Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of Bengali documents in collaboration with Rabindra Bharati University and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in December 2006

Record No: 2006/ 168	Language of work: Bengali
Author (s) / Editor (s): SUDHINDRA NĀTH DUTTA (1931 - 1943) SUDHINDRANĀTH DUTTA & HIRANKUMĀR SĀNYĀL (JULY 1940 - JUNE 1943)	
Title: পরিচয় PARICAYA	
Volume(s): VOL. 1 no1 (SRABAN 1338 [JULY 1931] - VOL 12 [ASHADHA 1350 [JUNE 1943]	
Place (s) of Publication: CALCUTTA	Publisher: JAGATBANDHU DUTTA 485 DALAHAUSI SQUARE. SRI KUNDABHUSAN BHADURI 11 COLLEGE SQUARE ETAL
Year / edition:	
Size: 23·2	Condition of the original: BAITTLE
Remarks: TITLE PAGE MISSING - VOL 4, VOL.9 PART II VOL 10 PART II TORN VOLUME - VOL. 5 (LITTLE TORN) VOL 7 PART I	
Holding institute: Rabindra Bharati University, Calcutta	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006 - 2007.

Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

পরিচয়

বার্ষিক
৪।০
প্রতি সংখ্যা
১৲

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪২

বিষয়-সূচী

সম্পাদকীয়

আইনষ্টাইন	...	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
রবীন্দ্র সঙ্গীত	...	...	শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট		...	শ্রীসুশোভন সরকার
পুরানো কথা	...	...	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন		...	আবু সয়ীদ আইয়ুব
ভাব ও ভাষা	...	...	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
সঙ্গম ও বিরহ	...	...	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
অভিসার	...	...	মার্সেল্ আরলাঁ
কবিতাগুচ্ছ	...	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত শ্রীনন্দলাল সেনগুপ্ত শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

পুস্তক পরিচয়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীসীতেশচন্দ্র কর, শ্রীলীলাময় রায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হুমায়ুন কবির, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল ইত্যাদি

সম্পাদক :
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ভব
কলিকাতা

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
ACC. NO. J 1821
DATE 21-5-2001

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J 1821

৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪২

পরিচয়

সম্পাদকী

ত্রৈমাসিকে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সুযোগ অত্যল্প। সাম্প্রতিক সংসারযাত্রা এমনি দ্রুত হয়ে উঠেছে যে দৈনিক পত্রও তার তালে চলতে অক্ষম; একটা খবর ছাপা হবার আগেই জনসাধারণের মন অন্য খবরে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া সংবাদসরবরাহ নারদশোভন বৃত্তি, এবং শুধু অর্থই অনর্থের মূল নয়, যাথার্থ্যও বিরোধবর্দ্ধক। কাজেই বার্ত্তা-সম্বন্ধে মতপ্রকাশে পরিচয়ের একটা স্বাভাবিক অনীহা আছে। কারণ নিরপেক্ষতার দাবি না-করলেও সে নির্ব্বিবাদ চায়; এবং মাঝে মাঝে তাকে যদিও হঠোক্তিতে পেয়ে বসে, তবু বঙ্গসাহিত্যের কলহকোলাহলে তার কণ্ঠস্বর আজ পর্য্যন্ত শোনা যায়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। তাহলেও শুচিবায়ু-নামক নারীসুলভ রোগকে পরিচয় ভয়ের চক্ষে দেখে, এবং সে জানে যে ঘটনা-সম্পর্কে উদাসীনতাও সেই সংক্রামক ব্যাধির দুর্লক্ষণ। কিন্তু সমাচারদর্পণই তার আদর্শ হলেও দেশ-কালের প্রতিবন্ধে সে-আদর্শকে সে আয়ত্তে আনতে পারে না। অতএব দুধের অভাব ঘোলে মিটিয়ে সে তার ঘটনাবোধ ব্যক্ত করে সাময়িক সাহিত্যের সবিস্তার সমালোচনায়। এই সম্পাদকী সেই সমালোচনা-বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত; যে-বিষয় সুশৃঙ্খল প্রবন্ধের অবাধ্য, যে-পুস্তকের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় অনাবশ্যক, এখানে উত্থাপিত হবে সেই সকল আশুক্লান্ত প্রসঙ্গ। কিন্তু সাহিত্যই পরিচয়ের অবলম্ব, এবং ত্রৈমাসিকের পক্ষে সময়োপযোগিতা অসাধ্য। সুতরাং এই মন্তব্যমুকুরে বর্ত্তমানের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিচ্ছবি কখনোই ফুটে উঠবে না। এমন-কি সম্পাদকেরাও যেহেতু আত্ম-

সর্ব্বস্ব ব্যক্তি, তাই শেষ পর্য্যন্ত এই পৃষ্ঠা-কটায় যা মিলবে, সে হচ্ছে একজন সীমাবদ্ধ মানুষের মানস প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয়গোষ্ঠীর ন্যূনাধিক সহানুভূতি থাকলেও এর সম্পূর্ণ দায় একা সম্পাদকের, এই কথা মনে রাখলে আমার অনুকম্পায়ীদের প্রতি হয়তো অবিচার ঘটবে না।

* * * *

বাংলা পত্রিকার সম্পাদকী বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বাক্যারম্ভ করবে, এইটাই হচ্ছে স্বভাবসঙ্গত। কিন্তু সে-পথ ঘটনাবিরল। বঙ্গসাহিত্যের সৌরমণ্ডলে উল্কাপাত অসম্ভব; এবং আমাদের গ্রহপতিদের গতিবিধির চর্চ্চা আমরা এত দিন ধ'রে করেছি যে তাঁদের প্রত্যেক বিকীরণ আমাদের নখদর্পণে, প্রত্যেক অপচার প্রত্যাশিত। উপরন্তু এ-বৈধতা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্ন নয়, আমাদের অর্ব্বাচীন সাহিত্যও নিয়মাধীন। এ-দেশের কবিযশঃপ্রার্থীরা যে-গুণের জোরে খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন, তারই অভ্যাসে তাঁদের সারা জীবন কাটে; কাব্য যে রসবৈচিত্র্য ব্যতীত বাঁচে না, তা বোধহয় তাঁদের জানা নেই। অথচ বাঙালী নিজেকে কলালক্ষ্মীর বরপুত্র ব'লে মনে করে। সে ভাবে যে তার কাছে রূপ যেহেতু রৌপ্যের চেয়ে মহার্ঘ্য, তাই সরকারী পরীক্ষাগুলোয় মান্দ্রাজীর সাফল্য তাকে টলাতে পারেনা, স্বদেশী বাণিজ্যে মারোয়াড়ীর একাধিপত্য সে নীরবে সয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ প্রায় সর্ব্বত্রই অহৈতুকী, এবং বাংলা অভিধানে যদি বৈদগ্ধ্য আর ভাবালুতা সমার্থবাচক না-হয়, তবে আমাদের রসজ্ঞান নিশ্চয়ই কিংবদন্তীমাত্র। আমরা অন্তত পাঁচ শ বছর থেকে কবিতা লিখছি, কিন্তু জন তিন চার সর্ব্ববাদিসম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে, আমাদের ভাণ্ডারে যা বাকি থাকে, তাতে সাহিত্যামোদীর লোভ ততটা নেই, যতটা লাভ মসলাবিক্রেতার। আধুনিক বাঙালীর কথা জানি না; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি যাদের কলমে বেরিয়েছিলো, কল্পনা তো তাদের ছিলোই

না, উদ্ভাবনার চেষ্টাও তারা কোনোদিন করেনি;—পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুলাপ পরবর্ত্তী পুনরুক্তির উপাদান জুগিয়ে এসেছে। ফলে আমাদের অধ্যাত্মকবিতায় আত্মসমর্পণ বা অমৃতপিপাসা নেই, আছে কেবল কুসংস্কার ও নির্ব্বুদ্ধাতিশয্য, আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি, আমাদের নিসর্গকাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগ্‌বাহুল্য। এই গেলো বাংলার কবিকাহিনী; এবং সাহিত্যে যদি ব্যাবসায়িক টান-জোগানের বিধান খাটে, তবে মানতেই হবে যে প্রতিধ্বনিপ্রীতি বাঙালী পাঠকেরও মজ্জাগত। হয়তো সেইজন্যেই আমাদের বাইরন্-বিলাসী পূর্ব্ব-পুরুষেরা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি বলতে দ্বিধা করেন নি, এবং আমাদের রবীন্দ্র-প্রভাবিত সমসাময়িকেরা সাহিত্যের সীমা-সম্বন্ধে অতটা উন্মুখর।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐকান্তিক মহত্বে আধুনিক লেখকের আস্থা আধুনিক সমালোচকের চেয়ে বেশি; কারণ সাহিত্যের মাত্রা না-মানলেও, আত্মশক্তির পরিমিতি সকল স্রষ্টাই ভালো ক'রে জানেন। ফলে আমাদের কাব্যরচয়িতারা, কাব্যবিবেচকদের মতো, কালাতীতের উপাসক নন; তাঁদের যেহেতু ইতিহাস-জ্ঞান আছে, তাই তাঁরা সহজেই বোঝেন যে বাইরন্-এর মতো গৌণ কবির অনুকরণই যখন অত শক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্য কবির পদানুসরণ একেবারে নিষ্ফল। সেইজন্যেই সনাতনী বেতসীবৃত্তিকে তাঁরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন, সেইজন্যেই প্রচলিত ঠাটে মানসীমূর্ত্তির পুনর্নির্ম্মাণে তাঁরা নিরুৎসুক, সেইজন্যেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস আত্ম-বিজ্ঞাপনে প্রযুক্ত, আত্মনিবেদনে নয়। কিন্তু সাহিত্যে মাত্রা যদিও অনিশ্চিত, তবু তার ধর্ম্ম সুবিদিত; এবং স্বতঃসিদ্ধি গণিতের ভিত্তি হলেও শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পরিণামী চিৎপ্রকর্ষ। অতএব কবির পক্ষে রোমন্থন যত-না গর্হিত, স্বয়ম্ভূতি ততোধিক অভাবনীয়; এবং মার্লো-র সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়র যেমন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত, মাইকেলের পরে রবীন্দ্রনাথের জন্মও তেমনি আবশ্যিক। কিন্তু আমাদের তথাকথিত তরুণসম্প্রদায় এই আর্য্যসত্যটাকে কাজে স্বীকার করলেও

কথায় আমল দেন না ; তাঁদের রচনারীতি যদিও রাবীন্দ্রিক রলরোলে অনুরণিত, তবু তাঁদের মনোভাবে অধমর্ণোচিত বিনয় নেই। অবশ্য এর জন্যে তাঁরা নিন্দনীয় নন ; কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ সাধারণের সম্পত্তি, আমাদের মাতৃভাষার এখন আর কোনো পৃথক সত্তা নেই ; এবং সেইজন্যেই হয়তো তাঁর সম্মোহ যদিও আমাদের অনভিপ্রেত, তবু তার থেকে উদ্ধারের উপায় আমরা জানি না। কিন্তু সামর্থ্য না-থাকলেও ইচ্ছার যে অন্ত নেই, এইটাই হচ্ছে বর্তমান বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা ; কেন-না ঐতিহ্য-ব্যতিরেকে সাহিত্যসেবা যদিচ অসম্ভব, তবু নির্বিকার ঐতিহ্য শুধু চিরাচারের নামান্তর, যার পাষাণপুরীতে কারুকর্মী সমাদৃত হলেও রূপকারের প্রবেশনিষেধ। সুতরাং সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্বত্র কাম্য ; তার মধ্যে বিপ্লবের পরিমাণ নগণ্য বটে, কিন্তু তার বিশিষ্টতা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। আধুনিকেরা সম্ভবত প্রায়ই ভুলে যান যে ব্যক্তিস্বরূপের অভাব কোনোদিনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে না। তাহলেও উত্তররৈবিক ছায়ানুবর্তিতায় কাকজ্যোৎস্না জাগিয়েছেন তাঁরাই ; আমাদের নিরিন্দ্রিয় নিরুদ্দেশযাত্রা শেষ হয়েছে তাঁদেরি নির্দেশে। তাই শুধু সাধনার বিচারে আমাদের নূতন লেখকদের আমি অত্যাধুনিক ইংরেজ কবি অডেন্ বা স্পেণ্ডর বা ডে ল্যুইস্-এর সমপাংক্তেয় মনে করি ; এবং সিদ্ধিতে, অর্থাৎ লোকমতে, এই বিদেশীরা যদি আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তার জন্যে শুধু ভাগ্যবিধাতাই দোষী। হয়তো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমে সুকর, হয়তো সেখানকার আত্মনিষ্ঠ সমাজ স্বকীয়তার মূল্য দিতে জানে, হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ কখনো ফল্গুর মতো প্রেততর্পণের মরুতীর্থ হয়ে ওঠেনি ব'লে উর্বরতা সেখানে শুধু উৎসের চার পাশেই দেখা যায় না, নদীসংলগ্ন শ্মশানও সেদেশে শ্যামল।

সে যাই হোক, কেন্দ্রাপসারণ আর সংস্কারমুক্তি এক নয় ; এবং প্রকৃত কবিমাত্রেই যদিও প্রথম প্রকরণে অভ্যস্ত, তবু দ্বিতীয় অবস্থায় অধিকারী শুধু তথাগতেরা। এ-কথা বাঙালী কবিরাও জানেন ; তাই তাঁরা শুধু পুনর্ব্বাদেরই প্রতিকূল, অনাসৃষ্টির জন্যে উন্মুখ নন। উপরন্তু

সে-চেষ্টারও কোনো অর্থ নেই ; কারণ ওয়াট্‌সনী মনোবিজ্ঞান যদিও ন্যায়ত ছিদ্রবহুল, তবু তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায়ই অপ্রমাদ ; এবং প্রথা-প্রবণ মানুষকে কলের পুতুল না-বললেও তার আচার-ব্যবহারে শিশু-শিক্ষার স্বাক্ষর একরকম অক্ষয়। তবে কবিরা সাধারণের চেয়ে আশু-চেতন ; এবং নিজ গুণে না হোক, আঠারো শতকের শেষ থেকে তাঁদের স্বকীয়তা-সম্বন্ধে যে-জনশ্রুতি চ'লে আসছে, অন্তত তার শাসনে তাঁরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থ। হয়তো সেইজন্যেই তাঁদের জাতিব্যবসায়ে আর সামবায়িক উদ্যোগের প্রাদুর্ভাব নেই, তাঁরাও আজকাল স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী। তবু কবিজীবন কাব্যের চেয়ে ব্যাপক, এবং আমাদের ভাবে যতই মৌলিকতা থাকুক না কেন, স্বভাবে আমরা নিতান্ত নির্বিশেষ। সুতরাং বাংলা কাব্যের নব্যতন্ত্রও আগাগোড়া নূতন নয় ; এবং ইদানীকার কবিরা আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গীই কাটিয়ে উঠেছেন, পরিপ্রেক্ষিতের পরবশতা ঘোচান নি। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কাব্য আর দর্শন বিভিন্ন বস্তু ; এবং কবির সমগ্র শক্তি যেকালে রূপসন্ধানেই নিয়োজিত, তখন তত্ত্বের জন্যে তিনি অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য। এ-নিয়ম দান্তে থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই খাটে ; দান্তে যেমন সুমা-র রসানুবাদ ক'রে ক্রিশ্চান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি উপনিষদের অনুগত ব'লে হিন্দু-সংস্কৃতির কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে লোকযাত্রার লক্ষ্য বদলেছে। আমাদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোয় পরগাছাই আজ একমাত্র বোধিক্রমরূপে বিরাজমান, যান-বাহনের বাহুল্যে পৃথিবীর প্রসার সঙ্কুচিত, সার্ব্বভৌম অন্নাভাবে সকল মানুষের অবস্থাই সমান। কাজেই আমাদের আধুনিকেরাও বৈদান্তিক বীক্ষায় নির্ভর হারিয়েছেন, তাঁদের মতে ভূমার দিকে নজর রেখে মোটারধাবিত রাজপথে চলা বিপজ্জনক। ফলত বর্তমান বাংলা সাহিত্য আর ভোরের কুয়াসায় আচ্ছন্ন নেই, তার পরিমণ্ডল এখন অস্ত-রাগে রঞ্জিত। কিন্তু এজন্যেও সাম্প্রতিকেরা চিন্তাশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা-ভাজন, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিযোগ অগ্রাহ্য। কারণ

এ-ক্ষেত্রে তাঁদের বৈদেশিকতা দোষাবহ বটে, কিন্তু তাঁদের মনুষ্যধর্ম্ম শ্রদ্ধেয়। তাছাড়া এই বর্ণসঙ্করতায় বাংলা সাহিত্য অভ্যস্ত। প্রাক্-মাইকেলী যুগেও কমঠবৃত্তির আদর ছিলো না; এবং ভারতচন্দ্রের সাধনা যদিও আর্য্যপন্থী, তবু তাঁর ভাবে ও ভাষায় মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। অতএব হাল আমলের বনেটপরা সরস্বতীও দেবতা, তিনিও বরদা এবং নমস্যা। দর্শন দূরের কথা, কাব্যে প্রতীক ও কবিপ্রসিদ্ধির প্রয়োজন যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন এফ্রোডাইটি উর্ব্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু শিল্প হেতুপ্রভব হলেও, তার ভূমিকার সমস্তটাই আনুষ্ঠানিক নয়, তাতে অতিদৈব সঙ্কল্পের স্থান আছে; এবং সাহিত্য-প্রসঙ্গে উপযোগবাদ যেহেতু অকাট্য, তাই তার উদ্দেশ্যে ও সার্থকতায় বিকল্প অচল। সুতরাং আমাদের সাগরলম্ফনের কৈফিয়তে শুধু কালনিষ্ঠার নাম শুনেই আমার জিজ্ঞাসা বারণ মানে না, সিন্ধুপারের মায়াকাননে বন্দিনী সীতার কুশলপ্রশ্নও স্বতই মনে আসে। সত্যই যদি প্রাচ্য মায়াবাদে বাস্তব জগৎ উপেক্ষিত ব'লে বাংলা সাহিত্য আজ পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে আমাদের উপরে ডি-এইচ্ লরেন্স্-এর আকর্ষণ দিন দিন এত বেড়ে চলেছে কেন? কারণ ইংলণ্ডে জন্মালেও লরেন্স্ য়ুরোপের প্রতিভূ নন; এ-কালের মানুষ হলেও তিনি প্রগতিবিদ্বেষী; যে-প্রতর্ক বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, সে-বৈনাশিকতায় তাঁর মন কখনো বিষিয়ে ওঠেনি, বিশ্বমানবের চিরকালীন সত্তাই তাঁকে পৃথিবীপ্রদক্ষিণে ডেকেছিলো। অর্থাৎ বুদ্ধির উপরে লরেন্স্-এর অভক্তি ছিলো বের্গসঁ-র চেয়েও গভীর; মহাসমরে বিধ্বস্ত হয়েও প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জাগে নি; তিনি আমরণ বিশ্বাস করেছিলেন যে পরীক্ষার মধ্যস্থতায় সত্যের সন্ধান মিলে না, সেজন্যে স্বজ্ঞার অন্তঃপ্রেরণাই নান্যপন্থা। সেইজন্যেই তাঁর রচনায় কল্পনা পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে, উপাখ্যান উপদেশের কাছে হার মেনেছে, তাঁর অসামান্য কবিপ্রতিভাও তাঁকে অসংযম ও লিপিশৈথিল্য থেকে বাঁচাতে পারেনি। অবশ্য তাঁর অকপটতা তর্কাতীত, তিনি যুগরোগের যে-নিদান করেছেন, তাও সম্ভবত নির্ভুল। কিন্তু তাহলেও, আমি যত

দূর জানি, লরেন্স্ বস্তুবাদের জন্যে বিখ্যাত নন, তাঁর অন্তর্দীপ্ত ভাবিকথন একদেশদর্শী; এবং সেইজন্যে বর্ত্তমান য়ুরোপ তাঁর পদলালিত্যেই মুগ্ধ, তাঁর অর্থগৌরবের মর্য্যাদা বোঝেন একমাত্র মিড্লটন্ মারি। অতএব এ-দেশের বস্তুবিলাসীদের কাছে লরেন্স্-এর প্রতিপত্তি দুর্ব্বোধ্য। তবে কি জাতিগত চৈতন্য শুধু কথার কথা নয়? আমরা আসলে প্রকৃতি-পরাঙ্মুখ ও উচ্ছাসপ্রবণ ব'লেই কি প্যাট্মোর-এর চেয়ে রসেটি আমাদের বেশি টানে, ওয়েন্-কে ছেড়ে আমরা ব্রুক্-এর তর্জ্জমা করি, ফষ্টার বেঁচে থাকতে গল্স্ওয়ার্দি-র জন্যে শোকাশ্রু মুছি? যদি আত্মসমাহিতিই আমাদের কাম্য হয়, তবে বাংলা দেশে য়েট্স্-এর আলোচনা নেই কেন? যদি আমরা যাথার্থ্যই চাই, তবে জয়েস্-সম্বন্ধে নিরুৎসাহের কারণ কি? যন্ত্রসভ্যতার সাক্ষাৎ পরিচয়ে যদি আমাদের ভয় না-থাকে, তবে আমরা অল্ডাস্ হাক্স্লি-কে বাড়াই কোন্ অছিলায়? আমি যুগধর্ম্মকে সম্মান করি, প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তাঁর পারিপার্শ্বিক দেশ ও কালের মুকুর, এই আমার বদ্ধ ধারণা; তাই আমাদের নববিধানে বহ্বারম্ভ লঘু ক্রিয়ার পুনরভিনয় আমি দেখতে চাই না, আন্তরিক অনিবার্য্যতাই আমার অভিষ্ট।

* * * *

আমার মতে আধুনিক য়ুরোপীয় মনের প্রায় সকল গুণই ফ্রেড্রিক্ ম্যানিং-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। সেইজন্যেই তাঁর অকাল মৃত্যু ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয়। স্বাস্থ্যের অভাবে ম্যানিং-এর অধিকাংশ জীবন প্রবাসে কাটে। ফলে, যতখানি লিপিপ্রাচুর্য্য এবং যাদৃশ বন্ধুভাগ্য খ্যাতির জন্যে দরকার, তা তিনি কোনোদিন অর্জ্জন করেন নি। কিন্তু চিররুগ্নতাই তাঁর রচনাসঙ্কোচের একমাত্র কারণ নয়। এই সাংবাদিক যুগেও ম্যানিং আত্মজ্ঞানকে আত্মপ্রকাশে ভজাতে পারেন নি; এবং তাঁর মনীষা সমসাময়িকদের ছিদ্রান্বেষণে কখনো এগোয় নি বটে, কিন্তু নিজের লেখাকে তিনি আজীবন নির্ম্মম দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তাই তাঁর সর্ব্বজনপ্রশংসিত সামরিক উপন্যাস—"হার্ প্রাইভেট্স্ উই" যখন প্রকাশকের জবরদস্তিতে মুদ্রিত হয়, তখন ম্যানিং তাতে নিজের নাম

দিতে পারেন নি। কিন্তু অদ্ভুত সে-পুস্তকের নিরাসক্তি, আশ্চর্য্য তার মিতভাষণ, তার অনুসন্ধিৎসার ব্যাপকতা অনুপম; যে-হিষ্টিরিয়া, যে-হিতোপদেশ, যে-অতিরঞ্জন সামরিক সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তার নামগন্ধও ম্যানিং-এর উপাখ্যানে নেই; অথচ তাঁর করুণা বিভীষিকা-বিলাসী রেমার্ক্-এর চেয়ে কম নয়, বরং সংযত ব'লে তাঁর নরকচিত্র আরো বেশি ভয়াবহ। মাত্র আর দুখানি বই "হার প্রাইভেট্স্ উই"-র পাশে স্থান পেতে পারে,—ব্লাওেন্-এর "আণ্ডার টোন্স্ অফ দি ওয়র" এবং লুড্ভিক্ রেন্-এর "ক্রীগ্"। কিন্তু ব্লাওেন্-এর সুমিতিতে একটা পোষাকী ভাব আছে, চিত্তবিক্ষোভের বিকাশ ইংরেজী সৌজন্যের অনুমত ব'লেই তিনি বুঝি শিষ্টাচার বাঁচিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর; এবং রেন্-এর নিরুদ্বেগ কেমন যেন আবেগবঞ্চিত। গ্রেভ্স্-এর "গুড্বাই টু অল্ দ্যাট্" এবং সিগ্ফ্রিড্ সস্থন্-এর "মেময়েস্ অফ্ এন্ ইন্ফ্যান্ট্রি অফিসার" বই-দুখানিতেও অসংযম নেই; কিন্তু উভয় পুস্তকের প্রেরণাই যেহেতু আত্মবিজ্ঞাপন, তাই আমার বিবেচনায় নৈর্ব্যক্তিক "হার প্রাইভেট্স্ উই" সামরিক সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা। এ-ছাড়া ম্যানিং "সীন্স্ এণ্ড্ প্রোট্রেট্স্" নামে আর একটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং "হার প্রাইভেট্স্ উই" যেমন তাঁর পরিদর্শনের সাক্ষ্য, তেমনি "সীন্স্ এণ্ড্ প্রেট্রেট্স্" তাঁর পরিকল্পনার নিদর্শন। সে-নাট্যরচনার বিষয়বস্তু মানব-জীবনের সনাতন সমস্যাসমূহ, তার কলাকৌশল ল্যাণ্ডর্-এর "ইম্যাজিনারি কন্ভার্সেশন্স্"-এর অনুরূপ, তার উৎকর্ষ তাকে ইতিমধ্যেই অমৃতের অধিকারী করেছে। "সীন্স্ এণ্ড্ পোট্রেট্স্"-এর সমতুল্য পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমি যতদূর জানি ভালেরি-র "এয়পালিন্স্" ছাড়া তার আর নিকটাত্মীয় নেই। ম্যানিং-এর কবিতা আমার অপরিচিত; কিন্তু যে-দুখানি ক্ষীণকায় পুঁথি তাঁর কাব্যসম্ভার বহন ক'রে বহুপূর্ব্বে বেরোয়, তার ঝঙ্কারে মতাদ্ধ এজ্রা পাউণ্ড্-ও একদিন বেজে উঠেছিলেন। সেইজন্যেই ম্যানিং-এর অন্তর্দ্ধানে ইংরেজী সাহিত্যের জনসমাকুল সভাও আজ শূন্য; কারণ প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা সে-দেশে অগণ্য হলেও নিষ্কাম সাধক সর্ব্বত্রই বিরল।

টি-ই লরেন্স্-এর অপঘাতেও ইংলণ্ডের বিস্তর ক্ষতি; কিন্তু সে-ক্ষতি ততটা ইংরেজী সাহিত্যের নয়, যতটা ইংরেজী রাষ্ট্রনীতির। কারণ "সেভ্ন্ পিলার্স্ অফ্ উইজ্ডাম্" লিখে লরেন্স যদিও তাঁর মাতৃভাষাকে উপকৃত করেছেন, তবু তাঁর মাতৃভূমির কাছে সে-পুস্তক যে-কীর্ত্তির কাহিনী তার মূল্য খুব সম্ভব অনেক বেশী। অবশ্য তিনি না-জন্মালেও টার্কির পরাজয় বন্ধ থাকতো না। কিন্তু তাঁর দৌত্য ব্যতীত আরবদেশ বৃটিশ বৈজয়ন্তীর উপচ্ছায়ায় আসতো কিনা সন্দেহ। তাহলেও লরেন্স্-সম্বন্ধে যে সব কৌটিল্যোচিত রূপকথা চলে, সেগুলো প্রায়ই অবিশ্বাস্য। লরেন্স্ বোধহয় স্বভাবত সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, ঘটনাচক্রই তাঁকে দিগ্বিজয়ের উপলক্ষ্য ক'রে তোলে; এবং ভের্সাই-সভায় আরব-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দুরভিসন্ধি অবগত হয়ে তিনি কেবল তাঁর পদক ও পদবীগুলোই ফিরিয়ে দেন নি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও কর্ত্তৃপক্ষদের জানিয়েছিলেন যে সে-অবিচারের প্রতিকারে তিনি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেও প্রস্তুত। এই নাটকীয় হঠোক্তি শুনে লয়েড্ জর্জ্জ্-এর মন না-গল্লেও, এর অমায়িকতা সুনিশ্চিত। কারণ লরেন্স্-এর পরজীবনের অজ্ঞাতবাস, প্রসিদ্ধিভীতি ইত্যাদি উপসর্গগুলো যদিই বা কোনো কূট ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হয়, তবু তাঁর আমরণ অর্থকষ্টের ব্যাথা না-পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে গুপ্তচর বলা অসার্থক ও অন্যায়। আসলে রাজনীতিকেরা তাঁকে বারম্বার দুঃখই দিয়েছে; এবং সন্ধিস্থাপনের অব্যবহিত পরে তিনি যখন আত্মধিকারের তাড়নে নিজের জীবনচরিত লিখতে সুরু করেন, তখন এক রেল্ওয়ে ষ্টেশনে তাঁর পাণ্ডুলিপি চুরি যায় রাজপুরুষদেরই চক্রান্তে। কিন্তু তাতে লরেন্স্-এর মুখ বন্ধ হয় নি, তাঁর পুনর্লিখিত জীবনী, "সেভ্ন্ পিলার্স্ অফ উইজ্ডাম্" স্বদেশী বিদেশী সকলের সম্বন্ধেই অপ্রিয় সত্যে পরিপূর্ণ। তবু রটনাকে লরেন্স্ এমনি ভয় পেতেন যে তিনি বইটিকে সাধারণের নাগালে আনতে চাননি, অল্প খানকতক দুর্ম্মূল্য কপি ছাপিয়ে বন্ধুদের মধ্যেই বেচেছিলেন। সে-পুস্তকের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নি, তার ছাপার খরচ জোগানোর জন্যে "রিভোল্ট্ ইন্ দি ডেজার্ট্" নাম

দিয়ে আরব যুদ্ধের যে-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লরেন্স্ প্রকাশ করেন, আমি শুধু তাই পড়েছি। কিন্তু নাতিদীর্ঘ হলেও "রিভোল্ট্ ইন্ দি ডেজার্ট্" অবিস্মরণীয় পুস্তক; লিখনভঙ্গীতে শত মুদ্রাদোষ থাকলেও লরেন্স্-এর কবিপ্রতিভা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের বস্তু; গত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে যত অসামান্য ইংরেজ লেখক আরব মরুতে ডাউটি-র পদাঙ্কে চলেছেন, লরেন্স্ সম্ভবত তাঁদের সকলের অগ্রগণ্য। স্বয়ং ডাউটি-ই লরেন্স্-এর উপমান, এবং তাঁরই মতো আরবদেশে লরেন্স্-এর প্রথম পদার্পণ প্রস্তুতত্বের অন্বেষণে। আমার বিশ্বাস, এই পুরাবৃত্তের মোহ তাঁদের ক্ষেত্রে আপতিক খেয়াল মাত্র নয়; আশপাশের বালখিল্যদের সঙ্গে তাঁদের বৈষম্য মূলগত ছিলো ব'লেই তাঁরা হয়তো দুর্গম মরুতে অতীতের মরীচিকাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। অন্তত লরেন্স্-সম্বন্ধে এই অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ হোমার ও ম্যালোরি-র প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত। তাঁর রোমহর্ষক কর্মজীবনেও তিনি এই কবিদের ছেড়ে কখনো এক পা নড়েন নি, এবং অডিসি-র গদ্যানুবাদই তাঁর সহিত্যসাধনার উপযুক্ত উপসংহার। আমার মতে তাঁর "অডিসি অফ্ হোমার" ইংরেজী প্রতিভাষিক সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়, তার জোড়া আমাদের কালে মিলবে না, সে-জন্য যেতে হবে এলিজাবেথের আমলে। আমার চক্ষে লরেন্স্-এর সমকক্ষেরাও সেই ঊর্ধ্বাগ যুগের মানুষ, তাঁর ওজস্বী ও অমিত ব্যক্তি-স্বরূপ আমাদের হিতবাদী সমাজব্যবস্থায় নিতান্ত অসমঞ্জস।

মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে পানাইৎ ইস্ত্রাতি-র তিরোধানও পরিতাপের বিষয়। আমাদের কানে তাঁর নাম যদিও অবিদিত, তবু য়ুরোপের বিচারে তিনি গর্কির প্রতিযোগী। ইস্ত্রাতি-র জন্ম বল্‌কান্ উপদ্বীপে; কিন্তু নিজেকে ফরাসী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কন্‌রাড্-এর মতোই তিনি দেখিয়ে গেছেন যে বক্তব্য থাকলে পর-ভাষার বাধাও অতিক্রমণীয়। বলাই বাহুল্য ফরাসীপ্রেমিক ইস্ত্রাতি জাতিস্মর ছিলেন না। কোনো এক দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি যখন আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে শয্যাগত, তখন রোম্যা রোলাঁ-র সেবা ও শুশ্রূষা, রোম্যা রোলাঁ-র সৌহার্দ্য ও

আশ্বাসবাণী তাঁর বিষাক্ত মনে জিজীবিষা ফিরিয়ে আনে। তাই তাঁর নব জীবনের অভ্যুদয় রোলাঁ-সম্পাদিত এয়রোপ্-পত্রিকায়। কিন্তু সেই থেকে বারো বছর ধ'রে একটার পর একটা উপন্যাস লিখে গেলেও ইস্ত্রাতি কখনো সৌখিনী সাহিত্যে আশ্রয় নেন নি; তাঁর রচনায় অভিজ্ঞতা সর্ব্বদাই অভিব্যক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে; এবং তিনি যেহেতু সুখের চেয়ে স্বস্তিকে বড় ভাবেন নি, বরং সত্যের খাতিরে সুখের আশায় বারম্বার জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তাই দিনে দিনে তাঁর পাঠকের দল বেড়েছে বটে, কিন্তু প্রিয়জনের সংখ্যা ক্রমাগতই কমেছে। অন্তঃকালে তিনি যদিও এক রোলাঁ ভিন্ন আর সকল বন্ধুকেই খুইয়েছিলেন, তবু তাঁর স্পষ্টভাষণ রোলাঁ-র ভাবালু উদারনীতিকেও ছেড়ে কথা কয় নি; এবং শেষ জীবনে সোভিয়েট্‌রাষ্ট্র-সম্বন্ধে তথ্যবহুল পরিবাদের ফলে তাঁর মতো জন্মবিদ্রোহীকেও ফরাসী বিপ্লববিলাসীদের শত্রুতা সইতে হয়েছে। কিন্তু সমষ্টিবাদীর ধমক খেয়েও ইস্ত্রাতি-র স্বভাব শোধরায়নি, এবং অত্যাচারবিদ্বেষ প্রলয়রতিরই নামান্তর, এই দার্শনিক উপদেশ জুলিয়্যাঁ বাঁদা-র মুখে শুনেও তিনি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠাকে সজাগ রেখেছিলেন। তাহলেও ইস্ত্রাতি-কে আদর্শপ্রাণ বলা অনুচিত; অনাচার ও অত্যাচারের সংসর্গে বেড়ে উঠে অনাগত রামরাজ্যে তাঁর ভরসা ঘুচেছিলো; এবং অন্ন-বস্ত্রের অভাবে আশৈশব সমাজরক্ষীদের সংঘর্ষে এসে তিনি মানুষকে ভালোবাসার অবকাশ পান নি। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি বস্তুতই ধ্বংসপ্রধান, তাঁর নায়ক-নায়িকারা সকলেই সর্ব্বহারা, তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ হলেও কেমন যেন কর্কশ ও ঘৃণাব্যঞ্জক। আরো কিছুদিন বাঁচলে ইস্ত্রাতি-র উগ্রতায় নিশ্চয়ই মন্দা পড়তো; অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়তো তাঁর অসাধারণ জীবনবেদের অনবদ্য ছবি এঁকে যেতেন। কিন্তু দুর্দ্দৈবের দৌরাত্ম্যে আমরা যদিও তাঁর কথকালির চূড়ান্ত প্রকাশে ফাঁকি পড়লুম, তবু তাঁর বর্ত্তমান বইগুলিকে সত্যানুরাগী সহজে ভুলবে না। ইস্ত্রাতি হাইনে-প্রমুখ রোম্যান্টিক দুঃশাসনদের শেষ বংশধর; এই জগদ্ব্যাপী নিরীহনিগ্রহের দিনে তাঁর জন্যে শোক করার তাই কারণ আছে।

আইনষ্টাইন্

তিরিশ বৎসর আগে আইনষ্টাইন্ যে প্রবন্ধে আপেক্ষিকবাদের সূচনা করেন তাহা পদার্থবিজ্ঞানে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। জড়জগতের ঘটনা-সমূহের বিবৃতি ও উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক যে দেশ ও কাল রূপ প্রক্ষেপ-ভূমির পরিকল্পনা করেন, তাহা যে দর্শকনিরপেক্ষ নয়, দ্রষ্টার গতির সহিত তাঁহার পরিকল্পিত দেশ-কাল-ধর্ম্মের যে নিকট ও নিত্য সম্বন্ধ আছে, এইটিই এই নূতন মতবাদের প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি দার্শনিকের কাছে খুব নূতন না ঠেকিলেও ইহাকে স্বীকার করিয়াও যে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই সত্য একেবারে অনায়াসবোধ্য কিংবা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ফলতঃ আইনষ্টাইনের পূর্ব্বে কোনো বৈজ্ঞানিকই ইহা সম্ভব বলিয়া ভাবেন নাই। দ্রষ্টানির্ব্বিশেষে যে দেশকালের ব্যবধানের পরিমাণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্ভব এবং ওই পরিমিতির উপর নির্ভর করিয়া গণিতের সাহায্যে জড়বস্তুর অবস্থান ও গতি কিংবা ঘটনার অবসম্পাতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের মূলে বর্ত্তমান। কাজেই নিউটন প্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্যেরা দেশ-কালের ধর্ম্ম ও মান ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও স্বতঃপ্রতিষ্ঠ, এই কথা স্বীকার করিয়াই পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করিয়াছেন। দেশ-বোধের জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল ছিল। দূরত্বের মাপকাঠি যে সকল দ্রষ্টার পক্ষে একই, ইহা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন। গতিভঙ্গে কিংবা স্থান-পরিবর্ত্তনে যে ওই মাপকাঠির কোনো রূপান্তর হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর ছিল।

কালমান যন্ত্রের ধ্রুবত্বের বিষয়ও তাঁহারা একই প্রকারে নিঃসন্দিহান ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে ও প্রিন্‌সিপিয়ার গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশকালের প্রক্ষেপ-ভূমি সকলের পক্ষে একই এবং

তাহার ধর্ম্ম দ্রষ্টার বিশেষত্বের অপেক্ষা রাখে না, এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুই শত বৎসর সর্ব্বগ্রাহ্য ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্ব্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনার মধ্যে নিত্য সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহারই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ফলে সূক্ষ্ম মানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও গণনার মধ্যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়িতে লাগিল, তাহার নিরা-করণ আর পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হইল না।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে আলোকতরঙ্গের উপর দ্রষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের কোনো প্রভাব আছে কিনা, এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ও তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার পরীক্ষার ফলে পুরাতন বিজ্ঞানের সহিত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার যে অসামঞ্জস্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার নিরাকরণের জন্য আইনষ্টাইন্ আপেক্ষিক মতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আলোকতরঙ্গ-বাহক ঈথর ও তৎসম্ভূত তরঙ্গের স্পন্দনকালই বৈজ্ঞানিকের কাছে নিউটনীয় স্বতঃপ্রতিষ্ঠ দেশ-কালের মূর্ত্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য হইত। এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক ও উহা যে আলোকবিজ্ঞানের সমস্ত অসামঞ্জস্যের কারণ, ইহা আইনষ্টাইন্ খুব সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। দেশকালের নিরপেক্ষবাদ ত্যাগ করিয়াও যে বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্ভব, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আইনষ্টাইন্ প্রথম প্রবন্ধে যে বিভিন্নগামী দ্রষ্টাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের পারস্পরিক আপেক্ষিক গতির হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা ধরিয়াই তিনি আপেক্ষিকবাদের বিচার আরম্ভ করেন। ওই সময়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে তিনি গণনার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের কোনো প্রভাবই তদবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র উপরোক্তভাবে সীমা-বদ্ধ হইলেও যে বিরোধভঞ্জনের প্রয়োজন ছিল তাহা সুসাধিত হইল। অধিকন্তু ওইরূপ নূতন মতবাদের উপর যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব, সে বিষয়েও অপক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকের মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। আইনষ্টাইন কিন্তু এই সাফল্যেই

সন্তুষ্ট রহিলেন না। আরও দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে তিনি আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র প্রভূতভাবে বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক নূতন গতিশাস্ত্রের ভিত্তি তিনি স্থাপনা করিলেন। আপেক্ষিকবাদ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ রইল না। সর্ব্বপ্রকার গতিবৈষম্যের ক্ষেত্রেও যে উহা প্রযোজ্য আইন্‌ষ্টাইন্ তাহা দেখাইতে সক্ষম হইলেন।

নূতন গতিশাস্ত্রের সহিত নিউটনীয় মতবাদের বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে মাধ্যাকর্ষণবাদের কয়েকটি মূল কথা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। নিউটন জড়বস্তুর গতিবৈচিত্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। যে কোনো দুইটি জড়বস্তুর মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হউক না কেন, নিউটনের মতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বর্ত্তমান। মাধ্যাকর্ষণ-ধর্ম্ম-সম্ভূত ওই শক্তির প্রভাব দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত বিপরীতবর্গ-নিয়মানুসারে বাড়ে ও কমে। তাঁহার বিজ্ঞানে কিন্তু এক বস্তু হইতে অন্যের উপর প্রভাব-প্রবর্ত্তনের জন্য কোনো অসীম বস্তুধর্ম্মী জড়ক্ষেত্রের পরিকল্পনার সুবিধা নাই। অর্থাৎ আলোকবিজ্ঞানের মত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তরঙ্গবাদের উপর অবস্থিত নয়। সর্ব্বপ্রকারে বিযুক্ত থাকিয়াও যে জড়বস্তুরা দূর হইতে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এই কল্পনা অনেকের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। মনে হয় নিউটন নিজেও তাঁহার মতবাদকে এইদিক হইতে অসম্পূর্ণ ভাবিতেন। বিদ্যুদ্‌বাহী জড়কণার মধ্যেও এইরূপ আকর্ষণশক্তির কল্পনা নিউটনের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডে ও মাক্সওয়েল্ পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিলেন যে এই ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার তরঙ্গাকারে একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হয়। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের এই দূর হইতে প্রভাব বিস্তারের কল্পনা অনেকের কাছে অসন্তোষজনক মনে হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনো মতবাদ উত্থাপন করিতে আইন্‌ষ্টাইনের

পূর্ব্বে কোনো বৈজ্ঞানিকই সক্ষম হন নাই। এ দিকে গ্রহ উপগ্রহের কক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের গতিবিধির বৈচিত্র্য এই মতানুসারে সহজ ও সুন্দরভাবে নির্দ্দেশিত হইল। এই তত্ত্বের অদ্ভুত সাফল্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিল। কোপার্নিকাস্ টলেমিকে নির্ব্বাসিত করিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব যে সৌরমণ্ডল অতিক্রম করিয়া অতিদূরবর্ত্তী তারাজগতেও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান, তাহার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থাপিত করিলেন।

মনে রাখিতে হইবে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বানুমোদিত গতিশাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দেশকালের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে আপেক্ষিকবাদের প্রচার করিতে গিয়া আইন্‌ষ্টাইন্ দেখিলেন নিউটনীয় শক্তি-পরিকল্পনার স্থান তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন বিজ্ঞানে নাই। কাজেই জড়ের, গ্রহের,তারকারাজির গতিবৈচিত্র্যের ভিন্ন হেতুনির্দ্দেশের প্রয়োজন হইল। দশবৎসরের সাধনার ফলে যে হেতু তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা উচ্চগণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু পুরাতন মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি এই মতবাদের সাহায্যে ভিন্নভাবে বুঝাইতে তিনি সক্ষম হইলেন। ইহার জন্য আইনষ্টাইন ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে বিসর্জ্জন দিয়া রীমান-কল্পিত দেশবোধতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন। গণিতের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হইবে জড়ের গতিবৈচিত্র্যের কারণ দ্রষ্টার দেশকালরূপ প্রক্ষেপভূমির অসমতা ও বর্ত্তুলতা।

ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে পরিকল্পনা এই মতবাদে সম্পূর্ণ নূতন ও চমকপ্রদ। পুরাতন বিজ্ঞানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই দেশবোধের একমাত্র অবলম্বন। উক্তমতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অসীম ও অবাধ। উহার পরিমাণের কল্পনাও অসম্ভব। আপেক্ষিক মতবাদে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অবাধ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহাকে আর অসীম কিংবা অপরিমেয় বলা চলে না। দেশকালের বর্ত্তুলতা স্বীকার করিলে আইনষ্টাইনের মতানুযায়ী তাহার প্রসারের পরিমাণ করা আর অসম্ভব নয়।

জড়ের গতির ন্যায় আলোকের গতির উপর দেশকালের অসমতা ও বর্তুলতার প্রভাব আছে। কাজেই আলোকরশ্মির উপর তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আইনষ্টাইনের মতবাদের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই বিষয়ে তিনি গণিতের সাহায্যে যে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সব কয়টি আজ বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যেই আইনষ্টাইন তাঁহার নূতন গণনার ফল প্রকাশিত করেন। সন্ধিস্থাপনের অব্যবহিত পরে ১৯১৯ সালের সূর্য্যগ্রহণের সময় ইংরাজ জ্যোতির্বেত্তারা এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। আইনষ্টাইনের বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতির আরম্ভ ওই সময় হইতেই। সাধারণ সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত আইনষ্টাইনের মতের আলোচনার আরম্ভ হইল। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মধ্যেও তাঁহার আপেক্ষিকতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও কৌতূহল জাগরূক হইল। ফলে আইনষ্টাইনের নাম আজ বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। তাঁহার জীবনী ও ব্যক্তিস্বরূপের বিষয় জানিবার কৌতূহলের আজ অবধি নাই।

সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইবার বহুপূর্ব্বেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিজ্ঞানবিলাসীদের চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর ও অলোকসামান্য অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মর্ম্ম আজ সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আলোকের শক্তিকণা-বাদ—ব্রাউন আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণীয় বস্তুকণার অবিরত আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত হেতুনির্দ্দেশ—ইত্যাদি গবেষণার প্রত্যেকটি আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ঘটনা। যে মহারথীরা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নেতৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদের অতি পুরোভাগেই আইনষ্টাইনের স্থান আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত।

এই অসামান্য বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিস্বরূপ বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় মহাসমরের পর গত কয়েক বৎসরের জাতীয় ও অন্তর্জ্জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিস্থিতির কিছু আলোচনার প্রয়োজন। যাঁহারা মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতে আস্থাবান, জাতিনির্ব্বিশেষে মনুষ্যজীবন যাঁহারা

অমূল্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতিরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার স্বীকার করিতে যাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা বিগত মহাসমরের হিংস্র ও ভয়াবহ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যে দাবানলে ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভেরসাই-এর সন্ধিতে সে দাবানল নির্ব্বাপণের পর পুনর্ব্বার উহা যাহাতে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সকল দেশের প্রকৃত মানবপ্রেমিকেরা উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। ওই মনোভাব হইতেই আন্তর্জ্জাতিক সমবায়ের উৎপত্তি। প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত মানবপ্রেমিকের চেষ্টাতে যে রাজনৈতিক জগতে শান্তি চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব, রোগ, দৈন্য, অন্ধ জাতি-বিদ্বেষ, নৃশংস সামাজিক অত্যাচার ও কলুষতার বিরুদ্ধে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত মানুষের সমবেত চেষ্টা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিরন্তর নিয়োজিত থাকিবে, এই আশা ও ধারণা লইয়াই আইনষ্টাইন জেনীভার বৈঠকে যোগদান করেন। গত কয়েক বৎসরের কাহিনী কিন্তু বড়ই নিষ্করুণ। জাত্যাভিমান, বর্ব্বর সমর-মনোভাব, পরশ্রীকাতরতা, অত্যাচার ও সাম্রাজ্যলোলুপতার আশু অবসানের স্বপ্ন দেখিয়া যাঁহারা জেনীভার আন্তর্জ্জাতিক বৈঠককে এক মহামানবীয় সভ্যযুগের সূচনা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর হতাশ হইয়া আইনষ্টাইন ১৯৩২ খ্রীঃ জেনিভার বৈঠকে পুনর্ব্বার যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ হিট্‌লারের অভ্যুদয়ে জর্ম্মাণীতে ইহুদীবর্জ্জন নীতি প্রচলিত হইলে তিনি নিজের মানসম্ভ্রম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন। স্বধর্ম্মাবলম্বী বহু ইহুদীর ন্যায় আজ তিনি স্বদেশত্যাগী। তাঁহার ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা বিজ্ঞানসাধককেও আজ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পড়িতে হইয়াছে।

আইনষ্টাইনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী হইতে

সঙ্কলিত হইয়া ১৯৩৩ সালে জর্ম্মাণ ভাষায় Mein Welt-bild * বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, The World as I see it তাহারই ইংরাজী অনুবাদ। বিষয়ানুসারে পুস্তকখানি পাঁচভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রবন্ধে প্রায় অর্দ্ধাংশ পূর্ণ। বাকী প্রবন্ধগুলি তাঁহার দার্শনিক মনোভাবের এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক,জর্ম্মাণীর ও ইহুদী সমস্যার বিষয়ে মতামতের পরিচয় দিতেছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত। কাজেই বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে মতামতের সুসঙ্গতি সব সময় সুস্পষ্ট না হইলেও সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধটির মধ্যে লেখককে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। বর্ত্তমান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সকলের কাছে যুক্তিযুক্ত, অমোঘ কিংবা বিচারসহ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারে। কিন্তু মানবজাতির উপর যে শ্রদ্ধা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলকেই স্পর্শ ও মুগ্ধ করিবে। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় রচনাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার মধ্যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা, আপেক্ষিক মতবাদের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিকের আদর্শ ও গবেষণা-পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রবন্ধই গভীরচিত্ত পাঠকের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আপেক্ষিক মতবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতির বিষয়ে আইনষ্টাইনের মতামতের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সৃষ্টির অপার রহস্যের ভিতর আমাদের মন যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অত্যল্প ও ক্ষীণ সন্ধান পায় তাহার সমগ্র উপলব্ধি মানববুদ্ধির অতীত হইলেও নিরন্তর তাহারই সাধনাই তাঁহার মতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে সমস্ত জগৎকে বৈজ্ঞানিক অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে চায়। এইজন্যই নিজের বুদ্ধি-অনুযায়ী বহর্জগতের হেতুসূত্রে-যোজিত

* The World As I See It—By Albert Einstein (John Lane).

মনোমত প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এইরূপে হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যেই ব্যক্তিত্বের দ্বারা রঞ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া সে বহির্জগতের স্বরূপসত্তাকে ধরিতে চাহে। প্রকৃতির প্রত্যেক জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণ মানববুদ্ধির অতীত বলিয়াই ওই প্রতীকের রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সরল ঘটনাসমূহের বিকলন ও পুনঃসংযোজনা লইয়াই বৈজ্ঞানিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সংযোজন ও বিশ্লেষণ ন্যায়ানুগ ও নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন; এইজন্যই পদার্থবৈজ্ঞানিককে গণিতের রীতি ও পরিভাষার আশ্রয় লইতে হয়। কাজেই অপূর্ণ হইলেও বৈজ্ঞানিকের প্রতীকরাজ্যে অশুদ্ধতা অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার স্থান নাই। সমগ্র জাগতিক ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ চিরকাল সসীম মানববুদ্ধির অতীত রহিলেও শুধু ন্যায়সঙ্গত বিকলন-প্রথায় প্রত্যেক বাস্তব বা জৈব ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ যে সম্ভব, ইহা আইনষ্টাইন বিশ্বাস করেন। যে সামান্য ও চিরন্তন নিয়মাবলী হইতে ন্যায়ের বিকলনপদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের আবিষ্কারের কোনো ন্যায়নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। বহির্জগতের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে উহারা আপনা হইতে বৈজ্ঞানিকের মানস-পটে উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য এই নিয়মাবলীর যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের তৎপ্রসূত ফলাফলকে অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিতে হয়।

নিউটন প্রমুখ পুরাণ-পন্থী বৈজ্ঞানিকেরা আইনষ্টাইনের মতই কতকগুলি প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ হইতে বিকলনপ্রথায় জগতের ঘটনাবলীর হেতুনির্দ্দেশ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই ধারণা ছিল যে সঙ্কলন-ন্যায়ানুমোদিত প্রথাতেই প্রাকৃতিক বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ ওই স্বতঃসিদ্ধ-গুলি নির্ঘর্ষিত করিয়া লইতে পারে। তাঁহারা অভিজ্ঞতার সহিত স্বতঃসিদ্ধগুলি ন্যায়সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্নপ্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা করিয়া বিশ্ব-জগতের হেতুনির্দ্দেশে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। এই মতের

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J 1821
1688

স্বপক্ষে উদাহরণসরূপ তাঁহারা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও নিউটনীয় গতি-শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন। বৈজ্ঞানিকদের উক্ত ধারণাকে আপেক্ষিকবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। আপেক্ষিকবাদের স্বতঃসিদ্ধগুলি পুরাতন গতিশাস্ত্রের প্রত্যয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও একই শ্রেণীর ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ এই মতেও সন্তোষজনক ভাবে সম্ভব। কাজেই যে প্রাথমিক সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গুলির উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া উঠে মানুষের অভিজ্ঞতার সহিত সেগুলির ন্যায়গত কোনো নিত্যসম্পর্ক নাই।

এই মত কিন্তু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যে প্রত্যয় ও সংজ্ঞার সংযোজনা হইতে বৈজ্ঞানিকের প্রতীকজগৎ গড়িয়া উঠে, তাহার সহিত মানব-অভিজ্ঞতার যদি ন্যায়সঙ্গত নিত্যযোগ না থাকে, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন কল্পনা করিবার অধিকার যদি স্বীকার করা যায়, তবে কি ভাবিতে হইবে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতের প্রতিকৃতির সহিত বাহ্য জগতের কোনো সম্পর্কই নাই। হেতু-প্রভব প্রতীকের সাহায্যে বহির্জগতের স্বরূপসত্তার উপলব্ধির চেষ্টা তবে কি মানবের ব্যর্থ-প্রয়াস মাত্র? লোকযাত্রার উপযোগিতাই কি তবে বিজ্ঞানের শেষ কথা?

আইনষ্টাইন উহা বিশ্বাস করেন না। ন্যায়ানুগত যোগসূত্র না থাকিলেও কোনো অজ্ঞেয় উপায়ে বহির্জগৎ আমাদের প্রতীকজগতের প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধগুলিকে অদ্বিতীয়ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করিতেছে, ইহাই আইনষ্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই অদ্বিতীয় নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তাহাও তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যে বাহ্যপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও ঘটনার অন্তর্নিহিত নিত্যসম্পর্কসমূহকে আমরা গণিতের অপেক্ষাকৃত সরল প্রত্যয়ের অনুসারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলিকে ন্যায়পথে পাওয়া যাইবে না। তাহাদের আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে আন্তরিক অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রত্যয়গুলির সম্ভাব্যতার কথা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে, তাহাদের সংযোজনার ফলাফলের সহিত বাহ্য জগতের প্রকৃতির তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে আমরা যথার্থ

প্রত্যয়গুলির সন্ধান পাইয়াছি কিনা। শুদ্ধ প্রত্যয় অবলম্বনে গাণিতিক উপায়ে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র আমরা রচনা করি তাহা শুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধ-শূন্য। তাহাতে দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ না থাকিলেও তাহার সহিত বহির্জগতের কোনো নিত্য সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ উহা বস্তুসার-শূন্য সংযোজনা মাত্র। উহার প্রত্যয়গুলির সহিত বহির্জগতের বস্তুসত্তার যথাযথ সম্পর্ক আরোপ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে ঐ বিজ্ঞানের অনুসারে বহির্জগতের ঘটনাবলীকে আমরা বুঝিতে পারি কিনা।

আপেক্ষিকবাদ-আবিষ্কার-ব্যপদেশে তাঁহার বিভিন্ন চেষ্টার উদাহরণ দিয়া আইনষ্টাইন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে উপরোল্লিখিত উপায়ে বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা নিষ্ফল ও আকাশকুসুম মাত্র নয়।

আইনষ্টাইন যে পূর্ব্বগামী আচার্য্যদের মতই বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে ও হেতুপ্রভব বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী, তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পদার্থ-বিজ্ঞানে নবতম সমষ্টিবাদের ফলে আজকাল অনেকেই হেতুবাদের উপরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ফলে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার পরিবর্ত্তে তাহার সম্ভাবনার আলোচনাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এই নবমতবাদ অণুপরমাণুরাজ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে যে হেতুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে ইহাই আইনষ্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই প্রতিষ্ঠার আয়াসেই তাঁহার সাধনা ও পরিশ্রম সমগ্রভাবে নিয়োজিত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
LIBRARY
11896

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে দুচারটি কথা

যাঁরা যন্ত্রসঙ্গীত ভিন্ন অন্য সব সঙ্গীত অশুদ্ধ, অতএব হেয় বিবেচনা করেন, তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখ্‌ছিনা, যাঁরা মনে করেন যে হিন্দু সঙ্গীতের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস তাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে কৃপার চক্ষেই দেখবেন, অতএব প্রতিদানে তাঁদেরকে কোনো অনুরোধ পর্য্যন্ত করতে সাহস হয় না। যাঁরা বলেন, দেশে বাঙলা গানেরই ভবিষ্যৎ আছে, হিন্দুস্থানী ঢঙ্‌ অচল কিংবা হিন্দুস্থানী গানই চলবে, বাঙলা গানের আয়ু দুদিনেই শেষ হবে,—তাঁদের কোনো প্রবন্ধই আদ্যোপান্ত পড়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দিব্য চক্ষুতে সমগ্র ভবিষ্যতের আভাস সুস্পষ্ট।

আমি লিখছি তাঁদের জন্য যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, সঙ্গীতে কথাকে সাপের বিষের মত নেই নেই করে উড়িয়ে দিতে চান না, এবং হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতিটাই বাঙ্‌লা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা মানেন, এবং তুলনামূলক বিচারে বুদ্ধি এবং ঘটনাকেই প্রধান করেন। মূল্যদান সম্বন্ধে আমি পাঠকবর্গকে শ্রীবৎস চিন্তার গল্পটি স্মরণ করাতে চাই। মূল্যদানের পূর্ব্বে মিল-গরমিল দুধারেই সমান নজর রাখতে হবে। তুলনার ক্ষেত্রটি যদি সমান না হয়, তবে তুলনাটি হবে সংস্কারকেরই সংস্কার। টাকাকে আনা দিয়ে ভাগ দেবার পূর্ব্বে তাকে আনাতে পরিণত করে পঞ্চম শ্রেণীর বালক, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাল না বাঙলা গান ভাল আলোচনা করবার সময় এই বালকসুলভ ফন্দীটি বয়স্কেরাও ভুলে যান। তাঁদের দোষ নেই, কারণ, বড়-ছোট, আগে-পিছে, জয়-পরাজয় ইত্যাদির বিচারকেই শিক্ষা বলা হয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য, পরিপ্রেক্ষিতের ভেদ, পরিণতির হারের বৈষম্য বোঝবার পক্ষে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রকৃত তুলনা ও মূল্যবিচার আমাদের করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সমালোচনার জন্য তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার

বাঙলা দেশে উচ্চ সঙ্গীতের ইতিহাস জানা চাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ইতিহাস কেউ লেখেননি। আমরা কেবল জানি যে বাঙলা দেশে ধ্রুপদের ও টপ্পার যতটা প্রচলন হয়েছিল, খেয়াল ঠুংরীর ততটা হয়নি। কৃষ্ণধন বাবু যন্ত্রকেই সেজন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মত আংশিক ভাবে সত্য। কারণ, তারের যন্ত্রের প্রভাব সুবিস্তৃত থাকলে কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রুতির প্রাধান্য ধরা পড়ত; এবং বাঙালী গায়কের কণ্ঠ শ্রুতিশুদ্ধ ছিল কেউ বলেননি, অন্ততঃ থাকলে অত সহজে হারমনিয়মের কৃপায় কণ্ঠের সর্ব্বনাশ হত না। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গতের জন্যই ধ্রুপদকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গোলাম আব্বাস নামে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী বাঙলা দেশে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁর দু'জন বিখ্যাত শিষ্যের নাম নিতাই ও নিমাই চক্রবর্ত্তী। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভাই কেশব মিত্র এবং ঝামাপুকুরের মুরারি গুপ্ত মহাশয় তাঁদেরই ঘরোয়ানা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ বাঙালী পাখোয়াজীই কেশব বাবু ও মুরারি বাবুর শিষ্য। নগেন বাবু, দুর্লভ বাবু, দীন হাজরা প্রভৃতি বাদক সেদিন পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে ধ্রুপদের মর্য্যাদাদানে সহায়তা করেছেন।

এদেশে ধ্রুপদের প্রচলনের অন্য কারণ বোধ হয় লোক-সঙ্গীতের উন্নতি। অন্যান্য প্রদেশে লোকসঙ্গীত বরাবরই ছিল—কিন্তু আমাদের কীর্ত্তনের মতন উৎকর্ষ লাভ করেনি। কীর্ত্তনের সুর ও তালের বৈচিত্র্য হয়ত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংঘাতেই সৃষ্ট। তবু ভজনের গায়কী অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে লাগতে পারে, একথা প্রাদেশিক হিংসার যুগে ধ্রুবপদ্ধতির জন্মভূমিতে অ-বাঙালীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। লোকসঙ্গীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ-প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোক-সঙ্গীতে তানের অভাব, ধ্রুপদে তান নেই; লোকসঙ্গীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, রূপ তার কবিতার, রস তার অনুভূতির; অন্য ধারে পুরাতন ধ্রুপদের অর্থ তখনও উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্পষ্ট হয়নি, রচনাগুলি ছিল সাধারণতঃ ধর্ম্মভাবাপন্ন, কাব্যাংশও তার হেয় ছিল না। তা ছাড়া, কথার গায়কী উচ্চারণ পদ্ধতিতে খেয়ালিয়ার অপেক্ষা

ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে বাউল কীর্ত্তনিয়ার মিল নিবিড়তর। লোকসঙ্গীতে অন্তের স্বরবর্ণ টেনে এবং দম ছেড়ে গাওয়া হয়, তাই গানের পক্ষে বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক অনুপযোগিতা শ্রোতা ততটা অনুভব করতে পারে না। খেয়ালে কথার যেখানে ফাঁক, সেইখানেই তান চলে, এবং তানের জন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ ব্রজভাষায় রচিত হত, সে ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি কিংবা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার গরমিল যথেষ্ট থাকলেও অন্ততঃ দুটি একটি বিষয়ে, যেমন যুক্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের ব্যবহারে কিছু মিল পাওয়া যায়। এই মিলনই গায়কের অবলম্বন। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করব। ভাষা বাদ দিলেও লোকসঙ্গীতের ঋজুতা, গাম্ভীর্য্য, ঐশ্বর্য্যহীনতা, সরলগতি, সংযম, অন্তর্মুখিনতা ধ্রুপদকে যতটা স্মরণ করায় খেয়ালকে ততটা করায় না। এই প্রকার মিলের জন্য বাঙলা দেশে ধ্রুবপদের প্রচলন খেয়াল অপেক্ষা সহজ হয়। বলা বাহুল্য, সব অঞ্চলের কীর্ত্তন সমান ভাবে সহজ নয়। এমন কীর্ত্তনও শুনেছি যার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর স্থাপত্যেরই তুলনা চলে।

যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না, তাঁরা নামের ভক্ত। অবশ্য নামগুলি ইতিহাসের রাস্তায় স্তম্ভের মতন। বিষ্ণুপুরে অনেকদিন পূর্ব্বেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এসেছিল। কারণ ছিল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা বৈষ্ণব হবার পরেই সেখানে সুকুমার শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বেহার অঞ্চল থেকে উড়িষ্যা যাবার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুপুরে কেবল কীর্ত্তনের চলন হল না, উত্তর প্রদেশের মুসলমানোচিত প্রকর্ষের প্রভাব সেখানে স্বীকৃত হল। কীর্ত্তন ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ায়, এবং বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে ধ্রুবপদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করলেন। তানসেনের বংশধর জ্ঞান খাঁ, প্যার খাঁ ও জাফর খাঁর মত বিখ্যাত গায়কের ঘরোয়ানা বেহার-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। বেথিয়া তখন বাঙলার অন্তর্গত ছিল বলা যায়। বাঙলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের ধ্রুপদগান বেথিয়ায় দান। মহারাজ নওয়লকিশোর ও আনন্দকিশোর উৎকৃষ্ট

রচয়িতা ছিলেন। রাধিকাবাবুর গুরু গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর ভাইএরা কাশীর লোক হলেও বেথিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জমিদারবর্গ ধ্রুপদিয়া পালন করতেন। গোবরডাঙ্গার গঙ্গানারায়ণ বাবুই সর্ব্বপ্রথম পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমান ওস্তাদের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করে দেশে ফেরেন। এই সময় রাণাঘাট, শ্রীরামপুর ও পানিহাটী প্রভৃতি গঙ্গার উপকূলস্থ গণ্ডগ্রামে ধ্রুপদ গানের মর্য্যাদা ছিল। মৌলাবক্সও এই সময় কলকাতায় আসেন এবং বাঙলাদেশ পর্য্যটন করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে বাঙলা দেশে ধ্রুপদের প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে ও নিকটস্থ যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের বাড়িতে যে সব বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার সমাগম হত, তাঁদের মধ্যে মৌলা বক্স, যদুভট্ট, বিষ্ণুভট্টই সর্ব্বপ্রধান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চ-সঙ্গীতের একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি রাগ-রাগিণী পিয়ানোতে বাজাতেন এবং সুরের মিশ্রণ ও বিস্তার নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করতেন। পিয়ানোতে তান বিস্তার কিংবা আলাপ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই সেই সব পরীক্ষায় সহায়তা করতে হত, উপযুক্ত কথা জোগান দিয়ে। বলা বাহুল্য, বাড়ির আবহাওয়ায় ছিল সংযত স্বাধীনতা এবং সুগম্ভীর ধর্ম্মভাব, যেটি ধ্রুপদের অনুকূল। অতএব বলা চলে উচ্চসঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

ধ্রুপদের চিহ্ন কি? প্রায় প্রত্যেক ধ্রুপদ গানেই চারটি তুক কিংবা পদ থাকে। অলঙ্কারের মধ্যে মীড়, গমক ও আশই ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের রূপ নির্দ্দিষ্ট। আলাপের পর অস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গাইতে হয়, বাকী দুইটি তুক বা পদ প্রায় অস্থায়ী ও অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তান চলে না ধ্রুপদে। তালের মধ্যে চৌতাল, আড়া চৌতাল, তেওরা, ঝাঁপ, সুরফাক্তা, পঞ্চমশোয়ারির ব্যবহারই প্রশস্ত। কিন্তু ধ্রুপদে তালের বাহাদুরী দেখান অন্যায়। গানের শেষে যৎসামান্য বাটোয়ারা, আড়ি, দেড়ি, কুয়াড়ি, বিসম, অনাঘাত দেখালেই যথেষ্ট হয়। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম্ম, প্রকৃতির বর্ণনা ও রাজার গুণগান। তার গতি গজের,

যেমন সর্পগতি হল ধামারের। ধ্রুপদের রস শান্ত ও গম্ভীর—বাহুল্য-বর্জ্জিত। তার ঐশ্বর্য্য অন্তরের। যাঁর কণ্ঠে তান অজস্র, স্বর কম্পমান, যাঁর স্বভাবে সংযম নেই তাঁর পক্ষে প্রকৃত ধ্রুপদী হওয়া অসম্ভব। ধ্রুপদের চার প্রকার বাণী আছে। তার মধ্যে ডাগুরবাণী ও গোবর বাণী বেশী চলে। খাণ্ডারবাণী কিংবা গহরবাণী গাওয়া অত্যন্ত শক্ত। যাঁদের এই কয়প্রকার বাণী শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জানেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে voice-production বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ধ্রুপদ গানের বিষয়ে বৈচিত্র্য কম, তার রচনার ভাষায় কথা বেশী ও কথাগুলি চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডের মতন, অতএব তার গায়কী রীতিতে স্বাধীনতাপ্রকাশের সুযোগ খেয়াল এবং ঠুংরী অপেক্ষা কম সকলেই স্বীকার করেন।

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায় যে খেয়াল ও ঠুংরীতে গায়কের নিজের কৃতিত্ব দেখাবার স্বাধীনতা আছে। বলা বাহুল্য, উচ্চ শ্রেণীর খেয়াল ও ঠুংরীর রচনায় সুরের বিকাশ অনিয়ন্ত্রিত নয়। কোন্ তানের পর কোন্‌টি আসা চাই তার নিয়ম আছে, সে কথা ভাল ঘরোয়ানার গান শুনলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া খেয়ালের তান রাগিণীর আশ্রয়ে, তার মূল প্রকৃতির অবলম্বনেই তান ফুটতে পারে সব ভাল খেয়ালিরাই জানেন। ঠুংরীতে এই তানবিস্তারপদ্ধতির ওপর আছে নায়ক-নায়িকা ও তাঁদের মেজাজ। খেয়াল-ঠুংরীতে তানের স্বাধীনতা যে যথেচ্ছাচারিতা নয় বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা এই—রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে সংযত সঙ্গীতেই পরিপুষ্ট। তাঁর প্রতিভা অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। তাঁর মতন ব্যক্তির এই প্রকার শিক্ষাদীক্ষায় এবং ঐ প্রকার বেষ্টনীতে যা করা সম্ভব তাই তিনি করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদের গুণগ্রহণ করলেন, গমকের হুঙ্কার ত্যাগ করলেন এবং বৈচিত্র্য আনলেন। আধার, বাঙলা ভাষা। তাঁর বৈচিত্র্যসাধনের উপায় একাধিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা-নবিশীর কাল তখন উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি আর সুরে কথা বসাচ্ছেন না। রাধিকাপ্রসাদ তখন আদিব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। রবীন্দ্রনাথ কবিতার

উপযুক্ত সুর খুঁজতেন রাধিকাপ্রসাদের কণ্ঠে। তখন তিনি কবি এবং সুরের প্রযোজক মাত্র; অর্থাৎ কথায় সুর বসানোই ছিল তাঁর সমস্যা। এই যুগের তাঁর অনেক রচনা এখনও ওস্তাদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা বলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আজকাল পতন হয়েছে। তাঁদের মন্তব্য বিচার করলে হয়ত পূর্ব্ব-পরিচয়ের আনন্দটুকুই ধরা পড়বে। "সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি" শুদ্ধ ইমন্‌কল্যাণ, অতএব গানটি ভাল—এক্ষেত্রে শুদ্ধতার অর্থ পুনরাবৃত্তি, যথাযোগ্যতা গৌণ—যদিও স্বীকার করি এ যুগে বেশীর ভাগ গানেই সুর ছিল কবিতার উপযুক্ত। কিন্তু এ যুগের রচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—কথা ও ভাবের উপযোগী না হলেও সুরটা যদি সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতার মনে কোনো বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান স্মরণ করাতে সমর্থ হত, যদি সুরটা হুবহু তার নকল হত তা হলেই শ্রোতা সন্তুষ্ট হতেন। অতএব কেবল উপযোগিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গানকে যাচাই করা যায় না। করলে পরে তাঁর ক্রম-বিকাশকে শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। অথচ উপযোগিতাই সঙ্গীত-রচনা ও রচয়িতার মূল্য নির্দ্ধারণ করবে।

উপযোগিতার অর্থ হ'ল এই—কথা ও সুরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাকে স্বীকার করা, তার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করা এবং সেই প্রকৃতির রূপ দেওয়া। তদ্‌ভিন্ন কবিতার মূল ভাবটির সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত রাগিণীর মূল ভাব কিংবা মূর্ত্তির মিলন-সাধনকেও উপযোগিতা বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবিতাটি মেঘলা দিনের বর্ণনা, তার মধ্যে মেঘ, বিজলী, ময়ূর, হানা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর কথা রয়েছে। আমাদের সংস্কারে মল্লারের সঙ্গে বর্ষার যোগ আছে। এমনও শুনতে পাই,—অমুক ওস্তাদ মল্লার গেয়ে শীতকালে বৃষ্টি আনলেন। অতএব কবিতাটির প্রকৃষ্ট মিলন হবে মল্লারের সঙ্গে। কিন্তু এই প্রকার মিলন-সাধনের কোনো সাঙ্গীতিক মূল্য নেই। কথা ও সুরের মধ্যে সম্বন্ধকে প্রকাশ করাই যদি সমস্যা হয় তবে তাদের মধ্যে গোটা কয়েক সন্ধিসর্ত্ত থাকা চাই। সন্ধির সর্ত্ত তৈরী করবার সময় মনে রাখতে হবে বাঙলা কবিতার ভাষা, অর্থ, ছন্দকে, বাঙলা দেশের প্রচলিত গায়কী-পদ্ধতিকে।

সন্ধি কখনও একতরফা ডিক্রী নয়, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানই তার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রত্যেককেই সন্ধির সময় কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। ছাড়বার সময় পাবার প্রত্যাশা থাকেই থাকে। ঐ যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাওয়া গেল সুরের মিশ্রণ, বিষয়ের বৈচিত্র্য, এবং আশের আধিক্য। মীড় রয়েই গেল —বিদেশী সঙ্গীতের হারমনিক্‌স্ এবং যন্ত্রসঙ্গীতের অলঙ্কারের পরীক্ষা সফল হল না। ছাড়া হল, রাগ-রাগিণীরও ব্রজভাষার যতটা শুদ্ধতা তখন ছিল তাকে এবং সেই সঙ্গে তার পাশে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেও। সুরের মিশ্রণ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললেই চলবে যে, তাঁর প্রদত্ত সুরে গুরুচণ্ডালী দোষ বর্ত্তায়নি। অনেক বড় ওস্তাদ্ এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী পাপী। ইমন-বেলাওল, ভৈরোঁ-বাহারের গান অনেক বাঙালী যুবক আজকাল গেয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টির সম্বন্ধে কিছু লিখছিনা—অতএব সুর ও কথার সন্ধি-সর্ত্তে ফিরে যাওয়া যাক্।

বাঙলা ভাষায় স্বরবর্ণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সঙ্গীতালোচনার পক্ষে জানা প্রয়োজনীয় সেগুলিকে নিম্নলিখিত চারটি মন্তব্যে প্রকাশ করা যায়।

(১) অর্থ পরিবর্ত্তনে স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় বা দৈর্ঘ্যে কোনো তারতম্য ঘটেনা—যেমন দিন, দিনকাল ও দীন-দুঃখী একই উপায়ে উচ্চারিত হয়।

(২) যে নিঃশ্বাসটুকু নিয়ে বাক্যারম্ভ করা যায় তার ঝোঁকে যত কথা উচ্চারিত হতে পারে তারাই একটি সমষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৩) বাঙলা উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে সাধারণতঃ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রথম শব্দে। এ ছাড়া অর্থভেদেও ঝোঁক পড়তে পারে। অন্য কোনো বাধা না থাকলে হসন্তবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণও ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হয়।

(৪) ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বাংলা শব্দ স্বরান্ত নয়, হসন্তান্ত।

ব্রজ ভাষায়, যে ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হত তার স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির। তার স্বরোচ্চারণরীতিতে অর্থের পরিবর্ত্তনে তারতম্য

ঘটে। যেমন দিন ও দীনদয়াল। তার ঐক্য কথাগুচ্ছে আবদ্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মে নয়। তাতে উচ্চারণের জোর দেওয়া হয় উপান্ত স্বরবর্ণে।

দুটি ভাষার স্বরবর্ণের ব্যবহারে যদি মোটামুটি ঐ ধরণের পার্থক্য থাকে তবে রবীন্দ্রনাথের রচিত বাঙলা গানে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। অন্ততঃ, আ-কারের বেলা ত বটেই। (ধরা যাক রাখাল, কিংবা মাতাল কথাটি। ব্রজভাষার নিয়মানুসারে প্রথম স্বরবর্ণ ছোট হয়ে এবং শেষেরটি দীর্ঘতর হয়ে রাখাল রাখোয়াল-এ, এবং মাতাল মাতোয়ালায় পরিণত হল।) বাংলা গানে স্বরবর্ণের স্বাভাবিক সঙ্কোচে ক্ষতি হল তানের, কারণ সাধারণতঃ খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেওয়া হয় না, শেষের ও উপান্ত স্বরবর্ণেই নেওয়া হয়। কিন্তু ধ্রুপদে সে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ তানের ব্যবহার নেই সেখানে, অতএব বাংলা ধ্রুপদ রচনা অপেক্ষাকৃত সচল—বাংলার স্বাভাবিক গাঢ় সম্বদ্ধতা ততটা মারাত্মক নয় ধ্রুপদে যতটা মারাত্মক বাঙলা খেয়ালে। স্বরবর্ণসঙ্কোচের জন্য যে ক্ষতি হয় বাঙালী গায়ক তার পূরণ করেন 'য়' দিয়ে, যেমন 'মা আমার' কথা-দুটির মধ্যকার অবকাশ অতিক্রান্ত হয় 'মা-য়-আমার' glide-এর দ্বারা।

বাঙলা ভাষার breath-group ধ্রুবপদী অলঙ্কারের নিতান্তই অনুকূল, কিন্তু খেয়ালের প্রতিকূল। মীড় ও গমক স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরামের উপযোগী। বাঙলা ভাষা যে কালে আমাদের মাতৃ-ভাষা তখন আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথার অর্থ আমাদের মনে আসবেই আসবে। গান যখন কবিতাতেই লেখা হয়, তখন উচ্চারণ স্পষ্ট করতেই হবে। ব্রজভাষার অর্থ আমরা বুঝিনা, তাই তার শুদ্ধবাণীর দায়িত্ব বাঙলার অপেক্ষা কম। কম বলেই অবশ্য সুর উপভোগের সুবিধা। অতএব একধারে যেমন ক্ষতি অন্যধারে তেমন সুবিধা। সুতরাং দেখা গেল যে বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েই ধ্রুপদের আড়ষ্টতা কমে যায়, বৈচিত্র্যের অবসর পাওয়া যায়। কিন্তু ধ্রুপদাঙ্গের বাঙলা গান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। নানা

বিষয়ে তিনি গান রচনা করতে লাগলেন, সবগুলি কিছু ধ্রুপদাঙ্গের হতে পারে না। তাঁর রচনায় নানা প্রকারের মনোভাবের, mood-এর প্রকাশ হতে লাগল। এখন সমস্যা উঠ্‌ল সেই সব বিচিত্র রচনার উপযুক্ত সুর দেওয়া নিয়ে।

এইখানে বাংলা ছন্দের আড়ষ্টতা ও একঘেয়েমি কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন, আমাদের জান্‌তে হবে। পুরাতন ছড়া বাদ দিলে বলা চলে যে বাঙলায় পয়ারেরই রাজত্ব ছিল। পয়ার ভাঙলেন ভারতচন্দ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দিয়ে। তবু বাংলার ঠাস্‌বুনানি হাল্‌কা হল না, কারণ যুগ্মশব্দ গাঁটের মতন। রবীন্দ্রনাথ এসে যুগ্মবর্ণকে হ্র মাত্রায় ব্যবহার করলেন। এতদিনে বাঙলা ছন্দ স্বাধীন হল, কারণ শব্দের মধ্যকার অবসরটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত হয়ে মাত্রাগোণার দাসত্ব দিলে ঘুচিয়ে। এই অবসরটুকু দীর্ঘ নয়, অতএব তাকে দীর্ঘ তানকর্ত্তব দিয়ে ভরাট করা যায় না, জোর তার মধ্যে আশ ব্যবহার চলে। মীড় ও আশের সাহায্যে কবিতার রূপ অনেকটা ফুটে উঠতে পারে। যতটা পারে ততটাই এই যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সার্থকতা।

তবু কাব্যছন্দের দাসত্ব গেল না। পরের যুগে কথা ও সুর সমস্তরের। "তিমির অবগুণ্ঠনে" গানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কথা ও সুরের সন্ধি-সর্ত্তগুলি বিজেতা-পরাজিতের নয়, মিত্র-মণ্ডলীর মিত্রও একাধিক, কারণ "কে তুমি"-তে বিস্ময়-ভাবটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সকল গানেই এই প্রকার সুর, কথা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গি মিলন দেখা যায় বলছি না, কিন্তু বিস্তর রচনায় সম্পূর্ণ মিলনের সাক্ষাৎ পাই। সেই সব রচনাগুলি আমাদের সমস্যা-পূরণের সার্থকতার পরিমাণ দণ্ড হবে।

অতএব বোঝা গেল রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান কেন নেই। বাঙলা ভাষায় লেখা সঙ্গীতে তানের সুযোগ কম। লেখক আবার ধ্রুপদে অভ্যস্ত। ততটুকু তান সম্ভব যতটুকুর সুযোগ breath-groupএর শেষে, অর্থের ইঙ্গিতে এবং ছন্দ-বৈচিত্র্যে পাওয়া যায়। তার বেশী তান দিলে রাগিণীর বিকাশ হয়ত হবে, কিন্তু ভাষা, ছন্দ, অর্থ ও

সুরের ভারসাম্য নষ্ট হবে—অর্থাৎ সঙ্গীত হবে না। আমার বক্তব্য এই—তানের উদ্দেশ্য আর সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এক নয়। তান সুরের একপ্রকার অভিব্যক্তি—সেটি রাগিণীর রূপ-উদ্‌ঘাটনের ইতিহাস; সঙ্গীত হল পরিপূর্ণ সামগ্রী, ইতিহাসের দিক্‌টা তার মুখ্য নয়। তান সুরের একপ্রকার অলঙ্কার, যেটি সুরের ওপর বসাচ্ছেন গায়ক স্বয়ং। সঙ্গীতের অলঙ্কার প্রধানতঃ শ্রোতার মনে। তানে চাই স্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর, সঙ্গীতের অবসর গাওয়ার পর, রেশে। তা ছাড়া, বাঙলা সঙ্গীতে বাঙলা ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং অর্থ ও ভাবকে অগ্রাহ্য করার অক্ষমতাহেতু তানকে নিতান্তই বশে রাখতে হয়। অর্থ-সম্ভার সর্ব্বদাই সুরকে চাপা দিতে যাচ্ছে। তাই সঙ্গীত-রচয়িতারা সেই গুরুভারকে লঘু করতেই সচেষ্ট হয়েছেন এতদিন। সঙ্গীতে সুরের মিশ্রণ এবং বৈচিত্র্যের সাহায্যে গুরুভারকে লঘু না করে সহজে বহন করা—এই হল রবীন্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব।*

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* রাজসাহী আবাঢ়ে ক্লাবের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

আন্তর্জাতিক সঙ্কট

১

ষোল বছর আগে যখন মহাযুদ্ধের শেষে শান্তি স্থাপিত হ'ল তখন অনেকের আশা হয়েছিল যে এবার পৃথিবীতে নব যুগের সূত্রপাত হবে। প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন্ ন্যায়ের যে আদর্শ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, বিজয়ী শক্তিবৃন্দ তার মর্য্যাদা রাখেনি বটে—ভের্সাইর সন্ধিপত্র ছত্রে ছত্রে পরাজিত রাষ্ট্রদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করেছিল এ কথাও সত্য। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি যে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা তখন সর্ব্বত্র প্রকাশ পেত তার থেকে এমন আশা পোষণ করা অমূলক মনে হয় নি যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ এবার নূতন রূপ নেবে। জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই ভরসাকে একটা বাহ্যিক মূর্ত্তি দেওয়া হয়, কিন্তু আসলে এই প্রত্যাশা আরও বেশী ব্যাপক ছিল—লীগের সভ্য না হয়েও এমেরিকার শান্তিরক্ষার চেষ্টা এর উদাহরণ। উত্তরসামরিক যুগে অনেকদিন পর্য্যন্ত যে-মনোভাব প্রবল ছিল তাকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি ধারণা দেখা যায়। প্রথমতঃ, আধুনিক প্রথায় যুদ্ধের প্রলয়রূপ লোককে স্তম্ভিত করেছিল; ধ্বংসের নিত্য নূতন উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে ব'লে এ বিশ্বাসের প্রচার খুবই স্বাভাবিক যে আর একবার পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হ'লে সভ্যতার আর বিশেষ কিছু বাকী থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ দিয়ে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা যে দুরাশা এই মত অনেকে গ্রহণ করেন—কেন না প্রতি জাতির পক্ষেই নিজের স্বার্থ ও ন্যায়বিচার অভিন্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে যুদ্ধে যারা দুর্ব্বলতর প্রতিপন্ন হবে তাদেরই যে অন্যায় হয়েছিল এ মনে করবার কোন হেতু নেই। যুদ্ধান্তের অবসাদ ও এই যুক্তি দু'টির ফলে একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ থেকে যুদ্ধকে বর্জ্জন করতে হবে; বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতান্তর অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সে-সব সমস্যার

বিনাযুদ্ধে নিষ্পত্তি প্রয়োজন; অতএব সকল দেশের একত্রে পরামর্শ ও কাজ করার অভ্যাসই যুক্তিসঙ্গত।

সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে যুদ্ধশেষের পর এই নূতন প্রবৃত্তি ১৯১৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত অনেকাংশে প্রবল ছিল। এই যুগটির প্রথমার্দ্ধে অবশ্য অনেক অসদ্ভাব দেখা যায়—এই সময়ে অপমান ও অত্যাচারের ফলে জার্ম্মানিতে ফরাসীবিদ্বেষ আরও বদ্ধমূল হ'ল, রুষদেশ ও তুরস্কের উপর অযাচিত আক্রমণের তখনও শেষ হয় নি। কিন্তু তবুও শান্তি স্থাপন ও রক্ষার চেষ্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত—নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর অনেকের তখন আস্থা ছিল; প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে যাদের স্বার্থ আছে, এমন নয়টি জাতি ১৯২২ সালে একটি বিশেষ সন্ধিপত্রে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপন করে; সেই বছরেই ওয়াশিংটন্-চুক্তির ফলে নৌবহরগুলির একটা সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। গত যুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শান্তিরক্ষার প্রতি এই ঝোঁক আরও বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স ও জার্ম্মানির বৈরীভাব তখন অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল; জার্ম্মানিকে পরাজয়ের পর থেকে যে-অর্থদণ্ডের ভার বইতে হচ্ছিল বহু পরিমাণে তাকে লঘু করে দেওয়া হয়; বিদেশী যে-সৈন্যদল জার্ম্মানিতে প্রহরীর কাজ করছিল তারাও সেই সঙ্গে অপসৃত হ'ল। লোকার্নো-সন্ধির ফলে পশ্চিম ইয়োরোপ প্রায় নিশ্চিন্ত বোধ করতে আরম্ভ করে। জার্ম্মানির রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান এবং জেনীভার প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার সহযোগিতাও এসময় উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনারও অন্ত ছিল না। এমন কি ১৯২৯ সালে যে-আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল তাতে করেও তখনকার মত আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হ্রাসই পেয়েছিল।

এদিক থেকে দেখতে গেলে গত চার বছরে পৃথিবীর একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়েছে। মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ঝোঁক শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেটে গেল। শুধু যে প্রতি দেশে এখন যুদ্ধের আয়োজন বিপুল উদ্যমে চলেছে তা' নয়, শান্তিরক্ষার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাও শিথিল

হয়ে আসছে—যুদ্ধবিরোধী ভাবধারাও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হচ্ছে। আজ তাই চারিদিকে একটা আশঙ্কার উদয় হয়েছে যে পৃথিবী বুঝি দ্রুতগতিতে আবার একটি মহা সমরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯১৪ সালের জগতে যে অবস্থা ও মনোভাব বিরাজ করত এখন তাই আবার ফিরে এসেছে বলে' মনে হয়।

আজকের দিনে সব মহাদেশ মিলে স্বতন্ত্র রাজ্যের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটটি হবে—কিন্তু সমস্ত মানবজাতির শুভাশুভ প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সাতটি বিশাল রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। এই জন্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স্, ইটালি, সোভিয়েট্ রাশিয়া, জাপান ও জার্ম্মানিকে মহাশক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। এদের ঘাত-প্রতিঘাত পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। তাই বর্ত্তমান সঙ্কটের গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি ব্যাপারে—জাপানের ব্যবহারে অন্য জাতিদের মধ্যে ভয়ের উদ্রেকে, নাৎসি জার্ম্মানির আস্ফালনে ইয়োরোপে আতঙ্ক সৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র-গুলিকে একতার সূত্রে বাঁধবার যে একটা প্রচেষ্টা চল্‌ছিল তার অবসানে।

২

১৯৩১ সাল থেকে জাপানের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক শক্তিদের সম্বন্ধে পারস্পরিক অবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে চলেছে। আজকের দিনের আশঙ্কার এটাই হ'ল প্রথম কারণ। এক বছরে জাপানের বৈদেশিক নীতির পাঁচটা দিক অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

জাপানের প্রথম উদ্দেশ্য চীন অঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন ও জাপানী প্রভাব বিস্তার। এ লক্ষ্য বহুদিনের কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দের চুক্তির পরে অনেকদিন জাপানের এ সংকল্প মন্দীভূত হয়েছিল। হঠাৎ ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল ও শাঙ্ঘাই নগরীর উপর বিনাযুদ্ধে গোলা-বর্ষণ করে' চীনকে দমন করে। তারপর হ'ল মাঞ্চুকুয়ো নামে তথা-কথিত স্বাধীন রাজ্যের স্থাপনা ও চীনের কাছ থেকে জেহোল প্রদেশ

জয়। সেই সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে জাপানী প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং উত্তর চীনের অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও জাপানী কর্তৃত্ব-স্থাপন বিষয়ে বন্দোবস্তের গুজবও সম্ভবতঃ অমূলক নয়।

গতবছর এপ্রিল মাসে জাপানী গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে চীন অঞ্চলে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব একমাত্র জাপানেরই—অতএব পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানের বিনা অনুমতিতে বিদেশী শক্তিদের প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া হবে না। ইংরাজ ও এমেরিকান্‌দের প্রতিবাদের ফলে অবশ্য জাপানের শাসকেরা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই কিন্তু এরূপ দাবী নিশ্চয়ই নূতন। এমেরিকার মন্‌রো-নীতির সঙ্গে এর তুলনা চলে কিন্তু সে নীতি একশ' বছরের উপর সকলে স্বীকার করে' এসেছে। জাপানের অভিনব চেষ্টা অন্যায় না হ'তে পারে কিন্তু এতে করে' শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনাই বাড়বে মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, জাপানের আচরণ অন্ততঃ তিনটি অতি আধুনিক সন্ধিপত্রের সর্ত্ত লঙ্ঘন করেছে—চীনে জাপান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা' লীগ কভেনাণ্ট্ (১৯১৯), নয়টি রাষ্ট্রের চুক্তি (১৯২২) এবং কেলগ্‌প্যাক্ট (১৯২৮) —এই তিনেরই বিরোধী। মাঞ্চুরিয়া ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ ও লীগ কর্তৃক নিযুক্ত লিট্‌ন্ সমিতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে জাপান দ্বিধা করে' নি যদিও সঙ্ঘের আর একটি সভ্যও প্রকাশ্যে জাপানের সমর্থন করতে সাহস পায় নি। এর ফলে জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করেছে এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠানটির যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে তা'ও নিঃসন্দেহ। তারপর সম্প্রতি জাপানী বাণিজ্যের অতি দ্রুত বিস্তার বণিকজাতিদের ভাবিয়ে তুলেছে। বাণিজ্যের প্রসার অবশ্য স্বাভাবিক ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে যেভাবে জাপানী পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ এমেরিকা, ভারতবর্ষ, এমন কি আফগানিস্থান কিম্বা আবিসিনিয়ার বাজার পর্য্যন্ত, ছেয়ে ফেলেছে তাতে অন্য জাতিদের ঈর্ষা হ'তেই পারে। জাপানীদের মতে তাদের জিনিষের স্বল্পমূল্যতার কারণ যন্ত্রের উৎকর্ষ, উৎপাদনে নৈপুণ্য এবং জাপানী শ্রমিকদের নিরাড়ম্বর জীবন-যাত্রার জন্য তাদের অল্প অভাব। অন্যেরা মনে করে যে আসলে

অন্যদেশে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য ফ্যাক্টরী বা মিলে যে সব নানারূপ নিষেধাজ্ঞা আছে, প্রতিযোগিতার খাতিরে জাপানে সে-সব বিধিব্যবস্থা অন্যায় ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ যা'ই হোক না কেন, বাণিজ্যে রেষারেষির ফলে আন্তর্জাতিক অশান্তির বৃদ্ধি সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। গুজব বিশ্বাস করলে একথাও বলতে হয় যে জাপানীরা এখন শ্যামদেশে ও মালয় উপদ্বীপে নানাভাবে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টায় নিযুক্ত।

অল্পদিন হ'ল জাপান আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ওয়াশিংটন্-চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ও এমেরিকার যেখানে পাঁচটি করে' বড় যুদ্ধের জাহাজ আছে, জাপানের সেখানে তিনটি সেরূপ জাহাজ রাখার কথা। এই অনুপাতের ব্যবস্থায় তখন জাপানের আপত্তি হয় নি কারণ লোকসংখ্যা, অর্থসম্পদ কিম্বা সাম্রাজ্যের বিস্তার কোন দিক দিয়েই জাপান অন্য দুটি রাজ্যের ঠিক সমকক্ষ নয়। তাছাড়া জাপানের যাতে কোন ভয়ের কারণ না থাকে এই জন্য স্থির হয়েছিল যে চীন অঞ্চলে ইংল্যাণ্ড বা যুক্তরাষ্ট্র বহু রণতরী রাখবার উপযুক্ত কোন সুরক্ষিত বন্দর নির্ম্মাণ করবে না। বহুশত মাইল দূরস্থিত সিঙ্গাপুর কিম্বা হাওয়াই দ্বীপ থেকে জাপানের উপর জলপথে আক্রমণের আশঙ্কা নিতান্তই কম। কিন্তু জাপানী গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জানিয়েছেন যে দু'বছর পর থেকে তাঁরা আর ওয়াশিংটন্-সন্ধির নির্দ্দেশ মানবেন না। তাঁরা এখন চান ব্রিটেন ও এমেরিকার সঙ্গে ঠিক সমান নৌবহর। তা নয়ত জাপানের মর্য্যাদা থাকে না আর জাপানের নাকি এর অভাবে সমূহ বিপদ্।

শক্তি, রাজ্য এবং প্রভাব বিস্তারের এই বিপুল উদ্যমের মূল কারণ অবশ্য জাপানে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। ক্ষুদ্রায়তন জাপানের পক্ষে বিশাল জনসমষ্টির অন্নসংস্থান বিশেষ চিন্তার কথা। জাপানীদের বিশ্বাস যে উদীয়মান জাতির পক্ষে জন্মনিরোধ লজ্জার কারণ। যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে অনেক প্রদেশে জাপানী উপনিবেশ গঠন সম্ভব কিন্তু সেখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। এ বিষয়ে কোন বন্দোবস্তের অভাব সমস্যাকে জটিলতর করেছে এবং এর জন্য প্রধানতঃ শ্বেত

জাতিরাই দায়ী। জাপানের দখলে যে-সব জায়গা আছে সেখানে আবহাওয়ার জন্য জাপানীদের বহুল বসবাস সম্ভব নয়। সুতরাং জাপানীদের অনেকটা বাধ্য হয়েই নূতন অগ্রসর-নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। মূলতঃ এই কারণ সত্য হ'লেও জাপানের বর্ত্তমান আচরণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করবার সময় অন্য কথাও মনে রাখতে হবে। শোনা যায় যে জাপানে শ্রমিকদের অসন্তোষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদের বিস্তার হচ্ছে; তাই শাসকদের মতে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখবার জন্য দেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাস বাড়াবার প্রয়োজন হয়েছে। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার থেকে জাপানীদের বিশ্বাস হয়েছে যে কেউ সহজে জাপানকে বাধা দিতে এখন রাজি না। ফলে জাপানের বৈদেশিক নীতি উত্তরোত্তর বেশী সাহসিক হয়ে উঠছে। এই ভাবেই বারবার যুদ্ধের পত্তন হয়।

চারটি রাষ্ট্রের স্বার্থ জাপানের প্রসারে আহত হ'তে পারে—চীন, সেভিয়েট্ রাশিয়া, এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে কোন দেশেই বোধ হয় আপাততঃ যুদ্ধ চায় না কিন্তু অসন্তোষ ও অশান্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ব'লে ভবিষ্যতের জন্য ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

চীনে বোধ হয় সম্প্রতি জাপানী-বিদ্বেষ কিছু কমেছে। জাপানের এখন চেষ্টা চীনকে নিজের আয়ত্তে এনে তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা—এই মিলনের মূল মন্ত্র হবে যে এশিয়াতে এশিয়াবাসীদেরই প্রভুত্ব থাকা উচিত। চীনের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট-বিদ্রোহ এখনও প্রশমিত হয় নি, চীনের সঙ্গে সোভিয়েট্-শক্তিরও এখন বিশেষ সদ্ভাব নেই। চিয়াং-কাই-শেক্ হয়ত তাই শেষ পর্য্যন্ত জাপানের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চীন ও জাপানের সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া শক্ত। অবশ্য চীন একেবারে জাপানের রক্ষিত রাজ্য হয়ে পড়তে পারে কিন্তু কুয়ো-মিন্-টাংএর এই শোচনীয় পরিণামে প্রাচ্যদেশে শান্তিভঙ্গেরই সম্ভাবনা বাড়বে।

চীন অবশ্য দুর্ব্বল কিন্তু অপর রাষ্ট্র তিনটি ক্ষমতাশালী বলে' তাদের অসন্তোষ বিপজ্জনক। সোভিয়েট্ রাশিয়া এখন নূতন

পঞ্চবার্ষিক সংকল্প নিয়ে ব্যস্ত, তার নেতারা স্বদেশের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্যই যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে জাপানের অভিসন্ধি সম্বন্ধে রাশিয়ার ভয় ও সন্দেহে বিস্মিত হবার কিছু নেই—মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানের নূতন নূতন রেলপথ নির্মাণের একটি প্রধান লক্ষ্যই বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন। অনেকেই মনে করেন যে ভ্লাডিভষ্টক্ বন্দর ও পূর্ব্ব সাইবেরিয়া থেকে রুষদের বৈকাল হ্রদের নিকটস্থ পর্ব্বত-মালার পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিতাড়িত করাই জাপানের উদ্দেশ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এখনও প্রবল হয় নি কেন না তাদের উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এমেরিকা তা'ছাড়া সাধারণতঃ শান্তিভক্ত বলেই খ্যাত। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট উপেক্ষার বস্তু হতে পারে না—যে-নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ ইয়োরোপীয় ব্যাপারে এমেরিকার পক্ষে স্বাভাবিক এক্ষেত্রে তা' সম্ভব নয়। চীন অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্র চিরদিনই মুক্তদ্বার বা সব জাতির সমান অধিকারের পক্ষপাতী। এদিকে জাপানের আয়ত্ত মাঞ্চুকুয়োতে বিদেশী বণিকদের নানাভাবে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে যদিও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুক্তদ্বার প্রথা সমর্থিত হয়েছিল।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত জাপানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিশেষ সদ্ভাব ছিল বলা যায়—কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে বলেই এখন মনে হয়। ইংরাজ ও এমেরিকান্‌দের মধ্যে যুদ্ধ কষ্টকল্পনা কিন্তু জাপান ও বিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাড়ছে বই কমছে না। বাণিজ্যের রেষারেষি ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া এবং কেনাডা, মালয় এবং হংকং রক্ষার ভাবনা আছে। জাপানের নৌবহর বৃদ্ধির সংকল্পও গ্রেট্‌ব্রিটেনের পক্ষে সুসংবাদ নয়। চারিদিকে থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

৩

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক অসদ্ভাব ও সঙ্কটের দ্বিতীয় কেন্দ্র জার্ম্মানি। ভের্সাইর সন্ধিতে জার্ম্মানির প্রতি অবিচার ও অপমান সকল সীমা

অতিক্রম করেছিল এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে তা সত্ত্বেও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে জার্ম্মানির বৈরিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। জার্ম্মানদের প্রতি ইয়োরোপের আজকের দিনে বিরূপ ভাব অনেকখানি বেড়েছে হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের পর থেকে। মহাযুদ্ধ ও ভের্সাই-সন্ধির পর জার্ম্মানির প্রতি সহানুভূতি প্রতি দেশেই দেখা যেত—উত্তর সামরিক যুগে উদার মতবাদের একটা লক্ষণই হয়েছিল ফ্রান্সের নিন্দা। নাৎসি-প্রাধান্যের পর থেকে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই উল্লেখযোগ্য। আজকাল অনেকেই মনে করেন যে ফরাসীদের জার্ম্মান-আতঙ্ক নিতান্ত অযৌক্তিক নয়—এবং অত্যাচারিতের ভূমিকা-অভিনয়ে জার্ম্মানি খানিকটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ শুধু জার্ম্মানির মধ্যে নাৎসি অত্যাচার নয়। রাশিয়াতেও যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সোভিয়েট-শক্তির বৈদেশিক নীতি অপর জাতির শঙ্কার কারণ বলে কখনও গণ্য হয় নি। পক্ষান্তরে নাৎসি-প্রভুত্ব সহজেই ইয়োরোপকে যুদ্ধের পথে টেনে নিতে পারে।

নাৎসি-আন্দোলনের ফলে জার্ম্মানিতে যে সামরিক মনোভাব দ্রুতবিস্তার লাভ করছে তা' নিতান্ত আশার কথা নয়। বিস্‌মার্কের যুগের পর থেকে জার্ম্মানিতে অস্ত্রশক্তির উপাসনা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল, গত যুদ্ধের পর কিছুদিন হয়ত সে-ধারার বদল হয়, আজ আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে আসছে। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে অবশ্য জার্ম্মানির প্রস্তাব ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। সে প্রস্তাবের প্রধান কথা ছিল এই যে হয় সকল রাষ্ট্রেরই সমান সমান পরিমাণে যুদ্ধসজ্জা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, নয়ত ১৯১৯ সালের সন্ধিতে জার্ম্মানিকে যে একতরফা নিরস্ত্র করা হয়েছিল সে ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রস্তাবে কোন ফল না হওয়াতে জার্ম্মানি প্রতিবাদ স্বরূপ বৈঠক ত্যাগ করে। কিন্তু জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের এর পরবর্ত্তী আচরণ স্বাভাবিক হ'লেও সমর্থন করা শক্ত। এর জন্য একেবারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যপদত্যাগ করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে নিজের মত না গ্রাহ্য হওয়া মাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে

সরে' দাঁড়াবার অধিকার সকল দেশের আছে। এ দাবী স্বীকার করলে সমবেত প্রচেষ্টার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য মহাশক্তিগুলিও সম্ভবতঃ এ অবস্থায় অনুরূপ কাজ করত—কিন্তু ঘটনাচক্রে জার্ম্মানি ও জাপান লীগ্ ত্যাগ করেছে বলেই তাদের সমালোচনা এখন অবশ্যম্ভাবী। এর পরে জার্ম্মানির ব্যবহার আরও আশঙ্কাজনক। ভের্সাই-সন্ধির যে সব সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মানির অস্ত্রসজ্জা স্বল্প-সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল হিট্‌লার সেগুলি অগ্রাহ্য করে' সামরিক সরঞ্জাম বৃদ্ধির আদেশ দিয়েছেন। জার্ম্মানির সমর্থকেরা বলেন যে ভের্সাই-সন্ধির কোন মূল্য থাকতে পারে না কেননা বিজিত জার্ম্মানিকে বাধ্য হয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এই চমৎকার যুক্তির উত্তর অত্যন্ত সহজ—আজ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধের পরই পরাজিত পক্ষ স্বেচ্ছায় সন্ধিসর্ত্ত গ্রহণ করে নি, কাজেই জার্ম্মানির এক্ষেত্রে সন্ধিভঙ্গের কোন বিশেষ দাবী থাকতে পারে না। জার্ম্মানির পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ভের্সাইর বিধি ব্যবস্থা অতি অন্যায় ও অসহনীয়—অনেকেই একথা নিশ্চয় এখনও স্বীকার করেন। কিন্তু সে-অন্যায়ের সংশোধন কি এমন আচরণ যার ফলে মহাযুদ্ধের সূচনা হ'তে পারে? যুদ্ধের ফলে যে অন্যায়ের উচ্ছেদ হয় এ বিশ্বাসকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে যে যার শক্তি বেশী, ন্যায়ধর্ম্ম তারই দিকে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় আসলে শুধু বিভিন্ন স্বার্থের সঙ্ঘাত। জার্ম্মানির কাছে যা' অসহ্য অন্যায় চেকোশ্লোভাকিয়া কিম্বা পোল্যাণ্ডের পক্ষে ঠিক তা'ই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া তাই বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতান্তরের সমাধান-চেষ্টায় যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে যার ফলে এক অন্যায়ের স্থান নেবে অন্য অন্যায়।

এছাড়াও নাৎসিদলের ব্যবহারে ভয়ের কারণ রয়েছে। হিট্‌লার একদা প্রচার করেছিলেন যে পূর্ব্ব-ইয়োরোপকে সভ্য ও জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করাই হ'ল ইতিহাসে জার্ম্মানির বিশেষ কাজ। জার্ম্মানিতে প্রবল আন্দোলন চলেছে যাতে অষ্ট্রীয়া, ডান্‌সিগ ও মেমেল্ জার্ম্মানির

হাতে আসে। এখন আবার মধ্য-ইয়োরোপকে জার্ম্মান নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করার বিশেষ চেষ্টা চলেছে—গত মহাযুদ্ধের আগেও জার্ম্মানির এ একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। হিটলারের পিছনে যে ধনিকেরা আত্ম-গোপন করছে তাদের আবার উপনিবেশগুলি ফিরে পাবার সংকল্প রয়েছে। হিট্‌লার ত' এখন প্রকাশ্যে ফ্রান্সকে দোষ দিচ্ছেন যে রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য করে' ফরাসীরা ইউরোপে বল্‌শেভিক্-বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্স জার্ম্মানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এখন ইয়োরোপে দলবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে ফ্রান্স আবার আগের মতন সন্ধিসূত্রে দৃঢ় আবদ্ধ মিত্রশক্তিদলের গঠনকার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে প্রধান সাফল্য লাভ হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সন্ধির মধ্য দিয়ে। কুড়ি বছর আগের মতন ফ্রান্স ও রাশিয়া এখন আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পোল্যাণ্ড্‌কে দলে টানবার জন্য আজ ফ্রান্স ও জার্ম্মানির মধ্যে কাড়াকাড়ি চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া—এই তিন রাজ্য পরস্পরের বিশেষ মিত্র; গত যুদ্ধশেষে ব্যবস্থার সময়ে তাদের প্রভূত লাভ হয়েছিল বলে' তারা ফ্রান্সের পক্ষপাতী যদিও ফরাসী বন্দরে যুগোশ্লোভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার নিহত হবার পর থেকে এই রাজ্যটি এখন ফ্রান্সের উপর কিছু বিরক্ত। এ-ভাবে দলাদলির থেকে ইয়োরোপে শান্তির সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমছে। এ সম্বন্ধে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

আপাতদৃষ্টিতে ইটালির সঙ্গে জার্ম্মানি ও জাপানের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অন্য দেশ দুটির মতন ইটালিও বঞ্চিত—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা এমেরিকার বিশেষ কিছু চাইবার নেই কিন্তু এদের অবস্থা স্বতন্ত্র। ইটালি ভের্সাইর ব্যবস্থার সংশোধন চায়, মুসোলীনির রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর কোন শ্রদ্ধা নেই, ফাসিষ্ট্ রাষ্ট্রীয় আদর্শ জার্ম্মানি ও এমন কি জাপান পর্য্যন্ত অনেকখানি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এখন ইটালি যে ফ্রান্সের দিক নিচ্ছে তার প্রধান কারণ এই আশঙ্কা যে জার্ম্মানি প্রথমে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারি এবং পরে সমস্ত মধ্য-ইয়োরোপ গ্রাস করতে

পারে। এতে ইটালির সমূহ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা। এইজন্য ইটালির সঙ্গে ফ্রান্স সম্প্রতি একটা মিটমাট করে' নিতে পেরেছে—যদিও উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অমিল বিস্তর আছে। ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে নূতন বন্ধুত্বের একটা নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে আফ্রিকাতে। ফ্রান্স এতকাল আবিসিনিয়াকে রক্ষা করে এসেছে কিন্তু ইয়োরোপে সাহায্যের তুলনায় আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা তুচ্ছ। ইটালি যে আবিসিনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে তাতে ফ্রান্সের কোন বিশেষ অমত অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মহাযুদ্ধের পর রাপালোর সন্ধির পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানির বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় কিন্তু সে-সখ্য নাৎসি-বিপ্লবের পর আর বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক, সুতরাং সোভিয়েট-শক্তিকে ফ্রান্সের শরণাপন্ন হ'তে হয়েছে। রাশিয়ার তাই লীগে যোগদান অকস্মাৎ বুর্জোয়া-প্রীতির লক্ষণ নয়, একদিকে জার্ম্মানি অপরদিকে জাপান এই দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়ে রুষ নেতাদের আত্মরক্ষার জন্য গত্যন্তর নেই।

ব্রিটেনের সঙ্গেও জার্ম্মানির আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হ'ল। জার্ম্মানদের নৌবল ও ইংরাজদের আকাশযান বৃদ্ধি এর অধুনাতম দৃষ্টান্ত। বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাও এখানে নিতান্ত অল্প নয়। নাৎসিদের সম্বন্ধে ইংরাজদের মনোভাব যে প্রসন্ন নয় সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকেই তা' বোঝা যায়। ভের্সাই-সন্ধির পর ইংল্যাণ্ডে জার্ম্মানদের প্রতি সহানুভূতি নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু এখন ফ্রান্সের সঙ্গে সখ্যভাব পুনর্গঠনের পালা চলেছে। এ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মানির মধ্যে যে-একটা বৈরীভাব ছিল এর পর তারই পুনরভিনয় হওয়া কিছু বিচিত্র না। এইভাবে ইয়োরোপের সমস্যাও চারদিক থেকে জটিলতর হচ্ছে।

৪

আধুনিক কালে কোনও বিশেষ জাতি বোধ হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে একটা মহাযুদ্ধের সন্ধান করে না। পারস্পরিক সন্দেহ ও ভয় থেকেই সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের উৎপত্তি। দল গঠন কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বৃদ্ধি

করে' শান্তি বজায় থাকে না, অতীত থেকে এ অভিজ্ঞতা সহজেই লাভ করা যায়। অথচ মহাযুদ্ধের পর একত্র পরামর্শ ও মিলিত প্রচেষ্টার যে একটা ইচ্ছা দেখা গিয়েছিল তাও আজ লুপ্তপ্রায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের দোষ অনেক ছিল কিন্তু যারা সত্যই শান্তি চায় তাদের পক্ষে এর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দুঃখের কথা। মাঞ্চুরিয়া ব্যাপারে অনেকেই বলেছিলেন যে লীগের তৎকালীন দুর্ব্বলতার ফল বিষময় হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সত্যই এখন আর বিশেষ মূল্য নেই। এর জন্য ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড অনেকাংশে দায়ী। লীগের অন্তর্গত মহাশক্তিগুলি জাপানকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলে রাশিয়া ও এমেরিকার সমর্থন নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। ছোট রাজ্যগুলির প্রথম থেকে সঙ্ঘ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল কিন্তু জেনীভার বাধাবন্ধন বড় রাষ্ট্রগুলির মনঃপূত নয়। একশ' বছরের কিছু আগে ক্যানিং বলেছিলেন যে সকল দেশের শুধু নিজ নিজ স্বার্থের সন্ধানই সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী মহাসমরের অভিজ্ঞতার পরও এখন আবার সেই আদর্শের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সকল আলোচনার নিষ্ফলতাও এর আর একটি দৃষ্টান্ত। সমরসজ্জা সীমাবদ্ধ করার কোন উপায়ই এখনও পর্য্যন্ত স্থির হ'ল না। প্রথমে কথা হয়েছিল যে সকল দেশের সামরিক শক্তি সমান পরিমাণে হ্রাস করা হবে; কিন্তু তখন সেই শক্তি মাপবার কোন পদ্ধতি আবিষ্কার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রস্তাব উঠল যে কোন কোন বিশেষ অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে। যে-অস্ত্র শুধু আক্রমণের জন্য তাকেই বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু বিচারের সময় দেখা গেল যে সকল অস্ত্রকেই কোন না কোন দেশ আত্মরক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে দাবী করছে। ফ্রান্সের মত ছিল যে শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর সৃষ্টি করা প্রয়োজন—অন্য রাষ্ট্রদের অনেকেই এতে কিন্তু সম্মত হ'ল না। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাব আলোচনার উপযুক্ত বলেই বিবেচ্য হয় নি। ইতিমধ্যে জার্ম্মানি সমান অধিকারের দাবী উপস্থিত করায় বৈঠক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

ব্রিটেন, এমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালি এই পাঁচটি দেশের

নৌবাহিনীই আজকাল উল্লেখযোগ্য ; এখন আবার জার্ম্মানিও এই তালিকার অন্তর্গত হতে পারবে বোধ হয়। এ বৎসর নৌবলের সীমানির্দ্দেশের আলোচনা হবার জন্য একটি বৈঠক ডাকার কথা আছে। কিন্তু এখানেও কোন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা কম। জাপান ইংল্যাণ্ড ও এমেরিকার সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করেছে, ইটালি চায়, ফ্রান্সের সমান হ'তে। জার্ম্মানিও হয়ত চাইবে ফ্রান্সের সমান নৌবহর। ফলে ইংরাজ, এমেরিকান্ ও ফরাসীদের মনে হ'তে পারে যে তাদের অবস্থা এখন আগের চেয়ে কম নিরাপদ হয়ে পড়বে। এছাড়া অন্য গোলযোগেরও অভাব নেই। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সাব্‌মেরিন্ তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ফ্রান্স ও জাপানের তাতে ঘোর অমত। ইংলণ্ডের ইচ্ছা যে বড় রণতরীর আয়তন হ্রাস করে' ব্যয়সঙ্কোচ করা হোক ; কামানের আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেড়েছে, অতএব তার একটা সীমা নির্দ্দেশ করলেই গোলযোগ মেটে। এমেরিকানেরা কিন্তু বড় যুদ্ধজাহাজ রাখতে চায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রণতরীর সংখ্যা কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোন অসুবিধা ও অমত নেই কিন্তু ইংরাজদের তাতে ঘোর আপত্তি। স্বার্থের উপর এ-সব মতের প্রতিষ্ঠা—কাজেই সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত।

এদিকে যুদ্ধের আয়োজনের ত্রুটি নেই। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু একটি কথার উল্লেখ করব। আজকাল জল, স্থল ও আকাশ সর্ব্বত্রই যুদ্ধের একটি প্রধান অবলম্বন হচ্ছে পেট্রলিয়াম্। এই খনিজ তৈল সকল স্থানে পাওয়া যায় না, এখন তাই এরজন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। এমেরিকার ও রাশিয়ার এবিষয়ে বিশেষ অভাব নেই ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও অ্যাংলো-পারসিক অয়েল কোম্পানীর প্রধান অংশীদার। অন্য শক্তিদের এ সম্বন্ধে অসুবিধা আছে তাই সকল দেশে এখন পেট্রোলিয়াম সঞ্চয় করে মজুত রাখবার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি জাপান মাঞ্চুরিয়ার পেট্রল ব্যবসা একচেটিয়া করে নিয়েছে এবং জার্ম্মানিতে বিপুল উদ্যমে ডক্টর বার্গিয়াস ও ডক্টর ফিশারের আবিষ্কৃত প্রণালীর দ্বারা কয়লা থেকে পেট্রল উৎপাদন করানো হচ্ছে।

৫

শান্তিরক্ষার উপায় কি এ প্রশ্ন আজকে অনেকের মনে উঠেছে। এখনকার যুদ্ধে দেশের সকল অধিবাসীকেই অল্পবিস্তর যোগ দিতে হয়, অতীতের মতন এককোণে থাকা আর সম্ভব না। তাছাড়া পৃথিবীর এক প্রান্তে সংগ্রাম আরম্ভ হলে তার জালে সারাজগৎ জড়িয়ে পড়াই আজকাল স্বাভাবিক। যে শোভিয়েট্ রাশিয়ার লোকদের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক এত কম সেই দেশকেও তাই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের বেলায় নির্লিপ্ততা পরিহার করতে হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুনর্গঠনে বিপদ কমতে পারে কিন্তু সে সংস্কারের সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। জার্ম্মানি ও জাপান ফিরে এলে এবং যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিলে পৃথিবীর শান্তি সুদৃঢ় হবে নিশ্চয় কিন্তু সে আশা যখন করা যাবে তার আগেই যুদ্ধের আশঙ্কা নিশ্চয় কাটবে। তাছাড়া যে দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে বারবার তার অনুকরণে লীগ্‌কে পরিত্যাগ করার লোভ এখন থেকে রয়েই গেল।

জার্ম্মানি ও জাপানের মতিপরিবর্ত্তন হ'লে ঠিক আজকের দিনের সঙ্কট কাটতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ সে আশা নিতান্ত কম এবং দ্বিতীয়তঃ আংশিক বদলে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। আন্তর্জাতিক বিপত্তির প্রধান কারণ মহাশক্তিদের স্বার্থানুসন্ধান। মহাযুদ্ধের পর যে একতার বন্ধন দিয়ে এদের বাঁধবার চেষ্টা হয়েছিল সে যোগ একবার ছিন্ন হয়ে গেলে আবার সহজে তার পুনঃস্থাপন হবে না। তাই মনে হয় যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধাতঙ্কের যুগ বোধ হয় আবার ফিরে এল।

শান্তি রক্ষার একটি উপায় সহজে মনে আসে—যে-সব রাষ্ট্র এখন বর্ত্তমান অবস্থাতে তৃপ্ত, তারা দলবদ্ধ হ'লে অন্যদের তুলনায় তাদের শক্তি বেশী। কিন্তু সে একতাও অনেকখানি বাহ্যিক। ইংল্যাণ্ডের চিন্তা ইউরোপে শান্তিরক্ষা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগর। ফ্রান্স ও ইটালির সত্তার মৌখিক—আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে এ দুই দেশের স্বার্থ ঠিক এক নয়। এমেরিকা

ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা সহজসাধ্য না। ইটালির ভবিষ্যৎ বৈদেশিক নীতি নিতান্তই অনির্দ্দিষ্ট।

ফ্রান্স ও জার্ম্মানি এবং এমেরিকা ও জাপানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সন্ধির দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। কিন্তু যেখানে স্বার্থের সঙ্ঘাত প্রচণ্ড সেখানে এরূপ বন্দোবস্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এরূপ ক্ষণিক ব্যবস্থার অবশ্য যথেষ্ট মূল্য আছে, যুদ্ধ স্থগিত রাখতে পারলে তখনকার মত নিশ্চয়ই মঙ্গল। কিন্তু শান্তিরক্ষার এ উপায় কিছু নূতন নয় আর বিশেষ সঙ্কটের সময় এতে যুদ্ধ আটকায় না। অথচ আপাততঃ এ ছাড়া অন্য কিছু উপায়ও নিষ্ফল বলেই মনে হয়।

অনেকে নিশ্চয় বলবেন যে যুদ্ধ সনাতন প্রথা, অতএব এ চিরকাল মানুষের সাথী থাকবে, এর জন্য আক্ষেপ নিরর্থক। ক্ষোভের কারণ আর কিছুই নয়, সে শুধু এই যে বৈজ্ঞানিকদের কৃপায় যুদ্ধের রূপ এ শতাব্দীতে এমন পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে আগেকার সঙ্ঘর্ষগুলির সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের আর তুলনা চলে না। ঐতিহাসিকেরা তাছাড়া স্বীকার করবেন যে গত মহাযুদ্ধের পর দশ বছর মানুষের ইতিহাসকে মোড় ফেরাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, সেই প্রয়াসেরই হয়ত অবশ্যম্ভাবী পরাজয় আজ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে আবার মহাযুদ্ধ বাধবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী জোর করে করা দুঃসাহসিক। দুটি কারণ এখনও সমরোন্মুখী প্রবৃত্তিকে বাধা দিচ্ছে। আর্থিক সঙ্কটে অনেক দেশ এখনও অবশ, হঠাৎ বিশেষ লাভের আশা না থাকলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এখনও তাই অনেক রাষ্ট্র ইতস্ততঃ করবে। দ্বিতীয়তঃ ধ্বংসের নব-উদ্ভাবিত অস্ত্রগুলি এখনও অপরীক্ষিত, কাজেকাজেই তাদের প্রয়োগ ও প্রকোপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব শান্তিরক্ষার সহায়ক; এ বিষয়ে এতখানি অনিশ্চিত ভাব আগে ছিল বলে' মনে হয় না। কিন্তু এরূপ বাধা সাময়িক মাত্র। সমস্ত জগৎ আবার যে পথে চলেছে সে পথ সঙ্ঘর্ষ ও সংগ্রামের পথ।

৬

আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে সকলে একমত হ'তে পারে না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সঙ্ঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের রূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তার কিছু পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব।

যুদ্ধবিরোধী মনোভাব আগের চেয়ে আজকাল অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছে। গত মহাসমরের অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক সভ্যতার ধ্বংসের ভয় এর মূলে আছে অবশ্য। এ মত অনুসারে যুদ্ধ নিবারণ করাই আজকের দিনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেউ বল্‌বে না যে বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এমন কি এও সত্য যে কয়েকটি মহাশক্তির অন্যায় আধিপত্য জগতকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু সে বিষয়ে সেই পুরাতন প্রশ্ন ওঠে—যুদ্ধের ফলে এক রাষ্ট্রের জায়গায় অন্যের বিশেষ লাভ সিদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু নূতন ব্যবস্থা যে অধিক ন্যায়সঙ্গত বা সকলের মনঃপূত হ'বে তার স্থিরতা কোথায়? আর পরিণাম অনিশ্চিত হ'লে এত ধ্বংস এত ক্ষতি বরণ করে নেবার সদর্থ থাকে কি? আগুন নিয়ে খেলাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কিন্তু এর থেকেও প্রবল মনোভাব আছে, আজ সর্ব্বত্র তারই জোর বেড়ে চলেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই ধারণাই দাঁড়ায় যে প্রতি জাতির কর্ত্তব্য তার স্বার্থানুসন্ধান এবং সেই জাতিগত স্বার্থ সর্ব্বদাই ন্যায্য। এক হিসাবে এ বিশ্বাস যথার্থ কেন না আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ ন্যায়ের স্থান বা সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু জাতিদের স্বার্থের সঙ্ঘাত যদি ইতিহাসের শেষ কথা হয় তবে এর থেকে কখনও উদ্ধারের আশা নেই—কারণ এমন শক্তিশালী রাজ্য আজকাল কল্পনা করা যায় না যা সারা জগৎকে পদানত রাখতে পারবে। সম্প্রতি এ জাতীয় মনোভাব সবিশেষ প্রকাশ পেয়েছে ফাসিষ্ট্ মতবাদে। ফাসিষ্ট্‌রা বিশ্বাস করে যুদ্ধ মঙ্গলজনক, সংগ্রামের প্রবৃত্তি জাতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ, যোগ্যতমের প্রাধান্য আন্তর্জাতিক জগতেও সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ আদর্শ। সেই সঙ্গে প্রতি দেশের ফাসিষ্ট্‌দের মনে হয় যে তাদের জাতিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তৃতীয় প্রকার মনোভাব সাম্যবাদের রূপ মাত্র। এ মত অনুসারে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব চিরকালের নিয়ম নয়, অন্ততঃ এর ভয়াবহ প্রকাশ ধনতন্ত্রের অঙ্গ মাত্র। বর্ত্তমান অশান্তি ধনিক সমাজের অপরিহার্য্য ব্যাধি—রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রভৃতি উপায় দিয়ে এ জাতীয় সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কিন্তু নূতন সমাজ গঠিত হ'লে আজকের দিনের বিপদ আর থাকবে না। লেনিনের মতে ধনতন্ত্রের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সঙ্ঘর্ষ প্রবলতর হবে—প্রতিদেশে ধনিক ও শ্রমিকদের বিরোধ, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে অধীন জাতিদের বৈরিতা। এইভাবে ধনতন্ত্রের অবসান হবে।

চতুর্থ ধরণের লোকের সংখ্যাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী। তারা হয় মনে করে যে এ সম্বন্ধে ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, কোনক্রমে মানুষের কাজ ঠিক চলে যাবে; নয়ত তাদের বিশ্বাস যে মানুষের চেষ্টার বিশেষ কোন ফল নেই, যা হবার তা আপনিই হবে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এরূপ মনের ভাবই হয়ত সব চেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচয়। অন্ততঃ আজকের দিনে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

শ্রীসুশোভন সরকার

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আগে ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের জের ত একবছরেই মেটে না। সাতান্ন সংবতেও বৃষ্টি পুরোপুরি হল না। যেটুকু বা হল তাও সকলে কাজে লাগাতে পারলেনা বলদ ও বীজের অভাবে। সরকার যতই পয়সা বিতরণ করুন তার একটা সীমা ত আছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। এক বছর সব জমি খালি পড়ে থাকার দরুনই হোক কিম্বা অন্য কারণে হোক, সেবার সারা গুজরাতময় যেখানে সেখানে 'সামো' বলে এক রকম বুনো শস্য এত জন্মাল যে লোকে খেয়ে শেষ করতে পারে না। তবু সে-বছর সরকার তরফ থেকে রিলিফের কাজ চালু রইল। তবে সাতান্ন সংবতের রিলিফ একটু অন্য রকমের। কর্ত্তারা স্থির করলেন যে লোক যাতে গাঁয়ে বসেই মজুরী পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, কেন না লোকে আবার এক বৎসর ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালে গ্রামের জীবন একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

এই রিলিফ-কাজের ভার পড়ল আমাদের ওপর। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা অবজ্ঞার হাসি হেসে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যতটা পারেন আমাদের কাজে বাগরা দিতেও কসুর করেন নেই। সরকার থেকে হুকুম বার করালেন যে আমরা যেন কোনও প্রকার ইরিগেশান খাল-বাঁধের কাজে হাত না দেই, যেন গ্রামের মধ্যে খুচরো রাস্তা মেরামত কিম্বা গরুবাছুরের জল খাবার ডোবা সংস্কার এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। বলা বাহুল্য আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি ত আমার প্রান্তে যে কটা কাজ করিয়েছিলাম সবই ইরিগেশান সংক্রান্ত। আমার কালেকটর ও কমিশনর সাহেব কথা দিয়েছিলেন যে তাঁরা দেখেও দেখবেন না। কিন্তু প্রায় ধরা পড়ে গেছলাম আর কি।

গোটা তিনেক ছোটখাট ঈরিগেশানের (জল-সেচনের) বাঁধ ও পুকুর যথাসময়ে শেষ হল, কিন্তু বাঁধে পয়নালী না বসালে চাষারা ত বাঁধ ভেঙ্গে জল নেবে, ফলে বছর দুয়েকের মধ্যে সব কাজটা পণ্ড হয়ে যাবে। নল পাই কোথায়। কর্ত্তাদিকে লিখলাম যে আমাকে শ'দুই নল আনিয়ে দেওয়া হোক। কমিশনর সাহেব বড় ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে তলব করলেন সেই নলের জন্যে। সেই সাহেব কিন্তু শুনেই গাঁক করে উঠলেন, নল ত দিলেনই না উপরন্তু কইফিয়ৎ চাইলেন যে অমুক তারিখের সরকারী মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ঈরিগেশান কাজে হাত দেওয়া হয়েছে কেন? কালেকটর আমার কইফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে একখানা confidential পত্রও লিখলেন—গোলযোগে পড়েছ যেমন করে পার নিজেকে বাঁচাও। আমি উত্তরে রিপোর্ট করলাম যে আমার লেখার ভুল হয়েছিল, নলের কোনও প্রয়োজন নেই। আমার প্রবীণ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ও কর্ম্মঠ লোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমাদের বাঁধগুলো নিখুঁত করতেই হবে। আমি আমার এলাকার সমস্ত কুমোরদের ডেকে পাঠাইগে। এক হপ্তা পরে আপনাকে জানাব কি ফল হয়। এক হপ্তাও লাগল না, কুমোররা মহা উৎসাহে কাজে হাত দিলে। একটা সুবিধামত জায়গা ঠিক করে নিয়ে কুড়ি তিরিশ জন কুমোর লেগে গেল পয়নালী গড়তে আর সেগুলোকে ভাটিতে পোড়াতে। কয়েক সপ্তাহ তারা সেখানেই ক্যাম্প করে রইল। অনেক নল ভাঙ্গল অনেক ফুটল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার দরকারের বেশী নল হাতে এল। বাঁধগুলো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হল, একটা বাঁধ কমিশনর নিজে দেখে খুব খুসী হয়ে গেছলেন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে কাগজপত্রে এ কাজগুলোকে সমস্তই দেখানো হয়েছিল গরু মহিষের জলখাবার ব্যবস্থা বলে। বৃদ্ধ লীলী সাহেব খুব হেসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—ওহে! তোমার গরুগুলো ওই নলে মুখ লাগিয়ে জল খায় না জলটা বাইরে এলে খায়? আমাদের গুজ-

রাতের বড় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এক White সাহেব; তিনিও আমাকে একদিন এ বিষয় নিয়ে ঠাট্টামস্করা করেছিলেন। মুখে হাসিঠাট্টা চলে, সরকারী চিঠিপত্রে ত আর চলে না। আমার অকর্ম্মের কইফিয়ত দিতে গেলে বিপদেই পড়তাম। তবে, তখনও আমীর ওমরাদের দিন একেবারে যায় নেই। প্রাণে ভরসা ছিল যে লীলীসাহেবের মত মুরুব্বী শেষ পর্য্যন্ত তাঁবেদারকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে দেবেন, লালফিতের খপ্পরে পড়তে হবে না।

এই সাতান্ন সংবতে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সাহায্য করবার জন্য Special Relief Officer বলে কয়েকজন জীব নানাস্থান থেকে আমদানী করেছিলেন। আমার ভাগ্যে তাঁদের দুটী পড়েছিল, একটী সেই Smith সাহেব যার প্রেতাত্মার তাণ্ডবের কথা আগেই আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এ ভদ্রলোক ছিলেন উত্তর ভারতের একজন পেনশনপ্রাপ্ত পুলিস ইনস্‌পেক্টার, নিরীহ ভাল মানুষ, সাতেও থাকতেন না, পাঁচেও থাকতেন না, নিজের ব্যসনের কোনও রকম ব্যাঘাত না হলেই হল। তাঁর সঙ্গে সহজেই একটা রফা করে ফেলেছিলাম। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন না, আমার কথা মত তালুক আর সদরে বসে কিছু দপ্তরের কাজ করে দিতেন। অন্যজন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের মানুষ ছিলেন; বয়সে তরুণ, জাতে পার্সী, হৃদয়ে উচ্চ আশা। তিনি সমস্ত মহকুমার নানারকম গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করে আমার কানে বর্ষণ করতেন। তাতে কিছু ক্ষতি হয় নেই, কেননা, ছুঁৎমুখজাতের ওপর কোনও বিশ্বাস আমার কোনও দিনই ছিলনা; কিন্তু পরে জানলাম সে লোকটী খোদ কমিশনার সাহেবের কাছে দুই সপ্তাহ অন্তর গুপ্ত রিপোর্ট পাঠাত। আর সে গুপ্ত রিপোর্টএর সঙ্গে ফেমিন-রিলিফের কোনও বিশেষ সম্পর্কও ছিল না। অবশ্য ভদ্রলোকের গোয়েন্দাবৃত্তির খবর পাওয়ার পর তাকে সরাতে আমার বেশী দিন লাগলনা। তবে তার দুষ্কর্ম্মের ফল থেকে আমার কর্ম্মচারীদের বাঁচাতে আমায় অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। উত্তরকালে এঁর যথেষ্ট পদোন্নতি হয়েছিল, আরেকটা

মজার কথা বারদৌলীতে বাজেয়াপ্ত-করা জমী যখন নিলামে চড়ানো হয় ইনিই তার অধিকাংশ ডেকে নিয়েছিলেন।

কোনও দেশের জমীর মালিক কে, রাজা না প্রজা, এ সম্বন্ধে চিরদিনই মতভেদ আছে। কখনও বা রাজা নিজেকে বিশাংপতি, নৃপতি বলেছেন, কখনও বা ভূপতি বলেছেন। গুজরাতের পাটিদার প্রজারা কিন্তু চির-দিনই নিজেদিকে তাদের ক্ষেতের মালিক বলে জানে; কেননা তাদের জমী তারা দান করতে পারে, আর যতদিন খাজনা উসুল দেয় ততদিন তাদের হাত থেকে জমী ফিরিয়ে নেওয়ার হাত রাজারও নেই। আমি অনেকবার তাদের মুখে শুনেছি যে তারা খাজনা দেয় রাজ্য-চালনার খরচখরচার দরুন। তাই বলে তারা কারও গোলাম নয়। তাদের মনে এই বিশ্বাসটা এত বদ্ধমূল থাকার দরুনই বোধ হয় গান্ধিজীর খেড়া-বারদৌলী আন্দোলন এতটা কৃতকার্য্য হয়েছিল। আমি আহমেদাবাদ ছাড়বার আগে সরকার Land Revenue Code-এ এক নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন যাতে ক'রে মুকরারী প্রজারও জমী বিক্রী করার বা বন্ধক দেওয়ার কোন হক্ থাকবে না। এই প্রস্তাব শুনে গুজরাতের পাটিদাররা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করে তারা প্রতিবাদ করতে লাগল। আমাদের কাছে সর্ব্বদা পাটেলদের ভীড় লেগে থাকত, তারা কাতর হয়ে বারবার বলত—"সাহেব, যেমন করে পার এ আইন রদ করাও। সালিয়ানা রায়তের সঙ্গে আর আমাদের কি তফাৎ রইল! এরকম ব্যবস্থা যদি হয় ত আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে; মজুরী করে ত যেখানে খুসী পেট ভরাতে পারি।"

কে একজন কালেক্টর এই রকম সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্যে কয়েকজন পাটেলকে বরতরফ করেন। তারা কমিশনারের কাছে আপীল করে। লীলা সাহেব এ হুকুম ত রদ করলেনই, উপরন্তু গুজরাতের ছোট বড় সকল হাকিমকে একত্র করে বুঝিয়ে দিলেন যে গ্রামের পাটেল শুধু সরকারী লোক নয়, সে তার গ্রামের লোকের প্রতিনিধি। গ্রামের ভাল মন্দের জন্য সে সভাসমিতি করতে পারে। প্রতিবাদ সত্বেও নতুন

আইন যথাসময়ে পাস হল। ভোট দেওয়ার আগে ফেরোজশাহ প্রমুখ লোকনেতারা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা অনেকের চোখে একটা নাটুকে ঢঙ্গ বই কিছু না, কিন্তু বিলেতী খেলা খেলতে গেলে বিলেতী ঢঙ্গ ত আর ছাড়া যায় না। এই সময়ে আমাদের জেলায় A বলে এক সাহেব ছিলেন। এই ঢঙ্গের খবর আমরা যখন পেলাম তখন আমরা কয়েকজন একত্র চায়ের টেবিলে বসে, সবাই জাত সাহেব আমি ছাড়া, A খুব রসিকতা করে বলে উঠল—"The monkeys are learning tricks (বাঁদর খেল শিখছে)"। আমার সামনে কথাটা বলায় বড়সাহেব একটু অপ্রস্তুত হলেন, বোধ হয় আমাকে একটু আশ্বস্ত করার জন্যেই কানে কানে বললেন "Fancy A calling anybody a monkey !"

A সত্যই কতকটা কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত ছিল। একবার কি কীর্ত্তি করেছিল আপনারা শুনুন—আহমেদাবাদ জেলার উত্তরভাগে সরকারী Salt Range আছে, সেই Rangeএর সীমান্তে কড়া পাহারা। দুটো বেড়ার মাঝখান দিয়ে লম্বা রাস্তা চলে গেছে, মাঝে মাঝে সিপাহীদের ঘাটি, বিনা অনুমতিতে সে রাস্তায় কারও চলার হুকুম নেই; বিশেষতঃ রাত্রে। একদিন A অন্য এক সাহেবের তাম্বুতে খানা খেয়ে ফেরবার পথে গভীর রাত্রে সেই রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। সে নিজে হাকিম, নিয়মকানুনের কদর তার জানা উচিত ছিল। ঘাটির সিপাহী যখন "হল্ট, হুকুমদার" বলে হাঁকল তখন তার থামা উচিত ছিল। তা না করে সে 'চুপ রও' বলে ঘোড়া আরও ছুটিয়ে দিলে; সেপাইদের বাঁশী বেজে উঠল, চারিদিক থেকে পাহারাওয়ালা এসে Aকে হেঁচড়ে ঘোড়া থেকে টেনে পাড়লে, তারপর ধাক্কা মারতে মারতে গারদে নিয়ে গেল। তখনও A নিজের পরিচয় দিলে না; ভোরবেলা ইন্‌স্পেক্টারের কাছে খবর গেল যে এক গোরা নিমক-চোর ধরা পড়েছে, তাকে গারদে পুরে রাখা হয়েছে। ইন্‌স্পেক্টার তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে A রাগে ফুলছে। একটা মিটমাট হয়ে গেল। সকাল বেলা A তার ক্যাম্পে ফিরে চাকরবাকরদের চিন্তা

দূর করলে। এ হেন লোকের ফেরোজশাহকে বাঁদর বলা একটু হাস্যাস্পদ বই কি।

উপরে এইমাত্র বল্লাম যে লীলীসাহেব পাটেলকে গ্রামের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। শুধু লীলীসাহেব কেন, বোম্বাই সরকারেরও এই বিশ্বাস ছিল। আমাদের ক্যাম্প প্রবাসের সময় যে সমস্ত কাজ করতে হত তার মধ্যে জমাবন্দি একটা খুব বড় কাজ ছিল। একটা কোনও সুগম দেখে স্থান বেছে নিয়ে সেইখানে জমাবন্দি ক্যাম্প হত। এক একদিন পঞ্চাশ ষাটটা গ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রান্ত-সাহেব দেখা করতেন, আর প্রত্যেক গ্রামের দেয় খাজনা কি সেইটে সরকার তরফ থেকে জানাতেন। অবশ্য একবার জরীপ ও ব্যবস্থা হয়ে গেলে দেয় খাজনা বাঁধা হয়ে যেত; তবু এই প্রাচীন প্রথাটা আমার সময়ে কায়েম ছিল। নদীর চরে তরমুজ কি খরমুজার চাষের দরুন সরকারের যেটা প্রাপ্য সেটা প্রতিনিধিদের শুনিয়ে দেওয়া হত, কারণ এই প্রাপ্যটা বছর বছর বদলাত। যাহোক মোট কথাটা এই যে সাহেব দরবার করে বসে প্রত্যেক গ্রামের পাটেল তলাটি ও দুএকজন মাতব্বরকে জানিয়ে দিতেন যে গ্রামের দেয় কর মোট কত; যেন এই প্রতিনিধিরাই সারা গ্রামের তরফ থেকে এই দেয় করটা মেনে নিতেন। এর পেছনে আমি ত দেখি একটা পরিষ্কার village community-র ধারা, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাম মিলে যেন সরকারের কাছে খাজনার জন্য দায়ী। জমাবন্দিতে কোনও প্রজার স্বতন্ত্র উল্লেখ হত না। গ্রামের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে পান আতর দিয়ে এক এক দল মাতব্বর বিদায় করতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগত না। Red Tape-এর দিক থেকে দেখতে গেলে এই জমা-বন্দি ক্যাম্পকে সহজেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এর একটা মহত্ত্ব ছিল তখনকার দিনে, হয়ত আজও আছে।

এই গুজরাতের পাটিদারদের কথা বারবার এত করে বলছি তাদের আমি বড় ভালবাসতাম বলে। বেশ solid (সারবান) মানুষ, —যে রকম লোককে বিলেতী ভাষায় hearts of oak ইত্যাদি কত

কথাই বলা হয়েছে। গ্রামের ভার, গ্রামের স্বাধীনতা এদের হাতে সঁপে দিয়ে একদিন গুজরাতের লোকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। এক Village Hampden-এর গল্প করি শুনুন—আমরা দুটী প্রাণী, একটা কাল ও একটী সাদা সাহেব শীকার করে বেড়াচ্ছি। স্থানটা গ্রামের কাছে না হলেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মনসাবেড়া দিয়ে ঘেরা পাটেলদের ক্ষেতের মাঝখানে; হঠাৎ একটা বড় ঝাঁক পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। বন্ধু হাঁকলেন, mark! অমনি দুটো বন্দুক একসঙ্গে ছুটল, গোটা কুড়িক নিরীহ পাখী (নিরীহ কিন্তু অতি সুস্বাদু) চারিদিকে টপটপ করে পড়ল। অধিকাংশ পড়ল সরকারী পোড়ো জমিতে কিন্তু গোটা কয়েক পড়ল এক পাটেলের ক্ষেতের বেড়ার মধ্যে। পাখী আনতে সেপাই পাঠানো হল। সেপাই এসে রিপোর্ট করলে হারামখোর পাটেল কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। দু'ছটা পাখী ছেড়েও ত দেওয়া যায় না। অগত্যা দুই সশস্ত্র হাকীম হানা দিলে পাটেলের ক্ষেতে। পাটেল এসে বেড়ার ফাঁকে দাঁড়াল। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে প্রকাণ্ড হুঁকো, কিন্তু নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের মত, একেবারে নিরস্ত্র। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলে আমার ক্ষেতে তোমরা কি হকে ঢোক সাহেব? সত্যিকারের সাহেবটী—অর্থাৎ Hampden-এর দেশের লোক ভাঙ্গা গুজরাতিতে উত্তর দিলে আমাদের পাখী পড়েছে তোর ক্ষেতে, আমি নিশ্চয় নিয়ে যাব, জোর করে। পাটেল পা ফাঁক করে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বল্লে—নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও; কিন্তু আমার সাধ্য যতক্ষণ আছে আমি আটকাব। গল্পটা সামান্য কিন্তু যথার্থ peasent proprietor কি প্রকার লোক হয় তা চোখে দেখলাম। পাখী কটা রণক্ষেত্রে ফেলে দিয়েই শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।

আহমেদাবাদ জেলার পাটিদারেরা কুঁদুলে মানুষ নয়, কতকটা গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু পাশের জেলাতে (খেড়ায়) তাদের প্রতিপত্তি অন্যরকম; সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাবী সবেতেই পাটেলেরা অগ্রণী। অবশ্য ব্রোচ জেলার পাটিদার বোহ্‌রারা এদিক দিয়ে আরও খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। তবে তারা পাটিদার হলেও মুসলমান; তাদের

কথা স্বতন্ত্র ; অস্ত্রের ব্যবহার তারা এখনও ভোলে নাই। খেড়া জেলার একটা গল্প বলি শুনুন। একটা বেশ বড় গ্রামে দুই পাটেলে অনেকদিন থেকে মামলা মোকর্দ্দমা ঝগড়া কাজিয়া চলছিল। সেই গ্রামের লাগা নদীর কিনারায় এক মস্ত সরকারী বাবলাবন ছিল। এদের একজন সরকারে দরখাস্ত করে খবর দিলে যে অন্য একজন অনেকগুলো বাবলাগাছ কেটে চুরী করে নিয়ে গেছে। সদর থেকে একজন কর্ম্মচারী খোঁজ করতে এল, সঙ্গে চাপরাসী চৌকীদার, গ্রামের পাটেল তলাটি, গ্রামের লোকও সবাই জমা হল, তার মধ্যে ফরিয়াদী ও আসামী। স্থানটা নির্জ্জন, গ্রাম থেকে বহুদূরে, কাছে চাষবাসও নেই। সরকারী লোক চলেছে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ফরিয়াদী কাটা গাছগুলো দেখাতে, "রাও সাহেব, এই পয়লা, এই দোসরা, এই তেসরা"। আসামী আর "এই চৌঠা" বলে হাঁক মেরে এক চৌকীদারের হাত থেকে টাঙ্গি ছিনিয়ে নিয়ে এককোপে ফরিয়াদীর মাথা উড়িয়ে দিলে। দিন দুপুরে এতগুলো লোকের সাক্ষাতে এরকম ব্যাপার শোনা যায় সীমান্ত প্রদেশেই হয়। যে যেখানে ছিল সবাই পালাল। যখন পুলিশ বিকেলবেলা বাবলাবনে গেল তখন সেখানে লাশের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। সত্যি, মানুষের লাশ পাওয়াই যায় নেই, এক চটের থলিতে সেলাই করা দু'দশটা হাড় নদীগর্ভে পাওয়া গেছে বলে পুলিশ হাজির করে। কিন্তু ডাক্তার সাহেবদের মন ভোলাতে পারে নেই। ঘটনাটা আমি চোখে দেখি নেই, মোকর্দ্দমা আমার এজলাসে হয়েছিল, আর আশ্চর্য্য এই, justice is blind। লোকটাকে আমি ছেড়েও দিয়েছিলুম।

পাটিদারদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই বল্লাম, দোষেগুণে তারা একটা বড় জাত। গুজরাতের ভবিষ্যৎ পলিটিকাল উন্নতির ধারা তাদের উপর অনেকটা নির্ভর করছে।

কিন্তু এই পাটিদারদের চেয়েও আরেকটা জাতের সঙ্গে আহমেদাবাদ জেলায় আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। তারা গিরাসিয়া রাজপুত। প্রাচীন কালে যোদ্ধা ছিলেন, এখন আর যুদ্ধও

করেন না। আভিজাত্যের সকল গুণই তাঁদের মধ্যে আছে, কেবল পয়সা নেই। আমার প্রান্তে অনেকগুলো গ্রাম তালুকদারী-গ্রাম ছিল, অর্থাৎ সেখানকার ভূস্বামী প্রজাদের কাছে খাজনা সংগ্রহ করতেন আর গ্রামের দেয় কর সরকারকে দিতেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা আয় ব্যয়ের ওজন কিছুতেই ঠিক করতে পারতেন না। আমার সময়ে অধিকাংশ তালুকদারী গ্রামের ভার সরকার নিজের হাতে নিয়েছিলেন, আর তালুকদার মশাইকে পেনশন স্বরূপ কিছু দিতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অধিকাংশই অতীব গরীব। কোনও রকমে ঘরদোরের বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতেন। কিন্তু গরীব হলে কি হয়, কি আশ্চর্য্য খানদানী এঁদের চাল, কথাবার্ত্তা কইতেন কি সুন্দর ভাষায়। যে গুজরাতি একটা নিতান্ত আটপৌড়ে বড়বাজারের বুলি তাই এদের মুখে শোনাত যেন মোগল দিল্লীর কি বুরবঁ প্যারিসের চোস্ত জবান। কাজ উপলক্ষে গ্রামে গেলেই তালুকদার মহাশয়ের বইঠকখানায় অন্তত আধঘণ্টার জন্যে বসতে হত। একটা ছোটখাট দরবার গোছের হত। কোথা থেকে বেরত এক রূপার আতরদান, কোথা থেকে আসত এক জীর্ণ কাশ্মীরী শাল অতিথির আসনের জন্যে। আমি সব সময়ে কথার মাত্রা ঠিক রাখতে পারতাম না। ভাবের আতিশয্যে দুচারটে নিতান্ত অর্থহীন সমবেদনার কথা বলে ফেলতাম। অথচ তাদের সত্যি উপকার করবার কোনও ক্ষমতাই আমার ছিল না। একবার হোলির সময়ে আমার ক্যাম্প পড়েছিল কতকগুলি রাজপুত গ্রামের মাঝে ; কদিন ধরে গ্রামের মেয়েরা দলে দলে গান করতে করতে আবির কুঙ্কুমের থালা হাতে আমার ক্যাম্পে আসতে লাগল। আমার করণীয় কি তা ঠিক জানতাম না, গ্রামের লোকের সঙ্গে হোলিখেলায় মেতে ওঠা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয় এটাও বুঝলাম, অথচ এ বেচারারা সাধ্যের অতীত খরচ করে আবির কুঙ্কুমের ভেট নিয়ে এসেছে। শেষে ভেবে চিন্তে অনেকগুলো টাকা নানারকমে ওই কয় গ্রামে খরচ করে ঋণমুক্ত হলাম। একবার করলাম কি উদয়পুর থেকে একজন ভাল চারণ আনালাম।

সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই ক্যাম্পে গানের মজলিস করে আশেপাশের গিরাসিয়া তালুকদার ও অন্য সাধারণ রাজপুতদের নিমন্ত্রণ করলাম। তাঁরা সবাই মহা আগ্রহে গান শুনতে এলেন, আর আমি যে তাঁদেরই জন্য উদয়পুর থেকে বারোটজীকে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলাম এতে তাঁরা সত্যই বড় খুসী হয়েছিলেন। অনেক গিরাসিয়া বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে আমি তাঁদের একজন দরদী বন্ধু।

গুজরাতের আরেকটা কথা বলেই এবারকার প্রসঙ্গ শেষ করব। একদিন আমি মীড্ বলে এক সাহেবের সঙ্গে এক ক্যাম্পে রয়েছি, সন্ধ্যা-বেলায় খাওয়াদাওয়ার পর চারপাইএ শুয়ে শুয়ে দুজনে গল্প করছি, হটাৎ মীড্ চেঁচিয়ে উঠল দেখ—ডাট্ আমি কেম্ব্রিজে এক আশ্চর্য্য বাঙ্গালীকে চিনতাম। নানা রকমে আশ্চর্য্য মানুষ, তার খবর তুমি কিছু জান? নাম ঘোষ। আমাদের সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হয়েছিল কিন্তু চাকরী পায় নেই। আমি বল্লাম, "আমি তাকে চিনি না, কিন্তু সে নিশ্চয়ই অরবিন্দ ঘোষ, বড়োদা কলেজের প্রিন্সিপাল।" মীড্ বল্লে, "তুমি চেননা? চেষ্টা করে আলাপ কোরো, জানবার মতন মানুষ।" আমি মনে মনে স্থির করলাম যে যত শীঘ্র পারি অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করব। ঘটনাক্রমে এর মাস দুই পরেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। বোম্বাই যাচ্ছি, বড়োদা ষ্টেশনে দেখি চিত্রকর শশিকুমার হেশ। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছেন তিনচারজন ভদ্রলোক। হেশ তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। প্রথমজন একজন কৃশকায় বাঙ্গালী চোগা-চাপকান পরা, মাথায় বাউরিকাটা চুল, তার ওপরে পিরিলী পাগড়ী, স্বল্পভাষী, মুখে মিষ্টি হাসি। চোস্ত ইংরাজীতে ভদ্রলোক বল্লেন, "এত কাছাকাছি আমরা দুজন বাঙ্গালী থাকি তবু আজও আমাদের আলাপ হয়নি, আশ্চর্য্য। আমি আসব আপনার কাছে।" অরবিন্দের আত্মীয়-স্বজন অনেককেই জানতাম, তাঁর কথা সবই শুনেছিলাম, চিনতে একটুও দেরী হ'ল না। আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করলাম। কিন্তু দুজনার সত্য পরিচয় হতে আরও

বছর চারেক দেরী হয়েছিল। দ্বিতীয়জন একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক, সৌম্যমূর্ত্তি, নাম দেশপাণ্ডে, অরবিন্দের পরম বন্ধু। পরে এঁর সঙ্গেও খুব ভাল করে জানাজানি হয়েছিল। তৃতীয়জনের নাম যতীন্দ্রনাথ, জাতে কনৌজিয়া, ধর্ম্মে হিন্দু, পেশা বড়োদা পলটনে সিপাহীগিরি, দীর্ঘকায়, বিরাটবক্ষ, দেখলে কারও মনে সন্দেহ থাকে না যে সিপাহী হবার জন্যই তাঁর জন্ম; কিন্তু সিপাহী বেশী দিন থাকতে হল না। কর্ত্তৃপক্ষ খবর পেলেন সে ভদ্রলোক জাতে ঠিক কনৌজিয়া নহেন, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তাঁকে বড়োদা ত্যাগ করতে হল। যতীন্দ্রনাথকে নিরালম্ব স্বামীরূপেও অনেকে দেখেছেন। বড়োদা ষ্টেশানের ঘটনাটা উল্লেখ করে রাখলাম যদিচ আমার কাছে ছাড়া অন্যের কাছে এর কোনও মূল্য নেই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন

সংস্কৃতির ক্রমবিবর্ত্তনে ওগুস্ত্ কঁত্ তিনটি স্তর নির্ণয় করেছেন—পৌরাণিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। ভূতলের নিম্ন ও ক্লিন্ন স্তরগুলি অতিক্রম করে মানবচিত্তের ঊর্দ্ধগগনপ্রয়াসী অভিযান আজ হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্নাত শিখরে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছে ব'লে তাঁর বিশ্বাস। পারলৌকিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানিক আচরণও পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক শব্দের অন্তঃপাতী, এই অর্থে পৌরাণিক যুগ আজো সমাপ্ত কিনা, এবং তার বিবিধ প্রভাব লক্ষ্যত অলক্ষ্যত বর্ত্তমানের চিন্তায় কল্পনায় ও কাজে কতখানি অনুপ্রবিষ্ট, তা' অবশ্য তর্কাধীন। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন যে আজ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, বরঞ্চ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে, তাতে প্রতর্কের অবকাশ নেই। স্বীকার করতেই হবে যে পণ্ডিত অপণ্ডিত নির্ব্বিশেষে অনেকের ধারণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী দর্শনের মন্ত্রমুখরিত বাক্যের বকযন্ত্র-পরম্পরায় পরিশোধিত হয়ে যে সারবস্তুটি বেরিয়ে এসেছে তা'তে অর্থের চেয়ে অনর্থের মাত্রাই অধিক। এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে এই অখ্যাতিটি নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এর দায়িত্বের ভার বহন করতে হবে দার্শনিকদেরই শূন্যসঞ্চরণপ্রিয় কল্পনাবৃত্তিকে। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল পরিদৃশ্যমান জগৎকে প্রতিভাসমাত্র জ্ঞান ক'রে যাঁরা কোনো এক ঊর্দ্ধ অতীন্দ্রিয় লোকে নিত্য নিরালম্ব পরম সত্তার সন্ধানে দর্শনকে নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের বাস্তব-বিমুখতাই আজ তাঁদের অবচ্ছিন্ন তত্ত্বসম্ভারকে প্রগতির রাজপথ থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জ্জনাস্তূপে পরিণত করেছে। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে ধ্রুব অবিসংবাদিত সত্যের অবতারণা কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষেত্রেই সম্ভবপর, তাই এঁরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরাবিদ্যার অযোগ্য মনে করলেন। ভাবলেন যে অবিমিশ্র বুদ্ধিজাত কোনো একটি মূল প্রত্যয়ের (concept) মধ্যেই বিশ্বজগতের সমস্ত রহস্য নিহিত। সেই প্রত্যয়টির বিশ্লেষণ ও

অপাবরণেই পরমাণু থেকে নীহারিকা পর্য্যন্ত, জীবকোষ থেকে মানবাত্মা পর্য্যন্ত, যাবতীয় বিশ্বব্যাপারের চরম ব্যাখ্যা মিলবে। ভগবান যেন মহাগাণিতিকরূপে জগৎটাকে জ্যামিতির আঁটবাঁধা যুক্তির ছকে ফেলে গড়েছেন, কেবল গোড়ার সূত্রটি ধরতে পারলেই আর ভাবনা নেই।

অদৃশ্যলোকের জ্যোতিচ্ছটায় যে-দার্শনিকদের ধ্যানদৃষ্টি নিবদ্ধ, প্লেটো তাঁদের অন্যতম। তাঁর মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক বস্তু এক-একটি শ্রেণীভুক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মূলে রয়েছে একটি সামান্যরূপ (eidos, form)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বস্তুগুলির কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই, সে-দাবী কেবল বুদ্ধিগম্য সামান্যরূপের। অবশ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে প্লেটো একেবারে অস্বীকারও করেন নি; তিনি এক আদি অবিশেষ অগুণ জড়পদার্থের কল্পনা করেছেন যার উপর সামান্যরূপগুলির ছাপ দিয়ে দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের বিভিন্ন বস্তুনিচয় গঠিত,—ঠিক যেমন ট্যাকশালে রূপায় বিভিন্ন মুদ্রার ছাপ মেরে টাকা আধুলি প্রভৃতি গড়া হয়। এই সামান্যরূপগুলি যে কেবল আমাদের খামখেয়ালী মনের ধারণা বা কল্পনা তা' নয়। অবশ্য এই ধূলির ধরণীতে তাদের সাক্ষাৎ মেলা অসম্ভব, কিন্তু প্লেটোর অবিচলিত বিশ্বাস যে তারা আমাদের দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়কলুষিত জগতের পরপারে কোনো এক প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত দ্যুলোকে বাস্তব ও স্বতন্ত্র রূপে বিদ্যমান। আমরাও ভূতলে নামবার পূর্ব্বে সেই দ্যুলোকবাসী ছিলাম, এবং সেখানকার ক্ষীণায়মান স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে জন্মেছি। সে স্মৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই জ্ঞানীর সাধনা। সামান্যরূপগুলির মধ্যে আবার সত্তার তারতম্য বর্ত্তমান এবং প্লেটো তাদের পর্য্যায়ানুক্রমে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। এই বিন্যাসের ফলে তিনি শ্রেয়সের সামান্যরূপকে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান সত্তা নির্দ্ধারিত করেন। শ্রেয়সই হল বিশ্বের আদি কারণ ও অন্তিম পরিণতি, তারই দিব্যকিরণসম্পাতে সমগ্র বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত। তার অতীন্দ্রিয় পরম স্বরূপটি একবার যদি বিশুদ্ধ বুদ্ধির পরিচর্য্যায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তা' হলে সেই প্রখর দীপ্তিচ্ছটায় আমরা নিখিল

ভুবনের রহস্য-কুহেলিকা ভেদ করে তা'র অন্তর্নিগূঢ় সত্য অবলোকন করতে পারব—এমনতর উদ্দাম কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধে কোনো-রূপ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্কের অবতারণাও বৃথা। প্লেটো তাঁর রামরাজ্যের পরিকল্পনা থেকে কবিদের নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের বিষয় নির্ব্বাচন ও রচনাভঙ্গিতে কাব্যের যে অকৃপণ আমেজ পাওয়া যায় তা' তাঁর সহধুরীদের সম্মিলিত অবদানকেও হার মানাতে পারে। উক্ত মতবাদের কাব্যসমৃদ্ধি হয়ত যথেষ্ট আছে, কিন্তু দার্শনিক বিচারক্ষেত্রে আমরা যে অটুট যুক্তিসূত্র প্রত্যাশা ক'রে থাকি তার অভাব শোচনীয়। শ্রেয়সকে বিশ্বের মূল উৎস ও চরম পরিপূর্ত্তি নির্দ্ধারিত করায় প্লেটো যতখানি ন্যায়তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন ততখানি যুক্তিনির্ভরতার আভাস দেন নি, তবে এ-ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র-নীতিগ্রস্ত স্বর্গীয় গুরুদেবের অশরীরী অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ তাঁকে কতদূর চালনা করেছে বলা শক্ত।

স্পিনোজার দর্শনের একদিকে রয়েছে গণিতপ্রীতি এবং অপর দিকে ভগবদ্‌ভক্তি, মাঝখানকার পথটা এতই শীর্ণ যে তাতে ক'রে গন্তব্যে পৌঁছানো তাঁর মত মহারথীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। এই দার্শনিক মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর দর্শন-সাধনার অনুপ্রেরণা কোনো বুদ্ধিগত তত্ত্বানুসন্ধান নয়, এমন একটি সম্পূর্ণ সমাহিত সত্তার অন্বেষণ যার ধ্যানে মানবচিত্ত পেতে পারে অক্ষয় শান্তি। সে পরম সত্তা থেকে অন্য সমস্ত গৌণ সত্তাকে ইনি অনুমানসূত্রে টেনে বের করতে চান জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলির মত অবিচ্ছিন্ন পৌর্ব্বাপর্য্যে, এবং সেই উদ্দেশ্যে এঁর রচনারীতি য়ুক্লিডের রচনার হুবহু নকল। এই বহ্বারম্ভের ব্যর্থতায় আমরা সমবেদনা বোধ করতে পারি কিন্তু বিস্মিত হতে পারি না, কারণ ভগবানের অনন্ত অভিপ্রায় আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে বিশ্বরচনার কালে য়ুক্লিডের বিশুদ্ধ জ্যামিতিক আদর্শ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিল না।

এ-দু'টো উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে যে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কোনো কোনো দার্শনিক দর্শনকে বস্তুবিশ্বের সকল সংস্পর্শ বাঁচিয়ে

কোন্ সুদূর কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের দর্শন অনেকটা পুরাণের কোল-ঘেঁষা, দুটোই প্রত্যক্ষ জগৎকে অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে যায় কল্পনার মায়াপুরীতে। তফাৎ এই যে পুরাণ হল সমষ্টি-মনের সৃষ্টি, এবং দর্শনের উৎপত্তি ব্যক্তিবিশেষের চিত্তস্বাতন্ত্র্যে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে পুরাণ ও ধর্ম্মের সঙ্গে দর্শনের যে চিরন্তন বিরোধ তাকে সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বিরোধ মনে করা অসঙ্গত নয়। মানুষ জন্মজন্মান্তর যে সমাজপ্রতিষ্ঠিত চিন্তা ও বিশ্বাসের শাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত, তার প্রতি বিদ্রোহ-ঘোষণাতেই দর্শনের উপক্রমণিকা। দেকার্ত যে তাঁর দর্শনচর্চ্চার পূর্ব্বে একবার সংশয়ের মুক্ত প্রাঙ্গণে ঘুঁরে নেওয়া আবশ্যক মনে করেছিলেন তা' খুবই স্বাভাবিক। সে যুগের মন চার্চ্চের মানসিক ও আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের নিঃশ্বাসরোধকারী কবলে এমনই মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল যে সংশয়ের খোলা হাওয়া না পেলে তার পুনরজীবন সম্ভব ছিল না।

দর্শনের শূন্যপ্রয়াণকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে যদি তার মোড় ফেরানো যায়, তা' হলে বাস্তব সত্তার কোন্ অংশ বা রূপ বিশেষভাবে তার অবধানের যোগ্য সেটার আলোচনা দরকার। প্রকৃত পক্ষে দর্শনের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞেয় জগতের যে-সম্বন্ধ তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানই সে-সম্বন্ধের প্রধান বাহন। নৈমিত্তিক জীবনের আশু প্রয়োজনে আমরা অনেক প্রত্যয় গড়ে তুলি, তাদের সম্বন্ধে কোনো খুঁটিনাটি প্রশ্ন করার অবকাশও ঘটে না, আবশ্যকও দেখি না। কালক্রমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-নির্ম্মাণের কাজে যখন এদের ডাক পড়ে তখনো এরা অনেক সময়ে বিচার-বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, হয়তো বা আপন অতিপরিচিতির জন্যই।

সাধারণ জীবনের স্থূল কাজকর্ম্ম ও চিন্তার এতে বিশেষ ক্ষতি হবার কথা নয়, এমন কি বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর তথ্যসঙ্কলন ও তত্ত্বসংগঠনও অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলে বিনা বিপত্তিতে। তবে এমনও প্রায়ই ঘটে যে যে-গলদগুলিকে গোড়ায় অগ্রাহ্য করা হয়েছিল তারাই কালে কালে কণ্টকিত হয়ে উঠে প্রগতির মসৃণ পথকে দুর্গম ক'রে

তোলে, যেমন আজ ঘটেছে পদার্থবিজ্ঞানে। এই মূলপ্রত্যয়গুলির অর্থবিভ্রাট ঘোচানো এবং তাদের সঠিক সংজ্ঞাবধারণের ভার কোনো বৈজ্ঞানিক নিতে রাজি ন'ন, তা' ছাড়া যে-শিক্ষা ও সাধনার ভিতর দিয়ে তাঁদের মনঃপ্রকৃতি সাধারণত গড়ে ওঠে, তা' এর সম্যক অনুকূলও নয়। এই কাজের দায়িত্ব আজ নিতে হয়েছে দার্শনিককে। উদাহরণ স্বরূপ স্থান প্রত্যয়টির কথা ধরা যাক। আমার হাতে যে পেন্‌সিলটি রয়েছে তার স্থান নির্দ্দেশ করা শক্ত নয়, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি যে সামনের আরশিতে তার যে-প্রতিবিম্ব পড়েছে তার অবস্থিতি কোথায়, তা' হলে ব্যাপারটা তত সহজ ঠেকবে না। জ্যামিতিক আলোবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে পদার্থবৈজ্ঞানিক বলতে পারেন যে প্রতিবিম্বের স্থান আরশির পিছনে, এবং ঠিক ততখানি পিছনে, পেন্‌সিলটা তার যতখানি সামনে। কিন্তু সে-জায়গা সম্ভবত দেওয়াল দরজা কিম্বা কোনো আসবাবপত্রে ভর্ত্তি,—সে-ভর্ত্তি স্থানটিতে প্রতিবিম্ব অবস্থিত বলবার মানে কি? প্রতিবিম্ব কি কোনো জায়গা দখল করে না, যদি না ক'রে থাকে তা' হলে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় কিসে? তার পরে মানস চিত্রের অবস্থিত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে তো অবস্থা আরো সঙ্গীন।

তাজমহলের যে ছায়ামূর্ত্তি এখন আমার কল্পনাপটে উদ্ভাসিত তার স্থান কোথায়? সত্যকার তাজমহল যেখানে? আমার মাথার মধ্যে মস্তিষ্কের কোনো অংশে? না চোখ থেকে দু তিন হাত সামনে, কাল্পনিক মূর্ত্তিগুলি যেখানে অবস্থিত ব'লে প্রতীতি হয়? না কি যে দেশে তার অবস্থান তা' আমাদের সার্ব্বজনীন পদার্থবৈজ্ঞানিক দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অন্য একটা দেশ? সে মানসচিত্রের কালও কি তা' হলে পদার্থবৈজ্ঞানিক কাল থেকে বিচ্ছিন্ন?—প্রশ্নের অন্ত নেই, এবং সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পরীক্ষাগারের সুদক্ষ, স্নায়ুবিদ্যায় সুপণ্ডিত মনোবৈজ্ঞানিকের কাজ নয়। অগত্যা ডাক পড়ে দার্শনিকের।

প্রত্যেক সুগঠিত ও পরিণত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা, এবং সে নিয়মকে আরো

ব্যাপক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা; একেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা-পরম্পরায় আমরা শেষকালে এমন কতকগুলো প্রাথমিক নিয়মে গিয়ে পৌঁছুই যাদের আর কোনোরূপ ব্যাখ্যা উক্ত বিজ্ঞানের পরিধিতে সম্ভব নয়, স্বতঃসিদ্ধ ব'লে তাদের চোখ বুজে মেনে নেওয়াই নিরাপদ। বিজ্ঞানের এই মৌল স্বীকৃতিগুলি (assumptions) অনেক ক্ষেত্রে আদিম মানবের সহজ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থায় সাময়িক প্রয়োজন-মত নির্ব্বিচারে তাদের চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পর থেকে বৈজ্ঞানিক মহারথিগণ এগিয়ে চলতে এতই ব্যস্ত যে পিছনের দিকে ফিরে তাকাবার তাঁদের সময়ই নেই। তা ছাড়া সে স্বীকৃতিগুলি আপাতদৃষ্টিতে এমনই সুস্পষ্ট ও সুবিশ্বাস্য ব'লে বোধ হয় যে তাদের নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করাকে কালক্ষেপ ভাবা অস্বাভাবিক নয়। অথচ সুস্পষ্টতা ও সত্যতায় যে কোনো আত্মীয়-সম্বন্ধ নেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কল্যাণেই বারে বারে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। পৃথিবী যে সমতল এবং স্থিতিশীল, মাত্র কয়েক শ' বছর আগে এর চেয়ে সুস্পষ্ট কী ছিল। কিন্তু কোপর্নিকস্ যখন একে মিথ্যা ব'লে ঘোষণা করলেন, তখন সুস্পষ্টতার দোহাই আর টিকল কই। কাজেই বৈজ্ঞানিক মূলসূত্রগুলি যতই সুস্পষ্ট হোক, তাদের বিশ্লেষণ ও বিচারের প্রয়োজন আছে, এ-কথা মানতে হবে। বিশেষ করে মানতে হবে আজকের দিনে যখন পদার্থবিজ্ঞান আপন উধাও রথচক্রের ধূলায় আপনি অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এই কাজটা প্রধানত দার্শনিকের বিভাগভুক্ত হলেও বৈজ্ঞানিকরা যে এতে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ নন, তা' আইন্‌ষ্টাইন্ পোঁয়াকারে প্রভৃতির নাম স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। উক্ত বিজ্ঞান-মনীষীদের গবেষণার সঙ্গে রাসেল, হ্বাইট্‌হেড্, ব্রড্ প্রভৃতির তত্ত্বালোচনার বড় একটা বর্ণভেদ নেই, তফাৎ এই যে, প্রথমত তাঁরা এ ক্ষেত্রেও ভাষার চেয়ে গাণিতিক সঙ্কেতের উপর বেশী নির্ভর করেছেন; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা আগাগোড়া কেবল আপন বিভাগভুক্ত পদার্থবিজ্ঞানের দিকেই নজর রেখেছেন, কিন্তু দার্শনিককে মনে রাখতে হয় সমস্ত বিজ্ঞানের বিচিত্র এবং কোনো

কোনো সময়ে বিরোধী অভাব-অভিযোগের কথা। উপরের মন্তব্যটাকে আরো পরিস্ফুট করবার জন্য কার্য্যকারণ নিয়মের দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। নিয়মটা মোটামুটি এই ঃ—যে কোনো ঘটনা ক-এর সঙ্গে অন্য কতগুলো পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা চ, ছ, জ-এর এমন সম্বন্ধ যে সেগুলির সন্নিপাতে ক সর্ব্বদা ঘটেছে এবং সর্ব্বদা ঘটতে বাধ্য। "সর্ব্বদা ঘটেছে" এটা তথ্যগত সংবাদ হতে পারে, কিন্তু "সর্ব্বদা ঘটতে বাধ্য" অভিজ্ঞেয় তথ্য নয়, অনুমেয় সত্যও নয়, সেটা হল বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্বীকৃতি। এর কোনো প্রমাণ নেই, তবে এটা মেনে নিলে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ-সূত্র আবিষ্কার করতে পারি। এই স্বীকৃতিটা নানা দিক দিয়ে বিবেচনার যোগ্য। প্রথমত, অন্বীক্ষাশাস্ত্রে একটি সুবিদিত পদ্ধতি রয়েছে যাতে ক'রে কতকগুলো পূর্ব্ববয়বের (premiss) সংযোজনে একটি সিদ্ধান্ত নিত্য ও আবশ্যিক রূপে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে কি কার্য্যকারণ-নীতির কোনো সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না? হেগেলপন্থীরা বলেন যে কার্য্য-কারণ-নিয়ম হেতুসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধেরই একটা বিশেষ রূপ। তা' যদি হয় তবে তো সে-নিয়মের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়, অন্বীক্ষাশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভূমির উপর তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, কার্য্যকারণ-ব্যাপ্তির পরিধি নির্ণয় করা খুবই দরকার। এর প্রয়োগ কি শুধু জড়জগতে, না জীবজগৎ ও মনোজগৎও তার আজ্ঞাবহ? জীবজগতে বোধ হয় তার রাজ্য-বিস্তারকে আর ঠেকানো যাবে না, কিন্তু মনোরাজ্য এখনো বিদ্রোহী। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে আজো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং মানবচরিত্রের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-বিবর্জ্জিত (non-teleological) ব্যাখ্যা হয়ত কোনো কালে সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, জড়জগৎ আজ তার শিষ্টাচার ভুলেছে, হাইসেন্‌বের্গের অনিশ্চয়বিধির কল্যাণে সেখানকার আইনকানুনেও শৈথিল্য ঢুকেছে, তার ক্রিয়াকর্ম্ম যে-নিয়ম মেনে চলে তা আর সার্ব্বিক নয়, সামষ্টিক মাত্র। চ, ছ, জ ঘটলে ক ঘটবেই এমন কথা এখন বলা চলে না ; এদের সন্নিপাতে ক সম্ভব এইটুকু ব'লে, এবং সে সম্ভাবনার মাত্রা নির্দ্দেশ ক'রেই পদার্থ-

বিজ্ঞান ক্ষান্ত হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে সম্ভাবনা কথাটার অর্থ আজো কুহেলিকাচ্ছন্ন, গাণিতিক ও পদার্থবৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল সেদিকে নিদ্রালু। "ক-এর উপস্থিতি সম্ভব"—এই উক্তিটা নিশ্চয়ই বস্তু-জগতের কোনো তথ্যের বিবরণ নয়, কারণ সেখানে হয় ক উপস্থিত নয় অনুপস্থিত, তৃতীয় অবস্থা অভাবনীয়। ক-এর ঘটনাঘটন সম্বন্ধে বক্তার মনের সংশয় বা অজ্ঞতার অভিব্যক্তিও এ নয়,—ব্যক্তিগত মনোভাব জ্ঞাপন করা পদার্থবিজ্ঞানে অপ্রাসঙ্গিক। এর একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে ক-এর উপস্থিতির জন্য চ, ছ, জ ছাড়া আরও conditions আবশ্যক ; সে কারণ-সামগ্রীর (totality of conditionsএর) যদি মাত্র কয়েকটা, অর্থাৎ শুধু চ, ছ, জ, বর্ত্তমান থাকে, তবে ক-এর সংঘটন আবশ্যক নয়, সম্ভব। এ-দিক থেকে সম্ভাবনার গাণিতিক পরিমাণ করাও শক্ত নয় ; ক-এর সম্ভাবনার অনুপাত $= \frac{\text{ক-এর যেসব conditions বর্ত্তমান তাদেরসংখ্যা}}{\text{ক-এর সমস্ত আবশ্যক conditions-এর সংখ্যা}}$ তবে মুস্কিল এই যে সম্ভাবনার এমন অর্থ করতে গেলে সে হয়ে দাঁড়ায় আবশ্যিকতার ছদ্মবেশ মাত্র। উপরের কয়েক ছত্রে পুনরায় দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে আমরা কথা-প্রসঙ্গে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, চ, ছ, জ-এর সঙ্গে অবশিষ্ট conditionsও উপস্থিত থাকলে ক ঘটতে বাধ্য। অর্থাৎ কারণ-সামগ্রীর সঙ্গে কার্য্যের সম্বন্ধ রইল পূর্ব্ববৎ, আবশ্যিক ও নিশ্চিত ; সে সামগ্রীর শুধু গোটাকতক condition যদি দেওয়া থাকে, বাদ বাকী থাকে অনির্দ্দিষ্ট, তা হলেই আসে সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা। কিন্তু এমন কথা তো অন্বীক্ষাশাস্ত্রের কলেজ-পাঠ্য বইতেও দুর্লভ নয়, একে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে আজ এত লম্ফ ঝম্ফ কিসের?

দর্শনকে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমির পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত করেন সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ প্রত্যক্ষবাদীরা, কিন্তু কাণ্টের নামই এদিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুবিখ্যাত Critique of Pure Reasonএর মুখ্য বিষয় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির প্রামাণ্যতা-বিচার। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ঐ দুই বিদ্যার গোড়ায় এমন কতকগুলো সূত্র পাওয়া যায় যার সার্ব্বিকতা ও আবশ্যিকতা

সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। অথচ যুক্তিবাদীদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে কিম্বা প্রত্যক্ষ-বাদীদের অমিশ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানে, কোথাও এর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কাণ্ট্ এই অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে যে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা' দর্শনের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয়। অবশ্য তাঁর একান্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সঙ্কল্প ও প্রয়াসকে চিরকালের মত পঙ্গু করে রেখেছে তাঁর অত্যধিক ধর্ম্ম ও নীতি-প্রবণতা। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানঘটিত সমস্যা তাঁর দর্শনের একমাত্র প্রেরণা নয়। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, বুদ্ধিপ্রসূত যাবতীয় বিদ্যার পরিধি প্রতীয়মান জগৎ পর্য্যন্তই, পরমার্থতত্ত্বলোকে তাদের প্রবেশাধিকার অনিবার্য্যরূপে ব্যাহত—তাঁর এই মতবাদ কেবল নঙর্থক নয়, এর সর্ব্বপ্রধান সদর্থক মূল্য তাঁর কাছে এই যে এতে ক'রে ঈশ্বর ও আত্মা-সম্পর্কিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসগুলিকে চিরকালের মত বুদ্ধির কবল থেকে রক্ষা করা হয়েছে। বুদ্ধিকে বিতাড়িত ক'রে নীতিবিশারদ কাণ্ট বিবেকের সদর রাস্তায় যে পাহারাওয়ালা ভগবানকে এনে খাড়া করেছেন তার কবল থেকে আমাদের রক্ষা করবে কে? তিনি বিবেকের অমোঘ বাণী শুনতে পেয়েছেন যে মানবাত্মার পাপপুণ্যের সঙ্গে তার দুঃখসুখের মাত্রা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাখা অত্যাবশ্যক। কাজেই পাপিষ্ঠকে তাড়া করবার জন্য একজন পরম পাহারাওয়ালা না হ'লে চলবে কেন? শঙ্করাচার্য্য না কি ঐহিক সুখসম্ভোগের মায়া ত্যাগ করা তাঁর শিষ্যদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করতেন। পারলৌকিক মায়াবর্জ্জনের কথা হয়ত তিনি উল্লেখ করেন নি, কিন্তু মায়াজালে বিজড়িত যাঁদের চিন্তা, বিপন্ন যাঁদের বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার থেকে তাঁরাও বঞ্চিত।

বিজ্ঞানের ভিত্তির চেয়ে তার সিদ্ধান্তই দার্শনিকদের চিন্তা ও সাধনাকে উদ্রিক্ত করে এসেছে বহুকাল। সমস্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে সম্মিলিত ক'রে একটি মহাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা যদি আজো সম্ভব না হয়ে থাকে সেজন্যে এই দার্শনিকদের চেষ্টার ত্রুটি দায়ী নয়। এবং শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রদেশে সেতু-বন্ধনের প্রয়াসেই তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে যান নি, তাঁরা চেয়েছিলেন মানবজীবনের সমস্ত ধারার শুভসঙ্গম।

তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি বিশ্বালোচনের (weltanschauung) সৃষ্টি করতে যেখানে আমাদের সমস্ত দাবী, বুদ্ধিগত হৃদ্‌বৃত্তিগত ও চরিত্র-শক্তিগত সমস্ত অভিলাষ, নির্ব্বিরোধে আপন আপন তৃপ্তি খুঁজে পাবে। অর্থাৎ দর্শন হবে এমন একটি মহীরুহ যার বিশাল স্নিগ্ধ ছায়াতলে শিল্পী ও সাধক, জ্ঞানী ও কর্ম্মী আপন বিচিত্র বন্ধুর পথের ক্লান্তি ভুলে এক শষ্পশয্যায় বিশ্রাম লাভ করবে। এ হেন দর্শনের স্বরূপ বুঝতে গেলে জানা দরকার যে তার অভিপ্রেত বিশ্বালোচন কি যুক্তি ও অস্বীকার অটল ভিত্তিতে শিকড় বিস্তার ক'রে থাকবে, না শিল্পীর স্বপ্নের মত হবে বন্ধন-মুক্ত, তারায় তারায় বাজবে তার অবাধ পক্ষধ্বনি। দার্শনিকরা সাধারণতঃ তার সংগঠনের ভার বুদ্ধির হাতেই অর্পণ করতে চান, কিন্তু তা' হলে একটি চিত্তবৃত্তিকে অন্যান্য বৃত্তির উপর অযথা প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিল্পীর কল্পনাকে, যোগীর সাধনাকে যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা কি তাঁরা জ্ঞানীর স্পর্দ্ধা ব'লে গণ্য করবেন না? পক্ষান্তরে, যদি বলা হয় যে দার্শনিক বিশ্বালোচন কেবল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেখানে কল্পনা ও নিষ্ঠারও অব্যাহত প্রবেশ থাকবে, তা' হলে এমন অভিষ্টসিদ্ধির আর সমস্ত অন্তরায়ের কথা বাদ দিলেও কেবলমাত্র বাহনের অভাবেই মর্ত্ত্যভূমিতে তার অবতারণা অসম্ভব। বুদ্ধি-প্রসূত ও বুদ্ধিরই ছাঁচে ঢালাই করা ভাষার অন্তত তাকে বহন করবার শক্তি নেই। যা বুদ্ধির অতিক্রান্ত তা' ভাষারও অতীত। অবশ্য অনুভূতি প্রকাশের জন্য অন্য প্রণালী রয়েছে—ছন্দ, সুর ও নৃত্য, এবং চরিত্রশক্তি বিকাশের ক্ষেত্র কর্ম্মজীবনের কঠিন সাধনায়। কিন্তু দার্শনিকের বাঞ্ছিত বিশ্বালোচন যদি শুধু তত্ত্বপ্রসূত না হয়, সমস্ত চিত্তবৃত্তির অপক্ষপাত সন্নিবেশে গঠিত হয়, তবে তার পরিব্যাপ্তির নিঃসীমতা ছাপিয়ে যাবে সকল প্রকাশভঙ্গির ক্ষুদ্র পরিসরকে।

আসলে এমন কোনো সময়য় মানব জীবনে আনা যায়ই না যাতে তার সমস্ত বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। টি, এস্, এলিয়ট্ প্রভৃতি কোনো কোনো মনীষী বর্ত্তমান কালের বিক্ষিপ্ততায় অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে যেতে চান মধ্য যুগের সমাহিত সংহত শান্তির মধ্যে। স্বীকার

করতে হবে যে মধ্য যুগ সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাকে একটি সমন্বয়ের প্রবাহে মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সে সমন্বয় ছিল ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে। তখনকার আর্ট ও বিজ্ঞান এত সরল এত প্রাথমিক ছিল যে ধর্ম্ম সহজেই তাদের আত্মসাৎ করতে পারলে, চার্চ্চের অতিপ্রাবল্যের আওতায় চিন্তানুশীলনের অন্য সকল ক্ষেত্র রইল অনুর্ব্বর হয়ে। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের জয়নিঘোষে মুখরিত, আজ যদি আমরা জীবনের পূর্ব্বতন সংহতি ফিরে আনতে চাই তা' হলে তার মূলসূত্র বৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য। সেখানে আর্টের ধর্ম্মের কর্ম্মের স্থানসঙ্কোচ ঘটা স্বাভাবিক। সমন্বয়ের মরীচিকা আমাদের দার্শনিক নয়নে এমন মোহ লাগিয়ে দিয়েছে যে স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা আমরা ভুলতে বসেছি। বিরোধ অবশ্য পীড়াদায়ক, কিন্তু বিরোধ বাধে তখনই যখন একই মন্দিরে একাধিক দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যদি কর্ম্মের যজ্ঞশালায় শ্রেয়োবোধই একমাত্র ইষ্ট হয়, যদি শিল্পের শিলাবেদিমূলে অর্ঘ্য দানের সময়ে মন কলালক্ষ্মীর ধ্যানেই সমাহিত থাকে, যদি বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যাধিকারে বুদ্ধির প্রতাপ থাকে অপ্রতিহত,—তাতে আমাদের কৃষ্টির শস্যগরিমা বাড়বে বই কমবে না। মানব মনের অসমধর্ম্মী অসমগামী বৃত্তিসমূহকে এককক্ষবর্ত্তী করায় যে শান্তি তা' রিক্তের শান্তি, বিশ্বের অনন্তভাণ্ডারদ্বারে প্রবেশকুণ্ঠচিত্তের শান্তি। সে-শান্তি ছিল মধ্য যুগের,—আমাদের জন্য থাক বৈচিত্র্য ও বিক্ষেপ, থাক অসংহত চিত্তের অনির্ব্বাণ জিজ্ঞাসা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

ভাব ও ভাষা

মিউনিকে থাকার সময় একদিন অভ্যাসমত একটি ছুটির দিন দেখিয়া আমরা কয়েকজনে দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ার মনোরম গ্রামগুলির মধ্য দিয়া পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে একটি গণ্ডগ্রামে পৌঁছিয়া একটি মেয়েকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম গ্রামের মধ্যে কোন Gaststatte আছে কি না যেখানে আহারাদি করা যাইতে পারে। মেয়েটি তৎসম্বন্ধে সংবাদাদি দিয়া উৎসুক নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল আমাদের বাড়ী কোথায়। এই বাঁধা প্রশ্নের এক বাঁধা উত্তর আমার ছিল, গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম, "নিকারাগুয়া"। "কলিকাতা" বলিলেও কোন ক্ষতি হইত না, কারণ মেয়েটির নিকট নিকোরাগুয়া ও কলিকাতা দুইই সমান। উত্তরে কিন্তু মেয়েটি যাহা বলিল তাহাতে সেই যে একটি চিন্তাধারার সূত্রপাত হইল আজও তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। মেয়েটি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি জার্ম্মান বল কিরূপে?" তাহার কথায় স্পষ্টই মনে হইল যে জার্ম্মান হইয়া না জন্মিয়াও যে কেহ জার্ম্মান ভাষা বলিতে পারে এই ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই আমার মুখে জার্ম্মান শুনিয়া তাহার এত বিস্ময়। জার্ম্মান ভাষাটা যে অ-জার্ম্মান যে কোন লোকই ইচ্ছা করিলেই শিখিয়া লইতে পারে এ কথা সে যেন কল্পনাও করিতে পারে না, তাহার যেন ধারণা যে জার্ম্মান জাতির দৈহিক বিশেষত্বগুলির মত জার্ম্মান ভাষাটিও জার্ম্মানরা জন্মগত অধিকার-সূত্রেই লাভ করিয়া থাকে।

ভাষা সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা প্রথম আরম্ভ হয় গ্রীসে এবং সেখানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঠিক এই কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। এক দল বলিত ভাষা phusis, অর্থাৎ মনুষ্য-চেষ্টানিরপেক্ষ সম্পূর্ণ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র। আর এক দল বলিত ভাষা আসলে energeia, অর্থাৎ মনুষ্যের প্রত্যক্ষ চেষ্টার ফলেই

ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বলিত, যে প্রাকৃতিক নিয়মের বলে মানুষের কোন চেষ্টা ব্যতীতও বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে ও মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, ঠিক সেই নিয়মের বলেই মানুষ কথাও বলিতে শিখে, তাহাতে তাহার আপন কৃতিত্ব কিছুই নাই। যে জার্ম্মান মেয়েটির কথা বলিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি তাহারও নিশ্চয়ই এই ধারণা ছিল, নতুবা আমার মুখে জার্ম্মান শুনিয়া সে এত বিস্মিত হইত না। অপর পক্ষের মত ছিল, মানুষ যেমন সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছামত সৌধোদ্যানাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ঠিক সেই রূপেই সে তাহার ভাষাও সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাতে প্রকৃতির অমোঘ বিধান পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষের মতটিকে অবশ্য ঠিক এই আকারে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, কারণ সৌধোদ্যানাদি মানুষের energeiaর ফল হইলেও তদুদ্বোধক প্রচেষ্টার মূলে আছে phusis। অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম যদি প্রথম স্তরের phusis হয় তবে মানুষের সৌধোদ্যানাদি নির্ম্মাণ দ্বিতীয় স্তরের phusis। এই অর্থে সকল প্রকার energeiaকেই দ্বিতীয় স্তরের phusis বলা যাইতে পারে। এখন ভাষাকে phusis বলিব না energeia বলিব ইহাই প্রশ্ন। জীব না থাকিলে জীবের ভাষা সম্ভব হইত না, মানবের ভাষাও মনুষ্য নামক জীবের অস্তিত্বের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। এই অর্থেই স্বীকার করিতেই হইবে যে ভাষা phusis নহে, energeia। কিন্তু সংজ্ঞামূলক এই পার্থক্য লইয়াই সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি মূল ও ফলানুসন্ধান করা যায় তবে phusis ও energeiaর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়াই অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়িবে, দেখা যাইবে energeia বাস্তবিকই বহুক্ষেত্রে মানবজীবনে phusisএ পরিণত হইয়াছে। শিল্প ও সাহিত্যালোচনার Gothic, Barok, Rococo বলিতে যাহা বুঝায় তাহা energeia না phusis ?

ভাষা সম্বন্ধে যে কোন আলোচনার পূর্ব্বে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র শব্দসমষ্টি (sound-complex) কখনই ভাষা হয়না। তোতাপাখী ও গ্রামোফোন যত কথাই বলুক আর যত শব্দই (word)

উচ্চারণ করুক কিছুতেই তাহাতে ভাষা সৃষ্টি হইবে না। শব্দের পিছনে সর্ব্বত্র একটি সচেতন চিন্তা বর্ত্তমান আছে কি না সর্ব্বাগ্রে তাহাই অনুসন্ধেয়। এই সচেতন চিন্তা বর্ত্তমান থাকায় মূকের শব্দহীন ইঙ্গিতকেও ভাষা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু পাগলের অর্থহীন প্রলাপ কখনও ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। আরও মনে রাখা দরকার যে এই সচেতন চিন্তা বক্তার মনে বর্ত্তমান থাকাই প্রথমতঃ প্রয়োজন, তাহা কেবল শ্রোতার মনে বর্ত্তমান থাকাই যথেষ্ট নহে, নহিলে গ্রামোফোনের শব্দসমষ্টিকেও ভাষা আখ্যা না দিবার কোন কারণ থাকে না। শ্রোতার অভাবে ভাষার ভাষাত্ব নষ্ট হয় কিনা সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

এখন আলোচ্য, ভাষার মূলে যে সচেতন চিন্তার ধারা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক তাহার মূলই বা কোথায় এবং তাহা গঠিত বা নির্দ্ধারিত হয় কিসের দ্বারা ? এবং যে কোন উপায়ে ভাষার গতি একবার নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে তদ্দ্বারা মানুষের চিন্তার ধারাও প্রভাবান্বিত হয় কি না।

Bergson পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে চিন্তার রূপ ভাষার দ্বারা অন্ততঃ আংশিক ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। Bergson বহু ভাষা শিক্ষা করার পক্ষপাতী। কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে এক ভাষাভাষী লোকের চিন্তা-প্রণালী তাহার প্রোক্ত ভাষাটিরই দাসস্বরূপ হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বহুভাষাবিৎ হয়, অর্থাৎ বহুভাষায় চিন্তা করিতে শিখে, তবে সকল ভাষার দাসত্ব হইতেই সে মুক্ত হইতে পারে, তাহার চিন্তা তখন ভাষার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য লাভ করে। Bergsonর এই কথা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একথা মানিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এক একটি ভাষা মানুষের চিন্তাধারাকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া থাকে অথবা আবদ্ধ করিয়া রাখে। ভাষার এই গুণটি স্বীকার করিলে—ইহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই—ভাষাকে আর কেবল মাত্র energeia মনে করা চলে না; কারণ যে ভাষা ভাষকের

ভাষণপ্রণালী পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে তাহাতে যে phusisএর ধর্ম্ম অন্ততঃ আংশিকভাবে বর্ত্তমান তাহা না মানিয়া উপায় নাই।

ইহা কিরূপে সম্ভব? ভাষা কর্ম্মমাত্র হইয়াও কর্ত্তৃপদবাচ্য হইয়া উঠিল কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তর একটি কথায় দেওয়া যাইতে পারে—ভাষকের কর্ম্মেই ভাষার উৎপত্তি কিন্তু নির্লিপ্ত কর্ম্মে নহে। ভাষা ভাষকের ধর্ম্ম, কর্ম্মমাত্র নহে। এখানে কর্ত্তার ব্যক্তিত্ব-দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতেছি। ভাষক ভাষণকালে বক্ষ্যমাণ বিষয়টি আপন ব্যক্তিত্বের রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে, কাজেই ভাষার মধ্যে ভাষকের ব্যক্তিত্ব সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট, এবং ভাষকের ব্যক্তিত্বের অংশভাক্ হওয়াতেই ভাষার কর্ত্তৃপদবাচ্যত্ব সম্ভব। এ স্থলে ভাষণ-প্রণালীর সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন, নতুবা বুঝা যাইবে না ভাষকের ব্যক্তিত্বের অংশ কিরূপে তাহার ভাষার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে।

একথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ অনুভূতিগুলির শব্দময় বাহ্য অভিব্যক্তির নাম ভাষা। ইহাই Croceএর প্রদত্ত ভাষার সংজ্ঞা। অল্পকথায় ভাষার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞা দেওয়া বোধ হয় সম্ভবপর নয়। অবশ্য এই সংজ্ঞার অন্তর্গত অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটিরই অর্থ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকিলে সংজ্ঞাটির পূর্ণ অর্থ প্রতিভাত হইবে না। যে কোন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির অনুভূতি (passive) সর্ব্বত্র অনুরূপ হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি (active) ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হইবেই, কারণ কর্ত্তার ব্যক্তিত্বের সহিত বাহ্য অনুভূতিটির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যেরই নাম উপলব্ধি। অতএব অনুভূতির মূলে সর্ব্বত্র একই বস্তু বর্ত্তমান থাকিলেও ব্যক্তিভেদে তাহার উপলব্ধি বিভিন্ন হইবেই। এই উপলব্ধিরই শব্দময় অভিব্যক্তির নাম ভাষা, কাজেই তাহাও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কার্য্যতঃ তাহা সকল সময় হয় না, তাহার কারণ ভাষার শব্দসংখ্যা ব্যক্তির উপলব্ধ অনুভূতির সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, Bergson কেন বলিয়া থাকেন যে এক

একটি শব্দ এক একটি মাত্র অর্থের দ্যোতক নহে, প্রত্যেক শব্দ সমজাতীয় অনন্ত অর্থের দ্যোতক এবং Bergsonর এই কথাটি স্মরণ রাখিলে ইহাও বুঝা যাইবে যে ভাষার দ্বারা মানুষের চিন্তাপ্রণালী প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না।

উপলব্ধ অনুভূতির সংখ্যা অনন্ত অথচ মানুষের ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা পরিমিত। অতএব এক একটি শব্দ-দ্বারা দ্যোতিত উপলব্ধ অনুভূতির সংখ্যাও অনন্ত। এখন কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক যে দুইটি নির্দ্দিষ্ট ভাষায় সমসংখ্যক শব্দ আছে। প্রত্যেক ভাষাতেই অনন্ত উপলব্ধ অনুভূতি সমসংখ্যক শব্দদ্বারা দ্যোতিত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে কখনও আশা করা যায় কি যে একটি ভাষায় একটি বিশেষ শব্দ যে সংখ্যাতীত উপলব্ধ অনুভূতিগুলির দ্যোতক, অপর ভাষাতেও এমন একটি শব্দ পাওয়া যাইবে যেটি ঠিক সেই সংখ্যাতীত উপলব্ধ অনুভূতিগুলির দ্যোতক হইবে? এস্থলে probability অনন্তের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ শূন্য।

ভাষা-দ্বারা কোন একটি সম্পূর্ণ চিন্তা-প্রণালীর প্রতি অংশ যে দ্যোতিত হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। বাক্যস্থ এক একটি শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারার প্রধান প্রধান স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। সিনেমার চিত্রাবলীর সহিত বাক্যের শব্দাবলীর তুলনা করা যাইতে পারে। সিনেমায় যেমন পরস্পর-সম্বন্ধবিহীন কতকগুলি চিত্র কেবল পারম্পর্য্য-বশতঃ একটি অখণ্ড কার্য্যের দ্যোতনা করিয়া থাকে, ভাষাতেও সেইরূপ একটি মাত্র অখণ্ড চিন্তা পরস্পরাবদ্ধ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ-দ্বারা সূচিত হয়। সিনেমায় যেরূপ একই কার্য্য দেখাইবার জন্য বিভিন্ন চিত্রাবলীর আশ্রয় লওয়া সম্ভব, ভাষাতেও সেইরূপ একই চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার সম্ভব। মনে করা যাউক সিনেমায় একটি সম্পূর্ণ কার্য্য দেখাইবার জন্য a b c d e f g h এই কয়টি চিত্রের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রদর্শন কালে সকল চিত্রই দেখানোর প্রয়োজন হয় না। দ্রুত পরম্পরায় a c e g দেখাইলে যে চিত্র পাওয়া যাইবে b d f h তাহা হইতে বিশেষ পৃথক হইবে না। এখন কল্পনা

করা যাউক যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সমস্ত শব্দের যোগে ভাবানুযায়ী একটি অতি দীর্ঘ শব্দশ্রেণী রচনা করা হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে একার্থক দুইটি শব্দ এক বা বহু ভাষার মধ্যে কখনও পাওয়া যায় না, কাজেই কল্পিত শব্দ-শ্রেণীটির একই স্থানে একাধিক শব্দ পুঞ্জীভূত হইবার আশঙ্কা নাই। এখন একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য এই পরিকল্পিত শব্দশ্রেণীর তদনুজ্ঞাপক অংশের সকল শব্দই ব্যবহার করা প্রয়োজন হইবে না, সিনেমার চিত্রগুলির মত তাহার কয়েকটি মাত্র ব্যবহার করিলেই সমস্ত চিন্তাধারাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এমন কি এই কল্পিত শব্দশ্রেণীটির ঐ অংশে একটি মাত্র ভাষার যে যে শব্দ গৃহীত হইয়াছিল কেবল সেই শব্দ কয়টির দ্বারাও চিন্তাটি প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এ ক্ষেত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য প্রত্যেক ভাষায় বিভিন্নার্থবাচক শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে একই চিন্তাধারা বিভিন্নার্থবাচক শব্দদ্বারা সূচিত হইতে পারে, এবং বাস্তবিক পক্ষেও একই চিন্তাধারা যখন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন প্রতিভাষায় তাহা ভিন্নার্থবাচক শব্দদ্বারাই সূচিত হইয়া থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ মনে রাখিতে হইবে যে প্রকাশ্যমান চিন্তা মূলতঃ সর্ব্বত্র অখণ্ড। ভাষার শব্দগুলি এই অখণ্ড চিন্তাধারার কয়েকটি মাত্র স্থানে আঘাত করিয়া তাহার গতিপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র।

চিন্তার অখণ্ডত্ব ও ভাষার এই সাঙ্কেতিকতা স্বীকার করিলে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না যে প্রতি চিন্তাধারার ভাষায় প্রকাশিত রূপটি ভাবভেদে বিভিন্ন হইবেই। কারণ উপরোক্ত প্রণালীতে একই চিন্তাধারা বিভিন্ন শব্দসমষ্টিদ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইলেও প্রতিভাষা প্রকাশ্যমান চিন্তাধারাটির কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে আঘাত করিয়া তাহাতে কিছু নূতনত্ব আনিয়া দিবে। একই বাক্য বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইলে তাহাতে যেমন বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা আসিয়া পড়ে সেইরূপ একই চিন্তা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইলেও তাহা বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হইয়া পড়িবে। অতএব স্বীকার করিতে

হইবে যে মূল ভাবটি না হউক ভাবের প্রকাশ্যমান রূপটি ভাষার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রভাবান্বিত হয়।

এ পর্য্যন্ত দেখানো হইল ভাষার আভ্যন্তরিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ কিরূপে ভাবও প্রভাবান্বিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে; কিন্তু এতদ্ভিন্নও ভাষার বাহ্য রূপের দ্বারা ভাববস্তু প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে সমধ্বনি বা assonanceএর সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। Aldous Huxley কোথায় একস্থলে বলিয়াছেন যে ফরাসী, ইটালিয়ান ও জার্ম্মান সাহিত্যে যে ভাবপ্রবণতার এত বাহুল্য দেখা যায় তাহার একটি প্রধান কারণ ঐ ভাষাগুলির অন্তর্গত কতকগুলি আকস্মিক সমধ্বনি। ইটালিয়ান ভাষায় amore ও dolore, ফরাসী ভাষায় amour ও douleur এবং জার্ম্মান ভাষায় Schmerz ও Herz-এর সমধ্বনি এই সকল ভাষার সাহিত্যে ভাবপ্রবণতার সূচনা করিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যের সৌভাগ্যবশতঃ ইংরাজি love-এর সহিত এক glove ছাড়া আর কোন শব্দের তাল মিল হয় না, তাই ইংরাজি সাহিত্য continental সাহিত্যের এই বিষময় ভাবপ্রবণতার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। Huxley অবশ্য পরিহাসচ্ছলেই এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথা একেবারেই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; কারণ অধ্যাপক Sutherland তাঁহার Medium of Poetry নামক পুস্তকে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন কিরূপে এই বাহ্য সমধ্বনি-দ্বারা কবিতার শুধু ভাষা নয় ভাব পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।

কাজেই বাহ্য ও অন্তরঙ্গ উভয়বিধ ক্ষেত্রেই ভাষা মূলতঃ ভাবের প্রতিবিম্ব হইয়াও তাহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে একমত। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদগণও যে এই মতের পূর্ণ পরিপোষকতা করিয়া থাকেন তাহা McDougall-এর এই দীর্ঘ উক্তিটি হইতেই প্রতীয়মান হইবে :—

"মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে চিরাচরিত শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতি কি ভাবে

সংক্রামিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ করা যদিও কঠিন, তবু মনের পরিপুষ্টি সাধনে তাহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত। এই সত্য আমাদের কাছে তখনই স্পষ্ট হইয়া উঠে, যখন মানুষের চরিত্রগঠনে ভাষার প্রভাব আমরা উপলব্ধি করি। শিশু যে কথাগুলি বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে শেখে, তাহার প্রত্যেকটিই সুদীর্ঘ সমাজ-ব্যবহারের ফল, তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে মানুষী অভিজ্ঞতা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। বস্তুবাচক বিশেষ্যগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রবহমাণ স্রোত হইতে গুটিকয়েক সুসীম রূপকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিশুর সম্মুখে আনে, এবং এই আকারগুলি ধ্রুব বস্তুসমূহের, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধি যে বস্তুগুলিকে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহার প্রতীক ও সঙ্কেত হইয়া উঠে। জাতিবাচক শব্দসমষ্টি সমশ্রেণীর বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের এবং ভিন্নধর্ম্মী বস্তুর বৈষম্য নির্দ্ধারণের সহায় হয়। ক্রিয়াপদগুলি কর্ম্মের সাধনপদ্ধতির বিবিধ প্রতিমানকে জ্ঞানগোচরে আনে; এবং দ্রব্য ও কার্য্যাবলীর তন্মাত্রকে নিষ্কর্ষিত করে বিশেষণ। প্রিপজিশন্ বা উপসর্গ দেশ ও কালের, কার্য্যকারণ ও পৌর্ব্বাপর্য্যের, সহযোগ ও বিয়োগের লোকসম্মত সম্বন্ধ ধার্য্য করে। এই সকল কৃত্রিম উপায়ে শিশুর নিরূপণ ও নিরীক্ষণ সুকর ও প্রখর হয়; এবং বাক্যের মধ্যে কন্‌জাংশন বা সংযোজক শব্দ তাহাকে যে জ্ঞানসম্ভারে অধিকারী করে, তাহা শিশুর স্বকীয় চেষ্টায় কোনমতেই আহৃত হইতে পারিত না।

উপরন্তু শব্দই যেহেতু তাহার কাছে বস্তু ও ঘটনার অবস্থা ও গুণের প্রতিরূপ, তাই শব্দের দ্বারাই বিচারকার্য্য সহজ হয় এবং বিচার-প্রসূত প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপটে প্রকট ও সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কাজেই ভাষা ব্যতীত যুক্তিপ্রকরণ অসম্ভব, কারণ যুক্তি আর কিছুই নহে, শুধু সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে পঁহুছিবার বহুলাভ পদ্ধতি।" (McDougall—Energies of Men, p. 110.)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

সঙ্গম ও বিরহ

'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গম স্তস্যাঃ'—কবি বলিলেন, সঙ্গম ও বিরহের তুলনায় বিরহই 'বরং', সঙ্গম নয়। উভয়ের মূলেই প্রেম—কিন্তু সঙ্গমে সম্ভোগ, বিরহে বিপ্রলম্ভ; তথাপি কবি কেন বলিলেন বিরহ শ্রেষ্ঠ? কবিরা 'ক্রান্তদর্শী'—প্রেমতত্ত্বজ্ঞ—রসিক—'রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'। জগতে রসিক সুদুর্লভ। রসিক কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে, কোটিতে গোটিক হয়।

সঙ্গম-বিরহ রসতত্ত্বের কথা—অতএব রসিকের নির্দ্ধারণ অবহেলার নয়। আর এক রসিক (কালিদাস) অমর তুলিকায় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সঙ্গম ও বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্রেও প্রণিধান করিলে সঙ্গমের অপেক্ষা বিরহের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হয়।

হিমালয়ের উপকণ্ঠে মালিনীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে শীলপট্টের উপর কিশলয় শয্যোপান্তে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সঙ্গম হইয়াছে। তৃষিত দুষ্মন্তের আকাঙ্ক্ষা—

অপরিক্ষত-কোমলস্য তাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি! গৃহ্যতে রসোঽস্য॥

অক্ষত কোমল তব সরস অধর
নবপুষ্প-রস যথা তৃষিত ভ্রমর—
মধুর উহার রস মৃদু করি পান
যাবৎ জুড়াই সখি! পিপাসিত প্রাণ।

ইহার পর উভয়ের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ এবং অচিরস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগ।

অকিটবালতরু পল্লব লোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।

প্রেয়সীর সেই বিম্বাধর
অম্লান তরুণতরুপল্লব-সমান
লোভনীয়—অহো! বারবার
রভোৎসবে করিলাম সন্তর্পণে পান।

তারপর? দুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলার নির্ম্মম প্রত্যাখ্যান এবং পরে অভিজ্ঞান দর্শনে লব্ধস্মৃতি দুষ্যন্তের তীব্র শকুন্তলা-বিরহ-বেদন।

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
রিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদ্ অতীতমেতে
মনোরথানাম্ অতট-প্রপাতাঃ॥

স্বপ্ন সে কি? মায়া সে কি? সে কি মতিভ্রম?
কিম্বা সুকৃতির মম অবসান ক্রম?
অতীত মিলন এবে দুরাশা কেবল
তুঙ্গ, হায়! মনোরথ-প্রপাতের স্থল!

বিরহতাপদগ্ধ দুষ্যন্ত—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।

রমণীয়ে দ্বেষ, পূর্ব্বমত প্রতিদিন
মন্ত্রিবর্গে না করে সম্ভাষ, শয্যাপ্রান্তে
বিবর্ত্তন করি যাপে বিনিদ্র রজনী—ইত্যাদি

আর শকুন্তলা? মারীচ ঋষির হেমকূট পর্ব্বতস্থ পুণ্যাশ্রমে নীতা বিরহিনী শকুন্তলার কি অবস্থা?

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।

পরিধানে ধূসর বসন, ব্রতাচারে শুষ্কমুখী
এক বেণী করিয়া ধারণ
শুদ্ধশীলা বর্ণিতা আমার—সুদীর্ঘ বিরহ ব্রত,
(নিষ্করুণ আমি)—মোর তরে করেন পালন।

এ সেই আশ্রম 'যাহার বৃহৎ শূন্যতাকে (বিরহিনী) শকুন্তলা আপনার বৃহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া' বাস করিতেছেন, 'সেখানে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ নীরব—কেবল বিশ্ববিরহিতা শকুন্তলার নিয়ম-সংযত, ধৈর্য্য-গম্ভীর, অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান'—(রবীন্দ্রনাথ)। ইহার উপর কবির মন্তব্য এই—পূর্ব্বাপরবিরোধী অপূর্ব্বঃ এষ বিরহ-মার্গঃ। ইহাকেই বলে বিরহ-রঙ্গের বিচিত্র তরঙ্গ।

প্রেমিক-প্রেমিকার এই সঙ্গম ও বিরহের একটা আধ্যাত্মিক দিক্ আছে। শুধু তাই নয়—এই প্রেম ভক্ত কর্তৃক ভগবানে অর্পিত হইতে পারে। 'মিষ্টিক'দিগের অনুভূতির আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সেই উপনিষদের প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভগবানকে প্রেমাস্পদ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন—তাঁহাদের কাছে তিনি দয়িত, বনিত, বামনী, পিতম্, মাশুক্। তিনি 'রসোবৈ সঃ—এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ'।

সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুল হার
তুমি অনন্ত চির বসন্ত, অন্তরে আমার! (রবীন্দ্রনাথ)

তাঁহাতে সঙ্গত হইলে ভক্ত পরানন্দ উপভোগ করে—রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। সে আনন্দ নন্দনাতীত—অকথ্য, অবর্ণ্য। সেই জন্য সখীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীরাধা বলেন—সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়?

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি এই যে প্রসক্তি—সুফিরা যাহাকে এসক্ বা আসনাই বলেন—এ দেশের রসিক ও য়ুরোপের মিষ্টিকদিগের পরিভাষায় যাহার নাম প্রেম বা Love—ঐ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য প্রতীক (Symbol)—প্রেয়স

ও প্রেয়সী, পিতম্ ও প্রিয়তমা, নাগর ও নাগরী, মাশুক ও আশেক, Bridegroom ও Bride।

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ * * স যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবমেব—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২১

I will draw near to Thee in silence, and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy *bride*; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms.—St John of the Cross

বংশীর আহ্বানে অভিসারিণী শ্রীরাধা 'পন্থবিজন ঘোর' অতিক্রম করিয়া সিক্ত বসনে কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইলেন—যে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ—

রচয়তি শয়নম্ সচকিতনয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্ (জয়দেব)

তখন শ্রীকৃষ্ণ—

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥

ইহার পর সঙ্গম—খৃষ্টানেরা যাহাকে 'Copula' বলেন।

অনুমানে বুঝহ রঙ্গ
যৈছন গোকুল নায়ক কোরই
নায়রী শয়ন বিভঙ্গ।
বামচরণ ভুজ আগোরহি পুন পুন
যাতই দক্ষিণ পাশ
তৈছন বচন কহই পুনঃ আঁখি মুদি
বচন রসায়ন হাস॥

Old Testamentএর Song of Solomonএ ভক্ত ও ভগবানের 'Copula' এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

Let Him kiss me with the kisses of his mouth
For thy love is better than wine.
Behold thou art fair, my beloved, yea, pleasant.

Also our bed is green; * *
His left hand is under my head,
And His right hand doth embrace me.
By night on my bed—I sought him
Whom my soul loveth:
I sought him, but I found Him not.
His left hand should be under my head,
And his right hand should embrace me.
I charge you, O daughters of Jerusalem,
That ye stir not up, nor awake
My love, until He please.

এই সঙ্গমকে খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা "the lovely dalliance of private conference" বলেন এবং তৎসম্পর্কে প্রেমিক-প্রেমিকার মানবীয় সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করেন।

In connection with it, the phrases of mutual love, of wooing and combat, awe and delight—the fevers of desire, the ecstasy of surrender are drawn upon.—Underhill's Mysticism. p. 161.

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

All things I then forgot,
My cheek on Him who for my wooing came
All ceased, and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies, and forgetting them.

—Enuna Noche Escura

সঙ্গম কি? 'It is the rapturous encounter with Love and supreme self-loss in the Naked Abyss!' সঙ্গমে সম্মিলন এবং মিলনের রভস (ecstasy)। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিলে এই সঙ্গমের পর বিরহ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে গুপ্তবৃন্দাবনের পর মাথুর। খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা এই বিরহকে 'Dark night of the Soul' বলেন। তখন প্রেয়সীর মনে হয় প্রিয়তম

তাহাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন—the anguish of the lover who has suddenly lost the Beloved। এইজন্য বিরহের নাম—'Divine Absence—the ecstasy of deprivation—Teressa যাহাকে 'pain of God' বলিয়াছেন। তখন ভক্ত প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট রিক্ততা অনুভব করে—'a profound emptiness, a period of destitution'। সে অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্টের কাতরোক্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হয়—'Father! Father! Why hast Thou forsaken me?' বসন্তপূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ উপভোগের পর অমানিশার ঘনান্ধকারের অনুভূতির ন্যায় সঙ্গমের পর বিরহ।

Thou didst begin, Oh my God, to withdraw Thyself from me; and the pain of Thy absence was the more bitter to me, because Thy presence had been so sweet to me, Thy love so strong in me.—Madame Guyon.

ভক্ত মিলনের প্রথমোচ্ছ্বাসে মনে করে চিরদিন বুঝি এই ভাবেই যাইবে, কিন্তু সে মরীচিকার অচিরেই অবসান হয়।

The soul believes that this temporary (fleeting) union will prove a perdurable consciousness of the Divine. Blind fool! The 'night of the Soul' is yet to come.—Underhill—p. 457

(In সঙ্গম), when 'basking in the sunbeams of the Uncreated Light' he forgets that he has not yet reached the 'Perfect Land'—is yet far removed from the true end of Being. So the Light withdraws Itself and the 'Dark Night of the Soul' sets in.—Ibid, p. 287.

মনোবিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে সঙ্গমের পর বিরহ (the great swing back into darkness) কেন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝা যায়। কারণ, 'affirmation has to be paid for by negation'। অতএব সঙ্গমের pleasure-affirmation স্বতঃই বিলুপ্ত হয় এবং বিরহের pain-negation তাহার স্থান অধিকার করে। This

'Divine Negation' the self must probe, combat and resolve। সেইজন্য খৃষ্টান মিষ্টিকেরা বলেন 'it (বিরহ) comes between the first mystic life or illuminative way and the second mystic life—the unitive way। অবশ্য বিরহের পরও মিলন আছে—সে মিলন মহামিলন। কিন্তু বিরহীর দৃষ্টিতে সে মহামিলন তখন সুদূরপরাহত। সে মহামিলনের কথা বর্ত্তমানে আলোচ্য নয়।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Pascal দৃশ্যতঃ শুষ্ক জ্ঞানবাদী ছিলেন—কিন্তু তাঁহার অন্তস্তলে একটি ভক্তিনির্ঝরিণী প্রবাহিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কোর্ত্তার সহিত সীবিত এক খণ্ড parchment পাওয়া যায় (a scrap of parchment was found sewn up in his doublet at his death)। ইহাকে প্যাস্কেলের 'মেমোরিয়াল' বলে। অতি স্বল্পাক্ষরে প্যাস্কেলের নিজের অন্তরে অনুভূত এই সঙ্গম ও বিরহের মর্ম্মচ্ছেদী বিবৃতি এইরূপ :—

'Joie! Joie! Joie! pleurs de Joie'—(Joy! Joy! Joy! tears and Joy), showing all-surpassing Joy, which accompanied his ecstatic apprehension of God. Then? Mon Dieu, me quitterez vous? He says again "Que je n'en sois pas séparé eternellement! "Are You going to leave me? Oh, let me not be separated from You for ever!"

বিরহে এইরূপই মনে হয় বটে। মনে হয় এ কাল রাত্রির বোধ হয় আর অবসান হইবে না। বুঝি নষ্টচন্দ্র আর হৃদয়াকাশে সমুদিত হইবেন না।

'The greatest affliction of the sorrowful soul in this state' says St. John of the Cross is the thought that God has abandoned it, of which it has no doubt,—the sense of being without God.'

বিরহে ভক্ত ভগবানকে অন্বেষণ করে কিন্তু তাঁহার পদচিহ্ন খুঁজিয়া পায় না—

—She seeks God and cannot find the least marks or footsteps of His presence.

God having shewn Himself has now deliberately withdrawn His Presence, never perhaps to manifest Himself again. 'He acts,'

says Eckhart, 'as if there were a wall erected between Himself and us ?

তখন কি মনে হয় ?

With Thee, a prison would be a rose garden, oh Thou, Ravisher of Hearts : With Thee Hell would be paradise, oh Thou Cheerer of souls'.—মৌলানা রূমি

তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত ভক্ত এক সুরে বলে—

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন। হা হা পদ্মলোচন!
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ সাগর!
হা হা শ্যামসুন্দর! হা হা পীতাম্বরধর!
হা হা রাসবিলাস নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই।

খৃষ্টীয় মিষ্টিকদিগের বিরহ-দশার লক্ষণ বিবৃত করিয়া Underhill লিখিয়াছেন,—

All these types of 'darkness' with their aacompanying and overwhelming sensation of impotence and distress are common in the lives of the mystics. We have seen them exhibited at length in Madame Guyon's writings.

Amongst innumerable examples, Suso and Rulman Merswin also experienced them : Tauler constantly refers to them : Angela of Foligno speaks of a "privation worse than hell." It is clear that even Mechthild of Magdeburg, that sunshiny saint, knew the sufferings of the loss and absence of God. "Lord, "she says in one place, "since Thou hast taken from me all that I had of Thee, yet of Thy grace leave me the gift which every dog has by nature : that of being true to Thee in my distress, when I am deprived of all consolation. This I desire more fervently than Thy heavenly kingdom !"

খৃষ্টীয় মিষ্টিকদিগের অনুভূতি নির্বিষ্টভাবে পাঠ করিলে, বিরহের অনেক কথাই জানা যায়, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, বৈষ্ণব ভাবুকেরা শ্রীরাধাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিরহের যে নিবিড় ও নিগূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, ইউরোপীয় Myticism এখনও তাহার সীমায়

পৌঁছিতে পারে নাই। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন বিরহের দশ দশা। যথা,

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু র্দশা দশ ॥—উজ্জ্বলনীলমণি

অর্থাৎ চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্বেগ, বিশীর্ণতা, মালিন্য, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—বিরহের এই দশ দশা। বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার এই দশ দশারই নিপুণ বর্ণনা আছে। পদকর্ত্তারা 'মহাজন'—ভগবানের চারণ—'Troubadours of God, minnie-singers of the Absolute'। তাঁহারা অনুভূতির চক্ষে যাহা দেখিতেন, তাহাই রচনা করিতেন। ঐ সকল পদের দুই একটি মাত্র এস্থানে উদ্ধৃত করিব।

শ্রীরাধা নবনী দশায় প্রায় উপনীত—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা—মুখে সদাই প্রলাপ—

ক নন্দকুলচন্দ্রমা ক শিখিচন্দ্রিকালংকৃতিঃ
ক মন্দমুরলীরবঃ ক সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি! জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিক্ বিধিম্॥

ধনী ভেল মুরছিত, হরিল গেয়ান
দশনে দশন লাগি মুদল নয়ান।

সখীরা কৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন :—

শ্যাম নামে চেতন পাই চারিদিকে চায়,
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়
তমালে দেখিয়া ধনী হইলা বিভোর
হা কৃষ্ণ! বলিয়ে তমালে দিল কোর।

আর একটি পদ—যখন শ্রীরাধা দশম দশায় উপনীত—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব!
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
কেন? কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পায়ব আমি পিয়া-দরশনে।

শ্রীরাধা হয়ত' ঐতিহাসিক নন—তিনি 'মহাভাবময়ী', সম্ভবতঃ ভাবুকের কল্পলোকের মানস-প্রতিমা। কিন্তু শ্রীচৈতন্য? ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলার রঙ্গভূমে তাঁহার সজীব বিরহনাটক ত' সর্ব্বজন সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল—তাঁহার ঐতিহাসিকতার বিষয়ে ত' সন্দেহ হইতে পারে না।

তাঁহার চরিতকার কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা শুনুন—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন্ দশা উঠে, স্থির নহে মনে॥

* *

অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য॥

* *

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥

* *

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান

* *

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর॥
"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজের নন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন॥

অতএব বিরহের দশ দশা কবিকল্পনা নয়।

আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুই বিরহের দশম বা চরম দশা। খৃষ্টান মিষ্টিকেরা ইহাকে 'mystic' death বলেন।

মাদাম্ গাইয়ন নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—

The nearer the soul drew to the state of death, the more her desolations were long and weary, her weaknesses increased, and also her joys became shorter, but purer and more intimate, until the time in which she fell into total privation.

আরাধিকা সেণ্ট টেরেসা এইরূপে আত্মবিরহের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—

The pain grows to such a degree of intensity that inspite of oneself one cries aloud. Moreover, the intense and painful concentration upon the Divine Absence, which takes place in this 'dark rapture', induces all the psycho-physical marks of ecstasy. Although this ecstasy last but a short time, the bones of the body seem to be disjointed by it. The pulse is as feeble as if one were at the point of death * * she is no longer the mistress of reason * * she burns with a consuming thirst and connot drink at the well which she desires.

এ বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নহে, চৈতন্যদেবের বিরহ দশার বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা প্রতীত হয়।

প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু॥
প্রতিরোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্‌গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক পৃথক নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥

* * *

পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম মাত্র আছে তাত॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির, আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বয়হে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনাধার॥
বৈবর্ণ্য, শঙ্খের প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হইল চমৎকার॥

এই সাত্ত্বিক অষ্ট বিকার কি কি ?

স্তম্ভঃ স্বেদোথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোথ বেপথুঃ
বৈবর্ণ্যম্ অশ্রুঃপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ—সাহিত্যদর্পণ ১১৬

অর্থাৎ স্তম্ভ (stupor), স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (tremor) বৈবর্ণ্য (pallor), অশ্রু (tears) এবং প্রলয় (মূর্চ্ছা, swooning)।

বিরহের উপযোগিতা (utility) কি ? কেন ভগবান্ ভক্তকে বিরহানলে দগ্ধ করেন ? বিরহের তাপে স্বর্ণের শ্যামিকা ক্ষালিত হইয়া বিশুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে বলিয়া। তত্ত্বদর্শী কবির ঠিক্‌ই বলিয়াছেন—

বিরহ-অগিন অন্দর জারে
তব পাওয়ে পদ পুরে।

In the dark night of the Soul comes Krishna to Radha.
—Vaswani

উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা 'দিব্যোন্মাদ' নাম
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান। —চরিতামৃত

খৃষ্টীয় মিষ্টিকদেরও ঐ কথা।

'In the midst of a psychic storm (বিরহ), mercenary love is for ever disestablished and the new state of Pure Love (অকৈতব প্রেম) is abruptly established in its place.

এ সম্পর্কে আরাধিকা সেণ্ট ক্যাথেরিনের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে।

'In order to raise the soul from imperfection' said the Voice of God to St. Catherine, 'I withdraw myself from her sentiment—which I do in order to humiliate her, and to cause her to seek me in truth. * * Though she perceives that I have withdrawn myself, she awaits with lovely faith the coming of the Holy Spirit, that is of Me, Who am the Fire of Love.

—ভগবদ্ বিরহ এমনই চমৎকারী। ভক্তের বিরহ (যাহার ভিত্তি প্রেম)—তাহার কথা ছাড়িয়া যদি মানব-মানবীর বিরহ (যাহার মূলে মুখ্যতঃ কাম) তৎপ্রতি চাহিয়া দেখি, তবে সেখানেও ঐ 'শোধন'-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিব। দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অহরহ অন্তরে দারুণ দাবদাহ এবং অশ্রুবর্ষণে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার ব্যর্থপ্রয়াস। ফলে ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

'লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। * * সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে, চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। * * অহরহ পরম বেদনার উত্তাপে শকুন্তলা রাজার হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বে কখনও যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। * * এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিলেন।'

সে যাহা হ'ক, আমরা মিষ্টিকদিগের কথায় ফিরিয়া যাই।

With mystics, the Dark Night is all directed towards the essential mystic act of utter self-surrender, that 'fiat voluntas tua' which marks the death of selfhood, in the interests of a new and deeper life — a complete self naughting, an utter acquiescence in the large and hidden purposes of the Divine Will—what Madame Guyon called 'holy indifference', —Underhill's Mysticism.

বিরহ ভাল না সঙ্গম ভাল? এ সম্পর্কে এখনও কাহারও সংশয় আছে কি? 'বরমিহ বিরহঃ'—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়। সেইজন্য সুফিরা বলেন সঙ্গম চাই না—চিরবিরহ দাও—

May I seek and ever seek
But may I never find!

The Sufis do not desire to be united to the Beloved. Why? Because they believe such a consummation would rob them of the ecstasy of endeavour and of constant questing.

ইহাকেই আর একজন মিষ্টিক 'Divine Discontent' বলিয়াছেন—'It keeps one alert and active,'—ইহাই বৈষ্ণব ভাবুকের 'ব্রজ'—সেখানে সঙ্গমের স্থিতি নয়—বিরহের অবিরাম গতি—'ব্রজ ব্রজ ব্রজ, চল চল চল'।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অভিসার

(ফরাসী থেকে)

সেবারে শীত চললো এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত, হিম-বরফের যেন আর ইয়ত্তা ছিলো না। তার পর হঠাৎ একদিন ভাঙন ধরলো। হপ্তাভোর দেখা গেলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ উত্তরের দিকে ছুটে চলেছে। বায়ুর গর্জ্জন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো, কিন্তু সে-হাওয়াকে লাগলো ঈষদুষ্ণ; মাটি গলতে আরম্ভ করলে, নিজেকে যেন এলিয়ে দিলে, কেমন একটা চিকণ সজলতা সারা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেললে। একদিন রাত্রে রগ টনটন ক'রে আমার ঘুম ভেঙে গেলো; বুঝলুম ঘরখানা একটা সূক্ষ্ম অথচ প্রগাঢ় গন্ধে পরিপ্লুত। ভোরবেলায় জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখলুম দেওয়ালের গোড়ায় গোড়ায় গুচ্ছ গুচ্ছ ভায়োলেট্ অন্ধকারের ডিম ফাটিয়ে ফুটে উঠেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আশ-পাশের ফুলগাছে সাদা গোলাপী, নানা রকমের রং ধরলো। মাঝে মাঝে আকাশ খালি ক'রে এমন গুমোট নামে যে নিঃশ্বাস নেবার উপায় থাকে না, আবার কখনো কখনো আকাশ ভরাট হয়ে আসে, বাগান থেকে বাড়ীতে ছুটে পালাবার সময় মেলে না, হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়।

একদিন গ্রামের নিচের পাহাড়তলী দিয়ে আসতে আসতে এই রকম একটা আচম্‌কা দুর্য্যোগে পড়লুম। কাছেই একটা পোড়ো যাঁতাকল ছিলো, তাতেই আমি আশ্রয় নিলুম। সে-বাড়িখানায় আগেও অনেক বার ঢুকেছি; তার আঁচড়কাটা দেওয়ালগুলোকে আমি ভালো ক'রেই চিনতুম, সেই কাঠ্‌কয়লায় লেখা মন্তব্য আর ছবিই ছিলো আশ-পাশের খবরের কাগজ। গ্রীষ্মকালে সেখানে বুনো পায়রার বকম্‌বকম্ আর বাবুই পাখীর কাঁচির মতো ডাক নদীর কলরবের সঙ্গে মিশে যেতো; এবং কাছাকাছি মাঠে গরু চরাতে এসে রাখালবধূরা তারি দেউড়িতে ব'সে করতো সেলাই।

সেদিনে নিচে না-থেকে, হাতের উপরে ভর দিয়ে আমি একেবারে চিলের ঘরে হাজির হলুম। দেখলুম ঘরটা প্রকাণ্ড হলেও ঝুপসি, মেঝের কাঠ জায়গায় জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। তবু কোনোকষ্টে দেওয়াল ধ'রে গিয়ে একটা শয্যাধারের উপরে বসলুম। পাশেই একটা জানলা বুনো গোলাপলতায় প্রায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে; কয়েক পা দূরে একটা মস্ত গর্ত্ত, তার মধ্যে দিয়ে নিচের ঘরটা নজরে আসে। সঙ্গে যে বইখানা এনেছিলুম, সেটা খুললুম। টালির উপরে বৃষ্টির দাপট চলেছে, ভিতরে ছাদ চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে—চমৎকার লাগতে লাগল; মনে হলো বর্ষণ যদি প্লাবনে পরিণত হয়, তাহলেও আপত্তি করবো না।

হঠাৎ নিচের থেকে একটা মৃদু আওয়াজ কানে এসে পৌঁছলো। গর্ত্তের উপর ঝুঁকে দেখলুম একটি লম্বা, ছিপছিপে মেয়ে ঘরে ঢুকে হাতের বাইসিকিলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলে, এবং আবার দরজা পর্য্যন্ত ফিরে গিয়ে একবার আড়চোখে আট-ঘাট দেখে নিলে। তারপর হাতখানাকে চোখের সামনে তুলে একদৃষ্টে কব্জির ঘড়িটার পানে চেয়ে রইলো। দমকা হাওয়া এসে তাকে যেন চাপড় মেরে গেলো, তবু প্রথমটা সে মুখ ঘোরালে না। তার পর হঠাৎ শিউরে উঠে সে তার থালি থেকে একখানা আরসি বার ক'রে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে এলোমেলো চুলের উপরে হাত বুলতে লাগলো। একটু বাদে সে স্কন্ধ-ভঙ্গি ক'রে ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে গেলো, এবং অবশেষে একটা কাঠের স্তূপের উপরে ওভারকোটটা পেতে হাঁটুর উপরে কনুই রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

তার মুখখানি সুন্দর, কোমল অথচ গম্ভীর, চাঁচাছোলা, পরিষ্কার; চোখ দুটি ডাগর কিন্তু সলজ্জ; ঠোঁট লম্বা হলেও পাৎলা। মুখ দেখে আন্দাজ করলুম তার বয়স হবে ত্রিশের কাছে। তার প্রতীক্ষার মধ্যে কেমন একটা আত্মসমাহিত ভাব ছিলো, তবু বোধ হলো অতি ছোটো-খাটো শব্দ ও সে কান পেতে শুনছে। দেখলুম তার শরীর কাঁপছে। সে দরজার দিকে যে-দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, তাতে লোভ যতখানি, সঙ্কোচ

ততোধিক। আবার আরসি বার ক'রে সেখানাকে সে তার মুখের সামনে নাড়তে লাগলো। তার অঙ্গভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা আড়ষ্টতা ছিলো, মনে হলো উৎকণ্ঠার তাড়নে সে যেন বিষিয়ে উঠছে। আলো যেন তার সইছিলো না, ক্রমশই সে ছায়ার দিকে স'রে যাচ্ছিলো, তার ঈষদ্ দীর্ঘ হাত পা, ঈষদ্ লম্বা মুখ, ঈষদ্ শুষ্ক চোখের পাতা ইত্যাদিকে সে যেন লুকতে চায়। কয়েক মিনিট এমনি ক'রেই কাটলো, তবু সে নিশ্চল, তবু সে ভিতর দিকেই তাকিয়ে রইলো, যেন তার প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা প্রকাশে সে ভয় পাচ্ছে, তেমন করলে হয়তো হতাশার সম্ভাবনা বাড়বে।

—যদি না ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তো কি বলেছি! কথাগুলো যে-গলা থেকে বেরুলো, সে-গলা বেশ খনখনে, কিন্তু কেমন যেন বেহায়া, কেমন যেন একঘেয়ে।·····মেয়েটি চমকে উঠে ফিরে চাইলে, তার মুখে হাসি দেখা দিলে, সে মাথা নেড়ে বললে—না। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন দারোগা। দস্তানা খুলে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে সে বললে:

—বলবে তো ঘুমোওনি? কিন্তু এখনো সারা শরীরে ঘোর রয়েছে।

সত্যিই তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে মেয়েটি নিশ্চল হয়ে বসেছিলো। দারোগাসাহেব তার দিকে ঝুঁকে বললে—আদর করবে না?

মেয়েটির হাত কাঁপতে লাগলো, তার দেহ এল নিবদ্ধ হয়ে। লোকটি তার সামনে বসলো।

—নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, আমি আসবো না, অ্যাঁ? কি করি বলো! একেই বলে চাকরী, শেষ মুহূর্ত্তে একখানা থান ইঁট এসে পড়লো: একটা চুরির তদন্ত। আমি ভেবেছিলুম আজ আর কোনোমতেই আসতে পারবো না। তাহলে চটতে তো?

মেয়েটি হেসে নিজের হাত বাড়িয়ে দিতে গেলো, কিন্তু কি ভেবে আবার গুটিয়ে নিলে।

—কিন্তু, বর্থা, আজকে তোমার জিভ জমে গেছে, দেখছি। বলো, অন্ততঃ একটা কিছু বলো। নাকি, আমি আসাতে একটুও খুসি

হওনি ? খুসি হওনি তো ? জবাব দাও, দোহাই জবাব দাও।

বর্থা মাথা নত ক'রে আস্তে আস্তে বললে :

—হাঁ, হয়েছি বৈকি।

—"হাঁ, হয়েছি বৈকি।" দেখো একবার "হাঁ, হয়েছি বৈকি" বলার রকম দেখো। মেয়ের মুখে যেন মাখম গলেনা। যাক, ঠাকরুণ আর একটু কাছে স'রে এসে বসুন। না ? হাঁ ? তবে আমাকেই কষ্ট করতে হবে ? বেশ, আমি লোক খুব ভালো, আমিই কষ্ট করছি।

দারোগা সাহেব তার কাছে ঘেঁসে বসে তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু মেয়েটি যেই তার সাথীর কাঁধে মাথা রাখতে গেলো, সে অমনি চেঁচিয়ে উঠল :

—আরে না, সাবধান। এইটাই আমার সেরা পোষাক। ওর ফলে কি হবে তা জানি ; একটি ঘণ্টা লাগবে পাউডার ঝাড়তে।

—কিন্তু, আমি তো পাউডার মাখিনি।

—না, না। আজকালকার সব মেয়ে পাউডার মাখে। আমাকে কি গাড়ল পেয়েছো ?

যেখানে বর্থা গাল রেখেছিলো, সে জায়গাটাকে দারোগা সাহেব বাদামী রঙের দস্তানা দিয়ে ঝাড়তে লাগলো।

—আমাদের আজকালকার উর্দ্দি যে আগের চেয়ে অনেক ভালো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ময়লাও হয় বড় তাড়াতাড়ি। আর আমাদের গরমের পোষাক দেখেছো ? হাল্‌কা, পাৎলা, ফিকে রঙের কাপড়ে তৈরি। কিন্তু আমি নিজে যে জিনিষটাকে বেশি পছন্দ করি সে হচ্ছে আমাদের চামড়ার পটি। আমি বলি একজোড়া ঝকঝকে পটির চেয়ে চমৎকার আর কিছুই নেই। তোমার তা মনে হয় না। জানো, অনেকে পুলিশে কাজ নেয় কেবল এই উর্দ্দির লোভে ?

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে ;

—আর এটা ? এটাকে কি বলে ?

—ওটা ? ওটা হচ্ছে কাঁধবন্ধ। ওইটেই তো হলো ওপরওয়ালার তক্‌মা, বুঝলেনা ? দেখছো ওটা পেটির সঙ্গে আঁটা থাকে, আবার পেছনে

গিয়ে পেটিতেই আটকায়।

—অস্বস্তি লাগেনা ?

—অস্বস্তি ? হাসালে। অস্বস্তি লাগবে কোন দুঃখে ? কি অদ্ভুত ধারণা ! আমি যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার কষ্ট হয় কিনা ওই···আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। বাপরে, স্পষ্ট কথা কখনো কইতে আছে, তাহলে যে রাংতা উঠে যাবে। একেই বলে স্ত্রীরত্ন ! তাঁরা প্রশ্ন করে যাবেন, কিন্তু যদি জবাব দিলে, ওরে, বাস্‌রে ! আহা, আমার নজ্জাবতী নতা !

—কিন্তু, চার্লস্, আমি তো একটি কথাও বলিনি।

—আমি তাহলে উজ্‌বুক ? জানো, যদিও আমার বয়স বেশি নয়, তবু তালিম নেওয়ার পালা ফুরিয়েছে।

—কিন্তু, চার্লস···

—কী চার্লস্ চার্লস্ করছো ? আমি ঠাণ্ডা মানুষ, তবু একটা সীমা আছে তো ? আমি এলুম মুখে রা নেই, যখন কথা ফুটলো, তখন মাথামুণ্ডু কি ব'কে গেলে, তা ভগবানই জানেন। চাও কি আমি বিদেয় হই ? তা ছাড়া···

দারোগা সাহেব ঘড়ি দেখলে।

—তাছাড়া, আর দেরি করা চলবে না।

—যাক, যাক ! দেখো, একবার কাণ্ডখানা দেখো, আবার কাঁদতে বসলো ! কি, হলো কি ? চুমু খাবে ? বেশ খাও। না ?

আমি দেখতে পেলুম মেয়েটি সজোরে হাত মুঠো ক'রে আছে নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে :

—ও, চার্লস্ এসেছি ব'লে, তোমায় দেখতে পেয়েছি ব'লে আমার এত আনন্দ হয়েছিলো।

—খুব ভালো ! এখনো তো আমায় দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু এ দেখাকে কাজে লাগাতে পারছো কই ? সত্যি বলছি, একটু দমে যেতে হচ্ছে। যাক, এসো ভাব ক'রে ফেলি। আমায় আদর করো, এইখানটিতে আর অনুগ্রহ করে পাউডার সম্বন্ধে সাবধান হও। এখন যে ভারি হাসি ? ধন্যি বুদ্ধি !·····আচ্ছা, বলো দিকি, সেই সেদিন থেকে

আজ অবধি কি ক'রে সময় কাটিয়েছো। সাবধান! সাবধান! একখানা গাড়ি আসছে!

তারা দুজনেই ছায়ার মধ্যে মিশিয়ে গেলো। ভিজে চাকার শব্দ কমলে পরে সে আবার বললে :

—সাবধানের বিনাশ নেই। আমার মতো লোকের নামে গুজব রটা মারাত্মক। কি যেন বলছিলুম? ও, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছিলুম, সেদিন থেকে কি করেছো... ··সেই যে সেদিন,—মনে আছে? যবে আমার ওখানে এসেছিলে? বলবে না?

—তোমায় ভেবেছি।

—এইটে শোনার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলুম। আমায়, শুধু আমায়, তাকে ভাবোনি?

—চার্ল্‌স্, তুমি কথা দিয়েছিলে.....

মনে হলো মেয়েটির গলার আওয়াজ অমুচ্চ এবং মিনতিময়।

—বেশ, বেশ। আমি চুপ করছি। মনে কোরোনা আমি হিংসুটে। মরার ওপর আবার হিংসে? অমন নীচ নই।

—আর তুমি, চার্ল্‌স্?

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি কি করেছো?

—ও! জানোই তো, টহল, খানাতল্লাসি, রিপোর্ট, এক কথায় চাকরি। মরার অবসর নেই।

—আমার কথা ভাবতেও একটু সময় পাওনা?

—ও! এই বলবার জন্যে এত ঘোরপ্যাঁচ। কিন্তু তোমার কথা নিশ্চয়ই ভেবেছি।

মনে হলো মেয়েটি যেন একটু ইতস্তত করছে। তারপর চোখ না-তুলেই সে ধীরে ধীরে বললে :

—আর সেই যে কড়ার করেছিলে, তার বিষয়ে কিছু ভাবতে পেরেছো?

—কি আবার কড়ার করলুম?

মেয়েটি লাল হয়ে গেলো।

—ও! চার্ল্‌স্, সে তো জানোই। তুমি যে বলেছিলে শীগ্‌গিরই, দু-এক দিনের মধ্যে বাবার কাছে কথা পাড়বে।

—বলছি কি পাড়বো না? কিন্তু বুঝছোই তো আমার মরবার সময় নেই। আর তাছাড়া দিনটা আমাকেই ধার্য্য করতে দাও। এ হচ্ছে মরদের কাজ, বুঝলে না?

বর্থা মাথা নেড়ে বললে—অবশ্য, অবশ্য।

দারোগা সাহেব উঠে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলো। তখনো বৃষ্টি অবিশ্রামে প'ড়ে যাচ্ছে।

—কী জঘন্য দিন।

মেয়েটি বললে :

—কটু কথা বলা অন্যায়, কেননা শীগ্‌গিরই গ্রীষ্মকাল সুরু হবে, মাঠে মাঠে আর লোক ধরবে না। তখন কি আর আমরা এখানে এমন ক'রে আসতে পারবো?

—বাঃ! কী দূরদৃষ্টি! কিন্তু তাহলেও দিনটা জঘন্যই।

দারোগা সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটির পাশে ফিরে এলো।

—আচ্ছা, বর্থা, বলো তো, আমায় যেদিন প্রথম দেখলে, সেদিন তোমার কি মনে হয়েছিলো? কিছু বলতে চাওনা? আমি কিন্তু স্পষ্টই দেখেছিলুম তোমার চাউনিতে কেমন একটা রসের ভাব রয়েছে।

—আর তুমি চার্ল্‌স্?

—ও! আমি, তোমায় দেখবামাত্রই আমি মনে মনে বললুম, "মেয়েটি সাধ্বী হলেও, সদাচারের জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছে।" সত্যি নয়? তাহলেও আমি কিন্তু এ-কথা ভাবিনি যে...। এতবার শুনেছিলুম যে তুমি জনমানবের সামনে আসোনা বাড়ির বার হও না, মুখে ওলপ দিয়ে থাকো। একেবারে যেন সতী সাবিত্রী! তাছাড়া সেই বাক্‌দানের গল্পটা। বারো বছর হলো মরে গেছে একজন লোকের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছিলো ব'লে অবিবাহিত থাকা, বিবাগী হয়ে যাওয়া, সে আবার কেমন? তাই মনে মনে বললুম, "এ-ভাব কখনো স্থায়ী

হতে পারে না। বেচারার নিশ্চয়ই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে"। ঠাট্টা নয়, বর্ষা, সত্যি তুমি তাকে এখনো ভালোবাসো নাকি? মরা মানুষকে কিছুতেই ভালোবাসা যায় না। জবাব দাও।

দারোগা সাহেব ঝুঁকে প'ড়ে বর্ষার হাত ধরলে।

—জবাব দাও, বলছি। লোকে বলে···

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অতি আস্তে আস্তে বললে:

—সে তো তোমায় আগেই বলেছি। আমি শপথ করেছিলুম যে তাকে কখনও ভুলবো না।

—শপথ করেছিলে; তার কোনো মানে নেই। কোন্ জিনিষটা ভুলতে চাওনি? তোমাদের বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিলো ব'লেই তো আর তোমরা···বুঝেছো তো কি বলছি? সে তো তুমি নিজেই আমায় বলেছো; আর তা না বললেও, আমি তো আর কচি খোকা নই। তবে? তবে তুমি কী আঁকড়ে ছিলে?

রুদ্ধ স্বরে, কম্পিত কণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলে:

—দোহাই চার্লস্, তোমার পায়ে পড়ছি আর কিছু বোলো না।

—না, তা হতে পারে না, আমাদের যদি বিয়ে হয়, তাহলে জানবার অধিকার আমার আছে। তুমি কিসে বাঁধা পড়েছিলে? তোমাদের মধ্যে যে আদর-টাদর চলেছিলো, তা স্বাভাবিক। তারপর চাঁদের আলো, রোমাঞ্চ, ইত্যাদি সে সমস্তও ছিলো। কিন্তু সে সব যার সঙ্গেই ঘটুক, তাতে কি আসে যায়···। আচ্ছা, সে ছেলে ভালো ছিলো, কি বলো? আমার চেয়েও ভালো? দেখো, জবাব দাও।

—চার্লস্।

—আমি জানতে চাই সে আমার চেয়ে ভালো ছিলো কি না।

আমি উত্তরটা শুনতে পেলুম না। কিন্তু দারোগা সাহেব হেসে বললে:

—সত্যি বলছি, আমার ভয় হচ্ছে। ও সমস্তই হচ্ছে খোকাখুকুর পুতুল খেলা। তোমার তা মনে হয় না? হ্যাঁ? অতি অবশ্য! কিন্তু আজো তাকে তুমি ভাবো?

—আর ভাবতে চাই না।

—আর ভাবতে চাও না। তার মানেই এখনো ভাবো?

—না।

—ও-না-এর পিছনে কোনো তাকৎ নেই। সত্যি বলো তুমি এখনো তার কথা ভাবো, হ্যাঁ কি না?

—খুব ভালো ক'রেই জানো যে না।

—আচ্ছা, আমায় যতটা ভালোবাসো, তাকেও ততখানি বাসতে?

—কিন্তু এ-দুটো যে এক জিনিষ নয়।

দারোগা সাহেব উঠে দাঁড়ালো; এবং কিছুক্ষণ ধ'রে তার চাপা দাঁতের মধ্যে দিয়ে শিস দেওয়ার আওয়াজ শোনা গেলো। তাকে আঘাত করেছে ব'লে কি মেয়েটি ভয় পেলে? সেও উঠে দাঁড়ালো, তার পর হঠাৎ অশ্রুবিগলিত হয়ে দারোগার বুকে লুটিয়ে পড়লো।

—চার্লস্, চার্লস্, তুমিই আমার সব।

দারোগা সাহেব বিব্রত হয়ে, তার চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

—যাক, যাক, আর ছেলেমানুষী করোনা। আর কেঁদোনা।

কিন্তু মেয়েটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে:

—আমায় ছেড়ে যেও না, দোহাই তোমার, আমায় ছেড়ে যেও না।

আমি শুনতে পেলুম মেয়েটির নিঃশ্বাসে ঘন ঘন যতি পড়ছে, দেখলুম তার দীর্ঘ দেহের কাঁপন থামছে না। লোকটি থেকে থেকে শুধু বলতে লাগলো:

—দেখো, দেখো, অমন অবুঝ হয়ো না।

বর্ষা ক্রমশ শান্ত হলো এবং মাথা ফিরিয়ে অন্ধকারে চোখ মুছে নিলে। অব্যাহতি পেয়ে লোকটি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিলো, কিন্তু তখনো শোনা যাচ্ছিলো, নর্দ্দমা দিয়ে জল বয়ে চলেছে। নির্ম্মুক্ত আকাশ থেকে উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মি এসে বাড়িখানাকে স্পর্শ করলে; আমার নাকে ভেসে এলো বুনো ঘাসের সৌগন্ধ। দূরে গাই ডাকতে লাগলো।

দারোগা সাহেব বললেন,—এবারে যেতেই হবে।

মেয়েটি এগিয়ে গেলো ; তার সমস্ত অঙ্গভঙ্গিতে কেমন যেন আড়ষ্টতা, নিঃশ্বাসে অসংযম ; তবু সে হাসলে চেষ্টা ক'রে, হাত ধ'রে নম্র স্বরে বললে—তোমার ক্ষমা চাইছি।

—বিলক্ষণ সে-সব আর ভেবো না। কিন্তু দেখো একবার, কাদা দেখো। কী জঘন্য দেশ।

—এ-দেশ তোমার ভালো লাগে না ?

—এই দেশ ? মোটেই না। তাড়াতাড়ি বদলি হলে বাঁচি। যদি আমায় বেজাস্ বা গ্রেনোব্‌-এ পাঠায়। হ্যাঁ, দেশের মতো দেশ বটে ; আশপাশের দৃশ্য যেন ছবি। আসল সহর তাকেই বলে, তার হালচাল এখানকার থেকে একদম আলাদা, বুঝলে না। সেখানে এই রকম কাদা ভেঙে চলতে হয় না, চারিদিকে শান বাঁধানো, আর তাছাড়া ট্রামও আছে। জংলীদের মতো বনবাস করতে হয় না সেখানে।

বর্থা বললে—গ্রেনোব্‌-এর কথা অনেক শুনেছি। আমার এক দূর সম্পর্কের বোন সেখানে থাকে, সে বলে সহরটি সত্যিই ভারি সুন্দর —আল্‌প্‌স্ পাহাড় আর প্রকাণ্ড নদী, বোধহয় আইসার। সেখানে থাকতে আমার খুব ভালো লাগবে।

লোকটি হাসতে হাসতে বললে :

—আর আমি ভেবেছিলুম তুমি নেহাৎ কুণো ; কিন্তু নতুন জায়গার নামে তো খুব মুখ ছুটেছে দেখছি।

মেয়েটি মাথা নীচু করে বললে :

—একলা যেতে চাইনা।

লোকটি আবার হেসে উঠলো, এবং কিছুক্ষণের জন্যে বর্থা তার দিকে চাইতে সাহস করলেনা।

—এবার কিন্তু আমায় সত্যিই যেতে হবে, বর্থা। আদর করবে ? এইখানে। আচ্ছা, আবার শীগ্‌গিরই দেখা হবে।

—কবে ?

—তোমায় জানাবো, ভয় পেয়োনা।

বর্থা দারোগার কাঁধবন্ধের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার ঘোর রঙের উর্দির উপরে আঙুল চালাতে চালাতে বললে :

—চার্ল্‌স্, ভুলে যাবেনা তো ?

—কি ?

—সে তো জানোই। বাবাকে বলা।

দারোগা সাহেব তুড়ি দিয়ে বললে :

—আঃ! আমার উপরে তোমার বিশ্বাস আছে না নেই ? জিনিষটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সে চলতে আরম্ভ করলে। মেয়েটিও তার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বললে :

—চার্ল্‌স্।

—অ্যাঁ ?

—আমার কথা একটু ভাববে ?

—দিব্যি করছি। আর তুমি ?

বর্থা একগাল হেসে বললে :

—ও! আমি···

জোড়া হাত বুকের উপরে রেখে, বর্থা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ দিয়ে তার অনুসরণ করলে ; এবং রাস্তার মোড়ে এসে দারোগা যখন অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখনো, মনে হলো, মেয়েটি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে, তার সঙ্গে চলেছে।

তারপর সে ঘরের ভিতর ঢুকে, অসংযত পদবিক্ষেপে গিয়ে তার পরিত্যক্ত আসনটিতে বসলো। তার সামনের দেওয়ালে একখানা অশ্লীল ছবি আঁকা ছিলো ; সেটাকে দেখে শিউরে উঠে সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলে। আমার মনে হলো তার ক্ষীণকণ্ঠে যেন কিসের নালিশ রয়েছে। অবশেষে সে বেরিয়ে গেলো।

গোলাপলতার আড়াল থেকে জানলা দিয়ে আমি দেখলুম, সে রাস্তায় এসে পড়লো। একটা নালার উপরে পথটা যেখানে কুঁজের মতো বেঁকে চলে গিয়েছিলো, সেখানে কতকগুলো পাথর জড় ক'রে একটা

প্রাচীর বানানো ছিলো। মেয়েটি সেইদিকে এগিয়ে সেই প্রাচীরের ধারে কিছুক্ষণ ঝুঁকে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলুম; এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ ভয়ে কেমন সিটিয়ে গেলো। তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম না বটে, কিন্তু তার হাত দুখানি যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, তা স্পষ্টই দেখলুম। খানিক পরে সে আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে কিছু কাল ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হলো তার মুখের উপরে সূর্য্যের স্পর্শ তাকে যেন অবসন্ন করে দিচ্ছে।

একটু বাদে মেয়েটি চলে গেলে পরে আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই পুলের দিকে চল্‌লুম। জলের কাছে একটা পাথরের উপরে গোটা-কয়েক সাপ জড়াজড়ি ক'রে নিঃস্পন্দ অবস্থায় রোদ পোয়াচ্ছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে মৃগনাভীর সৌরভ এসে ভিজে ঘাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেলো; এবং গাছ, মাঠ, এমন-কি সেই রাস্তা থেকেও ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো একটা হাল্‌কা উচ্ছ্বাস।

মার্সেল্ আরলাঁ

কবিতাগুচ্ছ

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে
হাঁড়ির মধ্যে,
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা ?
যত্ন করে নিলেম তুলে
গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয়তো কেবল
চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে ;
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার
মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার
ভোজন অন্তে,
বহুৎ তবু রইল বাকি মনটাতে,
এমনি করেই দেবতা পাঠান
ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল
যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই মুক্ষণেই।
রঙীন করে তাহার প্রাণের
উদয় অস্ত
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।

হেন গুমর নেইকো আমার,—
স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় ;
জানিনে তো কোন্ খেয়ালের
ক্রূর কটাক্ষে
কখন বজ্র হান্‌তে পারো অত্যাশায়।
দ্বিতীয় বার মিষ্ট হাতের
মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক্ বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক
তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন
না হয় কম্‌ল,
গাছ ম'রে যায়, থাকে তাহার টবটাতো।
জোয়ার বেলায় কানায় কানায়
যে জল জম্‌ল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটাতো।
অনেক হারাই তবু যা পাই,
জীবন যাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি ;
রইলো আশা, থাকবে ভরা
খুসির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি।
বল্‌বে তুমি, "বালাই, কেন
বক্‌চ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।"

বুঝি সেটা, সংশয় মোর
নেইক চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু
লিখনু অত্র,
বানিয়ে লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন
লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টুমি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রি

ধরণী ঘুমায়ে গেছে, ঘুমায়েছে বন উপবন,
ঘুমায়েছে নদ নদী, ঘুমায়েছে মরুভূপ্রান্তর,
অলস নিদ্রার মোহে স্তব্ধ হ'য়ে আছে চরাচর ;
চঞ্চলিত তরুশাখে কাঁদি মরে উতলা পবন।
এমন নিবিড় রাত্রি তারা ভরা নিঃসীম গগন,
এমন নিঃসঙ্গ ঘর অন্ধকার নিষ্কম্প নিথর,
একাকী জাগিয়া আছি কানে বাজে কানন-মর্ম্মর,
সাথে মোর জাগি আছে এ দেহের চঞ্চল যৌবন।
আমার বুকের স্বপ্নে রাঙায়েছি পৃথিবী আকাশ—
চোখের সম্মুখে মোর খুলে দেছি মন-বাতায়ন,
অজস্র কুসুম আনে বুকে মোর ফুলেলা প্লাবন,
আজি এ নিঃসঙ্গ রাতে কল্পনার ক্ষণ অবকাশ।
যামিনী ফুরায়ে গেলে ভেঙ্গে যাবে অলীক স্বপন,
সহস্র কর্ম্মের মাঝে জাগি রবে ব্যথার নিঃশ্বাস।

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

রাত্রির কবিতা

আজ আমি ডুবে যাবো, আজ আমি উবে যাবো,
আজ আমি তলাবো অতলে,
নিস্পন্দ রাত্রির তলে, নিঃসাড় বাঁধের জলে,
পাণ্ডুর বিমর্ষ জ্যোছনায় !
আমার অন্তিম ক্ষণ তুমি জানিবে না—
হয়ত এখন আছো শুভ্র লঘু দেহখানি
এলাইয়া বাতায়ন-পাশে,
আলুল অলক ব্যেপে, আরক্ত অধর ব্যেপে,
ব'য়ে যায় জ্যোৎস্নার শিহর,
বিলোল বাহুর ডোরে, গহন ঘুমের ঘোরে,
সোহাগ-আবেগে অচেতন !
হেথা এক ফোঁটা প্রাণ, ক্ষীণ প্রাণ-পরমাণু,
আলোড়িত অভিমান বেগে,
ফাটিয়া টুটিয়া পড়ে, দিগন্তে ছড়ায়ে পড়ে,
মহাশূন্যে নিঃশব্দে মিলায় ;
মুমূর্ষু তারার মতো, নিষ্প্রভ ফুলের মতো,
তোমার আঁখির অগোচরে !
নিয়েছি পেয়ালাখানি, মরণ পেয়ালাখানি,
তুলে নেছি ঠোঁটের কিনারে ;
একটি চুমুক শুধু, একটি শঙ্কিত চুমা—
একটি মুহূর্ত্ত শুধু বাকী !
কারো পরে রোষ নাই, কারো কোনো দোষ নাই,
আছে যাহা শুধু সে আমারি—
আপনার অনুরাগে, আপনারে ক্ষয় ক'রে,
নিজে আমি হ'য়েছি নিঃশেষ !
কোথা দূর বন হ'তে খ্যাপা বায়ু ব'য়ে অনে
অতর্কিত সুরভি-সঙ্কেত ;

কোথা পাখী ওঠে ডেকে, থেকে থেকে 'ওকে' 'ওকে',
ঘুমে ভরা পাতার আড়ালে—
ঝিল্ মিল্ করে জল, অগাধ অথৈ জল,
ঝিম্ ঝিম্ করে দেহ-মন,
আজ আমি ডুবে যাবো, আজ আমি উবে যাবো,
আজ আমি তলাবো অতলে !

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

মায়াবিনী

আমি ছিলুম ফাউষ্ট-এর মতো ; জ্ঞানার্জ্জনের প্রখরতাপে চিত্ত ছিল শুষ্ক রুক্ষ তীব্র, যেন চৈত্রশেষের মরুভূমি।

তাতে আমার অতৃপ্তি ছিল না, এগিয়ে চলার রুদ্রবেগেই পেয়েছিলুম আপন স্থিতি।

মধুর রসের আস্বাদ ? তাও পেয়েছি তির্য্যক্‌ভাবে, বুদ্ধি দিয়ে ; কেন-না সে-মাধুর্য্যের উৎসমূলে ছিল না কোনো শরীরিণী নারী ; ছিল একটা অ্যাবষ্ট্রাক্‌ট্ আইডিয়া, ইনটেলেকটুয়াল বিউটি, যাকে আমি ভজনা করেছি শেলীর মতো, শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে জীবনের হাটে মরণের সমাধিতে। মনে পড়ে কত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত অতন্দ্রিত কেটে গেছে তারি অতর্কিত আবির্ভাবের অধীর প্রতীক্ষায়।

কতদিন পথ চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে গাড়ী মোটরের তোড়-কে আবর্ত্তিত করেছি, তারি ক্ষণিক আভাসে বিমুগ্ধ হয়ে।

সহরের জন-স্রোত মনে হয়েছে ছায়াবাজী, কোন মায়াবিনী ভানুমতীর খেয়াল, লুকোচুরি খেলায় আমায় বিপর্য্যস্ত করায় যার কুটিল আনন্দ। তাকে আয়ত্ত করার ছিল না আমার কোন প্রয়োজন, তার অস্তিত্বের বিশ্বাসেই ছিল আমার অস্তিত্বের তাৎপর্য্য ॥

টিঁকলো না এ স্থিতি ; উঠলো ঝড়, কাল বৈশাখী, সুরু হোল প্রবৃত্তির
তাণ্ডব নর্ত্তন, এতদিনকার মূঢ় বঞ্চনার প্রতিরুদ্ধ প্রতিঘাত।
উবে গেল জ্ঞানস্পৃহা, আকাশমুখী অভীপ্সা ; মাটি, স্থূল কালো
মাটি, তখন আমার পায়ের তলার একমাত্র নির্ভর—দি ওনলি রিয়ালিটি।
মিশে গেলুম মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে ; ক্লেদাক্ত কর্দ্দমই
তখন পরমান্নের প্রতিভূ ॥
এমন সময় তুমি এলে—বর্ষার শ্যামল মেঘ।
জানি না কোন্ ডিপ্রেশনে তোমার জন্ম, কোন্ মনসুন তোমার সারথি,
কোন্ তুহিন রাজ্যে তোমার দেশ।
তুমি নুয়ে পড়লে আমার বুকের ওপর তোমার ভারাক্রান্ত বুক নিয়ে।
দেখতে পেলুম তোমার অন্তরের বিদ্যুৎ-দীপ্তি, তোমার চোখের
স্নেহ-সজলতা।
আমার সামীপ্যেই যেন তোমার গতি-অবসান ; তোমার আবেগবৈচিত্র্যের
নর্ম্ম-বিলাস চলবে আমাকে ঘিরেই।
এ মমত্ব-বোধ আমার জীবনে এই প্রথম, আমি মুগ্ধ হলুম।
বিশ্বাস জাগলো আমি বৃথা নই ; তোমার ধারা বর্ষণে আমার মাটিত্ব
পাবে উর্ব্বরতা, পাবে সৃষ্টিশক্তি, ফিরিয়ে দেবে বিধাতাকে তার
জন্মকালের ঋণ ॥
তখন ত বুঝতে পারিনি তুমি আমার সেই মায়াবিনী ছলতে
এসেছ নতুনরূপে।
মিটলো তোমার খেয়াল, থামলো তোমার দানের ধারা, কমলো
তোমার ভার, তোমার রং গেল বদলে, তোমার টানও গেল ভিন্নমুখে।
তুমি চলে গেলে যেন শরতের মেঘ, শ্বেতলঘুপক্ষ শূন্যচারী বলাকা,
উড়ে গেলে কে জানে কোন্ দিগন্তের পরপারে ॥
তবু ব্যর্থ হয়নি তোমার সংযোগ।
তুমি আমায় দিয়ে গিয়েছ প্রাণশক্তি, আর ঐকান্তিক সঙ্গমের প্রচ্ছন্ন
মাধুর্য্যের প্রসন্নতা, যার প্রকাশ—ক্ষেতের হলুদে, নদীর স্ফটিকে,
আকাশের নীলে।

তোমার অদর্শনে বিধাতার ঋণ শোধ করা সৃষ্টি-প্রেরণা আমি হারালুম ;
পেলুম কর্ম্মপ্রেরণা।
আমার জীবনে আর একটি মানুষ পেয়েছে পূর্ণ আশ্রয় ; তার ক্ষুধার
অন্ন তৃষ্ণার জল দুঃখের সান্ত্বনা ; তুলে নিয়েছি এই একটি অসহায়ের
সমস্ত ভার ; তাকে গড়ে তোলা আমার কামনার শেষ লক্ষ্য ; বিশ্বব্যাপ্ত
মানবার্ত্তির রহস্য-ঘন ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে আমার সক্রিয় প্রতিবাদ।
আমার বিশ্বাস পূর্ণ বিকশিত একটি মানুষ, সুগঠিত চাবীর মতো,
খুলে দিতে পারে সর্ব্বমানবের মুক্তিপথের রুদ্ধদ্বার।
তাই এর পূর্ণ বিকাশই আমার জীবনব্রত, এ সাধনায় আত্মবিলোপেই
আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা ॥
কিন্তু মায়াবিনী, এ আত্মবিলোপ যে ক্রমে আত্মহত্যা হয়ে উঠছে,
তোমার সংশ্লেষের অভাবে।
তোমার স্মৃতি যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, তোমার অদৃশ্য দূরত্ব যে আমার
সহ্য সীমার বাইরে যাচ্ছে।
ভাবছি বসে, আবার তোমার দেখা পাবো কবে।
তুমি কি আসবে না আমার জীবনোপান্তে, রাখবে না তোমার ইচ্ছাগতি
চরণদুটি আমার লুপ্তস্রোত প্রাণ-প্রবাহের শীতল-কোমল তুষার পুঞ্জে ?
না, আমায় খুঁজতে হবে তোমার মায়ার কাঠি, মৃত্যুর সূর্য্যচন্দ্র তারকাহীন
অন্ধতমসা পার হয়ে, জন্মান্তরের বসন্তাগমে নূতন কল্পলীলার সূচনায় ॥

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

বিয়োগান্ত

১

মেরু-শৈত্যের আবেশ লেগেছে প্রাণে
তোমার তনুর ছায়ে।
নির্ব্বান্ধব দিনের কণিকা
ভেসে যায় মেঘ পানে।

আহ্বান নেই,
নেই কোন মদিরতা,
তোমার তনুর ছায়ে।
মনে হয় মুছে ফেলি
প্রতি নিমিষের পরাজয়গুলি
জীবনের লিপি হতে।
একটি দিনের একটি না শোনা কথা,
মৃদু পরশের নেশা,
থাকুক অসীম নির্মেঘ নভ হয়ে
আমার কামনা-নীলে।
শুধু যেন মুছে ফেলি,
প্রতি নিমিষের মৃত্যু-কাহিনী
জীবনের লিপি হ'তে।

২

জীবনের চক্রপিষ্ট পথে,
কোলাহলের উন্নত শিখরে,
রইলে তুমি বসে।
নাম্‌লে না বিবর্ণ দিনের মাঝে
প্রতিদিনের অখ্যাত যাত্রায়,
রতিহীন রাত্রের নীরব আড়ালে
তোমার অভাবটা শীত-ঋতু,
দুরাশার কুয়াশায় ঢাকা।
তুমি-হারা তাপাতুর জীবন আমার
নিভে গেল, নিভে গেল আজ
কম্পমান হৃদয়ের শীতল দ্বিধায়।

তোমারই ত অকরুণ নির্ব্বাক দৃষ্টির নীচে
সোনালী নিমেষগুলি
মৃত্যু পেলো তিলে তিলে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

কাণ্ট্

স্থিতপ্রজ্ঞ হে মহাসন্ন্যাসী,
প্রতীচ্যের বিরূপাক্ষ সম
আপনার তপস্যার কেন্দ্রীভূত জ্ঞানাগ্নিশিখায়
শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা ভস্মশেষ করি,
রচিয়াছ যোগের বিভূতি ॥
চিত্তমানমন্দিরের সিদ্ধা সনে বসি
প্রসারিয়া অন্তর্দৃষ্টি তন্মাত্রিক আকাশের তলে,
দেখিয়াছ কুণ্ডলিত ঘূর্ণাবর্ত্ত স্রোতে
নীহারিকা-পুঞ্জ-মাঝে
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহমণ্ডলীর জন্মক্ষণ-রাশিচক্র ;
অঙ্কিত তাহাতে
সৃষ্টির অদৃষ্টলিপি সূক্ষ্মসমীকরণরেখায় ॥
তার পরে অগ্রগতি প্রাণের যাত্রায়
প্রত্যন্তজীবের সনে
মানব-দেহের
অস্থির সংস্থানসাম্যে
একসূত্র ধারাবাহিকতা
নৈরাত্ম্যশারীররাজ্যে প্রথম জানিয়াছিলে তুমি ॥
প্রস্তরিত পঞ্জরের সুগোপন তলে
বক্ষোমাঝে অনির্ব্বাণ চিতাবহ্নি জ্বালি,

আচম্বিতে বসুন্ধরা ধৈর্য্যহীন অসহ্য উচ্ছ্বাসে
জ্বালামুখী-রক্তধারা পান করে ছিন্নমস্তারূপে ;
তার সেই অন্তর্গূঢ় প্রলয়ের গুপ্ত অগ্নিলেখা
দেখিয়াছ ঈশাননয়নে ॥
তুষার-আসন হতে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
উচ্চারিলে আশীর্ব্বাণী তুমি,
সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতা-গুপ্তবীজমন্ত্রবলে
যেই ক্ষণে অকস্মাৎ
লুপ্ত হলো পৃথ্বী হতে গর্ব্বোদ্ধত রাজসিংহাসন,
বিপ্লবের পাঞ্চজন্য দিকে দিকে উঠিল ধ্বনিয়া,
লোকায়ত রক্তলেখা দেশ হতে দেশান্তরে
মুক্তিরূপে উঠিল ফুটিয়া,
সূর্য্যের উদয় হতে প্রতীচীর অস্তাচলে
চিতাগ্নির রক্তিম সন্ধ্যায় ॥
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত করি হে বিদ্রোহী
স্বতন্ত্র চিত্তের জয়ধ্বজা উড়াইলে তুমি ;
বিশুদ্ধ বুদ্ধির রথে বিজ্ঞানের ছায়াপথ বাহি
ত্রিদিবের সিংহদ্বারে হলে উপনীত ;
অন্বীক্ষাসায়কস্পর্শে রেণু রেণু হ'য়ে
নিরালম্ব শূন্যে মিলাইল
অলীক কল্পনাসৃষ্ট সোপাধিক ঈশ্বরের
নতশির মূঢ়প্রণতির অশ্রুসিক্ত লজ্জাপাদপীঠ ॥
আত্মার অমর প্রেত
মানবের আবর্জ্জিত চিত্তের মুকুরে
রচিয়াছে যুগে যুগে অশরীরী ছায়াময় রহস্যগুণ্ঠন,
অন্তরাল হতে তার অতীন্দ্রিয় মিথ্যা মায়াবিনী
অজানিত আকর্ষণে কতবার কৌতুক ইঙ্গিতে
ঘটায়েছে পথভ্রান্তি সুদূরের তীর্থযাত্রী যোগভ্রষ্ট মানব আত্মার ;

অবশেষে প্রমাজ্ঞানখড়্গাঘাতে তব
প্রেতলীলা চিরতরে সাঙ্গ হল তার ॥
তার পরে জগতের সমগ্র সত্তারে
দূর হতে দূরান্তরে অন্বেষণ করি
ক্রান্তানাকরথবর্ত্ম উত্তরিলে ধ্রুবজ্যোতির্লোকে ;
দিব্যদৃষ্টিতলে তব শূন্যে মিলাইল
অনন্ত-সান্তের ভিন্নবর্ণ আলো-ছায়া-মরীচিকা-রেখা ;
সংশয়ের অন্ধকারে নির্দ্দেশিলে নখচন্দ্র-আলোক-ইঙ্গিতে
বিশ্বের পরম তত্ত্ব নিরর্থক ভ্রান্তিমাত্র দেশকাল-প্রত্যয়-নেমিতে ॥
অন্তঃসংজ্ঞা প্রকৃতির তন্দ্রাবিষ্ট অন্ধকার হতে
মানবের শ্রেয়োবোধদ্বিজন্মসংস্কার
করিয়াছ প্রজ্ঞানের বোধিক্রমমূলে ;
সর্ব্বরাষ্ট্রস্বরাজ্যসিদ্ধির মহামন্ত্র উচ্চারিলে তুমি
শাশ্বতী শান্তির বাণী বাল্মীকির মুক্তি-অনুষ্টুপে ;
কিন্তু এ ক্ষণিকা পৃথ্বী আবর্ত্তিছে অস্থির সর্ব্বদা বিরোধের অক্ষদণ্ড পরে ;
তাই তুমি স্থাপিয়াছ ধ্যানযোগচিত্রকল্প তপস্যার মানস সন্তানে
শূন্যাকাশে নবসৃষ্ট অপ্রপঞ্চ সপ্তর্ষিমণ্ডলে ॥
তাই বুঝি প্রতিষ্ঠার ধ্রুবলোক হতে
মুক্তির অমোঘ দণ্ডে করিয়াছ কক্ষচ্যুত ভূতাবিষ্ট মূঢ় প্রকৃতিরে
শৃঙ্খলিত অভ্যাসের অচেতন বৃত্তরেখা হ'তে ;
আপন গতির বেগে মগ্নশৈলবাধাপথ বাহি
ছুটিয়াছে কালস্রোত ঘূর্ণাবর্ত্তে, মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করি
উত্তর প্রপঞ্চ তব মহাধ্যানরাজ্যের সন্ধানে ॥
হে নবীন মন্ত্রদ্রষ্টা, বিশ্বমাঝে অদ্বিতীয় তুমি,
ছিন্ন করি ধ্যানযোগে প্রবৃত্তির অন্ধ যবনিকা
লভিয়াছ সুদুর্জ্ঞেয় রহস্যের অব্যর্থ সন্ধান
অতীন্দ্রিয় তৃতীয় নয়নে।
তব মন্ত্রে নবজন্ম লভি, হেরিলাম নূতন জগতে

দূরে আরো বহুদূরে
মনোবুদ্ধিঅস্মিতার দৃষ্টিসীমা যেথায় মিলায়ে যায় মহাশূন্যতলে
মুক্তিতীর্থযাত্রাপথে,
অর্দ্ধ পরিচিত ধরিত্রীর বিদেহ আত্মার আলোকিত ঊর্দ্ধগতিরেখা।
পশিল শ্রবণে স্বপ্নে যেন স্তব্ধ অন্ধকারে,
তৃণাঞ্চিত পৃথিবীর ধূলিকণা, বনস্পতি, গন্ধাঞ্চল অরণ্যশ্রী,
সপ্তসিন্ধু, মানবের জন্মজন্মান্তর
গাহিতেছে সমস্বরে নিখিলের মধুচ্ছন্দা মুক্তির সঙ্গীত॥
তাহাদের নৃত্যচ্ছন্দে ঊর্দ্ধলোক হতে
চমকিত জ্যোতিঃপদরেণু বিচ্ছুরিত তারকার রূপে
অকস্মাৎ পড়িল ঝরিয়া;
সুন্দর নয়নপাতে আনন্দিত মহান শ্রদ্ধায়
শাশ্বত তারকাধূলি শুভাশিস নতশিরে করিল গ্রহণ,
নিঃশব্দ চরণপাতে চলিয়াছে যবে
স্থিরলক্ষ্য যাত্রাপথে রাত্রিবধূ টানি তার কৃষ্ণাবগুণ্ঠন,
আদিহীন বিস্তৃষ্টির আত্মজিজ্ঞাসার অতীত স্মরণ-রেখা
নিরুত্তরে ফেলিয়া পশ্চাতে,
জানাইতে যাত্রাশেষে শিশিরচন্দনস্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রণতি তাহার
ধ্রুবলোক-ধ্যানবেদীমূলে।
মহামৌন আশীর্ব্বাদে সুনমিতা সর্ব্বরীর শিরে
নক্ষত্রখচিত মুক্তির মুকুটদীপ্তি ঝলমল্ করিল আকাশে;
সেই দৃশ্যে কণ্টকিত পৃথিবীর অপলক দৃষ্টিপাতক্ষণ
চিরন্তন রূপ নিল যুগে যুগে মানবের অম্লান বিস্ময়ে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

পুস্তক পরিচয়

শেষ সপ্তক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)

শেষ সপ্তক রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার বই এবং তাঁর গদ্য কবিতা পর্য্যায়ের এটি তৃতীয় বই। প্রথম দু'খানি বইয়ে কবি যে আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ ক'রেছিলেন, বর্ত্তমান বইয়ে তা পূর্ণতা লাভ ক'রেছে মনে করাই সঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত ছন্দোবদ্ধ ও মিলকে পরিহার ক'রে গদ্যে কবিতা লেখার হেতু কি তা নিয়ে অনেক পাঠকের মনেই হয়ত প্রশ্ন আছে—রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধে সাধারণকে মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ে কতকটা অবহিত ক'রেছেন। তিনি নিজে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং সাহিত্য পরিষদে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রেও দেখিয়েছেন যে তথাকথিত ছন্দ এবং মিল না থাকলেও, এই গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে একটা সমাহিত অথচ মুক্ত সুরের আমেজ আছে, যা একটু তৈরি কান থাকলেই ধ'রতে পারা যায়। এ কথা সত্য হ'লেও অবশ্য ছন্দচাতুর্য্য কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হ'য়ে পড়ে না—আবার গদ্যে কবিতা লেখার বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না তা থেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি ওয়াল্ট্ হুইটম্যান্ তাঁর Leaves of Grass কাব্যে ছন্দকে পরিহার ক'রে সোজা গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। হুইট্ম্যানের কাব্যে লালিত্য, মাধুর্য্য বা সৌকুমার্য্য সৃষ্টির কোন আবশ্যক হয় নি—তিনি রসশিল্পী নন্—সংসার সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, অন্যায় অসত্য প্রভৃতির সঙ্ঘাত সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সব সুতীব্র অনুভূতি জেগেছিল, যে সমস্ত মতবাদ জন্ম লাভ ক'রেছিল, তাই তিনি লিপিবদ্ধ ক'রেছেন—শিল্পের দৃষ্টিতে তাদের রূপায়িত বা রসায়িত করেন নি। কাজেই তাঁর পক্ষে এই টেক্‌নিক্ খুব উপযোগীই হ'য়েছিল। তাঁর সমসাময়িক রুষ কথা-সাহিত্যিক টুর্গেনিভ Poems in Prose নামক বই লেখেন। এই বইয়ের কবিতাগুলিও একটু নূতন ধরণের—একটি কুকুর, কি একটি রিক্সাওয়ালা, কি দুটি বোন বা এই শ্রেণীর ছোট ছোট ছবি ও তাদের আনুষঙ্গিক ছোট ছোট সুখ দুঃখ, প্রীতি প্রেমের ইঙ্গিতকে কেন্দ্র ক'রে এই কবিতাগুলির সৃষ্টি। এরা যেন এক একটি ছোট গল্পের চালচিত্র। এ রকম কবিতার পক্ষেও গদ্যই প্রশস্ত টেক্‌নিক্।

কিন্তু হুইট্ম্যান্ বা টুর্গেনিভের ধারা রসাত্মক লিরিকের পক্ষে কতটা উপযোগী তা বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ধারা কিন্তু এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে তিনি যে রীতি অবলম্বন ক'রেছিলেন, এত কাল পরে বাংলাতে তিনি কতকটা সেই রীতিরই অনুসরণ ক'রেছেন মনে করা যেতে পারে। ইংরাজী গীতাঞ্জলির ধরণটা আবার Book of Psalms থেকে নেয়া কি না, সে গবেষণা বর্ত্তমান আলোচনার

পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ এ বিষয়ে টম্‌সন্ সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই মতদ্বৈধ আছে শুনেছি।

ছন্দ ও তান লয়ের ওজন বাঁচিয়ে, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের জড়োয়া গহনার ভারে, কবিতা যে সহজ ভাবে চ'লতে পারে না, তার স্বাভাবিক গতি যে কতকটা পঙ্গু হয় এবং অন্তরের স্বতঃ উৎসরিত আনন্দটি যে অনেকটা কৃত্রিম হ'য়ে পড়ে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই এই লৌকিক স্তরের সুলভ কল-গুঞ্জনকে পরিত্যাগ ক'রে কবিতার মধ্যে যদি বলিষ্ঠতর, নূতনতর গতির বেগ সঞ্চারিত করা যায়, তা হ'লে যে এই শব্দগত music-এর পরিবর্ত্তে প্রাণগত বৃহত্তর music-এর স্ফূর্ত্তি হবার সুযোগ হয়—এ কথাও পরীক্ষিত হ'য়েছে কার্ল স্যাণ্ডবার্গ ও ভি এইচ্ লরেন্সের হাতে। কবিচিত্তের অত্যুগ্র ভাবাবেশকে সৌখীন শব্দ-লালিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে তাকে তাল মাত্রার বাঁধাপথে হাঁটাতে গেলে কাব্যের প্রাণ-বস্তু ক্ষুণ্ণ হয় ব'লেই বিংশ শতাব্দীর কবি কাব্যের অপরূপ দেহসৌষ্ঠব চাইলেন না, তিনি চাইলেন তার প্রাণ-সম্পদের প্রাচুর্য্য। তাই বন্ধাহীন গদ্য কবিতাই হ'ল বিশেষ ক'রে এ যুগের কবিতা।

ধরা যাক্ শেষ সপ্তকের এই অংশটি—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায় সুদূরে ;
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলি
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমায় পরপারে দেয় পাঠিয়ে। (পৃঃ ৮৩)

এই কবিতাকে যদি ছন্দোবদ্ধে বাঁধা হ'ত (সে বলাকার ছন্দই হ'ক্ না কেন) তা হ'লে ঔৎসুক্য, মুহূর্ত্ত, অবলুপ্ত, লোকান্তর, চক্ষু, নিষ্কারণ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর বহুল এবং আপাতদৃষ্টিতে রূঢ় শব্দগুলিকে (পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ক'রতে হ'লে) হয় যথা সম্ভব মোলায়েম ক'রতে হ'ত, না হয় এদের ভারসাম্য রক্ষা ক'রতে প্রত্যেকটি চরণ ওজন ক'রতে হ'ত। তা ছাড়া প্রাণের কথা-গুলিরও এমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হ'ত কি না সন্দেহ। এই যে কৃত্রিমতা এর বিরুদ্ধেই কবির প্রধান আপত্তি।

ইংরাজী থেকেও একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক্—

Then must I not talk? Must I remain silent, with lips sealed in your burning kisses and look vacantly at the eyes that betray no passion, no yearning—but a dull desire floating drearily, like clouds hanging along a projecting precipice?—

এর সঙ্গে সুইন্‌বার্ণের Why should you not let me speak, Oh the longing for a word প্রভৃতি লাইনগুলির তুলনা ক'রলেই তফাৎটা কোথায় তা ধরা প'ড়বে।

বিংশশতাব্দীর কবিরা ব'লছেন এই তফাৎ থাক্‌বার কোন অর্থ হয় না। এ ছাড়া কাব্যের যে একটা বিশেষ ভাষা আছে, কতকগুলি বিশেষ ম্যানারিজ্‌ম্ আছে, সেগুলিরই বা কি সার্থকতা? আমরা যে ভাষায় কথা বলি, ভাবি চিন্তায়, কাব্যের ভাষা তা থেকে পৃথক হবে কেন? তা যেখানেই হয়, সেখানেই রচনা হ'য়ে পড়ে আড়ষ্ট, কাব্যের এলাকা হয় সীমাবদ্ধ। এই কথা আরো বেশী ক'রে খাটে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে—বাংলা কাব্যে প্রচলিত অসংখ্য নাম ধাতু, অব্যয় ও সর্ব্বনামের ছড়াছড়ি র'য়েছে, যা গন্ধে কদাচ চলে না; এ ছাড়া কাব্যের গঠনে এমন একটা বিশেষ ধরণ আছে, যার ফলে কেবল কান্তপদাবলীই বাংলা ভাষায় বাগিয়ে লেখা চলে। কিন্তু এই যুক্তির পেছুনে যে কথাটা আছে সেটা আগে প্রণিধান করার যোগ্য। কাব্যের পক্ষে বিষয়-বস্তুটা চিরদিনই উপলক্ষ ব'লে গণ্য হ'য়েছে, অথচ প্রচ্ছন্নভাবে তার ভেতর কাজ ক'রেছে সৌন্দর্য্য ও শিষ্টতার আভিজাত্য—কাজেই তার প্রকাশ-ভঙ্গীও হ'য়েছে তার অনুরূপ। এখন যদি প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে গদ্যাত্মকতা প্রবেশ করানো হয় (সে গদ্য যতই সুরেলা হ'ক্) তা হ'লে তার বিষয়-বস্তু বা দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—নচেৎ কাব্যের দেহে ও প্রাণে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটবে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে যা বলা যায় না বা যায় নি তাই বলার উদ্দেশ্যেই ছন্দ-মুক্ত কবিতা লেখার সূত্রপাত হ'ল। এবং এদিক থেকেই এর সার্থকতা।

কিন্তু শেষ সপ্তকের কবিচিত্তধারা রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত চিত্তধারা থেকে স্বতন্ত্র নয়। শুধু ছন্দের মিল ও ধ্বনিসাম্য বর্জ্জন ছাড়া আর সব দিক দিয়েই এ কবিতাগুলি কবির পরিণত জীবনের কাব্যগুলির (পূরবী, মহুয়া, বনবাণী) সম-গোত্রীয়। যেমন—

তারা কোন্ প্রথম প্রত্যূষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে বেরোলো,
অসংখ্য পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে। (পৃঃ ১৭)

এই শ্রেণীর কবিতার মিল জুগিয়ে দেওয়া কত সহজ। যতি-সংস্থান এবং মাত্রা-বিভাগ ত প্রায় তৈরিই আছে। আর প্রাণ-বস্তুর দিক থেকেও এরা খাঁটি রবীন্দ্র-পন্থী। তাই শেষ সপ্তকের কোন কোন স্থলে টেক্‌নিক্ যেন তার বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে মনে হয়। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে আমরা মতবাদের তূর্য্যধ্বনি ও শানিত উক্তির অসি-সঞ্চালন দেখেই সন্তুষ্ট। কিন্তু শেষ সপ্তক যে কলালক্ষ্মীর নৃত্যের আসর—এখানে নূপুরনিক্কণ ত বাহুল্য মনে হবার কোন কারণ নেই। তবে এখানেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা, কারণ তিনি নিজেই ব'লেছেন—

তারপর দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;
নির্জ্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়। (পৃঃ ১৫৯)

এবং এও বরাবরই দেখা গেছে তিনি যে ধারার প্রবর্ত্তন করেন, তিনি নিজেই তার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা সাধন করেন, অপরে করে তার অনুকরণ।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Anti-Duhring—By Friedrich Engels; Translated by Emile Burns. (Martin Lawrence).

সাম্যবাদী বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে মতবৈচিত্র্যের অভাব নেই, কিন্তু যে আন্দোলন ১৮৪৮ সাল হ'তে একদিকে আশা ও অন্যদিকে আশঙ্কার সৃষ্টি করে' আস্‌ছে, তার সঙ্গে সর্ব্বোপরি দুই মহাত্মার নাম সংশ্লিষ্ট আছে, মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্। উভয়ে প্রায় একই সময়ে, একই ভাব-স্রোতের মধ্য দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন; উভয়ে প্রথম হেগেল্ ও পরে ফয়েরবাখের (Feuerbach) প্রভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন; পরে উভয়েই স্বাধীনভাবে সাধারণস্বত্ববাদ (Communism) গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় ১৮৪৪ সালে; ও তা'র পর হ'তে তাঁদের মধ্যে যে আজীবন সাহচর্য্য ও সহকারিতা সংস্থাপিত হয়, তা অনবদ্য। পিতার ব্যবসায়োপদেশে এঙ্গেল্‌স্‌কে বহুদিন ম্যাঞ্চেষ্টারে থাক্‌তে হ'য়েছিল; সুতরাং তৎকালীন যান্ত্রিক সভ্যতার যেখানে পরাকাষ্ঠা, সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। বাস্তব জীবনের অকুণ্ঠিত বর্ণনা দিয়ে মার্ক্‌স্ যে তাঁর সিদ্ধান্তকে এত শক্তিমান্ করেছেন, দৃঢ় ভিত্তির ওপর বসাতে পেরেছেন, সেজন্য তিনি বিশেষ ঋণী ছিলেন এঙ্গেল্‌সের কাছে। যে ধরণের সাধারণ তথ্য, জীবনের প্রকৃত ঘটনার যেরূপ বিশ্লেষণ, মার্ক্‌সের মতবাদকে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূলমন্ত্র করেছে, সেদিকে এঙ্গেল্‌স্‌ই তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁদের সহযোগিতার প্রকৃষ্ট ফল হ'চ্ছে 'সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তাহার' (Communist Manifesto); ভাষার ভঙ্গীতে, তেজস্বিতায়, স্বল্পপরিসরে যুগান্তরকারী মতবাদ প্রকাশের ক্ষমতায়, এই ইস্তাহার অতুলনীয়। এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্‌সের বিরাট প্রতিভার প্রতি এমনই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে তাঁদের দু'জনের সহকারিতায় নিজের অংশীদারী সম্বন্ধে ঘুর্ণাক্ষরে সামান্য মাত্র গর্ব্ব করেন নি। আমরা এখন জানি যে তিনি শুধু অর্থ ও স্নেহ দিয়ে প্রবাসী মার্ক্‌স্‌কে আজীবন সাহায্য করেন নি; চিন্তা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে গুরুর অবদানকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন।

মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ সাম্যবাদকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিলেন, প্রাকৃত ভিত্তির ওপর স্থাপনা করলেন। তাঁদের আগে সাম্যবাদের যে প্রচলন ছিল, তাতে ছিল করুণার, সহানুভূতির, পরোপচিকীর্ষার, ন্যায়রাজ্য কল্পনার বাহুল্য। জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল অতি অল্প। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অকলঙ্ক জীবনের কাল্পনিক চিত্র এঁকে', স্বয়ংসিদ্ধ প্রাকৃতিক বিধির (Natural Law) আলোচনা করে', আদিম খ্রীষ্টানদের সমাজশাসন, মানুষের স্বভাবজ অনুকম্পা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ইত্যাদির কথা বলে' সাম্যবাদের প্রচারচেষ্টা হ'ত। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ আকাশকুসুম রচনাকে

কবর দিলেন; সাম্যবাদকে কল্পনার রাজ্য থেকে নামিয়ে মানবজীবনের সাধারণ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে দিলেন। তা'র ফলে দেখা গেল, সাম্যবাদ এই পৃথিবীর মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে আন্দোলনের নক্সা করা যাবে, সাফল্যের নিশ্চিততা সম্বন্ধে সন্দেহ থাক্‌বে না। তাই যে proletariat আগে ছিল সকলের করুণার পাত্র, রাজনীতিক্ষেত্রে Cinderella, সে এখন রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রাচীন সমাজ ভেঙে নূতনের প্রতিষ্ঠায় অনলস উদ্যোগী। পূর্ব্বে যে মতবাদ ছিল নিদেশক (dogmatic), সর্ব্বদাই নিজেকে চিরন্তন অবিসংবাদী সত্য বলে প্রচার করত, তাকে আজ স্বতন্ত্রাধিকার হ'তে সমানাধিকার যুগ প্রবর্ত্তনের প্রকৃষ্টতম শক্তি বলা হ'চ্ছে। সে শক্তি যে শ্রেণীর মধ্যে মূর্ত্ত হ'বে, সেই শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পূর্ব্বতন সাম্যবাদের কোন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল না। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ শ্রমিকশ্রেণী ও সাম্যবাদকে দেহ ও আত্মার মত একত্র ক'রে দিয়েছেন।

সাম্যবাদের সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় কম, তাঁদের কাছে আলোচ্য বইখানার নাম অদ্ভুত ঠেক্‌বে। ড্যারিঙের লেখা আজ প্রায় অপরিজ্ঞাত; এঙ্গেল্‌স্ তাঁর মত খণ্ডন না করলে বড় কেউ তাঁর নাম মনে রাখ্‌ত না। আত্মার অবিনশ্বরত্বে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁরা বল্‌বেন যে স্বর্গে গিয়েও (ড্যারিং স্বর্গেই গেছেন, ধরে নেওয়া উচিত), ড্যারিঙের সুখ নেই; তাঁর বহুযত্নগঠিত চিন্তাপ্রণালী অবজ্ঞেয় অবস্থায় র'য়ে গেল। ড্যারিঙের অহমিকা ছিল বিপুল; নিজেকে একমাত্র যথার্থ দার্শনিক বলে প্রচার করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি—তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তো বটেই, ভবিষ্যতে যতদূর দেখা যায় ("foreseeable future"), তার মধ্যেও নিজের তুলনা তিনি নিজেই ছিলেন। এঙ্গেল্‌স্ তাঁর তিনখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—"Course of Philosophy", "Course of Political and Social Economy", আর "Critical History of Political Economy and Socialism"। এই বইগুলোতে তিনি প্রচার করেছেন যে তাঁর মতই শেষ, চরম সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে অবশ্য অনেকেই ভেবেছেন যে তাঁদের সঙ্গে মতভেদের অর্থ সত্য হ'তে বিচ্যুতি; কিন্তু 'খোশ্ মেজাজে, বহাল তবিয়তে' আত্মোৎকর্ষ সম্বন্ধে এরূপ খোলাখুলি বক্তৃতার উদাহরণ অতি অল্পই মিল্‌বে।

ড্যারিং ১৮৭৫ সালে হঠাৎ তাঁর সাম্যবাদ গ্রহণের সংবাদ যথাসম্ভব আড়ম্বর করে' জানিয়েছিলেন। তখন তিনি বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। পূর্ব্বাচার্য্যদের নিন্দায় তিনি হ'লেন শতমুখ—লাইব্‌নিৎস্, কাণ্ট্, শেলিং, হেগেল্, কেউই বাদ গেলেন না। ফুরিয়ে, স্যাঁ-সিম্, ওয়েন প্রভৃতি সাম্যবাদীকে তিনি গ্রাহ্যই করতে রাজী হ'লেন না; লাসাল ও বিশেষ করে মার্ক্‌সের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিদ্রূপ করতে তাঁর লেখনী অসম্বৃত হ'য়ে পড়েছিল। জার্ম্মাণীতে তখন সাম্যবাদীদের দুই দলে মিলন ঘটেছে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধোদ্যোগ পুরো মাত্রায় চলেছে। এমন সময় ড্যারিঙের সাম্যবাদী নাম নিয়ে একটা বিশেষ মতের প্রচলন আর স্বতন্ত্র এক দলসৃষ্টির চেষ্টা জার্ম্মাণীর শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হ'বে বলে এঙ্গেল্‌স্ লেখনীধারণ করেন। প্রথমে তাঁর লেখা সাম্যবাদীদের মুখপত্র Vorwartsএ বেরিয়েছিল; পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

ড্যারিং দাবী করলেন যে তিনি যে দর্শনের পত্তন করলেন, তার ভিত্তি হ'চ্ছে

বাস্তবতা (Reality)। সর্ব্বপ্রকার গূঢ়ার্থবাদ (mysticism)—যা প্রকৃতত্বকে গোপন ক'রে রাখে—তা'র বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন। ধর্ম্মবিশ্বাস বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যকে জ্ঞানচক্ষুর সাম্‌নে থেকে দূরে সরিয়ে রাখে বলে তিনি তা'র প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করতে পশ্চাৎপদ হ'ন নি। কিন্তু 'ধর্ম্মের প্রতিভূ' ("substitute for religion") বলে তিনি যা খাড়া করলেন, তা হচ্ছে কঁৎ আর ফয়েরবাখের মতের একটা ভাব-প্রধান সংস্করণ। জড়বাদীদের চোখে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে তিনি ঈশ্বরকে সদর দরজা দিয়ে সরানোর পর খিড়কী দিয়ে ঢোকালেন্। আবার যে সাম্যবাদ তিনি প্রচার করলেন, তার গোড়ার কথা হ'ল নীতিশাস্ত্র (ethics); "সত্যের" চিরন্তনত্বে তাঁর বিশ্বাস, dialectics একেবারেই তাঁর মনঃপুত হ'ল না; সমাজতত্ত্বের ওপর ডারউইনের আবিষ্কারের যে ছায়া পড়্‌ল, তা তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন। অর্থনীতিক্ষেত্রে তিনি চেষ্টা করলেন, আমেরিকান লেখক H. C. Carey-র মত প্রতিষ্ঠা করতে; ধনিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মূলগত দ্বন্দ্ব নেই, সন্ধিস্থাপন সম্ভব ও উচিত, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি আরও বলে গেলেন যে অর্থনীতির দিক্ থেকে প্রত্যেক জাতি আত্মনির্ভর হ'তে পারলেই, তার কৃষ্টি, তার চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করবে। ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেটের তিনি ছিলেন অন্ধ ভক্ত; প্রাচীন যুগের গ্রীক, সর্ব্ব-যুগের ইহুদি, আর জগন্নিত্র গোটের ওপর তাঁর ছিল জাতক্রোধ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তাঁর সাম্যবাদ হচ্ছে একরমক মতিভ্রম। Dialectic Materialism তিনি মান্‌লেন না; শ্রেণীবিরোধ (class struggle) তাঁর কাছে অবোধ্য, 'অতিরিক্ত করের' (Surplus Value) মার্ক্‌স্ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার অধারণাই তিনি চেষ্টা করলেন না, বা সে চেষ্টা বিফল হ'ল। তবে এঙ্গেল্‌সের "Anti-Duhring"এ শুধু যে অধ্যাপকের মতখণ্ডন আছে, তা নয়। তাঁর বিদ্যাভিমানকে এঙ্গেল্‌স্ যেমন বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি নিজের জ্ঞানবল দিয়ে সে বিদ্যার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে' দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিনি সাম্যবাদের গোড়ার কথা আমাদের বুঝিয়েছেন। ভাষাসৌষ্ঠবে বইটি সুখপাঠ্য; সাম্যবাদী সাহিত্যে এর মূল্য খুব বেশী।

মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্-লেনিনের চিন্তাধারার উৎস হচ্ছেন হেগেল্; কিন্তু সে উৎসের গতিকে তাঁরা ভিন্নমুখী ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের বিচারের বর্গ (Categories of thought) নিয়োগ করা হ'য়েছে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আলোচনায়, কোন কাল্পনিক নিরুপাধিক সত্তার (absolute spirit) চিন্তায় নয়। আমাদের প্রত্যেক ভাবরূপের একটি প্রতিকূল রূপ আছে; আমরা অবশ্য সহজে তা লক্ষ্য করি না। আমরা জানি যে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব, শীতোষ্ণ, আলো-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, বিজ্ঞানবাদ-জড়বাদ, ধ্রুপদ-খেয়াল—এ সবের মধ্যে একটা পরস্পর অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু এই আখ্যান প্রত্যাখ্যানের লীলা যে সর্ব্বত্র, তা আমরা বিনা আয়াসে বুঝি না; কেবল নিবিড় চিৎশক্তি প্রয়োগের ফলে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে এই লীলারূপে দেখা যায়। প্রতিকূলতার সংগ্রাম যখন বাধে, তারই সিদ্ধান্ত হয় এক উচ্চতর অবস্থার সৃষ্টিতে। সময়ের সঙ্গে ন্যায় অন্যায় বলে পরিচিত হয়, যা প্রয়োজন তা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, প্রাচীন বিধিসংস্কারাদি অর্ব্বাচীন অবস্থার দ্বারা পর্য্যুদস্ত হয়। বিধিসংস্কারকে জীবনে নূতন পরিবেষ্টনের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা সামাজিক

বিরোধের রূপ নেয়; তার উদ্দেশ্য উচ্চতর সমাজস্তরে অধিরোহন। একেই হেগেল্ বলেছেন "negation of the negation"; thesis, anti-thesis-এর দ্বন্দ্ব হ'ল synthesisএর জনক।

ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে বুঝ্‌তে হ'লে একটা দৃষ্টান্ত দরকার। ধরা যা'ক্ একটা ডিম। এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যা নির্ণীত (positive) কিন্তু এর মধ্যে এমন বীজ রয়েছে যা জন্ম নিচ্ছে ডিমের আধেয়কে নষ্ট করে' (negatives)। কিন্তু এর ফলে ধ্বংস হ'ল না; বীজটি জীবন্ত আকার ধারণ করল। যখন negation সম্পূর্ণ হ'ল তখন ডিমের খোলা ভেদ করে' কুক্কুটশাবকের জন্ম, তা'র স্থান ডিমের চেয়ে উচ্চস্তরে।

প্রাক্-মার্ক্‌স্ যুগের সাম্যবাদীরা স্বত্বাধিকার উচিত কি অনুচিত, এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে যা মানবধর্ম্মের বিরোধী, তা অন্যায়; স্বত্বাধিকার মানবধর্ম্ম-বিরোধী, সুতরাং তা লোপ পা'ক্। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। মার্ক্‌স্ এঙ্গেল্‌স্ বললেন যে মানবধর্ম্ম বলে স্থির, অচঞ্চল কিছু নেই, ইতিহাস ক্রমাগতই মানবধর্ম্মের বহু পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করছে। যে যুগে ধনোৎপাদনের যে পদ্ধতি, তার সঙ্গে সেই যুগের সম্পত্তিবিধান, "মানবধর্ম্ম" পর্য্যন্ত, খাপ খেয়ে' যাবে। কোন চরম মীমাংসা বিশ্বধর্ম্মের বিরোধী; প্রবহমাণ স্রোতের মধ্যে আমরা রয়েছি, পরিবর্ত্তনই জীবন, স্থিতির অর্থ মৃত্যু। হেগেল্‌কে অনুসরণ করে মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ ক্রমবিবর্ত্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা হ'চ্ছে লেনিনের ভাষায় "A development, so to speak, in spirals, not in a straight line; a development in leaps and bounds, catastrophes, revolutions; intervals of gradualness; transformation of quantity into quality....."

মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সের মতে proletariat হ'চ্ছে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধবাঁধ; তাদের সাম্যবাদ-প্রচেষ্টার ফলে সমাজ-জীবনের এক উচ্চতর স্তরে আমরা আরোহণ করতে পারব। প্রাক্তন সমাজের রক্ষাকর্ত্তাদের সঙ্গে জায়মান সমাজের যোদ্ধাদের যে বৈরিতা, তা'র শান্তি নেই। জরাগ্রস্ত সমাজের মরণ অবশ্যম্ভাবী; তবে যথার্থ সাম্যবাদপক্ষীয়েরা যে ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠ, বা কেবল নীতি বা ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ হ'য়ে সর্ব্বহারাদের দলে যোগ দিয়েছে, তা নয়, তা'রা হ'চ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক কারণে একত্রীকৃত শ্রেণী।

হেগেল্ dialectic ব্যবহার ক'রে মনের প্রাচীরে ঘেরা এক পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন। মার্ক্‌স্ সেই প্রাচীর ভেদ করে যে পৃথিবীতে নরনারীর নিবাস, সেখানে স্থান নিলেন; বাইরের জগৎ ও মানুষের জীবন নানাদিক থেকে সারাজীবন অনুশীলনের ফলে চিন্তা বা ক্রিয়ার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করলেন। মানুষের ভাবধারা—ধর্ম্ম, ব্যবহার, বিধি, তত্ত্ববিজ্ঞান—সমস্তই তৎকালীন সামাজিক পরিবেষ্টনের পরিচয় বলে প্রচার করলেন।

মার্ক্‌সের মতামত যাঁরা জান্‌তে চান্, তাঁরা "Anti-Duhring"এর মত বই কমই পাবেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনাই বইয়ে আছে; আর মার্ক্‌স্ যা বলেছিলেন তা জান্‌তে চাইলে এখনকার কোন কোন

অধ্যাপকের স্বকপোলকল্পিত লেখা বাদ দিয়ে সোজাসুজি মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্ বা লেনিনের লেখা পড়া উচিত। এঙ্গেল্সের ভাষার প্রসাদগুণ অনুসন্ধিৎসুকে সাহায্য করবে; 'Capital" দেখে আমরা অনেকেই ভয় পাই, "Anti-Duhring"এ ভয়ের কোন কারণ নেই।

অনুবাদ প্রাঞ্জল, সুপাঠ্য হ'য়েছে। আমাদের ভাষায় এরূপ বইয়ের অনুবাদ হ'বে কবে? কোন পরিভাষাপ্রাজ্ঞ সুলেখক এর ভার নেবেন কি? আশা করতে ভরসা বিশেষ হয় না, কারণ দেখি তো যে আমরা কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা, অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মুগ্ধ, সমাজের জীবন্ত সমস্যা নিয়ে মস্তিষ্ক চালনাকে বুদ্ধিভ্রংশ বলে মনে করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Coleridge on Imagination—By I,A. Richards (Kegan Paul).
Poetic Experience—By Thomas Gilby O. P. (Sheed and Ward).

সম্প্রতি এজ্‌রা পাউণ্ডের প্রবন্ধ সংগ্রহে তাঁর কাব্যাদর্শের কথা পড়ছিলুম। তারপরে বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া পড়ে' আশ্চর্য্য হলুম উভয়ের কাব্যাদর্শের অনগভীর মিলে। তাই বেহামী রিচার্ড্‌স্‌ও যে নভশ্চারী কোলরিজে পাবেন তাঁর শ্রুতি, তাতে আর কি আশ্চর্য্য। রিচার্ডসের গভীর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও খিসিস্-জাতীয় পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। বইটি কোল্‌রিজ-ভাষ্য শুধু নয়, কোল্‌রিজসংস্কারও বটে। কোল্‌রিজ্ কাব্য বলতে শুধু কবিতা বুঝতেন না; কাব্য মানবজীবনে পরম প্রয়োজন ও মূল্যবান্ এ বিশ্বাস তাঁর ছিলো; রিচার্ডসেরও আছে। কাব্য সমগ্র মানবের সম্পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তির অখণ্ড চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি, এ কথাও রিচার্ড্‌স্ মানেন। কিন্তু এই মূর্ত্তিলাভ ও তার প্রক্রিয়া পারলৌকিক লীলা, কোলরিজের এ কথা মানতে তাঁর বাধে। রিচার্ড্‌স্ বলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছে আজ মৃত হলেও আমাদের মুক্তির প্রয়োজন উগ্রই আছে এবং কাব্য সে মুক্তির ফোয়ারা বহন করবে, ঈশ্বর মানার মতো অবৈজ্ঞানিক দাবী জারি না ক'রে। পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়েছে, সভ্যতা দিশাহারা, মানুষ আজ ভ্রান্তির জীবনশোষক গোলকধাঁধায়। ধর্ম্মপ্রেমআদি সব বিশ্বাসের আশ্রয় আজ ভেঙেছে, এখন অন্ধজনে আলো কে দেবে? না, এই শিশুতীর্থের নবশিশু, কাব্য। অথচ কাব্য প্রাণ পেয়েছে বিজ্ঞানপূর্ব্বজ ঐ সব বাতিল বিশ্বাসের আশ্রয়েই। অবশ্য এ বৈজ্ঞানিকমন্ত নাটকীয় ভাব রিচার্ডসের এ বইটিতে কমেছে।

এবং রিচার্ড্‌স্ পাঠকের কাছে প্রায় সর্ব্বদা যে বুদ্ধির জাগ্রত অবস্থা দাবী করেন, এ বইয়ে তা না কমে' বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণসতর্কতা ও রুচিমণ্ডিত পাণ্ডিত্য স্বাস্থকর। বহুকৃতসাধ্য স্পষ্টতা বর্ত্তমান বলে'ই তাঁর কথায় মর্ম্মান্তর ঘটা সহজ, যদিও তাঁর সুবিন্যস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া শক্ত। অবশ্য

কেম্ব্রিজের কূটবুদ্ধি পণ্ডিতের সঙ্গে কোলরিজের অনেক বিষয়ে মতৈক্য। কোল্‌রিজের সঙ্গে রিচার্ডস্ বিশ্বাস করেন যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের চেতনা হয়ে ওঠে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাতীত মিলনে স্বচ্ছ। দুজনেরই মতে এই অসাধারণ অপিচ ক্ষণস্থায়ী দিব্যজ্ঞান অতিশয় মূল্যবান। সেণ্ট টমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগ-সাধনার যাত্রাপথ। কোলরিজ্‌ও এর মধ্যে পেয়েছেন পরমার্থের ইঙ্গিত। এবং তিনজনেই—সেণ্ট্ টমাস অবশ্য কথাটা ব্যবহার করেন নি—এর সঙ্গে দেখেছেন শুদ্ধ কল্পনার সম্বন্ধ। এই শুদ্ধ কল্পনা কোলরিজের মতে ব্যাবহারিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেইজন্যেই নাকি শেক্‌স্‌পিয়র gentle। গিলবি কিন্তু কবিদের জীবনে গোলযোগই দেখেন। তবে আধুনিক কবি-জীবনী লেখার রীতি ত কোলরিজ দেখেন নি, আর ভেরলেন্, বদ্‌লেয়র্ প্রভৃতিও তখন জন্মান্ নি। প্রসঙ্গত বলে' রাখা ভালো যে কবি দার্শনিক সঙ্গীতকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানে কাজ চলছে এবং কেন যে দিব্যজ্ঞানবান কবি-তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারে না, সে মানস-জাগতিক প্রশ্ন হয়তো একদা উত্তর পাবে। বিজ্ঞানের এ সিদ্ধি সম্বন্ধে রিচার্ডসের বিশ্বাস প্রচণ্ড।

কোল্‌রিজ্ শুধু এই বিজ্ঞানের বর্ণনায় ক্ষান্ত হন নি। এই জ্ঞানের মাত্রা যে সামাজিক সভ্যতার ওপর নির্ভর করে, সে সত্যও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চোখে পড়েছিলো। এবং এই আত্মজ্ঞানের ফলই শুধু বুদ্ধিগত নয়, এ জ্ঞান একটা ক্রিয়া ও একটা নির্ম্মাণ, আর এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে নবমূর্ত্তি লাভে, নব আত্মপ্রকাশে! তার ফলে আসে শুদ্ধকল্পনা। রিচার্ডসের আয়াসসাধ্য পুনর্ভাষ্যে বুঝলুম যে, কোলরিজের মতে এই সঞ্জীবনী কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপ কাব্য হলেও এ অক্ষয় বটের শুভফল অন্যত্রও ফলে। যা কিছু অভ্যাসজর্জ্জর জীবযাত্রার একান্ত প্রয়োজন-সাধনের বাইরে, যা কিছু সুকুমার মানসক্রিয়া, তারই মধ্যে এ শুভের লীলা। সেণ্ট্ টমাসের মতে এই লীলার চরম ও শুদ্ধতম রূপ ঈশ্বরের প্রেমে। কুয়াসাচ্ছন্ন কোলরিজেরও এরকম একটা ধারণা ছিলো। এ বিজ্ঞান ছাড়া কথা রিচার্ডসের কাছে অসম্বদ্ধ। তিন জনের মিল জীবন-যাত্রায় কাব্যের উচ্চস্থান সম্বন্ধে। কোলরিজ্ ও রিচার্ড্‌স্ তো স্পষ্টতঃ কাব্যকে জীবন-যাত্রার প্রধান সহায় বলেছেন। এবং বিকল্পনা বা কল্পনাবিলাসের মূল্য যে কম ও তার স্থান নিচে, এর কারণ বিকল্পনা আর শুদ্ধ-কল্পনার তফাৎ প্রায় ততখানি, জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া ও জড় অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মধ্যে যতটা। এইখানেই হাট্‌লিকে ছেড়ে কোল্‌রিজের কাণ্টের অনুগমন। এইখানেই ক্ষমতাবান্ প্রতিভাশালীর ভেদ। এ-প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতায় কোল্‌রিজের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক রিচার্ডস্ একটু অসুবিধায় পড়ে' একটা যাহোক্ তাহোক্ প্রাক্-নিয়ন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই। এখানে রিচার্ডস্ সততা-সহকারে মেনেছেন যে ব্যক্তি ও বহির্জগতের সম্বন্ধ-সমস্যা শুধু ব্যক্তিবাদীকে বিচলিত নয়, বস্তুতান্ত্রিককেও ভাবিত করে।

পুঙ্খানুপঙ্খ ও উদ্ধৃতিবহুল এ আলোচনার আরেক কথা হচ্ছে কল্পনা-বিকল্পনার সঙ্গে বিকার বা dilirium ও mania বা উন্মত্ততার তুলনা। চলিত কথায় যে কবিকে পাগলের জাতে না হোক্, মাথায় ছিট্‌ওয়ালার দলে

ফেলে, সে ভুল অবশ্য এ তুলনায় নেই। কারণ বিকল্পনা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হলেও কল্পনার স্পষ্ট তিলক হচ্ছে তার চিন্তাক্রিয়া ও সঞ্চারী স্মৃতির ঐশ্বর্য্য। বিকল্পনা এ-কল্পনারই জের, তবে তাতে কল্পনার সম্য-চেতন বৈকল্য নেই। সেইজন্যেই কল্পনাবিলাস আমাদের অভিভূত করে না, করে চমৎকৃত। তার উৎকৃষ্ট আলোচনা কোল্‌রিজ্‌ করে গেছেন গ্রে ও কুলির কবিতা নিয়ে ও ভিনাস এণ্ড অ্যাডনিস্‌ থেকে দুই জাতীয় কয়েকটি লাইন নিয়ে। সে উপলক্ষে রিচার্ডস্‌ উৎকৃষ্ট টীকা করেছেন। এ টীকা বিচারবুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগেও সার্থক। যথা, ডিটেকটিভ নভেলকে রিচার্ডস্‌ বিকল্পনার পর্য্যায়ে ফেলেন, "টু দি লাইট্‌ হাউস্‌" বা "টম্‌ জোনস্‌"-কে কল্পনার। অথবা হার্ডির নভেলে তিনি পান খণ্ডে খণ্ডে কল্পনা কিন্তু সমগ্রে শুধু বিকল্পনা। অবশ্য এ ভেদজ্ঞান সহজ নয়। কারণ মানবমনে ঘটনা সব যে এক জাতের নয়, সে বোধের উপর এ ভেদ-জ্ঞানের ভিত্তি এবং এই ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই হবে না, জানতে হবে সমস্ত মনের হিসাবে। এবং তাও শুধু ব্যক্তিবিশেষের মনেই শেষ নয়, তার মধ্যে মেরুদণ্ডরূপে থাকবে সর্ব্ব মানবের বিশেষত্ব। অর্থাৎ আমরা এসেছি ভ্যালিউস্‌ বা তুলামূল্যের জগতে। এ মূল্যের ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার গোলমালে রিচার্ডস্‌ নামেন নি। বলেছেন কল্পনাবিচারে সৌভাগ্যবশতঃ মূল্য-মানদণ্ড না নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ সাধারণ সভ্যমানুষ মাত্রেরই কখনো না কখনো কল্পনার সঙ্গে দেখা শোনা হয়েছে। কিন্তু এ মুখচেনা জ্ঞানকে বিচারের ভিত্তি করলে যে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা হয় না, সে কথা বৈজ্ঞানিক রিচার্ডস্‌ চেপে গেছেন—মনোবিজ্ঞানের শৈশবের জন্যে বাধ্য হয়ে'। অথচ সুধী কাব্যজ্ঞদের মধ্যেই মতভেদ আছে। গ্রে এবং কুলি সম্বন্ধে কোল্‌রিজের কল্পনা-বিকল্পনা বিচার রিচার্ড্‌স্‌ মানতে পারেন না।

অতঃপর শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা। শব্দার্থতত্ত্ব যে গভীর মেধায় চর্চ্চনীয় বিজ্ঞান সে বলাই বাহুল্য। রিচার্ডস্‌ পূর্ব্বে এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রদূত দুটি বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। কোলরিজের প্রাগাধুনিক আশ্চর্য্য দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টিও সেমাসিওলজির বিপ্লবময় মাহাত্ম্য দেখেছিলো। কোলরিজের সেই নানা কারণে অসম্পূর্ণ তবুও মহান চেষ্টা থেকে রিচার্ডস্‌ শব্দার্থের রহস্য ধরিবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হায় যদিচ মোটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি পেয়েছে, একটু ভেতরে গেলেই আমরা পড়ি আবার অন্ধকারে। অবশ্য শব্দার্থের রহস্যেতিহাস না জানলেও আমরা রিচার্ডস্‌ গ্রেডস্‌ এম্‌প্রসনাদির সাহায্যে পূর্ণতর পাঠরীতি শিখছি। তাছাড়া সাধারণ ভাবে রিচার্ডসের আলোচনা যদিও অসম্পূর্ণ, তবু উপকারেই লাগ্‌বে। যথা, সব চেয়ে মোটা কথাই ধরা যাক, কথা বা শব্দ সর্ব্বদা অর্থৈকক বা স্বসম্পূর্ণ অর্থপিণ্ড নয়। এ জ্ঞান যে অনেকের নেই, তার প্রমাণ সুধী পণ্ডিত হার্বার্ট রীডের একটি বচন : কাব্য একটি কবিতায় বা একটি লাইনে বা একটি দুটি কথায় থাকতে পারে—উদাহরণ, শেক্‌স্‌পিয়ারের incarnadine, কীটসের shady sadness, কোলরিজের Mount Abora ইত্যাদি। অথচ ওষ্টরঞ্জনের বিজ্ঞাপনে incarnadine দিলে multitudinous waves লাল হয়ে ওঠে না।

এ সম্পর্কে কল্পনা-বিকল্পনার প্রয়োগ শিরোধার্য্য। যেখানে ঐ মানসক্রিয়ায় উষ্ণ কথাগুলি সার্থক-সংযোগে কাব্য হয়েছে, সেখানে পাই শুদ্ধকল্পনা। বিপরীতে অর্থাৎ কথার একক অর্থের, আভিধানিক অর্থের প্রাধান্য যেখানে, সেখানে বিকল্পনা। যথা এই শ্লোকে কথাগুলির অর্থ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র :—

Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean

কিন্তু এ শ্লোকে কথার অর্থ অভিধান ফেলে সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে গেছে :—

She looks like sleep—
As she would catch another Antony
In her strong toil of grace.

তারপরে কোল্‌রিজের "শুভবুদ্ধির" বিচার হলো রিচার্ড্‌সের আলোচ্য। এ শুভবুদ্ধির অস্তিত্ববিনা কল্পনা হয়ে ওঠে প্রলাপী বিকার, বিকল্পনা হয় মহাব্যসন। মুস্কিল হচ্ছে এই শুভবুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ে। কোল্‌রিজ্‌ বিকল্পনাবিহারী কুলির যে পিণ্ডারীয় ওড-এ শুভবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব দেখেছেন, রিচার্ড্‌স্‌ তাতে বিকল্পনাই পেয়েছেন—যদিও নিচুদরের বিকল্পনা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে এক্‌সচেঞ্জেএর দর রিচার্ড্‌স্‌ আজও বাঁধতে পারেন নি, কাজেই নিচু দর উঁচু দর অস্পষ্ট কথাই রইলো। কোল্‌রিজের মতে এ শুভবুদ্ধি আসে ব্যাকরণ, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের সহজ বা জাত জ্ঞানে। এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হয়ে' উঠতে পারে ক্ষমতা, পাওয়ার। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞান অদ্যাবধি পরিমিত। রিচার্ডস্‌ তাই ভাবীকালের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে' বলেছেন যে একদা বিজ্ঞানের নিশ্চিত নিকষে কবিতার ভালোমন্দের নির্ব্বিশেষ বিচার করা যাবে। ইতিমধ্যে তিনি মনেছেন কোল্‌রিজকৃত Reason-এর জয়গানের জটিল সার্থকতা।

কোল্‌রিজের কবিতায় 'বায়ু-বীণা'র রূপক সবার পরিচিত। বায়ুবীণা নামে পরের অধ্যায়ে রিচার্ডসের সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হচ্ছে নিসর্গ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের দুটি মতবাদ। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত সে মত দুটি রিচার্ডসের কঠিন-শব্দ-সঙ্কুল নব বেশে হচ্ছে এই :—

The mind of the poet at moments, penetrating 'the film of familiarity and selfish solicitude,' gains an insight into reality, reads Nature as a symbol of something behind or within Nature not ordinarily perceived। এবং The mind of the poet creates a Nature into which his own feelings, his aspirations and apprehensions, are projected.

রিচার্ডস্‌ স্থির করতে পেরেছেন যে অন্তত এ মত দুটি যথার্থ-ই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু সতর্ক বিচারে সাবধানী ভাষায় প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির চার রকম অর্থ ও তার বর্ণনা রিচার্ড্‌স্‌ করেছেন। প্রথম অর্থে প্রকৃতি শুদ্ধ, মানব মনের আয়ত্তের বাইরে, স্বাধীন, দুর্জ্ঞেয় এবং মানুষের ওপর প্রভাববিস্তারে

সমর্থ। এ প্রকৃতিতে মানসলোক আরোপ করতে মানবীয় কল্পনা অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মানব মনের লীলাক্ষেত্র। এ লীলায় ভণ্ডামি নেই, কিন্তু যে সব রূপ গুণ এতে প্রকৃতির উপরে আরোপিত হয়, তারা সব mythical। রিচার্ডসের এক অধ্যায় হলো পৌরাণিকের সীমানির্দেশ। যাঁরা fiction-এর সঙ্গে ও রিচার্ডসের বিশ্বাস বা belief-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এ অধ্যায়ে খুসি হবেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবন-যাত্রায় একান্ত প্রয়োজন এই সব বিশ্বাসকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়ে রিচার্ডস্ আমাদের অন্ধ পৌত্তলিক বলেন নি। কারণ এসব পুরাণেই আমাদের সভ্যতা। এদের অন্তর্বর্তনেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সংহত, মানস তথা ইন্দ্রিয়শরীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও আমাদের বিকাশ সমঞ্জস হয়। একান্ত-সহায় এই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সর্ব্বমানবীয় পুরাণগুলিতে অবশ্যই বিপরীত বিপদ আছে। যুক্তি-বিচার যেখানে কম বিকশিত, সে অসভ্য আদিম সমাজে পুরাণ মানুষকে অনেক সময় পুরাণহীন বানরের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে। সভ্য সমাজেও তা করে' তোলে, যার ফলে জাতিতে জাতিতে লাগে নৃশংস দ্বন্দ্ব। যদি কোন পুরাণ অন্যান্য নৈতিক সামাজিক বা আন্তর্জাতিক পুরাণের বিপক্ষে না যায়, তাহলে আমরা তাকে হয়তো বলি ধর্ম্ম কিম্বা লীগ্ অব্ নেশন্স্। এ সব পুরাণে বিশ্বাস অল্প বিস্তর সবাই করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস তাকেই বলে, যে বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আচরণকে চালিত করে। এ পূর্ণ বিশ্বাস দুর্লভ। যাদের এ আছে, তাদের কেউ ঈশ্বরের দূত বলে পূজা পায়, কাউকে পাঠানো হয় উন্মাদ-আশ্রমে। ভগ্নাংশ থাকলেও এ বিশ্বাসের জোরে কেউ হয় লেনিন্, কেউ পিএর ভিলাল, কেউ শেলি, কেউ ডন্ জুয়ান্। সেই জন্যেই কোল্‌রিজের মতে অত প্রয়োজন শুভবুদ্ধির, যে-বুদ্ধি দেয় সামঞ্জস্য। We receive but what we give, তার বেশী চাইলেই ঘটে অসাধারণত্ব—প্রতিভা বা উন্মত্ততা। এই পুরাণ সৃষ্টিতে কাব্যের স্থান ব্যাপক ও উচ্চে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুরাণের সঙ্গে কাব্যের পুরাণের প্রধান তফাৎ হচ্ছে যে শেষোক্তের মধ্যে প্রথমের অবশ্যম্ভাবী কার্য্য দাবী নেই। নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে আমরা বিপদসঙ্কুল সাগরে ও জনহীন দূর দেশে নাও যেতে পারি, কিন্তু মোটার কারের সামনে থেকে না সরলে হাঁসপাতালে যেতে হয়। যারা রিচার্ডসের অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিকমন্যতায় বিরক্ত হতেন, এবারে তাঁরা খুসি হবেন। ব্যাডলির কথা তুলে' জ্ঞানী রিচার্ডস্ এবার বলেছেন যে কোল্‌রীজীয় ঈশ্বরের মতো বিজ্ঞানও পুরাণজীবী ও ব্যবহারী।

কোল্‌রিজের সঙ্গে সেণ্ট টমাসের মিল দেখানো এখানে অসম্ভব। তাছাড়া তফাৎই বেশি। সেণ্ট টমাসের বিপুল সর্ব্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞান ও খর বুদ্ধির সম্পূর্ণতার অভাবের জন্যই কোলরিজ থেকে রিচার্ডস্ তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিকশিত করতে পারেন। তাছাড়া টমাস স্পষ্টতঃ কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেন নি। এমন কি মারিত্যাঁ Art and Scholasticism লেখবার আগে আমরা জানতুম না যে এ ভগবদ্বাদী দর্শনে কাব্যাদির কোনো স্থান আছে। কিন্তু ডমিনিকান্-ব্রতী গিল্‌সি তাঁর আদিগুরুর বিপুল দর্শন থেকে কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে পেরেছেন। ন্যায়শিক্ষিত ঘনসন্নিবদ্ধ এই সুলিখিত ছোট বইটি তাই প্রতি পৃষ্ঠায় উক্ত বৃহত্তর দর্শনের সহিত পরিচিতি ধরে নেয়। স্থানসঙ্কোচে তাঁর

দার্শনিক ভাষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য করা কঠিন এবং এক জায়গায় মূলগত প্রভেদ এ কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রণোদিত তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র করেছে—সে হচ্ছে ঈশ্বরেই সব জ্ঞানের, সব আচরণের পূর্ণতা। তা না হলে এ তত্ত্বালোচনায় মধ্যে মধ্যে চিন্তনীয় ও গ্রাহ্য কথা পেয়েই দ্বিধায় ক্ষান্ত হতে হতো না। প্রথমতঃ বইয়ের আরম্ভ ধরা যাক্, জ্ঞান যে শুধু আধিপ্রত্যয়—conceptual নয়—প্রত্যক্ষও হয়, এবং সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানবমনের পক্ষে প্রেম ও গভীরতর জ্ঞান এই ধরে' গিলবির সূত্রপাত। কারণ শুদ্ধ প্রত্যয় নয়, অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রতি মানবমনের গভীর প্রেম, এই প্রেমই ঈশ্বরের দিকে টমাস্‌কে নিয়েছিলো, এরই জন্যে ঈশ্বরে বিশেষের চরম বিশেষত্ব। কাব্য এই অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পরিচয়—অপেক্ষাকৃত, কারণ মানুষের মনের গঠনে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় শুধু ঈশ্বরেরই ও ঈশ্বরেই। কোল্‌রিজের মতাবলীর সঙ্গে এ মতের সম্বন্ধ নির্ণয় স্থগিত রেখে প্রত্যক্ষানুভূতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে একালের বৈজ্ঞানিকরাও বাগ্‌বহুল, সে কথা মনে রাখা ভালো। কোলরিজ হয়তো এবং গিল্‌সি স্পষ্টই আগামী ব্যঙ্গের উত্তর দিয়ে গেছেন। টমাসের দর্শনে অপরাবুদ্ধির বা প্রত্যয়গত জ্ঞানের কারবার অবচ্ছিন্ন সার্ব্বিক নিয়ে—সেখানে ইন্দ্রিয়গ্রহ দেখলে তার ব্যাস-বৈর্ঘ্যের মাপ করতে হয় কিন্তু কবির যে বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রহ্য তার সত্তা ও তার জ্ঞান সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রহ্যেই। সেখানে মাপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ টমাসের মতে form প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়, প্রত্যয়জ্ঞানের কারবার।

সে যাক, বলা দরকার যে টমাস্‌কে বুদ্ধি-বিদ্বেষী ভাবলে ভুল হবে। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়বুদ্ধির তিনি পূর্ব্বাপরমধ্য সম্বন্ধ রেখেছেন। তাই এ তত্ত্বকে thingism তথা ব্যক্তিসর্ব্বস্ব বলে' ঝেড়ে ফেলা যায় না। টমাসের কাছে মন প্রাকৃত বিশ্বের অংশ, শারীর। এবং এই মনেরই এক প্রক্রিয়ায় কোল্‌রিজিয়ান সুরে বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও বস্তু এক হয়ে ওঠে। অবশ্য এই অখণ্ডমিলন পদার্থিক নয়, চৈতন্যগত। ছবি যে দেখি, তাতে কয়েকটি রেখার যোগফল আমরা দেখি না, দেখি একটা সমগ্র ছবি। তেমনি মন দিয়ে দেখি না, বা অক্ষিতারা দিয়ে, দেখি সমস্ত ব্যক্তি দিয়ে। Gestalt মনোবিজ্ঞানের সমর্থনে গিসবি দুটো ছবি এঁকেছেন। সে ছবি দুটিতে চারটি ক'রে রেখার মধ্যে একটিতে শুধু তফাৎ, কিন্তু সমগ্র ছবি দুটি হলো ভিন্ন। ষ্টার্লিং কৃত উপায়ে স্নায়ুসম্পর্কলীন করে' হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সে হৃদয় তখন শুধু একটি মাংসপিণ্ডমাত্র। যা হোক, এই সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের প্রেমালাপের বাহন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সকলের জ্ঞানরাজ্যে এক মর্য্যাদা নেই। এ সব মানসিক ক্রিয়াদি কিন্তু চেতনারই কোলে। চেতনার বর্ণনা টমাস্ করেছেন। তার শুধু এক অংশ হচ্ছে স্মৃতি। চেতনার পরিচয় দিয়ে গিল্‌সি ভগবৎ-করুণার তুলনায় কাব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আবে ব্রেমোঁর প্রার্থনা ও কাব্য তাঁকে প্রামাণ্য দিয়েছে। বইয়ের বাকি অর্দ্ধেক মোটামুটি এই জ্ঞানতত্ত্বের কাব্যে আরোপ। কোনো বিশেষ কবিতা তাতে আলোচিত হয় নি, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অল্পবিস্তর কাব্যার্থে বিশ্লিষ্ট, ব্যাখাত ও বিস্তৃত হয়েছে। তার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কাব্য পরমার্থজ্ঞানেরই জাতের প্রক্রিয়া, তবে বাধ্যতাই নিচু দরের এবং একটু অসম্পূর্ণ। রিচার্ডস্ অবশ্য কাব্যের পারমার্থিক গোত্র মানেন বটে কিন্তু পরমার্থ

মানেন না। মাথু আর্ণল্ড্ আজকেও আমাদের সমসাময়িক। রিচার্ডস্ আজ একলা নয়।

বিষ্ণু দে

Retreat From Glory—By R. H. Bruce Lockart (Putnam).

পরিচয়ের এক অতীত সংখ্যায় লক্হার্ট-আত্মচরিতের প্রথম ভাগটির সমালোচনা করেছিলাম। আলোচ্য জীবনচিত্রখানি তারই সপ্তসারণ হলেও ভাব ও বস্তু-গত ঐক্য বিবর্জিত এবং পৃথক্‌ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তরুণ বয়সের সে উদ্দীপনাপূর্ণ রচনাভঙ্গী নিশ্চয় হয়ে গেছে বয়োবৃদ্ধি ও চাকুরী-ক্ষেত্রে মর্য্যাদা-হানির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ছোট ছোট পার্শ্বচরিত্রের ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অধিক হয়েছে অধিকতর বিচিত্র হয়ে। ভাবপরায়ণ বাস্তু-বাগীশের দিনপঞ্জিকায় বিবৃত ইংরেজ-রাষ্ট্রলীলার কয়েকটি গোপন চিত্র ছিল পূর্ব্বতন গ্রন্থের বিশেষ সম্পদ। বর্ত্তমান রচনা অপেক্ষাকৃত সংযত ও লঘুগামী হলেও এর ঐতিহাসিক অলঙ্কার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম মূল্যবান নয়। যে ঘোর মসীলিপ্ত ধূম্র মেঘ ভের্সাই-সন্ধি কক্ষের হিংসানল হতে উঠে সারা ডানিয়ুব উপত্যকা আচ্ছন্ন করে আছে তার অন্তর্নিহিত প্রলয়ঙ্কর শক্তির পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় লক্হার্টের অনতিরঞ্জিত তালিকায়। নগণ্য রাজদূতের স্বল্পপরিসর জীবনের সঙ্গে যেটুকু রাষ্ট্র-রহস্য সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে তার অতিরিক্ত কথা অবশ্য আত্মকাহিনীর মত অন্তরঙ্গ সাহিত্যে স্থান পায় নি—তবু অপরিহার্য্যের মত এসে পড়েছে আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ-সংঘর্ষ ও বিসংবাদের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ, ফরাসী-ইতালী-বিদ্বেষ, ইউরোপীয় জাতি-সমূহের পররাষ্ট্র-পদ্ধতির ব্যাখ্যা। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের স্থূল রেখা-গুলিকে ছায়নিষ্ঠার আশুরণে ঢাকতে গিয়ে যে সব ছোট ছোট তর্কের আলোড়ন তুলেছেন সেগুলির মীমাংসা যাই হোক, সমস্যার জটিলতা যে কতখানি নিবিড়, তা বোধগম্য হয় তাইতে। লক্হার্ট-জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী ব্যয়বাহুল্য, কর্জ্জ গ্রহণ, বংশাভিজাত্যের শ্লাঘা, মৎস্য শিকার ইত্যাদি বাজে কাজে ভারাক্রান্ত হলেও সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। তার কারণ, আলোচ্য আলেখ্যে তাঁর অন্তরের কোন নিবিড় যোগসূত্র নেই; এবার সেইজন্যে পাঠকের দৃষ্টি প্রথম হতেই নিরুদ্ধ হয় সমস্যাকুল রাষ্ট্র-গগনে। যুক্তিটি স্ববিরোধী শোনাচ্ছে বলে আর একটু বিশদ করে বলতে হচ্ছে। তাঁর কায়াবহুল জীবনযাত্রা বিচিত্র হলেও মানব-হৃদয়ের কোন নিবিড় স্পর্শ পেয়ে একটি পরম সত্তার পরিণত হয়ে ওঠেনি বলে পাঠক-চিত্তে সহানুভূতি জাগরূক হয় না। মনে হয় স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বর্গ, এমন কি প্রণয়ী পর্য্যন্ত যেন ভাসমান ক্রীড়নক—মরীচিকার মত বিচিত্র অথচ অলীক। ঘটনার বিন্যাস চিত্রল ছায়ার মত মানস চক্ষে ঈষৎ তৃপ্তিদায়ক হিল্লোল জাগিয়ে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু রাষ্ট্র-কাহিনীর পারম্পর্য্যশৃঙ্খল গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের নিগূঢ় কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। দীর্ঘায়িত গল্পকথা সমালোচনের স্বল্প পরিসর কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হলে রসোৎপাদনে অন্তরায় হয়, তবু সঙ্কলন করে দিলাম সংক্ষিপ্তসার।

লক্হার্টের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হলো লেলিনের আততায়িনীর কল্যাণে। বলশেভিক নেতার হত্যাচেষ্টার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সে বিষয় চেকা নিঃসন্দেহ হলেও তিনি সোভিয়েট কারাগারের অন্তর্ভুক্ত হলেন আর্চএঞ্জেলে মিত্রশক্তির কূট চক্রান্তের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত থাকার অপরাধে। তারপর যদিচ লিটিনভের বিনিময়ে মৃত্যুমুখ হতে অব্যাহতি পেলেন, স্বদেশে প্রত্যাগমন করে তাঁর অবস্থা হয়ে রইল ত্রিশঙ্কুর মত। লেনিন ট্রট্স্কী প্রমুখ তথাকথিত জার্ম্মান গুপ্তচরদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন বলে চাকুরীর ক্ষেত্রে উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হলো; লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিল প্রভৃতি ধুরন্ধর কর্ত্তারা অবজ্ঞা ভরে উড়িয়ে দিলেন তাঁর বলশেভিক শক্তির স্থিতিসামর্থ্য আস্থা এবং সেই সঙ্গে স্বদেশী কমিউনিষ্টরা প্রকাশ্য সভায় তাঁকে লেনিনের আততায়ী বলে আক্রমণ করলেন। ক্রমে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকট হওয়াতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো।

সুদীর্ঘ বৎসর কাল পরে তাঁর কর্ম্মজীবনের অনাড়ম্বর বিকাশ হলো আর এক দিকচক্রবালে যখন তিনি চেকোস্লোভাকীয়াতে চলে গেলেন সরকারী বাণিজ্য-বিভাগের সামান্য সংবাদ-সংগ্রাহক হয়ে। তখন অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুক্তরাষ্ট্র বিকলাঙ্গ দেহ গৃধ্র-শৃগালের যথেচ্ছ-বিহার-স্থান। মিত্র শক্তির কল্যাণে রাষ্ট্রের পূর্ব্বতন সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে সেখানে প্রবেশ করেছে শ্রেণী-সংঘর্ষ ও বিসংবাদ, অর্থ অনটন ও দুর্ভিক্ষ। খণ্ডিত দেহাংশগুলি অভিহিত হলো নূতন নূতন নামে—চেকোস্লোভাকীয়া রিপাবলিক, যুগোস্লাভীয়া, অষ্ট্রীয়া, রুমানীয়া। হাঙ্গেরীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ জেগে উঠলো নূশংস হয়ে। অজভেদী শুভ্রপ্রাচীর উঠে বাণিজ্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ রুদ্ধ করে দিল। মিত্রশক্তির প্রতিহিংসাপরায়ণ স্থূল হস্ত-প্রক্ষেপে পঞ্চাশ কোটি জার্ম্মান ও বিশ কোটি হাঙ্গেরীয়ান স্বজাতির সংসর্গচ্যুত হলো। পঞ্চাশ কোটি লোকের প্রতিভূকল্প রাজধানী ভিয়েনা ছয় কোটি লোকের স্বল্পপরিসর পরিধির মধ্যে নিরুদ্ধ হয়ে মৃতকল্প হয়ে রইল। রাজনৈতিক ক্ষেত্র হতে যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যের সঙ্গে উন্মূলিত হলো পূর্ব্বতন অভিজাত মণ্ডলীর আধিপত্য ও বিত্তাবস্তার প্রণীপ্তি। আকস্মিক গণতন্ত্রের আবির্ভাবে সংখ্যাবৃদ্ধিহ জাতিসমূহ থেকে বুদ্‌বুদের মত ঠেলে উঠলো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবতর রাষ্ট্রপণ্ডিতের দল। বিরাজ করলো অরাজকতা।

কৃষিপ্রধান দেশ হাঙ্গেরী বয়নশিল্প প্রসারের জন্যে অযথা অর্থব্যয় করতে লাগলো অথচ প্রতিবেশী চেকোস্লোভাকীয়া বিশাল যন্ত্রপ্রধান দেশ হয়েও রাজকোষ উজাড় করে ফেলে কৃষিকার্য্যের সপ্তসারণে। শুল্ক-যুদ্ধের মর্ম্মান্তিক উদাহরণ পাওয়া যায় চেক-হাঙ্গেরীর সীমান্ত প্রদেশে। দুইটি অজাতিভাবে সংযুক্ত গ্রাম সহস্র বছর ধরে পরস্পরকে যুগিয়ে এসেছে আলানি কাঠের বিনিময়ে ফসল এবং ফসলের বিনিময়ে আলানি কাঠ—তারপর যুদ্ধশেষে অকস্মাৎ আন্তর্জ্জাতিক সীমান্ত কমিশন এসে দুইটি গ্রামের মাঝে ছেদ টেনে দিলে—আজ বেরেহোভের কাঠুরীরারা অনাহারে মৃতকল্প আর তারপরে চাষীরা শীতে তুষারে মুমূর্ষু।

হাঙ্গেরী দৃঢ় সঙ্কল্প করে বলেছে যে যতদিন না সীমান্ত প্রদেশের ন্যায়সঙ্গত পুনর্ব্বণ্টন হচ্ছে সে সহযোগিতার জন্যে হস্ত প্রসার করবে না। যুগোশ্লাভীয়ার সঙ্কীর্ণচিত্ত রাজধানী বেলগ্রেড আন্তর্জ্জাতিক মিলন-চেষ্টাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে—তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সারবীয়ান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে চালিত। তাদের দ্বিধা-বিরহিত উক্তি হচ্ছে 'আমাদের যা আছে তা থাকবে, ভাল মন্দ বুঝি না।' অষ্ট্রীয়ার অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা স্থনিয়ন্ত্রিত হলো না আজ পর্য্যন্ত। এ অবস্থায় মন্দের ভাল হচ্ছে যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থান্বেষণ-পদ্ধতি পরস্পর-বিরোধী। নবজাত প্রদেশগুলিও রুমানীয়ার সহিত সামরিক সাহায্য বিনিময়ের সন্ধি করে নির্লজ্জ ফ্রান্স কর্ত্তৃক বিজিত জাতিগুলিকে নির্ম্মমভাবে কোণ-ঠেসা করে রেখেছে। ইংলণ্ড সর্ব্বনেশে ভের্সাই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরের ফলে ফ্রান্সের উত্তরোত্তর স্পর্দ্ধা ও প্রভাব বৃদ্ধি সহ্য করতে বাধ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে আপন আধিপত্য বিস্তারে সে নিশ্চেষ্ট একথা মনে করলে ব্রিটিশ বুদ্ধিবত্তার সম্মম লঘু করা হয়। সেখানকার পররাষ্ট্র-বিভাগ স্থল সামরিক হস্ত পশ্চাতে রেখে প্রসারিত করে দিল ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডের নয়নাভিরাম কণক পানি। অর্থনৈতিক নাগপাশের অনাড়ম্বর নিভৃত আলিঙ্গনের অন্তরালে যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার লীলা চল্লো লক্হার্ট হয়ে গেলেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একীভূত। তাঁর কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার বেড়ে যেতে উৎসাহের আর অন্ত রইল না। এদিকে অনাহূত অযাচিত শুভাকাঙ্ক্ষার প্রাদুর্ভাবে অস্থির হয়ে উঠলো গৃহস্বামীরা। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ফরাসী দন্তস্ফুটনই কায়েম হয়ে রইল। ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হলো যে, যে জাতিসমষ্টির প্রাণশক্তির মজ্জাটুকুও বিলুপ্ত, অর্থসাহায্য তাদের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। অবশেষে ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডকে তুলতে হলো তল্পি তল্পা এবং সেই সঙ্গে লক্হার্টের সৌভাগ্যরবি দ্বিতীয়বার অস্তমিত হলো।

লক্হার্টের জার্ম্মান-প্রীতি ফরাসী-বিদ্বেষ ও দুর্ব্বলের প্রতি ব্যক্তিগত সহানুভূতির দ্বৈত-প্রভাব-জনিত, সে কথা সহজেই অনুমেয় কিন্তু এই মনোভাবটি অধিকাংশ ইংরাজের মনোভাবের প্রতিভূস্বরূপ বলে প্রণিধান-যোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থে জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি অসঙ্গতির কথা উল্লিখিত নেই কিন্তু প্রগাঢ় লাঞ্ছনা-সঞ্জাত জ্বালা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল এবং একদিন যে তা হিটলার প্রতীকে প্রকট হয়ে উঠবে, তার পূর্ব্বাভাস হিণ্ডেনবার্গের অশীতি বৎসরের জয়ন্তী-উৎসবে প্রতিভাত হয়েছিল।

আলোচ্য বইখানির অনেক স্থানে আবেগের অতিভাষ দৃষ্টিকটুভাবে ফুটে উঠেছে। পড়ার সময় স্বতঃই মনে হচ্ছিল যে রাজকর্ম্মচারীর অভিজ্ঞতা-কাহিনী সত্যের অতিরঞ্জন বা অবদমনশূন্য হতে পারে না। কর্ত্তব্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিত ও পরিমণ্ডল তাদের এতই সঙ্কীর্ণ যে কোন সমস্যারই সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ চোখে পড়ে না—অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারের ওপর অযথা বিশ্লেষণের ঝোঁক পড়ে—অথচ অতিরিক্ত সন্নিধির জন্যে অনেকে অর্থগর্ভ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতীতি অবধারণে অক্ষম হয়।

অবশ্য লক্হার্টের আত্মকথায় সত্যের ব্যত্যয় হয়েছে বেশীর ভাগ অন্তরঙ্গ জীবন-কাহিনীতে এবং সেইজন্যে যারপর নাই হতাশ হয়েছি। মনস্তাত্বিক সত্যশীলতা জীবন-কাহিনীতে অপরিহার্য্য গুণ না হতে পারে কিন্তু আমার আশার বিস্তার বেড়ে উঠেছিল গোড়ার দিকের এই কটা কথায়:

From my early youth I have had an instinctive capacity for extracting the full flavour from an experience.

আমার দুঃখ যে বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ার পর এ উক্তির সার্থকতা পেলাম না। রাশিয়ার জীপসী নৃত্যের তালে তালে তাঁর ধমনীর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে—বেহালার সুরকম্পনে তাঁর উদাস চিত্ত উধাও হতে পারে দুস্তর পারাবারে, কিন্তু তার সঙ্গে পাঠক হৃদয়ের সংযোগ কোথায়?

আর একটি কথা না বলে সমালোচনা শেষ করতে পারছি না এবং সেজন্য যদি আমার মতো পাঠকের চিত্তও তিক্ত হয় তার জন্য দায়ী স্বয়ং বিধাতা—কারণ তিনিই হরিদ্রা ও কৃষ্ণ বর্ণের জাতি সৃজন করেন এবং এখন লক্হার্টের চিত্ত-পীড়ন করে আলোচ্য গ্রন্থের ফাঁকে ফাঁকে দু একটি কটু কথা বলিয়ে নিয়েছেন।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Letters of Gerard Manley Hopkins to Robert Bridges. The Correspondence of Gerard Manley Hopkins and Richard Watson Dixon : (Oxford University Press.) 2 Volumes.

সমরোত্তর যুগের ইংরেজী কবিতার উৎকর্ষবিচারে তর্কের অন্ত নাই, কিন্তু তাহার আবর্ত্তনের গতি যে অত্যন্ত দ্রুততাল, একথা তর্কাতীত। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে আজিকার দেবতা আগামী কল্যে পূজা পাইতেছেন না। তৃতীয় দশকে যে এলিয়টের প্রভুত্ব ছিল অবিসংবাদিত, চতুর্থ দশক পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি হইয়া উঠিতেছেন অতীতসংখ্যা। অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লুইস প্রভৃতি অতি সাম্প্রতিক কবিরা তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আর এলিয়টীয় প্রত্যয়বিহীন পতিত জমিতে আবদ্ধ নন। তাঁহারা সন্ধান পাইয়াছেন এমন একটি কবির যাঁহার রচনা ভাষায় ছন্দে ও ভাবে বিদ্রোহপ্রবণতা ও রক্ষণশীলতার অপূর্ব্ব সমন্বয়। এই কবিটির নাম—জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স্।

হপকিন্স্-এর কবিজীবনের ইতিহাসও কম বিস্ময়কর নয়। ভাবিতে অবাক লাগে, যে-হপকিন্স্-এর দিব্য প্রতিভায় আজ ইংলণ্ডীয় কাব্য-জগৎ উদ্ভাসিত, বছর পাঁচেক আগেও তাঁহার নাম প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ওয়ার্ড-প্রমুখ যাঁহারা ত্রিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা হপকিন্স্-এর নাম হয় জানিতেন না, না হয় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অথচ হপকিন্স্ জন্মিয়াছিলেন ১৮৪৪ অব্দে ও তাঁহার মৃত্যু ঘটে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ১৮৮৯ সালে। অর্থাৎ কালাক্রমের দিক দিয়া তিনি রোজেটি মরিস্ সুইনবার্ণ-এর সমসাময়িক। এই সুবিখ্যাত প্রিরাফেলাইটগণ, যাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে আপন আপন প্রতিভাবলে সাহিত্যের ইতিহাসে নিজেদের আসন কায়েমী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত হপকিন্স্-এর মিল ঐ সমকালীনতা পর্য্যন্ত। তাঁহার

স্বকীয়তা এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে ইহার অতিরিক্ত সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সেযুগে তাঁহার কবিতা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষিত হইত, তাহা বোধহয় নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একথা বলার কারণ এই যে তাঁহার কবিতা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার কারণ পরে দেখানো যাইবে। ১৯১৮ সালে ব্রিজেস তাঁহার কবিতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকের অনুযোগ, প্রকাশে এই বিলম্ব করিয়া ব্রিজেস তাঁহার মৃত নির্ভরশীল বন্ধুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। মনে হয়, এ অনুযোগ ভিত্তিহীন। ব্রিজেস জানিতেন যে হপকিনস-এর কবিতা এমনই অপ্রচলিত ধরণের, এমনই বিভিন্ন, যে প্রকাশিত হইলেই আদৃত হইবার সম্ভাবনা কম। তাই তিনি ধীরে ধীরে পাঠক মনকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। হপকিন্‌স্-এর কবিতা হস্তলিখিত অবস্থায় অনেককে পড়িতে দেওয়া হইত। বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি কবিতা ব্রিজেস চয়ন-গ্রন্থে নিবেশিত করিয়াছিলেন, যাহাতে হপকিন্‌স্ সম্বন্ধে রস-সন্ধানী পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। তাঁহার রচিত চয়নগ্রন্থ, "দি স্পিরিট অব্ ম্যান" প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিজেস বুঝিলেন, এইবার হপকিন্‌স্‌কে সাধারণে প্রচার করার সময় আসিয়াছে। ব্রিজেস যে বিলম্ব করিয়া ভুল করেন নাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, ১৯৩০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন হইল—ব্রিজেস প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে সময় লাগিল বারো বৎসর।

১৯৩০ হইতে আরম্ভ হইল খ্যাতির আকাশে হপকিন্‌স্‌এর ভাগ্য-তারকার উর্দ্ধগতি। পাঠকসমাজ আজ শুধু তাঁহার কাব্য পড়িয়া নিবৃত্ত হইতে চাহে না, কবির জীবন সম্বন্ধে তাহার সশ্রদ্ধ কৌতূহল অদম্য। লাহি-প্রণীত জীবনচরিতেও সে আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। তাঁহার পত্রাবলী সুবৃহৎ দুই গ্রন্থাকারে তিরিশ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। শুধু হপকিন্‌স্ নহে, যুরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহাদের আন্তরিক দরদ অছে, গ্রন্থ দুটি তাহাদের নিকট অমূল্য সম্পদ। ইংরেজী সাহিত্যে কীটস্-এর পত্রাবলী ইহাদের একমাত্র তুলনাস্থল, যদিচ বর্ত্তমান পত্রাবলী অনেকাংশে ব্যাপকতর।

হপকিন্‌স্, ব্রিজেস ও ডিক্‌সন্, ইহাদের পরস্পর সম্পর্কও বিচিত্র। তিনজনই অক্‌সফোর্ডের ছাত্র, তবে ঠিক সমসাময়িক নয়। ডিক্‌সন্ বয়োজ্যেষ্ঠ। অক্‌সফোর্ড ছাড়িয়া ইংলিশ চার্চ্চে চাকরী লইবার পূর্ব্বে দিনকতকের জন্য তিনি হাইগেট স্কুলে শিক্ষকতা করেন, যেখানে হপকিন্‌স্ ছিলেন ছাত্র। তখন শিক্ষকে ছাত্রে মুখচেনা হইয়াছিল, আলাপ হয় নাই। স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় ডিক্‌সন্ ওখানকার একজন শিক্ষককে স্বরচিত কবিতাপুস্তক উপহার দিয়া যান। বইটি ক্রমে হপকিন্‌স্-এর হাতে পড়িলে তিনি তাহার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তখনও আলাপের সূত্রপাত হয় নাই। অক্‌সফোর্ডে হপকিন্‌স্ ও ব্রিজেস সমসাময়িক কাব্যানুরক্ত ছাত্র হিসাবে আসেন। ব্রিজেস তখন সাহিত্যের ছাত্র নন, তিনি পড়িতেন চিকিৎসাশাস্ত্র ও এরূপ শোনা যায় যে ভবিষ্যতে তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটিল এই অক্‌সফোর্ড জীবনেই। অক্‌সফোর্ডে তখন নিউম্যানের যুগ—ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই তাঁহার প্রভাবের কথা অবগত আছেন। সে প্রভাবে হপকিন্‌স্‌কে পাইয়া বসিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া

জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। এ সংসারত্যাগ পরাজিত-মনোভাব-উদ্ভূত নহে। ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেক উপায় হপকিন্‌স্-এর করায়ত্ত ছিল। তাঁহার কবিতা পুরস্কৃত হইয়াছিল, তাছাড়া ক্ল্যাসিক্‌স্, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা ছিল অসামান্য। তাঁহার মতো মনীষাসম্পন্ন ছাত্র অক্‌সফোর্ডের ইতিহাসেও বিরল। সৌন্দর্য্য-বিরূপ বৈরাগ্যপ্রবণ মন যে তাঁহার নয়, তাহার বহু নিদর্শন তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। বহিঃপ্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভার তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত, নরদেহের গৌরবও তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইত না। তাঁহার এক ধর্ম্মভাই এইরূপ লিখিয়াছেন—

"I have rarely known anyone who sacrificed so much in undertaking the yoke of religion. If I had known him outside, I should have said that his love of speculation and originality of thought would make it impossible for him to submit his intellect to authority."

তবু ভগবৎ-উপলব্ধির প্রেরণা যখন আসে, তখন এমনই নিষ্ঠুর সর্ব্বাধিকারী-রূপেই তা দেখা দেয়। হপকিন্‌স্ তরুণজীবনের সমস্ত আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া এমন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন যাহার মূলমন্ত্র চরম বিনতি, একান্ত আত্মসমর্পণ চার্চ্চের নিকট, উচ্চতমের নিকট। এই পথ অবলম্বনের পর হপকিন্‌স্ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ডিক্‌স্‌নকে পত্র লেখেন। এই যে পত্রবিনিময় সুরু হইল তাহা এখন সুসজ্জিত ও সুসম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ডিক্‌সনের কবিতাগ্রন্থগুলি লোকসমাজে এখন আর অপরিচিত নাই। কিন্তু তাহার মূলে হপকিন্‌স্। তিনি যখন তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, তখন এক রোজেটি ব্যতীত কেহই ডিক্‌সনের তারিফ করেন নাই। হপকিন্‌স্-এর মধ্যস্থতাতেই ব্রিজেস-এর সহিত ডিক্‌সন-এর পরিচয় ঘটে। এ বিষয়ে যাঁহারা আরো জানিতে চাহেন, তাঁহারা ব্রিজেস-সম্পাদিত ডিকসন-এর নির্ব্বাচিত কবিতাগ্রন্থে তাঁহার স্মৃতি-লিপি পড়িয়া দেখিতে পাবেন।

ব্রিজেস-এর সহিত পত্রব্যবহার সুরু হয় জেসুইট দলভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা এক্ষেত্রে দুপক্ষের পত্র পাই না; ব্রিজেস তাঁহার নিজের সমস্ত পত্র বিনষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ অনুমান-সাপেক্ষ। হারবার্ট রীড ব্রিজেস-কে দেখিতে পাবেন না। তাই তিনি অনুমান করেন, লোকচক্ষে অশ্রদ্ধেয় হইবার ভয়ে। কাব্যরচনা-প্রণালী, জীবনাদর্শ-অনুসন্ধান প্রভৃতি মূলগত বিষয়ে ব্রিজেস-এর ছিল হপকিন্‌স্-এর সহিত গভীর মতভেদ। কাজেই যে পাঠক হপকিন্‌স্‌কে গ্রহণ করিবে, সে বাধ্য হইবে ব্রিজেসকে বর্জ্জন করিতে। আমার মনে হয়, হারবার্ট রীড-এর এ ধারণা মানসিক বিদ্বেষ-সঞ্জাত। আসল কারণ, বোধ হয়, ব্রিজেস-এর স্বাভাবিক অনাড়ম্বরশীলতা, যাহার জন্য তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখনেও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। একথা ঠিক হপকিন্‌স্ ও ব্রিজেস-এ মতভেদ মূলগত ও গভীর। জেসুইট সম্প্রদায়কে ব্রিজেস দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার প্রধান কারণ ছিল, এ-দল হপকিন্‌স্-এর মতো প্রতিভাকে কাব্যসৃষ্টি হইতে বিরত করে। দলে ভর্ত্তি হইবার সময় হপকিন্‌স্ তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বরচনা পোড়াইয়া ফেলেন; ও তাঁহার উর্দ্ধতনদের আদেশ ব্যতীত

কবিতা ছাপানো দূরে থাক, লিখিতেও চাহিতেন না। ব্রিজেস ও ডিক্‌সন্ বহুবার তাঁহাকে কবিতা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু হপকিন্‌স্ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার উপর কাজের চাপও ছিল এত যে কবিতা লেখার, এমন কি কবিতা পড়ার অবসরও হপকিন্‌স্ অতি অল্প পাইতেন। অথচ অপরের বেলায় হপকিন্‌স্ কবিতা প্রকাশের বিরোধী ছিলেন না। ব্রিজেসকে একপত্রে তিনি লিখিতেছেন :—

"I would have you and Canon Dixon and all true poets remember that fame, the being known, though in itself one of the most dangerous things to man, is nevertheless the true and appointed air, element, and setting of genius and its works.

অন্য এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"A great work by an Englishman is like a great battle won by England. It is an unfading bay tree. It will even be admired by and praised by and do good to those who hate England (as England is most perilously hated), who do not wish even to be benefited by her. (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এ স্বাঁষটুই কবির আয়ার্ণ্ড-নিবাসের ফল; তখন দুই দেশে ভীষণ বিবাদ, হপকিন্‌স্-এর মন ছিল আইরিশদের পক্ষে—গ্ল্যাডষ্টোনকে তিনি ঠাট্টা করিয়াছেন, Grand Old Mischief-maker বলিয়া)।

যে ব্রিজেস কাব্য-সরস্বতীর উপাসনাকেই জীবনের চরম সাধনা বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন তিনি যে-সাধনায় নিয়োগ করিয়া শেষ বয়সে "দি টেষ্টামেণ্ট অব বিউটি" লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিকট হপকিন্‌স-এর চার্চ্চ-আনুগত্য অতিশয় বিসদৃশ লাগিত। ডিক্‌সন্ জেস্থইট না হইলেও চার্চ্চ-ধর্ম্মী। তাই তিনি হপকিন্‌স্-এর জীবনযাত্রাকে যতটা দরদ দিয়া দেখিতে পারিতেন, চার্চ্চ-বহির্ভূত অথচ আদর্শবাদী ব্রিজেস তাহা পারিতেন না। কাব্য সম্বন্ধে হপকিন্‌স্-এর নিঃস্পৃহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ডিক্‌সন্ লিখিয়াছিলেন :—

"So I will say nothing, but cling to the hope that you will find it consistent with all that you have undertaken to pursue poetry still. Surely one vocation cannot destroy another ; and such a society as yours will not remain ignorant that you have such gifts as have seldom been given by God to man."

এ সম্বন্ধে ব্রিজেস্-এর উক্তি আমরা পাই না। কিন্তু হপকিন্‌স্-এর প্রতিবাদ হইতে অনুমান করা যায় যে তাহার সুর নিশ্চয়ই আরো চড়া হইত। এই তিন বন্ধু পরস্পর কাহাকেও রেয়াৎ করিয়া কথা কহিতেন না, ইহা এই পত্রাবলীর প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে বিশাল পাঠক সামাজের উপর চোখ রাখিয়া ইঁহাদের লিখা হয় নাই, ইহারা হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিত। ইঁহারা পরস্পরের রচনার সমালোচনা করিতেন এমন সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া যাহা মাঝে মাঝে মর্ম্মচ্ছেদী হইয়া উঠিত। কিন্তু ত্রুটি আবিষ্কারে ইঁহাদের—বিশেষ করিয়া ব্রিজেস ও হপকিন্‌স্—যেমন আলস্য বা সঙ্কোচ ছিল না, ত্রুটিত্ব স্বীকারেও তেমনি কুণ্ঠা বা কার্পণ্য ছিল না। তাই দেখিতে পাই, হপকিন্‌স্-এর ছন্দ-পরীক্ষণকে

ব্রিজেস বলিতেছেন, "presumptious jugglery" ও রাগের চোটে বানানে ভুল করিয়া বসিতেছেন; দেখিতে পাই, হপকিন্‌স্ বলিতেছেন, I say it because you always were and I see you still are given to conceit"। আবার অন্য দিকে দেখিতে পাই ডিক্‌সন্ হপকিন্‌স্‌কে লিখিতেছেন,—

"Bridges struck the truth long ago when he said to me that your poems more carried him out of himself than those of any one."

আর হপকিন্‌স্ ব্রিজেসকে লিখিতেছেন ;—

"I connot think of altering anything. Why should I ? I do not write for the public. You are my public and I hope to convert you.

You say you would not for any money read my poem again. Nevertheless I beg you will. Besides money, you know, there is love.

আর একটি পত্রে :—

"If I were not your friend I should wish to be the friend of the man that wrote your poems. They shew the eye for pure beauty and they shew, my dearest, besides, the character which is much more rare and precious.

এখানে ইহাও স্মর্ত্তব্য, হপকিন্‌স্-এর শেষ চিঠি ব্রিজেস-এর নিকট ও শেষ কবিতা ব্রিজেস-এর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি সনেট।

'প্রাঙ্ রীদম্', এই কথাটি হপকিন্‌স্-এর কবিতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার অর্থ কি ও বিশেষত্ব কি ; তিনি কেন বাধ্য হইয়াছিলেন উহার আবিষ্কার অথবা পুনরুজ্জীবন করিতে, ইহা ছন্দের অতিরিক্ত বন্ধন, না বন্ধনরিক্ত ব্যাভিচার; এ সমস্ত আলোচনায় যাঁহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহারা এই পত্রাবলী মন দিয়া পড়িয়া দেখুন ও অপেক্ষায় থাকুন হপকিন্‌স্-এর সেই সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রের যাহা তিনি কাডেষ্টি প্যাটমোরকে লিখিয়াছিলেন। এখানে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বর্ত্তমানে এমন ইংরেজী কবিতাই দুর্লভ যাহাতে হপকিন্‌স্-এর ছন্দ গঠনের বা শব্দ প্রয়োগের প্রভাব না মেলে। আজকালকার অনেক স্বেচ্ছাচারিতার জন্যও তাঁহাকে দায়ী করা চলে। কারণ, হপকিন্‌স্ অতিমাত্রায় স্বকীয়; পরের ব্যবহৃত কোন কিছুই লইব না, ইহা যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ফলে স্বকীয়তা অনেক স্থলে উদ্ভটতায় নামিয়া আসিয়াছে। এ ত্রুটি সত্যসন্ধানী করিব দৃষ্টি এড়ায় নাই।

"No doubt, my poetry errs on the side of oddness. I hope in time to have a more balanced and Miltonic style. But as air, melody is what strikes me most of all in music and design in painting, so design, pattern, or what I call inscape is what I, above all, aim at in poetry. Now it is the virtue of design, pattern or inscape to be distinctive, and it is the vice of distinctiveness to become queer. This vice I cannot have escaped.

দুঃখের বিষয়, হপকিন্‌স্-পন্থী কবিরা এই পার্থক্যটি প্রায়ই মনে রাখিতে পারেন না।

পত্রাবলী পড়িতে পড়িতে একটি প্রশ্ন বারবার মনকে উত্তেজিত করে, বস্তুত

হপকিন্‌স্‌-এর সম্বন্ধে তাহাই কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, জেস্থইট-চার্চ্চে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাব্য-জীবন ব্যাহত হইয়াছিল কিনা। এ-জটিল প্রশ্নের সুনির্দ্ধারিত মীমাংসা নরলোকের ক্ষমতাতীত। ইহাতে সন্দেহ নাই, বাহিরে থাকিলে তাঁহার কবিতা সংখ্যায় বাড়িত। আবার ইহাও সত্য, তাহা হইলে তাঁহার কবিতার সারমর্ম্ম অন্যরূপ হইত। কারণ, হপকিন্‌স্‌-এর কবিতা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদৃঢ়প্রোথিত। আমি গুণতির অপেক্ষা গুণের পক্ষপাতী; হপকিন্‌স্‌-এর কবিতায় যে বিশেষ গুণটি রূপময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অতি বিরল, সুবিশাল ইংরেজী সাহিত্যে তাহার অনুরূপ কিছু মেলে কিনা সন্দেহ; মিল্‌টনের সহিত তাঁহার ন্যায়সঙ্গত তুলনা চলে না; তাঁহাকে মিষ্টিক বলিলে এই বহু-অপব্যবহৃত কথাটির পুনঃ অপব্যবহার করা হয়; যদি কাহারও সহিত তাঁহার সাদৃশ্য থাকে তবে তাহা তাঁহারই মতো বৈশিষ্ট্যবান্‌ কবি ডান্‌-এর সহিত। আমার মনে হয় এ বৈশিষ্ট্য চার্চ্চ-সংযোগের ফল। ডান্‌ও ছিলেন পুরোহিত-কবি। হপকিন্‌স্‌ তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনকে কি নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি যখন পড়ি;—

When a man has given himself to God's service, when he has denied himself and followed Christ, he has fitted himself to receive and does receive from God a special guidance, a more particular providence. This guidance is conveyed partly by the action of other men, as his appointed superiors, and partly by direct lights and inspirations. If I wait for such guidance, through whatever channel conveyed, about anything, about my poetry for instance, I do more wisely in every way than if I try to serve my own seeming interests in the matter. Now if I value what I write, if I do myself, much more does our Lord. And if he chooses to avail himself of what I leave at his disposal he can do so with a felicity and with a success which I could never command. And if he does not, then two things follow; one that the reward I shall nevertheless receive from him will be all the greater; the other that then I shall know how much a thing contrary to his will and even to my own best interests I should have done if I had taken things into my own hands and forced on publication. This is my principle, and this in the main has been my practice; leading the sort of life I do here it seems easy, but when one mixes with the world and meets on every side its secret solicitations, to live by faith is harder, is very hard; nevertheless by God's help, I shall always do so.

অন্যত্র: My vocation puts before me a standard so high that a higher can be found nowhere else.

বিস্ময়ের কথা এহেন ব্যক্তিত্ব-নিরোধী লোক অন্য একটি কবি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

He has all the gifts that make a poet excepting only that last degree of individuality which is the most essential of all.

আরো বিস্ময় লাগে যখন দেখি হপকিন্‌স্‌-এর মতো চার্চ্চ-অনুরক্ত ব্যক্তি

লিখিতেছেন ১৮৭১ সালে, যখন কমিউনিজম আজিকার মতো ফ্যাশান বা প্যাশান হইয়া দাঁড়ায় নাই—

I must tell you I am always thinking of the Communist future. I am afraid some great revolution is not far off. Horrible to say, in a manner I am a communist.

হপকিন্‌স্‌ গোঁড়া খৃষ্টান হইয়াও কমিউনিষ্ট; বর্ত্তমান ইংলণ্ডের অনেক তরুণ কবি গোঁড়া কমিউনিষ্ট, খৃষ্টান কিনা জানি না। তাঁহারা হপকিন্‌স্‌-এর গুরু বলিয়া মানেন। যদি এই গুরুভক্তির ফলে তাঁহারা আদর্শ-নিষ্ঠার সহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় করিতে শিখেন, হতাশার চোরা বালিতে মুহ্যমান না হইয়া জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেন; যদি, ব্রিজেস-এর ভাষায়, হপকিন্‌স্‌-এর plumage of far wonder and heavenward flight তাঁহার শিষ্যবর্গকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হপকিন্‌স্‌-এর কঠিন শৃঙ্খল-শাসিত ধর্ম্মজীবন তাঁহার অসাধারণ মনীষা-মণ্ডিত কাব্যজীবনের সার্থকতার পথে অন্তরায় হয় নাই।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Nature of Mathematics—By Max Black, (Kegan Paul).

গণিতের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কাণ্ট্‌ শুধাইয়াছিলেন উক্ত শাস্ত্র প্রকৃত-পক্ষে বিকলনমূলক, না সঙ্কলনমূলক—analytic না synthetic? এ-প্রশ্নের জবাব দিবার সময় যদিও অধিকাংশ গণিতব্যবসায়ীরই নাই, তবু ইহা প্রত্যেক দার্শনিকেরই জিজ্ঞাস্য। গণিত কি কেবল বহিরায়তনিক গঠনবৈশিষ্ট্যের পর্য্যালোচনায় আবদ্ধ? ভিত্তিগত স্বয়ংসিদ্ধগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই কি উহার উদ্দেশ্য? উহা কি formal logic অথবা প্রকারক ন্যায়ের অঙ্গমাত্র, এবং ২+৩=৫ ইত্যাদি সমীকরণ-গুলি কি শুধুই পুনর্ব্বাদ—tautology? তবে কি গণিতের সংজ্ঞা petitio principii-নামক সিদ্ধসাধন-দোষে দুষ্ট? গণিতের সঙ্গে বহির্জ্জগতের সম্পর্ক কি? উহাতে যে যুক্তির প্রয়োগ হয়, তাহার প্রচ্ছদপটে কি বস্তুবিশ্ব চিত্রাপিত থাকে, না কি উহা নিরঞ্জন ও নিরপেক্ষ? উপরোক্ত পুস্তকে এই সকল সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা আছে, এবং বইখানির বেশির ভাগই রাসল্‌ ও হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিচার ও বিবেচনায় পূর্ণ। ব্ল্যাক্‌ এই মতের নাম দিয়াছেন 'লজিষ্টিক্‌স্‌', এবং শুধু ইহার আলোচনা করিলে পাছে গ্রন্থের ভারসাম্য নষ্ট হয়, সেই ভয়ে লেখক এই সংক্রান্ত আরো দুইটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একটি হিল্‌বার্ট্‌-প্রবর্ত্তিত 'ফর্ম্যালিজ্‌ম্‌' যাহা লজিষ্টিক্‌স্‌-এর নিকট আত্মীয়, অন্যটি ব্রুয়ার-প্রচারিত 'ইণ্টুইশনিজ্‌ম্‌' যাহার জনক স্বয়ং কাণ্ট্‌। গ্রন্থের কোথাও একদেশদর্শিতা নাই, এবং ফলত লেখকের পক্ষপাতশূন্য বিবৃতি দুই শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনে লাগিবে—যে-গণিতজ্ঞ তত্ত্ব-সম্বন্ধে সজাগ হইতে চান এবং যে-দার্শনিক তথ্য-সম্পর্কে উদাসীন নন।

এই তিন সম্প্রদায়ের কার্যক্রম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা সহজ নহে, এবং লজিষ্টিক্‌স্‌-এর ক্ষেত্রে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এ-গুলির মধ্যে ফর্ম্যালিজ্‌ম্‌-ই সব চেয়ে সুবোধ্য; এবং ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে বোলিয়ে ও লোবাচেভ্‌স্কি জ্যামিতিকে সমান্তরালবাদ হইতে মুক্তি দেওয়াতেই উহা সম্ভব হইয়াছে। ফলে জ্যামিতির রাজ্যে ইউক্লিডকে আর সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। বিভিন্নধর্ম্মী স্বতঃসিদ্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য জ্যামিতিও আজ সমান মর্য্যাদায় অধিকারী। নূতন নূতন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে জ্যামিতির পক্ষে সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের অন্তরঙ্গ সুসঙ্গতি ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। অল্পে অল্পে গণিতের অপরাপর বিভাগেও এই বিশ্বাসের প্রভাব ছড়াইয়া গিয়াছে, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বতোবিরোধের নিরাকরণই আজ গণিতশাস্ত্রের সার্ব্বত্রিক আদর্শ। ফর্ম্যালিষ্টদের মতে গণিত ন্যায়শাস্ত্রের মতো, বিষয়বস্তুর সহিত তাহার মূলগত কোনো সম্পর্ক নাই। আধুনিক কোয়ান্টাম্‌ গতিবিজ্ঞানও এই মতের সমর্থন করে।

ইন্টুইশনিষ্টরা এই সিদ্ধান্তে নায় দিতে অপারগ। গণিতের যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বজ্ঞার অনধিকার প্রবেশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া তাঁহারা বলেন যে প্রত্যয়কে প্রত্যক্ষগোচর করিতে না পারিলে গণিতের কোনো নির্দ্দেশই মানুষের শিরোধার্য্য হইতে না। যে তত্ত্ববিচারে আমাদের রূপগঠনকারী অন্তর্দৃষ্টি অচল, সেইখানেই গণিত আর প্রামাণ্য থাকে না। অবশ্য বিশ্লেষণমূলক পুনর্ব্বাদের কথা স্বতন্ত্র; সেখানে নূতন জ্ঞানের অবকাশ নাই বলিয়া প্রত্যয়গুলির মূর্ত্তি-পরিকল্পনা অনাবশ্যক। কিন্তু নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যয়মাত্রেরই সাক্ষাৎ উপলব্ধি অপরিহার্য্য; এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যয়কে মূর্ত্ত করিতে না পারিলে নূতন জ্ঞানার্জ্জন যেহেতু অসাধ্য, তাই ইন্টুশনিষ্টদের কাছে law of excluded middle অর্থাৎ মধ্যনিরসনের নিয়ম সাধারণত অগ্রাহ্য। রাম যে শ্যাম নহে, এই বাক্য যদি মিথ্যাও হয়, তবু রামই যে শ্যাম ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না। ওই শেষোক্ত বাক্য প্রমাণ করিবার জন্য রাম ও শ্যামের মধ্যে সাক্ষাৎ সাদৃশ্য অনুভূত হওয়া চাই।

লজিষ্টিশিয়নরা গণিতকে ন্যায়াতিরিক্ত যুক্তিপ্রকরণ বলিতে অনিচ্ছুক। ন্যায়কে বিস্তৃত করিয়া, তাহার মধ্যে গণিতকে বসানোই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই তাঁহারা প্রথমত ন্যায়শাস্ত্রকে গণিতানুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্থাৎ উপযুক্ত সাঙ্কেতিকের সাহায্যে তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে সম্প্রসারিত করিতে চান, যাহাতে আজ না হোক, অন্তত অচির ভবিষ্যতে গণিত উক্ত নববিধানে অবলীলাক্রমে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু এই অদ্ভুত ও ভয়াবহ পরিভাষাই লজিষ্টিক্‌স্‌-এর মর্ম্মগ্রহণে প্রধান অন্তরায়। যাঁহারা অসতর্ক পাঠক, বিশেষজ্ঞ নহেন পরন্তু গ্রাহী, তাঁহাদের পক্ষে সেই চিহ্নবিন্যাস এমনি প্রহেলিকাময় যে লজিষ্টিক্‌স্‌-এর নাম শুনিয়াই তাঁহাদের তৃষ্ণ থাকিতে হইবে, তাহার অধিক আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীসীতেশচন্দ্র কর

Prefaces—By Bernard Shaw (Constable).

বছর চারেক ব্যাঙ্কের চাকুরি করে বিশ বছর বয়সে বার্ণার্ড শ ডাবলিন ছাড়লেন। ব্যাঙ্কের কাজে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে মার্গে সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিভার মার্গ অন্যতর, ক্ষেত্রও অন্যত্র। এরূপ অস্পষ্ট বোধ নিয়ে তিনি লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁর মা ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষয়িত্রী। বড় ঘরের মেয়ে, স্বামী মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছেন বলে নিজকে উপার্জ্জনের উপায় দেখতে হয়।

হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন চাকুরী কর, মার সাহায্যে লাগ। কেউ কেউ চাকুরীও যোগাড় করে দিলেন। শ কিন্তু দরিদ্রা মায়ের গলগ্রহ হয়ে বছরের পর বছর কাটালেন। এটা ওটা খুচরা কাজ করেন, কোনো গানের আসরে পিয়ানো বাজান, কোনো সঙ্গীত সমালোচকের সহকারী হয়ে সমালোচনা লিখে দেন। টেলিফোন কোম্পানীতে যোগ দিয়ে বেশী দিন মন লাগে না, তবু সেই উপলক্ষে লণ্ডনের সর্ব্বত্র ঘুরে দেখা হয়। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারী যে দিন বিনা মাশুলে খোলা থাকে সে দিন মূর্ত্তি বা ছবি দেখে বেড়ান।

প্রতি রাত্রে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে পাঁচ বছরে পাঁচ খানা নভেল লিখে ফেল্লেন। কোনো প্রকাশক সে সব নভেল ছাপল না। তখন তিনি লিখলেন খবরের কাগজে রঙ্গ সমালোচনা। থিয়েটারের, কনসার্টের, প্রদর্শনীর। পাঁচ বছরের নীরব সাধনায় ভাষা শিখেছিলেন। সঙ্গীত তাঁর মায়ের কাছে শেখা, অভ্যাস করে আসছিলেন। আর তাঁর হাস্যরস তাঁর স্বভাবগত। লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ বিদূষক বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। অমনি তাঁর উপর হল অর্থবৃষ্টি।

ইতিমধ্যে তিনি কার্ল মার্ক্সস পড়েছিলেন। তাৎকালীন সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। ব্যক্তিগত সাফল্যের মোহ তাঁর ছিল না। নতুন সমাজের আইডিয়া তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। তিনি সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতেন। সেই বক্তৃতাই হাস্যরসের সহিত ওতপ্রোত হয়ে অভিনয় সমালোচনা আকারে পত্রিকার পাতে পরিবেশিত হল। যে মানুষের নিজের কোনো বাঁধন নেই লোভ নেই সংস্কার নেই তাকে ঠেকায় কিসে? তার উপর রাগ করলে সে ভয় পায় না, তাকে গালাগাল দিলে সে তামাসা করে, তার সঙ্গে তর্কে নামলে সে নাকাল করে ছাড়ে।

একটি ছোট থিয়েটারে ইবসেনের নাটক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডে কেন অমন নাটক লেখা হয় না? শ বল্লেন, আচ্ছা, আমি লিখছি। তাঁর প্রথম নাটক "Widowers' Houses" চারিদিকে নিন্দার ঝড় তুল্ল। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি নাটক লিখতে পারেন এবং যা আজ নিন্দার ঝড় তাই কাল স্তুতির ঝড় হবে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে থিয়েটারই তাঁর চার্চ, নাটকই তাঁর সার্মন। একদিন চার্চ খালি করে লোক থিয়েটারে আসবে ধর্ম্মের ব্যাখান শুনতে।

তাঁর ধর্ম্ম তিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সে ধর্ম্মের তত্ত্ব হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন, আর কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে সোশ্যালিজম্‌। বিবর্ত্তনবাদ প্রচলিত হয়ে অবধি পরমপিতা পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ তিমি পর্য্যন্ত সকলের এককালীন

স্রষ্টা এ ধারণা সুধীজনের পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিবর্তন সম্বন্ধে সেকালের লোক ডারউইনকে একমাত্র প্রমাণ্য বলে গ্রহণ করায় ব্যক্তিসম্পত্তিবাদীদের বিবেক দরিদ্রের দুঃখ দেখে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছিল না। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। ধনিকরাই যোগ্যতম, তারাই থাকবে। শ্রমিকরা মরবে। প্রকৃতির নিয়ম যন্ত্রের মত অমোঘ ও নির্মম। সেই যন্ত্রের দ্বারা প্রতি-নিয়ত বাছাই-য়ের কাজ চলেছে। যারা প্রকৃতির আপন হাতে নির্বাচিত হল তারা পৃথিবীর প্রভু ও ভোক্তা। যারা বাতিল হল তারা ভারবাহী, তারা ভোগ করবে না, তারা ভুগবে।

ডারউইন কথিত বা ডারউইনের প্রতি আরোপিত এই হৃদয়হীন সমাচার কখনো মানুষের নব ধর্ম হতে পারে না, পুরাতন ধর্মের স্থান পূরণ করতে পারে না। এটা ধর্ম নয়, এটা ধনিকতন্ত্রের সাফাই। এ যদি ধর্ম হয় তবে চুরি ডাকাতিও ধর্ম। বার্ণার্ড শ তাই ডারউইনকে উপহাস করলেন। তিনি গেলেন ডারউইনের পূর্বগামী লামার্কের কাছে। প্রাণী আপনাকে ইচ্ছানুযায়ী বিবর্তিত করতে পারে, এত কাল তাই করে এসেছে। চিরকাল তাই করবে। প্রকৃতি একটা যন্ত্র নয়, প্রকৃতি পরীক্ষা করছে, ভুল করছে, ভুল করতে করতে ঠিক করছে, যা ঠিক করছে তাকে বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত করছে। ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের সমাজের গঠন পরিবর্তন করতে পারি, তার দ্বারা বংশের বিবর্তন ঘটাতে পারি, অতিমানব হয়ে উঠতে পারি। আর তা যদি না করি, যদি যন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করি, তবে পরিবর্তনশীলা পরীক্ষাপরায়ণা প্রকৃতি একদিন আমাদের উপর আস্থাহীন হয়ে অন্য কোনো প্রাণীকে শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত করবে। আমাদের প্রতি তার পক্ষপাতের হেতু নেই।

সমাজের গঠন কি রূপ হবে পুরাতন ধর্মপ্রবর্তকগণ তার সূচনা দিয়ে গেছেন। আমরা তার কালোপযোগী সংস্কার সাধন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সোশ্যালিজম। সঞ্চয় ও সম্পত্তি প্রায় প্রত্যেক প্রবর্তকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। যীশু বলেছেন উটের পক্ষে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বড় লোকের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ দুষ্কর।

অথচ সম্পত্তি না হলে মানুষের চলে না। চাষ করব, তার জন্য হাল লাঙ্গল চাই। বাগ করব, তার জন্য এক কাঠা জমি চাই। সম্পত্তি দোষের নয়, দোষের হচ্ছে ব্যক্তির স্বত্ব। সেইজন্য সোশ্যালিষ্টদের প্রস্তাব সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে যাক, ব্যক্তির যা দরকার তা ব্যক্তি নিক রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে। তা নইলে ধনী দরিদ্রের উপর প্রভুত্ব করতে থাকবে, দরিদ্রের সম্পত্তি কিনে নিয়ে তার স্বাধীনতা কিনে নিতে থাকবে। রাষ্ট্র সকলের সম্পত্তি গ্রহণ করে তার পরিচালনা করবে ও লভ্য হতে সকলকে সমান ভাগ দেবে। ব্যক্তির নিজের সঞ্চয় বলে কিছু থাকবে না, কারণ সঞ্চয়ই ত মূলধন, মূলধন থেকেই ত পরকে খাটিয়ে স্বয়ং লাভবান হওয়া। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কেবল সম্পত্তির ব্যবহার।

রাষ্ট্রের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করার আনুষঙ্গিক বিপদ এই যে রাষ্ট্রের চালক যারা হবে তারা চালনকার্য্যে অনিপুণ হতে পারে। নাবিক অনভিজ্ঞ

হলে জাহাজের ভরাডুবি। সাধারণত যারা ভোটের জোরে পার্লামেন্টে যায় ও পার্টির জোরে গবর্ণমেণ্ট দখল করে তাহাদের মূঢ়তা, অদূরদর্শিতা ও হৃদয়হীনতা এমন যে তাদের স্কন্ধে সকল সম্পত্তি ন্যস্ত করলে সর্বনাশ অনিবার্য্য। অতএব এক দল অতিমানব চাই। এদের প্রজনন করতে হবে যেমন করে উৎকৃষ্ট বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রজনন করা হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দ্বারা হবে আধান, শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা ধারণ। পরস্পরের সহিত দাম্পত্য জীবন-যাপনে এদের অরুচি থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ হিতায় জগদ্‌হিতায় চ এরা সাময়িকভাবে সঙ্গত হবে। ফলে যেসব সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তারাই হবে সকলের ভাগ্যবিধাতা।

বার্ণার্ড শ'র মতবাদের থেকে অতিমানবের আবশ্যকতা এমন অবিচ্ছেদ্য বলে সে মতবাদ সোশ্যালিষ্ট মহলেও উপেক্ষিত। ইংলণ্ডের সোশ্যালিষ্টরা অতিমানব চায় না, তারা চায় পক্ষপাতী ভোটার। বেশীর ভাগ ভোট যেদিন তাদের হস্তগত হবে সেদিন তারা অর্থাৎ তাদের নায়করা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ভোটারের নির্দেশ অনুসারে। ইংলণ্ডের সোশ্যালিষ্টরা ডিমোক্রেসীর উপর আশা রাখে। তার মানে বেশীর ভাগ লোকের মত যে একদিন তাদের মতবাদের অনুকূল হবে এ তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তা যদি হয় তবে একে একে রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, জমি ইত্যাদি রাষ্ট্রের হাতে আসবে, যেমন ইতিমধ্যে ডাকঘর, বেতার ইত্যাদি এসেছে।

রাশিয়ার ওরা অতিমানবের অপেক্ষা করে নি। লেনিনকে যদিও শ্রদ্ধা করে তবু লেনিনকে ওরা অতিক্রম করেছে। অতিমানব আর যাই হোন তিনি ব্যক্তি বিশেষ। ব্যক্তি বিশেষের জন্য কমিউনিষ্ট দর্শনে স্থান নেই। ব্যক্তিকে হতে হবে সমষ্টির সহিত একাত্ম। সমষ্টিচিত্তে যে চেতনা, সমষ্টিমানসে যে কল্পনা, সমষ্টি-হৃদয়ে যে আবেগ, সমষ্টিজীবনে যে উদ্দেশ্য, তোমার আমার ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু তাই প্রতিফলিত করবে। তুমি আমি সমষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তুমি আমি ইউনিট নই, ইউনিট হচ্ছে সমষ্টি। কাউকে যেমন মুখ দেখেই চেনা যায়, কাউকে গলা শুনে, তেমনি সমষ্টিকে চেনা যায় তোমাকে আমাকে দেখে। আমাদের আপন আপন পরিচয় নেই, আমরা সমষ্টির পরিচায়ক।

সমষ্টির উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে প্রতিমূর্ত হয়েছে, যারা সমষ্টির অন্তঃকরণস্বরূপ, তারা সমষ্টির পক্ষে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে, নাই বা হল তারা মেজরিটির প্রতিনিধি। তাদের নিজের বলতে কিছু নেই, না ধন না মন। কমিউনিষ্ট রাশিয়া, ফাসিষ্ট ইটালী ও নাৎসী জার্মানী এক্ষেত্রে এক মার্গী। তবে এদের প্রত্যেকে রাষ্ট্রসম্পত্তিবাদী নয়। দ্বিতীয় দুই দেশ কণ্টকের দ্বারা কণ্টকের উচ্ছেদ চায় বলে কণ্টকের অনুকরণ করেছে।

কাজেই গ্লেটো যে আশা করেছিলেন দার্শনিকরা শাসক হবে, গোপরা যে মনে করেছিলেন যাজকরা হবে শাসক, বার্ণার্ড-শ যে প্রস্তাব করেছেন অতিমানবরা শাসন করবে এর কোনোটার ললাটে সিদ্ধি লেখা নেই।

তারপর অতিমানবের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ রয়েছে। উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র প্রজনন করা যায় না। চিড়িয়াখানায় যে বাঘ জন্মায় সে যতই খাক যতই বাড়ুক যতই শিক্ষা পাক তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে সে খাস জঙ্গলী বাঘের এক

আঘাতে মারা পড়বে। তোমার অতিমানব উকীলের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বন্দ্বে জিতবে না, বেণের সঙ্গে দরাদরির খেলায় হার মানবে, সৈনিকের উচ্চাভিলাষের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পলিটিসিয়ানের চালবাজিতে মাৎ হবে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ আক্ষেপ করেছেন, তাঁর পুরানো কথা আ ও পুরানো হয়নি, সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগে চলছে না, মিথ্যা বড়াই করছে প্রগতির নামে। কিন্তু প্রগতি নাই হোক পরিবর্তন কি হয়নি? ধনী দরিদ্র বলে দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণী কি আছে? গরীবরাও কিছু না কিছু ব্যাঙ্কে জমাচ্ছে, শেয়ার কিনছে, সুদ ও ডিভিডেণ্ড পাচ্ছে। তারাও ছোটোখাটো ক্যাপিটালিষ্ট। ইংলণ্ডে এদের সংখ্যা শ'র জীবনকালে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনীরা যত ধনী হবে দরিদ্ররা তত দরিদ্র হবে মার্ক্‌সের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা কোথায়? ইংলণ্ডে বেকার সমস্যাও থাকত না যদি না ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর আয়ের আদর্শ বাড়ত। তারা যদি অল্পে সন্তুষ্ট হয় তবে দশজনের মজুরি কমিয়ে যা বাঁচে তা দিয়ে আরো দু'তিন জনের পোষণ হয়। শ্রমিক সাধারণের মজুরি বেড়েছে, খাটুনি কমেছে, ইনশিওরেন্স প্রবর্তিত হয়েছে, কিছু না হোক ডোল আছে। অন্যান্য দেশেও এই সকল সংস্কার অনুসৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে দারিদ্র্য রয়েছে, এবং দারিদ্র্য একটা নিরাবার্য ব্যাধি। এদিক থেকে দারিদ্র্যের শত্রু ও মানবের মিত্র বার্ণার্ড শ'র শেষ বয়সের আক্ষেপ তাঁর প্রথম বয়সের আপত্তির মতই সহেতুক। এর জন্য কাকে দোষ দেওয়া যায় জানিনে, কেননা শাসকরা সব দেশেই শাসিতের প্রকৃতি গ্রহণ করে, চাষা যেমন গোরুর পিছন পিছন ঘুরে গোরু ব'নে যায়। মানবের হিতৈষীরা হতাশ হয়ে মানবজাতিটাকেই তিরস্কার করেছেন, কোনো বিশেষ শ্রেণীকে না। মনে হয় শ'র অভিমান মানব জাতির প্রত্যেকের উপরে।

তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এখনো ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্বন্ধে আশান্বিত।

লীলাময় রায়

অন্তঃশীলা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, (ভারতী ভবন)

এতদিন এই মনস্বী লেখকের রচনা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, সঙ্গীত ও সাহিত্যবিষয়ক চিন্তাশীল প্রবন্ধেই নিবদ্ধ ছিল। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে পদার্পণ ধূর্জ্জটিবাবুর নূতন। ধূর্জ্জটিবাবু সবুজপত্র যুগের লেখক; তবু সেই সময় থেকে সুরু করে আধুনিক লেখকদের নিয়ে যদি গণ্ডী রচনা করা যায়, তবে বলতে হয় সে গণ্ডীর মধ্যে গুণগ্রাহী ধীমান প্রতিভাশালী লেখক ও সমালোচক যাঁরা আছেন, ধূর্জ্জটিবাবু তাঁদের অগ্রণী। শুধু রচনায় নয় পঠনেও ধূর্জ্জটিবাবুর সমতুল মেলা দুষ্কর। তাঁর অধীত বিদ্যার প্রাচুর্য্য তাঁর রচনা ও চিন্তাশীলতার অন্তরে অন্তরে পরিব্যাপ্ত। এমনও হয়েছে যে অনেকের কাছে এটা একটা নালিশের বিষয় যে তাঁর লেখার প্রধান উপজীবিকা পঠনাশ্রিত বুদ্ধি। বুদ্ধির এলাকা ও চিন্তার এলাকা এক কিনা ঠিক আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় আসলে ধূর্জ্জটিবাবু চিন্তার ব্যাপারী। এইজন্যই তাঁর

এক বইয়ের নামকরণ হয়েছে চিন্তয়সি। তাঁর প্রথম বই "আমরা ও তাঁহারা" এইজন্যই চিন্তা বনাম অনুষ্ঠান ও আপ্তবাণীর তর্কে মুখর। কিন্তু এখানে গ্রন্থকারের বহুমুখী অধ্যয়ন ও চিন্তাপ্রসূত রচনাবলীর মূল্য নিরূপণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য তাঁর গল্পউপন্যাসের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য লেখার যে যোগাযোগ আছে তারই প্রতি এই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই যোগাযোগের সূত্র গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতায়। ধূর্জ্জটিবাবুর গল্প ইতিপূর্ব্বেই সাহিত্যরসিকদের কাছে যোগ্য মর্য্যাদালাভ করেছে;—সে সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা অনাবশ্যক ও বাহুল্য। কিন্তু গল্পগুলির শ্রেণীবিভাগ করা আমি এখানে প্রয়োজন মনে করি। তাঁর এক শ্রেণীর গল্প বিবৃতিমূলক; কিন্তু এগুলির ঘটনাসমাবেশ নিজগুণে তেমন প্রতিষ্ঠা পায় না যেমন পায় বিবৃতিকারের অনুরাগ বা আবেগচিহ্নিত কথকালিতে। তাঁর অপর শ্রেণীর গল্প হোল চিন্তাশ্রিত,—ঘটনাসমাবেশ বা চরিত্র-সমাবেশের মধ্যে এর মূল সংস্থাপিত নয়, এর অবলম্বন নায়কের চিন্তাবৈচিত্র্য। এর পূর্ব্বে গ্রন্থকারের "রিয়ালিষ্টে" যে গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাদের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে; এবং দুই শ্রেণীর গল্প লেখাতেই ইনি প্রভূত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যদিও কারো কাছে প্রথম শ্রেণীর, কারো কাছে বা তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প বেশী সমাদর লাভ করবে।

অন্তঃশীলা শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পের সমজাতীয়। অন্তঃশীলার ঘটনাসমাবেশ সামান্য, চরিত্রসমাবেশও গৌণ, চিন্তাসমাবেশই এর প্রধান ও অমূল্য সম্পদ। কিসের চিন্তা? নিছক চিন্তা যা আধুনিক শিক্ষিত ও মনস্বী ব্যক্তির মনকে পদে পদে আবিষ্ট করে। বিদ্যা ও ভাবনার সঙ্গে স্বাবর জঙ্গম অনুষ্ঠান ধর্ম্ম আদর্শ বিজ্ঞান সমাজ প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সংঘাতের ফলে চিন্তা; সংঘাত ঘটনার ক্ষেত্রে নয় সংঘাত চেতনার ক্ষেত্রে। চিন্তাও ধারাবাহিক নয়, চিন্তা অবচ্ছিন্ন অথচ সব কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। চিন্তা না বলে বলা যেতে পারে চেতননের বিকাশ। বিবেকের দংশনে ভবানন্দের বিলাপোক্তির মত একধারায় চেতনা প্রবাহিত হয় অল্প ক্ষেত্রেই, চেতনার রূপই হোল অবচ্ছিন্ন ও বহুধা। সহজ ও অকৃত্রিম বলে একে চিনতে দেরী হয় না। এই ধরণের চিন্তার বিকাশে গ্রন্থকার যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। চিন্তাধারার রূপ সর্ব্বত্রই এই রকম কি না, এর উত্তর যাই হোক, ধূর্জ্জটিবাবুর নায়ক খগেন অন্ততঃ এ রকম চিন্তাশীলতার প্রতিভূ। সন্দেহ হয় গ্রন্থকার আপন অজ্ঞাতসারেই এই নায়কের মধ্যে নিজেকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন। অন্ততঃ নায়ক স্বয়ং গ্রন্থকারের মতই বিদ্যায় ভাবুকতায় বিচারে ও পর্য্যবেক্ষণে পারদর্শী। গ্রন্থকারের সঙ্গে নায়কের এই একাত্মতার সুফল হয়েছে এই যে কোন জায়গায়ই চিত্রণ অপ্রাকৃত ঠেকে না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে অন্তঃশীলার আখ্যানবস্তু সামান্য। কিন্তু গ্রন্থকার যে বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আখ্যানভাগটিকে নির্দ্দিষ্ট সীমা ও পরিমাপের মধ্যে আবদ্ধ রেখে ভালই করেছেন। তিনি কাহিনীটিকে যেখানে সুরু করেছেন অন্যের হাতে সেটাই হোত শেষ, এবং এ-ক্ষেত্রে এই কারণেই উপন্যাসটি হয়েছে খুব ধারাল। বস্তুতঃ যে শ্রেণীর চিন্তার গতি এ উপন্যাসটিতে প্রকট হয়েছে তার জন্য চাই ঘটনাজালবিমুক্ত

যথেষ্ট অবসর, তার জন্য চাই সুরুতেই তীব্র আঘাত। এটা ধূর্জটিবাবুর প্রথম উপন্যাস; তা হলেও এ যেন ওস্তাদের হাতের মার। খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রী আত্মহত্যা করেছেন, কারণটা বাহ্যতঃ অকিঞ্চিতকর। কিন্তু আন্তরিক কারণ খগেনবাবুর বুদ্ধি ও বিচারবৃত্তির সঙ্গে সাবিত্রীর সহজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ। সে সহজ প্রবৃত্তি বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা মার্জিত নয়; তাতে আছে জয়ের ইচ্ছা ও জিঘাংসা। সাবিত্রীর বন্ধু ছিলেন রমলা, সম্পূর্ণ আধুনিক, অন্ততঃ আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। স্বামীর কলুষিত ব্যবহারের জন্য তিনি পৃথক বাস করতেন ও দাম্পত্যজীবনের প্রতি তাঁর যে বীতস্পৃহা হয়, সাবিত্রীর দাম্পত্যজীবন তাতেই প্রতিহত হয়ে সাবিত্রীর ঈর্ষার ইন্ধন জুগিয়েছিল। তারই ফলে সাবিত্রীর আত্মহত্যা। আখ্যায়িকা আরম্ভ হয়েছে এই দুর্ঘটনার পর করোনারের কোর্টে ও সাবিত্রীর সৎকারে। খগেনবাবুর মন তখন চিন্তাবিক্ষোভে ও অবচেতনার তরঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত। মৃত্যুর অছুত এই যে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার অমোঘতা, গ্রন্থকার এর যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা দুর্লভ। এই অধ্যায়টিই বোধ হয় বইটির শ্রেষ্ঠাংশ বলে বিবেচিত হবে,—যদিও এটি ঈষৎ অতিরঞ্জিত। পাঠক বইটির এ অংশে একটা কীর্তন ও তজ্জনিত খগেনবাবুর বিক্ষিপ্ত মনে প্রতিক্রিয়ার একটা অপরূপ সুন্দর স্কেচ্ দেখতে পাবেন। এর পর ঘটনাস্রোতের পরিবর্তন হয় রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর মুখোমুখী আলাপ-পরিচয়ে। উভয়ের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক ও কথোপকথন হয় এবং উভয়ের মধ্যে যে একটা অজ্ঞানের আচ্ছাদন ছিল তা হয় অপসারিত। সাবিত্রীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তাও উভয়ের নিকট উদ্ভাসিত হয়। রমলার বাড়ীতে খগেনবাবু এক নবীন ছাত্রের হৃদয় ও মনের পরিচয় পান, সে সুজন। সুজনও আধুনিক কালের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন কিন্তু রমলার সংস্পর্শে তার হৃদয় দরদী হয়েছিল। রমলা ও সুজনের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে খগেনবাবুর নিজেকে অনুসন্ধান করে দেখবার ইচ্ছা জাগে। ফলে খগেনবাবু রমলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাসীমার কাছে কাশী যান। সেখান থেকে রমলার সঙ্গে কিছু পত্র বিনিময়ও হয় ও পরিশেষে নিজের ডায়েরী পাঠিয়ে দিয়ে খগেনবাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরুদ্দেশ হন।

আমার মনে হয় খগেনবাবুর সঙ্গে রমলার পরিচয় আর কিছু নয়, খগেনবাবুর নিজের চিন্তাজালের গ্রন্থিউন্মোচন বা আত্মোপলব্ধি। রমলা শুধু প্রাসঙ্গিক ভাবে উপস্থিত মাত্র। এমন অনুমান করা অসম্ভব নয় যে রমলা থাকুক বা না থাকুক খগেনবাবুর চিন্তাজালের গ্রন্থিউন্মোচন ব্যাহত থাকত না। অথবা বলা চলে খগেনবাবু ও রমলা সেই চিন্তাবৃত্তির এপিঠ ওপিঠ। বাস্তবিক অন্তঃশীলার আখ্যায়িকার প্রকৃত সংস্থান মাত্র একটি, ও প্রথম দুই অধ্যায়ই তার চূড়ান্ত প্রকাশ। স্বীকার করতেই হয় চরিত্রচিত্রণ বা আখ্যায়িকার ক্রমপরিণতির দিক থেকে পাঠকের দাবী কথঞ্চিত অপূর্ণ থেকে গেছে। কথোপকথনের ধারাল চমক বাদ দিলে উপন্যাসের মাঝের অংশ একটু গতিহীন। অপরপক্ষে বলা যায় গতি ঘটনা-চক্রে নয়, গতি মনের জাল-জঞ্জাল অপসারণে। এই দিক থেকেই বইটির সার্থকতা।

আর একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগে, কেবল মাত্র চিন্তাশীল সজীব মনের

সফলতা কোথায়। খগেনবাবু চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ও সেই জন্যেই তাঁর নিষ্ক্রমণ—escape। এ নিষ্ক্রমণ শুধু সমাজ বা রমলার মিলন লাভের সম্ভাবনা থেকে নয়, এ নিষ্ক্রমণ বুদ্ধি ও বিচারের কারাগার থেকে। এই নিষ্ক্রমণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় খগেনবাবুর ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলিতে। সে দিক থেকে ও ভাবের প্রগাঢ়তার জন্য এ পৃষ্ঠাগুলি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই নিয়ে গ্রন্থকারকে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে—সমগ্রভাবে দেখতে গেলে গ্রন্থের সারতত্ত্ব কি এই যে বুদ্ধির বন্ধন থেকে নিষ্ক্রমণই হোল বুদ্ধিজীবীর প্রকৃষ্ট পথ? এটা মানতেই হয় যে বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া খগেনবাবুর চিত্রে ও ডায়েরীর পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে। অথচ খগেনবাবু সাংখ্য বেদান্ত যোগ আর্ট বিজ্ঞান কোথাও মুক্তি খুঁজে পান নি। তিনি সকল রকম সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন করে নূতন সম্বন্ধ-সৃষ্টির আভাস দিয়েছেন। গ্রন্থকার বোধ হয় নূতন আদর্শে নূতন সমাজ স্থাপনার কথা বলতে চেয়েছেন। যে কেউ ধূর্জটিবাবুর প্রকাশিত রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে এ কল্পনা ধূর্জটিবাবুর নূতন নয়। কিন্তু ও আদর্শসম্বন্ধে বিশদ কোন কিছুই বিবৃত করা নেই। অন্ততঃ খগেনবাবুর চিন্তার ছকের মধ্যে ও সারা বিশ্বের প্রাক্তন ও আধুনিক যা কিছু প্রচলিত তত্ত্ববাদের আলোড়নে তা যে কোথায় আত্মগোপন করে আছে তা খুঁজে পাওয়া শক্ত। অপর পক্ষে গ্রন্থকর্তা বলতে পারেন যে মানব সমাজের আহরিত বিদ্যা পুঁথিপত্তর ও অনুষ্ঠানের প্রাচীরগাত্রে মাথুরের যে মাথা ঠুকে মরতে হচ্ছে তাই দেখানই শুধু ঔপন্যাসিকের কাজ, কেমন করে আবার সে প্রাচীর ভাঙতে হবে তা দেখান তাঁর কাজ নয়—আর যারই হোক। সমালোচক এতে বলবেন যে মাথাঠোকা ও বেদনাবোধ শুধু বিবৃত করলেই হবে না, তাকে উপন্যাসে সাকার করতে হবে।

আমার এ অভিযোগ যে কত নগণ্য সে বিষয়ে আমার কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই কেননা একে উপন্যাসই বলা হোক বা আর কোন নামেই ডাকা হোক, অন্তঃশীলা কেবল সম্পূর্ণভাবে নূতন নয়—অন্তঃশীলা অসাধারণ বই। অন্তঃশীলার মূলপ্রসঙ্গ প্রেম নয়, অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির দুর্কিষহ ভারই যে আধুনিক জগতের মহাট্র্যাজেডী এই অন্তঃশীলার মূলগত প্রসঙ্গ। ঐকান্তিক ভাষাও অন্তঃশীলার স্বকীয়তা বর্দ্ধন করেছে। প্রকৃত পক্ষে এ বইটি সাগ্রহে না পড়লে বাংলাসাহিত্যামোদীকে বাংলাভাষার একটা অনন্যসাধারণ বই পড়ার লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হবে; আর মূলতঃ চিন্তা ও অন্তর্মুখী জীবনের নক্সা হলেও অন্তঃশীলায় ভৃত্য ও আশ্রিতের প্রতি স্নেহ, ছাত্রজীবনের প্রতি অসীম সহানুভূতি ও গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসার যে চিত্র আছে অন্য কোন বাংলা লেখায় তার জোড়া পাওয়া শক্ত।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Indus Civilisation—By Ernest Mackay. (Lovat Dickson & Thompson Ltd.)

প্রায় তের বছর আগে ৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধু প্রদেশে 'মহেন্-জো-দড়ো' (সিন্ধী ভাষায় অর্থ 'মৃতস্থান') নামক স্থানে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর পরে প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের অন্যান্য মনীষীরা মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পা প্রভৃতি বিবিধ স্থানের খনন-কার্য্যে মনোযোগ দিয়ে আরও অনেক মূল্যবান্ তথ্য ও দ্রব্য আহরণ করেছেন। আলোচ্য পুস্তকে প্রধানতঃ সেই সব তথ্য ও দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে একটা স্থূল ধারণা দেবার প্রয়াস আছে।

প্রয়াস যে সফল হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী করা নিরাপদ। লেখকের রচনার প্রসাদগুণ যথেষ্ট, এবং চিত্রগুলিও সু-চয়িত। অবিনীত পাণ্ডিত্য কোথায়ও চোখে পড়ে না। ইতিহাস যে দর্শন নয়, একথা লেখক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। সেকালের দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল—তারা কি রকম বাড়ীতে থাকতো, কি কাপড় কি গয়না পরতো, কি অস্ত্র ব্যবহার করতো, কি খেলা খেলতো, কি শিল্প আয়ত্ত করেছিল, কি দেবতা তাদের পূজ্য ছিল,—এই সবের পরিচয়ই গ্রন্থটি পরিপূর্ণ, প্রোজ্জ্বল। এক কথায়, বইখানি একটী সুলিখিত গল্পের মতো সুপাঠ্য।

বাড়ীগুলোর পোড়া ইট ও সহরের জল-নির্গম-প্রণালী দেখে অনুমান হয় যে সেকালে ঐ স্থানে যথেষ্ট বৃষ্টি পড়তো। বন্যারও প্রকোপ ছিল খুব; অন্তত দুটী বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। হয়ত একটা ভীষণ বন্যার ফলেই মহেন্-জো-দড়ো পরিত্যক্ত হয়। বহু শতাব্দী পরে, খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে, নগরের একটী অংশে আর একবার লোকের বসতি হয়েছিল। নতুবা 'মহেন্-জো-দড়ো' যথার্থই 'মৃত-স্থান'।

বাড়ীগুলো নিতান্ত প্লেন; অন্ততঃ কারুকার্য্যের বিশেষ চিহ্ন তো পাওয়া যায় নি। জানেলা ছিল কিনা তা জানা যায় না; না থাকাই সম্ভব, লেখকের মতে গরম দেশে জানেলা নিষ্প্রয়োজন। দরজাগুলো বড় রাস্তার উপর না থাকাই ছিল রীতি; সম্ভবতঃ চোরের ভয়ে। দেয়াল যে রকম পুরু, তার থেকে মনে হয় বাড়ী অনেক সময়ে দু-তলা, তিন-তলা, কিম্বা তার চেয়েও উঁচু ছিল; কোথাও কোথাও ছাতের কড়ি বসাবার গর্ত্তও দেখা যায়। কোনো-কোনো বাড়ীর সিঁড়ি রাস্তা থেকেই উঠেছে; লেখকের অনুমান, সে রকম বাড়ীতে একাধিক স্বতন্ত্র পরিবার বাস করতো,—অনেকটা আধুনিক 'ফ্ল্যাট'-জাতীয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বাথ-রুম ছিল—সকল ক্ষেত্রেই রাস্তার দিকে। বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল ড্রেনের; নর্দ্দমা নিয়ে এত চিন্তা আর কোনো প্রাচীন জাতি করেছিল কি না সন্দেহ। 'ড্রেন'-গুলোর মধ্যে অনেক মাটির খেলনা বেরিয়েছে; বোঝা যায়, আনাগোনা পুতুল নিয়ে যাওয়ার-অভ্যাসটী সেকালেও ছিল। ঘরের আসবাব সম্বন্ধে অবশ্য বেশী কিছু বলা এখন সম্ভব নয়। তবে একটি শীল-মোহরে এক রকম টুলের ছবি আছে, যার পায়া ষাঁড়ের পায়ের মতন; এই ধরণের জিনিষ প্রাচীন মিশরেও মেলে। একটী মাটির বাতি-দানও পাওয়া গিয়েছে। উঠোনেই সচরাচর রান্না করা হ'ত। তবে ছোট ছোট রান্নাঘরও ছিল, যার মধ্যে ইটের উনুন লক্ষ্য করা যায়।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে খুব বেশী জানা যায় নি। অনাবৃত পুরুষের ও স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে সেগুলিতে বীরপুরুষ ও দেবদাসীর রূপ ধরা দিয়েছে। দেবদেবীর মূর্ত্তির আবরণ ও আভরণ যদি সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের অনুরূপ গণ্য করা হয়, সেটা অসঙ্গত বলা যায় না। এই যুক্তি মান্য করে লেখক সেকালের গয়না পোষাকের বর্ণনা দিয়েছেন। মেয়েরা পরতো ছোট ঘাগ্‌রা (short skirt) আর মরদ-রা পরতো কোমর-বন্ধ। কোমরের উপর দেহের যে অংশ সেটা পরিচ্ছদে ঢেকে রাখাটা সেকালের মেয়েদের ফ্যাশান্ ছিল না। কেবল একটী নারী-মূর্ত্তির গায়ে cloak দেখা যায়; cloak-টীতে হাত ঢাকা পড়েছে, কিন্তু বুক ঢাকা পড়ে নি—বোধ হয় এটী শীত-নিবারণের বস্ত্র। হারাপ্পায় একটী পুরুষ-মূর্ত্তির পরণে ধুতি বা 'ধ্রীচেস্' লক্ষিত হয়। কখনো-কখনো পুরুষদের বাম স্কন্ধে প্রলম্বিত একখানি 'দোছোট' দেখা যায়, এবং একটী মূর্ত্তিতে সেটী হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। পুরুষেরা প্রায়ই দাড়ী রাখ্‌তো, গোঁফ কামাতো। মাথার চুলের কেয়ারী অনেকটা সুমেরীয় রীতি অনুযায়ী মনে হয়; একটী দেব-মূর্ত্তির মাথায় সীঁথেকাটাও দেখা যায়। পুরুষরা খোঁপা বাঁধ্‌তো। মেয়েদের চুল-বাঁধার প্রণালী বোঝা কঠিন; তবে হাতীর দাঁতের হেয়ার-পিন, তাঁবার আরসি, প্রসাধনের এই সব সরঞ্জামের অভাব ছিল না। একটী নারী-মূর্ত্তির মাথার পিছনে একরাশ কুঞ্চিত কেশ লম্বমান; আর কয়েকটী দেবী-জাতীয়া প্রতিকৃতির বেশ-বিন্যাসে আধুনিক কালের মতন 'বিহুনি' আর 'বো' (bow) দেখা যায়। অলঙ্কারের বর্ণনা লেখক অতি সযত্নে দিয়েছেন; তার ছবিও অনেক রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা সেই বর্ণনা ও ছবি প্রত্যক্ষ করলে সে বিষয়ে ধারণা করে নিতে পারবেন। রমণীর অলঙ্কার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমালোচকের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; সুতরাং লেখক-প্রদত্ত বর্ণনার পরিচয় এখানে দেওয়া গেল না।

খেলা-ধুলো নানারকমের ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েরা মাটির খেলনা তৈরী করতো। কোনো কোনো খেলনায় তাদের কচি আঙুলের দাগ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। মাটির ঝুমুঝুমি, বাঁশী, রঙীন পাখী, ঘাড়নাড়া ষাঁড়, গরুর গাড়ী, খেলা-ঘরের হাঁড়ী-কুঁড়ী—এই রকম অনেক খেলনা পাওয়া গিয়েছে। এত প্রচুর ক্রীড়া-সামগ্রীর মধ্যে যুদ্ধোপযোগী শকটের মৃন্ময় নিদর্শন একটীও না মেলায় লেখক অনুমান করেন যে লোকগুলো রণপ্রিয় ছিল না, এবং তাদের সভ্যতার শেষ অবস্থায় আসবার পূর্ব্বে তারা শত্রু-বিধ্বস্ত হয় নি।

প্রবীণদের খেলার মধ্যে পাশা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্ষক্রীড়া যে প্রাচীন তার যথেষ্ট প্রমাণ সাহিত্যে বর্ত্তমান; প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের খননের মারফৎ আজ আমরা সেকালে ব্যবহৃত হাতীর দাঁতের পাশা, পাথরের বা মাটির dice প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হচ্ছি। বাগ্-বন্দীর ধরণের একটী ঘরকাটা ইট আবিষ্কৃত হয়েছে; লেখক অনুমান করেন, খেলাটী প্রাচীন মিশরের 'সেন্ট' বা সুমেরীয় কোনো খেলার মতন ছিল। মাটির ও পাথরের অনেকগুলো বোড়ে পাওয়া গিয়েছে।

হারাপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর মৃন্ময় পাত্রগুলো প্রায় একই রকমের। শেষোক্ত নগরের সন্নিহিত একটী আধুনিক গ্রামে এখনও কলাল-চক্র ব্যবহৃত হচ্ছে; একালের

তৈরী জিনিষগুলোর রং সেকালের মতো বটে, কিন্তু ঢপ্ আলাদা। হয়তো তখনো এখনকার মতোই পুরুষরা চক্র-চালনা দ্বারা পাত্র নির্মাণ করতো, আর স্ত্রীলোকরা সেই পাত্র বর্ণ যোজনা দ্বারা সুন্দর করবার চেষ্টা করতো। বর্ণ-যোজনায় সৌন্দর্য্য-বোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হাতল-ওয়ালা পাত্র বড় একটা মেলে না; কিন্তু মুখ-নল-যুক্ত 'ফীডিং কাপ' কয়েকটী আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং সে রকম কাপ্ সুমেরেও দেখা যায়। একপ্রকার পাত্রের গায়ে ডুমো-ডুমো knobs দেখতে পাই; মেসোপটেমিয়াতে ডক্টর ফ্রাঙ্কফোর্ট এই জাতীয় পাত্র পেয়েছেন এমন এক স্তর থেকে যেটা নাকি আমাদের মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পার সমসাময়িক। মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলির আকৃতি প্রায়ই 'জিওমেট্রিক্যাল'—ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ-মণ্ডল-আত্মক। জন্তু-জানোয়ারের ছবিও মাঝে মাঝে মেলে। মানুষের চেহারার একান্ত অভাব; কেবল হারাপ্পার একটী মৃৎপাত্রে মনুষ্যের আকৃতি দেখা যায়। মহেন্-জো-দড়োয় প্রাপ্ত সুন্দর ছোট ছোট আধ ইঞ্চি উঁচু কয়েকটী পাত্র স্থানীয় মাদুঘরে রয়েছে; সেগুলি বোধ হয় গন্ধ-দ্রব্যের আধার। লেখক বলেন, সিন্ধু-সভ্যতা যে মূলতঃ কর্ম্মোপযোগী এ সত্য মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পার তৈজস-পত্রাদি ও গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখেই উপলব্ধি করা যায়।

অস্ত্র শস্ত্র প্রধানতঃ তাঁবা বা 'ব্রোন্জ্' দিয়ে গড়া। ছুরি, ক্ষুর, ছেনি, করাৎ, ছোরা, কুড়ুল, তরওয়াল, বর্শা, তীরের ফলা ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র দেখা যায়। পাথরের তৈরী গদার মাথা (mace-heads) অনেকগুলো বেরিয়েছে; অতএব আমরা ধরে নিতে পারি, লোকে তখন গদা-যুদ্ধ করতো। সুতো জড়ানো মাছ-ধরা বঁড়শীও কয়েকটী উদ্ধার করা হয়েছে। সুতোর টেকো (spindle-whorls) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাছ মাংস খাওয়ার আরও প্রমাণ মেলে; বড় বড় মাটির জালায় মাছের কাঁটা আর ছাগল-কচ্ছপ-হরিণ-গরু-শূয়ারের হাড় বিস্তর দেখা যায়। মসলা পেষণের পাষাণ, রুটী বেল্‌বার বেলুন, কেক্ করবার ছাঁচ পর্য্যন্ত না-কি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুজন ইংরেজ মনীষী লক্ষ্য করেছেন যে খাবার সময়ে টেবিল চেয়ারের ব্যবহার অজানা ছিল না; চামচ তো পাওয়া যায়-ই; এমন-কি টেবিলে ব্যবহারযোগ্য ছুরিরও না-কি সন্ধান মেলে, যদিচ শেষোক্ত অভ্যাস সম্বন্ধে লেখক নিজে সন্দিহান।

সিন্ধু-সভ্যতার শিল্প-কৌশলের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় কতকগুলি steatite পাথরের কবচ-জাতীয় চতুষ্কোণ পদার্থে। এগুলিকে seal-amulet বলা হয়; কিন্তু 'সীল' করা জিনিষ খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। কবচগুলি দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর প্রত্যেকটীর উপর আছে একটী প্রাণীর আকৃতি ও একটী সেকেলে অক্ষরে শিলালিপি; আর এক শ্রেণীতে প্রাণীর আকৃতি নেই, আছে শুধু শিলালিপি। কোনো কোনো কবচে খোদিত জন্তু দেখে লেখক শিল্পীকে বিশেষ প্রশংসা করেছেন :—

(p. 160) "A specimen bearing the figure of a humped, or Brahmani, bull (pl. M, 1) is a very good example of the fine work that could be produced. The muscles ripple under the skin in a most realistic fashion, and the well-nourished hump drooping at the back is also extremely well engraved, especially when

it is remembered that all the work had to be done on so small a scale. A fragment of a larger seal with just the head and shoulder of a tiger is also a splendid piece of work, the open mouth, tongue, bared fangs, and careful placing of the double stripes being indicated with great fidelity."

মহেন্-জো-দড়ো বা হারাপ্পায় যদিও কোনো মন্দির অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি, তথাপি সেকালকার লোকের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। একটী দেব-মূর্ত্তির ভগ্নাংশের চিত্র আলোচ্য পুস্তকে স্থানলাভ করেছে। সেটীর গলার দুপাশে গয়না (necklace) পরবার গর্ত্ত আছে; মনুষ্যমূর্ত্তিতে এরকম গর্ত্ত থাকে না। চোখ দুটীর ভাব অর্দ্ধ-নিমীলিত। এভাবের চোখ Kish ও Ur এ প্রাপ্ত সুপ্রাচীন মৃন্ময় মূর্ত্তিতেও দেখা যায়। সুতরাং আমাদের 'যোগ'-এর সঙ্গে এ চোখের কোনো যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে। শিবের মূর্ত্তি একটী কবচে পাওয়া যায়। পশুপতি-রূপে তিনি বিরাজ করছেন—হাতী, বাঘ, মোষ, গণ্ডার, হরিণ তাঁকে বেষ্টন করে আছে। 'মাতৃ-দেবী' (Mother Goddess) অতি প্রাচীনকালে প্রাচ্যে পূজা পেয়েছেন। লেখক বলেন, এই দেবীর বহু সংখ্যক মৃন্ময়ী মূর্ত্তি মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির মাথার দুপাশে প্রায়ই দুটী বাটীর মত লাগানো আছে, কখনো কখনো ধোঁয়ার দাগ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ ঐ বাটীতে তেল বা ধূপ জ্বালানো হতো। মূর্ত্তিগুলি যে দেয়াল-ধারে রাখার জন্যেই গড়া, তার প্রমাণ সেগুলোর পিছন-দিক্‌টার কাজ সামনে দিকের মতো সাফাই নয়।* এই 'মাতৃ-দেবী' উল্লিখিত শিবের পত্নী কি-না বলা যায় না। তিনি কুমারী হওয়া অসম্ভব নয়; তাঁর স্তন-দ্বয়ের ক্ষুদ্রতা এই অনুমানের পরিপোষক।

পশু-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, দুই-ই প্রচলিত ছিল। কবচগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। হাতী, বাঘ, গণ্ডার, মোষ, ষাঁড়, কুমীর, ঘড়িয়াল ইত্যাদি নানা জীবের মূর্ত্তি কবচে দেখা যায়।† লেখকের মতে, মিশরে পশু-পূজা উপলক্ষে পূজ্য পশুটীকে শোভা-যাত্রায় বহন করার পদ্ধতি মহেন্-জো-দড়োতেও প্রচলিত ছিল। একই আকৃতিতে বিভিন্ন পশুর সমবায়ও কোনো কোনো কবচে চিত্রিত আছে। তিন প্রকার গাছের পূজা দেখা যায়—অশ্বত্থ, নিম্ব আর acacia জাতীয় একটী বৃক্ষ। সুমেরীয়দের উপাস্য দেবতা 'নর-বৃষ' (man-bull) মহেন্-জো-দড়োর একটী কবচে দৃষ্ট হয়।

এ সভ্যতা কত প্রাচীন তা ঠিক বলা যায় না। অবশ্য প্রস্তর-যুগ অতিক্রম করে' ধাতু যুগের কোনো সময়ে যে সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে; তাঁবা আর 'ব্রোনজ্' (টিন মেশানো তাঁবা) দুই-ই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ছিল, কিন্তু লোহার ব্যবহার ছিল না। বৈদিক সাহিত্যে লোহার উল্লেখ যজুর্ব্বেদেই প্রথমে পাওয়া যায়। সিন্ধু-সভ্যতা যে pre-Aryan, এ সিদ্ধান্তকে লেখক স্থির সিদ্ধান্ত বলে' মেনে নিয়েছেন। মেসোপোটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্য সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে টেল-আসমারে একটি সিন্ধু-সভ্যতা-প্রসূত কবচ আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে

* হয়তো এগুলি সেকালের 'দেয়াল-গিরি।' মাত্র একটী ব্যক্তি-দান পাওয়া যায়।

† পাখী-পূজার লক্ষণ দেই; কেবল ঘুঘুর পূজা হয়তো ছিল। মিশরের চিত্র-লেখায় পাখী বিশেষ দেবতা বা তদ্বিষয়ক ভাবের সূচক।

হাতী, গণ্ডার ঘড়িয়ালের প্রতিকৃতি দেখা যায়। ডক্টর ফ্রাঙ্কফোর্ট এই আবিষ্কারটী করেছেন; এবং তাঁর মতে, যে স্তরে কবচটী পাওয়া যায় সে স্তর খৃষ্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের। সিন্ধু-সভ্যতা যে এতই প্রাচীন, এই আবিষ্কারটী হচ্ছে তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু লেখক স্বীকার করেন: "That it depends on Mesopotamian chronology, and that any modification of the latter must entail a corresponding re-dating of the Indus valley finds"।

মিশর, ক্রীট, গ্রীস সুমেয় এসব দেশের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার কিছু কিছু যোগা-যোগ ছিল, তার প্রমাণও লেখক অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন। এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় জানা গিয়েছে যে ঐ সভ্যতা শুধু হারাপ্পা মহেন্-জো-দড়োতে নয় এদিকে বেলুচিস্থান অপরদিকে শিমলা-শৈলের সন্নিহিত রূপর-নামক স্থানেও প্রসার লাভ করেছিল। দুঃখের বিষয় এই সভ্যতার প্রধান পরিচায়ক যে কবচগুলো আমরা পাই তার লিখিতাংশের পাঠোদ্ধার আজ পর্য্যন্ত হয় নি, যদিও এ কার্য্যে অনেকেই ব্রতী হয়ে রয়েছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি এদেশে সমাদরের যোগ্য; আশা করি, বইটী সুধী পাঠকের মনে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করে' সত্য-নির্দ্ধারণের সহায়ক-রূপে মান্য হবে।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

Wheels and Butterflies—By W. B. Yeats (Macmillan & Co.)

The House of Titans—By A. E. (Macmillan & Co.)

উনবিংশ শতকের শেষাশেষি আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা আয়রিশ সাহিত্যকেও বহুদিকে এবং বহুভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব ও আন্দোলনের মধ্যে তাহার জন্ম বলিয়া সেই সাহিত্যের সঙ্গাগ ও সজ্ঞান ধর্ম্ম নেতিমূলক। কিন্তু মানুষের চিত্ত সৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে তাহার প্রকাশকে কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়ার নাস্তিকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। তাই সজ্ঞানে আইরিশ সাহিত্য ইংরাজি সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রতীক মাত্র, কিন্তু রূপসৃষ্টিতে সে সাহিত্য আপনার স্বধর্ম্মের সাধনায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই বিশ্বমানবের চিত্ত তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইয়েটসকে আইরিশ চিত্তের এই রূপসাধনার সর্ব্বপ্রথম না হইলেও সর্ব্বপ্রধান সাধক বলিলে কোনই অত্যুক্তি হয় না, সে সাধনায় এ-ই তাঁহারই বন্ধু এবং সহকর্ম্মী।

বিদ্রোহ কেমন করিয়া স্বরাষ্ট্রে পরিণত হইল, আয়রিশ সাহিত্যের মূলমন্ত্রের আলোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক আয়র্ল্যাণ্ড সেদিন বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, তাহার সমাজ-সংগঠনে প্রতিপদে ইংরাজের করচিহ্ন, এমনকি তাহার অর্দ্ধজাগ্রত চিত্ত সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের মায়ামন্ত্রে আচ্ছন্ন। দেহে এবং মনে,

বাক্যে এবং ভাবে, চিন্তা এবং কল্পনায় সেদিন আয়রিশ চিত্ত ইংরাজের প্রতিধ্বনি করিয়াই আপানাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিল। ইংলণ্ডেও সেদিন বাগ্মিকতার জয়জয়কার, আর্থিক সফলতা ও সিদ্ধিতে মদমত্ত ইংরাজ সেদিন বস্তুবিলাসকে বাস্তবতার চরিতার্থতা জ্ঞানে আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ। তাহারই বিরুদ্ধে তরুণ আইরিশ-চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, ইংরাজের যাহা কিছু গর্ব্বের বিষয়, যাহা কিছু তাহার সাফল্যের চিহ্ন, তাহাকেই অস্বীকার করিয়া আয়রিশ তরুণ বলিল যে আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তি তাহার আপনার ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন; তাহার আপনার বিস্মৃত ও অবহেলিত অতীতকে কল্পনার মায়ামন্ত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই আয়রিশচিত্তের কল্যাণ। তাই পুরাতন আয়র্ল্যাণ্ডের কাহিনী ও রূপকথা, স্বপ্নবিলাস ও অভিলাষকে ঘিরিয়াই আয়রিশ সাহিত্যের জয়। বর্ত্তমান ও ঐতিহাসিক অতীতের যত পরাজয়, যত গ্লানি ও লজ্জা সমস্তকেই অস্বীকার করিয়া তাই আয়রিশ-চিত্ত গৌরবান্বিত অতীত ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, ইংরাজের সঙ্গে যে তাহার কোনদিন কোনবিষয়ে কোনস্থানে কোন সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া সর্ব্ববিষয়ে অমিশ্র আইরিশিকতাকেই মূলমন্ত্র করিয়া লইল।

অবিমিশ্র রোমান্টিকবাদ তাই এই আইরিশ সাহিত্যের প্রাণমন্ত্র। যেখানেই জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া ওঠে, সেখানেই রোমান্টিকতার আবির্ভাব ও যথেচ্ছ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। বিদ্রোহে তাই আইরিশ রোমান্টিক সাহিত্যের আরম্ভ, এবং বহু সাহিত্যিকের জীবনে তাহা বিদ্রোহের যুদ্ধঘোষণা মাত্রই রহিয়া গেল। সত্যিকারের শিল্পী কিন্তু তাহার মধ্যে আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পান নাই। তাই প্রথম হইতেই ইয়েটসের সাহিত্য সাধনা ধ্বংস অপেক্ষা সৃজনকে মহত্তর বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তাঁহার জাতীয়তাবাদে সঙ্কীর্ণতার কোন ছোঁওয়া লাগে নাই, প্রথম হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আপনার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কোন জাতি কোন দিন বড় হইতে পারে নাই, সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের সমস্ত মানবচিত্তের ঐশ্বর্য্যকে আপন করিয়া লইয়াই জাতির গৌরব। "Plays & Commentaries"র মতন যৌবন বয়সের লেখাতেও এ কথা পরিস্ফুট, তাই বারম্বার তাঁহার সহকর্ম্মীদের তিনি বলিয়াছেন যে যদি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে তবে গ্রহণে কোন গ্লানি নাই, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজ তাই যাহা পাইয়াছে, তাহাকেই আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু সেই জন্যই আজিও সে যুগ ইতিহাসের গৌরবের যুগ। ইয়েটসের রোমান্টিকবাদে বিদ্রোহ তাই শেষ কথা নয়। স্থান-কালদেশসভ্যতা নির্ব্বিশেষে তাঁহার সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে যখনই যাহা ধরা পড়িয়াছে, তাহাকেই তিনি আপনার সাহিত্যের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

রোমান্টিক সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের গ্লাবনের মধ্যে কিন্তু অপূর্ণতার সম্ভাবনা স্বভাবতই নিহিত। প্রাত্যহিক এবং পরিচিত জগৎকে অতিক্রম করিয়া তাহা অপরূপ মায়ালোকের সন্ধানে উন্মুখ, কিন্তু সেই একাগ্রতার ফলেই তাহা একমুখীন বা একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া তাহা কল্পনার জগতে আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি খুঁজিয়া ফেরে। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করিবার সে প্রয়াসের ফলে সে সাহিত্য কালে আপনার সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণতাই সাহিত্যের প্রাণ, এবং জীবনের সত্যপ্রকাশ করিয়াই সাহিত্য সম্পূর্ণ। তাই রোমান্টিক সাহিত্যের

কল্পনাবিলাস কালক্রমে জীবনের সত্যবিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং সেই বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যধর্মের হানিও অবশ্যম্ভাবী। অপরূপ সৌন্দর্য্য অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং আবেগের তীব্রতা সত্ত্বেও তখন সে সাহিত্য প্রাণহীন হইয়া পড়ে, মানুষের চিত্ত সে সাহিত্যকে আদর করিতে পারে, তাহার স্বপ্নমদিরার নেশায় আত্মবিস্মৃতি খুঁজিতে পারে, কিন্তু সে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আপনার স্থায়ী বাসগৃহ স্থাপন করিতে পারে না, তাহার অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের মাদকতার মধ্যে আত্মার তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় না। সেইজন্যই রোমান্টিক সাহিত্যে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই চিত্তবৃত্তির প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মুমূর্ষতার সূচনাও লুক্কায়িত। সাহিত্যিক প্রতিভার রচনায় সে দৌর্ব্বল্য হয়তো সম্পূর্ণ আত্মবিকাশ করেনা, কিন্তু প্রতিভাশালী সাহিত্যিককে পর্য্যায়ভুক্ত করিলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়ও দেওয়া হয় না।

আয়রিশ সাহিত্যের বেলায়ও ঠিক তাহাই হইয়াছে। প্রতিভাশালী দুয়েকজন সাহিত্যিককে বাদ দিলে জাতীয়তাবাদী রোমান্টিক আয়রিশ লেখকদের অধিকাংশের মধ্যেই এই রোমান্টিকবাদ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে অভ্যাস মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের রচনায় তাই রূপসৃষ্টির সাধনা নূতনত্বের মোহে চাপা পড়িয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকাশভঙ্গিতে চিত্ত চমৎকৃত হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায় না; কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইলেও সে সৌন্দর্য্যের ক্ষণভঙ্গুর দীপ্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এ কথা অনেকাংশে এ-ই'র রচনার পক্ষেও সত্য। মানবচিত্তের গভীরতায় মুহূর্ত্তের জন্য যে বিশ্বাতীত জ্যোতি ফুটিয়া উঠে সেই অবিনশ্বর মুহূর্ত্তকে কাব্যালোকে বন্দী করিবার ফলে তাঁহার অনেক রচনাই ভাস্বর, সে সমস্ত রচনার সম্মুখে চিত্ত আপনা হইতেই বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে। তাই তাঁহার কাব্যগগনে আত্মকেন্দ্রিক নক্ষত্রের দীপ্তি বিচ্ছিন্ন, তাহাদের পরিসর অল্প, আলোকের উজ্জ্বলতা অধিক নহে, কিন্তু আপনার মধ্যে তাহারা পরিপূর্ণ।

নক্ষত্রলোকের বিচ্ছিন্ন দীপ্তিতে সূর্য্যালোকের বিপুল প্রসারের কোন আভাস মেলে না, তাই এ-ই'র রচনায়ও জীবনের প্রসার ও বিস্তারের পরিচয় আমরা পাই না। সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা যতই গভীর হউক না কেন, মানব হৃদয়ের অনন্ত বৈচিত্র্যের স্থান তাহার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে মেলে না, তাই কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে অবশেষে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, জীবনের নিষ্ঠুরতা ও কঠিনতা, তাহার নির্ম্মম প্রবাহের প্রবলতার জন্য তৃষিত হইয়া পড়ে। এ-ই'র রচনার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের মধ্যেও চিত্ত তাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে চাহে, হয়তো এ-ই'র নিজের চিত্তও সেই অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যের কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে তাই আমরা এ-ই'র রচনার একটি নূতন দিকের পরিচয় পাই। অভিজ্ঞতার অমর মুহূর্ত্তগুলিকে গ্রথিত করিবার সাধনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি এবার জীবনের প্রসার ও বৈচিত্র্যকে তাঁহার কাব্য-সাধনায় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, ফলে রক্তমাংসের নরনারীর সুখদুঃখই এবার তাঁহার কাব্যলোকে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। পরাজয় ও তাহার গ্লানি, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় কেমন করিয়া জীবনের নবীন উজ্জ্বল দিনে দিনে ম্লান হইয়া আসে,

তরুণ দিনের সমস্ত আদর্শই অভ্যাসের জড়তায় প্রাণহীন হইয়া পড়ে,—জীবনের সেই চিরপরিণতির ইতিহাসই কাব্যগ্রন্থখানির নামকবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। নর-নারীর প্রেম কেবলমাত্র প্রীতিপ্রদ ও সুখদায়ক নহে, প্রেমের অবসানে চিত্তের বিক্ষোভ ও আত্মবিদ্রোহ জাগে, সন্দেহের তীব্র জ্বালা ও ঈর্ষার বিষে হৃদয় তিলে তিলে দহিয়া মরে—এ-ই'র পূর্ব্বেকার রচনায় জীবনের এই অন্ধকার দিকের কোন ইঙ্গিত মেলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু Dark Ladyতে মানবচিত্তের সেই আত্মঘাতী বিরোধই মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। এতদিনে তাই তাঁহার কাব্যরাণী অতীন্দ্রিয় জগতের মায়া-সৌন্দর্য্যের বেড়া পার হইয়া আমাদের পরিচিত জগতের আলো-অন্ধকার হাসিকান্নার প্রাঙ্গণে আসিয়া মানুষীর বেশে দাঁড়াইয়াছে।

এ-ই'র রচনাভঙ্গি কোনদিনই বিপ্রবী নহে, ধ্রুপদী সাহিত্যিকদের রচনা-রীতির প্রভাব তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিস্ফুট। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই ধ্রুপদী রচনাভঙ্গি ইঙ্গিত ও প্রতিধ্বনির সৌন্দর্য্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। House of Titans পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে তাই Keats-এর কথা মনে হয়, তাঁহার প্রভাব যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুকেই রূপ দিয়াছে, তাহা নহে, রচনাভঙ্গি এমন কি শব্দ-সংযোজনায়ও তাঁহার ছায়া পরিস্ফুট। Dark Lady-তেও ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিপদে Shakespeare'র প্রতিধ্বনিতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সে প্রতিধ্বনি কেবলমাত্র বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গিতে নহে, Shakespeare'র চরিত্র-সৃষ্টি ও ধ্বনিসঙ্গীতও আমাদের কানে বাজিতে থাকে।

ইয়েটসের প্রতিভার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁহার রচনায় কল্পনাবিলাসের চূড়ান্তপ্রকাশও আপনার অন্তর্নিহিত জীবনশক্তির প্রাবল্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইয়েটসের রচনা কখনও ক্ষীণজীবী নহে, রোমান্টিক সাহিত্যের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্যের মধ্যেও তাঁহার চিত্তবৃত্তির প্রবলতা অনুভব করা যায়। রোমান্টিক-বাদ তাই ইয়েটসের পক্ষে কাব্যবিলাস মাত্র নহে, তাঁহার কাব্যরচনার তাহাই অর্থ। তাই তিনি প্রথম হইতেই আপনার কাব্যক্ষেত্রকে প্রসার করিতে চাহিয়াছেন। স্থান, কাল বা দেশ নির্ব্বিশেষে সৌন্দর্য্যের সন্ধানে তাঁহার কাব্যের অভিযান। জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতাও তাই তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, কাব্যের সত্য সাধনায় তিনি সমস্ত সঙ্কীর্ণতার আহ্বানকে অবহেলা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সত্যের সেই সাধনায় তাঁহার কাব্যপ্রতিভা তাই সহজেই কল্পনাবিলাসকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনা Towerএ মানবতার এই সাধনা যেমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে, আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের আর কোথাও তাহার তুলনা মেলে কিনা সন্দেহ। জীবনের এই বিপুলতা ও অন্ধ নিয়তির অনিবার্য্য গতির অনুভূতিতে আলোচ্য গ্রন্থখানিও পরিপূর্ণ, তাহার নামের সার্থকতাও সেইখানে। চক্রের আবর্ত্তনে প্রজাপতি নিষ্পিষ্ট হইলে সমস্ত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তাহার মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, কালপ্রবাহের প্রগতিতে প্রতিভা, রূপ ও মহত্ত্ব লইয়া মানুষের মৃত্যুও তেমনি নিশ্চিত। ট্র্যাজেডীর মর্ম্মকথা দুঃখ নহে, সমস্ত প্রয়াসের অনিবার্য্য অবসানেই জীবনের প্রকৃত ট্র্যাজেডী। জীবনের এই ট্র্যাজেডীর অনুভূতিতে তাই আলোচ্য গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

চারিখানি নাটিকায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ, কিন্তু সমস্ত নাটিকাগুলিরই মূলসূত্র এক। সপ্তদশ শতাব্দীকে প্রতিভার যুগ বলা হয়, বুদ্ধির এমন মুক্তি ইয়োরোপের ইতিহাসে অন্য কোন যুগে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই বুদ্ধিউদ্ভাসিত যুগেও বুদ্ধিতে Swift বোধ হয় অতুলনীয়। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রতিভার অবসানে হতাশ প্রেমিকের ব্যর্থতা, উন্মাদের জীবনের বিফলতা। তিনশত বৎসর পরে কেবল তাহার স্মৃতিই রহিয়াছে। যে ঘরে Swift'র জীবন-নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ঘরে অধ্যাত্মবাদীর গবেষণায় কেবল মাত্র তাহারই কয়েকটী ছিন্ন খণ্ড ভাসিয়া ওঠে।

অপর একটী নাটিকার মূলসুর রূপ ও প্রেমের ভঙ্গুরতা। অবিনশ্বর ও অনন্ত প্রেমের শপথে প্রণয়ের সুরু, কিন্তু অবশেষে প্রেমলাভের ভরসাটুকুতেও বিসর্জ্জন দিয়া আত্মার শান্তি। এমনি করিয়া জীবনের যাত্রাপথের পাথেয় পথ ফুরাইবার আগেই ফুরাইয়া আসে।

মানুষের সীমাবদ্ধ চেষ্টার চারি পার্শ্বে যে বিপুল ও অসীম শক্তিসমূহের লীলা, তাহারই আসন্ন অনুভূতিতে নাটিকাগুলি ভারাক্রান্ত। নিয়তির এই দ্বন্দ্ব প্রকাশে তাহাদের জন্ম বলিয়াই বোধ হয় ইয়েটস চরিত্রসৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেন নাই। চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের মানুষ নহে, বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত অদৃশ্য শক্তির লীলা চলিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতীক মাত্র।

হুমায়ুন কবির

Men Without Art—By Wyndham Lewis, (Cassell).
Make It New—By Ezra Pound, (Faber & Faber).

প্যারিস্ কম্যুন্-এর তাণ্ডবে ধৈর্য্য হারিয়ে, গুস্তাভ্ ফ্লোবের স্বাবলম্বী শিল্পের আইভরি মিনারে আত্মরক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো যে সে-তন্ত্রবাত শিখরে হিমের প্রকোপ যদিও প্রচণ্ড, তবু পারি-পার্শ্বিক গ্রহ-নক্ষত্র সেখানে অম্লান, জনতার পাশব চীৎকার সেখানে সুদূরপরাহত। কিন্তু গণতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হলেও ফ্লোবের রাজতন্ত্রকে সংশয়ের চক্ষে দেখতেন; এবং বর্ত্তমানের সংসর্গে তিনি যেমন বদ্ধমূল থাকতে পারেননি, তেমনি ভূত-ভবিষ্যতের স্বপ্নও তাঁকে শান্তি দেয়নি। সেইজন্যেই কলাকৌশলের অতথানি বহিরাশ্রয়িতা সত্ত্বেও তিনি ক্রণদী লেখকদের শেষ বংশধর নন, অত্যাধুনিক খেয়ালী সাহিত্যের অগ্রদূত; সেইজন্যেই তিনি নিষ্কাম অথচ নৈশাকি, নির্লিপ্ত বটে, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আখ্যার অযোগ্য; সেইজন্যেই তাঁর নিজের সুবুদ্ধি যদিও সুবিখ্যাত, তবু তাঁর মস্তিশিষ্ক মোপাসাঁ-র মৃত্যু উন্মাদরোগে। কারণ স্বপ্নাধ্যন্তর পরিসমাপ্তি প্রজ্ঞাপারমিত সোহংবাদে যেথানে সঙ্গতি অথবা প্রকৃতিস্থতা নিরর্থ ও নিষ্প্রয়োজন; এবং যুক্তির ধর্ম্ম যেহেতু একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যস্থাপন, তাই এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের মতো নীট্‌শে-র অতিমানুষও ন্যায়বিচারে উদাসীন। তাহলেও এ-যুগের রূপকার ফ্লেবের-এর পদাঙ্কে চলতে বাধ্য, তাঁর আদর্শ ছাড়া আমাদের হয়তো

গত্যন্তর নেই। কেননা সদ্বন্ধমাত্রেই আদান-প্রদানের ফল, এবং শিল্পের পক্ষে সমাজ-শোভনতা যতখানি আবশ্যক, সমাজের শিল্পশোভনতা ততোধিক অপরিহার্য্য। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পোষণীয় যে শুধু আত্মাভিমানী কবিরাই আজ সংসার-বিবাগী নয়, সঙ্কীর্ণ সংসারও তাদের অপাংক্তেয় করেছে। এই ব্যবধান দিন দিন এ-রকম দুস্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে অচির ভবিষ্যতে সভ্যসমাজ থেকে শিল্পের চির-নির্ব্বাসন প্রায় নিঃসন্দেহ।

অনেকের মতে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে উক্ত বিসংবাদ এমনি সনাতন ও সার্ব্বভৌম যে এ-ক্ষেত্রে মধ্যপথের কল্পনাও হাস্যকর; এবং উইণ্ডহ্যাম্ লুইস্ বিশদ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ আপাতনিরপেক্ষ লেখকই ভিতরে ভিতরে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। কিন্তু স্বয়ং লুইস্ ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিক যদিচ এক বা অপর দলের অন্তর্ভুক্ত, তবু মুখে সে-কথা মানতে সকলেই অসম্মত; এবং এলিয়ট্-আদি ঐতিহ্যনিষ্ঠেরা সমালোচনার সময়ে যতই সমাজসেবা শেখান না কেন, রচনার বেলায় তাঁরা প্রত্যেকেই সেই সমাজকে কেবল বিদ্রূপবাণ হানেন। অবশ্য এর জন্যে লুইস্ তাঁদের নিন্দনীয় ভাবেন না। কারণ ক্রিশ্চানী হিতোপদেশে ভক্তি না থাকলেও, আদম-কৃত আদিম পাতকে তাঁর অগাধ বিশ্বাস; এবং তিনি যদিও জানেন যে গ্রীক শিল্পের দৃষ্টান্তে আর্টে জীবনের প্রতিবিম্ব খুঁজতে গিয়েই পশ্চিমী ললিতকলা আজ যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েছে, তবু মানুষ-সম্বন্ধে গ্রীক নাটকের খেদোক্তিতে তাঁর সমর্থন আছে। লুইস্-এর বিবেচনায় মানুষ অভিশপ্ত, তার সমাজে শৃগালের শাঠ্যে সিংহের নিপাত অবশ্যম্ভাবী, তার গুণ গাওয়া যেমন গর্হিত, তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া তেমনি প্রশংসনীয়। সেইজন্যেই ব্যক্তি হিসেবে অর্ডিং ব্যাবিট্ তাঁর কাছে মর্য্যাদা পান বটে, কিন্তু ব্যাবিট্-প্রবর্ত্তিত মনুষ্যধর্ম্ম তাঁর চক্ষুশূল। কেননা মানুষের ধর্ম্ম বলতে তিনি বোঝেন অনাচার আর অত্যাচার; তাই মানুষের পূজা দূরের কথা, তার মনোরঞ্জনও তাঁর অসহ্য লাগে। কিন্তু আধুনিক লেখকেরা এমনি কাপুরুষ যে 'বিশ্ববৈরী' লুইস্-এর অনুসরণে তাঁরা পশ্চাৎপদ। দুর্ভ্ভাগ্যের দুরভিসন্ধি আবিষ্কারের ভার ফ্রয়েডী ড্রেন-পরিদর্শকের উপরে ছেড়ে দিলে পাছে তাঁদের নিজস্ব আত্মপ্রসাদের ফাঁকি ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাঁরা শুধু রূপসৃষ্টিতে তৃপ্ত হননা, অমূলক মনস্তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষণে মানুষী স্খলন-পতন-ত্রুটির ব্যাপদেশ সন্ধানেও তাঁরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু লেখক আর পাঠক যেকালে ভিন্ন স্তরের জীব, তখন তাদের মধ্যে সন্ধির আশাও বিড়ম্বনা। কাজেই লুইস্-এর বিচারে শতকরা নিরেনব্বই জন লেখকই হয় রূপকারী বিবেকে বঞ্চিত, নয় ঘরের শত্রু বিভীষণ, এবং সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অপলাপে পরিপূর্ণ।

তার মানে এ নয় যে লুইস্ কলাশুদ্ধির পুরোধা। বরং উল্টো দিকেই তাঁর ঝোঁক; এবং তিনি শুধু রিচার্ড্‌সী কাব্যার্চ্চনাকেই আক্রমণ করেননি, হেন্‌রি জেম্‌স্-এর সৌন্দর্য্যবিলাসও তাঁর বিদ্বেষের বস্তু। কারণ লুইস্-এর মতে জেম্‌স্-এর শিল্পপ্রাণতা স্বায়ত্তশাসনের ধার ধারেনা, তাঁর বৈদগ্ধ্য নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপলক্ষ্য মাত্র। হয়তো সেইজন্যেই এ-যুগের উদ্ভাসিক কাব্যবিবেচকদের কাছে জেম্‌স্-এর অত প্রতিপত্তি। সেই অদেশপলাতক প্রবের মতো আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিও নারী-

সুলভ ; তাই আজকালকার সুকুমার বৃত্তি যুক্তিনির্ভর তত্ত্বে, বুদ্ধিপ্রসূত রাজনীতিতে, সজ্ঞতিসাধক শিল্পে আর আরাম পায় না ; এ-কালের উদ্বাস্ত দৃষ্টিতে ছদ্ম ঐতিহ্যের নির্শ্বিঘ্ন গড্ডলিকাই অগতির গতি। এই মনোভাবের সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ দশার সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে ল্যুইস্-ও, মারিও প্রাংস্-এর নির্দ্দেশে, অধিকাংশ আধুনিক লেখককেই অস্কার ওয়াইল্ড্ প্রমুখ 'সয়তানী' বিকৃতচেতাদের সগোত্র বলতে প্রস্তুত। এ অনুমান যদি মিথ্যাও হয়, তবু ইদানীকার ক্লাসিক্ হাল-চালে তাঁর হাসি আসে। কারণ যে-পরিগ্রহণ প্রাচীন সাহিত্যের পরম সম্পদ, তাতে অর্ব্বাচীনেরা নিতান্ত নিঃসম্বল ; দিনগত পাপক্ষয় তাঁদের ধাতে সয়না ব'লেই তাঁরা প্রুস্ৎ-এর শুচিগ্রস্ত অন্তর্দ্দর্শনের অন্ধ ভক্ত। অবশ্য ল্যুইস্ অম্বীকার করেন না যে পূর্ব্বসূরীদের উদাহরণ-ব্যতিরেকে শিল্পাভ্যাস অসম্ভব। কিন্তু আদর্শের মূল্য-বিচারে তিনি বর্ষণগনার পক্ষপাতী নন, তাঁকে টানে শুধু মানদণ্ডের সময়োপ-যোগিতা ; এবং তাঁর বিবেচনায় বর্ত্তমান মানুষ যেহেতু বীভৎসরসেই উৎসু, তাই সাময়িক সাহিত্যকে তিনি পেটার-এর ছুৎমার্গে চালাতে চাননা, সুইফ্ট্-প্রবর্ত্তিত ব্যঙ্গরচনাই তাঁর বাঞ্ছিত পদ্ধতি। অর্থাৎ ল্যুইস্ বিশ্বাস করেন যে মানুষ দুর্ভ্রহের সৃষ্টি নিয়েই জন্মায় ; আত্মচরিতকে ট্র্যাজিডির অতিরঞ্জনে রাঙিয়ে তোলার সাধ যদি বা তার থাকে, তবু সে-সাধ্যে সে একেবারে বঞ্চিত। কাজেই পরবর্ণ মনুষ্য-জীবন ল্যুইস্-এর কাছে পুতুল নাচের মতো একটা যান্ত্রিক প্রহসন মাত্র ; তার মধ্যে অভিপ্রায়ের অন্বেষণ কেবল পণ্ডশ্রম নয়, অমঙ্গলকরও বটে।

উপরে যা বললুম, তাতে যুক্তিসঙ্গতির চেয়ে স্বতোবিরোধই হয়তো বেশি। কিন্তু সেজন্যে সমালোচক ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা ; কারণ 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট'-এর মুখবন্ধে ল্যুইস্ যদিও সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন যে সাম্প্রতিক সাহিত্যাচার্য্যদের কুৎসা রটানোতে তিনি অনিচ্ছুক, লেখকবিশেষকে নির্দ্দশন হিসেবে ধ'রে সাহিত্য-সম্বন্ধে কতকগুলো সামান্য সত্যে পৌঁছনোই তাঁর উদ্দেশ্য, তবু কার্য্যত সে-গন্তব্যে তিনি যেতে পারেন নি, ছিদ্রান্বেষণের কুটিল পথে একাধিকবার দিশাহারা হয়েছেন। তাহলেও বইটি ভাবুকমাত্রেই অবশ্যপাঠ্য ; কারণ ল্যুইস্-এর মন্তব্য প্রামাণ্য না-হলেও প্রণিধেয়, এবং তাঁর বক্তব্যে তর্কের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু শুভবুদ্ধির অভাব নেই। পক্ষান্তরে ল্যুইস্ যেকালে দার্শনিক নন, মুখ্যত শিল্পী, তখন তাঁর সিদ্ধান্তে ব্যাপ্তি খোঁজা অনুচিত। তিনি যে লোকপ্রসিদ্ধিতে ভয় না-পেয়ে সর্ব্বপূজ্য মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির সাক্ষাৎকারে এগিয়েছেন, শুধু এই দুঃসাহসের জোরেই আলোচ্য পুস্তকখানি স্মরণীয়। কিন্তু এ-ছাড়া আরো অনেক গুণে 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট' ঐশ্বর্য্যবান। ল্যুইস্-এর রচনারীতি সত্যই উপভোগ্য, তাঁর শ্লেষবাণের প্রায় প্রত্যেকটিই লক্ষ্যভেদী, তাঁর ধীশক্তি আশ্চর্য্য রকমের সচেতন। তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ড্রাইডেন্-এর সমকক্ষ ব'লে ভেবে থাকেন। ল্যুইস-এর সম্প্রতি প্রকাশিত পরিহাস-কবিতা পড়ে, এ-দাবীতে সায় দেওয়া যদিও শক্ত, তবু বাদবিতণ্ডায় তিনি বারম্বার যে-দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা অষ্টাদশ শতকেরই যোগ্য। উপরন্তু 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট'-এর মূল প্রতিপাদ্যের আমি সমর্থন করি। ল্যুইস্-এর মতোই, শিল্প আমার অবসরবিনোদনের সাথী নয়, চিত্তশুদ্ধির সহায়। তাই আমার নিকষেও বিদ্যুৎকের গৌরব বন্দীর অপেক্ষা

অধিক। আজকের জগতে যারা হাসতে জানে না, তারা তো শেষ পর্য্যন্ত কাঁদবেই, এমন-কি মতিভ্রান্তিও হয়তো তাদের অনিবার্য্য বিধিলিপি।

"মেন্ উইদাউট্ আর্ট"-এর অভিব্যাপ্ত দুরুক্তি থেকে কেবল একজন নব্য লেখক অল্পে অব্যাহতি পেয়েছেন, এবং তিনি হচ্ছেন এজ্রা পাউণ্ড্। কিন্তু এই লোভনীয় সম্মান পাউণ্ড্-এর প্রাক্তন সুকৃতির পুরস্কার নয়, সেজন্যে তাঁর ইহলীলার বিশৃঙ্খলাই ধন্যবাদার্হ। যে-জীবন্মুক্তিকে ল্যুইস্ মনীষার তান্ত্রাত্ত্র বলেছেন, অনেকে পাউণ্ড্-এর মধ্যে তার পরাকাষ্ঠা দেখেন। কারণ পাউণ্ড্ ভুলেও কখনো প্রিয়চিকীর্ষার পথে চলেন নি ; পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছেও তিনি আজ উদ্ভট আর উৎকটের আকর্ষণে আবিষ্ট ; পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় তাঁর এত আপত্তি যে 'এ-বি-সি অফ্ রীডিং'-নামক পুস্তকে তিনি চাসার-কে ঠেলে তুলেছেন শেক্সপীয়র-এর উপরে। শুনেছি ইংরেজীর চেয়ে চীনভাষাতেই তিনি বেশী বুৎপন্ন, স্বদেশের চেয়ে ক্রবাদুরদের জন্মভূমির সঙ্গে অধিক পরিচিত, তর্কযুদ্ধে মসিযুদ্ধে ততটা অভ্যস্ত নন, যতটা সিদ্ধহস্ত অসিচালনে। কিন্তু তাহলেও তাঁর সম্বন্ধে বাতুল-বিশেষণটা শব্দের অপপ্রয়োগ, তিনি যথার্থই প্রতিভাবান। পাউণ্ড্ ইদানীন্তন কাব্যকলার উদ্ভাবক এবং আবহমান রচনারীতির অকৃপণ গুণগ্রাহী ; তাঁর সুমন্থণায় শুধু অপরিণত শিল্পীরাই উপকৃত হননি ঘেট্স্-এর মতো আত্মস্থ কবিও সে-প্রভাবের মূল্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা সন্দিহান, কিন্তু সে-বিদ্যাদুরাগের বিস্তার সর্ব্ববাদিসম্মত ; এবং নানা দেশের গদ্য-পদ্যের যে-সমস্ত অনুবাদ তিনি এতকাল ইংরেজ পাঠককে উপহার দিয়ে এসেছেন, তাতে যদিও ভাষাতত্ত্ববিদের মন ওঠে না, তবু তার প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ। পাউণ্ড্ সমালোচক হিসেবেও নমস্য। সত্য বটে তাঁর মত পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর মতোই অস্থির, তিনি নিশ্চয়ই নিন্দা প্রশংসা দুয়েতেই শতমুখ, তাহলেও এলিয়ট্, জয়েস্, ল্যুইস্ ইত্যাদি সাহিত্যরথীরা পাউণ্ড্-এর আবিষ্কার। সুতরাং তাঁর রুচি অমোঘ ; যে-কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা ভাবি-কথন সম্ভব, তার একদেশদর্শিতা বাহ্য ও নগণ্য।

কিন্তু পাউণ্ড্-এর কল্যাণেই ল্যুইস্-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটলেও, এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাৎ, এবং গুরু-শিষ্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুপ্রকট হেন্‌রি জেম্‌স্-প্রসঙ্গে উভয়ের মতদ্বৈতে। অবশ্য পাউণ্ড্-এর বিচারেও জেম্‌স্ অনবদ্য নন। কিন্তু ল্যুইস্ যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে গণমনোভাবপোষণের অভিযোগ আনেন, সেখানে পাউণ্ড্ তাঁকে দোষ দেন আভিজ্ঞাতিক নিরাসক্তির জন্যে। কারণ পাউণ্ড্, 'এবষ্ট্রাক্ট্ প্যাটার্ন্'-এ বা বিষয়বিবিক্ত রূপকল্পে আস্থাহীন ; হয়তো পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ নেই ; কিন্তু বিগ্রহের মধ্যে তিনি বিগ্রহাতীতের আবির্ভাব খোঁজেন। কাব্যের অভিধাকে রসাত্মক বাক্যে আট্‌কে রাখতে তাঁর সাময়িকতায় বাধে বটে, কিন্তু কবিতা যে আবেগপ্রভব, তা তিনি নিঃসঙ্কোচে মানেন। সেই-জন্যেই তাঁর বিশ্বস্তর অদ্ভুতরূপা থেকে মালার্মে বাদ পড়েছেন ; সেইজন্যেই ভালেরি-কীর্ত্তিত প্রতীকের স্বাধিকারস্বীকারে তিনি অক্ষম ; সেইজন্যেই হৃদয়বান রেমি দ গুর্ম তাঁকে আজও বিস্ময়বিমুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। কারণ অর্জ্জিত বিদ্যায় আধুনিকদের নেতৃস্থানীয় হলেও পাউণ্ড স্বভাবত ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-

লক্ষী ; এবং তাঁর রচনায় অভিব্যক্তি যদিও সমাদৃত, তবু তাঁর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য অভিজ্ঞতা। তবে হাল আমলে কোল্‌রিজী দীর্ঘস্থতার সুযোগ নেই ; আজকের দিনে বাক্‌জীবন নাবিক যেমন দুর্লভ, গন্তব্যবিশ্বত বরযাত্রীও তেমনি বিরল ; এটা পরিভাষার যুগ, সংসারের বৈচিত্র্য এখন এত বেড়ে গিয়েছে যে সাঙ্কেতিক ভিন্ন তার সময়োচিত প্রকাশ অসাধ্য। কাজেই সংক্ষিপ্ততার খাতিরে পাউণ্ড্-ও আলেখ্যপ্রধান কাব্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শব্দচিত্র নিরালম্ব নয়, জীবন্ত উপলব্ধির অভিজ্ঞান ; তাঁর অলঙ্কারমাত্রেই রূপক। কারণ পাউণ্ড্ বিশুদ্ধ শিল্পের লোকোত্তর জয়যাত্রায় পরাঙ্মুখ ; পদার্থবিদের মতো তিনিও ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধির দাস ; এবং বিজ্ঞান যেমন অভূতপূর্ব্ব ঘটনার ব্যাখ্যায় উপমিতির শরণ নেয়, তিনি তেমনি তাঁর অপরূপ অভিজ্ঞতার বিবরণে অগত্যা উপমা-উৎপ্রেক্ষাকে প্রশ্রয় দেন। অর্থাৎ পাউণ্ড্-এর মতে কাব্যগত চিত্রকল্প মনোরাজ্যের গূঢ়ৈষণাগ্রন্থির সমতুল্য ; এবং ঐ শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে-অভূতুতি-সংমিশ্রণ দেখা যায়, কবির ভাবচ্ছবিতে তারই আভাস মেলে ব'লেই পাউণ্ড্ 'ইমেজিষ্ট্'।

উল্লিখিত মতামতের লুাইসী টীকা বানানো সহজ, এবং মূল প্রবন্ধাবলী না হোক, 'মেক্ ইট্ হ্যু'-এর প্রক্ষিপ্ত উক্তিগুলি অহরহ। কিন্তু ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর ফিলিষ্টিয়া-ভীতির মতো পাউণ্ড্-এর লোকহিংসাও আত্যন্তিক হিতৈষণার ফল, তাতে আত্মন্তরিতার নামগন্ধ নেই। আজকালকার কোনো কবি যদি মরমী সমর্পণের মানে বুঝে থাকেন, তবে তিনি 'ক্যান্টোজ্'-প্রণেতা এজ্রা পাউণ্ড্। কারণ ওই অসমাপ্ত মহাকাব্য বিশ্বমানবের জীবনেতিহাস, তার কোনো নায়ক নেই, এবং তাতে ব্যক্তি দূরের কথা, বিভিন্ন দেশ ও কালের সীমাসন্ধি সুদ্ধ পাউণ্ড্ মানেন নি। তিনিও স্পেংলার-এর মতো প্রগতিবিমুখ, তাঁর চক্ষেও সভ্যতা ঘূর্ণাবর্ত্তের সরূপ, এবং এই ভ্রমিজাত সমধর্ম্মী বুদ্‌বুদ্‌গুলোকেই তিনি ব্যক্তি ব'লে ভাবেন। তাই 'ক্যান্টোজ্'-এ ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য গ্রাহ্য হয়নি, এবং রিনেসেন্স্-এর ষড়যন্ত্রী ইটালিয়ানরা সশরীরে মার্কিনী বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এই দিক থেকে 'ক্যান্টোজ্'-এর সঙ্গে 'ওয়েষ্ট্ ল্যাণ্ড্'-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এলিয়ট্-এর প্রসঙ্গই শুধু অনাত্ম, এবং পাউণ্ড্ বিষয় ও ব্যঞ্জনা দুয়েতেই নৈর্ব্যক্তিক। কারণ তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি তো স্পেংলার-এর অনুবর্ত্তী বটেই, উপরন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনি ক্রোচের শিষ্য। হয়তো পাউণ্ড্-ও মনে করেন যে অভিজ্ঞতা নিজের অভিব্যক্তি নিয়েই লোকসমক্ষে আসে, এবং ভাষার দারিদ্র্যে ভাবের অকিঞ্চিৎকরতাই সূচিত হয়। সম্ভবত সেই-জন্যেই তিনি তাঁর মহাকাব্যের প্রকাশিত চল্লিশ সর্গ কেবল অনুবাদ আর উদ্ধারের সাহায্যেই রচেছেন। মানুষ যখন অভিজ্ঞতার কল্যাণেই স্মরণীয়, তখন ব্যক্তিত্ব একটা উপসর্গ মাত্র ; এবং বর্ণনা যথাযথ না-হলে যেহেতু অভিজ্ঞতার মানহানি ঘটে, তাই কবির পক্ষে স্বকীয়তাসম্পাদন দোষাবহ ; তার কর্ত্তব্য অনুকরণ, অথবা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে, সাক্ষী-সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা। এইখানেই এলিয়ট্-এর সঙ্গে পাউণ্ড্-এর বৈষম্য। এলিয়ট্ পরিণামবাদী, ক্ষণপ্রাণ অভিজ্ঞতাকে কর দিতে তিনি কুণ্ঠিত, তাঁর পৃথিবীর মানদণ্ড ধর্ম্মের শাশ্বত নগাধিরাজ। অতএব আবেগের চাঞ্চল্যকে তিনি সইতে পারেন না, তাঁর কাছে মহুষ্যজীবন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই

নয়, মরুভূমির পরপার থেকে তাঁকে ডাকে শুধু সৃষ্টি ও সমালোচনার তীর্থসঙ্গম। পাউণ্ড্ সে-মরীচিকার পিছনে ছুটতে রাজী নন ; তাই তাঁর আর এলিয়ট্-এর মধ্যে বিচ্ছেদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

অবশ্য পাউণ্ড্ আলোচ্য পুস্তকে এত কথা বলবার সময় পাননি ; এবং 'মেক্ ইট্ হ্যু'-এর বিষয়সূচী এমনি বিপ্রযুক্ত যে তার পৃষ্ঠায় কোনো সুচিন্তিত মতবাদের প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন দুষ্কর ব্যাপার। উপরন্তু অন্যান্য ভূয়োদর্শীর মতো পাউণ্ড্-ও নৈয়ায়িক কর উপরে রুষ্ট ; তাঁর বিশ্বাস তিনি তত্ত্বপিপাসু নন, তথ্যসন্ধানী। কিন্তু নিঃসর্পক কৈবল্যই যদি তথ্যের লক্ষণ হয়, তবে তা শুধু অস্বীকারই বহিষ্কৃত নয়, ভাষারও অতীত। কারণ ভাষা সামান্যবাচক, এবং পাউণ্ড্, যেকালে তাঁর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে নীরব নন, অতিশয় বাঙ্ময়,তখন ঐকান্তিক অভিজ্ঞতার অখণ্ড উপভোগ তাঁর আয়ত্তাতীত, তিনিও বৈশিষ্ট্যের ধ্যানমূর্ত্তিকে জ্ঞানগোচরে আনেন সাধারণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। বলাই বাহুল্য যে এরি নাম এলিয়টী ঐতিহ্য, এবং এর সপক্ষে পাউণ্ড্-এর কোনো উদ্ধারযোগ্য উক্তি যদিও আমার জানা নেই, তবু ভাগ্যলক্ষ্মী ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে তাঁর দুষ্কৃত উৎসাহ নিশ্চয়ই বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা স্বীকারে তাঁর দ্বিধা আছে, তাই 'মেক্ ইট্ হ্যু'-এ আধুনিক ফরাসী কবিদের তালিকা দিতে গিয়ে তিনি এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে সমসাময়িক শিল্পের নির্ব্বাচনক্ষেত্র দ্বিপ্রবীয়। তার একপাশে উইণ্ড্হ্যাম্ লুাইস্-এর নিঃসঙ্গ গিরিবর্ত্ম যার যাত্রীরা আত্মসমাহিত, অন্যদিকে জ্যাল্ রোম্যা-র জনাকীর্ণ রাজপথ যার পথিকেরা তদ্‌গতচিত্ত। আমার বিবেচনায় এই পথদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নেই, এ-দুটো বিপরীতগামী হ'লেও এদের লক্ষ্য এক ; অতিমানুষ যেমন অলৌকিক কল্পরাজ্যের অধিবাসী, বিশ্বমানবও তেমনি অন্তর্ভৌম অবচেতনালোকের জীব, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্মিতার মতো সার্ব্বজনীন সাযুজ্যও একটা। অতিবাস্তব প্রত্যয়। অতএব এ উভয়সঙ্কটে কোনো দলেই নাম লেখানোর প্রয়োজন নেই ; পাউণ্ড্-এর মতো দু নৌকোয় পা রেখেও শিল্পোৎপাদক নৈরাজ্য সাধনায় এগুনো যায়। তবে এই রকমের অন্যায় স্থিতিস্থাপকতায় হয়তো দার্শনিক মহলে নুনাম রটে। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই ; কারণ নির্লিপ্ত সর্ব্বাস্তিবাদীই যে কাব্যভারতীর শ্রিয়পাত্র তার আজন্ম প্রমাণ পাউণ্ড্-এর অসংখ্য কবিতায় বর্ত্তমান। অতএব তাঁর আদর্শকে বৃত্তে চাইলে 'মেক্ ইট্ হ্যু'-এর প্রবন্ধ কটা পদ্যাপদ্য নয়, সেজন্যে তাঁর সমগ্র রচনাবলী পড়াই বিধেয়। কেননা, পূর্ব্বেই বলেছি, পাউণ্ড্-এর প্রয়োগপ্রবণ মন পরমার্থের প্রতিকূল ; ব্যাবহারিক সত্যের তন্ময় উপলব্ধিই তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে আলোকসামান্য ক'রে তুলেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও সে-গুণ ভূরিপরিমাণে মেলে ; তাই অন্তত আমার কাছে এই প্রবন্ধগুলি, মন্ত্রদ্রষ্টার অসম্বন্ধ সূত্রের মতো, স্বাধীন ভাষ্যের ভিত্তিভূমি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মানবত্ব কি ? * * * *

বইখানি প্রাণের আবেগে লেখা। প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এম্, এ মুখবন্ধে বলেছেন,—

"আজ আমাদের যা অবস্থা তাতে আমরা কেহই কাহাকেও চিনি না, কেহই কাহাকেও জানি না, কেহই কাহাকেও বুঝি না, ফলে তার প্রতিক্রিয়াও সেই রকম হচ্ছে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, আত্মঘাতী, এবং পরস্পর পরস্পরের অবিশ্বাসী, বস্তুত।"

বক্তা ও শ্রোতা যখন থাকেন মুখোমুখী, তখন তিনি মুখে যা বলেন বা না বলেন, তার অপূর্ণতা অল্পাধিক আনুকূল্য লাভ করে তাঁর ভাবব্যঞ্জনায়। কথায় ঠিক যেটা প্রকাশিত হল না, সেটা কতকটা বুঝে নেওয়া যায় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, বাহুর ভঙ্গীতে, ভাষার বাহুল্যের অবকাশে এবং সর্ব্বোপরি চেষ্টাকৃত অব্যক্ততার বেদনায়।

কিন্তু ছাপার হরফে যখন লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, চাক্ষুষ পরিচয় দূরের কথা, নাম পর্য্যন্ত উহ্য, সে স্থলে পাঠককে রচনানৈপুণ্যের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করতে হয়। লাজুক লোক হয় হন মুখচোরা, না হয় কথা বলবার উত্তেজনায় হন প্রগল্‌ভ। অল্প কথায় যে বক্তব্যটি সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হতে পারত, বাগ্‌বাহুল্যে তা চাপা পড়ে। এই দ্বিতীয়োক্ত প্রাচুর্য্যে লেখক আপনাকে কতকটা দুর্ব্বোধ্য করে তুলেছেন। মনে হয় তিনি যেন পাঠকবর্গ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ ও সন্ত্রস্ত এবং কেবলি যেন শঙ্কিত হচ্ছেন, তারা নারাজ। এরূপ অবস্থায় জোর করে যতটা কথা ব'লে ফেলেন সে অনুপাতে বক্তব্য বিষয়টি বাগ্‌জালে আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে পাঠকের স্বতঃই এই কথাটি মনে হয়, লেখক যদি আর একটু আত্মভোলা হয়ে আপনার অভিজ্ঞতা অনুভূতির কথা বল্‌তেন তাহলে পাঠকের সহানুভূতি অর্জ্জন করা সহজ হত। প্রাসঙ্গিক কথার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বহুবাক্য ও অপূর্ণ দৃষ্টান্তের অবতারণা করতে হত না।

লেখক স্বয়ং এ বিষয়ে অন্ধ নন। কারণ ১৯৯ পৃষ্ঠার কেতাবের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

এতদূর পথ চলে এসে, এইবার হয়ত বা এতক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকেরই বৈর্য্যচ্যুতি এসে পড়েছে কারণ যা নিয়ে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ "মানবত্ব কি ?" কথাটার এখনও সুস্পষ্ট করে কোনো কিছুই বলা হয় নি।

দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কথাটা সত্য। দুঃখের সঙ্গে বল্‌ছি এই জন্য যে, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ে মনে হল লেখক চেষ্টাতিরেকেই আপনার স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলতাকে কতকটা অস্পষ্ট ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। তবু তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। সত্য বটে, দেশকালপাত্র অনুসারে সকল তত্ত্ব সকল বিষয়েরই একটা বিশিষ্ট রূপ ফোটে। মানবত্বের তাৎপর্য্য কি এই প্রশ্নের পটভূমি "দেশ, কাল, পাত্র" শীর্ষক তিনটি অধ্যায়ে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় প্রসারিত হয়েছে। অবশিষ্ট "সওয়ালে" মানবত্বের একটি আখ্যার সমীপে আমাদের উপনীত করেছেন। যথা—

"নিজি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হয়ে "স্বতঃ মুক্ত" কেন্দ্রটিকে এক পেশে অবস্থার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে "স্বভাবমুক্ত" অবস্থায় পর্য্যবসিত করতে পারেন··· ···তিনি প্রকৃত মানব।"

স্থানাভাবে সবটা উদ্ধৃত করা গেল না। পুনশ্চ,—

"এর পরেও আর একটি পদের সন্ধান শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন, সেটি হল মানবের নারায়ণত্ব"।

ঠিক কথা এবং পুরাতন কথা। কিন্তু পুরাতন সত্যগুলি চিরদিনই নূতন হয়ে আমাদের মুগ্ধ করে ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বিবৃতির বিশিষ্টতায়। সেই বৈশিষ্ট্যটি বিফলে অন্বেষণ করেছি লেখকের সাগ্রহ সাবলীল রচনার মধ্যে।

উপসংহারে মাতৃজাতির উদ্দেশে গ্রন্থকার এই উদ্দীপনাপূর্ণ অনুনয় জানিয়েছেন।

"সুপুত্র হলেও 'কু' মাতা হওয়া কি উচিত হচ্ছে? আরো জিজ্ঞাস্য মায়ের মর্য্যাদা মায়েরা ছাড়া কে বুঝবে বলত? তাই আবার ডাকি—'মা' জাগো! ছেলেদের জাগাও! আবার জগৎ সত্যানন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক!"

শ্রীদেবেশ শর্ম্মা

East & West.—Gilbert Murray & Rabindranath Tagore. International Institute of Intellectual Co-operation. League of Nations. 1935.

লীগ অব নেশন্‌স্ বা জাতি-সঙ্ঘ যে মহৎ আদর্শের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা সার্থকতা লাভ করে নাই। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার অভাব অনেক স্থলেই দেখা যায় তাহা একেবারে অকারণ বলা চলে না। জাতি-সঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান—International Institute of Intellectual Co-operation। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য জগতের বিভিন্ন দেশের মনীষিগণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপারে সহযোগিতাসাধনে সহায়তা করা। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকেও এই যোগাযোগ চিরকাল সাধিত হইয়াছে এবং হইবে, অর্থাৎ যতক্ষণ না এইরূপ যোগাযোগের পথে রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক অন্তরায় উপস্থিত হয়। অন্তরায় উপস্থিত হইলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো শক্তি নাই যে তাহার প্রতিরোধ করে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানির মনীষিসম্প্রদায় 'পিতৃভূমির' সুসন্তান হইয়া যুদ্ধনীতির সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বহু ফরাসী পণ্ডিত জার্ম্মান পণ্ডিতসম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে 'বর্ব্বর' আখ্যা দিতে দ্বিধা করেন নাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছিল—কিন্তু তাহার মূলে ছিল ততটা মনীষাগত সহযোগ নয়, বিশেষত এই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে, যতটা ফরাসীদেশ, জার্ম্মান এবং অপর সকল দেশের জনসাধারণের স্বার্থ যে মূলত এক ও অখণ্ড এই বোধ। এই বোধ উদ্বুদ্ধ করিতে মনীষিগণ অবশ্য সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু সকল দেশের নিয়তম

শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে স্বার্থপ্রণোদিত সার্ব্বভৌমিকতার বিস্তার ছাড়া এই বোধের বিকাশ অসম্ভব; এবং এই স্বার্থ জাতিসঙ্ঘের যাঁহারা পরিচালক তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী। এই জাতিসঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট এবং ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত কোনো প্রতিষ্ঠান-দ্বারা এই উদ্দেশ্য কি ভাবে সাধিত হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

সমালোচ্য পুস্তিকাটির উপর যে ছাপ আছে উপরের উক্তিগুলি শুধু সেই ছাপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পুস্তিকাটিতে গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সঙ্গে যে দুইটি পত্র বিনিময় করিয়াছেন তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্র দুইটির নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। গিলবার্ট মারে মানুষের সহিত মানুষের সহযোগের কথাই লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও উত্তরে উদার মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর জগতের সকল জাতির মিলনের সম্ভাবনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মারে সাহেবের মতন তাঁহার লেখনী শুধু মধু বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। প্রবলপ্রতাপ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাহাদের বিপুল জ্ঞানবিজ্ঞান, তাহাদের বিস্ময়কর মনীষা, তাহাদের সার্ব্বভৌম দর্শন সত্ত্বেও যে প্রাচ্য জাতিসমূহকে শোষণ করিতে দ্বিধা করে নাই এবং ইহারই ফলেই যে জাতিগত বৈর ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়া সভ্যতার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহার বর্ণনায় যদি কিঞ্চিৎ তিক্ত হইয়া থাকে তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় নানা সঙ্কীর্ণ আচার সংস্কার প্রভৃতির ফলে কি ভাবে সমগ্র দেশ পঙ্গু হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত তীব্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু ফাঁকা সার্ব্বভৌমিকতার মন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, এই সার্ব্বভৌমিকতার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা প্রাচ্যই হউক, বা প্রতীচ্য হউক, তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি তন্ন তন্ন করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছে। সমস্যা—কি ভাবে অন্তরায়গুলির নিবারণ অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানের কোনো আভাস এই পত্র দুইটির মধ্যে পাঠক হয়তো পাইবেন না। কিন্তু এই অন্তরায়গুলি যে প্রকৃত—এই বোধেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বোধ আমাদের নিকট আরো সুস্পষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য জাতিসঙ্ঘ বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের গৌরবের কিছু নাই। ম্যাক্‌মিল্যান্ কম্পানির মধ্যস্থতায়ও এই পত্রের বিনিময় ও মুদ্রণ সংঘটিত হইতে পারিত।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

প্রকাশক—শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ২৩।এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

পরিচয়

বার্ষিক ৪।০
প্রতি সংখ্যা ১৲

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
শারদীয়া, ১৩৪২

বিষয়-সূচী

কাণ্ট্ ও বিজ্ঞানবাদ	... ...	হুমায়ুন কবির
প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
মান, লজ্জা, ভয়	... ...	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সারথি	... ...	৺রাখালচন্দ্র সেন
ফাশিস্‌মো	... ...	শ্রীসুশোভন সরকার
শব্দ ও অর্থ	... ...	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
পুরানো কথা	... ...	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
কবিতাগুচ্ছ	... ...	শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়
		শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদকী

পুস্তক পরিচয়

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীছায়া দেবী, শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু, শ্রীমণিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্রলাল ঘোষ, শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
শ্রীস্বর্ণনন্দন শর্ম্মা ইত্যাদি

সম্পাদক :

ভারতী ভবন
কলিকাতা

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪২

পরিচয়

কাণ্ট্ ও বিজ্ঞানবাদ

পরিচয়ে কাণ্টের দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা পূর্ব্বে একবার করিয়াছি, কিন্তু সে আলোচনা কোন কোন স্থানে দুর্ব্বোধ্য বা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে মনে হয়। ব্যক্তিগত অসামর্থ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা চলে যে সে প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ বোধ হয় অসম্ভব। আমার জ্ঞাতসারে বাংলায় কাণ্টের দর্শন-আলোচনার এই প্রথম উদ্যম বলিয়া জানিতাম, পরে শুনিয়াছি যে বহুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসীতে" একবার এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে নিশ্চয়ই বহুদিনের কথা, এবং সাধারণের পক্ষে সে আলোচনা সহজলভ্য নহে; বিশেষতঃ কাণ্টের দর্শন বিচার ইংরাজিতেও অতি অল্পদিনই হইল যথা যথ ভাবে সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বে কাণ্টের দর্শনবিচার বহুস্থলেই কাণ্টের অপেক্ষা হেগেলের মতবিচারেই অধিক মনোযোগ দিয়াছে, ভাবিয়াছে যে হেগেলীয় মতবাদের পূর্ণতার তীর্থ-পথে কাণ্টীয় দর্শন কেবল একটী সোপান মাত্র। বহু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অধ্যাপনায় আজিও এ মনোবৃত্তির পরাভাস পরিস্ফুট, কিন্তু কোন দার্শনিককেই তাঁহার পরবর্ত্তীদের মতবাদের উপাদানমাত্র বিবেচনা করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার নিজস্ব দানকে উপলব্ধি করার পথে তাহা পরিপন্থী। সকল দার্শনিকের বেলায়ই এ কথা প্রযোজ্য, কিন্তু কাণ্টের সম্বন্ধে ইহার সত্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার গবেষণাকে ভিত্তি করিয়াই আধুনিক জগতের দর্শনের গতি ও বিকাশ, এবং সেই জন্যই আধুনিক

জগতের মনোবৃত্তিকে জানিতে হইলে কাণ্টের দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকিলে চলে না। প্রয়োজনীয়তার এই গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়া পাঠকগোষ্ঠী কাণ্টের দর্শন আলোচনায় আমার এই অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টাসমূহকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, ইহাই ভরসা করি।

১

আধুনিক জগতের মনোবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিলে বলা চলে যে ইহা বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের যুগান্তরকারী প্রগতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেবলমাত্র সে প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয় না। বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার, নূতন নূতন অভিযান এবং নবীন পদ্ধতি আমাদের চিরাচরিত জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই রূপান্তর জীবনের প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের মানস-গঠন ও বিশ্বদৃষ্টিকেও রঞ্জিত করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা সার্থক।

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনোবৃত্তির ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মেলে। সভ্যতার এ বৈচিত্র্যের অর্থ ইহা নয় যে কোন বিশেষ দেশ বা কালের সভ্যতার উপাদান অবিমিশ্র। মানবচরিত্র এবং মানবসমাজের জটিল সংগঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ কথার সত্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে। রূপবোধ, নৈতিকতা অথবা ধর্ম্মান্বেষণার প্রবলতা বিশেষ দেশ অথবা যুগের বিশ্বদৃষ্টিকে রঞ্জিত করিয়া সমসাময়িক সভ্যতার অভিমুখ ও সংগঠন নির্দ্দেশ করিতে পারে, কিন্তু সে নির্দ্দেশের ফলে মানবচিত্তের অন্যান্য বৃত্তিসমূহ নিষ্পেষিত হয় না, কেবলমাত্র রূপান্তরিত হয়। ফলে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্য উপাদানমূলক নহে, সংগঠনমূলক। সমস্ত সভ্যতার ক্ষেত্রেই একই প্রকারের উপাদানসমূহ ক্রিয়াশীল, কেবলমাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের প্রাধান্যে ও সংগঠনের পার্থক্যে সভ্যতার অবয়ব ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা সভ্যতা হিসাবে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য যে কোন সভ্যতার অপেক্ষা হীন নহে। প্রাচীন চীনের রূপসাধনা, সাহিত্যসৃষ্টি অথবা সমাজ সংগঠনের কথা মনে করিলে আজিও আমাদের আশ্চর্য্য লাগে। জীবনযাত্রার ধারা বিচার করিলেও চীন সভ্যতার উৎকর্ষ বিস্ময়কর মনে হয়। কালপ্রবাহের দৈর্ঘ্য এবং নরনারীর সংখ্যা বিবেচনায় বলা চলে যে বিশ্বসভ্যতার বিকাশে চীনের স্থান প্রায় সর্ব্বোচ্চে, অথচ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চীনসভ্যতার সে বিকাশে বিজ্ঞানের স্থান অতি নগণ্য। ব্যক্তিগত হিসাবে যে চীনবাসী বিজ্ঞানে প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতি অথবা সভ্যতা হিসাবে যে চৈনিক চিত্ত বিজ্ঞানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, সে কথাও সমানই নিঃসন্দেহ। চীনবাসীর চরিত্র অথবা বুদ্ধির অভাবের কথা এ প্রসঙ্গে উঠিতে পারে না, কারণ দর্শন, সাহিত্য এবং রূপসৃষ্টিতে চৈনিক চিত্ত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে স্থির সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা অধিক মেলে না। ভারতবর্ষ অথবা পারস্যের সভ্যতা সম্বন্ধেও বোধ হয় এ কথা বলা চলে। এই সমস্ত সভ্যতায় বিজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, এ কথা মনে করিলে কিন্তু ভুল হইবে। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কারের ইতিহাসই এই সভ্যতাসমূহের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু বিজ্ঞানের সে বিকাশ এ সভ্যতার মর্ম্মকথা নহে।

আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলিবার অর্থ এইখানেই মেলে। কোন একটী বিশেষ আবিষ্কারের তুলাদণ্ডে বিচার করিলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের বিকাশকে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে কি না, সে কথা বিচারের বিষয়। কিন্তু বিশেষ আবিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি যুগধর্ম্ম এবং মানুষের বিশ্বদৃষ্টি দিয়া আমরা সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহি, তবে আধুনিক সভ্যতা যে একান্তভাবে বিজ্ঞানধর্ম্মী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। প্রাচীন সভ্যতায় বিজ্ঞান ছিল মানুষের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র

সাধনার উপাদানসমূহের মধ্যে একটী মাত্র উপাদান,—বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান সেই সাধনার ধারানির্দ্দেশক।

আধুনিক যুগে মানুষের চিত্তবৃত্তির সমস্ত প্রকাশের ক্ষেত্রেই এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সভ্যতাকে বুঝিতে হইলে তাই এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলা চলে যে বিশ্বসৃষ্টির প্রকাশ শৃঙ্খলাবদ্ধ, এই বিশ্বাসই তাহার মূল। প্রকৃতির পর্য্যায়ে সহজ বিশ্বাস না থাকিলে বিজ্ঞানের বিকাশ অসম্ভব, তাই এই বিশ্বাসের আবির্ভাবের ফলেই অসভ্য যুগের যাদুবিদ্যা বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিকের সজ্ঞান মতবাদ যাহাই হউক না কেন—এবং অনেক স্থলেই সে মতবাদ একান্তরূপে অভিজ্ঞতানির্ভর বলিয়া শৃঙ্খলার সার্ব্বিকতায় অবিশ্বাসী—তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাই প্রমাণ করে যে প্রকৃতির পর্য্যায়ের সহজ বিশ্বাস তাঁহার স্বধর্ম্ম। দর্শনের সিদ্ধান্ত হিসাবে তাই বৈজ্ঞানিক বহু স্থলেই হিউমের সন্দেহবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠা দর্শনের সেই অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতকেও অক্লেশে লঙ্ঘন করিয়া যায়।

প্রকৃতির শৃঙ্খলায় বিশ্বাস তাই বিজ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে এ বিশ্বাসকে বরণ করিয়া লইলে বিজ্ঞানের সাফল্যের কোন বিবরণ দেওয়া চলে না। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার মূলেই এ বিশ্বাস রহিয়াছে, জগৎ-প্রপঞ্চের বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থৈর্য্যের এ সন্ধান না পাইলে মানুষের চিত্ত অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করিবার কথা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সুতরাং কেবলমাত্র এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানের বিশেষ মনোবৃত্তিকে বুঝিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কারণ মানবচিত্তের অন্যান্য বিকাশের তুলনায় বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ইহাতে প্রকাশ পায় না। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ স্থাপনে। এক পক্ষে এ সম্বন্ধ সাধারণ সম্বন্ধ, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষের সাংখ্যিক বা স্থানকালগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ নাই। বিশেষের স্বভাব বা লক্ষণ বিচার করিয়া সেই লক্ষণের

সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই বিজ্ঞান তৃপ্ত। সেই লক্ষণের পুনরাবির্ভাব হইলে সেই সম্বন্ধেরই পুনরাবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী, ইহাই বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ। অন্য পক্ষে এ সমস্ত সাধারণ সম্বন্ধও বিশেষের বিশিষ্ট স্বভাববিচারের ফলে আবিষ্কৃত। বিশ্বসৃষ্টি নিয়মানুবর্ত্তী, প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশই শৃঙ্খলা মানিয়া চলে, পৃথিবীর ধারাবাহিকতায় এ সাধারণ বিশ্বাস বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই বিজ্ঞান সৃষ্টিকে নিয়মানুবর্ত্তী বলিয়া তৃপ্ত নহে, বিচিত্র সৃষ্টির বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বিশিষ্ট নিয়ম আবিষ্কারই তাহার লক্ষ্য, প্রকৃতির বিশিষ্ট প্রকাশের মধ্যে বিশিষ্ট শৃঙ্খলাস্থাপনেই তাহার সিদ্ধি। কার্য্যকারণ-বিধির উদাহরণ দিয়া বলা চলে যে কার্য্যকারণ-বিধির সর্ব্বব্যাপকতায় বিশ্বাস বিজ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহার সাধনা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষের মধ্যে বিশিষ্ট কার্য্যকারণ-বিধির আবিষ্কার।

সৃষ্টির প্রত্যেকটী ঘটনাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে অলঙ্ঘ্য নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ—এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের বলেই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রহস্য নির্ণয়ের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এ বিশ্বাসের ফলে বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বত্রই যান্ত্রিকতার অমোঘ বিধানে বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য। যান্ত্রিকতার এ সর্ব্বব্যাপকতা কার্য্যকারণ-বিধির সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র, সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের উপর বুদ্ধির অমিশ্র আলোক ফেলিয়া পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘ্য সূত্রের শৃঙ্খলে তাহাকে প্রকাশ করিতে উৎসুক।

যান্ত্রিকতার এ বিজয়-অভিযান বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম হইলেও মানবচিত্ত দুই দিক হইতে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। কার্য্যকারণ-বিধির সম্প্রসারে যান্ত্রিকতার রাজ্যস্থাপন বিজ্ঞানের লক্ষ্য, কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যেই সে-সাধনার পথে বাধা রহিয়াছে। বিজ্ঞান বিশিষ্টকে ভিত্তি করিয়া সৌধ রচনায় রত, কিন্তু বিশিষ্টের প্রতি একান্তভাবে বদ্ধ-দৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর। বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির পরাকাষ্ঠা তাই হিউমের সন্দেহবাদে, কিন্তু সে সন্দেহবাদের মধ্যে বিজ্ঞানের

সাধারণ সূত্রের স্থান নাই, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ফলে বিজ্ঞানের মূলগত বিশ্বাস এবং তাহার সাধনার পদ্ধতি পরস্পর-বিরোধী। এই জন্যই কোন কোন দার্শনিক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, কারণ জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাহার মধ্যে অসঙ্গতি বা বিরোধের কোন স্থান নাই। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান তাই মানুষের কর্ম্মপদ্ধতি মাত্র, ব্যবহারিক জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা যতই অধিক হউক না কেন, জ্ঞানের স্বপ্রকাশ সম্পূর্ণতার কোন চিহ্ন সেখানে নাই। একথা মনে করিবার আরো কারণ রহিয়াছে। কার্য্যকারণ-বিধি বিজ্ঞানের প্রাণমন্ত্র, যতদূর তাহার প্রসার, ততদূর পর্য্যন্তই বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কার্য্যকারণ-বিধির স্বভাবের মধ্যেই স্ববিরোধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কার্য্যকারণ-বিধি বিশেষ ঘটনাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ দিয়া বিচার করে, তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তীদের স্বভাবের মধ্যেই পাইতে চাহে। ফলে বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্য ঘটনা-পর্য্যায়ের মধ্যে তাহার অবস্থানের ফল বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু অন্য পক্ষে স্বভাবকে অবস্থান-নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

এই স্ববিরোধের ফলেই বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির তাৎপর্য্য লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে এত মতভেদ। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা ও বৈশিষ্ট্যবোধের উপর যাঁহারা আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির তাৎপর্য্য নিরীক্ষা ও পরীক্ষায়। তাহার ফলে যে সংযোজক বাক্য আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি, কিন্তু সে বৃদ্ধির মধ্যে সার্ব্বিকতার অবকাশ নাই বলিয়া বস্তুতপক্ষে জ্ঞানের সে বিকাশ কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অন্য পক্ষে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে সাধারণ সম্বন্ধের সার্ব্বিকতার উপরই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যয়ের স্বভাবযোগ্য বিচার করিয়াই বিজ্ঞানের পরিণতি। গণিত তাই বিজ্ঞানের প্রতীক, এবং গণিতের

সাধারণ সূত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের বিষয়। ফলে বস্তুর দেশকালগত অবস্থান বিজ্ঞানের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক, এমন কি নিরীক্ষা ও পরীক্ষাও বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের অপরিণতির সাক্ষ্য মাত্র। বিজ্ঞানের পরিণতির ফলে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া গণিতের সার্ব্বিক সূত্রে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্যই একদিন উদ্ভাসিত হইবে।

একপক্ষে আপনার কর্ম্মপদ্ধতির স্ববিরোধ যান্ত্রিকতার সর্ব্বব্যাপী বিজয় অভিযানের অন্তরায়। অন্যপক্ষে মানুষের আত্মোপলব্ধি এবং চিত্তবৃত্তির আদর্শবোধ এ অভিযানকে অস্বীকার করিতে চাহে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে মানুষের আত্মা বিশ্বের যান্ত্রিকতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনার পূর্ণতার সন্ধান পায়, নীতিবোধের গভীরতায় এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায় কার্য্যকারণ-বিধির অজানিত আদর্শকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, ধর্ম্মান্বেষণার আহ্বানে বিজ্ঞানের সমগ্র আদেশ অনুদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া পরম সত্যের সন্ধান করে। বিজ্ঞান আপনার দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের সত্যকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা প্রধানতঃ বিজ্ঞানধর্ম্মী বলিয়া সে সভ্যতার তুলাদণ্ডে বিজ্ঞানের তুলনায় সৌন্দর্য্য, নীতি অথবা ধর্ম্মবোধ অবহেলিত হইয়াছে, তাহাও সত্য, কিন্তু মানুষের চিত্ত বিজ্ঞানের সে দাবীকে কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্য ও শিল্প এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানের এ সর্ব্বগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নীতি ও ধর্ম্মবোধও চিরদিনই বিজ্ঞানের সে যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে, প্রতিদিনের নিত্যকর্ম্মে সামাজিক মানুষও তাহার ব্যবহারে স্বভাবে বিশ্বাসে বিজ্ঞানের সে যান্ত্রিকতাকে কার্য্যত অগ্রাহ্য করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। দ্বন্দ্বকে অগ্রাহ্য করিলেই দ্বন্দ্বনিরসন হয় না। তাই আধুনিক সভ্যতার আত্মঅবিশ্বাস এবং আত্মঘাতী সন্দিগ্ধতার মূলও বোধ হয় এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে নিহিত।

কাণ্টের দর্শনের লক্ষ্যও তাই দুইটী। বিজ্ঞানের স্বভাবের

মধ্যে যে বিরোধের সন্ধান মেলে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির পরিপূর্ণতর উপলব্ধি তাঁহার দর্শনসাধনার একটী প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানকে তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কাণ্ট ক্ষান্ত হন নাই, তাহার অধিকারের সীমানির্দ্দেশ করিবার প্রয়াসও তাঁহার সাধনার অঙ্গীভূত। তাহার ফলে নীতি ও ধর্ম্মবোধের প্রেরণায় যে বিশ্বছবি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, সেই ছবির সঙ্গে বিজ্ঞানের যান্ত্রিক বিবরণের সমন্বয়সাধনও তাঁহার দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। একপক্ষে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া তাহার যৌক্তিকতা ও সত্যসন্ধানকে তিনি সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন, অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের সঙ্গে আদর্শবোধের যে সংঘর্ষ, তাহার সমাধান করিয়া অভিজ্ঞতাকে তিনি পরিপূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী বলিয়া জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(২)

বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে পৃথক করিয়া দেখিলে সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের কোন বিবরণ দেওয়া যে অসম্ভব তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। প্রতিমুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসাবে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েই অগ্রাহ্য। ঠিক একই কারণে বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং তাহার তাৎপর্য্যের আলোচনায় বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েরই নিষ্ফলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই এই সমস্যার সমাধানেই কাণ্ট তাঁহার দর্শনের মর্ম্মকথা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সে সমাধানের মূলকথা এই যে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের সংযোগকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয়গম্য ও বুদ্ধিলব্ধ বিষয় যে বিভিন্ন নহে, সে বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিবার ফলেই কাণ্ট-পূর্ব্ব দর্শন চালমাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্য নির্দ্দেশ করিয়া কাণ্ট

দর্শনকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে যদি আমরা স্বতন্ত্র মনে করি, তবে অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগের কোন বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগকে স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিতে চাহি, তবে অভিজ্ঞতার সার্ব্বিকতা এবং বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পথে কোন বাধা থাকে না। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্যস্বীকারের ফলে কাণ্ট দেখিলেন যে প্রত্যয় এবং সংবেদনার মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও তাহারা পৃথক নহে, সংবেদনা না থাকিলে প্রত্যয় অর্থহীন, প্রত্যয় না থাকিলে সংবেদনা অজ্ঞেয়।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে প্রত্যয় বস্তু অথবা ঘটনার স্বভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া তাহা সার্ব্বিক, সার্ব্বিক বলিয়া দেশকালের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাই তাহার অস্তিত্বেরও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। পক্ষান্তরে সংবেদনা বিশিষ্ট, বিশেষ দেশকালজ বলিয়া বিশিষ্ট অস্তিত্বের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে এক মনে করিলে প্রত্যয়কে সংবেদনার মধ্যে আবদ্ধ মনে করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যয়ের সার্ব্বিকতাকে স্বীকার করিবার অর্থ কি? এ আপত্তির উত্তরে কাণ্টের বক্তব্য এই যে বিভিন্ন সংবেদনার অস্তিত্বগত পার্থক্যকে অবহেলা করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্যস্থাপনই প্রত্যয়ের কাজ, তাই ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই বুদ্ধির বিকাশ। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বুদ্ধির পক্ষেও সমানই অলভ্য। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে হয় বিশেষ ও সামান্যকে পৃথক জ্ঞান করিলেও বিশেষ ব্যতীত সামান্যের অথবা সামান্য ব্যতীত বিশেষের জ্ঞান সমানই অসম্ভব।

কাণ্টের বক্তব্যকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে প্রত্যয়ের ধর্ম্ম সংবেদনার মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ। সেইজন্যই প্রত্যয় এবং সংবেদনার বিষয় এক, অথচ প্রত্যয় এবং সংবেদনা বিভিন্ন। ফলে প্রত্যয়কে সংবেদনার সঙ্গে সমশ্রেণীয় মনে না করিয়া অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য সাধনের মনন-রীতি গণনা করাই সঙ্গত। বিভিন্ন প্রত্যয়ের

বিষয়ে যাহা সত্য, মানবচিত্তের মনন-রীতির বেলায় সাধারণভাবে তাহা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফলে এই সমস্ত মনন-রীতির সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে সংবেদনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে নহে, অভিজ্ঞতার যে সংগঠনের উপর তাহাদের সম্ভাব্যতা ও বোধগম্যতা নির্ভর করে, তাহাদের সঙ্গেই আমাদের মননরীতির কারবার। মননরীতির সম্বন্ধে যাহা আমরা বলি, তাহা অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বর্ণনা নহে, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনারই তাহা বর্ণনা। সমস্ত সংবেদনা ও চিন্তাধারার মূলে যে সমস্ত সাধারণ সূত্র, অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতা দিয়াই তাহাদের সত্য প্রমাণিত হয়, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাহারা অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ।

বিজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব তাহার বিবরণও এইখানেই মেলে। বিশেষের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলে তাহার স্বভাব সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, তাই ভবিষ্যদ্বাণীতেই বিজ্ঞানের সাফল্যের পরিচয়। ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ প্রকৃতিকে আদেশদান, বিশেষ বস্তুর অভিজ্ঞতার পূর্ব্বেই তাহার স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। আমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছি, বস্তুতও তাহা সেই স্বভাবের পরিচয় দিবে, এই ভরসাই সেই পূর্ব্বজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভরসাকে কেবলমাত্র আবেগের দাবী বলিয়া গণনা করা যায় না, কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞান এবং সমস্ত অভিজ্ঞতাই আবেগের প্রতিক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়। অভিজ্ঞতাকে সাধারণ ভাবে অস্বীকার করা স্ববিরোধী, তাই অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সমস্ত সন্দেহের সুরু। সেই অভিজ্ঞতার সাধারণ সর্ত্তের উপরেই কাণ্ট বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, যে সমস্ত সাধারণ সূত্র অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার সঙ্গেই জড়িত, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাই তাহাদের সত্যকে প্রমাণ করে। কাজেই যে ভরসা এই সমস্ত সাধারণ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেবলমাত্র ভরসা নহে, তাহাকে জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

মানুষের অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রভেদ অথচ সংযোগের প্রয়োজনীয়তা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। চিত্তের যে মননরীতি অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার ভিত্তি, তাহাকে সাধারণ সূত্রে প্রকাশ করিতে

গিয়া কাণ্ট তাই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে খানিকটা প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কাণ্টপূর্ব্ব দর্শনের মতে কেবলমাত্র তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতিই যে বিভিন্ন, তাহা নহে, মননশক্তি হিসাবেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন, এবং সেই জন্য তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্লেটোর দর্শনেও আমরা এই মতবাদেরই পরিচয় পাই, কারণ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় জ্ঞানের সামগ্রী নহে, তাহা কেবলমাত্র অভিমত। জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা তাই একমাত্র বুদ্ধির মধ্যেই নিহিত। বাস্তব এবং অবাস্তবের পার্থক্যের সঙ্গে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের পার্থক্যের সমীকরণের চেষ্টা তাই ইয়োরোপীয় বুদ্ধিবাদের একটী প্রধান অঙ্গ। তাহাকে অস্বীকার করিয়া কাণ্ট বলিলেন যে বুদ্ধি বাস্তবকে জানিবার উপকরণ নহে, বুদ্ধি দিয়া আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে জানিতে পারি। ফলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধির পার্থক্য বিষয়গত অথবা স্বভাবগত নহে, কেবলমাত্র কর্ম্মপদ্ধতিতেই তাহাদের পার্থক্য এবং মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ফলে হয়তো ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি একই মননশক্তির বিচিত্র বিকাশ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্যই কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের মূলমন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে এ পার্থক্যকে অর্থহীন মনে হইতে পারে, কারণ আমরা সাধারণত মনে করি যে যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাই বাস্তব, তাহাই জ্ঞানের লক্ষ্য। বিশ্লেষণের ফলে কিন্তু এ সহজ বিশ্বাস টিঁকিতে পারে না, কারণ মরীচিকা, ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার ফলে কোনটী জ্ঞান এবং কোনটী নহে, সেই সম্বন্ধেই মনে সন্দেহ জাগে, এবং বাস্তবকে জ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিবার আর কোন সার্থকতা থাকে না। সেই কথাকেই কাণ্ট বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়-বস্তুর পার্থক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে বাস্তবের স্বপ্রকাশ কোন পরিচয় নাই, থাকিলেও আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস্তবের যতটুকু প্রবেশ, বাস্তব সম্বন্ধে কেবল ততটুকুই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবার কোন উপায় নাই,

তাই অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরীণ বাস্তবকেও নিঃসন্দেহভাবে বাস্তব বলিয়া জানিবার কোন স্বপ্রকাশ লক্ষণ মেলে না। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তব তাই আমাদের কাছে অজ্ঞেয় এবং চিরকাল অজ্ঞেয় থাকিতে বাধ্য,—তাহার সম্বন্ধে কোন বিবরণ দিতে যাওয়া অর্থহীন। অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের বিষয়বস্তু লইয়াই তাই আমাদের কারবার, তাহাকে জানিয়া এবং তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যার বিচার করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তব আমাদের কাছে অজ্ঞেয়, একথা স্বীকার করিলে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তবের কল্পনাই বা আমাদের মনে কেমন করিয়া আসিল? অভিজ্ঞতা-নিরাপক্ষ বাস্তবকে যদি ব্রহ্ম[১] এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যদি প্রকৃতি[২] বলা হয়, তবে বলিতে হয় যে প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কারবার, তাহাকে জানিয়াই বুদ্ধি তৃপ্ত, কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞান কি করিয়া সম্ভবপর হইল? কাণ্টের মতে সঙ্গতিই প্রকৃতির লক্ষণ, তাই অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হইতে বাধ্য এবং অভিজ্ঞতার এই সঙ্গতিই জ্ঞানের ভিত্তি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়াই সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য সম্ভবপর, এবং সেই সম্ভাবনার উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার সীমানাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, সাক্ষাৎ অথবা বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিলেও অতীত এবং ভবিষ্যৎকে লঙ্ঘন করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই। ঘটনার সঙ্গে সম্ভাবনার সম্বন্ধস্থাপন করাই তাই বুদ্ধির কাজ, কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তবেই বুদ্ধি সম্ভাবনার বিচার করিতে পারে। এ সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও, অথবা এ সমস্ত স্বীকার করিবার ফলেই কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে সঙ্গতির প্রতিমানই যখন জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড, তখন ব্রহ্মের নামোল্লেখেরও কাণ্টের কোন অধিকার নাই।

এ আপত্তি কাণ্টের নিজের মনেও উঠিয়াছিল, কিন্তু বিচার করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে

১ ব্রহ্ম = noumenon ২ প্রকৃতি = phenomenon (appearance)

তাহা ভিত্তিহীন। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেই এ প্রশ্নেরও মীমাংসা অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত অভিজ্ঞতায়ই ইন্দ্রিয়ক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়-মুক্ত অমিশ্র বুদ্ধির বিষয়বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ, তাই সে বিকাশে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিবার কোন ইঙ্গিত তাহার মধ্যে নাই। অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয় যে বিষয়বস্তু আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করে, তাহা প্রকৃত হইলেও খণ্ডিত। একথা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাহার সত্য প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়ের সংবেদনায় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বিশেষ দিক অথবা খণ্ডমাত্র আমরা জানি, তাহার অন্যান্য দিক অথবা উপাদান ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কল্পনার ফলেই তাহারা জ্ঞান-গোচর। এই সমস্ত অন্যান্য দিক অথবা উপাদানও কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত নহে, ইন্দ্রিয়াতীত হইলে তাহারা অভিজ্ঞতার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইতে পারিত না। ঘরে বসিয়া যখন দেওয়ালের দিকে আমরা চাহি, তখন দেওয়ালের অপর দিক সংবেদিত হয় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য পিঠ নাই, একথা স্বপ্নেও আমাদের মনে হয় না। অন্য পক্ষে, দেওয়ালের বাহির দিকও সংবেদনারই বস্তু, আমাদের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাও ইন্দ্রিয়জ বলিয়া প্রকাশিত হয়। দূরে যে পাহাড়ের চূড়া আমি এই মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে পাহাড় বলিয়া জানিবারও কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র আমার দৃষ্টিপথে বিশেষ আকারবিশিষ্ট বর্ণপুঞ্জকে সংবেদনা হিসাবে প্রকাশ করিতেছে। সে সংবেদনা যে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর অঙ্গীভূত অথবা উপাদান, সে বস্তু যে কেবলমাত্র দ্রষ্টব্য নহে, তাহা যে স্পর্শনীয়, দার্ঢ্যশীল এবং অন্যান্য বহু প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুণসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই।

সঙ্গতিই প্রকৃতির লক্ষণ, কিন্তু সঙ্গতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তবুও

ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যেই সঙ্গতির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, তাই উপস্থিত দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া গেলেও সমস্ত দেশকালকে অতিক্রম করিবার কোন নির্দ্দেশ অভিজ্ঞতায় মেলে না। ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির পার্থক্যে কাণ্ট এই কথাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। একপক্ষে সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলেই ইন্দ্রিয়জ উপাদান, অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয়জ বর্ত্তমানকে অতিক্রম না করিয়া গেলে অভিজ্ঞতার কোন অর্থই হয় না। এই অতিক্রমণ বুদ্ধির ধর্ম্ম, এবং কাণ্টপূর্ব্ব বহু দার্শনিকের মতে এই অতিক্রমণেই জ্ঞানের সম্ভাবনা। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয় প্রকৃত, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি যে বিষয়ের পরিচয় পায়, তাহা কেবলমাত্র প্রকৃত নহে, তাহা বাস্তব অর্থাৎ ব্রহ্ম। কাণ্ট কিন্তু সে কথা অস্বীকার করিয়াছেন। বারম্বার এই সত্যই তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন যে এ অতিক্রমণ ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানের অতিক্রমণ হইলেও ইন্দ্রিয়ের অতিক্রমণ নহে।

কাণ্টের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে, অভিজ্ঞতায় যে প্রকৃতিকে আমরা জানি, তাহা ব্রহ্ম অথবা বাস্তবেরই অংশ। খণ্ডের সঙ্গে সমূহের যে সম্বন্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধও তাহারি অনুরূপ। ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি বিভিন্নধর্ম্মী নহে, বিভিন্ন মনোবৃত্তির বিষয়বস্তু হিসাবে তাহাদের গণনা করা চলে না, এমন কি প্রকৃতিকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অথবা কার্য্যফল মনে করিবারও কোন কারণ নাই। ফলে তাহাদের পার্থক্য স্বভাবগত নহে, আমাদের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া তাহা বিকাশগত।

কথাটীকে আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলা বোধ হয় আবশ্যক। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সংযোগের ফল। ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র দেশকালগত মুহূর্ত্তিক বর্ত্তমানকে প্রকাশ করে, কিন্তু সেই আণবিক সময়ের মধ্যে চিত্ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা। তাই বুদ্ধি প্রতি নিমেষেই সেই আণবিক মুহূর্ত্তকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধির এই অভিযান কোনকালেই সমস্ত দেশকালের সীমানা পার হইয়া যাইতে পারেনা। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাব্যতা এই অতিক্রমণের উপরেই

প্রতিষ্ঠিত। তাই এই প্রকারের বাক্য কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রকেই প্রকাশ করেনা, সমগ্র অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য বর্ত্তমান।

কাণ্টের মতে আমরা বাস্তব বা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবেই জানি। কিন্তু সে জ্ঞান আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। তাহাতে ব্রহ্মের দিক বা খণ্ডবিশেষ প্রকাশ পায় বলিয়াই তাহাকে আমরা প্রকৃতি বলিয়া থাকি। তাহার প্রকৃতি নামের অর্থই এই যে ব্রহ্মের সমগ্রতা আমাদের অভিজ্ঞতার বোধগম্য নহে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান বিকাশ লাভ করে, অবস্থানের পরিবর্ত্তনেও নিত্যনূতন সামগ্রী জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু দেশ ও কালের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আমাদের জ্ঞান আংশিকই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন দেশে ও কালে জ্ঞানগোচর হয় এবং তাহাদিগকে কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির সাহায্যে গ্রথিত করিয়া যাহা আমরা পাই তাহাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ। ব্রহ্মের ঐক্য তাই অভিজ্ঞতার পূর্ব্বমীমাংসা[১] কিন্তু সে ঐক্যকে আমরা কখনই সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না, অনুমানের সাহায্যে তাহার ধারণা করি মাত্র। অভিজ্ঞতায় বিষয়ীর এবং বিষয়ের ঐক্য এই ঐক্যকেই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করিতেছে। তাহারি ফলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা বলিয়া জানিতে পারি, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সংবেদনার মধ্যে একই বস্তুর প্রকাশ দেখিতে পাই।

ব্রহ্মের যে অংশ সাক্ষাৎভাবে আমাদের জ্ঞানগোচর, সেখানে সমস্ত সংবেদনাই দেশ ও কালের নিয়মাধীন। সেই সাক্ষাৎ সংবেদনাকে আণবিক মনে করিলে অভিজ্ঞতার কোন বিবরণ দেওয়া যায় না, তাই অসাক্ষাৎ সংবেদনার সঙ্গে তাহাদের যোগ অবশ্যচিন্তনীয়। এই সংযোগকে আকস্মিক অথবা দৈবাৎ মনে করিবার কোন উপায় নাই, কারণ তাহাই আমাদের বস্তুবোধের ভিত্তি। বস্তুর বিশিষ্ট স্বভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া বিশেষ বস্তুর বেলায় এই সংযোগরীতি

১। পূর্ব্বমীমাংসা—presupposition।

বিভিন্ন কিন্তু অভিজ্ঞতার সামগ্রী হিসাবে সমস্ত বস্তুরই স্বভাবের যে ঐক্য, সংযোগরীতির উপর তাহারও প্রভাব না থাকিয়া পারে না। তাই দেশ ও কালের যে সংগঠন সাক্ষাৎ সংবেদনার মধ্যে প্রকাশিত, অসাক্ষাৎ সংবেদনার মধ্যেও তাহার উপস্থিতি না ভাবিয়া আমরা পারি না। তাই কাণ্টের মতে অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়মাত্রই দেশ-কালগত, এবং দেশ ও কালের ঐক্য অভিজ্ঞতার সঙ্গতির প্রধান উপকরণ। দেশ ও কালের ঐক্য না থাকিলে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, তাই দেশ এবং কালের ঐক্য বুদ্ধির পক্ষে অনতিক্রমণীয়। ব্যক্তির সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাই দেশকালনির্দ্দিষ্ট, এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বলিয়া এই দেশকাল কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিরই দেশকাল এক। ফলে দেশ ও কাল কেবলমাত্র ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধের ফল নহে, বরঞ্চ এক অসীম ও অনন্ত দেশকালের কাঠামোর মধ্যেই অভিজ্ঞতা বিকশিত হইতেছে।

কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের অর্থ এখানেই মেলে। প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের পার্থক্যে কাণ্ট কাল্পনিক বা মানসিকের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাই তাঁহার মতে প্রকৃতি চিত্তজাত নহে, বরঞ্চ বস্তু এবং চিত্তের পার্থক্য প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবিম্ববাদের[১] বিরুদ্ধে তিনি তাই বারে বারে বলিয়াছেন যে বস্তুকে জানিয়াই আমরা চিত্তকে জানিতে পারি, বিষয় না থাকিলে বিষয়ীর জ্ঞানও সমানই অসম্ভব। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কি করিয়া সম্ভবপর, তাহাই কাণ্টের প্রধান সমস্যা। ইন্দ্রিয় যে জগৎকে প্রকাশ করে, তাহা আণবিক ও বিচ্ছিন্ন, অথচ অভিজ্ঞতা সংবেদনার মধ্যে আবদ্ধ নহে, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহা বর্ত্তমানের সম্বন্ধস্থাপন করিতে চাহে। এ সমস্যার উত্তর প্রতিবিম্ববাদে মেলে না, কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় বাস্তবের প্রতিবিম্ব, একথা বলিলে সংবেদনার সঙ্গে সংবেদনার সম্বন্ধের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহার বিষয়ে

১। প্রতিবিম্ববাদ—representationism.

কিছুই বলা হয় না। জ্ঞানতন্ত্রবাদ এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদও এ প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর, কারণ অভিজ্ঞতার বিষয় মানসিক অথবা চিত্তবহির্ভূত, যাহাই হইক না কেন, সাক্ষাতের সঙ্গে অসাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অচ্ছেদ্য বন্ধনের কোন বিবরণই তাহাতে মেলে না। বস্তু ও চিত্তের সত্তার আলোচনা কাণ্টের উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের পার্থক্যেও তাই তিনি স্বভাবের কোন পার্থক্য প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার বক্তব্যকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান সাক্ষাৎ দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি সাক্ষাৎকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু সে অতিক্রমণেও ইন্দ্রিয়জ জগতের সংগঠন ও সংযোগরীতিকে পরিত্যাগ করে না। তাই মনে হইতে পারে যে এই সংগঠন ও সংযোগরীতি সমগ্র বাস্তবেরই পক্ষে সত্য, সুতরাং তাহারা ব্রহ্মেরই স্বভাবকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে জানিয়া আমরা ব্রহ্মকেই জানিতেছি। এই সংগঠন ও সংযোগরীতি কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, তাহারা বুদ্ধির সামগ্রী, এবং সেই জন্যই কাণ্টপূর্ব্ব বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের ধারণা যে বুদ্ধি দিয়া আমরা ব্রহ্মের স্বভাব জানিতে পারি। ফলে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের দ্বিত্বস্বীকার অবশ্যম্ভাবী, এবং অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগ রহস্যই থাকিয়া যায়।

এই রহস্যের সমাধান করিবার সাধনায় কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের বিকাশ। তিনি দেখিলেন যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সংগঠন ও সংযোগ-রীতিকে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের স্বভাবের পরিচয় মনে করিলে স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সংযোগকে স্বীকার করিয়া লইয়া এই সমস্ত মননরীতিকে আমরা যতদূর ইচ্ছা প্রসারিত করিতে পারি। তাহার ফলে ব্রহ্মের নূতন নূতন অংশ এবং রূপ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, বিজ্ঞানের সাধনা বর্ত্তমান এবং ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া মানবচিত্তের সম্মিলিত অভিজ্ঞতায় সমগ্র জগতের পরিচয় দিতে চাহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে চাহিলেই মুস্কিল বাধে, তাহার ফলে জ্ঞানের বিকাশের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তিরই বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাই কাণ্টের মতে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন

করা অসম্ভব, তাহাদের বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র নহে। বুদ্ধি তাই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়াই তাহাকে তৃপ্ত থাকিতে হয়। বুদ্ধির জ্ঞানে তাই সম্পূর্ণতার সাধনা রহিয়াছে, কিন্তু সাধনা রহিয়াছে এই বোধই সে জ্ঞানের অপূর্ণতার পরিচায়ক। সেই অপূর্ণতা-বোধ হইতেই আমরা ব্রহ্মের পূর্ণতার ধারণা করি, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র ধারণা থাকিতে বাধ্য। ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়াও মানুষের জ্ঞান চিরদিনই আংশিক এবং অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের পার্থক্যে কাণ্ট এই সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার বিজ্ঞানবাদের মর্ম্মকথা।

হুমায়ুন কবির

প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য

প্রাচীন শিলালিপি আলোচনা করলে আমরা নানাযুগের সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাই। সে ইঙ্গিত হ'তে যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ক্রমবিকাশের খোঁজ পাওয়া যায় সে কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বুলার ও লেভি বিশেষ করে বলেছেন।

সব চেয়ে প্রাচীন শিলালেখ হচ্ছে অশোকের খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের। অশোকলিপি ছন্দোবদ্ধ নয়, তার ভাষাও সংস্কৃত নয়। কিন্তু সে লিপির রচনায় ও শব্দবিন্যাসে একটা সহজরীতির খোঁজ পাওয়া যায়। লঘুত্বই হচ্ছে সে রচনা-ভঙ্গীর প্রাণ এবং সেই জন্যই তাকে সুকুমার সাহিত্যের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে না। যখন অশোক বলেন—"দেবনাং পিয়ে পিয়দশি লাজা হেবম্ আহা ছুবাদশবাভিসিতেন মে ইয়ম্ আনপয়িতে সবতা বিজিতসি মম সুতা লাজুকে পাদেসিকে পংচসু পংচসু বসেসু অনুসয়ানং নিখমংতু"—[দেবানাং প্রিয়ো প্রিয়দর্শী রাজা এবমাহ দ্বাদশবর্ষাভিষিক্তেন ময়া ইদমাজ্ঞাপয়িতম সর্ব্বথা বিদিতোঽস্তু মম যুক্তাঃ রাজুকাঃ প্রদেশিকাঃ পঞ্চসু পঞ্চসু বর্ষেষু অনুসংযানং নিষ্ক্রমন্তু], কিংবা যখন বেহিস্তান শিলালিপিতে দরায়ুস অনাড়ম্বরের সঙ্গে বলেন—থাতিয়ু দারয়বুস্ কৃসায়থিয় [রাজা দরায়ুস বলছেন—] তখন আমাদের বুঝতে দেরী হয় না যে এই দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী ও রাজা দরায়ুস সত্যকার রাজা। অথচ নানা বিশেষণের আড়ম্বর সত্ত্বেও "পরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী" যে সত্যই সে মর্য্যাদার মহারাজাধিরাজ ছিলেন না তা সহজেই বোঝা যায়।

অশোকলিপির রচনানৈপুণ্যের পরিচয় সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্য থেকেও পাওয়া যায়। সুত্তনিপাত বৌদ্ধ সাহিত্যের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ—আর এর মধ্যে কখনো কখনো যে রচনারীতির খোঁজ পাওয়া যায় তা নিতান্ত মামুলী ধরণের নয়। সে রীতির সহজগতি ও লঘুত্ব সংস্কৃত

সাহিত্যের বৈদর্ভী রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। সুত্তনিপাতের ধনীয়সুত্তে ধনীয়ো গোপ বুদ্ধকে বলছে—

পক্কোদনো দুদ্ধখীলো' হম্ অস্মি,
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,
ছন্না কুটি, আহিতো গিনি,
অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব।

[আমি ভাত রেঁধেছি, দুধ দুইয়েছি, মাহি নদীর তীরে আমার বাস, ছাউনির কুটীর, সেখানে আগুন জ্বালা রয়েছে। সুতরাং বৃষ্টি এখন হতে পারে।]

এর উত্তরে বুদ্ধ বলছেন—

অক্কোধনো বিগতখিলো' হম্ অস্মি,
অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো।
বিবটা কুটি নিব্বুতা গিনি,
অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব॥

[আমি ক্রোধ ও মনের বাধা নষ্ট করেছি। মাহি নদীর তীরে এক রাত্রি আমার বাস, ব্যাবৃত কুটীর, নিবৃত আগুন, সুতরাং বৃষ্টি এখন হতে পারে]

বুদ্ধের এ উত্তর দ্ব্যর্থবোধক হলেও তার সহজগতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। বরং তা বজায় রেখে যে শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি করা হয়েছে তা কোন সুদক্ষ কবি ব্যতীত অন্যের সম্ভব নয়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে সত্যকার সংস্কৃত কাব্যের ছায়া ধরা পড়ে। এ যুগের দুখানি শিলালিপির রচনাভঙ্গী কাব্যরীতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের গির্ণার লিপি ও মহারাজ শ্রীপুলমায়ির নাসিক লিপি। গির্ণার লিপি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগের, তার রচনা গদ্য ও ভাষা সংস্কৃত। নাসিকলিপিও ঐ শতকের মধ্যভাগের, তার রচনারীতি গদ্য ও ভাষা প্রাকৃত আর সে প্রাকৃত হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।

গির্ণার লিপি যিনি রচনা করেছিলেন তিনি কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাব্যের প্রাণ হচ্ছে ওজঃ গুণ আর এ গুণ নির্ভর করে সমাসবহুলতার উপর। এ দুই লিপিই হচ্ছে সমাসবহুল। গির্ণার লিপিতে শব্দ ও বর্ণের অনুপ্রাসেরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। আর এ সব অনুপ্রাস না থাকলে কাব্যরচনা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। শব্দানুপ্রাস—গুরুভিরভ্যস্তাম্নো রুদ্রদাম্নো, সৃষ্টবৃষ্টিনা,—বিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং,—ন্যায্যান্যানাং বিদ্যানাং ইত্যাদি। বর্ণানুপ্রাস—গিরিশিখর-তরুতটাট্টালকোপতল্পদ্বারশরণোচ্ছ্রয়-বিধ্বংসিনা।

গির্ণার লিপিতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার বিরল হলেও আছে, যেমন—পর্ব্বতপ্রতিস্পর্দ্ধী, মরুধন্বকল্প, পর্জ্জন্যেন একার্ণবভূতায়ামিব পৃথিব্যাঃ কৃতায়াং।

এই সব গুণ থাকাতেই গির্ণার লিপিকে গদ্যকাব্য বলা চলে, আর এ লিপির রচয়িতাও এ রচনা যে কাব্য তা নিজেই বলেছেন। কারণ মহারাজা রুদ্রদামনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—স্ফুট-লঘু মধুরচিত্রকান্তশব্দসময়োদারালঙ্কৃতগদ্যপদ্য-[কাব্যবিধানপ্রবীণে] ন—

সুতরাং এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবির মতেও কাব্য দুই প্রকারের গদ্য ও পদ্য। সে কাব্যের গুণ হচ্ছে স্ফুটত্ব, লঘুত্ব, মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য, কান্তি, শব্দবিন্যাস, ঔদার্য্য ও অলঙ্কার। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও কাব্যের বিশেষতঃ বৈদর্ভীরীতির এই সব গুণের কথা বলা হয়েছে—

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধির্মাধুর্য্যমোজঃ
পদসৌকুমার্য্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ
কাব্যস্য গুণা দশৈতে॥ (নাট্যশাস্ত্র)

শ্রীপুলমায়ির নাসিকলিপিতেও এসব গুণ আছে সেইজন্য সে লিপিও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এ লিপি সমাসবহুল সুতরাং ওজঃ গুণবিশিষ্ট, এ লিপিতে নানা অলঙ্কার ও অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে তা ছাড়া ভাষায় মাধুর্য্যের অভাব নাই। রাজাকে নানা পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—হিমবত-মেরু-মদর-

পবত-সম-সারস (হিমবতমেরুমন্দারপর্ব্বতসমসারস্য—)। রাজা নানা রত্নের অধিপতি হিসাবেই হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের তুল্য। এ উপমা আমরা কালিদাসের কাব্যেও পাই—

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষু পায়নাপানিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা॥

(রঘুবংশ)

কাদম্বরীতেও রাজা শূদ্রককে বলা হয়েছে—

মেরুরিব সকলভুবনোপজীব্যমানপদচ্ছায়ঃ—

শ্রীপুলমায়িকে আরও যে সব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তা' সংস্কৃত কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত কোন কবি ব্যতীত অন্য লেখকের কল্পনার বহির্ভূত। তাঁকে বলা হয়েছে—সবরাজলোকমঙলপতিঘাত-সাসন, দিবসকরবিবোধিতকমলবিমলসদিশবদন, তিসমুদতোয়পীতবাহন, পটিপুণচদমডলসসিরীকপিয়দশন, বরবারণবিকমচারুবিকম—, ভুজগপতি-ভোগপীনবাটবিপুলদীঘসুদ...ভুজ, অভয়োদকদানকিলিননিভয়কর, অবিপনমাতুসুসাসক, পোরজননিবিসেসসমসুখদুখ—, খতিয়দপমানমদন— ইত্যাদি।

শিলালিপিতে ছন্দোবদ্ধ কাব্যের প্রথম পরিচয় পাই সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ও কুমারগুপ্তের রাজ্যকালীন বন্ধুবর্ম্মণের মান্দাসোর প্রশস্তিতে। এলাহাবাদ প্রশস্তি খৃষ্টীয় চতুর্থশতকের ও মান্দাসোর পঞ্চম শতকের। মান্দাসোরের প্রাচীন নাম হচ্ছে দশপুর, পশ্চিম মালবের রাজধানী, শিবানী নদীর তীরে অবস্থিত। এ নদী হচ্ছে তাপ্তীর শাখা বিশেষ। দশপুরের প্রশস্তিকার বৎসভট্টি যে উজ্জয়িনীর কাব্যকলানিপুণ কবিদের এমন কি কালিদাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা' খুবই সম্ভব।

মান্দাসোর প্রশস্তিতে মহাকাব্যের যে সব গুণ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তা' সবই আছে। তাতে দেশ, নগর, সমুদ্র, পর্ব্বত, ঋতু রাজা প্রভৃতির বর্ণনা পাই। তাতে ছন্দের বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

মোট ৪৪টী শ্লোকের মধ্যে অনুষ্টুভ, আর্য্যা, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিতা, মন্দাক্রান্তা, মালিনী, বংশস্থ, বসন্ততিলকা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, হারিণী, প্রভৃতি নানা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

কবি বৎসভট্টি মঙ্গলাচরণের পর দেশের বর্ণনা করেছেন। সে দেশ হচ্ছে লাট দেশ, সে দেশ কবির মতে পৃথিবীর মধ্যে রমণীয় কারণ সে দেশের গাছপালা কুসুমভরে অবনত, সে দেশের পর্ব্বতমালা শ্যামল বনানীদ্বারা আবৃত আর সে দেশ মন্দির, সভাগৃহ ও বিহারে পূর্ণ।

কুসুমভরাবনততরুবরদেবকুলসভাবিহাররমণীয়াৎ।
লাটবিষয়ান্নগাবৃতাশৈলাজ্জগতি প্রথিতশিল্পাঃ॥

এই লাট দেশ হ'তে একদল প্রসিদ্ধ শিল্পী দশপুর নগরে এলো। দশপুর নগর ক্রমে পৃথিবীর তিলকস্বরূপ হয়ে উঠলো। সে নগরের সরোবর কারণ্ডবসংকুল, প্রফুল্ল পদ্মে সমাকীর্ণ, আর তার তটদেশস্থ বৃক্ষসমূহ হতে পতিত পুষ্পরাশি জল পর্য্যন্ত তীরদেশকে বিচিত্রিত করেছে। এই সরোবরে যে সব হংস ক্রীড়া করে তারা বিলোল তরঙ্গের আঘাতে পতিত পদ্মের রেণু দ্বারা আবৃত, সরোবরের কোথাও বা মৃণাল কেশরপূর্ণ পদ্মের ভারে অবনত। বনরাজি নিজপুষ্পভারে নত বৃক্ষে পূর্ণ, আর প্রগল্‌ভ অলিকুল ও অজস্রগীতনিপুণ পুরাঙ্গনাদের সঙ্গীতে মুখর সে নগরের গৃহসমূহ উন্নতদেহা ও শুক্লবর্ণা নারী ও চঞ্চল পতাকায় শোভিত হয়ে তড়িল্লতাবৃত শ্বেতবর্ণ মেঘশৃঙ্গের ন্যায় দেখায়, সে নগরের অট্টালিকা গন্ধর্ব্বদের সঙ্গীতে মুখর কৈলাস-পর্ব্বতের তুঙ্গ শিখরের ন্যায় দেখায়; আর সে সব অট্টালিকা, বেদিকা, চঞ্চল কদলীবন ও নানা চিত্রকর্ম্মের দ্বারা শোভিত। উন্নতবক্ষা প্রীতি ও রতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ কামদেবের ন্যায় সে নগর দুটী চঞ্চল স্রোতস্বতীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ।

এই বর্ণনায় বৎসভট্টি সমসাময়িক কবিদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন মনে হয়। বিশেষতঃ নগরের গৃহ ও অট্টালিকা ও পুরবাসিনী-দের বর্ণনায় মেঘদূতের ছায়া ধরা পড়ে। বৎসভট্টি বলেছেন—

চলৎপতাকাস্থবলাসনাথাস্ত্যর্থশুভ্রাস্ত্যধিকোন্নতানি।
তড়িল্লতাচিত্রসিতাভ্রকূটতুল্যোপমানি গৃহাণি যত্র ॥
কৈলাসতুঙ্গশিখরপ্রতিমানি চান্যান্যাভান্তি দীর্ঘবলভীনি সবোদিকানি।
গন্ধর্ব্বমুখরাণি নিবিষ্ট চিত্রকর্ম্মাণি লোলকদলীবনশোভিতানি ॥

আর মেঘদূতে—

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদস্তাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

দেশের ও নগরের বর্ণনার পর বৎসভট্টি রাজবর্ণনা করতেও ভোলেন নি। প্রথমে হচ্ছে গুপ্তবংশীয় মহারাজা কুমারগুপ্তের বর্ণনা—কারণ মন্দাসোর লিপি উৎকীর্ণ হয় কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে। মহারাজা কুমারগুপ্ত হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর [ভারতের] অধিপতি, সে পৃথিবীর মেখলা চতুঃসমুদ্রের তটদেশ, সুমেরু ও কৈলাস তার পয়োধর আর তার হাসি হচ্ছে বনান্তের প্রস্ফুটিত কুসুম—

চতুস্সমুদ্রান্তবিলোলমেখলাম্ সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীম্ কুমারগুপ্তে পৃথিবীম্ প্রশাসতি ॥

সেই সময়ে দশপুরের রাজা ছিলেন বিশ্ববর্ম্মণের পুত্র রাজা বন্ধুবর্ম্মণ। বিশ্ববর্ম্মণ নিজে দীনের প্রতি অনুকম্পাপরবশ, আর্ত্ত ও বিপন্নের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, অনাথের নাথ, বন্ধুবর্গের প্রতি দানে কল্পদ্রুম, ভয়ার্ত্তের অভয়দায়ক, সমস্ত রাজ্যের বন্ধু আর তা' ছাড়া—

দীনানুকম্পনপরঃ কৃপণার্ত্তবর্গসন্ধাপ্রদোঽধিকদয়ালুরনাথনাথঃ।
কল্পদ্রুমঃ প্রণয়ীনামভয়ংপ্রদশ্চ ভীতস্য যো জনপদস্য চ বন্ধুরাসীৎ ॥

আর তাঁর পুত্র বন্ধুবর্ম্মণ ছিলেন স্থির, রাজনীতিকুশল, বন্ধুপ্রিয়, প্রজামণ্ডলের বন্ধু, বন্ধুবর্গের ভয়হর্ত্তা, দৃপ্ত, শত্রুপক্ষের সংহারে দক্ষ। তিনি সুপুরুষ, যৌবনসম্পন্ন, রণপটু, বিনয়নম্র এবং রাজা হয়েও রিপুর বশবর্ত্তী ছিলেন না।...

স্থৈর্য্যনয়োপপন্নো বন্ধুপ্রিয়ো বন্ধুরিব প্রজানাং।
বংধর্ত্তিহর্ত্তা নৃপবন্ধুবর্ম্মা দ্বিডদৃপ্তপক্ষক্ষপণৈকদক্ষঃ ॥
কান্তো যুবা রণপটু বিনয়ান্বিতশ্চ রাজাপি সন্ন-পাশ্রিতোন মদৈঃ স্মরাদ্যৈঃ।
শৃঙ্গারমূর্ত্তিরভিষাত্যনলঙ্কৃতোঽপি রূপেণ যঃ কুসুমচাপ ইব দ্বিতীয়ঃ ॥
বৈধব্যতীব্রব্যসনক্ষতানাং স্মৃত্বা যমন্যাপ্যরিসুন্দরীণাম্।
ভয়াদ্‌ভবত্যায়তলোচনানাং ঘনস্তনায়াসকরঃ প্রকল্পঃ ॥

এ বন্ধুবর্ম্মণের রাজত্বকালে দশপুরনগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে ও সে নগরের শিল্পীরা নিজেদের একটী শ্রেণী স্থাপন করে এবং সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে কবি বৎসভট্টি ঋতু বর্ণনার অবকাশ পেয়েছেন আর সে বর্ণনায় তিনি বিশেষ-ভাবে রচনানৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঋতুতে সে হচ্ছে হেমন্ত—

রামাসনাথরচনে দরভাস্করাংশুবহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে।
চন্দ্রাংশুহর্ম্ম্যতলচন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে ॥
রোদ্রপ্রিয়ংশুতরুকুন্দলতা-বিকাশপুষ্পসবপ্রমুদিতানি কলাভিরামে,
তুষারকণকর্কশশীতবাতবেগপ্রনৃত্তলবলীনগনৈকশাখে ॥
স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনাবিপুলকান্তপীনোরু।
স্তনমজঘনঘনালিঙ্গন নির্ভৎসিতহুহিন হিমপাতে ॥

তখন নারীরা তাদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হন, সূর্য্যকিরণের খরতাপে উপত্যকাসমূহ আনন্দদায়ক হয়, ও মীন গভীর জলে প্রবেশ করে। তখন চন্দ্রকিরণ, হর্ম্যতল, চন্দন, তালবৃন্ত কিংবা হার কিছুই উপভোগ করা যায় না, পদ্ম শিশিরসিক্ত হয়ে তার গন্ধ হারায়। তখন রোদ্র, প্রিয়ঙ্গতরু, কুন্দলতা প্রভৃতির বিকশিত পুষ্পের মধুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর সুমধুর কলধ্বনি করে। তখন শীতবায়ু শিশির-কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্কশ হয়ে ওঠে আর সে বায়ুর দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে লবলীকুঞ্জ ও নগনবৃক্ষের বিরল শাখা নৃত্য করে।

হেমন্তের এই বর্ণনা কালিদাসের ঋতুসংহারে অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং হর্ম্যপৃষ্টং শরদিন্দুনির্মলম্।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্॥

এই হেমন্ত ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত দশপুরের সূর্য্যমন্দির কালক্রমে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তার সংস্কার প্রয়োজন হয়। সে সংস্কার হয় শীত ঋতুতে। সুতরাং এই অবসরে কবি বৎসভট্টি শীতঋতুর বর্ণনা করেছেন—

স্পষ্টৈরাশোকতরুকেতকসিন্দুবারলোলাতিমুক্তকলতামদয়ন্তিকানাং।
পুষ্পোদ্গমৈরভিনবৈরধিগম্য নূনমৈক্যং বিজৃম্ভিতশরে হরপুতদেহে॥
মধুপানমুদিতমধুকরকুলোপগীত-নগনৈকপৃথুশাখে।
কালে নবকুসুমোদ্গমদণ্ডুরকান্তপ্রচুররোধ্রে॥

অর্থাৎ সে (শিশির)। ঋতুতে যে দেবতার দেহ হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই কামদেব অশোক, কেতকী, সিন্দুবার, চঞ্চল অতিমুক্তকলতা ও মদয়ন্তিকার অভিনব পুষ্পোদ্গমের সঙ্গে তাঁর (পঞ্চ) শর ফিরিয়ে পান। তখন নগনবৃক্ষের বিরল পৃথুল শাখা মধুপানে মত্ত মধুকরকুলের সঙ্গীতে মুখর হয়। আর প্রচুর পল্লবে মনোহর রোধ্র নবকুসুমোদ্গমে সজ্জিত হয়ে দোদুল হয়ে ওঠে।

এলাহাবাদ প্রশস্তি বৎসভট্টির প্রশস্তির মত দীর্ঘ না হলেও তার রচয়িতা বৎসভট্টির চেয়ে বেশী কাব্যকলাকুশল ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তি খৃষ্টীয় চতুর্থশতকের মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল আর তার রচয়িতা হরিষেণ সে প্রশস্তিকে নিজেই কাব্য বলেছেন (এতচ্চ কাব্যমেব—)। এ প্রশস্তিতে যে রাজার গুণকীর্ত্তন করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত। প্রশস্তির প্রথম অংশ ছন্দোবদ্ধ আর দ্বিতীয় অংশ গদ্য—সে গদ্যও কাব্যগন্ধী। প্রথম অংশে হরিষেণ যে সব ছন্দ রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে—শ্রগ্ধরা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ও মদাক্রান্তা। প্রশস্তির এ অংশ খণ্ডিত, মাত্র একটী শ্লোক সম্পূর্ণ পাওয়া যায়—

আর্য্যো হীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকীর্ণিতে রোমভিঃ
সভ্যেষূচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদীক্ষিতঃ।
স্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি॥

সমুদ্রগুপ্তের পিতা তাঁকে 'তুমি সত্যই আর্য্য' এই বলে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন 'তুমি এইবার পৃথিবী শাসন কর।' তাঁর নয়ন তখন স্নেহে ব্যালুলিত, আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন; সভাসদেরা তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত আর স্বজনবর্গের আনন ম্লান।

হরিষেণের এই শ্লোকটী নিখুঁত, এর ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাস নির্দ্দোষ-একার্থবোধক শব্দের পুনরুক্তি নাই আর এর বিষয়বস্তু কবি অতি অল্প কথায় স্পষ্টভাবে আমাদের সাম্‌নে ধরে দিয়েছেন। আমরা চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই বৃদ্ধ মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করছেন, স্নেহার্দ্র হলেও তাঁর নয়ন তত্ত্বদর্শী, ভবিষ্যতে পুত্রদের মধ্যে কে সম্রাটপদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে তাঁর সূক্ষ্মদর্শী নয়ন তা বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রগুপ্তকে যখন তিনি 'তুমি সত্যই আর্য্য' বলে বরণ করছেন তখন সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাসদেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠেছে আর অন্য কুমারগণের আনন তখন ব্যর্থতার আক্ষেপে ম্লান।

হরিষেণের এই প্রশস্তির আর একটী খণ্ডিত শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্ত বিদ্যা ও কাব্যের মর্য্যাদা জানতেন। তিনি বিদ্বানের সঙ্গে কালযাপনে আনন্দ লাভ করতেন (প্রজ্ঞানু-যঙ্গোচিতসুখমনসঃ); শাস্ত্রতত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তুঃ)। সুতরাং তাঁর আজ্ঞা পণ্ডিতমণ্ডলীর গুণের দ্বারা যেন বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে সৎকাব্য ও লক্ষ্মীর মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ তা' দূরীভূত করেছিল। সেই জন্যই তাঁর রাজ্যকীর্ত্তি বিদ্বল্লোকে বহু কবিতায় কীর্ত্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

—সৎকাব্যশ্রীবিরোধান্ বুধগুণিতগুণাঞ্জনাহতানেব
বিদ্বল্লোকে বি···স্ফুটবহুকবিতাকীর্ত্তিরাজ্যংভুনক্তি।

কাব্যকলা ও শ্রীর এই বিরোধের কথা অন্য কবিরাও বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন আর তাদের উভয়ের মিলনের কথা কালিদাসও বলেছেন—

পরস্পরবিরোধিন্যোরেক সংশ্রয়দুর্লভম্।
সংগতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূতয়েস্তু সদা সতাম্॥

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে উজ্জয়িনীতে শকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আর শকরাজারা বিজাতীয় হলেও ভারতীয় সভ্যতায় অল্পায়াসেই দীক্ষালাভ করেন। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিপোষক, আর বিদ্বান্ ও কবিদের সত্যকার বন্ধু। এর কারণ হয়ত ব্যক্তিগত, কারণ যদি প্রশস্তিকারের কথা মান্‌তে হয় তাহলে বলতে হবে যে মহারাজা রুদ্রদামন্ ছিলেন নিজে কাব্যকলায় নিপুণ। উজ্জয়িনীর এই 'কাব্যবিধান-প্রবীণ' রাজা ও তাঁর অনুবর্ত্তী অন্যান্য রাজাদের পরিপোষকতায় উজ্জয়িনী ও তার নিকটবর্ত্তী দশপুর প্রভৃতি স্থানে বহুদিন ধরে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চলে, আর সে চেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গির্ণার নাসিক ও দশপুরের প্রশস্তিতে।

উজ্জয়িনীর কবিদের সাহিত্যসৃষ্টির এই চেষ্টার হয়ত একটা পূর্ব্বেকার ইতিহাস আছে। সুত্তনিপাতের ধনিয়সুত্তের নিপুণ কবি বুদ্ধকে ও সে সঙ্গে আমাদের নিয়ে যান মাহী নদীর তীরে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের লোক—আর তিনি উজ্জয়িনী নিকটবর্ত্তী গোনর্দ্দে বসে যে মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যেই আমরা প্রথম সংস্কৃত কাব্যছন্দের প্রয়োগ পাই (যেমন মালতী, বসন্ততিলকা ইত্যাদি)। উজ্জয়িনী থেকে বিদিশা পর্য্যন্ত যে প্রাচীন রাজপথ, গোনর্দ্দ সেই পথের উপর অবস্থিত। আর সেই বিদিশাই হচ্ছে আবার, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের পটভূমি।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তরাজারা নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আর তাঁদের নূতন রাজধানী পাটলিপুত্রে আবার আমরা নূতন কবিদের সাক্ষাৎ পাই। হরিষেণের প্রশস্তিতে আমরা কাব্যরচনার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাই, গুপ্তবংশের পরবর্ত্তী কালের প্রশস্তিতেও কাব্যরীতির

প্রভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের প্রশস্তির রচনারীতিতে আমরা বেশীর ভাগ পাই অনুকরণ, বাগাড়ম্বর ও চাটুবাদ।

সুতরাং সংস্কৃত শিলালিপির রচনারীতি থেকে বিচার করলে মানতেই হবে যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হ'তে ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্যসৃষ্টির প্রধান যুগ আর সে কাব্যসৃষ্টি সুরু হয় প্রথম পশ্চিম ভারতে অবন্তিদেশে—উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র ক'রে।

এ প্রদেশ কেন কাব্যরচনায় প্রথম কেন্দ্র হয়েছিল তার হয় ত কোন গূঢ় কারণ থাক্‌তে পারে। বনরাজিতে শোভিত, অনুচ্চ পর্ব্বতসঙ্কুল ও নদীমাতৃক এই দেশ হয় ত কবিকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করতে পারত—সেই জন্যই তাঁদের রচনা আমাদের মনকে মাহী, নর্ম্মদা রেবা প্রভৃতি নদীর তীরে টেনে নিয়ে যায়। আর সেই জন্যই হয় ত কাব্য-প্রকাশের রচয়িতা ও তাঁর সঙ্গে বাংলার ভাবপ্রবণ সাধক চৈতন্যদেব রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতসীতরুতলে আর চৈত্র মাসের রজনীতে বিকসিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ না হলে দয়িত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না—

যঃ কৌমারহরঃ যা এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপিতত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

'মান লজ্জা ভয়'

উপনিষদের ব্রহ্ম—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্, তিনি একাধারে 'অস্তি ভাতি প্রিয়ং'—খৃষ্টানী ভাষায়, তিনি Life, Light and Love. তিনি Trinity (ত্রেধাত্মা)—সচ্চিদানন্দ।

He is eternally, He knows eternally, He desires eternally
—St Augustine

অর্থাৎ তিনি যুগপৎ Omnipotent, Omniscient and All-loving ; এক কথায়, প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম—Power, Wisdom and Bliss—তাঁহাতে পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত।

এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-সিদ্ধিই জীবের পরম পুরুষার্থ—তাহার Summum Bonum. ঐ সিদ্ধির সাধন কি? প্রকৃতির প্রভেদ-অনুসারে ঐ সাধন ত্রিবিধ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। যিনি 'বীর' সাধক (Hero-type)—ব্রহ্মের প্রতাপের প্রতি যাঁহার পক্ষপাত, তিনি কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের সহিত মিলিত হন। যিনি 'ধীর' সাধক (Sage-type)—ব্রহ্মের প্রজ্ঞার প্রতি যাঁহার পক্ষপাত, তিনি জ্ঞান-যোগ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের সহিত মিলিত হন। আর যিনি 'পীর' সাধক (Saint-type)—ব্রহ্মের প্রেমের প্রতি যাঁহার পক্ষপাত, তিনি ভক্তি-যোগ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের সহিত মিলিত হন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহেশ্বর—তিনি 'ঈশতে ঈশনীভিঃ,' তিনি 'মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্', তিনি 'সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ,' —তাঁহার উপর বা অপর কোন কিছু নাস্তি—যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ—তাঁহাকে ঊর্দ্ধে বা অধে বা মধ্যে গ্রহণ করা যায় না—নৈনম্ ঊর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ (Him, not from above nor from below, nor midmost can one grasp)—তিনি বৃহৎ যশঃ (great Glory)—তাঁহার তুলনা নাই—ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।

কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি প্রেমময় ভগবান্—'God is Love.' Love is the essence of God. —Emerson

ভক্তের কাছে তিনি ঐশ্বর্য্য-গহন নন, তিনি মাধুর্য্যসঘন। তিনি 'রসো বৈ সঃ', তিনি রসতম—রসামৃতসিন্ধু। তিনি 'Dolce Amore' (Sweetest Love)—তিনি 'মধু ক্ষরতি তদ্ ব্রহ্ম'—তিনি মধু হ'তে মধু—তিনি 'মধুরং মধুরং সকলং মধুরং'। তিনি পিতম্ (প্রিয়তম)—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। তিনি 'বামনী'—Lord of Love—তিনি দয়িত, বনিত, মাসুক (Beloved)। যিনি ভক্ত, যিনি পীর—তিনি প্রেমিক (Lover), তিনি 'আসেক'—তাঁহার স্পর্শে ভক্তি প্রেমে পরিণত হয়—সা (ভক্তিঃ) কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা (নারদ)—এবং তিনি ভগবানে এসক্ বা আসনাই করিয়া প্রেমের দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইহাই প্রেমধর্ম্ম।

প্রেমধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব কি? অতি সংক্ষেপে প্রেমধর্ম্মের Philosophy এই :

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং—তিনি শুধু এক নন, তিনি অ-দ্বিতীয়—তিনি Unit এবং Unique—কিন্তু

স বৈ নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে × × স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাং—বৃহ, ১।৪।৩

অর্থাৎ,

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ—চরিতামৃত
প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ, পুরুষ আপনে
বিভিন্ন আকার হইল রমণ কারণে—দুর্গ্গ ভসার

ভগবান্ আত্মারাম—কেন? কিরূপে?

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদ্ অসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥

—কন্দপুরাণ

এখানে রাধিকা সমস্ত আরাধিকার, সমস্ত Lovers of God-এর type, symbol, প্রতীক, প্রতিভূ।

প্রেমলীলায় ভগবান্ রমণ—ভক্ত রমণী।

If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman—yes, however manly you may be among men.—F.W. Newman.

সেইজন্য নরোত্তম দাস বলিয়াছেন—ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হ'ব। ব্রজে (ভবে নয়) শ্রীকৃষ্ণই একা পুরুষ—আর সবাই প্রকৃতি। রূপগোস্বামীর প্রতি মীরা বাইয়ের উক্তি স্মরণ আছে ত'? মীরা রূপ গোস্বামীর ভক্তি-যশের কথা শুনিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান। গোঁসাইজি বলেন 'আমি প্রকৃতির মুখ দর্শন করি না—কিরূপে দেখা করিব?' উত্তরে মীরা বলিয়া পাঠান 'গোঁসাই প্রভু কবে থেকে পুরুষ হ'লেন—আমরা ত' জানিতাম বৃন্দাবনে সবাই প্রকৃতি—একা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।' তখন রূপগোস্বামীর ভ্রান্তি তিরোহিত হয়, তিনি সাদরে মীরার অভ্যর্থনা করেন।

প্রেয়সীর প্রিয়তমের প্রতি যে ভাব, ভক্তের ভগবানের প্রতি সেই ভাব হওয়া চাই। এই ভাবের পরিপক্ক অবস্থা প্রেম। ইহার আরম্ভ পূর্ব্বরাগে—খৃষ্টান মিষ্টিকেরা যাহাকে First Flame of Love বলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—অমনি

পহিলহি রাগ নয়নরঙ্গ ভেল!
যমুনার জলে যাইতে সজনি—
কালারূপ দেখিয়াছি—
সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা—
রূপ নিরখিব কি?

তারপর আকুল উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল সঙ্গমলিপ্সা—'অনুদিন বাড়ল, অবধি না গেল'। তখন ভক্ত বলেন—হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত! ভ্রমতি কিং করোম্যহম্ (মাধবেন্দ্রপুরী) অর্থাৎ, খৃষ্টান মিষ্টিকের ভাষায়—

Never there was or can there be imagined such a love as there is between a humble soul and Thee.—Gertrude More.

কিন্তু এক হাতে ত' তালি বাজে না! শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধিকার যেমন উৎকণ্ঠা—রাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণও—

'অনঙ্গবাণ ব্রণখিন্নমানসঃ' (জয়দেব)।

শ্রীকৃষ্ণও বলেন—

হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা!
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরিনু রাধা।

তাঁহার দৃষ্টিতে—

দশাং কষ্টাম্নপদমপি নয়ত্যাঙ্কিক রুচিঃ
বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি।

—সেই কাঞ্চন প্রতিমা পদ্মবনের শোভাকেও বিড়ম্বিত করে এবং তাঁহার কটাক্ষ চঞ্চলা ভ্রমরীর ভ্রম জন্মাইয়া তদীয় হৃদয় দংশন করে—

হৃদয়মিদমদাক্ষীৎ পঙ্কজাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ। (বিদগ্ধ মাধব)

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা 'মধুরিপু-কাম' বলেন—পুরয়মধুরিপুকামম্ (জয়দেব)।

শ্রীকৃষ্ণের এইভাব লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব মহাজন তাঁর মুখে বলান—

প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর সত্য বচন।
তোমাসবার স্মরণে
ঝুরো মুই রাত্রিদিনে
মোর দুঃখ না জানে কোন জন।

অর্থাৎ, শ্রীরাধা তিনি—'যার প্রেম-গুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।'

এই যে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম-সম্বন্ধ—উত্তর-প্রত্যুত্তর—'দিলে নিলে বদল পেলে', reciprocity—অন্য দেশের মিষ্টিকেরাও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

When the love of God arises in thy heart,—without doubt God also feels love for thee.—Rumi

The endless love that was without beginning, and is and shall

be for ever. And with this our good Lord said full blissfully,—Lo! how that I loved thee * *

Oh soul! before the world was, I longed for thee and thou for Me. Even as from everlasting thou hast loved thyself—so from everlasting thou hast loved Me.

এই যে বহমান মিথঃ-প্রেমের স্রোত—Rippling tide of love which flows secretly from God into the soul and draws it mightily—ইহা আধ্যাত্মিক প্রেমরাজ্যের এক অপরূপ রহস্য। এই মিথঃ আকর্ষণকে (mutual attraction) মিষ্টিকেরা Divine Osmosis (দৈব আদান প্রদান) বলেন—a 'give and take' is set up between the finite and the Infinite Life.

মিষ্টিকের আর একটি উক্তি শুনুন,—

Orison (আরাধন) brings together the two lovers—God and the Soul—into a joyful room when they speak much of love.

ইহাই বৈষ্ণবের কুঞ্জক্রীড়া—'রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে'।

এ মিলনে বাধা কি ?

'মান লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়'।

এ আনন্দপথ মাঝ
কণ্টক সঙ্কোচ লাজ—চমৎকারচন্দ্রিকা

It is the sense of shame, of diffidence, of timidity before the thought of God, that is the obstacle to realisation.

—C. Jinarajadasa's Mysticism p. 17.

যখন এই সঙ্কোচ-বাধা তিরোহিত হয়, তখন—

অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

সেইজন্য রূপগোস্বামী শ্রীরাধার সহচরীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতোঃ
ভদ্রোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী ॥

'হে কৃষ্ণ! রাধা-তরঙ্গিনী পতিতরু পরিহার করিয়া, ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিয়া, গুরুজন-রূপ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া তোমাতে মিলিতে চায়।'

শ্রীরাধার নিজের উক্তি এই ;—

যস্তোৎসঙ্গ সুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা সখি! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহাত্মনা ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥

—বিদগ্ধ মাধব

'হে সখি! যাঁহার আলিঙ্গন-সুখাশায় আমি গুরুজনের লজ্জাকে শিথিলিত করিয়াছি, প্রাণাধিকা সখীগণকে ক্লেশ দিয়াছি, আর সতীকুলসেবিত মহান্ ধর্ম্মকেও অবজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা সেই কৃষ্ণ যখন আমাকে উপেক্ষা করিলেন, তখন আমার এই পাপ প্রাণ ধারণের ধৈর্য্যকে ধিক্।'

এই 'মান লজ্জা ভয়' সম্বন্ধে একটু নিবিড় ভাবে আলোচনা করিতে চাই।

প্রথমতঃ মান। মান কি ? মান=Spiritual Pride, দৈন্যাভাব। সাধন-পথে ভক্তকে দীনাতিদীন হইতে হয়। তাই তাহার প্রতি উপদেশ—That power which the Disciple shall covet is that which shall make him appear as nothing in the eyes of men. (Light on the Path). ইহাকেই বলে 'অকিঞ্চন' হওয়া। সেই গীতার প্রাচীন কথা—

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

বুদ্ধদেবেরও ঐ উপদেশ—

যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো * চ পাতিতঃ।
সাস্সপোরিব আরাগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥

এক কথায়, যদি 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে হয়, তবে 'মান অপমান ভাসিয়ে দিয়ে চ'ল সখি! কুঞ্জ মাঝে' এবং শ্রীচৈতন্যের কথায় বলিতে হয়—

* মক্খ=কাপট্য

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

ইহাই ত' প্রকৃত রাধাভাব। শ্রীরাধা তাঁহাকে ভুলিতে চান, কিন্তু

পাশরিতে চাহি মনে, পাশরা না যায় গো
বল সখি! কি করি উপায়?

রাধা ভাবেন—তাঁর বলা ক'ব না—তাঁকে ভুলে যাব—কিন্তু তিনি যে হৃদয়েশ—সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আছেন—তাঁকে ভুলিবেন কেমনে?

কিম্ ইহ কুণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতম্ আশয়া
কথয়ত কথাম্ অন্যাং ধন্যাম্, অহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে!—কর্ণামৃত
(স্মের—হাস্য)

তাঁর কথা ছেড়ে সখি! ধন্যা অন্যা কথা বল
তিনি মোর হৃদয়েশ, তাঁকে কিসে ভুলি বল।
গুরুগঞ্জন—চন্দন অঙ্গভূষা
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা
সম শৈল কুলমান দূর করি—
তব চরণে শরণাগত কিশোরী।

ইহাই শরণাগতি। ভক্ত বলেন—তুমি কে আর আমি কে? আমি তোমার পদরেণু।

অয়ি নন্দতনূজ! কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।

ভক্তের আবার মান?—'অমানিনা মানদেন'

ভক্তের যেমন মান নাই—তেমনি ভয়ও নাই। খৃষ্টান বলেন—Love—which casteth out fear—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন (উপনিষদ্)। সেই প্রহ্লাদের কথা—

ভয়ংভয়ানাম্ অপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি?

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিল কিন্তু প্রহ্লাদ বিচলিত হইলেন না। কেন হইবেন? তিনি যে, অভয়ং বৈ প্রাপ্তোসি জনক! (বৃহদারণ্যক)। তিনি বলিলেন—সেই 'অনন্ত চিরবসন্ত যখন অন্তরে আমার' তথাপি ভয়! সেই জন্য গীতা সাধকের 'দৈবী-সম্পদ্' গণনায় 'অ-ভয়'কে প্রথম স্থান দিয়াছেন—

অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিঃ

রাধা কুলকামিনী—তাঁহার প্রথম ভয় কুলশীলের ভয়—কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে,

গুরুয়া গরব কুল নাশাইল কুলবতী
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।

হ'ন না তিনি কুলবতী, হ'ক না তাঁর 'সুহৃত্তজ আর্য্যকুল'—কৃষ্ণানুরাগের প্রবল বন্যায় সে কুলশীল, ধরমকরম সমস্তই ভাসিয়া গেল। পদকর্ত্তা যদুনন্দন বলিতেছেন—

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই
বলে বলুক পাড়ার লোকে তাহে নাহি ডর
না বলুক না ডাকুক না যাব কারু ঘর
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই
মনের ভরম পাছে বঁধুরে হারাই!

এক কথায়, 'কুলশীল মান ভয়, তেয়াগিয়া সমুদয়' তিনি কৃষ্ণ ভজনা করিলেন। তার উপর রাধা অন্তঃপুরিকা—তাঁর শাশুড়ী ননদ আছেন—অতএব গুরুজনের ভয়। জটিলার কুটিলার ভয়ে তিনি কি করেন?

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ * মন্দ
নীল নিচোলে ঝাঁপল মুখচন্দ

এ অভিসারের কথা। কিন্তু যখন ঘরে থাকেন?

গুরুগরবিত মাঝে বসি সখী সঙ্গে
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে

* বিধুন্তুদ=রাহু

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার
ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি।

আর যখন ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব হয়, তখন

রন্ধন শালাতে আসি
গুরুজন ভয় বাসি
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও রাধার অন্তঃশীলা প্রেম-নির্ঝরিণী অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয়। ইহাকেই বলে প্রেমবৈচিত্র্য!

অধিকন্তু রাধা সুকুমারী—বিকচ কুসুম জিনি তাঁহার পেলব তনু। অথচ ঘনান্ধকারে ফণি-ফণার উপর দিয়া 'পন্থ বিজন অতিঘোর' অতিক্রম করিয়া সঙ্কেতস্থানে অভিসারে যাইতে হইবে। ভয় (physical fear)? ভীরু হইলেও রাধার ভয় নাই—কারণ, তিনি জানেন—'মান লজ্জা ভয়, তিন থাকিতে নয়'।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আঁধিয়ার
তহি বরখত অবিরত জলধার
পাতর মা ভেল আঁতর বারি *
কৈছে পঙারব সো সুকুমারী।

আর লজ্জা? কিসের লজ্জা? কার কাছে লজ্জা?

যো সুখ চাহে তো লজ্জা ত্যাগে
প্রিয়সে হিলমিল লাগে।—কবির

যদি প্রিয়তমের সঙ্গে গভীর ভাবে মিলিতে চান—তবে প্রিয়াকে নগ্ন হইতে হইবে। তা'ই খৃষ্টান মিষ্টিক বলেন—Naked follow the Naked Christ.

If the soul were stripped of all her sheaths, God would be discovered all naked to her view and would give Himself to her,

* প্রান্তর বারি-পূর্ণিতা হেতু অন্তর (দূর) হইল। মা=Oh

withholding nothing. As long as the soul has not thrown off all her veils, however thin, she is unable to see God.

—Meister Eckhart.

ইহা কামুক-কামিনীর নগ্ন হওয়া নয়—'ফেলগো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল, পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ'—নয়।

ইহা উপনিষদের আধ্যাত্মিক নগ্নতা—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥—ঈশ

এইরূপ মায়ার আবরণ-উন্মোচনে রিক্ত হওয়াই প্রকৃত নগ্নতা—আধ্যাত্মিক লজ্জাত্যাগ।

Just as a true pilgrim going towards Jerusalem, leaveth behind him house and land, wife and children and maketh himself poor and bare from all things that he hath, that he may go lightly without letting. Right so, if thou wilt be a spiritual pilgrim, thou shalt strip thyself naked of all that thou hast.—Hilton

অর্থাৎ, একটি 'fig-leaf' দ্বারাও লজ্জা নিবারণ করিতে পাইবে না।

It is then that, caught up above all things, by the sublime ardours of a stripped and naked spirit, we obtain the immediate contact of the Divine.—Ruysbrock's De Contemplatione, cited on p. 519 of Underhill's Mysticism.

শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলায় এই লজ্জা-ত্যাগের আধ্যাত্মিক রূপক অতি নিপুণ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা বেশ জুগুপ্সিত—শ্রীকৃষ্ণ নাকি 'গোপবধূটি-দুকুল চৌরায়—' তিনি 'গোপতিতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূটি বিটং ব্রহ্ম'—কিন্তু ভক্ত ভাবুকের চক্ষে ইহা পরম রমণীয়।

ভাগবতে বস্ত্রহরণের বিবরণ এই: একদিন গোপিকারা যমুনার কূলে বসন ছাড়িয়া জলে অবগাহন করিতেছেন—হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই সব বস্ত্র গ্রহণ করতঃ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন—

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥
অত্রাগত্যাবলাঃ। কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।

'হে অবলাগণ! এখানে আসিয়া স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর।' গোপী বলিলেন—"অবিনয় করিও না—হে নন্দনন্দন! তুমি আমাদের সকলের প্রিয়—ব্রজবাসীর শ্লাঘ্য—আমরা শীতকাতর—বসনগুলি দাও'।

মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বং নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ! ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা যদি সত্য সত্য আমার অনুগতা, তবে যাহা বলিলাম কর—এইখানে আসিয়া স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর।

ভবত্যো যদি মে দাস্তো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ ॥

শীতার্ত্তা গোপবালারা কি করেন? সলজ্জায় জল হইতে উত্থিত হইয়া পাণি দ্বারা যোনি আবরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন—

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাম্ যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ ॥

Even that was not enough! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—না, ঠিক হয় নাই। হস্ত উত্তোলন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হও—মস্তকে দুই হাত তুলিয়া নমঃ কর—তবে বস্ত্র পাইবে।

বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্যপনুত্তয়েঽহসঃ।
কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥

বরাকী গোপীরা নাচার—কি করেন? লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহাই করিলেন। তখন,

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং করুণা করিয়া তাহাদের বসন ফিরাইয়া দিলেন। সংক্ষেপে ইহাই বস্ত্রহরণ-লীলা।

বলা বাহুল্য, এ সমস্তটাই রূপক—যাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা খৃষ্টান মিষ্টিকদিগের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। সাধু ভাস্বানি এই রূপকের অধ্যাত্মিক অর্থ এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

Blessed, thrice-blessed
Were Gokul and Brindaban,
And the simple, guileless *gopis*
Whose garments he stole in love.

Steal Thou in Thine mercy,
My garments tinted, tainted, soiled,
My gaudy garments of power and pride,
Steal them, O Lord of Love!

And ne'er give them back to me
But tear them to the shreds,
Or burn them in the Sacred Flame
Of Thy all-consuming Love!

And I shall at Thy lotus-feet
Stripped, self-emptied, naked sit
To see the naked Truth of Love,—
The Love that steals and sanctifies.

—T. L. Vaswani

যে রমণী—'নারীণাং ভূষণং লজ্জা' ত্যাগ করিয়াছে, তার পক্ষে লোকলজ্জা ত্যাগ করা আর বেশী কি?

সখীগণ সবে মিলি, যাওগে গোকুলে চলি
বোলবি ননদিনী সনে।
গোবিন্দ-প্রেমসায়রে ডুবিয়াছে রাই
পুনঃ না আসিবে নিকেতনে ॥

* * *

কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ।
পিরীতিভূষণ প্রতি তনুমন কহয়ে দাস গোবিন্দ।

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া দাশুরায় লিখিয়াছিলেন—

ননদিনী বল্‌গে নগরে—
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

এ সম্বন্ধে জ্ঞানদাসের পদ এই ঃ—

শ্যাম-রূপ দেখি আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেলিনু হাতে
ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি কি আর লোকের ভয়!
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আন মনে নাহি লয়॥

অর্থাৎ, 'লজ্জা লজ্জিতৈব পলায়িতা'।

আরাধিকা মীরাবাইও এই কথাই বলিয়াছেন,—

তাত মাত ভাই বন্ধু আপনা না কোই—
সন্তন ঢিগ্ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।

এইরূপে 'মান, লজ্জা, ভয়' যখন সমুদয় ত্যাগ হয়, তখন প্রেয়সী প্রিয়তমের সহিত নিবিড় মিলনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার নিরন্তর অনুভূতি হয়—

শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে—
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সারথি

সৃষ্টিধর মাঝির তিন পুরুষের খবর জানা যায়। তাহাদের কাহারও জীবন নিজগৃহে রোগশয্যায় শেষ হয় নাই। প্রপিতামহ উমানাথের মৃত্যু হইয়াছিল পদ্মার বুকে জলদস্যুর হাতে, পিতামহ দশরথের মেঘনায় নৌকাডুবিতে এবং পিতা অভয়াচরণের নিজ নৌকায় সর্পদংশনে। সৃষ্টিধরও প্রায় চল্লিশ বৎসর অবধি মাঝির কাজ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল ম্যালেরিয়ায়, সে ব্যবসায় ছাড়িয়া সঞ্চিত কিছু অর্থ লইয়া মহাজনী করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই তাহার মনে বিশেষ সুখ ছিল না। এখনকার লোকে নৌকায় যাতায়াতের সুখ বোঝে না। তাহারা ষ্টীমারেই হৌক বা ডাক বা গহনার নৌকায় হৌক—তাড়াতাড়িতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিলেই সুখী। পৌঁছানোটাই যেন সব, আর যাওয়াটা কিছু নয়। কোথায় গেল সেই আগের কালের যাত্রী সব। তাহারা মাঝিকে চাকরের মত দেখিত না। দ্বিপ্রহরে কোনো বাজারের কাছে গাছের ছায়ায় নৌকা লাগাইত। যাত্রীদের কর্ত্তা বাজার করিয়া আনিতেন। মাঝিদের খাবারও তাহার সঙ্গে আসিত। তারপর সেই গাছের ছায়ায় রান্নাবান্না হইত। গ্রামের লোক আলাপ করিতে আসিত। অপরাহ্নে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার নৌকা চলিত। এমনি করিয়া আজকালকার তিন দণ্ডের পথে সারাদিন কাটাইয়া যাত্রা শেষ হইলে কর্ত্তারা খুসী হইয়া যাহা দিতেন, মাঝিদের তাহাতে কখনও অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। এখন আর সেদিন নাই। নৌকাভাড়া কড়ায় গণ্ডায় ঠিক করিয়া তবে যাত্রী নৌকাতে পা দেয়। চুক্তি অনুযায়ী সময়ের মধ্যে না পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে আবার তাহা হইতে কাটা যায়। যাত্রীদের যাহা ব্যবহার, আগের কালের লোকে চাকরের সহিতও সেরূপ করিত না। তখনকার কালে পাল তুলিয়া বসিলে কর্ত্তাদের সহিত সুখদুঃখের,

দেশবিদেশের গল্প হইত, কোনো মাঝি পাঁচালী পড়িত, কেহ বা গান করিত—কিন্তু সেদিন আর নাই। সুতরাং ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই সৃষ্টিধরের ব্যবসায়ে আর মন ছিল না; কিন্তু তবু যখন বর্ষায় তাহাদের গ্রামের নাগর নদী দুকূল ছাপাইয়া শীতলাতলা অবধি আসিত, যখন বাতাসে আসিত নূতন ধান ও পাটের গন্ধ, তখন একটা অনির্দ্দিষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টিধরের মেজাজ খারাপ করিয়া দিত। রাত্রিতে ভালো ঘুম হইত না। সৃষ্টিধরের স্ত্রী ইচ্ছাময়ী ভয়ে ভয়ে থাকিত; এবং প্রতিবেশিনীদের কাছে বলিত যে বর্ষায় তাহার কর্ত্তার শরীর একেবারেই ভালো থাকে না।

সৃষ্টিধর বুঝিয়াছিল দিনকাল বদলাইয়াছে। তাই তাহার একমাত্র পুত্র শঙ্করকে লেখাপড়া শিখাইবে ঠিক করিয়াছিল। শঙ্করের পাঠশালার পড়া হইয়া গেলে সৃষ্টিধর একদিন বড় স্কুলের হেডমাষ্টারের সহিত দেখা করিতে গেল। হেডমাষ্টার তখন লাইব্রেরিতে ছাত্রদের আবেদন-পত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সৃষ্টিধর নিজের আবেদনটী জানাইল। কিন্তু কথা তাহার যেন আর ফুরায় না। তাহার আবেদনটী যেন সৃষ্টিছাড়া এবং তাহার জন্য যেন প্রভূত কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন—একবার কহিল সে নিজে চোখ থাকিতেও অন্ধ, তাই তাহার ইচ্ছা তাহার ছেলেটীর সেরূপ না হয়। তারপর অন্য কথা পাড়িয়া আবার কহিল যে তাহার ছেলে বাবুদের ছেলের মত চাকরী করিবে এ আশা সে করে না। কিছুদিন পড়িলেই সৃষ্টিধর গ্রামের বাজারে তাহার জন্য একটী দোকান করিয়া দিবে।

হেডমাষ্টার ব্যস্ত লোক, এত কথা শুনিবার তাঁহার অবসর ছিল না। এতক্ষণ নিজের কাজে ছিলেন বলিয়া বাধা দেন নাই। এবার তাঁহার হাতের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় অধৈর্য্যের সুরে কহিলেন, "সে আর এমন কথা কি সৃষ্টিধর, পাঠশালার পণ্ডিতের নিকট থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে তোমার ছেলেকে নিয়ে একদিন এস। ভর্ত্তি হবার ফি দুটাকা, মাসিক বেতন আট আনা, পরে আরো বেশী দিতে হবে।"

সৃষ্টিধরের জীবনে সে একটা দিন। মাঝিপাড়ার কোনো ছেলে এতদিন বড় স্কুলে যায় নাই। সেই স্কুলে বাবুদের ছেলেদের সহিত শঙ্কর একসঙ্গে পড়িবে এই চিন্তা যুগপৎ তাহার মনে হর্ষ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। জেলার সহরে গিয়া সৃষ্টিধর শঙ্করের জন্য নূতন কাপড় চোপড় কিনিয়া আনিল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক প্রতিবেশী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, আষাঢ় মাসে কোট গায়ে দিয়া ও শাল চড়াইয়া শঙ্কর পিতার সহিত স্কুলে যাত্রা করিল। স্নানের সময় দুএকজন বর্ষীয়সী ইচ্ছাময়ীকে বলিল, "শঙ্করকে ত লেখাপড়া শিখাতে পাঠালে, কিন্তু ওকি আমাদের সইবে?" ইচ্ছাময়ী মনে করিল ওটা হিংসার কথা, উত্তর দিল না।

২

ক্লাসের ছেলেদের চাপাহাসির যেন আর অন্ত নাই। গরমের সময়ে এই অপূর্ব্ব বেশ পরিহিত নিম্নজাতির ছাত্রটী তাহাদের কাছে যেন একটী অদ্ভুত জীব। এ উহার মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। ক্লাসময় একটা ফিস্‌ফাস্ চলিয়াছে। অথচ মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলে না। শঙ্কর দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে তাহার সহপাঠীদের চেয়ে তাহার গায়ের জোর অনেক বেশী। কিন্তু মারামারি বাধাইবার জন্য ত একটা অছিলা চাই। তাহার বেঞ্চিতে যাহারা বসিত তাহাদের মধ্যে দুএকজন পকেটে করিয়া জামরুল আনিত। খাইবার সময় শঙ্করকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিত। কিন্তু সে না দাঁড়াইলে তাহারা নিজেরাই উঠিয়া খাইত। স্কুলে জল খাইবার একটী ঘর ছিল। অন্য ছেলেরা ভিতরে গিয়া গ্লাসে করিয়া জল খাইত। শঙ্কর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত, দপ্তরী জল ঢালিয়া দিত, সে হাত জোড় করিয়া জল ধরিয়া খাইত। কিন্তু ইহা লইয়াও বিবাদ চলে না। তাহার কাপড় চোপড় দেখিয়া কোনো ছাত্র অপর ছাত্রকে বলিত 'বড় শীতরে ভাই, নয় কি?' কিন্তু সে কথাও তাহাদের নিজেদের মধ্যে। নালিশ করিতেও যেমন তাহার লজ্জা করিত,

নিজ হইতে বিবাদ বাধাইতেও তাহার মন তেমনি সঙ্কুচিত হইত। পাঠশালায় সকাল-বিকাল স্কুল হইত, অন্যান্য নিম্নজাতির ছেলে ছিল। এত গোলমাল ছিল না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছাময়ীর কাছে সে বলিত স্কুলে তাহাকে কি সহিতে হয়। ইচ্ছাময়ী প্রবোধ দিয়া কহিত, "ছোট বড় করা ভগবানের হাত, অদৃষ্ট নিয়ে কি ঝগড়া করা চলে। এ জন্মে ভাল হয়ে থাকলে আর এক জন্মে আমরাও বড় হব।" এই পরজন্মের আশ্বাসে শঙ্করের মন কখনও ভোলে নাই। কিন্তু মাকে সে ভালবাসিত এবং মায়ের নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে স্কুলে কখনও ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি বাধাইবে না।

কিন্তু সুখও ছিল। বই লইয়া দশটার সময়ে যখন সে স্কুলে যাইত, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিত—চোখে তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। বয়স্কেরাও তাহার সহিত সম্মানের ব্যবহার করিত। মেয়ে মহলে তাহার আদরের অন্ত ছিল না।

স্কুলের দুঃখও বেশী দিন রহিল না। কিছুদিন পরেই শঙ্কর অন্যান্য ছেলেদেরই মত সাজ করিতে লাগিল। সে মেধাবী ছাত্র ছিল। কাহাকেও পড়া বলিয়া দিয়া, কাহারো অঙ্ক কসিয়া দিয়া, কাহারো ম্যাপ আঁকিয়া দিয়া শীঘ্রই সে জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তাহারা তাহাকে স্বতঃই খানিকটা খাতির করিতে আরম্ভ করিল। পরীক্ষার দিনে তাহার কাছে বসিবার জন্য সহপাঠীদের মধ্যে আগ্রহের শেষ ছিল না। কিন্তু এত সুখ বোধ হয় ভগবানের সহিতেছিল না। শঙ্কর থার্ড ক্লাসে উঠিতেই প্রথম ফাল্গুনে একদিন সৃষ্টিধর কঠিন জ্বরে পড়িল। দুদিন পরেই প্রলাপ আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল। ইচ্ছাময়ী নানা দেবতার কাছে নানারূপ মানৎ করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন শেষ রাত্রিতে সময় হইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া ইচ্ছাময়ী শঙ্করকে জাগাইয়া পিতার কাছে লইয়া গেল। সৃষ্টিধর ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছিল। শঙ্করের দিকে তাকাইল

কিন্তু চিনিতে পারিল না, বিড় বিড় করিয়া বলিল, 'নে বেলা থাকতে পাড়ি ধর কালবোশেখীর সময়।' রাত্রি না ফুরাইতেই সৃষ্টিধর শেষ হইয়া গেল। শঙ্কর কাঁদিতেছিল, ইচ্ছাময়ী তাহাকে বুকের কাছে লইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, 'এসব ভগবানের হাত, দুঃখু করো না, ধন, পরের জন্মে আবার দেখা হবে।' তাহার চোখে জল ছিল না।

(৩)

মানুষের অন্তরের গোপন পুরীতে যে চেতনা রূপকথার রাজকন্যার মত ঘুমাইয়া আছে, তাহারই পায়ের ও মাথার কাছে সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির বেশে রহিয়াছে প্রথম শোক ও প্রথম প্রণয়। পিতাকে হারাইবার পর শঙ্কর যেন সংসারকে নূতন চোখে দেখিতে আরম্ভ করিল। পাড়ার প্রত্যেক বৃদ্ধের প্রতি যে মমতা তাহার মনে জাগিল, সেটা একান্তই নূতন। তাহাদের কাহারো অসুখ করিলে শঙ্কর লেখাপড়া ফেলিয়া রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিত। তাহার পিতার মত কোনো বৃদ্ধকে পথে বা নদীর বুকে দেখিলে একটা নিরুদ্ধ ব্যথায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিত। পিতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাহার মনের কথা সে চিরদিন মায়ের কাছেই বলিয়াছে। কিন্তু তবু বুঝিতে পারিত কি অফুরন্ত স্নেহ সেই বুকে ছিল। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে কত দিনের কত খুঁটি-নাটির কথা মনে করিয়া বালিশ ভিজাইত। তাহার ছেলেবেলায় ইচ্ছাময়ী সৃষ্টিধরকে একটী বড় থালায় করিয়া ভাত দিত। শঙ্কর সেই পাতেই খাইতে বসিত। সেই থালার একটী কোণে পিতা তাহাকে ভাত মাখিয়া দিতেন। ডিমভরা কইএর একটুখানি মুখে দিয়া পিতা মাছটা তাহার দিকে সরাইয়া দিতেন। ইচ্ছাময়ী বলিত—'ওকি, ওর জন্যে ত দিয়েছি আর একটা।' সৃষ্টিধর কহিত, 'কত খাব আর, পেট ভীষণ ভরে গেছে।' দুধের বাটি হইতে একটু দুধ ঢালিয়া লইয়া সৃষ্টিধর তাহার নিজের দিকে ভাত মাখিত। তারপর বাটিভরা দুধ শঙ্করকে দিয়া বলিত, 'এইটুকু এক চুমুকে খাও দিকিনি কেমন পারো।' কতদিন শীতের রাত্রিতে সৃষ্টিধর তাহাকে নিজের কাছে শুইতে লইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে আধ ঘুমন্ত

অবস্থায় শঙ্কর অনুভব করিয়াছে তাহার চারিদিকে লেপটী গুঁজিয়া দিয়া সৃষ্টিধর তামাক খাইতে উঠিয়া গিয়াছে। কতদিন জ্বর আসিলে নিজের অনবসরের জন্য ইচ্ছাময়ী তাহাকে বাতাস দিবার জন্য বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। একটু পরে সৃষ্টিধর কহিয়াছে, 'তুই পড়াশুনা করগে যা, আমার বড় শীত করেছ।' সেদিন বোঝে নাই এ সবের অন্তরালে কি ছিল। এ সংসারে তাহা আর মিলিবে না। কিন্তু সত্যই কি তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, না ইচ্ছাময়ীর কথা সত্য, একদিন না একদিন আবার মিলিবে।

ইচ্ছাময়ী তাহার নিকটেই শুইত। অনেক দিন রাত্রিতে শঙ্কর তাহার মাকে তাহার ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিত। মুখ ফুটিয়া পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। জানিত যে ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পিতার কথা আসিয়া পড়িবে। ইচ্ছাময়ী একদিন বলিতেছিল, "তুইও ছেলেবেলায় তাঁকে খুব ভালবাসতিস্। যখন টাকা আদায়ের জন্য বেরোতেন, পথের ধার থেকে যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় দেখতিস্, ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে বল্‌তিস্—'মা আমার প্রাণটা যেন পুড়ে যাচ্ছে'। আমি হাসতাম, আর বলতাম, 'কিরে তোর প্রাণে আবার আগুন লাগালো কে?"

কিন্তু এ সংসারে আর কাহারো কাছে এ কথা সে পাড়িত না। এ মর্ম্মের কথার মর্য্যাদা আর কেহ রাখিতে পারিবে না, এ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। কাহারো নিকট তাহার পিতার কথা শুনিয়া তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠে নাই। সকলের অগোচরে শুধু মাতাপুত্রে ছিল এই বেদনা-মধুর গোপন জীবনটুকু!

সৃষ্টিধর কিছু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিল। আর অনেক টাকা তাহার লাগানো ছিল। সংসারে অভাব ছিল না। শঙ্কর পড়িতে লাগিল। পরের বৎসর পূজার সময়ে তাহার সহপাঠী বন্ধু অবনী চৌধুরীদের বাড়ীতে যাত্রা। অবনীর সহিত শঙ্করের খুব ভাব। অবনী লেখাপড়ায় মন্দ নয়, তাই শঙ্কর তাহার থেকে কত ভালো এটা সে:বেশ বুঝিতে পারিত। অবনী রাস্তার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্কর যাইতেই তাহাকে বসাইল

ও নিজে তাহার নিকট বসিল আসরের ঠিক্ সামনে। চারিদিকে পান সিগারেটের গন্ধ। যাত্রা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পালা 'মথুরেন্দ্র সংহার'। কংস আসরে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেনাপতিকে যাহারা হরিনাম করে তাহাদের ধ্বংস করিতে আদেশ দিতেছেন।

এত বড় বাড়ীতে এ রকম সভায় শঙ্কর কখনও আসে নাই। প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে অসংখ্য বাতির ঝাড় জ্বলিতেছে। তাছাড়া স্থানে স্থানে গ্যাসের আলো। অভিনেতাদের সাজ অতি সুন্দর। রাণীর পোষাক যেন হীরা জহরতে ঝলমল করিতেছে। কখনও কংস আসিতেছেন, কখনও বসুদেব,কখনও যশোদা ও নন্দ, কখনও রাধা ও অন্যান্য গোপীরা। কংসের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া মথুরাবাসীরা অক্রূরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অক্রূর বৃন্দাবনে আসিতেছেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ ও রাধার যমুনা-পুলিনে সাক্ষাৎ। অন্যান্য সময়ে গান গাহিয়া দিতেছিল মোক্তারের মত কাপড় পরা কতকগুলি গায়ক। কিন্তু কৃষ্ণ ও রাধা নিজেরাই গান করিতেছিলেন। চমৎকার গলা। শঙ্কর তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। এমনি সময়ে তাহারি কাছে একটা গোলমাল উঠিল।

তাহাদেরই অনতিদূরে বসিয়াছিলেন ভৈরব ভটাচার্য্য। সুপুরুষ, সুগৌর বলিষ্ঠ দেহ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড রেখা। গায়ের রঙ্ যেন চাদর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তন্ত্র-শাস্ত্রে অসীম পণ্ডিত ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। অবনীরা তাঁহার শিষ্য। অবনীকে ক্রমাগত শঙ্করের সহিত কথা বলিতে দেখিয়া তাহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও ছেলেটী কে, তোমার কে হয়।"

অবনী জিজ্ঞাসা করিল—"কোন ছেলেটী?"

ভৈরব কহিলেন—"ঐ যে তোমার কাছেই বসে রয়েছে। শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ। যার সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত গল্প করছ।"

অবনী যেন একটু ভয় পাইয়া গেল—বলিল—"ও, ও আমাদের ক্লাসের একটী ছেলে।"

"নাম কি?"

"শঙ্কর মাঝি, সৃষ্টিধর সেই যে আর বৎসর মারা গেছে, সে ওরই বাবা'।

ভৈরব শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন না। গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সভার যে অংশ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই অংশে হীনজাতি তাঁহারি সহিত একাসনে বসিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবনীর পিতা নন্দ চৌধুরী ছুটিয়া আসিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ালাপ থামিয়া গেল। শঙ্কর সব শুনিতেছিল। নন্দ চৌধুরী তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে এস ত, বাছা।'

অপমানে অভিমানে তখন শঙ্করের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কোনরকমে নিজেকে সামলাইয়া বলিল—"চলুন।"

নন্দ তাহাকে সভার অন্য কোণে লইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, সেখানে আবার একটী গোলযোগের সূচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, তাই শঙ্কর বসিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নন্দ সরিয়া গেলেন সেই মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া সভাত্যাগ করিল।

বড় বাড়ী। যে উঠানে যাত্রা হইতেছে তাহারি পরে একটী ফুলের বাগান। সেই বাগানের বেড়ার ধার দিয়া অনেক লোক কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া পান, বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয় করিতেছে।

যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি আসিতেছে। রাধা গাহিয়া বলিতেছেন—'তোমারি কারণে আমি পরি নীলাম্বরী'। কৃষ্ণ গানে উত্তর দিতেছেন, 'আমিও সেইজন্যে রাধে পীতাম্বরধারী।' আর কতকগুলি লোক ধূয়াটী গাহিতেছে—'পড়ে প্রণয়-ফাঁদে প্রাণ যে কাঁদে, হায় পোড়া মন প্রবোধ মানে না'।

(৪)

বাড়ীতে ফিরিয়া শঙ্কর এ ঘটনাটীর কথা তাহার মাকে বলে নাই। শঙ্করের বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে তাহার মা তাহার সহিত একমত হইবেন না আর মুখে হইলেও তাহার অন্তরের এ দারুণ জ্বালা বুঝিতে পারিবেন না। পরদিন যথাসময়ে সে স্কুলে গেল।

অবনীও আসিল। দুজনেই দুজনকে কিছু এড়াইয়া চলিল, কিন্তু ছুটি হইবার আগে অবনী তাহার কাছে আসিয়া কহিল—'কাল একটু সকালে সকালে এস ভাই, কতগুলি deduction আমি পারি নি, তোমার কাছে বুঝে নেব।' শঙ্কর উত্তর দিল—'বেশ'।

শঙ্কর মনে মনে অবনীকে কম দোষী করে নাই। অবনী একবার প্রতিবাদ করে নাই—একবার বলে নাই যে সেই তাহাকে ওখানে নিয়া বসাইয়াছিল। সে চলিয়া আসিবার সময়ে তাহার সাথে আসে নাই। তবু পরদিন কিছু আগেই স্কুলে আসিল। অবনী আসিয়াই শঙ্করের হাত ধরিয়া কহিল—"আমার উপর সেদিন রাগ করনি ত ভাই। কাল সারাদিন লজ্জায় তোমার দিকে তাকাতে পারিনি।" শঙ্কর আঁক কসিবার খাতাখানি বাহির করিতে করিতে উত্তর দিল—"তোমার আর দোষ কি।"

ব্যাপারটা যদি এইখানেই শেষ হইত, তাহা হইলে হয়ত শঙ্কর মনে আর কিছু রাখিত পারিত না। কিন্তু অবনী ক্ষমা চাহিয়াছে নিজের জন্য, তাহার পিতা বা ভৈরব ভট্টাচার্য্য কোনো অন্যায় করিয়াছেন, পাছে এই স্বীকার করা হইয়া থাকে এজন্য অবনী আবার বলিল—"আর ওতে তোমাদেরও পাপ হয়।"

"পাপ?" বলিয়া বিস্ফারিত নয়নে শঙ্কর অবনীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—'কই, তোমার deduction কই?"

মনের আঁধার মনেই রহিয়া গেল। একথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই। অথচ দিনরাত এ আঘাত কাঁটার মত বেঁধে। পিতার মৃত্যু মাতাপুত্রকে যে নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, তাহাও যেন শিথিল হইয়া গেল। মায়ের সহিত আর বেশী কথা হয় না। ইচ্ছাময়ীর লক্ষ্য এড়ায় না। মনে করিল শঙ্কর শোক ভুলিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ একদিন রবিবারে শঙ্কর মাকে বলিল—"মা আমি নীলগঞ্জের বাজারে যাব। আমার কাপড় নেই, তোমারও বেশী নেই, কিছু কাপড়চোপড় কিনে আনি।"

নীলগঞ্জের বাজার শঙ্করদের গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

সেখানে থানা, ডাক্তারখানা সবই আছে। কাপড়চোপড়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন—কিন্তু এ কাজের ভার আর কাহাকেও দেওয়া যায় কিনা এই অপেক্ষায় ইচ্ছাময়ী শঙ্করকে কিছু বলে নাই। শঙ্কর প্রস্তাব করিতে ইচ্ছাময়ী বিশেষ আপত্তি করিল না, শুধু বেশী রাত করিতে বারণ করিয়া দিল।

নীলগঞ্জে খৃষ্টানদের একটী মিশন ছিল। সেইখানে যাওয়া ছিল শঙ্করের উদ্দেশ্য। সে শুনিয়াছিল খৃষ্টধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। সব সমান। কিন্তু সে কথা তাহার মাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না এবং এ সম্বন্ধে কোনো একটা সুস্পষ্ট ইচ্ছাও তাহার মনে আসে নাই।

নীলগঞ্জে পৌঁছিয়া মিশন-হাউসের আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যখন সেখানে প্রবেশ করিল, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়াই তাহার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া আসে। কারণ কি বলিবে, কি করিবে এসব কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তারপর এতটা বড়াবাড়ি করা উচিত কিনা এ সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহার আর উপায় ছিল না। মিশন-হাউসের ফটক পার হইতেই একটী সব্জী-বাগান। সেখানে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক কাজ করিতেছিলেন। শঙ্করকে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

শঙ্কর বলিল—"হাঁ, আমি এখানকার পাদরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—অনেক দূর থেকে।"

ভদ্রলোক কহিলেন—"আমিই পাদরী সাহেব। চল আমার বসবার ঘরে চল।"

তারপর তিনি শঙ্করকে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন ও দুজনে বসিবার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি খ্রীষ্টান?"

"না—আমি আপনাদের ধর্ম্মের কথা শুনতে এসেছি।"

"সে ত সুখের কথা। কতদিন ধ'রে কি ক'রে তোমার মনে এ ইচ্ছা এল?" পাদরীর স্বরে একটী শান্ত স্নেহের ভাব ছিল। সে জন্যই হোক বা অনেক দিনের নিরুদ্ধ ব্যথা কাহাকে বলিতে পারিবার অবসর পাইয়াই

হোক, শঙ্কর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা—তাহার প্রথম স্কুলে যাওয়ার পর হইতে সেই যাত্রা শুনিবার রাত্রির কথা অবধি—অনর্গল বলিয়া গেল। কোনো কিছু গোপন রাখিল না। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"শুনেছি আপনাদের ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই, সে ধর্ম্মে কি আমাদের আশ্রয় আছে?"

পাদরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ, একটী আঘাত পেয়ে আমার কাছে এসেছ। তোমার আশা আমাদের ধর্ম্মে এমন আঘাত নেই। কিন্তু অত্যাচার কোনো না কোনো রকম সব সমাজেই আছে। আর আমাদের ধর্ম্ম ত শুধু জাত মানে না ব'লেই পৃথক ধর্ম্ম নয়। তার মধ্যে আরও অনেক কথা আছে। তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?"

শঙ্কর জানাইল সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে।

পাদরী কহিলেন—"আমাদের ধর্ম্ম কি সে তুমি যিনি আমাদের ধর্ম্মের মূল তাঁর কথা থেকেই সব চেয়ে ভাল বুঝবে।"

তারপর অন্য ঘরে উঠিয়া গিয়া তিনখানা বই লইয়া আসিলেন। একখানি তাঁহারি প্রণীত খ্রীষ্টধর্ম্ম—সহজ বাংলাতে লেখা। অন্য দুখানি St. Matthew'র Testament, ইংরাজী ও বাংলাতে। বই কয়খানি শঙ্করকে দিয়া কহিলেন—"এই কয়খানি বই তোমার অবসর মত পড়ে দেখো। তারপর যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে আবার দেখা কোরো।"

শঙ্কর উঠিল। পাদরী তাহাকে ফটক অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া বাগানে ফিরিয়া গেলেন। শঙ্কর বাজারে গেল এবং যাহা কিনিবার ছিল, কিনিয়া বেশী রাত্রি হইবার আগে বাড়িতে ফিরিল।

বইগুলির ছত্রে ছত্রে যেন মানুষের গৌরব ভরা। ছোট বড় সংসারে থাকিতে পারে, বিধাতার চোখে নাই। পবিত্রতা অপবিত্রতা জন্মের ধারা বহিয়া চলে না। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধান হইতে কে শুনাইল তাহাকে এই অমৃত বাণী। তাঁহারো জন্ম হীন কুলে—এ পৃথিবীতে তাঁহার দিন বহুদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনিই

বলিতেছেন—আমি চিরদিন তোমাদের সাথে আছি—যত দিন সৃষ্টি রহিবে ততদিন আমি তোমাদের সাথের সাথী।

শঙ্কর ঠিক করিল খ্রীষ্টান হইবে। কিন্তু কথাটা মা'কে বলা চাই। মা খুসী হইবেন বলিয়া একদিন রাত্রিতে ইচ্ছাময়ীকে আবার তাহার ছেলেবেলার গল্প বলিতে বলিল। অতি মূর্খ মা'ও নিজের সন্তানের বেলাতে অনেক কথা বুদ্ধিমতীরই মত বোঝে। আর ইচ্ছাময়ী মূর্খ ছিল না। কথাটী যে আর কোনো কথার পূর্ব্বাভাস সে সেটা বুঝিল, কিন্তু তবু যেমন ভাবে সব কথা কহিত সেই ভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ইচ্ছাময়ী শেষ না করিতেই শঙ্কর কহিল—'মা'।

'কি ?'

'আমি মনে করেছি খ্রীষ্টান হব।'

ইচ্ছাময়ী যেন ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই, বলিল—'কি হবি?'

'খ্রীষ্টান'।

'কেন ?'

মায়ের মন গলিয়াছে মনে করিয়া শঙ্কর পাদরীর নিকট যাহা বলিয়াছিল, আবার সেই সব কথা মায়ের কাছে বলিল।

ইচ্ছাময়ী কহিল—'এতে খ্রীষ্টান হবার কি কথা আছে ? জাত-জন্ম ভগবান করেছেন। ব্রাহ্মণ কলির দেবতা। আমি তোমার দোষ দিই না, দোষ অবনীর, সে তোমাকে ওখানে নিয়ে বসলো কেন ?"

হায়রে, অবনীও ত এই সুরে কথা বলিয়াছিল। তাহার অন্তরের দুঃখের সাড়া কি জগতে কোনো হৃদয়ে নাই ? খ্রীষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা সে মাকে বলিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু বলিল না।

খানিক পরে ইচ্ছাময়ী কহিল—'আমার কাছে আয়।'

শঙ্কর মায়ের বিছানায় উঠিয়া গেল। ইচ্ছাময়ী কহিল,—'আমার মাথায় হাত দে।'

শঙ্করের আর কোনো উৎসাহ ছিল না, মাথায় হাত দিল। ইচ্ছাময়ী বলিল,—'এবার বল যে কোনোদিন বাপ-পিতাম'র ধর্ম্ম ছাড়বিনে।'

শঙ্কর শপথ করিল।

ইচ্ছাময়ী আবার কহিল—'যদি করিস, সেদিনই আমার মরা-মুখ দেখবি।'

শঙ্কর মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সব শুনিল। বুঝিল যে তাহার কোনোদিন খ্রীষ্টান হওয়ার সম্ভাবনা নাই—আর বুঝিল মায়ের নিকট হইতে সে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেখানে সে নিতান্ত একাকী।

শঙ্কর নীলগঞ্জে আর ফিরিয়া গেল না। পাদরীও তাহার আর খোঁজ করেন নাই।

(৫)

কিছুদিন ধরিয়া মাতাপুত্রের চিন্তা বিভিন্ন পথে চলিল। ইচ্ছাময়ী ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিত—'কি করে এ অবোধ বালককে বোঝাই সব কথা। সিদ্ধেশ্বরী তলার মাদুলী এনেই না ওকে পেলাম। তারপর যখন হামে ও যেতে বসেছিল, তখন ঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে চরণামৃত এনেই না ওকে বাঁচাই। ও বলে খ্রীষ্টান হবে। মা সিদ্ধেশ্বরী, যদি সারা জীবন তোমার নাম ক'রে চলে থাকি, মা, তবে আমার বুকে এমন দাগা দিও না।'

শঙ্কর ভাবিত—'জীবনে এ কি গরমিল। যাকে সব চেয়ে ভালবাসি, সেই আমার অন্তর থেকে সব চেয়ে দূরে। কেমন করে মাকে বোঝাই খ্রীষ্ট কে, কি তাঁর বাণী। তিনি ত আমাদের মত লোকের জন্যই পৃথিবীতে এসে নিজের রক্তে আমাদের মুক্তির দ্বার খুলে গেছেন।'

একদিন রাত্রিতে শঙ্করের ঘুম পাইতেছিল না। মনে করিতেছিল মার মনও কি খ্রীষ্টের দিকে নেওয়া যায় না। ইচ্ছাময়ীকে ডাকিয়া কহিল 'মা, তোমার কথা যদি ঠিক না হয় ?'

ইচ্ছাময়ী জাগিয়াই হাতে কি পয়সা আছে না আছে তাহার হিসাব করিতেছিল। বলিল, 'আমার কোন্ কথা ?'

'এই ছোট বড় করা যদি ভগবানের হাত না হয় ?'

'তবে কার হাত ?'

'এটা যদি মানুষেরই ব্যবস্থা হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ত এ নেই, তারাও ত মানুষ।'

ইদানীং ইচ্ছাময়ীর রক্ত ঐ খ্রীষ্টান শব্দটা শুনিলেই গরম হইয়া উঠিত। কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল—'আর জন্মের পাপ এ জন্মে ভোগ করতেই হবে, বাবা।'

ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা শঙ্করের বলিবার ছিল। পাদরীর প্রণীত "খ্রীষ্টধর্ম্মে" জাতির বিরুদ্ধে, জন্মান্তরের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি সে পড়িয়াছিল এবং সেগুলি তাহার কাছে মনে হইয়াছিল অকাট্য। কিন্তু মাকে তাহার রাগাইবার ইচ্ছা ছিল না। তাই কথাটা কিছু অন্যভাবে ঘুরাইয়া কহিল—'এই ধর যদি তোমার পুণ্য বাবার চেয়ে বেশী হয়, কিংবা আমি যদি পাপ করি, তাহলে পরজন্মে আর কি করে আমাদের দেখা হবে?'

ইচ্ছাময়ী এবার সত্যই রাগ করিয়া উত্তর দিল—'দু'পাতা ইংরেজী পড়ে তোর যে কি হয়েছে জানি না, আমার পুণ্য, তাঁর পুণ্য, তোর পুণ্য এ কি সব পৃথক? সতীর স্বামী কখনও বদ্‌লায়, না তার সন্তানকে সে কোনোদিন হারায়?'

ইহার পর আর কথা চলে না। পরের দিন প্রাতেই ইচ্ছাময়ী তাহাদের জাতির পুরোহিতের কাছে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া আসিল। শঙ্করের মনে এ চিন্তা এতদিন আছে ভাবিয়া তাহার মন আশঙ্কায় ও অশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার আর দু-একজনকে গোপনে শঙ্করের জন্য একটী মেয়েও দেখিতে বলিল।

শঙ্কর লেখাপড়ায় অবহেলা করিত না। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন ছুটি, এমন সময়ে তাহাদের পাড়ায় কলেরা দেখা দিল। ঘরে ঘরে রোগী। রাস্তায় চলিতে গেলে গা ছম্‌ছম্ করে। প্রতিদিন কাহারো না কাহারো মৃত্যু হইতেছে। কেহ কাহারো বাড়ীতে বিশেষ যায় না। সকাল সন্ধ্যা নগর-সংকীর্ত্তন হইতেছে।

এ রোগ বড়-ছোটর ভেদ রাখিল না, সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। ভৈরব গেলেন, নন্দ চৌধুরী যাইতে যাইতে রহিয়া গেলেন।

ইচ্ছাময়ী গেল। গ্রামে ইচ্ছাময়ীর এক দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই তাহার মহাজনীর কাজকর্ম্ম দেখিয়া দিত সেও গেল। ঘরে ঘরে শোকের রোল উঠিল। তারপর কোনো হিংস্র জন্তুর মত চারিদিকে থাবা মারিয়া ফাল্গুনের শেষে মারী অন্তর্হিত হইল।

মা থাকিলেন না, অথচ সংসার চলিবে, এ চিন্তা একদিন শঙ্কর করিতে পারিত না। কিন্তু সংসার ত চলিলই, এমন কি মায়ের মৃত্যুর পরদিন নিজের রান্না হবিষ্যান্ন যখন ক্ষুধার জ্বালায় পেট ভরিয়াই খাইল তখন নিজের প্রতি তাহার অসীম ঘৃণার উদ্রেক হইল। মানুষকে ভোলা এতই সহজ? তাহার অভাবে দিন রাত হয় না, সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ক্ষুধাও পায়, ঘুমও হয়? অথচ মানুষ ভাবে সে আর একজনকে ভালোবাসে।

কিন্তু তখনও সে বোঝে নাই তাহার জীবন কতখানি খালি হইয়া গেছে। হঠাৎ হাত বা পা কাটা গেলে যেমন কিছুক্ষণ কোনো বোধ থাকে না, তারপর আসে অসীম যন্ত্রনা এবং তারো পর চিরদিনের অভাব, শঙ্করেরও তেমনি মাতৃবিরহের বেদনা দিনের পর দিন গভীরতর হইয়া উঠিল।

ইচ্ছাময়ী তাহাকে বিশেষ কিছু বলিয়া যাইবার অবসর পায় নাই। শঙ্কর তাহাদের মহাজনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না। কিন্তু দুই এক মাস যাইতেই খাতকের পর খাতক আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা—টাকা ফেরৎ দিয়াছে। ইচ্ছাময়ী কাজের গতিকে খত ফেরৎ দিতে পারে নাই। নিজের লোক বলিয়া তাহারাও বিশেষ জোর করে নাই। কিন্তু এত শীঘ্র ইচ্ছাময়ী চলিয়া যাইবে এ কেহ ভাবিতে পারে নাই। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। এখন যদি শঙ্করের অসুবিধা না হয় তবে খতখানি ফেরৎ দিলে ভাল হয়। তবে যদি শঙ্কর ব্যস্ত থাকে তাহারা আর একদিন আসিতে পারে।

হীরু ভট্টাচার্য্য অধিকাংশ খতের লেখক। সে সাক্ষী দিল যে টাকা প্রকৃত পক্ষেই দেওয়া হইয়াছে—তাহারই সামনে।

শঙ্কর সব খতই ফেরৎ দিল। দু একজন খাতক তখন দেশে ছিল না। শুধু তাহাদের খত রহিল। সেগুলি তামাদি হইবার এখনও সময় আছে।

মায়ের মৃত্যুর পর সে আর স্কুলে যায় নাই। স্কুলের বেতন দিয়া পড়িবার শক্তি তাহার আর নাই। বরাবর ফার্ষ্ট হইয়াছে, আশা করিয়াছিল হেডমাষ্টার ডাকিয়া একটা কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। দিনের পর দিন গেল। তাহার আর ডাক পড়িল না।

একজন বিধবা প্রতিবেশিনী দুবেলা তাহাকে রাঁধিয়া দিয়া যাইতেন। কিন্তু চলে কি করিয়া। যে টাকা ইচ্ছাময়ী রাখিয়া গিয়াছিল তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। শ্রাদ্ধে কম টাকা খরচ হয় নাই। সে নিজে যাহা খরচ করিবে ভাবিয়াছিল, তাহার প্রায় দ্বিগুণ খরচ হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিয়াছে বাপ মা কাহারো দুইবার মরে না, শঙ্কর যেন টাকার কথা না ভাবে। কিন্তু শ্রাদ্ধের পরে পরামর্শ দিতে কেহ আসে নাই।

একবার মনে করিয়াছিল সেই পাদরী সাহেবের কাছে যায়। খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা তাহার মায়ের কথা ভাবিয়া তাহা পারিল না। তাহার যতটুকু শিক্ষা এবং যে কুলে তাহার জন্ম, তাহাতে তাহার চাকরীর কোনো আশা নাই। ভাবিয়া কিছুরই যখন কিনারা করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে একদিন নিশিকান্ত দেখা করিতে আসিল।

নিশিকান্ত পাঠশালায় তাহার উপরে পড়িত এবং বয়সও তাহার হইতে প্রায় দশ বৎসর বেশী। পাঠশালা ছাড়িয়াই সে ব্যবসা ধরিয়াছে। বৎসরে দুএক বার গ্রামে ফেরে। পাড়ায় তাহার খ্যাতি অখ্যাতি দুইই ছিল। যতদিন পাড়ায় থাকিত পাড়া মাতাইয়া রাখিত। আজ এবাড়ীতে তাস, কাল সে বাড়ীতে পাশা। প্রায় রোজ রাত্রিতে সংকীর্ত্তন। ছেলেদের খেলনা বানাইয়া দিত। মেয়েদের ফরমাস খাটিত। সব চেয়ে লম্বা গাছের নারিকেল সেই পাড়িয়া দিত। অসুখ বিসুখ বা ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার হাতে ভার দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইত। শুধু তাহার সমবয়সীরা তাহাকে পছন্দ করিত না, বলিত মেয়েদের দিকে ও যেন কেমন নজরে তাকায়।

নিশিকান্ত ও শঙ্করে অনেক আলাপ হইল। উঠিবার আগে নিশিকান্ত কহিল—'একটা কথা মনে করে এসেছিলাম, যদি কিছু না মনে কর ত বলি।'

শঙ্কর বলিল—'তুমি যে কুটুম্বিতা আরম্ভ করলে—বলই না কি কথা?'

'আজ কাল শুধু মাঝিগিরিতে দিন চলে না। আমি তাই শীতকালে মাছের ব্যবসাও করি কিছু কিছু। কোনো বড় হাটে মাছ কিনে ছোট হাটে বিক্রি করি। যেগুলি জীয়িয়ে রাখা না যায়, সেগুলি কেটে নুন মাখিয়ে রাখি। আর কই মাগুর এ সব ত রাখা যায়। যে লোকটি আমার সাথে কাজ করত, নানা গোলমালে সে চলে গেছে। তুমি লেখাপড়া করেছ, হয়ত তোমার ভালো লাগবে না। কিন্তু এই ত আমাদের জাতের ব্যবসা, যদি ভালো লাগে আমার সঙ্গে আসবে কি—মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।'

শঙ্কর যেন আকাশ হাতে পাইল। বলিল—'মোটা ভাত কাপড় ছাড়া কিছুই চাই না, নিশিদা। নিজের নৌকা নেই, না হলে একথা আমিও ভেবেছিলাম। সবাই মুখে না হলেও মনে মনে আমার লেখাপড়া শিখতে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করে বলে আমি আর কারুর নৌকাতে কাজও চাইতে পারিনি।'

তারপর একদিন সকালে পাল তুলিয়া শঙ্করকে লইয়া নিশিকান্তর নৌকা যখন গ্রামের ঘাট ছাড়িল—পাড়াতে অনেকেই বলিল—'বলেই ত ছিলাম লেখাপড়া আমাদের সয় না। বাপ গেল, মা গেল। লেখা পড়া শেষ হল, রইল কিন্তু জাত ব্যবসা।

শঙ্করের মনে কিন্তু অপূর্ব্ব পুলক জাগিয়া উঠিল। পালে তখন বাতাস লাগিয়াছে। এ যেন রূপকথার পাখী, ডানা মেলিয়া নীলাকাশ ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। নদীর জলে, কূলের ঘাসে, এ কি গন্ধ! আকাশে এক সারি গাংচিল যেন কুচকাওয়াজ করিতেছে। যেন সাদা মেঘের টুকরো সব, এক একবার পালকে ভোরের রোদ লাগিয়া হীরের মত ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। ঘাটে ঘাটে ঘট কক্ষে গ্রামের

বধূরা। কাহারো স্নান হইয়া গিয়াছে, সখীর জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ জল ভরিতেছে, কেহ বা গামছায় বুক ঢাকিয়া আঁচল কাচিয়া লইতেছে। নিশিকান্ত হালে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—

"আমারে ডাক দিয়েছে, ভাই, সোনার দেশের গাঙ্।"

(৬)

নিশিকান্তের কার্য্যকলাপ শঙ্কর অবাক হইয়া দেখিত। তাহার কথা-বার্ত্তা অবাক্ হইয়া শুনিত। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল নিশিকান্তর এ জ্ঞানবুদ্ধির কাছে তাহার পুঁথিগত বিদ্যা নিতান্ত তুচ্ছ। কোন্ তিথিতে কখন জোয়ার আসিবে, কোন্ নদীর কূল কোথায় ভাঙ্গিতেছে, কোন্ ধারে স্রোতের জোর বেশী, কোন্ বাঁকে পাল চলিবে, সবই তাহার জানা। বাতাস দিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া বলিত বৃষ্টি হইবে কিনা। আকাশে যখন মেঘ নাই তখন বাতাসের গতি ও দিনের গরম দেখিয়া বুঝিতে পারিত বিকালে ঝড় হইবে কিনা। নদীর বুকে আসাবস্থার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার দৃষ্টি খুঁজিয়া পাইত নৌকা রাখিবার জায়গা। শরীরে তাহার অসীম শক্তি, শঙ্করকে বেশী খাটিতে দিত না। উজানে দাঁড় বাহিত সেই, প্রয়োজন হইলে গুণ টানিত সেই। তারপর দিনের শেষে যখন রাঁধিতে বসিত, তখন শঙ্কর বলিত—'দাও না, নিশিদা, আমি কিছু করি।'

নিশি হাসিয়া বলিত—'করবি রে, সবি করবি। দুদিন সবুর কর। আর কিছু দিন পরে তোর নিশিদা শুধু পায়ের উপর পা দিয়ে শুয়ে থাকবে, তোকেই করতে হবে সব। খাটুনীর জীবন আমাদের, দুদিন একটু আরামে রইলিই বা।'

শঙ্করের উপর তাহার অসীম মমতা ছিল। সর্ব্বদা এমন ভাবে চলিত যেন শঙ্করের উপযুক্ত কাজ এ নয়, এ কাজের কঠোরতা হইতে তাহাকে বাঁচানো চাই। অথচ তাহাকে শিখাইতও সব। ঝড় আসিলে হাল ধরিতে বলিত ও নিজে কাছে বসিয়া রহিত। দরকার হইলে দাঁড় দিয়া কি করিয়া হালের কাজ ও হাল দিয়া দাঁড়ের কাজ করা যায়, তাহা

দেখাইত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'তোমার মত সব বিষয়ে পাকা কবে হতে পারব, নিশিদা।' নিশিকান্ত উত্তর দিত—'পারবি, পারবি, আগে রোদ লাগা। তবে দু-একদিকে আমার মত তোর পেকে কাজ নেই।' শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'ব্যাপারটা কি?' নিশিকান্ত চোখে মুখে এক অগাধ রহস্যের ভাব আনিয়া মাথা নাড়াইয়া জানাইত এখনো বলিবার সময় হয় নাই।

নিশিকান্তর সহিত কাজ করিয়াও সুখ ছিল। সর্ব্বদা হাসিমুখ। দোষ কারো দিলে নিজের দোষই দিত। কখনও পাল তুলিবার পর, কখনও বা দিনের শেষে ছুটি মিলিলে নৌকার উপর বসিয়া হয় বাজাইত বাঁশী, না হয় তুলিত গান। মুগ্ধ হইয়া শঙ্কর শুনিত। বাঁশী যেন কাঁদিতে থাকিত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'এটা কি বাজালে?' নিশিকান্ত বলিত—মাথুর, না হয় মান, না হয় বিরহ। ক্রমে শঙ্কর বাঁশীর সুর ধরিতে শিখিল।

নিশিকান্তের উপর স্নেহে, শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে শঙ্করের মন ভরিয়া গেল।

শীত আসিল। তখন যাত্রী কম। মাছের ব্যবসা করিবার কথা। নিশিকান্ত নৌকা বিরামপুরের বন্দরে লইয়া গেল। প্রায় এক মাইল লম্বা বাজার ও হাজার হাজার নৌকা। এখান হইতে সকালে মাছ কিনিয়া সেই দিন সন্ধ্যাতেই কাছে কাছে হাটে কিছু লাভে বিক্রি করা যায়। কিন্তু পরিশ্রমের কাজ, বিরামপুরে ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি গভীর হইয়া যাইত। তারপর রান্না-বান্না, খাওয়া ও ঘুমানো। আবার পরদিন ভোরে বাজার করা, মাছ আনা, নৌকার খোলে তাহাদের জীয়াইয়া রাখা, কাজের অন্ত ছিল না। কিন্তু নিশিকান্তের কোনো পরিবর্ত্তন নাই। সেই অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই হাসিভরা মুখ। শুধু জোর করিয়া রান্নার ভারটা শঙ্কর লইয়াছিল।

ক্রমে শীতও শেষ হইয়া আসিল। দেশে ফিরিবার আর বেশী দেরী নাই। একদিন দুপুরে খাইবার পর নিশিকান্ত বলিল—'তোকে একজন দেখতে চায়।'

বিস্মিত হইয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে, কে ?'

'কাজল গো কাজল।'

'কে কাজল ?'

এবার নিশিকান্ত হো হো করিয়া উঠিল। বলিল—'নিশিকান্তের ছোট ভাই তার ভাজের খবর রাখে না।'

শঙ্করের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল, বলিল—'কি যে বলছ তুমি, পরিষ্কার করে বল না সব, কবে বিয়ে করলে, কিছুই ত শুনি নি।'

নিশিকান্ত হাসি থামাইয়া কহিল—'শোনবার কথা নয়। তুই বড় ভাল ছেলে, তোকে বলতে চাইওনি। কিন্তু কি যে তার সাধ হয়েছে তোকে দেখবে। তোর গল্প করি কি না সব সময়ে'।

'কিন্তু সে কে, নিশিদা ?'

'সে হচ্ছে কাজল বোষ্টমী, আদর করে বলি আমার চোখের কাজল। দেশ বিদেশ ঘুরি, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটি, ওর ওখানে গিয়ে একটু মনটা জুড়োইরে'—তারপর শঙ্করের দিকে একটা গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'রাগ করলি নাকি, শঙ্কু—'

শঙ্কর এবার একটু একটু বুঝিতে পারিল। বলিল—'রাগ করব কেন, কিন্তু এবার গেলেই বা তার কাছে কবে' ?

নিশিকান্ত আবার হাসিল। উত্তর দিল—'যাই ত রোজই, যখন যাই আর ফিরি, তখন শঙ্কু ভায়া যে ঘুমে অচেতন'।

শঙ্করের কৌতূহল হইল। কিন্তু যাইবার উৎসাহ ছিল না। জিনিসটা তাহার বিশেষ ভালো লাগিতেছিল না; তবে আপত্তিও করিল না বিশেষ। নিশিকান্ত যাহাই করুক তাহার তুলনা জগতে নাই। আর তাহার সাথেই ত যাইতেছে।

বন্দর ছাড়াইয়া গ্রাম, সেই গ্রামের কোণে একখানি মাত্র ঘরে কাজল থাকে। চারিদিকে বেড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উঠানে শুকনো পাতাটি নাই। এক কোণে একটী তুলসী-মঞ্চ। তাহারই পিছনে লাউএর মাচা। আর এক কোণে একটী কুয়া। বারান্দায় দুখানা ছোট চৌকি। অন্যদিকে একটী মাদুরে বসিয়া কাজল ডাল বাছিতেছিল।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই নিশিকান্ত উচ্চ কণ্ঠে কহিল—'এই যে এনেছি আজ, কাজল। নয়ন ভরে দেখ এবার, এমন ভালোছেলেটী আর পাবে না।'

কাজল উঠিয়া দুজনকে বসিতে দিল। শ্যামাঙ্গী, ঈষৎ স্থূল কিন্তু ঋজুদেহা। এলায়িত চুল পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে। হাতে কয়গাছি সোনার চুড়ী, কপালে চন্দনের রেখা।

কথা বেশীর ভাগ নিশিকান্তই কহিল। অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় এই প্রথম। সে খানিকক্ষণ মাথা উঁচু করিয়া কথাই কহিতে পারিল না। বিশেষতঃ যখন জানিত নিশিকান্তের সহিত এ রমণীর কি সম্বন্ধ। কাজলের মধ্যে লজ্জার আড়ষ্টতা ছিল না, লজ্জা ভাঙ্গার চাঞ্চল্যও ছিল না—যেটুকু কথা কহিল, সে শঙ্করেরই সহিত এবং সে কথার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই।

সেদিন সকালে নিজেদের প্রয়োজনের কয়েকটী জিনিস কেনা হয় নাই। নিশিকান্ত শঙ্করকে রাখিয়া সেগুলি কিনিতে গেল এবং বলিয়া গেল এখানে ফিরিয়া শঙ্করকে লইয়া যাইবে।

শঙ্করের ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু কাজলের সামনেই এ কথা বলিতে কেমন বাধিয়া গেল। নিশিকান্ত যাইবার সময় আবার রসিকতা করিয়া বলিয়া গেল—'কাজল, ও কিন্তু খুব ভালো ছেলে।'

নিশিকান্ত চলিয়া গেলে কাজল ঘরের পিলসুজ জ্বালাইল। আর একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া আঁচলে ঢাকিয়া তুলসী-মঞ্চে রাখিয়া দিয়া আসিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া কহিল—'এবার ঘরে চল, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।'

শঙ্কর কহিল—'এই কাদাপায়ে ঘরে যাব—জল পেলে ধুয়ে নিতুম।'

ঘরের ভিতর হইতে কাজল ঘটি ভরিয়া জল আনিল। তারপর শঙ্করকে তাহার চৌকিটা বারান্দার প্রান্তে লইয়া যাইতে বলিল। শঙ্কর জল লইতে হাত বাড়াইল এবং কিছু বলিতে পারিবার আগেই নিজ হাতে জল ঢালিয়া কাজল পরিষ্কার করিয়া শঙ্করের পা ধোয়াইয়া

দিল। তারপর হাতের গামছা দিয়া মোছাইয়া দিল। ঘরের বেড়ায় রাধাকৃষ্ণের নানারূপ যুগল মূর্ত্তির ছবি। সন্ন্যাসীর বেশে চৈতন্যদেবের ছবিও একটা ছিল। এক কোণে একখানা খাট। পরিষ্কার বিছানা, ও রঙীন মশারি আর একদিকে একটী আল্‌নায় ভাঁজকরা কয়েকখানি শাড়ী রহিয়াছে। ঘরের মেজেতে নানারূপ তৈজসপত্র। পিছনে আর একটী বারান্দা ঘেরা, সেখানে রান্না হয়।

কাজল বারান্দা হইতে মাদুর আনিয়া ভিতরে পাতিয়া দিল। শঙ্কর বসিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি রাঁধতে যাবেন না?'

কাজল কহিল—'আমি এক বেলাই রাঁধি, রাত্রিতে কখানা রুটী গড়ে নি, সকাল বেলার তরকারি থাকে।'

ধীরে ধীরে কাজল তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিল। দেশের কথা, সংসারের কথা, তাহার জীবনের কথা—কি কোমল কণ্ঠস্বর, কি স্নিগ্ধ চাহনি, যেমন বড় চোখ তেমনি ঘন ভ্রূ ও চোখের পাতা। মায়ের মৃত্যুর পর শঙ্করের অন্তর যেন একটু স্নেহের জন্য তাহারি অগোচরে ভিখারী হইয়া ঘুরিতেছিল, অনবদ্য তৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল। জগৎ-সংসারের কাছে এ নারী যাহাই হৌক, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল উহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে।

কাজল বলিতেছিল—'নিশিকান্ত তোমায় ভালোবাসে। পৃথিবীতে ও যে কাউকে এমন করে ভালোবাসতে পারে, আমার মনে হয় নি। তাই তোমায় দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল।'

শঙ্করের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে তাহাই যদি হয়, তবে এখানে আসে কেন। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না। বরং কাজলের কথায় সায় দিয়া নিশিকান্ত তাহাকে কত ভালোবাসে, তাহাকে কিরূপ খাটিতে দেয় না, কি বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে, উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সব বলিতে লাগিল।

তারপর আরো কথা হইবার পর কাজল বলিল—'এখন ত চিনলে আমার বাড়ী, এসো মাঝে মাঝে। নিশিকান্তের অপেক্ষায় থেকো না। ও মন-ভোলা লোক, কখন যে ওর কি মনে হয় বোঝা দায়।'

যাহাকে লইয়া এ দেখা, এ যেন তাহারই অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সুর। শঙ্করের যেন কেমন লাগিল, কোনো উত্তর দিল না।

এমন সময়ে নিশিকান্তের গলা পাওয়া গেল।

সে রাত্রিতে নৌকায় ফিরিয়া নিশিকান্ত যেন মাতাল হইয়া উঠিল। গানের উপর গান। যখন নদীর বুক কাঁপাইয়া উচ্চকণ্ঠে গান তুলিল—'সে হোক না কালো, আমার ভালো চোখে লেগেছে', তখন যেন শঙ্করের বুক এক কারণহীন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইলে নিশিকান্ত বাঁশী ধরিল। কিন্তু আজ বাঁশীর অন্য সুর, সে কান্না যেন নাই, যেন সেই নদীর জোয়ারেরই মত, কূল ভরিয়া সুরের জোয়ার আসিয়াছে। অনেক রাত্রিতে বাঁশী রাখিয়া শঙ্করকে একবার জড়াইয়া নিশিকান্ত কহিল—'কেমন করে বলব, রে শম্ভু, কি ভালো লেগেছে আজ। তোর কাছে আজ আর আমার কিছু গোপন নেই।'

শুধু কেহ জানিত না যে দূর সাগরের গোপন আহ্বান লইয়া শঙ্করেরও দেহ মনে জোয়ার আসিয়াছে একই সাথে দুই কূলে ভাঙ্গনের মাতন সুরু করিয়া দিয়াছে।

৭

সৃষ্টিতে সব চেয়ে ঘৃণা করে লোহা চুম্বককে—কারণ তাহার টানিবার শক্তি আছে কিন্তু আপন করিয়া লইবার শক্তি নাই। শুধু শঙ্করের মনে এ ঘৃণা জাগিতেছিল নিজের উপর—কাজলের উপর নয়। কাজল যদি তাহার মনের সকল দ্বিধা কাটাইয়া সকল বাধা ভোলাইয়া নিজের কাছে টানিয়া লইতে পারিত, শঙ্কর বাঁচিত। অথবা স্বপ্নের মত ঘুম ভাঙ্গিবার সাথে সাথে মন হইতে সরিয়া যাইত, তাহা হইলেও শঙ্কর শান্তি পাইত। কিন্তু অদৃষ্টে তাহা তাহার ছিল না। দেশে ফিরিবার আর চার-পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে। নিশিকান্তের অনুরোধ সত্বেও শঙ্কর কাজলের কাছে আর যায় নাই। নিশিকান্তের খুসীর সীমা ছিল না। কাজলকে জিজ্ঞাসা করিত—'কি, বন্ধুকে লাগল কেমন?' শঙ্করকে বলিত—'কাজল

যে রোজই তোর কথা জিজ্ঞেস করে, গতিক ভালো নয় ত'। নিজের শক্তির উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই হাতের ঘুড়ীর মত নিজের কল্পনাকে মনের আকাশে খেলাইয়া সুখ পাইত। শঙ্কর অনেক সময়ে কর্কশ উত্তর দিত। পরে অনুতপ্ত হইয়া সহস্র রকমে নিশিকান্তকে খুসী করিতে চেষ্টা করিত। নিশিকান্ত কোনোটিই লক্ষ্য করিত না।

কিন্তু পড়ন্ত রোদে ডিঙির উপর ডিঙি যখন নদীর বুক যেন না ছুঁইয়া ভাসিয়া আশ-পাশের গ্রামে ফিরিত, তারপর নদীর বুকে যখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিত, তখন শঙ্করের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত একটী দীপালোকিত গৃহ, ঘন পল্লবস্নিগ্ধ দুটী নয়ন, আর এই সন্ধ্যারই মত উদাস বৈরাগ্যে ভরা একখানি মুখ। আর মনে পড়িত তাহার পায়ে কোমল দুখানি হাতের নিপুণ স্পর্শ। নিজের আকুলতা আর রাখিতে পারিত না, নিশিকান্তকে বলিত 'একটী গান গাও ত, ভাই—'

এমনি সময়ে সে জ্বরে পড়িল। নিশিকান্ত তাহাকে কাজলের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিল। শঙ্কর অনেক আপত্তি করিল, নিশিকান্ত শুনিল না, বলিল—'কতদিন কত অসুখ বিসুখে নৌকাতে কাটাতে হবে, কাজলের বাড়ী কাছে থাকতে কেন এ কষ্ট পাওয়া'। তারপর শঙ্করকে গরুর গাড়ীতে লইয়া, নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া সন্ধ্যার সময়ে কাজলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কাজল সব শুনিয়া ক্ষিপ্র ও নিপুণ হস্তে খাটে শঙ্করের জন্য নূতন বিছানা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে নিজের বিছানা করিল। তারপর শঙ্করকে বাতাস দিতে বসিল। নিশিকান্তকেও থাকিতে বলিল, কিন্তু নৌকায় কাহারো থাকা দরকার বলিয়া নিশিকান্ত কিছু কাল পরে ফিরিয়া গেল।

দুদিন পরে শঙ্করেয় জ্বর ছাড়িল। যখনই চোখ মেলিয়াছে, দেখিয়াছে কাজল পাশে বসিয়া কিছু না কিছু করিতেছে। কখন যে সে নিজের কাজ করিত শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিত না। তেমনি পরিপাটী সাজানো ঘর, তেমনি পরিচ্ছন্ন বেশে কাজল।

সেদিন রাত্রিতে শঙ্কর কাজলকে কহিল—'তুমি আজ ঘুমোতে যাও, আমি ত ভালো আছি।'

কাজল উত্তর দিল—'আমি ত রোজই ঘুমোই সময়মত। আজো তুমি দুর্ব্বল, আমি কাছে থাকি, তুমি ঘুমুলে আমি ঘুমুতে যাব।'

কিন্তু ঘুম শঙ্করের আসিল না। এ কি সত্য? যে ঘরের স্বপ্ন সে প্রতি সন্ধ্যায় দেখিয়াছে সেই ঘরে, সেই কাজলের কাছে সে রহিয়াছে, একি সম্ভব? সেই দীপালোকিত স্নিগ্ধ মুখখানি এত কাছে? রাত্রি হইলে কাজল জিজ্ঞাসা করিল—'কই তুমি ঘুমোচ্ছ না যে, বললে যে ভালো আছ?'

'এই যে এবার ঘুমোই'—বলিয়া শঙ্কর চোখ বুজিল। তন্দ্রাও আসিল। যখন জাগিল তখন কত রাত্রি জানে না। দেখিল কাজল তাহার মাথাটী কোলে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর দুচোখ বহিয়া জল পড়িতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'কাজল, কাঁদছ কেন?'

কাজল উত্তর দিল না, শঙ্কর আবার কহিল—'কি দুঃখ তোমার, কাজল? নিশিদা তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।'

এবার কাজল উত্তর দিল, বলিল—'বাসে সত্যি, কিন্তু ও যেন ঝড়ের মত এসেছে, আবার কবে ঝড়ের মত চলে যাবে।'

শঙ্করের বুকের মধ্যে তোলপাড় বাধিয়া গেল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। তারপর কাজল হঠাৎ তাহার মুখখানা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—'মাণিক আমার, কেন আসনি এতদিন আমি যে রোজ পথ চেয়ে থাকতাম।'

শঙ্কর মনে মনে ডাকিল—'নিশিদা, নিশিদা।' ইচ্ছা হইল মুখ সরাইয়া লয়, কিন্তু পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কাজল আবার কহিল—'চল, আমায় কোথাও নিয়ে চল। চল কাল রাত্তিরেই যাই। আমার কিছু টাকা আছে। যেদিন না থাকবে, ভিক্ষে করে তোমায় খাওয়াব, এমন করে ভেসে ভেসে আর পারি না।'

এবার শঙ্কর উঠিয়া বসিল। 'কি বলছ এসব তুমি?

কাজল স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর আঁচলে চোখ ঢাকিয়া দ্রুত পদে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি অন্ধকার, যেন এই প্রত্যাখ্যাতা পথভ্রষ্টা নারীর লজ্জায়, অপমানে, কলঙ্কে চারিদিক কালি হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের ইচ্ছা হইল উঠিয়া যায়। কিন্তু উঠিয়া গিয়া কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। এক একবার মনে পড়িতে লাগিল নিশিকান্ত সেই সন্ধ্যাবেলাতেই না তাহার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া, তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য অনেক মজার গল্প করিয়া গিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইল। কাজল নিজের কাজ ও রোগীর সেবা যেমন করিত, তেমনি করিতে থাকিল। কেহই রাত্রির কোনো কথা তুলিল না।

সেদিন বেলা হইলে নিশিকান্ত যখন আসিল, শঙ্কর তাহাকে বলিল সে ভালো হইয়া গিয়াছে। সেই দিনই ভাত খাইবে, এবং সেই দিনই নৌকায় ফিরিতে চায়। নিশিকান্তের ইচ্ছা ছিল শঙ্কর আর একদিন কাজলের কাছে থাকে। কিন্তু দেশে ফিরিবার আর দুই দিন মাত্র বাকি, তাই বিশেষ আপত্তি করিল না। সেও দ্বিপ্রহরে কাজলের কাছে খাইল। কিছু পরে শঙ্করকে বলিল—'তুই এবার এগো, শঙ্কু, আস্তে হাঁটবি ত, আমি পথে ধরে নেব।'

এবার নিশিকান্তের যাইবার পালা। উঠিবার বেলায় একখানা দশ টাকার নোট কাজলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল—'শঙ্কুকে রাখবার খরচপত্র—"

সে শেষ না করিতেই কাজল নোট ফিরাইয়া দিয়া কহিল—'কোনো দরকার নেই, বিশেষ কিছু খরচ হয়নি।'

নিশিকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল—'একি কাজল বিবির টাকায় অরুচি হল কবে থেকে—'

'রুচি অরুচি কি বোঝ তুমি? এবার যাও তুমি, বন্ধু হয়ত অনেক পথ এগিয়ে গেল—' বলিয়া কাজল দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিশিকান্ত তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া গাহিল—'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে কাজল, দাসখৎ লিখে দিয়েছি হায়—"

তারপর একবার প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া নিজের পথ ধরিল। বিদায়ের বেলা কাজল কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু এবার ফিরিয়া দেখিল—কাজল সেখানে নাই। উচ্চৈস্বরে নিশিকান্ত কহিল—'সাবধানে থেকো, কাজল। পারি যদি ত বর্ষাকালে হয়ে যাব।'

শঙ্কর ও নিশিকান্ত দেশে ফিরিয়া কয়েক মাস কাটাইয়াছে। বর্ষা আসিবার আর বেশী দেরী নাই। দু'একটী প্রয়োজনীয় জিনিস আগে হইতেই কিনিয়া রাখিতে হইবে। এসব লইয়া পরামর্শ করিতে শঙ্করের বাড়ীতে আসিয়া নিশিকান্ত দেখে শঙ্কর ঘরের মধ্যে মন দিয়া বই পড়িতেছে।

নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল 'কি বই ও?'

শঙ্কর নিশিকান্তকে দেখিতে পায় নাই। তাড়াতাড়ি বাঁইবেল-খানি বন্ধ করিয়া চলিল—'ও একটা বই, কি মনে করে, নিশিদা?'

নিশিকান্ত সে কথার উত্তর দিল না, বলিল—'তুই বুঝি খুব পড়তে ভালোবাসিস, আচ্ছা 'বিদ্যাসুন্দর' আছে তোর কাছে?'

'না, নিশিদা, কি মনে করে এলে?'

নিশিকান্ত রাগের ভান দেখাইয়া বলিল—'তোর কাছে কি আসতেও নেই রে? ফিরে অবধি ত ডুমুরের ফুল হয়েছিস। আর ত বেরোবার দেরী নেই আমাদের। দুই একটা জিনিস কিনতে টিনতে হবে, একদিন নীলগঞ্জে চল।

শঙ্কর কহিল—'নিশিদা আমি আর তোমার সাথে ফিরব না—কদিন থেকে মনে করছি তোমায় বলব।'

নিশিকান্ত কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিয়া উত্তর দিল—'ফিরবি না কিরে? তোর ভালো লাগে না? আর এখানে করবিই বা কি?'

শঙ্করের ভয় হইতেছিল নিশিকান্তের কাছে তাহার সঙ্কল্প না থাকে। তাই কিছু জোর দিয়াই বলিল—'ও কাজ আমি পেরে উঠব কিনা জানি না, তা ছাড়া আমার খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ও কিছু করা দরকার, দেশে না থাকলে এ সব হয় না।'

নিশিকান্ত কখনও কোথাও হার মানে নাই। শঙ্কর তাহাকে নিজে হইতে একেবারে ছাড়িবে এ তাহার কল্পনার অতীত। কিন্তু শঙ্করের কথায় যে দৃঢ়তা ছিল তাহা স্মরণে থাকায় বলিল—'তবে একটা বছর দেশে কাটা, টাকা কড়ি আদায় কর। কিন্তু পারবি না কি, বেশ ত পারছিলি। পরের বৎসর আবার যাবি। এক বছরের জন্য একটা লোক আমি জোগাড় করে নেব এখন।'

তারপর অন্য অনেক কথা হইল। উঠিবার সময় নিশিকান্ত বলিল—'গানের অভ্যাসটা রাখিস, তোর বেশ গলা আছে।' ফিরিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে নিশিকান্ত শঙ্করকে গাহিতে শিখাইতেছিল।

নিশিকান্তের যাইবার দিন আসিল। তাহাকে বিদায় দিয়া ঘাট হইতে ফিরিবার সময়ে শঙ্করের মনে হইল যেন তাহার পৃথিবী শূন্য হইয়া গিয়াছে। মা, বাবা, কাজল, নিশিদা—একে একে সবাই কোথায় গেল। আঁধার রাত্রিতে নদীর বুকে দেখা নৌকার মত এরা কোন্ আঁধারে মিলাইয়া গেল। সর্ব্বোপরি নিশিদা—

সে বেদনা বুঝিবার মত লোক কি আছে সংসারে? সত্যিকার বন্ধু ইচ্ছা করিয়া বিদায় দিয়াছে কি কেহ? সে স্নেহে দান নাই প্রতিদান নাই, জয় নাই পরাজয় নাই, আহ্বান নাই প্রত্যাখ্যান নাই। এই অপরিচিত শত্রুময় জগতে দুটী পুরুষের এক সঙ্গে পথযাত্রা—শেষ কি হইয়া গেল সবই?

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। খত ফিরাইয়া দিবার পর যে কয়েকটী থাতক বাকি ছিল, শঙ্কর তাহাদের বাড়ীতে যাইতে আরম্ভ করিল। বেশী দেনা মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের। মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে দেখিয়া আদর আপ্যায়ন করিল এবং টাকার কথা তুলিতেই বলিল—'ও সম্বন্ধে উমেশ জানে। সে মাসখানেক পরে ফিরবে। মনে হয় যেন একবার বলেছিল যে প্রায় সমস্ত টাকাটা তোমার মাকে দেওয়া হয়েছে।'

শঙ্কর এখন এ সব কিছু কিছু বুঝিত, বলিল—'কিন্তু খতের পিঠে ত কোন উশুল নেই।'

মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া উত্তর দিল—'তোমরা বাবা একালের ছেলে, সব

কাগজে কলমে চাই, আমরা পরস্পরকে কত বিশ্বাস করতাম। কতবার বিনা খতে তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা এনেছি, তারপর সুদশুদ্ধ ফেরৎ দিয়েছি, কিন্তু সেদিন কি আছে আর?'

শঙ্করের বেড়ানো হইতে লাগিল বটে—কিন্তু টাকা ঘরে আসিল না। সৃষ্টিধর এ সব জানিত তাই উচ্চ সুদে ছাড়া টাকা দিত না। তাহার কিছু লাভ হইয়া গেলেই বাকি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না। কিন্তু এসব খত তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নেওয়া, সুদও তামাদি বাঁচাইবার জন্য দু-এক টাকা ছাড়া নেওয়া হয় নাই।

কয়েকদিন পরে একদিন দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্কর দেখে তাহার জন্য রান্নাবান্না কিছুই হয় নাই। যে প্রতিবেশিনী তাহার জন্য রাঁধিয়া দিত, মনে করিল তাহার বুঝি অসুখ হইয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিল বুড়ী খাইয়া দাইয়া শুইয়া আছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'কি মাসী, ব্যাপার কি? মাসী কহিল—'সে অনেক কথা।'

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া বসিতে যাইতেছিল। বৃদ্ধা কহিল—'ঐখানেই দাঁড়াও, বাবা, আমি বাইরে আসছি।'

তারপর বাহিরে আসিয়া চুপি চুপি কহিল—'পাড়াময় রটে গেছে তুমি খেস্তান, গরু খাও, আচ্ছা, বাবা একথা কি সত্যি?

সে কথার উত্তর না দিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'রটেছে ত, কিন্তু রটালো কে, মাসী?'

তাহার প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া বৃদ্ধা কিছু অপ্রসন্ন সুরেই উত্তর দিল—'কি জানি, বাবা, আমি কারো কোনো কথাতে নেই। মিথ্যে যদি হয়, পঞ্চায়েৎ কর।'

শঙ্করের গা জ্বলিতেছিল। বাড়ীতে আসিয়া নিজেই রান্না করিল। পঞ্চায়েৎ ডাকিবার জন্য কোনো উৎসাহই প্রকাশ করিল না।

কিন্তু সমাজচ্যুত হইয়া গ্রামে বাস করা অত সহজ নয়। পাড়ায় বিবাহে, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কেহ আর তাহাকে ডাকে না। কেহ কথা বলে না, কেহ বাড়ীতে আসে না। কাহারো বাড়ীতে গেলে যেন

তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়ে। এমনি সময়ে একদিন অনেক রাত্রিতে মৃত্যুঞ্জয় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। শঙ্কর জাগিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল। মৃত্যুঞ্জয়ের খতের তামাদির এক বৎসর এখনো বাকি। তাহার বড় ছেলে উমেশও ফেরে নাই, ফিরিলেও শঙ্কর তাহার দেখা পায় নাই। টাকাও কিছু সে পায় নাই।

শঙ্কর কহিল—'এত রাত্তিরে আপনি ?'

মৃত্যুঞ্জয় চুপে চুপে কহিল—'চল, বাবা, তোমার ঘরের মধ্যে।'

তারপর ঘরে আসিয়া কহিল—'পাড়া না ঘুমুলে কি আসতে পারি—তবু না পথে হরিশের সাথে দেখা। বললাম, যুধিষ্ঠিরের মায়ের অসুখ দেখতে যাচ্ছি।'

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল,বলিল—'এত ভয় যখন,তখন এলেন কেন ?'

মৃত্যুঞ্জয় কোনো উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, বল বাবা, তুমি কি খেস্তান ?'

'না, আমি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইনি। কিন্তু খ্রীষ্টে আমি বিশ্বাস করি।'

'ঠাকুর দেবতা মানো ?'

'যতদিন ধর্ম্মত্যাগ না করি, ততদিন দেশাচার, কুলাচার মেনে চলতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু আমি ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করি না।'

ইহাই যেন মৃত্যুঞ্জয় আশা করিয়াছিল, বলিল—'তবেই-ত, বাবা, তুমি খেস্তান, এখন উপায় কি ?'

শঙ্কর বলিল—'কিসের উপায়, আমি ত কারো কাছে থেকে কিছু চাইনি।'

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—'চাওনি ঠিক, কিন্তু এর পরে যে তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে না, তার মানে কি ? কি রকম দিন কাল ত জান। সৃষ্টিধরের ছেলে তুমি, তুমি ভুললে আমরা ত ভুলতে পারিনে। আমি বলি তুমি পঞ্চায়েৎ ডাকো। সেখানে আমার কথার উপর কথা কইবে এমন সাহস কারো নেই। তারপর একটা যা কিছু প্রাশ্চিত্তির করলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি থাকলে তোমায় মারে কে ?'

শঙ্কর তেমনি ধীর স্বরে কহিল—'আমি পঞ্চায়েৎও ডাকব না, প্রায়শ্চিত্তও করব না, আপনাদের ভয় নেই, এদেশ আমি ছেড়ে যাব।'

মৃত্যুঞ্জয় এতটা ভাবিতে পারে নাই। বলিল—'তবে উঠি, কিন্তু কথাগুলি ভেবে দেখো, বাবা।'

শঙ্কর কহিল—'দাঁড়ান একটু।' তারপর একটী কাঠের বাক্স খুলিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের খতখানি বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়া বলিল,—'এইটী নিয়ে যান।'

মৃত্যুঞ্জয়ের ইহাতে যেন বিস্মিত হইবার কিছু ছিল না, বলিল—'ও সেই খতখানা, তা দাও, বাবা, এত তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না, তা দেখ, প্রাশ্চিত্তির না করলেও চলতে পারে।'

শঙ্করের আর সহিতে ছিল না, বলিল—'এবার যান, আমি শুতে যাব। তবে আপনাকে বলে রাখি যে খ্রীষ্টান যে হইনি তার একমাত্র কারণ আমার মার তাতে অমত ছিল এবং সেইজন্য হবও না কোনোদিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম।'

শেষের কথাগুলি শঙ্কর উত্তেজনাবশেই বলিয়াছিল। ইদানীং মনের শান্তির জন্য সে অনেক সময়েই বাইবেল পড়িত বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে বাস্তবিক সে অতদূর অগ্রসর হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেলে তাহার মনে আসিল উত্তেজনার পরিবর্ত্তে গভীর নৈরাশ্য। মনে পড়িতেছিল যে সে একদিন ভাবিয়াছিল ইহাদের জাগাইবে, ইহাদের সমবেত শক্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া যাহারা যুগান্তের অত্যাচার, ঘৃণা ও স্পর্দ্ধার উপর আসন মেলিয়া আজ এত উপরে উঠিয়াছে, তাহাদের টানিয়া আনিয়া ধূলায় লুটাইয়া দিবে। কিন্তু ভদ্রলোকের অত্যাচারের মূলে তবু যাহোক একটা বিশ্বাস আছে, কিন্তু আপনার জন এরা, এদের মনও কি ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সারারাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। এক একবার মনে হইল যেন জ্বর আসিয়াছে। দু-একবার বাতি জ্বালাইয়া বাইবেল পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো শান্তি মনে আসিল না, শেষ রাত্রিতে এক একবার একটু তন্দ্রা আসিল। জাগিয়া দেখে ভোর হইয়াছে। বাহিরের

প্রভাতের বায়ুর স্পর্শ যেন স্বপ্নলব্ধ কাজলের চুম্বনের মত স্নিগ্ধ। দেহমন জুড়াইয়া গেল। সহসা মনে হইল সে খ্রীষ্টকে জীবনে পায় নাই, তাহার কারণ খ্রীষ্টকে সে চাহে নাই। চাহিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, অত্যাচার হইতে মুক্তি। কাজলকে সে যে রাত্রির আঁধারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সেই কাজল ত সকাল সন্ধ্যা তাহার বুকের মধ্যে। আর যিনি চিরদিন সাথে রহিয়াছেন, এ আশ্বাস দিতে পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট, তিনিই দূরে রহিবেন—ইহার কারণ তাহার নিজের ব্যাকুলতার অভাব ছাড়া আর কিছু হইতে পারে?

সেদিন অপরাহ্নে শঙ্কর নীলগঞ্জে গিয়া একখানি ছোট নৌকা কিনিল। একজনে চালাইতে পারে। সেটা নিজেদের ঘাটে বাহিয়া আনিয়া যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি। নিজের উপযোগী বিছানা ও তৈজসপত্র কিছু নৌকাতে সেই রাত্রিতেই উঠাইয়া রাখিল। পরদিন ভোরে বাড়ীতে তালা দিয়া চাবি লইয়া সেই বৃদ্ধার কাছে আবার গেল।

বৃদ্ধা উঠানে গোবরের ছড়া দিতেছিল। শঙ্কর কহিল—'এই যে মাসী, তোমারও যে খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। আমি কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। বাড়ীর চাবিটা তোমার কাছে রইল। কিছু ভয় করো না, এবার দেখো আর কেউ কিছু তোমাকে বলবে না।'

বৃদ্ধা চাবি লইল, বলিল—'কোথায় যাচ্ছ?' শঙ্কর হাসিয়া কহিল—'জানি না।' 'কবে আসবে?' 'তাও জানি না।'

তারপর 'এবার আসি মাসী'—বলিয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া শঙ্কর ঘাটে আসিল। সেখানে গাড়ু হাতে দুইটী পাড়ার বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল, শঙ্করকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

বাতাস ছিল। শঙ্কর ছোট একখানি রঙীন পালও কিনিয়াছিল। তাহাই খাটাইয়া দিল। নৌকা ছুটিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ দুটী মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। তারপর শুনিল শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছি—

'ও মন তোর ভাবনা কি?
খ্রীষ্ট তোর রথের সারথি'।

এবার একজন আর একজনকে কহিল—'বলেই ত ছিলাম, মৃত্যুঞ্জয় মিথ্যা বলবার লোক নয়।'

৺রাখালচন্দ্র সেন

ফাশিস্‌মো

১

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে-দুইটি মাত্র স্বাধীন রাজ্য এখনও আত্মরক্ষা করছে তার মধ্যে অন্যতম—ইথিওপিয়া অথবা আবিসীনিয়া আজ বিশেষ বিপন্ন। ফাসিষ্ট্ ইটালির সাম্রাজ্য-বিস্তারের জালে আবিসীনিয়া সম্প্রতি জড়িয়ে পড়েছে—পূর্ব্ব আফ্রিকার এই কোণে খণ্ডযুদ্ধ বোধ হয় এখন অনিবার্য্য, এবং ইটালির সামরিক সজ্জা ও শক্তি যে ইথিওপিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ তারও সন্দেহ নেই। অসহায় আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি নানা-দিকে প্রকাশ পাচ্ছে; বিশেষতঃ প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে এই মনোভাব নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। এই উপলক্ষে সম্প্রতি আমাদের দেশে মুসোলীনি-প্রীতি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বহুদেববাদ আমাদের মজ্জাগত—তাই একই নিঃশ্বাসে মুসোলীনি, হিট্‌লার, লেনিন্, ষ্টালিন্, কামালপাশা, রেজা খাঁ, সুন্-ইয়াৎ-সেন্, মহাত্মা গান্ধী সকলকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে যে-বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবেই ব্যক্তিবিশেষের স্থান প্রধানতঃ নির্দ্ধারিত হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি উদাসীনই থাকি। আবিসীনিয়ার ব্যাপারে ইটালির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে ফাশিস্‌মো বা ফাসিজ্‌ম্-এর নিগূঢ় সম্বন্ধ ও অঙ্গাঙ্গি যোগ বিদ্যমান রয়েছে একথা ফাসিষ্ট্ চিন্তা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার পরিচয় আছে সেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে।

ফাসিষ্ট্ প্রভাব শুধু ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কটেরও একটি প্রধান কারণ ফাসিষ্ট্ রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি। যে-তিনটি মহাশক্তির আচরণে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা

সম্প্রতি অনেক বেড়েছে, তার মধ্যে ইটালি ফাশিস্‌মোর জন্মভূমি, জার্ম্মানির নাৎসিদলকে ফাসিষ্ট্‌ পর্য্যায়েই গণ্য করা হয়, এমন কি জাপানের শাসকদেরও ফাসিষ্ট্‌ ভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। অবশ্য এই তিনটি জাতিই নিজেদের বঞ্চিত মনে করে; আধুনিক জগতে কর্ত্তৃত্বের যে-ব্যবস্থা ও ঐশ্বর্য্য ভাগ-দখলের যে-বন্দোবস্ত রয়েছে এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড কিম্বা ফ্রান্সের তাতে আপত্তির কোন কারণই নেই। কিন্তু জাপান, জার্ম্মানি ও ইটালি তা' নিয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যায় ব্যবস্থা কিম্বা অসহ্য দুরবস্থা এই রাষ্ট্রত্রয়ের আস্ফালনের একমাত্র কারণ নয়। পৃথিবীতে বঞ্চিত জাতির অভাব নেই, তাদের অধিকাংশই শান্তভাবে জীবন যাপন করে। মহাশক্তিদের মধ্যেও মহাযুদ্ধের পর রাশিয়াকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল অথচ আভ্যন্তরিক সংগঠনে মনোনিবেশই সোভিয়েট্‌-রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বলে' মেনে নিয়েছে। লোকসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি জাপান, জার্ম্মানি ও ইটালির রাজ্যবিস্তার-প্রচেষ্টার কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা হয় কিন্তু একদেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলে অন্য দেশবাসী-দের তার ভার বহন করতে হবে এ যুক্তিও নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। প্রাক্‌-ফাসিষ্ট্‌ যুগের জার্ম্মানিও ভের্সাইএর ব্যবস্থার শত প্রতিবাদ-সত্ত্বেও সন্ধি ভঙ্গ কিম্বা যুদ্ধের আয়োজন করে নি। আসল কথা, অস্ত্রশক্তির উপাসনা ফাশিস্‌মো গৌরবকর ও মঙ্গলজনক বলে'ই সর্ব্বদা প্রচার ক'রে এসেছে এবং বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে ফ্যাসিষ্ট্‌ রাষ্ট্রগুলিই সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমস্যাকে জটিলতর করে তুলছে।

উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা কিম্বা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সামরিক মনোভাব কিন্তু ফাশিস্‌মোর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; ফাসিজ্‌মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব থেকে ইতিহাসে এদের দেখা পাওয়া যায়। ফাসিষ্ট্‌ মত-বাদের আসল বিশেষত্ব খুঁজতে গেলে রাষ্ট্রের নূতন স্বরূপ কল্পনা এবং সমাজের আর্থিক সমস্যা সমাধানের নবপ্রচেষ্টার কথাই প্রথমে বিচার করা উচিত। ইয়োরোপ এমন কি সমস্ত জগতের আধুনিক ইতিহাস

ফরাসী-বিপ্লব ও পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতির বিশাল পরিবর্ত্তনের সময় থেকে আরম্ভ করা হয়। গত দেড়শ' বছরের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দু'টি চিন্তাস্রোতের পরিচয় পাই। তার মধ্যে একটির আরম্ভ অষ্টাদশ শতকের উদারনীতিতে এবং তার পরিণতি বর্ত্তমান গণতন্ত্রের আদর্শে। অন্যটিকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা সমাজতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়; তার মধ্যে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে—সেগুলি সোশ্যাল ডিমোক্রাসি এবং সাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ এই দুই পৃথক মতবাদে ভাগ করা চলে। উদারনীতি ও গণতন্ত্র, সোশ্যাল ডিমোক্রাসি ও সাম্যবাদ আধুনিক ইতিহাসের এই বিশেষ চিন্তার ধারাগুলি আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত পুরাতন। এদের তুলনায় ফাশিস্‌মো অত্যাধুনিক—এর বয়স পনের বছরের বেশী নয়। ফাসিষ্ট্‌দের প্রধান দাবী এই যে তাদের নূতন আন্দোলন ও নববিধান ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস, প্রটেষ্টাণ্ট্‌ ধর্ম্মসংস্কার, ফরাসীবিপ্লব ইত্যাদির সমতুল্য স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে ফাশিস্‌মোর আবির্ভাবকে দেখতে হবে—ফাসিষ্ট্‌দের এই দৃঢ় বিশ্বাস। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে ইতিহাসের নূতন যুগ নাকি আরম্ভ হচ্ছে—বিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতকের পুরাতন ধারণাগুলিকে বর্জ্জন করে' নূতন আদর্শে গড়ে উঠবে, ফাসিষ্ট্‌ মতবাদের এই হ'ল গোড়ার কথা।

থিওরি হিসাবে ফাশিস্‌মোর কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমেই একটু বিপদ আসে—গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যেমন সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত, ফাসিষ্ট মতবাদে তার অনুরূপ শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। এর কারণ বলা হয় যে ফাসিজ্‌ম্‌ কর্ম্মপ্রধান, সুসম্বদ্ধ থিওরি গঠন তার লক্ষ্য বা কাজ নয়। আর একটি কথাও স্মরণযোগ্য—জাতীয় ভাবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ফাসিষ্ট্‌ আন্দোলন নির্ভর করে বলে' তাদের পার্থক্য বেশী চোখে পড়ে; ইটালির বেলা যে কথা প্রযোজ্য জার্ম্মানির সম্বন্ধে তার সমস্তটা না খাটতে পারে। তবুও ফাশিস্‌মোর সকল দেশেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং মতবাদ হিসাবে তার

বর্ণনা অসম্ভব নয়। ইটালীয় দার্শনিক জেন্টিলে ফাশিস্‌মোর বিবরণ দিয়েছেন, তিন বছর আগে মুসোলীনি পর্য্যন্ত ইটালির এক বিশ্বকোষে এর মূল ধারণাগুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। জার্ম্মানিতে হিট্‌লার তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভ্যান ডেয়ার ব্রুক্, ষ্টাপেল্, রোজেনব্যর্গ প্রমুখ নাৎসি প্রচারকদের লেখারও কোন অসদ্ভাব নেই। এইভাবে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে ফাশিস্‌মোর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে, আবান্তর নানান কথা বাদ দিয়ে তাদের দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

২

ঐতিহাসিক পরম্পরার দিক থেকে দেখতে গেলে ফাশিস্‌মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ। মুসোলীনি অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সোশ্যালিষ্ট্ হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন এবং ইটালীর ফাসিষ্টেরা পুনর্গঠিত শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করবার পর রাষ্ট্রের নূতন ব্যবস্থাবিধিতে তাদের স্থান অস্বীকার করে নি। এ কথাও সত্য যে হিট্‌লার নিজের দলকে ন্যাশনাল্ সোশ্যালিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন এবং নাৎসিদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজমের শত্রু মনে করে। কিন্তু ফাসিজম্ যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী এ বিশ্বাস বর্জ্জন করবার কোন বৈধ কারণ নেই।

ইটালি ও জার্ম্মানি উভয় দেশেই সোশ্যালিজম্ প্রচারের পথ রুদ্ধ করাই ফাসিষ্ট আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সে কাজে অন্ততঃ সাময়িক সাফল্য লাভই এখন পর্য্যন্ত ফাসিজমের প্রধান কৃতিত্ব বলে' গণ্য হচ্ছে। দুই দেশেই সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ও তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন ফাসিষ্ট ইতিহাসের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। জাপানে সোশ্যালিজম্ ও শ্রমিক-আন্দোলনকে পদদলিত করাই ফাসিষ্ট-ভাবাপন্ন শাসকদের লক্ষ্য—জাতীয়তার মূলমন্ত্র জাপানে এজন্যই প্রচণ্ডভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যত্র যে যে দেশেই ফাসিষ্ট আন্দোলন মাথা তুলেছে সর্ব্বত্রই এই একই উদ্দেশ্য দল গঠনের ভিত্তি হয়ে

দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্টুগাল, অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি সকল দেশের ফাসিষ্টদের সমস্ত বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রধান মিল এইখানে।

শুধু আচরণেই এই সোশ্যালিষ্ট-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এও নয়—বিশ্বাস ও মতগত পার্থক্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। মার্ক্সবাদের গোড়ার ধারণাগুলি ফাসিষ্টেরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। মার্ক্সের মতে প্রলেটেরিয়াট্ বা মজুর শ্রেণীই ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের মূল উপাদান—সুতরাং সামাজিক প্রগতি এ যুগে সেই শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের উপরেই নির্ভর করবে। ফাশিস্‌মো এ বিশ্বাসকে পরিহার করেছে—ফাসিষ্টেরা কার্য্যতঃ নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে। মার্ক্সের প্রধান কথা ছিল এই যে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং শ্রেণীগত স্বার্থের সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী; এই সঙ্ঘাতের ফলে শ্রেণীভেদ লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রেণীসঙ্ঘর্ষই এই ইতিহাসের মূলসূত্র হ'তে বাধ্য। ফাশিস্‌মোর বক্তব্য এর বিরোধী—জাতীয় ঐক্যই আদর্শ ও আসল সত্য, এই জাতিগত স্বার্থের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ লোপ পেয়ে সামঞ্জস্যের রূপ গ্রহণ করে। মার্ক্স ইতিহাসকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা বলা হয়; এতে আর্থিক ব্যবস্থা ও যে শ্রেণীগত পার্থক্য তার উপর নির্ভর করছে তাই ইতিহাসের মূলসূত্র বলে' কল্পিত হয়েছে। ইতিহাসের এই আর্থিক ভিত্তিকে ফাশিস্‌মো প্রমাদ বলে' গণ্য করে। ফাসিষ্ট মতে জাতিই (রেস্ বা নেশন্) হচ্ছে ইতিহাসের প্রধান উপাদান। জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির স্থান আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার চেয়ে ঢের উঁচুতে এবং রাষ্ট্র বা ষ্টেট শ্রেণী বিশেষের আধিপত্যের যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের একটা নৈতিক স্বরূপ এবং বিশিষ্ট সত্তা আছে। বস্তুতঃ মার্ক্সের সকল মতামতের ভিত্তি ডায়ালেক্‌টিক্ জড়বাদের মধ্যে। এই দার্শনিক মত ফাসিজ্‌ম সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে—নানা জাতীয় আদর্শবাদ বা ভাববাদই ফাশিস্‌মোর অবলম্বন।

এখানে অবশ্য কথা উঠতে পারে যে ফাসিষ্টেরা নিশ্চয়ই মার্ক্সবাদের

পরিপন্থী, কিন্তু সোশ্যাল্ ডিমোক্রাসির নিরীহতর মতামতের সঙ্গে তাদের বিরোধ কোথায়? ফাশিস্‌মোর সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্রাসিরও মিলন কিন্তু সম্ভবপর নয়। মতবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাম্যপন্থার মতন সোশ্যাল্ ডেমোক্রাটদেরও আদর্শ হচ্ছে উৎপাদন-পদ্ধতির সকল উপাদানেই সর্ব্বসাধারণের স্বত্বাধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে কিন্তু ফাশিস্‌মোর অবিচলিত আস্থা আছে। তাই সমাজতন্ত্রের সকল শাখার যেখানে মূলগত ঐক্য, সমাজের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় সেই সাধারণ স্বত্বের আদর্শের বেলাতেই ফাশিস্‌মোর সঙ্গে এ সমস্ত মতামতের দুস্তর পার্থক্য। কর্ম্মক্ষেত্রেও সোশ্যাল্ ডিমোক্রাসির ফাসিষ্ট আমলে কোন স্থান নেই। স্বতন্ত্র শ্রমিকদল গঠন, স্বাধীন শ্রমিক সঙ্ঘগুলির অস্তিত্ব, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথাকে আক্রমণ, এর মধ্যে কোনটিই ফাসিষ্টদের মনোমত হতে পারে না। মার্ক্সপন্থীরাই ফাশিস্‌মোর ঘৃণিত শত্রু হ'লেও আদর্শনিষ্ট সোশ্যাল্ ডেমোক্রাটদেরও ফাসিষ্টদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। ফাসিজম্ সকল প্রকার সোশ্যালিজমেরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

৩

ফাসিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে সাম্যবাদীদের আচরণে যে সামান্য সদৃশ্যটুকু লক্ষ্য করা যায় তা' নিতান্ত বাহ্যিক। বিপ্লবে বিশ্বাস, নূতন ধরণের বিরাট দল সংগঠন, বিপ্লবের পর একনায়কত্ব স্থাপন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে ফাশিস্‌মো ও সাম্যতন্ত্রের মিল দেখা যায় বটে কিন্তু সে মিল মোটেই গভীর নয়। উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসের বেলায় এই দুই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরস্পরের বিশেষত্ব বজায় রেখে সোশ্যালিষ্ট ও ফাসিষ্টের মধ্যে মিলন সম্ভব নয়।

কিন্তু গত দেড়শ' বছরের ইতিবৃত্তে প্রধান স্থান নিয়েছে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের প্রসার; আধুনিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে গেলে এদের তুলনায় সোশ্যালিজমের প্রভাব নিশ্চয়ই সামান্য। ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি ও ডিমোক্রাসির

প্রতিষ্ঠাই যুগধর্ম্ম বলে' গণ্য হয়েছে। ডেমোক্রাটিক্ মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শকে গ্রহণ করে নি কিন্তু প্রায় সকল দেশেই বর্ত্তমান শতাব্দীর সূচনায় গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও বোধ হয় তার প্রভাব অন্য সকল মতবাদের থেকে প্রবলতর। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক মনোভাব অস্বীকার করা ফাশিস্‌মোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'লেও এ বিশ্বাসে বিশেষ নূতনত্ব নেই।

গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতিবাদ ও উদারনীতি পরিহার ফাশিস্‌মোর দ্বিতীয় বিশেষত্ব এবং সেই বৈশিষ্ট্য প্রথমটির তুলনায় অপ্রধান হ'লেও রাষ্ট্র ও সমাজের নূতন পরিকল্পনা হিসাবে এর একটা বিশেষ দাবী আছে। ফাসিষ্টেরা যখন নবযুগ প্রবর্ত্তনার কথা বলে তখন তারা গণতন্ত্রের অবসানের উপর খুব জোর দেয়। ফরাসীবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবী যে-পথে চলেছে তার শেষ নাকি ভ্রান্তি ও ধ্বংসের বিভীষিকায়; তার প্রকোপ থেকে ফাশিস্‌মো মানুষকে উদ্ধার করবার ব্রত নিয়েছে। বিংশ শতকে সোশ্যালিজমের মতন গণতন্ত্রও পরিত্যাজ্য এ কথা ঘোষণা করতে ফাসিষ্টদের ক্লান্তি নেই।

গণতান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করবার উদাহরণ ফাসিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমাগতই পাওয়া যায়। সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন এবং শাসনযন্ত্র অধিকারের পর বিরোধীদলের স্বাধীনতাহরণ ফাসিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ, সুতরাং নিয়মতন্ত্রের শত্রু হিসাবেই ফাসিষ্টদের গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রেও শুধু আচরণ নয়, মতবাদ ও বিশ্বাসেও ফাশিস্‌মো গণতন্ত্র ও উদারনীতির থেকে স্বতন্ত্র। অল্প বিশ্লেষণেই একথা প্রতিপন্ন করা সম্ভব।

সংখ্যাধিক্যের কর্ত্তৃত্বের অধিকারই গণতন্ত্রের প্রধান কথা। জনসমষ্টির সাধারণ ইচ্ছাকে রুসো ন্যায্যতঃ সমাজের শাসকশক্তি হিসাবে স্বীকার করেছিলেন, সেই সাধারণ ইচ্ছা নির্দ্ধারণ করবার বৈধ উপায় অবশ্য সংখ্যাধিক্যের মত গ্রহণ। এই মূলসূত্র নির্ভর করছে এ বিশ্বাসের উপর যে সকল মানুষেরই রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান এবং বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সেই অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকার করাই প্রগতির পথ।

এই ধারণাগুলিকে ফাশিস্‌মো যে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ফাসিষ্ট মতানুসারে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রীক অধিকার এবং সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্যশাসন অন্যায় ও অমঙ্গলজনক, তাতে জাতি বা সমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর দেশের প্রকৃত ইষ্টসাধনের জায়গা নেয় নানাবিধ স্বার্থের অনুসন্ধান ও সঙ্ঘাত। এইভাবে শ্রেণী বা ব্যষ্টির বিরোধের ফলে সমষ্টির প্রভূত অমঙ্গল সাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব গণতন্ত্রের মূলসূত্রই ভ্রান্ত, তাকে বর্জ্জন করাই উচিত।

জনমতের প্রতিনিধি হিসাবে কোন পরিষদের শাসনব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব এইজন্য ফাসিষ্টেরা স্বীকার করে না। পার্লামেণ্ট-জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয় অক্ষম, নয় অনর্থের হেতু; দেশের শাসনভার তার উপর ন্যস্ত করা মূর্খতার পরিচয় ভিন্ন কিছু নয়। অবশ্য মুসোলীনি ইটালির পার্লামেণ্টকে সংস্কার করলেও তার উচ্ছেদ-সাধন করেন নি; আর হিট্‌লার মাঝে মাঝে জার্ম্মান জনগণকে ভোটের সাহায্যে তাঁর প্রতি আস্থা প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সংখ্যাধিক্যের প্রভুত্বের অধিকার কিম্বা রাজ্যশাসনে প্রতিনিধিসভার কর্তৃত্ব এর কোনটিই ফাশিস্‌মোর অঙ্গ নয়। জনমতের প্রতিভূ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শাসকদের দায়িত্ব স্বীকার কিম্বা জবাবদিহি দেবার কোন প্রয়োজনও ফাসিষ্ট মত গ্রহণ করে না—অবশ্য যখন শাসকেরা ফাসিষ্টদলের অন্তর্গত হ'ন তখনই এ স্বাধীনতার কথা ওঠে।

যে-উদারনীতি ইংল্যাণ্ড ও এমেরিকায় গড়ে উঠেছে তার মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী। এই মতানুসারে সকল লোকেরই কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে—স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা এ-জাতীয় অধিকারের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারগুলিকে ফাশিস্‌মো কিন্তু স্বীকার করে না। ফাসিষ্ট মতে সমাজকে সমষ্টিরূপে কল্পনা করা হয়;—সমাজ ও সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের মঙ্গল তাই শুধু কথার কথা নয়, সেই মঙ্গল সাধনের অন্তরায় হ'লে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করাই উচিত। এইভাবে উদারনীতির মূলবিশ্বাসগুলিও ফাশিস্‌মো কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে।

ফাসিষ্টেরা অনেক সময় বলে যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক জাতীয় বিশ্বাসেরই প্রকারান্তর। উভয়েই ব্যক্তিত্ববাদের প্রকাশ, সমাজের পৃথক অস্তিত্ব ও প্রাণকে অস্বীকার করে' উভয় মতই তাকে শুধু ভিন্ন ভিন্ন লোকের একত্রে অবস্থান হিসাবে দেখেছে। এমন কি সাম্যবাদও শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার স্বীকারে পর্য্যবসিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের পরিকল্পনা ফাশিস্‌মো নূতন ভাবে করতে চেয়েছে। মুস্কিল হয় শুধু এইখানে যে সংখ্যাধিক্যের মত এবং শ্রেণীস্বার্থের ধারণা ছেড়ে দিলে সমাজের মঙ্গল ও সমষ্টির কল্যাণ নির্দ্ধারণের উপায় কি থাকে? এ প্রশ্নের শুধু একমাত্র উত্তর ফাশিস্‌মোর পক্ষে সম্ভব—সে উত্তর, ফাসিষ্ট ইচ্ছার কাছে সকলের আত্মসমর্পণ।

৪

উদারনীতি, গণতন্ত্র, সোশ্যাল ডিমোক্রাসি, সাম্যবাদ এ সমস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ কি এই যে ফাশিস্‌মো যন্ত্রযুগ ও ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাতে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? গত দেড়শ' বছরে যে-সমস্ত ধারণা ক্রমে ক্রমে জয়যুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ত' সকল সময়েই শোনা গেছে—ফাসিজম্ কি শুধু সেই প্রাচীন প্রতিকূলতার পুনরাবৃত্তি? ফাসিষ্টেরা এ-কথা স্বীকার করে না—তাদের মত এ-আন্দোলনে নূতন উদ্যম, এর মধ্যে নবজীবনের প্রেরণা রয়েছে। ফাশিস্‌মো পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনা নয়, প্রগতির রথে সময়োপযোগী নবযুগের সূত্রপাত এর লক্ষ্য।

ফাসিষ্ট মতবাদ এইজন্যে সযত্নে পুরাতন যুগের ধারণাগুলির থেকে নিজের পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসীবিপ্লবের আগে ইয়োরোপে প্রায় সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখনকার রাজারা ভগবৎদত্ত অধিকারে রাজ্যশাসন করবার দাবী করতেন। এ-অধিকার ফাশিস্‌মো স্বীকার করে না, রাজতন্ত্রের দিকেও তার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। ইটালিতে রাজসিংহাসন রক্ষার কারণ রাজতন্ত্রে বিশ্বাস নয়—সাময়িক সুবিধা ও ইটালির বিশেষ অবস্থাই

মুসোলীনির এ-নির্দ্ধারণের মূলে রয়েছে। অবস্থার বিপর্য্যয়ে নাৎসিরাও কাইজারবংশকে সিংহাসনে ফিরিয়ে আনতে পারে কিন্তু সেকালের সে-রাজভক্তি ও রাজতন্ত্রে বিশ্বাস অন্ততঃ হিটলারের অনুচরদের বিশেষত্ব নয়। রাজতন্ত্র ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য সেকালের সমাজে উল্লেখযোগ্য ছিল—উত্তরাধিকারসূত্রে আভিজাত্যপ্রথা। দেশের শীর্ষস্থান তখন অধিকার করত। ফাসিষ্ট মতবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী হ'লেও এ-জাতীয় পুরাতন অভিজাত্যে তার বিশেষ আস্থা নেই। অভিজাতশ্রেণীর পুরাতন মর্য্যাদা এবং সেকালের ফিউডাল্ বিধিব্যবস্থা ও দাবীগুলির সমর্থন ফাশিস্‌মোর মধ্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত ; মধ্যযুগে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-গুলির যে-আধিপত্য ছিল, ফাসিষ্টেরা তারও পুনরুত্থানের বিরোধী। ফাশিস্‌মো ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য ফাসিষ্টদের চিহ্ন নয় ; কিন্তু চার্চ্চের প্রভুত্ব ও স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার তাদের মনঃপূত হতে পারে না। ফাসিজমের প্রকৃত ধর্ম্ম ফাশিষ্ট ষ্টেট্ পূজা। রাষ্ট্রের একটা নৈতিক রূপ ও স্বতন্ত্র জীবন আছে, ধর্ম্ম ও নীতিতে বিশ্বাস ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, জাতির জীবনে জাতির একটা বিশেষ ধর্ম্ম ও তদুপযোগী ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন—ফাসিষ্ট মতামত এসব বিশ্বাসের সমর্থক। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিম্বা কোন প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান ফাসিষ্টদের কাম্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। ইটালিতে ক্যাথলিক্ ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবন থাকতে পারে না কিন্তু ফাসিষ্ট রাষ্ট্রশক্তি রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের উপর বিশেষ আস্থাবান বা নির্ভরশীল নয়। জার্ম্মানিতে নানাভাবে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাৎসিদলের করায়ত্ত করার চেষ্টা চলেছে। ফাশিস্‌মোর থিওরি অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে বিরাজিত হবে—অতএব সেখানে পূর্ব্বকালের চার্চ্চপ্রতিপত্তির স্থান কোথায় ?

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে যে রোমান্টিক ভাবুক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ দার্শনিকদের উদয় হয়েছিল, তাদের মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণ এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-বিরোধের সঙ্গে ফাসিষ্ট মতবাদের

সুতরাং পার্থক্য আছে। উনবিংশ শতকের কোন কোন লেখককে ফাসিজমের অগ্রদূত বলে অভিনন্দন করা হয় বটে—কিন্তু ফাসিষ্ট আন্দোলন বর্ত্তমান যুগের বিশেষ অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, তার আসল লক্ষ্য মধ্যযুগে প্রত্যাবর্ত্তন নয়, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা। ধনতন্ত্রের উদয় ও বিকাশের যুগে ডিমোক্রাসিতে অশেষ সুবিধা ছিল—এখন সমাজতন্ত্রাভিমুখী বিপ্লবের হাত থেকে ধনিক কর্ত্তৃত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা অনেক দেশে ফাশিস্‌মো নামক অভিনব মতবাদের সৃষ্টি করেছে। একমাত্র জাপানের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে ফাশিস্‌মোর কয়েকটি বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগোপযোগী ধারণার অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়।

৫

ফাশিস্‌মোর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে—সকল প্রকার সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ, গণতন্ত্র ও উদার নীতি বর্জ্জন এবং মধ্যযুগের ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের থেকে এর পার্থক্য। এ-বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটি শুধু অন্য মতবাদের থেকে ফাসিজমের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ফাসিষ্টদের আরও কয়েকটি বিশ্বাবসর উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই ফাসিষ্টদের নেতৃত্বের ধারণার কথা মনে পড়ে। মানুষে সকলে সমান না, সকলের সমানাধিকার কিছু বাঞ্ছনীয় নয়, সংখ্যাধিক্যের আধিপত্য অমঙ্গলের আকর। জাতি ও দেশের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। নেতার আবির্ভাব হ'লে সকলের কর্ত্তব্য তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ। এইজন্য জার্ম্মানিতে হিটলারের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত হয়েছে, এইজন্যই ইটালিতে উচ্চৈঃস্বরে বলা হচ্ছে—মুসোলীনির ভুল কখনও হতে পারে না।

কিন্তু জাতির নেতা সম্পূর্ণ একক নন—তিনি বিশ্বাসীদের প্রতিভূ মাত্র, তাঁর পশ্চাতে সুসম্বদ্ধ পার্টি বা দল বিরাজ করছে। ফাশিস্‌মোর প্রধান অবলম্বন আসলে এই দল—নেতা শুধু এর মুখপাত্র ও অধ্যক্ষ।

ফাসিষ্টদের দলসংগঠন তাদের আধুনিকত্বের পরিচায়ক, এ-ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি সাম্যবাদীদের অনুকরণ বলেই সন্দেহ হয়। আধুনিক কালের এ-জাতীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ গণতান্ত্রিক দেশের দলগুলি যে নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। মুসোলীনি কিম্বা হিটলারের ব্যক্তিত্বই যে ইটালি বা জার্ম্মানির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অন্ততঃ হিটলার যে অনেক সময় নেতা হয়েও ক্রীড়নক মাত্র তা' মনে করা অযৌক্তিক নয়।

নেতা ও দলের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে একাধিপত্য স্থাপন ফাশিস্‌মোর উদ্দেশ্য। এই একনায়কত্ব জাতির ঐক্য ও মঙ্গল সাধনের জন্য। সাম্যবাদীদের অধিনায়কত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে ফাসিষ্ট ব্যবস্থা সাময়িক নয়, এ প্রথা শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে পৌছবার সহায় না—এই হল চিরকালের আদর্শ ও সর্ব্বোত্তম বিধি। ফাসিষ্টেরা তাই ভবিষ্যৎ সামাজিক ব্যবস্থা কল্পনার মধ্যেও গণতন্ত্রের ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নির্দ্দেশ করে না। ফাসিষ্ট রাষ্ট্র totalitarian বা সমগ্রগ্রাসী—তার এই বিশেষত্ব শুধু সাময়িক না, ফাশিস্‌মোর আদর্শে এ চিহ্ন চিরকালের জন্য। কিন্তু তাই বলে দেশের শাসনযন্ত্রে যে লোক-মত প্রকাশের কোন উপায় একেবারেই থাকবে না তা' নয়। জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকার অস্বীকৃত হ'লেও তাদের সহযোগিতা আবশ্যক। বিশেষতঃ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পদানত রাখা সম্ভব না। শ্রেণীগত পার্থক্য ও স্বার্থের সঙ্ঘাতও ফাসিষ্ট মতবাদে একেবারে অগ্রাহ্য হয় নি। এই সব নানা কারণে ইটালিতে নূতন ভাবে রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা চলেছে। শ্রমিক ও ধনিকদের পৃথক পৃথক সঙ্ঘ গঠিত হচ্ছে—তাদের সহযোগিতায় দেশের সকল ব্যবসা পরিচালিত হবার কথা। তবে বিরোধ উপস্থিত হ'লে ষ্টেটের মধ্যস্থতা অবশ্যই মানতে হবে; রাষ্ট্রশক্তি যে সে ক্ষেত্রে কোন দিক নেবে তা' অনুমান করা শক্ত নয় কিন্তু ফাসিষ্টেরা বলে যে রাষ্ট্র ও তার কর্ম্মচারীরা শ্রেণী-স্বার্থের উপরে উঠতে পারে। দেশের শাসনযন্ত্রও অসাক্ষাৎ ভাবে

এই সঙ্ঘগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর খানিকটা নির্ভর করবে। এইরূপ নূতন ব্যবস্থাকে Corporative state আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে' ধনিক কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব বা ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার হ্রাসের কোন সম্ভাবনাই নেই।

নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন আদর্শে দল গঠন, সমগ্রগ্রাসী একাধিপত্য এবং শাসনযন্ত্রসংস্কার—এ-সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হ'ল জাতির ঐক্য-বোধ বিস্তার ও মঙ্গল সাধন। দেশ বা জাতির মঙ্গল কিসে সে-কথা নির্দ্ধারণের ভার অবশ্য ফাসিষ্ট্ সম্প্রদায়ের উপর—তা' নিয়ে বাদানু-বাদের স্বাধীনতা এখানে নেই। জনসাধারণের মধ্যে এ-বিশ্বাস সংক্রামিত-করতে হবে যে নেতা ও দল এবং তাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী রাষ্ট্র-শক্তি জাতির মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই করছে না। এ বিশ্বাস প্রচারের উপায় ফাশিস্‌মোর প্রসার ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতীয়তা-বোধকে এত প্রবল করতে হবে যে সে-ঐক্যের পরিপন্থী সমস্ত কিছুকেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। পরিপূর্ণ অকুণ্ঠ অন্ধ ন্যাশনালিজম্ তাই ফাসিষ্টদের কাম্য—এর প্রতাপ যত বেশী হবে ততই জনসাধারণের মধ্যে ফাসিষ্ট কর্ত্তৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেশী। জাতীয় ভাবের এই রূপ আজ জাপানে এত প্রকট বলে'ই জাপান ফাশিস্‌মোর এত নিকটে এসে পড়েছে।

জাতীয়তাবোধের পুষ্টিসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য আসলে আভ্যন্তরিক শ্রমিক-অসন্তোষের হ্রাস। ফাসিষ্ট মতে শ্রেণীবিদ্বেষ জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় মাত্র অথচ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ ভাবে পদদলিত করাও সম্ভব নয়। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের দুটি উপায় আছে—এক, জাতীয় ঐক্যবোধকে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাতে জনসাধারণ স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ ও অভাব বরণ করে নেবে। যুদ্ধের সময় এ-মনোভাব সর্ব্বত্র দেখা যায়; প্রশ্ন শুধু এই যে এ-উচ্ছ্বাস ক্ষণিক উত্তেজনা থেকে চিরন্তনের পর্য্যায়ে তোলা যায় কি না। দ্বিতীয় উপায়,—ধনতন্ত্রের কোন কোন দিক সংশোধন—যার ফলে শ্রমিক ও নির্ধনদের আস্থা ও আশাভরসা ফিরিয়ে আনা যায়।

এজন্যই ধনিকপ্রবরদের রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীনে আনা, কৃষকদের সাহায্য ও সন্তোষ সাধন, ধ্বংসোন্মুখ নিম্নস্তরস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা-নির্ব্বাহের পথপ্রদর্শন ইত্যাদি প্রচেষ্টার উদ্ভব। দুঃখের কথা এই যে ইটালি ও জার্ম্মানিতে এখনও পর্য্যন্ত এ সদিচ্ছা বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে বলে জানা যায় নি। ইটালিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ গত বার বছরে ঠিক অন্যদেশের মতনই চলেছে; জার্ম্মানিতেও ধনিকশ্রেণীর প্রতিপত্তি বিশেষ কিছু কমেছে বলে' জানা যায় না। ধনরত্ন বজায় রেখে জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করবার এক উপায় অবশ্য রাজ্য বিস্তার—এইজন্য উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্যজয়ের ইচ্ছা ফাশিস্‌মোর এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক ফাসিষ্ট্ রাজ্যের অবশ্য প্রসারের বিশেষ লক্ষ্য ও দিক আছে কিন্তু বিভিন্ন উদ্যমগুলি একই গোলের অন্তর্গত। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এমন শক্তি আছে, এই দেশগুলির সম্বল ও সঞ্চয় এত বেশী যে এখানে রাজ্য-বিস্তারের এখন প্রয়োজন নেই, ফ্যাসিজ্‌ম-ও অনেকখানি অনাবশ্যক। ইটালি, জার্ম্মানি ও জাপানের কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থা এখন এমন যে সেখানে ফাশিস্‌মোর বিশেষ স্থান আছে এবং এ রাজ্যগুলির নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার সর্ব্বদা একটা প্রচণ্ড প্রলোভন রয়েছে। এই ঝোঁককে মুসোলীনি সমর্থন করেন এই বলে যে বর্ত্তমান ব্যবস্থাতে কতকগুলি দেশ বঞ্চিত ও নিগৃহীত হচ্ছে—তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করবার একটা দাবী আছে। তাঁর যুক্তিতে বিপদ এই যে ন্যায় অন্যায় বিচার করার উপায় আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে দুর্লভ, যদি প্রতি জাতি নিজের দাবীর নিজেই বিচার করে, তাহালে মতভেদেরও অবসান হবে না, যুদ্ধবিগ্রহও চিরকাল মানুষের সাথী থেকে যাবে।

এ প্রসঙ্গে ফাসিষ্টেরা বলে' থাকে যে যুদ্ধ সত্য সত্যই চিরন্তন, তাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় মানুষের নেই। শুধু তাই নয়, ফাসিষ্ট্ মতানুসারে এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই—সংগ্রামস্পৃহা মঙ্গলজনক ও উন্নতির সহায়ক। যুদ্ধ ভিন্ন মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি কখনও স্ফূর্ত্তি পায় না—দেশ ও জাতির জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ

বিকাশ। যুদ্ধের প্রতি বিরাগ ব্যক্তির পক্ষে কাপুরুষতা, জাতির পক্ষে বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার চিহ্ন। জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে তাই ফাসিষ্টদের অবজ্ঞার অন্ত নেই এবং সকল দেশেই এই অবজ্ঞা সাধারণতঃ এখন ফাসিষ্ট মনোভাবেরই পরিচায়ক। জাপান ও জার্ম্মানি লীগ্ ত্যাগ করেছে, ইটালিও আজ তাদের অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত। মাঞ্চুরোর বেলায় জাপান ও ভের্সাই-সন্ধি লঙ্ঘনের সময় জার্ম্মানি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অবহেলা ও অমান্য করেছে। ইটালি কর্ফু দ্বীপের ব্যাপারে বহুদিন আগে ও সম্প্রতি আবিসীনিয়ার গোলযোগে সেই একই মনোভাব দেখিয়েছে। অবশ্য যুদ্ধের নৈতিক উপকারই যে শুধু ফাসিষ্টদের মুগ্ধ করে তা নয়। বঞ্চিত মহারাষ্ট্রগুলি নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক; আর যুদ্ধের সম্ভাবনা কিম্বা যুদ্ধ এসে পড়লে জাতীয় ঐক্যের নামে আভ্যন্তরিক বিরোধ চেপে রাখা যে বেশী সহজ হয়ে আসে এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

৬

জাতীয়তাবোধ যখন ফাশিস্‌মোর একটি প্রধান অঙ্গ, তখন বিভিন্ন ফাসিষ্টদের মধ্যে পার্থক্য, এমন কি তাদের স্বার্থের সঙ্ঘাত পর্য্যন্ত কিছু বিচিত্র নয়। তাই অষ্ট্রীয়ায় নাৎসি দলের সঙ্গে অন্য ফাসিষ্টদের সংঘর্ষ হয়, আর ইটালি ও জার্ম্মানি, কি ইটালি ও জাপান পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবও পোষণ করতে পারে। এইজন্যই আবার ইটালির ফাসিষ্ট ও জার্ম্মানির নাৎসি ঠিক সব ব্যাপারে একমত না। এই দুই দেশের আন্দোলন দুইটির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আসলে এদের চিন্তার গভীর মিলই উল্লেখযোগ্য, পার্থক্যগুলি চমকপ্রদ হলেও তাদের ঐতিহাসিক মূল্য কম।

ইটালীয় ফাসিষ্টদের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে প্রধান হ'ল রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্বের গৌরব। মুসোলীনির অনুবর্ত্তী দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতিহাসে ইটালির জন্য নেতার আসন নির্দ্দিষ্ট রয়েছে; পুরাকালে রোমান রাজ্য, মধ্যযুগে

পোপের আধিপত্য, তারপরে রেনেসাঁস্, উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনরুত্থানের পথপ্রদর্শন, বর্ত্তমান শতকে ফাশিস্‌মোর সৃষ্টি—এ সকলই সভ্যতার ইতিহাসে ইটালির দান। সেকালের রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ তাই আজকের ইটালির বাঞ্ছিত পন্থা। সাম্রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা এতে আরো প্রবল হয়েছে। মুসোলীনির আস্ফালন ও সকল দেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এ মনোভাবের হাস্যাস্পদ ফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ফাশিস্‌মো নামটি পর্য্যন্ত প্রাচীন রোমের রাজশক্তির প্রতিভূদণ্ডগুচ্ছ থেকে গৃহীত। পক্ষান্তরে জার্ম্মান নাৎসিদের বিশিষ্ট বিশ্বাস হচ্ছে নর্ডক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। গত শতকে চেম্বারলিন নামক ঐতিহাসিক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে নর্ডিক টিউটন্‌রা নাকি বিধাতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এই নর্ডিকেরাই আসল খাঁটি আর্য্য বলে এখন দাবী করা হচ্ছে। জার্ম্মানেরা তাদের প্রধান বংশধর—এখন জার্ম্মান রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারলেই জার্ম্মানি জগতের মুকুটমণিরূপে শোভা পাবে। রেস্ সম্বন্ধে এ ধারণা নাৎসিরা এখন সোৎসাহে প্রচার করছে। এতে জার্ম্মানির পুরাতন য়িহুদি-বিদ্বেষে ঘৃতাহুতি পড়েছে। য়িহুদিরা জার্ম্মান জাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করে, তাদের নীতি ব্যবহার চরিত্র চিন্তা সমস্তই কলুষিত এ কথা হিটলার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন। তার উপর তারা বিদেশী, আর্থিক জগতে নাকি সব অত্যাচারের তারাই মূল, এমন কি মার্ক্স বাদ তাদেরই গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় মাত্র। য়িহুদি-বিদ্বেষ ছাড়া অন্য ব্যাপারেও নাৎসিদের জাতি সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা প্রকাশ পায়। সকল জার্ম্মানকে এক রাষ্ট্রের মধ্যে আনতে হবে, অতএব হিটলারি আমলে সাগরপারে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে বিস্তার লাভের ইচ্ছাই বেশী, কারণ তাতে বিদেশী জার্ম্মানদের পিতৃভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ধর্ম্মের বেলাও সেই জাতির বৈশিষ্ট্য মাথা তুলছে; ফলে জার্ম্মান ক্রিশ্চান্ বলে খৃষ্টধর্ম্মের এক নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে—তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোন কোন নাৎসি বিশুদ্ধ জার্ম্মান দেবতা হিসাবে ওডিন্, থর ইত্যাদি সেকালের দেব-দেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করতে উদ্যত হয়েছে।

৭

এই জাতিগত বিভিন্নতার ফল সুবিস্তৃত হ'লেও তাদের বাদ দিয়ে ফাশিস্‌মোর মূলসূত্রের ব্যাখ্যাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। ফাসিজ্‌মের আবির্ভাবের কারণ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর—তবু শেষ করবার আগে সে বিষয়ের উল্লেখ করছি।

ফাসিষ্ট্‌দের অভ্যুদয়ের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রতি দেশে সে ইতিবৃত্ত অনেকখানি বিভিন্ন। কিন্তু তার মধ্যে কোন ঐক্য খুঁজতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সে-আন্দোলনের মূল কারণ স্থানে স্থানে সোশ্যালিষ্ট্ আধিপত্য স্থাপনের আশু সম্ভাবনা। ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার প্রয়াস হিসাবেই ফাশিস্‌মোকে এখন ঐতিহাসিকেরা ব্যাখ্যা করছেন। তবে সব দেশে এ আন্দোলনের সাফল্য সমান সম্ভব নয়। যেখানে গণতন্ত্র বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, যে দেশে উদারনীতি জনমতের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে, সেখানে ফাশিস্‌মোর প্রয়োজন না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন যে ফাসিষ্ট্ মতবাদ ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মাত্র। সেইজন্যই নাকি ফাসিষ্টেরা কৃষক ও নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর এত সদয়। অর্থাৎ অল্পলোকের হাতে আর্থিক ক্ষমতা এসে পড়ার যে একটা ঝোঁক ধনতন্ত্রে আছে, ফাশিস্‌মো তাকে বিনাশ করে' পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়। এ কথা বিস্তর শোনা যায় অবশ্য, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইটালি ও জার্ম্মানির আধুনিক অভিজ্ঞতায় এদিকে কোন ফল পাওয়া গেছে বলে' মনে হয় না। অতীত অবস্থাতে ফিরিয়ে আনা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য।

ফাশিস্‌মোর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক কতকগুলি অপরিহার্য্য বিপদ আছে। বিভিন্ন দেশের ফাসিষ্ট্‌দের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ ফাসিষ্টদের আর্থিক কর্ম্মপদ্ধতি দুর্ব্বল—বিশেষ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সঙ্ঘাত দূরীকরণ সহজ কাজ নয়। জনগণের উপর নির্ভর করে ফাসিষ্টদল গঠিত হয় বলে তাদের বহুকাল ধরে হাতে রাখার সমস্যাও সুকঠিন, জন সাধারণকে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব থেকে বরাবরের মতন

বঞ্চিত করাও দুঃসাধ্য। যোগ্য নেতা সকল সময়ে পাওয়া যাবে কিম্বা নানাজাতীয় নানাবিধ লোকের সমষ্টিতে যে দলের গঠন তার একপ্রাণতা যে নষ্ট হবে না একথা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। এই সব কারণেই মনে হয় যে ফাশিস্‌মো আধুনিক সমস্যার চিরন্তন সমাধান নয়, এমন কি সর্ব্বত্রই যে এ-প্রথা গণতন্ত্রের স্থান অধিকার করবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

শ্রীসুশোভন সরকার

শব্দ ও অর্থ

শব্দ ও অর্থের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলে প্রথমেই আশ্চর্য্য লাগে এই যে যে-শব্দ প্রথমে কেবল মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা ক্রমে সেই নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধটী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া কালে প্রায় অর্থ সম্বন্ধে ইচ্ছাগতি হইয়া উঠে। সর্ব্ববিষয়ে মানুষের ধারণা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ভাবাবলীর পারম্পর্য্য ও সম্বন্ধ রক্ষার ভার পড়িয়াছে শব্দের উপর। কারণ অর্থের অনুপাতে শব্দ প্রায় অচল। শব্দের এই আপেক্ষিক জড়তায় মানুষের কিন্তু একটী পরম উপকার সাধিত হইয়াছে—শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাধ্য হইয়া জাগতিক সকল ব্যাপারের শ্রেণীবিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি আসলে তাহার শ্রেণী-বিচারের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই মনে হয় শব্দ ব্যবহার করিতে না শিখিলে মানুষের বুদ্ধি-বিকাশ অন্ততঃ আমাদের পরিচিত পন্থায় হইত না।

শব্দের যে অর্থব্যত্যয় কিছুমাত্র সম্ভব ইহা হইতেই বুঝা যায় যে শব্দ কখনও বক্ষ্যমাণ বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক নহে। বাস্তবিক পক্ষে বক্ষ্যমাণ বস্তু অপেক্ষা বক্তার সহিতই শব্দের সম্বন্ধ নিগূঢ়তর। পূর্ব্ব প্রবন্ধে Croceর প্রদত্ত ভাষার যে সংজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। শব্দদ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের যতটা পরিচয় পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক পরিচয় পাওয়া যায় শব্দের প্রয়োগকর্ত্তা বক্তার;—তাই প্রযোক্তা ভেদে শব্দের ভিন্নার্থদ্যোতকতাও অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে শব্দ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে বক্ষ্যমাণ-বস্তুনিষ্ঠ (objective) হইলে তাহার অর্থব্যত্যয় কখনও সম্ভব হইত না। কারণ সম্পূর্ণরূপে objective হইতে হইলে এক একটী শব্দ এক একটী মাত্র বস্তুর সংজ্ঞায় পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু শব্দের অভিধা সর্ব্বত্রই শ্রেণীবাচক, ব্যষ্টিবাচক নহে

(পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত Bergsonর মত অনুসন্ধেয়)। শব্দের সহিত অনন্তর (immediate) সম্পর্ক বক্তারও নহে, বস্তুরও নহে। বক্তার মনে বক্ষ্যমাণ বস্তু সম্বন্ধে যে Vorstellung (ভাবচ্ছবি) উদ্ভূত হইয়াছে কেবল তাহারই সহিত শব্দের অনন্তর সম্পর্ক। সর্ব্বত্রই অর্থব্যত্যয়ের মূলে এই ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবচ্ছবি বা Vorstellung। মানব মনে কোন বিষয় সম্বন্ধে Vorstellung কতকগুলি পরিমিত সংখ্যক সমজাতীয় বস্তুর প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতিরেকে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু এই Vorstellung মানবচিত্তে একবার অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে তাহা উত্তরোত্তর বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া অধিকতর মাত্রায় স্বস্থ ও স্বাধীন হইয়া উঠিবে। এই অবস্থায় শব্দার্থ এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে স্থানান্তরিত হইতে পারে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে সেতুস্বরূপ এই Vorstellungএর কথা বিস্মৃত হইয়া Wundt (Sprache, vol. II, p. 445) বলিয়াছেন যে শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হয়।* Guentert (Grundfragen der Sprachwissenschaft p. 68) এসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার মতে শব্দ সর্ব্বত্রই মানুষের মননশক্ত্যুদ্দীপক যন্ত্র মাত্র। Guentert আরও বলেন যে শব্দরূপী এই যন্ত্র দ্বারা Vorstellung কখনও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিন্তু দেখান হইয়াছে যে একথা সত্য নহে।

এই সম্পর্কে Wundtএর আর একটি কথার বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, "Abstrakte Begriffe in diesem Sinne sind demnach Begriffe, deren wesentliches Vorstellungssubstrat nur noch in dem Worte besteht" (Ibid. p. 484)। অর্থাৎ মুখ্যতঃ শব্দকে আশ্রয় করিয়াই বস্তুবিরহিত গুণবাচক (abstract) বিষয় সম্বন্ধে মানুষের ধারণা গড়িয়া উঠে। Wundtএর

* Zwischen den Laut-und Bedeutungsformen allmaehlich fester werdende Association.

এই কথা হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি মনে করেন, পশু, পক্ষী, জল, হাওয়া প্রভৃতির Vorstellung তত্তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষানুভূতি আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু abstract বিষয় সম্বন্ধীয় Vorstellungএর মূলে তজ্জ্ঞাপক শব্দ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু নাই। Wundtএর এই কথা সত্য হইলে শব্দ যে কেবলমাত্র energeia নহে তাহা প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতাও আর থাকে না। কিন্তু Wundtএর এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ abstract ও concreteএর মধ্যে সাধারণতঃ যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে, মানবীয় অনুভূতির পক্ষ হইতে বিচার করিলে সে পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে না। হ্রাস, বৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য, স্বাধীনতা এইগুলিকে আমরা সাধারণতঃ বলি গুণবাচক (abstrct) এবং মনুষ্য, পশু, জল, হাওয়া ইত্যাদি হইল বস্তুবাচক (concrete)। এই দুইটী শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে এতই সুস্পষ্ট যে ইহাদের অন্য কোন প্রকার শ্রেণীবিভাগ যে সম্ভব তাহাও আমাদের মনে হয় না। কিন্তু একথা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আদিম মানবের শ্রেণীবিভাগপদ্ধতি (অর্থাৎ চিন্তাপ্রণালী) অস্মদীয় পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না। উপরন্তু আধুনিক সুবিদিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারাও উভয় শ্রেণীর সীমা নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব। যখন বলা হয় "ঐ মানুষটী" তখন শব্দ সাহায্যে মনোমধ্যে যে ধারণাটী উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করা হয় সেটীকে concrete বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন বলা হয় "মানুষ" তখন যে ধারণাটী উদ্বুদ্ধ হয় সেটী abstract। 'মানুষ' কথাটী দ্বারা মনুষ্যজাতীয় কোন এক বা একাধিক জীবকে উদ্দেশ করা হয় না; তদ্দ্বারা উদ্দিষ্ট হয় সমস্ত মানব জাতির মধ্যে যে গুণসমষ্টির সমাবেশ দেখা যায়—সেই গুণসমষ্টি এবং এই সমগ্র গুণ সমষ্টির অন্তর্গত কতকগুলি বিশেষ গুণের সমাবেশে এক একটী বিশেষ মানুষ (concrete)। কাজেই দেখা যাইতেছে যে পরিমাপক গুণাবলীর সংখ্যার উপরেই abstract ও concreteএর পার্থক্য নির্ভর করে,—অনুভূতি পক্ষে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বাস্তব কোন ভেদ নাই।

Abstract ও Concreteএর মধ্যে এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য অস্বীকার করিলেও কিন্তু Wundtএর উত্থাপিত প্রশ্নের কোন সমাধান হইল না। প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে Vorstellung ব্যতিরেকে শব্দপ্রয়োগ সম্ভব নয়। কিন্তু abstractএর Vorstellung কোথা হইতে কিরূপে আসিবে? Concreteএর সহিত তাহার শ্রেণীগত পার্থক্য নাই সত্য, কারণ দেখান হইয়াছে যে পরিমিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে abstract আপনা হইতেই concreteএ পরিণত হয়; কিন্তু তথাপি concreteএর পটভূমির উপর abstractএর Vorstellung প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি? এই বিষয়ে সন্দিহান হইয়াই Wundt বলিয়াছেন কেবল শব্দমাত্র আশ্রয় করিয়া abstractএর Vorstellung উদ্বুদ্ধ হয়।

কিন্তু Vorstellung যে সর্ব্বত্র concreteএর উপর প্রতিষ্ঠিত একথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যাহা কিছু প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতিগোচর হয় তাহাই Vorstellungএর উদ্বোধক হইতে পারে। এখন কেবলমাত্র concrete বস্তুই যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতিগোচর হয় তাহা নহে, দুইটী concreteএর বৈপরীত্যও সমভাবে অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। এই বৈপরীত্য যে abstract সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং তাহাকে আশ্রয় করিয়া abstractএর Vorstellungও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ সুন্দর ও কুৎসিতের বৈপরীত্য আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য ও কৌৎসিত্যের Vorstellung গড়িয়া উঠিতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে শব্দ কি সর্ব্বত্রই Vorstellungএর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি? বিভিন্ন ভাষায় সমার্থক যত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাহা নহে। কিন্তু সমপর্য্যায়ের শব্দাবলীর নিরুক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যে পরিমাণ বৈষম্য ও তারতম্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে Vorstellung-সমূহের মূলেও যে সেই পরিমাণ বৈষম্য ও তারতম্য বর্ত্তমান ছিল এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ শব্দ সর্ব্বত্রই বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত Vorstellungএর উদ্বোধক যন্ত্র মাত্র; ইহার এক একটী বিশিষ্ট স্থানে

আঘাত করিয়া শব্দ শুধু সেই অংশটী মাত্র নহে, সমগ্র চিত্রটীই জাগাইয়া তুলে। হয়তো উভয় ক্ষেত্রেই Vorstellung সম্পূর্ণ অভিন্ন (ইহা অবশ্য তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া হইতেছে, কারণ সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন দুইটী Vorstellung কল্পনা করা অসম্ভব), কিন্তু শব্দ তাহাদের বিভিন্ন অংশে আঘাত করিয়া তাহাদের মধ্যে আপাতবৈষম্যের সৃষ্টি করিবে। Vorstellungএর পটভূমির বিস্তৃতিই আসলে শব্দের অর্থ-ব্যত্যয়ের মূল কারণ। Vorstellungএর পটভূমি যদি আয়তনহীন বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইত তাহা হইলে শব্দের অর্থব্যত্যয় কখনও সম্ভব হইত না।

উল্লিখিত পন্থায় বস্তুবাচক (=বিশেষ্য) সকল শব্দের উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু গুণবাচক (=বিশেষণ) শব্দসমূহের প্রয়োগ কিরূপে ভাষায় প্রচলিত হইয়াছিল সে প্রশ্নের সমাধান এতদ্দ্বারা হইল না। এতৎ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভেই কিন্তু বলিয়া রাখিতে হইবে যে বস্তু ও গুণের মধ্যে আসলে প্রকৃতিগত কোন বৈষম্য নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, অনুভূতির ক্ষেত্রে গুণ ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কারণ গুণশূন্য কোন বস্তুর কল্পনা করিতে মানুষ অসমর্থ। গুণ কাহাকে বলিব? এ সম্বন্ধে Kantএর নির্দ্দেশ অতি সুস্পষ্ট। তিনি বস্তুর (Gegenstand) এক একটি বিশেষ অবস্থাকেই (Zustand) গুণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। Kantএর এই সারগর্ভ নির্দ্দেশটুকু বর্ত্তমান আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গুণকে বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে; কিন্তু বিবিধ গুণ বস্তুবিশেষকে আশ্রয় করিতে পারে, এবং বিবিধ বস্তু একটী বিশেষ গুণের বাহন হইতে পারে। যদি a, b, c হয় গুণ এবং x, y, z হয় বস্তু, তবে a (x, y, z) এবং x (a, b, c) এইরূপ অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। মনুষ্যের যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সাধারণত ax, by, cz ইত্যাদি প্রকারেরই হইবে, কিন্তু a (x, y, z) এবং x (a, b, c) কিছুমাত্র সম্ভব হইলেও তাহার একদিক হইতে

a, b, c, এবং অপর দিক হইতে x, y, zএর Vorstellung মানব মনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে। অর্থাৎ একটী বিশিষ্ট গুণ (=অবস্থা) একটী মাত্র বিশিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে ঐ বিশেষ গুণটীকে কখনই ঐ বিশেষ বস্তু হইতে পৃথক করিয়া কল্পনা করা যাইত না। কিন্তু একটী বিশিষ্ট গুণ যদি বিভিন্ন বস্তুতে বর্ত্তমান থাকে তবে গুণ ও বস্তুর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সত্বেও গুণটীকে বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে কল্পনা করা সম্ভব হইবে। অনুরূপ পন্থায় বিভিন্ন গুণ হইতে পৃথক করিয়া নির্গুণ বস্তুর উপলব্ধি কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ অনুভূতি-পক্ষে বস্তু গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

যথাসময়ে বিজাপুর রওয়ানা হলাম। আমাকে যাঁরা গাড়ীতে তুলে দিতে ষ্টেশনে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন N. I. A'র মুনশী মহাশয়, লালশঙ্কর ভাই। তিনি ট্রেন ছাড়বার সময় চুপিচুপি আমাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি যত শীগ্‌গীর পার জজ্ হয়ে যেও, তাতে ঢের কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে। কালেকটারী করা তোমার মত মেজাজী মানুষের পোষাবে না।" আমি ভাল মন্দ কিছুই বললাম না। বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বিদায় নিলাম। জজ্ হওয়ার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। চাকরী যদি করতেই হয়, চিরদিন কালেকটারীতে থেকে প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখব এই ছিল আমার মতলব। তখন ত জানতাম না, বুঝতামও না, যে চাকরীতে নিজের ইচ্ছা বলে একটা জিনিসের কোন মূল্যই নেই। লালশঙ্কর ভাই সত্যি অতি চমৎকার লোক ছিলেন। প্রথম বার তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকতাম, তিনি অত কমিশনার-ঘেঁষা মানুষ ভেবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার আহমদাবাদে যাই তখন তিনি পেনশন নিয়েছেন। আর ইজার কোর্ত্তা পরে আমলাদের পেছনে ধাওয়া করতে হত না। আহমদাবাদে যত সৎকর্ম্ম, যত সার্ব্বজনিক কাজ, সবের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সেবার আমি তাঁর যথার্থ স্বরূপ চিনলাম। আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল। কত রকমে তিনি যে আমাকে ঋণী করলেন তার ইয়ত্তা নেই।

লীলী সাহেবের যথার্থ ডান হাত ছিলেন আর এক ভদ্রলোক। তাঁর নামটা আর করব না, কিন্তু ভদ্রলোক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। পনের টাকার কেরাণীগিরি থেকে নিজ গুণে চড়ে উঠেছিলেন, যত দূর ডেপুটী-কালেকটারের চড়া সম্ভব। উন্নতির চরম সীমায় তিনি ওঠেন নিজের বড় সাহেবের উপর গোয়েন্দাগিরি করে। এই বড় সাহেবটীও

সেকালের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁরও নাম করে আজ কোন ফল নেই। ভদ্রলোক বড় সাহেব হলেও অর্থের প্রতি তাঁর মমতা সাধারণ পাহারাওয়ালার মতই ছিল। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। তাঁর দান খয়রাতের গল্প আজও অনেকে করে থাকে। ক্লাইবের দিনে আমলাবর্গের, Nabob-দের, রজতপ্রীতির কথা ইতিহাসে পড়েছেন। সেই নবাবের দল কিছু একশ বছরে সমূলে লোপ পায় নেই। উনিশ শতকেও এমন অনেক বড় সাহেব ছিলেন, যাঁরা লোকের কাছে রাজা, নবাব, আমীর ইত্যাদি আখ্যা পেয়েছিলেন। তাঁরা যেমন দুহাতে অর্থ সঞ্চয় করতেন, তেমনই দরাজ হাতে আবার সে টাকা ছড়াতেন। এই সব আমীর-সাহেবদের বাগান-ফোয়ারা-বিবিখানা সংবলিত প্রাসাদতুল্য বাড়ী আজও বোম্বাইএর স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরে যখন কোম্পানীর রাজত্ব উঠে গেল, তখন ধীরে ধীরে হাকীমদেরও চাল চলন বদলাতে আরম্ভ হল; কিন্তু পুরানো হাকীমদের সরাতে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের নূতন সরকারকে। এই দুর্নীতি দমনের কাজে যে সমস্ত নেটিব আমলা কর্ত্তাদের বিশেষ রকমের সাহায্য করেছিলেন, তার মধ্যে মুখ্যতম ছিলেন আমার আহমদাবাদের বন্ধুটী। সাধারণ লোকে তাঁকে বাঘের মতন ভয় করত। আমাদের মত চুনোপুটী হাকিমদের ত তিনি একরকম অভিভাবকই ছিলেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাড়া করে দেওয়া, ঘোড়া কিনে দেওয়া, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়া, এ সব কাজে তিনি আমাদের মুরুব্বী ছিলেন। আমাকেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তিনি। তবু তখনকার দিনে তাঁকে ভালবাসতে পারি নেই। আজ বুড়ো বয়সে বুঝতে পারি যে তাঁর দেহে সেই যুগের দোষগুলোও যেমন ভরা ছিল, গুণও তেমনই পূর্ণমাত্রায় ছিল। এক কথায় তিনি একজন কর্ম্মী পুরুষ, মস্ত লোক, ছিলেন। লালশঙ্কর ভাইয়ের মত তিনি ত ব্রাহ্ম ছিলেন না। তাই তাঁর কোন শুচিবাই ছিল না। তখনকার আবহাওয়াই অন্য রকম ছিল। ম্যাক্স ওয়েল জন বুলের কথা কি লিখে গেছেন, পাঠকের মনে আছে ত।

ইংরেজ বাপ ছেলেকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাবার সময় এই বলে না কি আশীর্ব্বাদ করতেন, "দেখিস বাছা পয়সা রোজগার করিস। ধর্ম্মপথে থেকে পারিস ত খুব ভাল কথা, কিন্তু পয়সা আনাই চাই।" ইংরেজ বাপই যে একলা ছেলেকে এই আশীর্ব্বাদ করতেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। সে যুগে অনেক দেশের অনেক ছেলেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাজ করতে বেরোতেন। যাক গে, আমার বন্ধুটীর কথা বলি। তিনি আমাকে সর্ব্বদা বলতেন, "You must always be discreet। সর্ব্বদা অপ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করবে।" ষ্টেশনে বিদায় দেবার সময় সাবধান করে দিলেন, "My boy ! Beware of the Deccani tongue-waggers." চমৎকার কথা নয়? যারা একদিন সারা ভারতবর্ষকে নিজের মুঠোর ভেতর প্রায় ভরেছিলেন তাঁরা tongue-waggers ই বটে। আর একটী লোকের নাম করে আহমদাবাদের কথা শেষ করব। আমি যখন প্রথম চাকরী নিলাম তখন যে কটী তরুণ গুজরাতীর সঙ্গে আলাপ হল, তার মধ্যে একজন ছিলেন বর্ত্তমান কংগ্রেস-নেতা ভুলাভাই দেশাই, তিনি তখন এডভোকেট পরীক্ষার জন্য পড়ছেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে, আর যাকে বলে keen as mustard (সর্ষের মত ঝাঁঝালো)। তাঁর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

আগেই বলেছি যে আমার ঠিক এই সময়ে বিজাপুর যাওয়ার নানা রকম সাংসারিক অসুবিধা ছিল; তবু বিজাপুরের মতন একটা পুরানো রাজধানী দেখবার আগ্রহও মনে খুব জেগেছিল। কেবলই মনে করতাম যে এইবার সব সেকেলে মুসলমান খানদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে। গুজরাতে সে রকম সাবেক ঘরানার মুসলমান বড় একটা দেখি নেই। যা দুই একজন দেখেছিলাম তাঁদের চালচলন ধরণ-ধারণ একেবারে গরাসীয়া রাজপুতদের মত। আর আহমদাবাদ শহরের মুসলমান বড়লোক যাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তাঁদিকে বিশেষ ভাল লাগে নেই। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে এমন ব্যাপার দাঁড় করিয়েছিলেন, যে আহমদাবাদ আঞ্জুমান-ই-

ইসলামের সেক্রেটারী হয়েছিলেন বৃদ্ধ লালশঙ্কর ভাই—জাতে নাগর ব্রাহ্মণ। তাই বিজাপুর যাওয়ার আগে ঘুরে ঘুরে কেবলই এই কথা মনে হত যে এইবার সত্যি বনেদী ঘরের মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে ভাব হবে, আর তাদের প্রাণে একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার করবার সুযোগ পাব। বাস্তবিক উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের মুসলমান জাতটা এত নিরুদ্যম ভগ্নোৎসাহ ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল যে তাদের সংস্পর্শে এলেই আমার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যেত। মনে হত, এ জাত আবার না জেগে উঠলে ভারতে মহাজাতি সংগঠনের চেষ্টা বৃথা।

তাই চাকরীর শেষ পর্য্যন্ত যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি মুসলমান সমাজকে একটু সামনে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছি। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনে কাঠবিড়ালীও ত সাহায্য করেছিল। আজ মুসলমান সম্প্রদায় নূতন জীবনের সন্ধান পেয়ে আনন্দে অতি-মাত্রায় অধীর হয়েছেন। এতে অ-মুসলমান অনেকেই বিরক্ত। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয় যে আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি সামান্য প্রচেষ্টা-গুলো আজ সার্থক হচ্ছে।

সত্যিকার বিজাপুর দেখলাম আমার স্বপ্নের আদিল-শাহী বিজাপুর থেকে একেবারে আলাদা। বিজাপুর শহর ও তার আশপাশ যেন একটা মহা শ্মশানের মতন। চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল পাথরের স্তূপ আর পোড়ো বাড়ী। তার মাঝখানে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহম্মদ আদিল শাহের সমাধি, গোল গুম্বজ। রেলে আসতে আসতে বহুদূর থেকে নজরে পড়ে এই প্রকাণ্ড গুম্বজ। আপনারা অনেকেই এই সমাধি-মন্দিরের ছবি দেখেছেন, তাই আমি এর বর্ণনা করে আপনাদের বিরক্ত করব না। তবে এইটুকু বলি যে গুম্বজের পাদমূলে যে balconyটা চারিদিকে ঘুরে গেছে সেটা এত চওড়া যে ছ'তিন খানা মটরগাড়ী পাশাপাশি তাতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। এই গুম্বজের আর এক নাম বোল গুম্বজ, কেন না balconyতে কোনও একটা আওয়াজ হলে বেশ মিনিট ছই ধরে বার বার তার প্রতিধ্বনি

হয়। নানা রকম লোকে সেই balconyতে উঠে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আনন্দে কাটিয়ে দিত। আবার বেশী মার্জ্জিত-রুচি কেউ কেউ তার ভেতরে পিস্তল ছুড়ে আমোদ করতেন। গুম্বজের ভেতরে অনেক জায়গায় পিস্তলের গুলির দাগ দেখেছিলাম। মহম্মদ আদিল শাহের অদৃষ্ট! এই সমাধির বাইরে যে নকারখানা বা দেউড়ী ঘর আছে সেইখানে আগে সাহেবদের ডাক বাংলা ছিল। সেকালের কোন বিচক্ষণ হাকীমের হুকুমে এ সুব্যবস্থা হয়েছিল,তা আমি জানি না। তবে কার্জ্জন সাহেব বছর খানেক আগে যখন বিজাপুরে এসেছিলেন, তখন এক কলমের খোঁচায় এই অতি বিসদৃশ ব্যাপার খতম করে দিয়ে গেছলেন। মহম্মদ শাহের স্মৃতির অবমাননা সুরু করেন কিন্তু তাঁর আপন সন্তান আলী আদিল শাহ। বাপের উপর টেক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আলী নিজের জন্য এমন এক বিশাল সমাধি-মন্দির তুলতে আরম্ভ করেছিলেন যে তার চূড়ার ছায়া গিয়ে পড়বে গোল-গুম্বজের চূড়ায়। কিন্তু বেচারার ইচ্ছা পূর্ণ হল না। আলী রোজার দোতলা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আলী ইহলোক ত্যাগ করলেন। সেই অসম্পূর্ণ ইমারতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলানগুলোর মাঝে সমাধিস্থ হলেন আলী আদিল শাহ। আজও সেই রোজার খিলানের বহর দেখলে আন্দাজ করা যায় যে ইনি কি বিশাল সমাধি-মন্দিরই কেঁদে-ছিলেন। বিজাপুরের ইমারতগুলোর প্রধান সৌন্দর্য্য আমার যা চোখে লাগত সেটা তার বিশাল গঠন। নইলে কারুকার্য্য, খোদাই বা mosaic বা জালির কাজে বিজাপুরের বাড়ীগুলো আহমদাবাদের কি দিল্লী-আগ্রার ইমারতের কাছেও লাগে না। এক চিনি-মহলের ভেতরে শুনতে পাই সর্ব্বত্র চিনেমাটির বিচিত্র রঙীন টালি বসান ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলো হস্তান্তরিত হয়ে দূর বিদেশে চলে গেছে। আমার সময়ে আর প্রায় ছিল না। কে নিয়েছিলেন বা কাকে কত দাম দিয়ে ছিলেন সে সব অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করে কোন লাভ নেই। আরশ মহল বলে আর এক সেকেলে প্রাসাদ ছিল তাতেও ত আরশের (শ্বেত পাথরের) চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ছিল না! সে সব পাথরই বা

কে নিলে! আমাদের নেবব্-সাহেবদের আমলে যাকে বলে পুকুর-চুরী কত যে হয়ে গেছে তার কি গুণতি আছে!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাস করতেন "দুই বোন" বলে এক জোড়-গুম্বজের একটার তলে। এই "দুই বোন"ও ছিল এক প্রাচীন সমাধি-মন্দির। এর মেজের নীচে ছিল বিখ্যাত উজীর খাওয়াস খান ও তাঁর মুরশিদের কবর। আর উপরে আমরা খানাপিনা নাচগান করতাম। একটা সভ্য জাতের পক্ষে কি করে এটা সম্ভব হয়েছিল আজ বোঝা শক্ত! বিজাপুরের মজাই এই ছিল যে আমরা সবাই বাস করতাম, কাছারী করতাম, সাবেক ইমারতগুলোর ভেতর। যতদূর মনে আছে, আমার সময়ে নূতন একেলে বাঙ্গালা বা কাছারীবাড়ী একটাও ছিল না। বাদশাহী আমলে যে বাড়ীগুলো বাসস্থান কি আদালত ছিল, সেগুলো কাজে লাগানোতে হয়ত কোনও দোষ নেই, কিন্তু কর্ত্তাদের কোনও বাছবিচার ছিল না। সমাধিমন্দির এমন কি মসজিদ পর্য্যন্ত সরকারী কাজে লাগানো হয়েছিল। ডাকঘর ছিল পুরানো বোখারী মসজিদে। অবশ্য এ সব হতে পেরেছিল এই জন্য যে বিজাপুরে বনেদী ঘরের মুসলমান প্রায় কেউ ছিলেন না। আদিল শাহীর পতনের পর ধীরে ধীরে সবাই নিজাম রাজ্যে বাস করতে চলে গেছলেন। কার্জ্জন লাট সাহেবকে লোকে যাই বলুক না, তিনি ভারতবর্ষের সাবেক ঐতিহাসিক ইমারতগুলোকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বিজাপুরে এসেও তিনি আদিলশাহী ধর্ম্ম-মন্দিরগুলোকে অবমাননা হতে রক্ষা করবার কড়া ব্যবস্থা করে গেছলেন। গোলগুম্বজের দেউড়ীবাড়ীর কথা আগেই বলেছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও "দুই বোন" হতে বিতাড়িত হলেন। ডাকঘরও বোখারী মসজিদ হতে স্থানান্তরিত হল।

এ সবই sentimentএর কথা। তবে sentimentএর কি কোনও মূল্য নেই! আমার নিজের একটা গল্প বলি শুনুন। একবার আমরা একদল ছোট বড় হাকীম অজন্তা-গুহা দেখতে গেছলাম—সাতজন সাহেব ও আমি। প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা দেখতে দেখতে ক্ষুধার উদ্রেক

হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল তাই দুই তিন বাক্স ভরে ভোজ্য-পানীয় সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ধরে গুহাগুলো ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে টিফিন করতে বেরিয়ে এলাম। এক গুহার দুয়ারের কাছে চাদর বিছিয়ে চাকরেরা টিফিন সাজিয়েছিল। রাশি রাশি খাদ্যের স্তূপ! কিন্তু আমার দেখেই কেমন হঠাৎ গা ঘিন ঘিন করে উঠল। মনে হতে লাগল, কি পাষণ্ড আমি, কতকগুলো বিদেশী বিধর্ম্মীর সঙ্গে জুটে আমার ধর্ম্মমন্দিরের অপমান করছি। দাঁড়িয়ে উঠলাম। উঠে আস্তে আস্তে বললাম, "আমি এখানে খাব না, তোমরা খাও।" সে বেচারারা হতভম্ব হয়ে আমার মুখের পানে তাকালে। তারা বুঝতেও পারলে না যে কেন আমি হঠাৎ এরকম বে-রসিকের মতন ব্যবহার করছি। চারিদিক থেকে "Why, man ?", "What nonsense !" ইত্যাদি রব উঠল। আমি অগত্যা আমাদের দলের সবচেয়ে প্রবীণ Wকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললাম, "W—আমাকে বৌদ্ধ বিহারের সামনে এইসব মদ মাংস খেতে বোলো না; তোমরা আরম্ভ কর, আমি কিছু রুটী মাখন নিয়ে গিয়ে অন্যত্র খাই।" সে ভদ্রলোক তখনও বুঝতে পারে না। বললে, "কেন? তুমি ত বৌদ্ধ নও! আর এই গুহাগুলোও ত এখন ধর্ম্ম-মন্দির নয়, এখানে ত যে যা খুশী করে!" আমি বললাম, "তা হোক গে W, আমার মুখে এখানে খাবার উঠবে না, আমাকে মাপ কর। নিজের দেশের, জাতের, অপমান আমি এমন করে করতে পারব না।" W গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "All right, Dutt, I understand." ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে বললেন "এখানে খাওয়া হবে না। চল নীচে নেমে গিয়ে খাওয়া যাক।" আর কেউ কোন কথাই বললেন না। বোধ হয় বুঝলে যে একটা কিছু অন্যায় কাজ করা হচ্ছিল। তার পরে সকলে মিলে মহা হাল্লা করে নদীগর্ভে এক স্বাভাবিক পাথরের চাতালের উপর বসে টিফিন টুকরীগুলি খালি করা গেল। কিন্তু সত্যি কথা বলি, আমি নিজে সেদিন হ্যামস্যাণ্ডুইচ্ ও কোল্ডচিকেন খেয়ে কিছু আনন্দ পাই নেই। মনটা কেমন হয়ে গেছল।

যাকগে, sentiment করে কাজ কি! বিজাপুরের যে অংশটায় আমরা থাকতাম ও কাছারী করতাম সেটার নাম আর্ক কেল্লা (citadel)। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার নাম আনন্দ-মহল। বাদশাহী আমলে সেই বাড়ীর দালানে নাচগানের আসর বসত। দালানটা প্রকাণ্ড, কত প্রকাণ্ড তা আপনাদিকে বুঝিয়ে বলা শক্ত। তবে একটা আন্দাজ করে দিতে পারি। সামনে তিনটে খিলান, মাঝের খিলানটার বহর প্রায় ৬০ হাত, পাশের দুটো প্রত্যেকটা ৩০ হাত। এই দালান হতে একদিকে একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে হত আমার আবাসে। অন্যদিকে সেই রকম আর এক দরজা দিয়ে ঢুকতে হত আমার কাছারীতে। মাঝখানটায় সামনের দিকে নীচের তলাটা ছিল আমাদের ক্লাবের বিলিয়ার্ড ঘর ও লাইব্রেরী। তার উপর দুই তলায় থাকতেন জজ্ সাহেব। সমস্ত বাড়ীটা চোরকুটরী ও খুপরীতে এমনই ভরা ছিল যে দেখে লোকের তাক লেগে যেত। কি কাজে লাগত এই খুপরীগুলো! লোকে বলত মহম্মদ আদিল শাহ নাকি লুকোচুরী খেলতেন তাঁর প্রণয়িনী রম্ভাবাই-এর সঙ্গে এইখানে। এই মহম্মদ-রম্ভার প্রেম বিজাপুরের ইতিহাসের একটা বড় মিষ্টি জিনিস। এদের কত ছবি তখনকার দিনে কিনতে পাওয়া যেত। আবার এই আনন্দ-মহলেই নাকি উজীর কমাল খাঁ খুন হয়েছিলেন। গল্পটা আপনাদিকে বলি। প্রথম আদিল শাহ ইউসুফ ছিলেন জাতে তুর্কী, ধর্ম্মে শিয়া, কিন্তু তিনি সব রকমে উদারহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রধানা বেগম ছিলেন এক মরাঠী হিন্দু মহিলা। যখন ইউসুফ আর্ক-কেল্লা তৈরী করেন, তখন কেল্লার ভেতর রেখে দিয়েছিলেন এক প্রাচীন হিন্দু মন্দির। সে মন্দির আমার সময়েও ছিল। শোনা যায় যে পরবর্ত্তী কোন কোন বাদশাহ সেই মন্দিরে পূজা দিতেন। ইউসুফের সেনানী ও আমলা-বৃন্দের ভেতর অনেকেই ছিলেন সুন্নী। তাঁর মৃত্যুর পর সুন্নী উজীর কমাল খাঁ ষড়যন্ত্র করলেন যে বালক সুলতান ইসমায়েলকে মেরে নিজে সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু ইসমায়েলের মা—ইউসুফের মহারাষ্ট্রীয়া মহিষী—সময়ে সব জানতে পেরে এক তুর্কী সৈনিক পাঠিয়ে কমালকে

খুন করালেন। রাজ্য বেঁচে গেল। লোকে বলত যে এই কমাল খাঁর প্রেতাত্মা আনন্দ-মহলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত অন্ধকার রাত্রে। ভাগ্যক্রমে আমাদের নজরে কোন দিন পড়ে নেই সে প্রেতাত্মা। তবে, এই বিজাপুর জায়গাটাই এমন ছিল যে কেবল মনে হত যেন প্রেতাত্মার সংসর্গেই বাস করছি। আর্ক কেল্লার মধ্যের রাস্তাগুলো প্রায় সারাদিনই থাকত কেমন নিঝুম, নির্জ্জন। কখন কখন এমনও দেখেছি যে দিনে দুপুরে দুতিন ঘণ্টা ধরে বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লোকও যাওয়া আসা করলে না। আনন্দ-মহলের লাগা আর এক প্রাসাদ, গগনমহল। তার হাতার মধ্যে ছিল আমাদের ক্লাবের টেনিস খেলার জায়গা। গগনমহলের তিনটী দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে নাকি কাঠ কাঠরার অনেক কারুকার্য্য ছিল। লোকে বলে যে সে সব মারাঠারা ভেঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সাতারার রাজবাড়ীতে লাগিয়েছিল। মারাঠারা ভাঙ্গাচোরা লণ্ডভণ্ড করার কাজ বড় একটা করত না। তবে গগন-মহলের উপর তাদের একটা বিশেষ রকমের বিদ্বেষ থাকার কথা। কেন না এই মহলেই সুলতানের দরবারে পান আতর নিয়ে বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খান বেরিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজীকে ধরে আনতে। গগন মহলের সুমুখে খাড়া রয়েছে সুন্দর সুদৃশ্য এক খিলান। তার আকার বিশাল, প্রায় চৌষট্টি হাত চওড়া! খিলান আর ইমারতটার মাঝে কি ছিল তা এখন বোঝবার উপায় নেই।

আফজল খানের কথা বলতে মনে হল যে আমরা আফজল ও শিবাজীর ব্যাপারটার যে বর্ণনা ইংরেজী ইতিহাসে পড়ি সেটা অনেকাংশে রচা কথা। "বুসাতীন ও সলাতীন" বলে বিজাপুরের এক নিজস্ব ইতিহাস আছে। তাতেও এ ব্যাপারের উল্লেখ আছে। তার থেকে এ কল্পা মোটেই মনে হয় না যে সমস্ত দোষটা শিবাজীর স্কন্ধে চাপান যায়। যাই হোক, রাজায় রাজায় যুদ্ধ ত আর ten commandments-এর নীতি অনুসারে চলে না! সুতরাং আফজল শিবাজীকে ফন্দী করে ধরবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন কি না, তার বিচার আজকের দিনে নিষ্ফল। কেন না, আজ আমাদের চোখে আফজল খান ও

শিবাজী, প্রতাপসিংহ ও মানসিংহ, আকবর ও আওরঙ্গজেব সবাই নমস্য ব্যক্তি, সবাই আমাদের ভারত-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক!

বিজাপুর শহর হতে খানিক দূরে আফজলপুর বলে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কাছে এক পুকুর পাড়ে ঘন বনের ছায়ায় দেখা যায় সারি সারি ছেষট্টিটা কবর। গড়ন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সবগুলিই স্ত্রীলোকের সমাধি। কিম্বদন্তী যে সেনাপতি আফজল খানের ছেষট্টি জন বেগম ছিলেন, শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সেনাপতি জানতে পারেন যে আসন্ন যুদ্ধে তাঁর মরণ নিশ্চিত, তাই তিনি স্বহস্তে বেগমদিকে বধ করে তাঁদের দেহ কবরস্থ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিম্বদন্তী সত্য কিনা বলা শক্ত। তবে এ রকম ব্যাপার তখনকার দিনে ত ঘটত! আমি যে মুসলমান বন্ধুর মুখে গল্পটা শুনেছি তিনি বিজাপুরেরই লোক, জুমা মসজিদের পুরোহিত বংশে তাঁর জন্ম।

আগে বলেছি যে বিজাপুরের ইমারতগুলোর বিশেষত্ব তাদের বিরাট design। এইটাই সাধারণ নিয়ম। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। ইব্রাহিম শাহের সমাধিমন্দির আকারে বৃহৎ হলেও নানা রকম সূক্ষ্ম খোদাই কাজে ভরা। কিন্তু যারা আহমদাবাদের রাণী সিপ্রীর মসজিদ কি আবুর দিলবাড়া মন্দির, কি আগ্রা ফতেহপুর সিক্রীর বিখ্যাত ইমারতগুলো দেখেছেন, তাঁদের ইব্রাহিম রোজা দেখে মন উঠবে না। কিন্তু গোল-গুম্বজের বিশাল ধূসরবর্ণ কায়া, তার মাথার উপরকার প্রকাণ্ড সাদা-সিধে আরব গড়নের dome, তার কারুকার্য্য-বিহীন মস্ত মস্ত দেওয়াল যে দেখবে তারই মন শ্রদ্ধায় ভরে যাবে। উত্তর ভারতের ক্ষীণকটি ইন্দো-সারাসেনিক গুম্বজের সঙ্গে খোদাই, mosaic, খুচরো সাজ-সজ্জা শোভা পায়, কিন্তু আসল সারাসেনিক গুম্বজের স্বভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। বিজাপুরে এটা খুব বুঝেছিলাম।

তবে এই বিজাপুরেই আবার দুটী এমন সুন্দর ইমারত আছে, যা দেখলে অতি বড় কাঠ-খোট্টা আরবেরও চোখ জুড়িয়ে যাবে। একটী হচ্ছে আমাদের আনন্দ মহলের পাড়ারই মক্কা মসজিদ্। ঠিক যেন

খেলা ঘরের বাড়ী, চারিদিক ঝক্ ঝক্ করছে, ছোট্টটি, কিন্তু কি চমৎকার। লোকে বলত যে আগেকার দিনে বেগম্-শাহজাদীরা এই মসজিদে প্রার্থনা করতে আসতেন। কেউ কেউ আবার বলত যে এই মসজিদ্ আদিলশাহী রাজত্বের চেয়েও পুরানো, হিন্দু রাজাদের আমলে কোন ভগবদ্ভক্ত পীর রাজার অনুমতি নিয়ে এটা তুলেছিলেন।

অন্য ইমারতটী হচ্ছে মেহতর মহল। নাম মহল বটে, কিন্তু সত্যি একটী মসজিদের সিংহদ্বার মাত্র। কিম্বদন্তী যে এক মেথরের অর্থে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহলটী তৈরী হয়েছিল। ইমারতটী বাহিরে থেকে দেখতে যেমন চমৎকার, ভেতরের খোদাই কাজও সেই রকম অপরূপ ও বিচিত্র। কিছুকাল আগে এর একটী মিনার ভেঙ্গে পড়ে গেছল। কার্জ্জন লাটের শুভাগমন উপলক্ষে কর্ত্তারা এক নূতন মিনার তৈরী করিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ত আনাড়ী মানুষ, যখন দেখলাম নূতন পুরানোতে কোন তফাতই ধরতে পারলাম না। কিন্তু স্বয়ং লাট বাহাদুরেরও না কি তাক্ লেগে গেছল। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পকারীগরীর ধারা আজও একেবারে শুকিয়ে যায় নেই। তবে প্রায় চাপা পড়ে গেছল আর কি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

কবিতাগুচ্ছ

যাত্রিণী

তুমি যাত্রিণী।
তোমার যাত্রা পথে ছিল আমার কুটীর,
তাই হলে হঠাৎ অতিথি আমার ঘরে
আর পাঁচজনের মতই শুধু দুদিনের পান্থ।
কমা মাত্র, পূর্ণচ্ছেদ নও।

হায়রে লোলুপ কল্পনা!
ভাব্‌লাম তুমি অভিসারিণী,
এসেছ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে
আমার গলায় দিতে মালা।
মালাও একটা দিয়েছিলে, কণ্ঠে নয় হাতে।

ফুলের নয়, রুদ্রাক্ষের।
দিলে দীক্ষা, বাসরের নয়, সন্ন্যাসের।
সে রুদ্রাক্ষ শুকো ফলের নয়,
ঝল্‌মলে তারায় তারায় গাঁথা ; বাঘের জোড়া নখের মত
আছে তাতে একটি চন্দ্রকলার দোলক।

তুমি আমার ভৈরবিণী।
ছিলেম বৈষ্ণব, হলাম শাক্ত।
ছিলুম অশ্রুল ভক্ত, হয়েছি এবার বীরাচারী।
চক্ষের শ্রাবণ ফুরাল, উজানে গেলাম জ্যৈষ্ঠের খরায়।
জলাগুলো হ'ল মরুভূ, পেল শ্মশান-বৈদগ্ধ্য।

বংশীধারীর বাঁশি এখনো শুনি,
যেন অন্ধকারের ঝিল্লীরব।
শ্রীরাধিকার তনু-জ্যোৎস্না
আজ এই জোনাকির কণা-ছড়ানো তমিস্রা,
নিভ্‌ছে জ্বলছে আলোকের অন্তিম নিঃশ্বাসের মত।

মহাকাল ধূলি-লুলিত-বপু ভূতল শয়ানে।
রুদ্রাণী তাঁর বক্ষে দাঁড়িয়ে আলুল-কুন্তলা।
অন্ধকার ঘনিয়েছে মুক্ত কেশীর অলকদামে,
অন্ধকার উঠ্‌ছে ফণা মেলে ধূর্জ্জটির অঙ্গ-ভুজঙ্গে,
হয়েছে পুঞ্জীভূত তাঁর জটাকুণ্ডলীতে।

তোমার সে মালাখানি জড়িয়েছি আমার মাথায়।
ইন্দুলেখা পড়েছে ঝুলে আমার ললাটে।
আমার এই জীবন,—আদ্যন্তরহিত মহাকাল।
তুমি চলেছ এই বুকের উপর দিয়ে,—যেন জঙ্গমা স্থিতি।
তোমার বুকে দোলে আমার বহু স্মৃতির নৃমুণ্ডমালা।

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

চল্লিশ

সকালবেলা বাংলা খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে হঠাৎ তারিখটা চোখে পড়লো,

তেইশে শ্রাবণ, আমার জন্মদিন।
আমার অজ্ঞাতসারেই মন চট্ কোরে হিসেব সেরে বললে,
চল্লিশ পার হয়ে গেল।
'চল্লিশ' শব্দটা বার বার কানের ওপর আছড়ে পড়তে লাগলো,
লোহার হাতুড়ি পেটার বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ যেন।

সেই সঙ্গে স্মরণে এলো, জাম-সাহেবকে নিয়ে বিলেতী সাংবাদিকের রসিকতা,

ফরটি এণ্ড ফ্যাট্।
চট্ কোরে মনে ঘা লাগলো,
আমারও ত নিজেকে নিয়ে খেলা করার দিন শেষ হয়ে গেছে।
আমার এখন কোমরে চাই কোমর বন্ধ, চোখ চশমা-নির্ভর,
চুল পাতলা হয়ে চাঁদিতে চাঁদ দিচ্ছে উঁকি।
জীবনের ক্ষেত্রে ভাগীদার হয়ে স্ত্রী এসে জুড়ে বসেছেন,
আর সে ক্ষেত্রের পরিসরকে আরো সংকীর্ণ করেছে ছেলেমেয়েরা।
আমার এখন স্পোর্টস্‌ম্যানশিপের সুযোগ কোথা ?
আমি ত দস্তুর মতো সংসারী।
অথচ আমি যে এমন সংসারী হব,
তাদের ক্যাপটেন সম্বন্ধে একথা ভাবা কি আমার টীমের পক্ষে সম্ভব ছিল ?
তাদের চোখে আমি ছিলাম তারুণ্যের প্রতিরূপ,
পরার্থনিষ্ঠার অবতার,
নবযুগের নবীনতন্ত্রে দেশমাতৃকার পূজার একনিষ্ঠ পুরোহিত।
এই নিয়ে তুচ্ছ করেছি পিতৃহৃদয়ের নিভৃত-লালিত আশা,
ভেঙ্গে দিয়েছি তাঁর বুক,
মায়ের চোখে বহিয়েছি অবিরাম অশ্রু,
শান্তির সংসারে ডেকে এনেছি ঝঞ্ঝার সর্ব্বনাশ।
তবু মনে হয়েছে ঠিক করছি,
আমার পিতৃ পিতামহ জন্মভূমিকে যেভাবে ঠকিয়ে এসেছেন,
আমি দিচ্ছি মাত্র তার বিলম্বিত প্রতিদান।
ক্রমে ক্রমে দেখতে হোল পিতার তিরোধান,
হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের করুণায় পৈতৃক ভূসম্পত্তির হস্তান্তর,
ভাইয়ের অধোগতি, বোনের অবাঞ্ছিত বিবাহ,
বিপর্য্যস্ত জননীর সংসারত্যাগ,
ও তীর্থবাসে আমরণ পরান্নযাপিত জীবন।

তবু আমার চৈতন্য হয়নি ;
খ্যাতি ও লাঞ্ছনার নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে ভেবেছি,
এই যে প্রবল ঘূর্ণি, এ কখনও নিষ্ফল হয় ?
থামার সময় ত এলো বলে ;
আর সেই থামার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবো
দেশ জোড়া শান্তি, স্বাধীন ব্যবস্থায় আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির বিস্তৃত সম্ভাবনা,
ক্ষুধার হিংসার পরশ্রীকাতরতার চরম অবসান।

থামলো দোলা—সফল হোল না স্বপ্ন,
বাস্তবের সংঘাতে গেল টুকরো টুকরো হয়ে।
দেখি, স্বাধীনতার আশা আকাশের তারার মতোই সুদূর,
ক্ষুধার অন্ন বেশী দুর্ল্লভ,
হিংসার লেলিহান জিহ্বা সর্ব্বত্র উদ্যত,
পরশ্রীকাতরতার অন্তর্লীন প্রবাহ দিগন্ত-বিসর্পিত।
মেকি গৌরব গেছে ঝরে',
খাঁটি লাঞ্ছনার ভীম ভ্রূকুটিতে দেশ স্তম্ভিত।
আমার যারা সাথী ছিল তাদের কেউ দিল প্রাণ,
কেউ হয়েছে উন্মাদ, কেউ বা জীবন-পথে পঙ্গু ;
অন্যেরা রয়েছে অপেক্ষায়
ভাবসাগরে নতুন বেগে জোয়ার লাগার।

আমিই শুধু সরে এসেছি
একটি জোড়া কাঁকণ-পরা হাতের মায়ায়
যে-কাঁকণ আমিই পরিয়েছি বেড়ির জায়গায়
যে-বেড়ি সে পরেছিল আমাকে বাঁচাতে গিয়ে
গুপ্তচরের সযত্নে পাতা ঘাঁতিকল থেকে।
কী নির্য্যাতনই না সে সহ্য করেছে আমার মুখ চেয়ে নীরবে।
মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসে সে দিয়েছে আমাকে গৃহ,
দিয়েছে সন্তান, দিয়েছে তৃপ্তি ;

সুধু কেড়ে নিয়েছে আমার যৌবনের উন্মাদনা, আমার স্বচ্ছন্দগতি।
তাকে ছেড়ে আমি আজ খঞ্জ, অসহায়।

আবার ত ডাক আসবে একদিন,
দেশের হৃদয় হবে মথিত,
স্বার্থের সাধ-কোরে-গড়া সৌধগুলি পড়বে ভেঙে ভূমিকম্পে,
মিলনের অন্তরায় হবে দূরীভূত,
আমার সঙ্গীরা হবে দিশারী নেতা অতীত কীর্ত্তির গরিমায়,
কেবল আমিই থাকবো পিছিয়ে পড়ে'
পতিপ্রাণা স্ত্রীর বাধ্য স্বামিটি হয়ে'।

আজ আমার জন্মদিনে আমি তাই এই কামনা করি,
সেদিন যখন আসবে
আমার ছেলেমেয়েরা মানে না যেন তাদের মায়ের মানা,
তুচ্ছ করে যেন আমার অনিচ্ছা,
ছিড়ে ফেলে সংসারের জট-পাকানো জাল,
ও যোগে দেয় যেন সেই উন্মত্ত আবর্ত্তে
আমাদের গোপনতম ইচ্ছার প্রকৃততম প্রতীক হয়ে'।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

আবির্ভাব

ভেবেছিলুম শেষ হয়ে গেছে মন-দেওয়া-নেওয়ার পালা ;
হাজার মরণের ঢেউ পেরিয়ে জীবন এসে নিবৃত্তি পেয়েছে সমে ;
এমনি কোরেই বাকী কালটা কেটে যাবে।
নারীর সঙ্গে ব্যবহার হবে আন্তরিক কিন্তু অনাবিষ্ট,
থাকবে না আর মনকাড়াকাড়ির টাগ-অব-ওয়ার, মানভাঙাভাঙির
জোয়ার-ভাঁটা।

মানবো না কোনো সমাজে-গড়া চাল-চলন,
মানবো সুধু আমার নিঃস্পৃহ অন্তরের গহনোদ্ভূত স্বতঃ-উৎসারিত
প্রেরণাকে অকুণ্ঠ অসঙ্কোচে,
যার ফলে হয়ত আমার দুনামের দুন্দুভি বেজে উঠবে ঘোর রবে,
তবু বিচলিত কোরবে না আমাকে ;
ভেবেছিলুম, জীবন-নাট্যের চতুর্থ অঙ্কে এসে-পৌঁছেছি সেই ঢালু পথে,
যাতে আর কোনো চড়াই-উৎরাই নেই—
এমন সময় ঘটলো তোমার আবির্ভাব।

এ আবির্ভাবে তোমায় আমায় নতুন দেখা নয়,
নতুন কোরে দেখা ; অপূর্ব্ব সে নতুনত্ব।
সেই একটি পরমক্ষণ যখন তুমি ডাকলে আমায় নিতে তোমার
বন্ধুত্বের উপহার,
তার মাদকতা আমি ভুলি কি করে ?
কতদিন ত এর আগে দেখা হয়েছে,
কত গল্প কত তর্ক, কত বেড়িয়ে বেড়ানো,
তবু সে-পরিচয় কখনো সামাজিকতার শিষ্ট সীমা ডিঙিয়ে
তীব্র অনুভূতির নিবিড়তায় জমাট বাঁধে নি।

সেদিন তুমি আমায় ডাক দিয়েছিলে তোমার আকস্মিক বিপর্য্যয়ে ;
এমন একজন কাউকে তখন তোমার দরকার,
যার কাছে তোমার আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের গোপন ব্যথাটি মেলে
ধরতে পারো।
তোমার ব্যর্থ-প্রেমের কাহিনী তুমি আমায় শোনালে,
শোনালে তোমার মানসিক সংগ্রামের সুবিস্তীর্ণ ইতিহাস ;
আমার কাছে উদ্‌ভাসিত হোল তোমার অন্তর-লোকের শক্তি ও মাধুর্য্য,
মূঢ়তা ও দুর্ব্বলতা,
উচ্চাবচ-সমন্বিত সাগর-গিরি-শোভিত সে এক মহাদেশ।

তোমার এ নির্ভরতায় আমি কৃতার্থ হলুম,
তার উন্মাদনায় আমার জীবনে ঘটলো রূপান্তর।
মনে হোল, এই একটি বিদ্যুৎ-গর্ভ সময়-কণার প্রত্যভিঘাতে বিশ্বের
জীবন দ্বিখণ্ডিত হয়েছে,
পুরাতন পড়ে আছে পরিত্যক্ত নির্ম্মোকের মতো।
অতীতের ভস্মাকীর্ণ চিতাগ্নি থেকে উজ্জীবিত হচ্ছে নূতন ফিনিক্‌স্,
সৃষ্টি-রহস্যের নব পর্য্যায়,
যার প্রথমারম্ভের আমি যেন সদ্যঃতম স্রষ্টা।
কামনার বহ্নিশিখা উঠলো আবার উগ্রতেজে দেদীপ্যমান হয়ে;
মন তার অভ্যস্ত প্রশান্তি ভুলে গিয়ে, লোভাতুর আগ্রহে,
তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়।
এর হীনতায় আমি লজ্জিত, এর আবেগে আমি পরাজিত।
বেশ বুঝতে পারি তোমার মর্ম্মের পূজাবেদীতে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত,
সে আমি নই;
তোমার কাছে আমি সুধু তার স্তবগানের সহৃদয় শ্রোতা।
ভয়ে ভয়ে ভাবি, যেদিন আমার নীচাশয়তা তোমার চোখে পড়বে ধরা—
কিন্তু নিষ্কামতার আদর্শ যে আজ আমার কাছে অর্থহীন,
জীবনগতি যে মোড় ফিরেছে।
এখন আমি প্রতিদিন এই সাধনা করি
কবে আমি সেই শক্তি পাবো,
যেদিন দৃপ্তকণ্ঠে আমার মনের কথা তোমার মনের দ্বারে আঘাত
কোরবে,

যাতে হয় তোমাকে পাবো,
নয় তোমাকে হারাবো,
চিরদিনের মতো।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদকী

এই বৎসর ডব্লু-বি য়েট্‌স্-এর সপ্ততিতম জন্মোৎসব। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে এই আত্মসন্ধানী মহাকবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা আজও শেষ হয়নি; মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি যে-পরিণতির উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, সেখানে তিনি এখনো অনাগত। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাঁর আশা ও বিশ্বাস, তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু, তাঁর স্বদেশ ও সভ্যতা, সে-সমস্তই একে একে ক্ষয়, অপচয় ও মৃত্যুর বশ্যতা স্বীকার করেছে; কেবল বদলায়নি তাঁর অভীপ্সা, শুধু হার মানেনি তাঁর রূপকারী বিবেক, সুদীর্ঘ জীবনের অসংখ্য দুঃখ-দৈন্যকে ছাপিয়ে, তাঁর স্বাবলম্বন ক্রমাগতই পরাকাষ্ঠার দিকে এগিয়েছে। অথচ য়েট্‌স্ রোমান্টিক নামেই খ্যাত; এবং সেই খেয়ালী দলের কাছে আকস্মিক উন্মাদনার মূল্য আজন্ম অভ্যাসের চেয়ে বেশি, তাঁদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ততটা সাধনার অনুকূল নয়, যতটা প্রেরণার মুখাপেক্ষী, আত্মজ্ঞানকে দাবিয়ে অহঙ্কারকে বাড়াতে তাঁরা সকলেই সিদ্ধহস্ত। অবশ্য এ-নিয়মের ব্যতিক্রমেই রোমান্টিক সাহিত্য উৎকর্ষে পৌঁছেছে; এবং নিঃসম্পর্ক নৈমিষে চিরনির্ব্বাসিত থাকতে চাননি ব'লেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্ মহাকবি। কিন্তু কোনো আন্দোলনের বিচারে তার মুখ্যপাত্রদের বাদ দেওয়াই বিধেয়; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে সার্ব্বজনীন নিয়ম কবিকল্পনা মাত্র, যা বাস্তব, সে হচ্ছে একটা ঝোঁক, একটা অনির্দ্দিষ্ট সমষ্টির অনিশ্চিত ঐকাচরণ। এ-সিদ্ধান্ত অন্যায় ঠেকলেও অন্তত এটা অবিসংবাদিত যে উনিশ শতকের শেষ কবিরা আর ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্-কীর্ত্তিত নিরুদ্বেগ স্মৃতির সাহায্যে কাব্য লিখতেন না, উপস্থিত অভিজ্ঞতার উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশই তাঁদের সাহিত্যসেবার মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর্ণল্ড্-এর শুচিবায়ু এই সঙ্কল্প থেকেই উদ্ভূত; পেটর্-এর ইন্দ্রিয়াসক্তি এই অভিমতেরই নব সংস্করণ; ওয়াইল্ড্, ডাউসন্, জন্‌সন্ ইত্যাদির বিসদৃশ জীবননাটিকা এই প্রকৃতিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ

অভিজ্ঞতা কোনোকালেই স্বাধিকারে সমাদর পায় না, অপূর্ব্বতাই তাকে মর্য্যাদা জোগায়; এবং ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা সামান্যকে অলৌকিক ক'রে তোলা যেহেতু শ্রম- ও সময়-সাপেক্ষ, তাই প্রত্যেক যুগের অধীর স্বল্পমেধারাই অন্তম অসারতার প্রতিকারে অসাধারণের আশ্রয় খুঁজেছে।

সৌভাগ্যক্রমে গত শতাব্দীর শোকাবহ উপসংহার য়েট্‌স্ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতাবিলাসীদের সংসর্গে বেড়ে উঠে, তিনি কেবল সাহিত্যিক বস্তুতন্ত্রেই আস্থা খোয়াননি, হাক্স্‌লি-স্পেন্সর্-এর বৈজ্ঞানিক জড়বাদেও তাঁর নির্ভর ঘুচেছিলো। কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কল্যাণেই আমরা বস্তুজগৎকে চিনি, এবং সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানই যখন তাঁর বন্ধুদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিলো, তখন য়েট্‌স্ অভিজ্ঞতাকে তো উপেক্ষা করলেন বটেই, এমন-কি সেই অভিজ্ঞতা যে-বস্তুর প্রতিবিম্ব, সে-সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ জাগলো। কিন্তু বস্তু অবজ্ঞেয় হলেও অগ্রাহ্য নয়; এবং য়েট্‌স্ যদিও বর্ক্লি-র দেশেই জন্মেছিলেন, তবু সেই নিরাধার দার্শনিকের বিরুদ্ধে স্যাম্যুয়েল্ জন্‌সন্-এর ক্লেশকর প্রতিবাদ তিনি ভোলেননি। কাজেই তিনি আসলে বস্তুকে উড়িয়ে দিলেন না, প্রয়োগাদির সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে অতিবস্তুও বস্তুর মতোই সত্য, এবং মানুষ যদি পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারে, তবে ভূত-প্রেত, অপ্সর-গন্ধর্ব্ব, দেব-দেবী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ছুৎমার্গ অচল। তবু যে আমরা তাদের মানতে অনিচ্ছুক, তার কারণ বিশ্বচরাচরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি আমাদের নেই; এবং প্রত্নতত্ত্ব নখদর্পণে না এলে আমরা যেমন প্রাক্কালীন অস্ত্র-শস্ত্রকে লোষ্ট্র ভেবে, অন্যমনে ফেলে দিই, তেমনি বিদেহ নগরের সাক্ষাৎ পরিচয়েও আমাদের চোখ ফোটে না অবিদ্যারই অনুগ্রহে। কিন্তু অজ্ঞান কেবল অশরীরী-সম্পর্কেই অন্ধতা আনে না, প্রত্যক্ষও সমান দুর্জ্ঞেয়; সেখানেও ইন্দ্রিয়লব্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহাতীতকে না খুঁজে, অভিজ্ঞতা-নামক পাষাণপ্রতিমা নিয়ে আমরা মাতি খেলায়। কিন্তু বিজ্ঞানের দম্ভ আঁকড়ে থাকলে আর চলবে না; অভিজ্ঞতার করাঘাতে মনের দরজা খুলতে খুলতেই বলতে হবে যে সে-আগন্তুক যে-দেশের দূত, তার

আক্রমণ যদিও মারাত্মক, তবু তার অভিপ্রায় অবেদ্য, অভেদ্য, অনর্থময়। এর পরে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, বরং অতিসাধারণই বরণীয়; কারণ তার সম্বন্ধে আর কিছু না বুঝলেও, অন্তত এইটুকুর খবর আমরা রাখি যে মর্ত্ত্যধামে তাকে ফিরে ফিরে পাঠিয়ে মানুষের ভাগ্যবিধাতা তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিধাতা-শব্দের ব্যবহারে হয়তো য়েটস্-এর আপত্তি আছে; কেননা অদৃষ্টের পরিকল্পনায় তিনি কোনো বিরাট পুরুষের শরণ নেননি। তাঁর অনুসারে বৈদান্তিক ব্রহ্মের মতো একটা স্বতোবিরোধী উদ্বাস্তু চৈতন্য স্বভাববশে দানা বেঁধে মাঝে মাঝে ব্যক্তির আকার ধরে ব'লেই, তিনি মানুষের স্খলন-পতন-ত্রুটি কোনো রকমে সয়ে যান। সেইজন্যেই নাটকেও তিনি চরিত্রচিত্রণে উদাসীন, তাঁর রঙ্গরচনায় প্রাধান্য পায় চরিত্রগত আবেগ, আবেশ ও অনুভূতি।

এতক্ষণ যা বকলুম, তাতে প্লোটাইনাস্-এর প্রভাব কতখানি জানি না; কিন্তু লাইবিৎস্ ও কাণ্ট্-এর এই উৎকট সংমিশ্রণ যে দর্শন বা কাব্যবিবেচনা নয়, তা আমার কাছেও সুস্পষ্ট। তবু য়েট্‌স্-এর মতো সংযতবাক্ লেখকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় খানিকটা দুর্ব্বোধ্যতা অনিবার্য্য, এবং দর্শনের পরিভাষার মতো সাহিত্যের সাঙ্কেতিকও যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না! উদাহরণ হিসেবে 'পিওর পোয়েট্রি' নামক কাব্যকৈবল্যের উল্লেখ করা যেতে পারে; এবং অলস মনে পড়লে য়েট্‌স্-এর অনেক কবিতাতেই সেই অমানুষিক লক্ষণ ধরা পড়বে। কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্য রচনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্তত ইংরেজী সাহিত্যে, বিরল হলেও, তাঁর লেখায় সুইন্‌বর্ন্-এর মঞ্জুল বাক্‌সর্ব্বস্বতা নেই; অর্থহীন অনুলাপের সাহায্যে তিনি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করতে চান না; তাঁর কাব্যের ইন্দ্রজাল সুপরিস্ফুট চিত্রকল্পের প্রসাদ। য়েট্‌স্-এর সাহিত্যসাধনা যখন সুরু হয়, তখনও ব্রাউনিং জীবিত, মেরিডিথ্ বুদ্ধিজীবীদের ইষ্টদেবতা, ফ্রান্সিস্ টম্‌সন্-এর প্রসিদ্ধি রুচিবাগীশদের মধ্যে বাড়ছে। তৎসত্ত্বেও তাঁদের পদাঙ্ক এই কবিযশঃপ্রার্থীকে টানেনি। হয়তো 'কৃচ্ছ্রসাধনের মোহ' তাঁকে কিশোর বয়সেই মজিয়েছিলো;

এবং তিনি প্রাক্তন সংস্কারের কল্যাণেই বুঝেছিলেন যে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাসকূট সহজসাধ্য, আপাত-প্রাঞ্জলতাই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল। নয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আলেখ্যশিল্পের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি; এবং প্রথম জীবন সেই পৈত্রিক বিদ্যাভ্যাসে কাটিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ভালো ছবি বাগার্থের অতীত, প্রকৃতির প্রতিভূ হওয়া তার ব্যবসা নয়, সে অব্যক্তের প্রতীক, আপন গঠনসৌষ্ঠবের গুণে দ্রষ্টার কল্পনাকে অসীমে পাঠানোতেই তার চরিতার্থতা। সেইজন্যেই 'রাইমার্স্ ক্লাব্'-এর উদ্যোক্তা হিসেবে তরুণ য়েট্স্ যে-কাব্যাদর্শ প্রচারের ব্রত নেন, তার মধ্যে নিরাকার প্রত্যয় আদর পায়নি, তার পৃষ্ঠপোষণে বিদ্যাভিমানীর আত্মরতি জাগেনি, তার অনধিকার চর্চ্চায় দার্শনিকের অম্লজল ঘোচেনি; সে-কাব্য আশাপথ চেয়েছিলো শুধু সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতার আর সঙ্গতিপ্রেমিক দর্শকের। অবশ্য সে-কবিতার মর্ম্মানুসন্ধানও পণ্ডশ্রম নয়; কিন্তু সে প্রতীক, তার অর্থগৌরব পাঠকদের ইচ্ছাধীন। তাহলেও য়েট্স্-এর প্রতীকপূজা মালার্মে-র অনুবাদ নয়। তাঁর 'ট্রেম্লিং অফ্ দি ভেল্'-উপাধেয় আত্মজীবনীর নামকরণে সেই কবির প্রতিধ্বনি যদিও অভিপ্রেত, তবু ফরাসী প্রতীকীরা য়েট্স্-এর থেকে পৃথক। অন্তত মালার্মে-র চক্ষে স্বপ্নই একমাত্র সত্য ছিলো, এবং দৈনন্দিন সংসারকে তিনি এমনি অবান্তর ভাবতেন যে মানুষী ভাষায় আত্মোপলব্ধির প্রকাশকে ব্যর্থ জেনে, তিনি প্রায়ই বলতেন, কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ শাদা কাগজের নিষ্কলঙ্ক মৌনিতায়। এ-মতে য়েটস্-এর সমর্থন নেই; এবং তিনি বস্তুকে অস্থায়ী বিশেষণ দেন বটে, কিন্তু স্বপ্নকে ততোধিক অবিনশ্বর মনে করার হেতুও তাঁর অবিদিত। সুতরাং যে-ভাষা বস্তুর পদসেবী, তার সঙ্গে স্বপ্নেরও কোনো বিবাদ নেই। আসলে য়েট্স্-এর ভাষা অতিশয় সাবলীল এবং চিরপরিবর্ত্তনশীল, তার নিগড়ে ভাব কখনো পঙ্গু হয় না। শব্দব্রহ্মের সহজ সৃজনীশক্তির উপরে তাঁর আস্থা অগাধ; এবং তিনি যেহেতু বর্ণনায় যত্নবান নন, ব্যঞ্জনার প্রয়াসী, তাই তাঁর কাব্যের অর্থ বা বিষয়বস্তু অনেকের কাছে রহস্যাবৃত ঠেকলেও, সে-কাব্যের আবেদন

সার্ব্বভৌম। কারণ জাতিগত সংস্কৃতি ব্যতিরেকেও যখন বিদেশীরা পরদেশী সাহিত্যের মানে বোঝে, তখন সাহিত্যের অর্থ নিশ্চয়ই সার্থকতার নামান্তর। কিন্তু এই ধরণের সাহিত্যরস অনেক সময়ে শুধু বিলাসিতার অনুপান জোগালেও, স্বভাবসৌন্দর্য্যের অনটনে যেমন পূর্ব্বপুরুষের পরিশীলন-সম্পদই উত্তরপুরুষের অবজ্ঞাভাজন, তেমনি য়েট্স্-এর কবিতাও সার্ব্বজনীন অনুকম্পার অধিকারী শুধু স্বসমুখ রূপের জোরে।

কিন্তু রূপ আর কলাকৌশল বিভিন্ন প্রকৃতির; এবং শেষোক্তের অভাবে শিল্পসেবা যদিও বিড়ম্বনা, তবু রূপের আশীর্ব্বাদেই ললিত কলা কারুকার্য্যের অগ্রগণ্য। কারণ কলাকৌশলের শেষ উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহারে; উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে উৎপাদক ও খাদকের যে মানসিক কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে, এমন সন্দেহও তাকে বিচলিত করে না; অবাধ্য উপাদানকে বশে এনে, তার কাঠামোয় রচয়িতার স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলার ভার রূপের উপরে ছেড়ে দিয়ে, সে যথাসম্ভব যান্ত্রিক উপায়ে নির্ম্মিত সামগ্রীর দোষনিরাকরণেই ব্যস্ত। সেইজন্যেই কলা-কৌশলের উন্নতিকল্পে অভ্যাস ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ যথেষ্ট, কিন্তু রূপের পরিপুষ্টি সমগ্র জীবনযাত্রার মুখাপেক্ষী। চারিত্র্য আর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে হর্বর্ট্ রীড্ যে-বৈলক্ষণ্য দেখেছেন, আমার মতে রূপ আর কলা-কৌশলের মাঝেও সেই ব্যবধান বর্ত্তমান। কলাকৌশল চারিত্র্যের অভিব্যক্তি আর রূপ ব্যক্তিস্বরূপের; এবং চরিত্রগুণ একবার অর্জ্জন করলে তাকে হারানো যখন শক্ত, তখন কলাকৌশল শিল্পসৃষ্টিতে সংহতি ও স্থৈর্য্যই আনে, প্রাণসঞ্চার রূপের কাজ। উপরন্তু চারিত্র্য অনুকরণের ফল; আত্মীয়-বন্ধুর উপদেশ, প্রতিবেশের শাসন ও কুলসংক্রমণ, এই তিনের ঘাত-প্রতিঘাতই মানুষকে চরিত্রবান করে। কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপ জন্মায় আত্মজিজ্ঞাসার উদ্যোগে। অতএব তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নিকট; কারণ অভিজ্ঞতা আত্মজিজ্ঞাসার সহচর, ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে চিরপ্রথার বিরোধ না-বাধলে প্রত্যর্কের সুযোগ আসে না। তাহলেও ব্যক্তিস্বরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তাকে অভিজ্ঞতার

নিকষ বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বরূপও একটা প্রতীক, ব্যক্তির প্রবর্দ্ধমান সত্তাই তার পটভূমি, দৈনিক অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে, একটা অবিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী দর্শনে উপনীত হওয়াই তার উদ্দেশ্য; এবং সেইজন্যেই চারিত্র্যের মতো কৃপণ বা দ্বৈপায়ন উপাধি তাকে সাজে না; দৈবাগত সম্পত্তি খোয়ালেও তার যেহেতু প্রাণসংশয় ঘটে না, তাই পান্থশালাকে দুর্গে পরিণত করার প্রলোভন বা প্রয়োজন তার নেই; সে আনন্দ পায় চলে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ানোই তার বৈশিষ্ট্য। এ-কথা য়েট্‌স্‌ও জানেন, এবং সেইজন্যেই সাধনার চেয়ে সিদ্ধিতেই তাঁর আগ্রহ; কেবল অনবদ্য কলাকৌশলে তাঁর সাধ মেটেনা, তিনি প্রতিনিয়ত খোঁজেন রূপের পরিপূর্ণতা। কিন্তু রূপ আর জীবন হরিহরাত্মা। কাজেই য়েট্‌স্‌-এর সাহিত্যসেবা শুধু গ্রন্থাগারে আবদ্ধ থাকে না; সমাজে ও সংসারে, রাষ্ট্রনীতিতে ও হিতৈষণায়, প্রচারকার্য্যে ও সংগঠনে নিজের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার নিষ্ঠুর বিতরণে তিনি তাঁর ব্যক্তিতার সীমা বারম্বার পেরিয়ে যান। ফলে তাঁর ক্ষুদ্রতম কবিতার অমৃতলোকে আধুনিক মন ও বর্ত্তমান যুগই চিরন্তন মূর্ত্তি পায়নি, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীও সেই মায়ামুকুরে অক্ষয় রেখায় চিত্রার্পিত। ডব্লু-বি য়েট্‌স্‌ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সগোত্র, উপরন্তু তাঁর মহান্‌ হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তিনি এখনো নিঃশেষ করেননি; তাই তাঁর দীর্ঘ আয়ু ও সবল স্বাস্থ্য সকল শিল্পানুরাগীরই একান্ত কাম্য।

* * * *

দুর্ভাগ্যবশত শুধু য়েট্‌স্‌-জয়ন্তীর উল্লেখ ক'রেই এবারকার সম্পাদকীতে ছেদ টানা যাবে না। গত দু মাসের শোকসংবাদও বিস্তর। জর্জ্জ্‌ রাসেল্‌ (এ-ই) ও আঁরি বার্বুস্‌-এর তিরোধানে কেবল য়ুরোপীয় সাহিত্যেরই ক্ষতি হলো না, এই দুই দিক্‌পাল নক্ষত্রের অস্তগমনে ঘনায়মান পশ্চিমাকাশের অন্ধকারও হয়তো বাড়লো; এবং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর বন্ধুদের পক্ষে যেমন অরুন্তুদ, তাঁর দেশবাসীর পক্ষে তেমনি অপ্রতিকার্য্য

এঁদের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্যতা আমার নেই; কারণ এক এ-ই বাদে এঁরা কেউই স্বভাবসাহিত্যিক ছিলেন না। এমন-কি এ-ই-ও কবি হিসেবে যতই প্রশংসনীয় হোন না কেন, তাঁর প্রতিভার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি শিল্পোত্তর ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সুকুমার কলায় এঁদের চেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি থাকুন বা না-থাকুন, অকৃত্রিম মানবধর্ম্মের গুণে এঁরা প্রত্যেকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনের অধিকারী; এবং সে-গুণ আধুনিক জগতে এতই দুর্লভ যে সঙ্কীর্ণ বৈদগ্ধ্যের সাধুবাদ ছাড়াও এঁরা মানুষের কৃতজ্ঞ অন্তরে অমরতা পাবেন।

পুস্তকপরিচয়

কৌলজ্ঞান নির্ণয় and Some Minor Texts of the School of Matsyendra Natha.—Edited by Prabodh Chandra Bagchi, M. A., D. es lettres (Paris). Lecturer, Calcutta University. (Metropolitan Printing and Publishing House Ltd. Calcutta,)

An Introduction to the Adhyatma Ramayana—by Prabodh Chandra Bagchi, reprinted from Calcutta Sanskrit Series No XI (Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta).

নেপালের দরবার হইতে সংগ্রহ করিয়া ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয় এই চারখানি হিন্দুতন্ত্র গ্রন্থ (কৌলজ্ঞাননির্ণয়, অকুলবীরতন্ত্র, কুলানন্দতন্ত্র ও জ্ঞানকারিকা) বাহাত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকা ও গ্রন্থ চতুষ্টয়ের ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার সহ প্রকাশ করিয়াছেন। চারিখানি গ্রন্থই মৎস্যেন্দ্রনাথের নামের সহিত জড়িত—কোনখানাই মৎস্যেন্দ্রনাথের স্বরচিত নয়। সম্ভবতঃ মৎস্যেন্দ্র প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথের যে সকল শিক্ষা দীক্ষা প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহাই এই সকল গ্রন্থের আকার ধারণ করিয়াছে। ডাঃ বাগ্‌চি বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (যাহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল) তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০০ বৎসর (the middle of the 11th Century A. D.)। অন্য তিনখানি তন্ত্রগ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের নিশ্চয় পরবর্ত্তী।

একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া ডাঃ বাগ্‌চিকে এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হইয়াছে। একে প্রচুর লিপিকর প্রমাদ, তাহাতে আবার গ্রন্থগুলি অপসংস্কৃতে রচিত—ইয়োরোপের মধ্য যুগের যেমন Dog-Latin, গ্রন্থকার ব্যাকরণ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। সেইজন্য 'সুশব্দবাদী'দের অবজ্ঞা করিয়া তিনি 'অর্থশরণতামাশ্রিত্য' রচনায় প্রবৃত্ত। অতএব corrupt readingsএর অন্ত নাই। সেইজন্য অনেক স্থলে মূলের অর্থগ্রহণ কঠিন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ কে এবং কোন যুগের লোক? তাঁহার সম্পর্কে নানা প্রদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তীসমূহ এবং গ্রন্থমধ্যে রক্ষিত "পৌরাণিক" বিবরণসকল ডাঃ বাগচি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদিগের ভিত্তি এত দুর্ব্বল যে তাহার উপর সিদ্ধান্ত-গঠন দুর্ঘট। ডাঃ বাগচি মৎস্যেন্দ্রকে নবম শতকের শেষে ফেলিয়াছেন এবং লুই পাদের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ বঙ্গের সমতটে তাঁহার জন্ম এবং গোরক্ষনাথ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কামরূপে নাকি তাঁহার শিক্ষার প্রভাব খুব বিস্তৃত ছিল—

কামরূপে ইদং শাস্ত্রং যোগিননাং গৃহে গৃহে।

ইহাও অসম্ভব নয় যে তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন এবং পরে তান্ত্রিক সাধনায় 'সিদ্ধ' হইলে ব্রাহ্মণ পদবীতে উন্নীত হন। ইহার অধিক তাঁহার বিষয়ে নিঃসংশয়ে জানা কঠিন।

ডাঃ বাগচি বলিতেছেন—

When the Kaulajnana was compiled the Kaula School seems to have had already a fairly long history, as on several occasions the different Schools and the names of their teachers are given in the texts.

এ কথা ঠিক কিন্তু তিনি যে বলিতেছেন it may be held that there is some truth in the tradition which associates Hathayoga with Matsyendra, ইহার ভিত্তি কি?

ভূমিকায় ডাঃ বাগচি হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, এবং মৎস্যেন্দ্রের যোগিনী কৌলের সহিত কোন কোন বৌদ্ধতন্ত্রের সান্নিধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র উভয়েরই এক বুনিয়াদ (common basis) এবং তাহার সহিত চীনাচার ও তীব্বতীয় Tantricism-এর গাঢ় সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে এখনও সম্যক্ আলোচনার সময় আসে নাই। এখনও ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহকার্য্য চলুক—নেপাল, চীন, তিব্বত, কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, মধ্যদেশ, দাক্ষিণাত্য সকল স্থান হইতে উপকরণ সংগৃহীত হউক। অবশেষে এমন এক synthetic geniusএর উদয় হইবে যিনি সকলের সমীকরণ করিয়া চরম সিদ্ধান্তের চূড়ায় আরোহণ করিবেন—ইতিমধ্যে ডাঃ বাগচির কথাই ঠিক্ কথ—

But that is a subject which cannot be properly treated in the present state of our knowledge of the Tantras.

এই প্রসঙ্গে একটা কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই—বাগচি মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন কিন্তু সাধারণ পাঠকের হয়ত ইহা অবিদিত। তন্ত্রকে পাশ্চাত্যেরা যতটা অর্ব্বাচীন ভাবেন তন্ত্র তত অর্ব্বাচীন নয়। তন্ত্রের দুই মূর্ত্তি এবং উহার নির্দ্দিষ্ট মার্গও দুই। একটি দক্ষিণ মার্গ (white) এবং অন্যটি বাম মার্গ (black)। ভবভূতির মালতীমাধবে আমরা এই দ্বিবিধ মার্গেরই পরিণত আকারের সাক্ষাৎ পাই। 'সৌদামিনী' দক্ষিণ মার্গের সিদ্ধ সাধিকা এবং কাপালিক 'অঘোর ঘণ্ট' বামাচারী। দক্ষিণ মার্গের হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থে (এবং অল্পবিস্তর বামমার্গের গ্রন্থেও) বেদান্তের ও (শুধু হঠযোগ নয়) রাজযোগেরও অনেক মূল্যবান কথা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সংগ্রহেও আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ষট্‌চক্র-ভেদ বিষয়ে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।

ব্রহ্মস্থানে যৎ কমলং চতুঃষষ্টীদলান্বিতম্।
তত্রৈব মনসা রোধ্য লক্ষয়েদ্দীপশিখান্ ব্রতী।

পাঠক 'কৌলজ্ঞানের পঞ্চম পটল পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক পাইবেন।

দধিমধ্যে যথা সর্পিঃ কাষ্ঠে চাগ্নিঃ স্থিতো যথা।
পুষ্পে গন্ধস্তিলে তৈলং বৃক্ষে ছায়া সমাশ্রিতা।
মদ্যমধ্যে যথানন্দং দীপে প্রভা সমাশ্রিতা। * * *
নিশ্চিতং নিশ্চলং সাম্যং নির্দ্বন্দ্বং চ নিরাকুলম্।
ভবেনু ভোক্ষো নরাণাশ্চ দ্বন্দ্বভাববিবর্জ্জিতম্। * * *
গুণত্রয়বিনির্ম্মুক্তং সদা নির্ব্বাণলক্ষণম্। * * *
ধর্ম্মাধর্ম্মং যদা ত্যক্তং ক্ষিপ্রং মুঞ্চন্তি মানবাঃ।

—এ সকল নিছক বেদান্ত। কৌল কি? ডাঃ বাগচির ভূমিকা হইতে এ সম্পর্কে কিছু নূতন আলোক পাওয়া গেল—

কুলঃ শক্তিরিত প্রোক্তমকুলঃ শিব উচ্যতে।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলধর্মিত্যভিধীয়তে।
ইতি তন্ত্রোক্ত শিবশক্তি সামরস্য বা কৌলম্।

'সহজ' 'সহজিয়া' শব্দ ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের গর্হাসূচক—ইদানীং উহার সহিত কামিনী ও বারুণীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—

যামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্।

'কৌলজ্ঞানে' মৎস্য, মাংস, মুদ্রা এই তিন মকারের উপদেশ পাওয়া যায় কিন্তু অন্য দুই মকার (মদ্য ও মৈথুনের) উল্লেখ দেখা যায় না। মৎস্য ও মাংস সম্ভবতঃ mystic phraseologyরূপে ব্যবহৃত—fish ও flesh নহে। বস্তুতঃ কৌলজ্ঞানে 'সহজ' সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত। সহজ তিনি—যিনি উপাসক ও উপাস্যের একত্বে সুস্থিত—

কৌলমার্গে যয়ো সন্তি কৃতকা সহজ্যা তথা।
কুণ্ডলী কৃতকা জ্ঞেয়া সহজা সমরসে স্থিতা।

অকুলবীর এই সহজানন্দ অনুভব করেন—

সহজানন্দঃ চ কেবলম্।

সে আনন্দ কিরূপ?

ভাবাভাবোবিনির্মুক্তঃ উদয়াস্ত বিবর্জিতঃ
স্বভাবমতিমৎশান্তঃ মনো যস্ত মনোময়ঃ।

সেই জন্য মনে হয় ডাঃ বাগচি কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই তন্ত্র চতুষ্টয় দক্ষিণ মার্গীয় —বাম মার্গীয় নহে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ বৈদান্তিক ও রাম ভক্তের পক্ষে উপাদেয় গ্রন্থ। এগ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কয়েকস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে বটে কিন্তু কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহার কোন নির্ভুল ও critical সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। Calcutta Sanskrit Series এতদিনে সে অভাব পূর্ণ করিল। এজন্য ঐ seriesএর পরিচালক সংস্কৃতানুরাগীর ধন্যবাদভাজন। মূল গ্রন্থের মুখবন্ধ স্বরূপ ভাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি ৭৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ইংরাজী ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। বিশেষতঃ ভূমিকার তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়ে ডাঃ বাগ্‌চি অধ্যাত্ম-রামায়ণে উপদিষ্ট অদ্বৈত বেদান্তের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও সারগর্ভ।

অষ্টম পূর্ব্বাধ্যায়ে ডাঃ বাগচি বাল্মীকি রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের তুলনা করিয়াছেন এবং কি কি বিষয়ে অধ্যাত্ম রামায়ণে আদি কবির বিবরণ অনুসৃত হয় নাই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে মহাভারতের বনপর্ব্বে যে রামায়ণ বিবৃত আছে তাহার সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের তুলনা থাকিলে ভাল হইত। ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিত মানস' রামায়ণের কয়েকস্থলে বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন। ডাঃ বাগচীর ভূমিকায় ঐ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিলে আমরা প্রীত হইতাম।

অধ্যাত্ম রামায়ণে মায়াসীতার উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে ডাঃ বাক্‌চি লিখিতেছেন—

Rama foretells Sita that Ravana will come to her in the form of Bhiksu and instructs her that she should remain inside the cottage leaving her shadow outside and that she should then live in the fire unseen for a year. They would be united after the death of Ravana. **It is also the illusive Sita whom Ravana carries away.

সম্ভবতঃ ডাঃ বাগ্‌চির ধারণা যে, মায়াসীতা অধ্যাত্ম-রামায়ণকারের সৃষ্টি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কূর্ম্মপুরাণে মায়াসীতার উল্লেখ আছে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা।
পরীক্ষসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। চরিতামৃতে আরও দেখিতে পাই, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দক্ষিণভারতে তীর্থ দর্শনোপলক্ষে যখন মাদুরায় উপস্থিত হন তখন এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ মহা রামভক্ত। তাহার মহা দুঃখ ছিল যে, রাবণ সীতাদেবীকে স্পর্শ করিয়াছিল—

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি।

মহাপ্রভু তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মাত্র হরিল রাবণ।
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল।

কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে স্বস্তি হইল না। মাদুরা হইতে মহাপ্রভু রামেশ্বর আসিলেন। সেখানে দেখিলেন, ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছে। তাহাতে মায়াসীতার প্রসঙ্গ শুনিয়া সেই পুরাতন পুঁথির পত্রটি মাগিয়া লইয়া পুনরায় মাদুরা আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইলেন।

বিপ্র সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা উপাখ্যান।
মায়া সীতা মিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লইল।
পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইল।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, চৈতন্যযুগের পূর্ব্বেও দক্ষিণ ভারতে উচ্চবর্ণের মধ্যে রামভক্তের অভাব ছিলনা। ডাঃ বাগ্‌চির ধারণা যে রামাইত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দই রামসীতার উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন (রামানন্দের জন্মকাল ১৩৫৬ বিক্রম সংবৎ—১৩০০ খৃঃ)

The Ramaite sect was founded by Ramananda who introduced for the *first time* the worship of Rama and Sita. ** His disciples who mostly belonged

to the lower castes were all worshippers of Rama. The only mode of worship with them was Japa or the repetition of the name of Rama.

তিনি আরও বলেন যে অধ্যাত্ম রামায়ণের রচনাকাল খৃষ্টীয় শঞ্চদশ শতাব্দী যে সময় রামাইত মত ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভ করিতেছিল এবং এজন্য রামভক্ত তুলসীদাসের বিশেষ কৃতিত্ব। (তুলসীদাসের সময় খৃষ্টীয় ১৫৩২—১৬২৩)

The followers of Ramananda were all non-Brahmins and it was probably through the activities of Tulasidasa that the Rama cult was introduced amongst the Brahmins. The Adhyatma Ramayana seems to have been composed in this period, perhaps a little earlier than the time of Tulasidasa, about the 15th cent. when the Ramaite cult was being introduced in the Brahmanical fold.

এ সকল কথার অনুমোদন করা যায়না। আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যযুগের পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে রামভক্তের অভাব ছিলনা। উত্তর ভারতের ত' কথাই নাই। এমনকি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত রামোপাসক ছিলেন। চরিতামৃতে দেখিতে পাই চৈতন্য-আজ্ঞায় মুরারি একবার রামোপাসনাস্থলে কৃষ্ণউপাসনা আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
ছাড়িতে না পারি রাম মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যায়।
তোমার আজ্ঞাভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥

আর রামনাম সঙ্কীর্ত্তন? তুলসীদাসের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামের সহিত রামনাম গান করিয়া বেড়াইতেন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

পদ্মপুরাণেও দেখিতে পাই, শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

রাম রামেতি রামেতি রাম রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ডাঃ বাগচি অধ্যাত্মরামায়ণের কাল নির্দ্দেশ করিতে যে সকল যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন তাহা আমার নিকট সুযুক্তি বলিয়া মনে হয় না। তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণকে পুরাণ শ্রেণী ভুক্ত করিতে নারাজ। তিনি বলেন রামভক্তিকে যখন "প্রেমলক্ষণা" বলা হইয়াছে (তস্মাৎ রাঘব সদ্ভক্তি স্তুয়ি মে প্রেমলক্ষণা) এবং যখন প্রেমভক্তি চৈতন্যের অনুচরগণ কর্ত্তৃকই ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথমতঃ প্রচারিত হয়, তখন "Our text could not have been composed much earlier than this period—" বিশেষতঃ অধ্যাত্মরামায়ণে যখন বৃন্দাবনের নাম আছে। বৃন্দারণ্যে বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং বন্দে রামং। বৃন্দাবনের নাম ভাগবতে নাই কি?

বৃন্দারণ্যং শ্বপদরমণঃ প্রাবিশৎ গীতকীর্ত্তিঃ।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কর্ণামৃতের কথা কে না জানে! মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে সযত্নে এই কর্ণামৃতের নকল করিয়া আনেন এবং গম্ভীরায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত এই কর্ণামৃত আস্বাদন করিতেন। এই কর্ণামৃত অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে বৃন্দাবনের নাম তো আছেই, অধিকন্তু বিল্বমঙ্গলের মুখে আমরা প্রেমধর্ম্মের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাই—

তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥

আমার ধারণা অধ্যাত্মরামায়ণ পুরাণ শ্রেণীর গ্রন্থ। যে যুগে ঐ গ্রন্থচক্র (cycle) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অধ্যাত্মরামায়ণ সেই যুগের রচনা। এযুগ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতকের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। পুরাণযুগের গ্রন্থ বলিয়াই ইহার আরম্ভ ষট্-সংবাদিনী কথায় এবং পুরাতন রীতি অনুযায়ী ইহার সবিশেষ মাহাত্ম্য খ্যাপন, (ডাঃ বাগ্‌চি যাহাকে special sanctity বলিয়াছেন)। খুব সম্ভবতঃ অন্যান্য পুরাণের ন্যায় পরবর্ত্তী যুগে সেই আদি অধ্যাত্ম রামায়ণ নবীকৃত (new reduction) হইয়াছিল। সেই সময় অর্ব্বাচীন প্রসঙ্গের সন্নিবেশ ঘটা আশ্চর্য্য নয় (বাগ্‌চি মহাশয় যাহার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন)। এই নূতন সংস্করণেও পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্তের যোগ অসম্ভব নহে। বিশেষ অনুধাবন সহকারে সংস্কৃত মূল আলোচনা করিলে হয়ত এখনও ঐ প্রক্ষিপ্তের আবিষ্কার করা যাইতে পারে। আশা করি ডাঃ বাগ্‌চি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

আধ্যাত্ম রামায়ণের লক্ষ্য বৈদান্তিকভাবে বাল্মীকির রামায়ণের পুনর্গঠন এবং অসঙ্কোচে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মত্ব খ্যাপন। বাল্মীকি রামায়ণের কয়েকস্থলে শ্রীরামচন্দ্রকে 'ত্রৈলক্যনাথ, অনাদিনিধন বিষ্ণু' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ডাঃ বাগ্‌চি দুএক স্থলের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বালকাণ্ডে দেখা যায়—পরশুরাম কৃতবীর্য্য ও জড়ীকৃত হইলে রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

অক্ষয়ং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তিতেস্তু পরন্তপ॥
ন চেয়ং মম কাকুৎস্থ! ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ॥

—বালকান্ত, ৭৬।১৭, ১৯

কিন্তু, তাহা হইলেও শ্রীরামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত। রাবণ বধের পর দেবতারা সমবেত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিলে রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি ত' মানুষ—দশরথের পুত্র—আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি—আমাকে বলুন।"

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবান্ তদ্ ব্রবীতু মে॥

তখন দেবতারা বলিলেন,—

সীতালক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুদেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীংতনুম্॥

—১১৯।২৭

"সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী এবং আপনি ভগবান্ বিষ্ণু। রাবণ বধের জন্য মানুষী তনুতে প্রবেশ করিয়াছেন।"

অধ্যাত্ম রামায়ণকারের দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত নহেন—সম্পূর্ণ সচেতনঃ। তিনি, বৃদ্ধ, সত্যসনাতন অদ্বয়। ব্রহ্মতত্ত্ব এবং রামায়ণের সমস্ত ঘটনা তাঁহার 'লীলাকৈবল্য মাত্র'।

ভূমিকায় যে সকল সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই। ডাঃ বাগ্‌চি সঙ্কল্প শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন—proposition। ইহা কি ঠিক্? নরনারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ। এখানে 'নরনারায়ণ' সেই বিখ্যাত নর ও নারায়ণ ঋষি—কিন্তু বাগ্‌চি মহাশয়ের অনুবাদ—You are the Narayan in the form of man। ত্বমেব সর্বমিদং ত্বদ্বিনির্মুক্ত কিঞ্চন—ইহা বেদান্তের প্রসিদ্ধ 'ব্যতিরেক'। ডাঃ বাগ্‌চির অনুবাদ এই—All this exists when you are ignored but nothing of it exists when you are known। অবিদ্যাকৃতদেহাদিসঙ্ঘাতে প্রতিবিম্বিতা—সঙ্ঘাত=organism। বাগ্‌চি মহাশয়ের অনুবাদ 'when the chit-shakti reflects itself in the material world created by Avidya'। বেদান্তের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশা সুপরিচিত—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধির উপযাতে একই চিন্মাত্র বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ রূপে প্রতিভাত হন। ইহা ব্যষ্টি-উপাধি লক্ষ্য করিয়া। যখন সমষ্টি-উপাধি লক্ষ্য করা হয় তখন চিদাকাশের সংজ্ঞা হয় বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও সূত্রাত্মা। এই প্রসঙ্গের অবতারণায় ডাঃ বাগ্‌চি একটু অনবধান প্রদর্শন করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন বিশ্ব-সাক্ষ্য—The witness of the world, তৈজস-সাক্ষ্য—The witness of the functions এবং প্রজ্ঞা-সাক্ষী—The witness of the consciousness,

এই সকল ক্ষুদ্র ত্রুটী বিচ্যুতি আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে বিদূরিত হইবে। মোটের উপর ডাক্তার বাগ্‌চির এই ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং ইহা সুধী সমাজে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

The Chinese Renaissance—By Hu Shih. (The University of Chicago Press).

সান্ ইয়াৎ সেনের পরই চীন দেশের নেতাদের মধ্যে হু শি-র নাম ও খাতির। বর্ত্তমান কালের চৈনিক নবজীবনের মূলে রয়েছে তাঁরই প্রতিভা। দর্শন, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চীন যুবকের আধুনিক মনোভাবের জন্য যদি কোন একটি ব্যক্তিকে দায়ী করা সম্ভব হয়, তবে তাঁকেই করতে হবে। দর্শনে তিনি Deweyর শিষ্য, সাহিত্যে তিনি মুক্তিবাদী ও রিয়ালিষ্ট, ভাষায় তিনি ডিমক্রাট। সর্ব্বসাধারণের কথিত ভাষায় (pei-hua) তিনি নানান রকমের পুস্তক-প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়েছেন। শিক্ষাতত্ত্বে, সমাজ-সংস্কারেও

তিনি অগ্রণী। নিজে খ্রীষ্টান, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েও স্বদেশের কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান। বিদেশীরা হুশিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবেই দেখেন। এমন লোকের বক্তৃতাগুলি যে উচ্চশ্রেণীর হবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে!

তাঁর ভাষায় তাঁর মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করছি:

If I have any thesis to present, I want my readers to understand that cultural changes of tremendous significance have taken place and are taking place in China, in spite of the absence of effective leadership and centralised control by a ruling class, and in spite of the deplorable necessity of much undermining and erosion before anything could be changed. What pessimistic observers have lamented as the collapse of Chinese Civilisation, is exactly the necessary undermining and erosion without which there could not have been the rejuvenation of an old civilisation. Slowly, quietly, but unmistakably, the Chinese Renaissance is becoming a reality. The product of this rebirth looks suspiciously occidental. But, scratch its surface and you will find that the stuff of which it is made is essentially the Chinese bedrock which much weathering and corrosion have only made stand out more clearly—the humanistic and rationalistic China resurrected by the touch of the scientific and democratic civilisation of the new world."

উদ্ধৃতাংশে হু শি-র বিনয় এবং উন্নতিবাদ বড়ই উপাদেয়।

বইখানি উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে। পড়তে পড়তে আমার মন সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছিল। মনকে সজাগ করবার ক্ষমতাটাই লেখকের গুণ। কিন্তু বিমর্ষ হয়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়াটা কি পাঠকেরই দোষ?

হু শি-র বক্তব্যে আমার ভীষণ আপত্তি আছে।

(১) নবজীবনের সঙ্গে economic ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে কি থাকতে পারে বইটা পড়ে কোন সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না। অথচ চীনের এই জাগরণে যে আর্থিক শোষণ ও দৈন্যের জন্যই হয়েছে সকলেই জানেন। এই বিষয়ে Tang Leang-Lir বিশ্লেষণ হু শি-র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও বিশ্বাসযোগ্য।

(২) যদিও হু শি বলেছেন যে চৈনিক নবজাগরণ চৈনিক কৃষ্টির 'প্রস্তর-শয্যায়' ওপরই সংঘটিত হয়েছে তবু হু শি-র ব্যাখ্যা পড়ে ও মনোভাব দেখে মনে হয় যে তাঁর ধারণা যে সে জাগরণ কেবল পশ্চিমী সভ্যতারই উন্মেষনায়। সামাজিক বিবর্ত্তনের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে এমন কৃতজ্ঞতা ও অতিভক্তির প্রয়োজন থাকত না। পশ্চিমী সভ্যতার দিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে হু শি একেবারে নিঃসন্দেহ—যেন সেটা প্রকৃতির নিয়ম।

(৩) আধুনিকতাতেও হু শি-র বিশ্বাস নিতান্ত প্রগাঢ়। বইখানির কোন ছত্রে valuationএর চিহ্ন নেই। আধুনিকতা বলতে তিনি বিজ্ঞান ও সাধারণতন্ত্রই বোঝেন। তাঁর মতে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মনোভাব চীনাদের পক্ষে গ্রহণ করা নিতান্তই সহজ—কারণ চীনারা বরাবরই rationalistic, এবং গত তিন শত বৎসরের critical scholarship-এর চর্চ্চায় নিতান্তই মানবিক এবং ইহজাগতিক হয়ে

উঠেছে। সাধারণতন্ত্রেও হু শি-র বিশ্বাস ঐ ধরণেরই। সামুরাই ছিল বলে পশ্চিমী সভ্যতার সারাংশ গ্রহণ করতে জাপান যেমন তৎপরতা দেখিয়েছে তেমনি তৎপরতা অভিজাত-সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অভাবে চায়না দেখাতে পারেনি বলে হু শি-র মনে আফ্‌শোষ আছে। কিন্তু আফ্‌শোষ পুষে বসে থাকবার লোক তিনি নন, তাই popular speechএর সাহায্যে জনগণকে জাগাচ্ছেন।

আমাদের দেশেও প্রায় সমগ্র নব-পরিশীলনের একটি উৎস এখনও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ Gilbrt Murrayর পত্রের উত্তরে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। পশ্চিমী সভ্যতার দান, বিজ্ঞানের দোষ-গুণ, পূব-দেশের বিশেষতঃ ভারতের ঐতিহ্য এবং নতুন-সংস্কার গ্রহণ করবার শক্তি ও তার সীমা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আদান প্রদান—এই সব বিষয়ে আলোচনা তিনিও করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রফেসর নন, এবং তিনি চিঠিই লিখেছেন, পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি। সেইজন্য তাঁর চিঠিতে systemএর অভাব আছে। কিন্তু পড়ে যেন সন্দেহ হল, পত্রলেখকই ঠিক বলেছেন, যেন তাঁর বোঝবার ক্ষমতা আরো বেশী, পূর্ব্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধ তিনিই ধরেছেন, বিজ্ঞানের সীমা তিনিই নির্দ্ধারণ করেছেন, যেন তিনিই a better humanist। (Open Letters—East and West. International Institute of Intellectual Co-operation Paris 1935).

(৪) বইখানিতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষ রয়েছে। ৮৫ পৃষ্ঠায় পাঁচ দফা আপত্তি রুজু হয়েছে। পর পর লিখছি—

Celibacy, mendicancy, ascetism and self-sacrifice and suicide, abstruse mythology and metaphysics, hair-splitting differentiations, most selfish and anti-social scheme of salvation, and for what end? Forsaking of the family and desertion of all one's duties to the state—

এ-সবই চৈনিক মনোভাব ও মানবধর্ম্মের প্রতিকূল। কি করে চীন-সভ্যতা এই বিষ উদ্গীরণ করল তার বর্ণনাও আছে। প্রধান উপায় হল সনাতন—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

"The native religion of Taoism, which rose in the centuries after the gradual invasion of Budhism, was a revival of the old Sinitic religion of the people under the influence of the impact of Budhist ideas and practices. First unconsciously, and then fully consciously, Taoism undertook to kill its foreign rival by imitating every feature of it."

অর্থাৎ দেশী অবতার তৈরী হল—লাওৎসে—তারপর এগী, ধর্ম্মসূত্র, স্বর্গ-নরক কিছুই বাদ গেল না—তবে সবই স্বদেশী—Buy Chinese। অবশ্য তাও-এর সঙ্গে অত্যাচার এবং অত্যাচারের সঙ্গে Zen-ধর্ম্মও মিশেছিল;—মেস্‌মেরিজমের সঙ্গে আর্সেনিকের মতন। Zen-ধর্ম্মও নাকি খাঁটি দেশী, অর্থাৎ অ-ভারতীয়? চীনের দার্শনিক ইতিহাসে কিন্তু উল্‌টো কথাই পড়েছি। Arthur Waleyর "The Way and its Power" একটি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক গ্রন্থ। তাও-ধর্ম্মের অন্য ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। Waley সাহেবের মতে তাও-ধর্ম্মে বিদেশী বিশেষতঃ ইরাণী, গ্রীক ও

ভারতীয় প্রভাব আছে। তৃতীয় শতাব্দীর ধর্ম্মগ্রন্থে ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও পৌরাণিক উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই :

I see no reason then to doubt that the Chinese technique of self-hypnosis may have been supplemented in the third century, particularly towards its close by hints from abroad. But we are not at present in a position to prove that this was so." (পৃঃ ১১৫)

Holy mountain-men' ঋষি এবং যোগাসন ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় পদ্ধতির সাথে যোগের চিহ্ন Waley লক্ষ্য ও নির্দ্দেশ করেন নি। তাও-ধর্ম্মের এই সামাজিক-ব্যাখ্যা বড়ই নতুন।

অবশ্য হু-শিও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কে ঠিক কথা বলেছেন জানি না। আমার ভারতীয় অভিমান হৃত আছে—কিন্তু সেটা হু শি-রই ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি আক্রোশ-প্রসূত। পশ্চিমী-সভ্যতার প্রতি অমন শিশুসুলভ বিশ্বাস না থাকলে ঐ প্রকারের যুক্তি লেখা যায় না। তবে হু শি আমেরিক্যান শ্রোতার কাছেই বলেছিলেন—এই যা কথা!

পুনরায় লিখছি—বইখানি খুবই ভাল—কিন্তু আমার মোটের উপর ভাল লাগল না। যে-টুকু ভাল লেগেছে সেটুকু হল তাঁর সমাজ-তত্ত্ব সাধনা ও শিক্ষা, যদিও সেটি আমেরিক্যান পণ্ডিতের সমাজতত্ত্ব—অর্থাৎ classificatory, synthetic নয়। হু শি-র বিনয় চৈনিক-বৈদগ্ধ্যরই উপযুক্ত। তাঁর মতন কৃতী ও যোগ্য ব্যক্তির বর্ণনায় নিজের নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই দেখে খুশী না হয়ে থাকা যায় না।

পরিচয়ের পাঠকবর্গকে তৃতীয় অধ্যায়টি পড়িতে অনুরোধ করছি। তাতে সাহিত্যিক-বিপ্লবের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে Scrutinyতে Richardsএর ঐ বিষয়ের প্রবন্ধটি যদি মনোযোগ সহকারে তাঁরা পড়েন তা হলে অন্যান্য উপকারের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র দান সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপকারটিও সংসাধিত হবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Rock—By T. S. Eliot (Faber and Faber).

Murder in the Cathedral—By T. S. Eliot (Faber and Faber).

এ যুগ যে বিশেষজ্ঞের যুগ, সে কথা আজ সবাই জানে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাই আজ আমরা ভৈষজতত্ত্বজ্ঞ হাতুড়ের কাছে যাই না অথবা আই, এস্, সি পড়ে, সত্যেন বোসের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়বার ধৃষ্টতাও রাখিনা। এ যুগধর্ম্ম আমরা আজ প্রায় সব কাজেই পালন করি—এক সাহিত্য ছাড়া। সাহিত্য বিষয়ে অনেকেরই ধারণা যে জনগণমনই সাহিত্যিকের সাধনা—লক্ষ্য। এ ধারণা পোষণে অবশ্য অনেক লেখকও সহায়তা করেন। ফলে দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠক হয়ে ওঠে কবিতার দুর্ব্বিনীত পাঠক। মুদ্রাযন্ত্রের মাহাত্ম্যে দৈনিক পত্রের অর্ব্বাচীন

অপব্যবহারের জয়জয়কার যেখানে সে ক্ষেত্রে যদি কবিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাতে আশ্চর্য্য কি? তাছাড়া উচ্চকপাল না হয়ে কাব্যের যথাযথ আবেদন পাঠকমনে পাঠানো আজ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক শিক্ষা-প্রসারে নাট্যশালা ও সিনেমার অজ্ঞরুচি সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক তথা বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে ভাষার অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভাষা হয়েছে বাজারের ঘষা পয়সা। কথাগুলো যেন শেওলাধরা, ধরলে পিছলে পড়ে যায়। কাব্যের আবেদনে তাই আজ কবিকে ও পাঠককে ভাবিত করার প্রয়োজন। এলিয়টের মতো সত্য কবিকে তাই বিশেষজ্ঞ কবি হতে হয়েছে।

তাই এলিয়টের কবিতা সম্বন্ধে সাধারণের মতামত হাস্যগ্রাহ্যমাত্র। তাঁর ভাষা-সংক্ষেপ, স্থান-সংকোচ, উদ্দেশ, ইঙ্গিত অনেকের বিভীষিকা হলেও তার সার্থকতা অবিসম্বাদী। কিন্তু বিদগ্ধজনের সংখ্যা ভারতবর্ষের বাইরেও খুব বেশী নয়, এবং এলিয়টের সাধারণগম্য হওয়ার বাসনা তাঁর নিজেরই স্বীকৃত। এলিজাবিথান্ নাটকের এই দুর্মুখী আবেদন বরাবর এলিয়টকে লুব্ধ করেছে। অতি সুকুমার বিদগ্ধ পাঠকের কাছেও যাঁর আবশ্যিক আবেদন সেই নাট্যকার সাধারণ নাট্যামোদীর সময় হরণেও পটু। নাটকীয় রূপ তাই এলিয়টের কলমকে বহুকাল ধরে টান্‌ছে। তাঁর উচ্চাশা নাটকের উভয়ল রূপের একাধারে আপাতবোধ্যতা এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যের সামঞ্জস্য করা।

তাঁর সে উচ্চাশা কতটা পূর্ণ হলো, তা এখানে বসে' সঠিক বোঝা শক্ত। কারণ নাটকের সাফল্য অনেকটা ও অনেক সময়ে রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্তিলাভের অপেক্ষা রাখে, বিশেষ করে' যদি কোনো নাটক পরিদৃষ্টই হয় তাহলে'। এবং The Rock অন্তত সেই শ্রেণীর নাটক।

এলিয়টের পক্ষে এই সাফাই বোধ হয় এবার দরকার। পরিচিত এই কবির লেখা এবারে পড়তে গিয়ে শেষে বলতে হয়—নাটক দুটি ফরমায়েসী লেখা। আর বাস্তবিকই তাই। প্রথমটিতো গির্জ্জাসাহায্য কল্পে লেখা, দ্বিতীয়টিও ক্যাণ্টারবুরির উৎসবের জন্য লেখা। শুধু তাই নয়, The Rockএর লেখা আগাগোড়া অন্যদের দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত।

এই সব আপাতজ্ঞাতব্য কথাই মনে হচ্ছে, তার দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে বই দুটি যাকে বলে উত্তরায়নি। এলিয়ট আজ পর্য্যন্ত যা লিখেছেন তা সব সময়েই মহাকাব্য না হোক্, সুপাঠ্য কবিতা হয়েছে, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মমত এইবার তাঁর সাহিত্যিক বিচ্যুতির কারণ হলো। গদ্য সমালোচনায় তাঁর ধর্ম্মমত কিছুকাল ধরে' অনেকের পক্ষে অসহ্য রকম স্পষ্ট হচ্ছিলো, এবারে সে স্পষ্টতা তাঁর সাহিত্যিক শক্তিকে দূষিত করলো।

আর নাটকদুটির ব্যর্থতার কারণ শুধু ধর্ম্মমতই নয়। গ্রীক নাটকের কোর্‌স্ এবং টিউডর্ মর‍্যালিটি ও ক্রনিক্‌ল্‌প্লের প্রতি অত্যধিক প্রীতিও এলিয়টের ব্যর্থতার গৌণ কারণ। গৌণ কারণই বটে—তাই সোফোক্লিসের কোরাসের বদলে দেখি রকের কোরাস্ হলো গির্জ্জার কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর আমাদেরকে প্রস্তুত করবে রকের আগমনের মাহাত্ম্য বুঝতে। কিন্তু সে মাহাত্ম্য বোঝা শক্ত। মনে যখন অনুষঙ্গ নষ্ট

হয়ে' গেছে তখন শুধু আলঙ্কারিক আর্ত্তনাদ কি করে' ধাপে ধাপে মাহাত্ম্যপথে নিয়ে যাবে? তাই, উদাহরণত, প্রথম কোরাসে পাঠকের হৃদয় রকের কিম্ভূত কিমাকার পদধ্বনি শুনতে চঞ্চল হয় না—চঞ্চল হয় হয়তো ড'র একটি পূর্ব্বপ্রত্যাশিত লাইনে—

Perpetual revolution of configured stars,
Perpetual recurrence of determined seasons—
অথবা I journeyed to London, to the timekept city,
Where the River flows, with foreign flotation.

কিন্তু এলিয়টের কাব্যের এ বিস্ময়করতা আর এবার শেষ পর্য্যন্ত অভিভূত করে না। আলোর অনুষঙ্গ এলিয়টের একটা মুখ্য জাদুকাঠি। সেই আলোও এবারে প্রচারকের কাব্যেতর হাতে হয়ে' উঠেছে ব্যর্থ, মাটীর স্তূপ রকের আড়ালে মোহন্ত মহারাজের পটভূমি মাত্র। পুরোনো যেসব আলঙ্কারিক কৌশল আগে এই ভাবুক মনস্বীর লেখাকে মনস্পর্শী করে' তুলতো, এবারে সে সব অলঙ্কার প্রয়োগও প্রচারকার্য্যে ব্যর্থ। পুনরাবৃত্তি এলিয়টের হাতে অসামান্য সার্থকতা পেতো, এবারে সে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও টমাস্ বেকেটের মাহাত্ম্য বোঝা শক্ত। উদাহরণ স্বরূপ শুধু Rockএর শেষ কয়েক লাইনই ধরা যাক্—

And where we dwell, there is no Temple. For the Lord
God the Almighty, and the Lamb,
They are the temple. And the lamp thereof is the Lamb
And there with us is night no more, but only
Light
Light
Light of the Light.

অথবা ধরা যাক এই নূতন রীতির লাইন্ কটি—

Sweet and cloying through the dark air
Falls the stifling scent of despair ;
The forms take shape in the dark air :
Puss-purr of leopard, footfall of padding bear,
Palm-pat of nodding ape, square hyaena waiting
For laughter, laughter, laughter. The Lords
of Hell are here.

They curl round you, lie at your feet,
Swing and wing through the dark air.
O Thomas Archbishop, save us, save us, save
yourself that we may be saved ;
Destroy yourself and we are destroyed.

তাঁর ভাবুক সমালোচনা দিয়ে এলিয়টের মতামতের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। গির্জ্জা বা ধর্ম্ম যে আমাদের জীবনের লক্ষ্যহীন বিচ্ছিন্নতাকে এক্যিবদ্ধ না করলে আমাদের শান্তি নেই, সে কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করি। বোঝা শক্ত

এলিয়টের তীক্ষ্ণদৃষ্টির ভ্রান্তিবিলাস। গ্রীক্ কোরাস্, এলিজাবিথান্ আদিম নাটক, নিজের অসামান্য গদ্য ও পদ্য লিখনের ক্ষমতা থাকলেও পুণ্য ধর্ম্মপ্রচার নাটকে লেখা শক্ত, সেটা যে তিনিও বোঝেন না, সে কি তাঁর ধর্ম্মোৎসাহে এ নাটক দুটির ফরমায়েস গ্রহণ করাতেই প্রমাণ নয়? তাঁর এই লিখতে আর ফরমায়েসের বন্ধনে এবং ইতিহাসের বাঁধা পথে চলতে যাওয়া কি তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সাধনারই অঙ্গ?

এলিয়টের কাব্যপ্রতিভার লক্ষণ অবশ্য এ দুটি বইয়ে প্রচুর। কোরাস্‌গুলি তাঁর শিল্পকৌশল ও গভীরতার পরিচয়। ছন্দোময় পদ্যরীতির আশ্চর্য্যরূপও এবার নানাভাবে এলিয়টে পেলুম। এবং মধ্যে মধ্যে পেলুম সেনেকার বাক্-চাতুর্য্য ও এলিজাবিথান্ অমিত্রাক্ষরের ওজস্বী শক্তি। কিন্তু যিনি ইংরেজি Anabasis লেখেন, যাঁর লেখা Gerontion, Waste Land, Ash-Wednesday প্রভৃতির মতো কাব্য, তাঁর পক্ষে এ সব নৈপুণ্য তো স্বাভাবিক মাত্র। আশ্চর্য্য করে বরং তাঁর চরিত্রগুলির অস্পষ্টতা—বিশেষ করে' Murder in the Cathedral-এ এবং তাঁর ঘটনা-সংঘাতে মনকে নাড়া দেওয়ার অভাব। আর ক্ষুব্ধ করে তাঁর উৎসাহাধিক্য। হয়তো সেনেকার আবৃত্তি ও নাটোর প্রথার সমর্থনে তাঁর হলো এবার মাত্রাজ্ঞানের অভাব। অতি দীর্ঘ স্যমন্‌টি না হলে' কি করে' বইয়ের পাতা ভরে আর কি করেই বা নাহলে' নাইটদের বক্তৃতার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অতিকথনে নষ্ট হয়? আর বিষয় যে আমাদের বিরূপ করেছে তাও নয় কারণ অনুরূপ বিষয়ের নাটক আমাদের ভালো লাগে। ইয়েট্‌সের The Resurrection বা Calvary আমাদের মুগ্ধই করে। এবং New Tstament তো আমাদের কাছে মহাকাব্য।

তাই মনে হয় নাটকে এলিয়টের যা কর্ত্তব্য ছিলো এবং করবার ইচ্ছা ছিলো তা পাওয়া এখনো ভবিষ্যতের হাতে। আর তাই Sweeney Agonistes-কেই শুধু সেই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস বলে' ভাবতে হয়।

বিষ্ণু দে

পুরাণ-প্রবেশ—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত (এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)।

বাঙ্গালাদেশে বেধ অপেক্ষা পুরাণের চর্চ্চা অধিক হইয়াছিল। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আঠারখানি পুরাণের অনেক পুঁথি সংগৃহিত হইয়াছে। নবদ্বীপ পাব্লিক লাইব্রেরীতে ও গোস্বামীদের বাড়ীতে বৈষ্ণব পুরাণগুলির অনেক পুঁথি দেখিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের বোধ হয় কূর্ম্ম পুরাণের প্রচলন ছিল না। "রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিলেন" এই কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্য এক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। পরে রামেশ্বর তীর্থে আসিয়া তিনি

বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম পুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা উপাখ্যান।

মায়াসীতা নিল রাবণ—শুনিল বাখানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ২।৯ ১৮৫-১৮৬।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালাদেশে ভাগবতের আলোচনা চলিতেছে। তাই শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাপ্ত করেন দেখিতে পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণখানি হয়তো বাঙ্গালাদেশেই রচিত হইয়াছিল। কেননা ঐ পুরাণে দেখা যায় যে মেয়েরা শাঁখা পরিতেছে বিবাহের রাত্রে 'বাসর শয্যা' হইতেছে। মনসাকে জগদ্গৌরী বলা হইয়াছে। হুগলী জেলার নারিকেলডাঙ্গা গ্রামে ঐ নামে মনসার এক মন্দির আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, মগধ ও সুবঙ্গের (শ্রীহট্ট) কথা যত আছে অন্যদেশের কথা তত নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধার মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই পুরাণের প্রভাবেই জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাস যথাক্রমে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় লীলাগান রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশে অনেককাল ধরিয়া পুরাণের পঠন-পাঠন হইলেও, পুরাণগুলির তুলনা-মূলক ঐতিহাসিক বিচার অতি অল্পই হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙ্গালীদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষে" পুরাণগুলির বিবরণ দিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুরাণের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমরা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুরাণের ক্যাটালগ নামক মূল্যবান পুরাণ আলোচনার গ্রন্থ ও বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর জর্ণ্যালের ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ পাইয়াছি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর সুবিমল সরকার পুরাণ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীনতম সামাজিক অবস্থা বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। অবাঙ্গালীদের মধ্যে উইলসন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে পুরাণের বিচারাত্মক আলোচনা করেন। আধুনিক কালে পার্জ্জিটার সাহেব পুরাণ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দুইখানি বই লিখিয়াছেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে Wilhbald Kirfel নামক জার্ম্মান গবেষক Das Purana Pancalaksana নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরাণের আধুনিক ও প্রাচীন গবেষকদের মধ্যে কেহই পুরাণে বিবৃত রাজাদের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। পার্জ্জিটার সাহেব ঐ সব রাজাদের বিবরণকে tradition বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে রাজাদের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পুরাণের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেই যুগ ও মন্বন্তরের কালবাচক বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক মাপকাঠি বাহির করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কার মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারের ন্যায় বিস্ময়কর ও মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে যুগান্তরকারী। এতকাল পুরাণের কোন ঐতিহাসিক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই —কেননা কোন্ ঘটনা কোন্ রাজার সময়ে ঘটিয়াছিল জানা গেলেও, সেই রাজা

কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, জানিবার উপায় ছিল না। বিভিন্ন বংশের রাজা ও ঋষিদের পর্য্যায়ও সুষ্ঠুভাবে নির্ণীত না হওয়ায় কে কাহার সমকালীন তাহা জানা যাইত না। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় কাল ও পর্য্যায় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি রাজাদের কালনির্ণয় করিয়া পুরাণের আলোচনার ও নূতন গবেষণার পথ করিয়া দিয়াছেন।

বসু মহাশয় যে সমস্ত যুক্তি-বলে কালের পারম্পর্য্য আবিষ্কার ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেগুলি সংক্ষেপে বলিবার উপায় নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে কৌতূহল বোধ করিবেন তাঁহাদিগকে মূলগ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। কাল-নির্ণয় করিয়া তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। চৌদ্দটী মন্বন্তরের সময় তাঁহার মতে এইরূপ—

(১) স্বায়ম্ভুব ৫৯৫৮—৫৫৯৯ খৃঃ পূঃ, (২) স্বারোচিষ ৫৫২৯—৫২৪২ খৃঃ পূঃ, (৩) ঔত্তমি ৫২৪২—৪৮৮৫ খৃঃ পূঃ, (৪) তামস ৪৮৮৫—৪৫২৮ খৃঃ পূঃ, (৫) রৈবত ৪৫২৮—৪১৭১ খৃঃ পূঃ (৬) চাক্ষুষ ৪১৭১—৩৮১৪ খৃঃ পূঃ (৭) বৈবস্বত ৩৮১৪—৩৪৫৭ খৃঃ পূঃ (৮) সাবর্ণি ৩৪৫৭—৩১০০ খৃঃ পূঃ (৯) দক্ষ ৩১০০—২৭৪৩ খৃঃ পূঃ (১০) ব্রহ্ম ২৭৪৩—২৭৪৩—২৩৮৩ খৃঃ পূঃ (১১) ধর্ম্ম ২৩৮৩—২০২৯ খৃঃ পূঃ (১২) রুদ্র ২০২৯—১৬৭২ খৃঃ পূঃ (১৩) দেবসাবর্ণি বা রৌচ্য ১৬৭২—১৩১৫ খৃঃ পূঃ (১৪) ভৌত্য ১৩১৫—৯৫৮ খৃঃ পূঃ। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরের পর ঐ প্রকার কালগণণা-রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনু বংশ বা প্রিয়ব্রত বংশের পর্য্যায়কাল তিনি গড়ে ২৪০২ বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন ও ঐ বংশের প্রথমপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর সময় ৫৯৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ধরিয়া ৪৯ অধস্তন পুরুষ প্রচেতাগণের কাল ৪৭২৬ খৃঃ পূঃ ঠিক্ করিয়াছেন। বৈবস্বত মনুর সময় ৩৮১৪ খৃঃ পূঃ, তৎপরে ইক্ষ্বাকু বংশ।

বসু মহাশয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হইয়াও ঐতিহাসিক বিচারে যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই গ্রন্থখানি রচনা করিবার জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া একাগ্রচিত্তে পুরাণ পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত দু'এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। তবে তাঁহার নিকট হইতে আলোক পাইবার আশায় দু'একটী সংশয় প্রকাশ করিতেছি।

বসু মহাশয় ৪৮ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "বৈবস্বতমন্বর পর হইতেই মন্বন্তরগণনা রহিত হইয়াছে"। অথচ সমস্ত পুরাণ একবাক্যে বলিতেছে যে এখন বৈবস্বত মন্বন্তরই চলিতেছে। অধিকাংশ পুরাণেই লিখিত আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে নৈমিষারণ্যে বসিয়া ঋষিগণ পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৪৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল। ঐ সময় তো দেবসাবর্ণি বা রৌচ্য মন্বন্তরে পড়ে।

আলোচ্য গ্রন্থে একটি কল্পেরই হিসাবনিকাশ দেওয়া হইয়াছে মনে হইল। অথচ মৎস্যপুরাণের ৫৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কল্প ত্রিশটী, এবং বিভিন্ন কল্পের ঘটনা লইয়া বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছে। কল্প শব্দ ঠিক্ কি ভাবে পুরাণকারেরা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সমাধান হওয়া উচিত।

বসু মহাশয় মন্বন্তরকে কাল্পনিক কাল বলিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে প্রতি মন্বন্তরে প্রলয় হয়; কিন্তু শ্রীধরস্বামী মন্বন্তরে প্রলয় স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের কি অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করে।

আলোচ্য গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় আছে "ভার্গব জামদগ্ন্য পরশুরাম ১৯শ যুগে। ইঁহাকেই বায়ুপুরাণ অবতার বলিয়াছেন। ···২১ যুগের পরশুরাম অবতার নহেন।" বসু মহাশয়ের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামী নামক domiciled Bengalee পুরাণ-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া মধ্যযুগের উপযোগী তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ লঘুভাগবতামৃতে বলেন যে পরশুরাম অবতারকে "প্রায়ঃ সপ্তদশে কেচিদ্ ত্রাবিংশেঽন্যে চতুর্যুগে।" কিন্তু বসু মহাশয়ের নির্ণীত ১৯ বা ২১ যুগের সঙ্গে পূর্ব্ব প্রচলিত ১৭ বা ২২শ যুগের পরশুরামের সমাধান কিরূপে হইবে?

বসু মহাশয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে পুরাণ, মহাপুরাণ ও উপপুরাণের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। আবার ১৩৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"পুরাণ ও উপপুরাণের লক্ষণ একই প্রকারের"। আমরা জানি উপপুরাণ কম প্রামাণ্য। কোন পুরাণের অংশ বিশেষ লইয়া তাহার পরিবর্দ্ধনেই কি উপপুরাণের সৃষ্টি হয় নাই? ভাগবত মহাপুরাণও বটে, বৈয়াসিকী সংহিতাও বটে। আমার মনে হয় অধুনা প্রচলিত আঠারখানি পুরাণের মধ্যে তিনটী বিভাগ করা যায়। (১) পঞ্চলক্ষণ পুরাণ—Wilhbald Kirfel "Das Purana Pancalaksana" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে সমস্ত মহাপুরাণের $\frac{1}{10}$ অংশ মাত্র পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। (২) দ্বিতীয় যুগে পঞ্চলক্ষণকে বাড়াইয়া দশলক্ষণ করা হয়—বিশেষতঃ ভাগবতের জন্য। (৩) গরুড়, অগ্নি ও নারদ পুরাণকে বিষ্ণুকোষ করিবার চেষ্টা হয়। অগ্নি পুরাণে (৩১৪।১৭) পঞ্চ লক্ষণ ব্যতীত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, অভিধান, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, বৈদ্যক, গান্ধর্ব্ব, ধনুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র ধরা হইয়াছে। বসু মহাশয় পুরাণ ও মহাপুরাণের মধ্যে ভেদ টানিয়াছেন—আমি এই ভেদ স্বীকার করিতে পারিলাম না। তিনি ১৩৪ পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে মহাপুরাণের যে লক্ষণ দিয়াছেন উহা অনুসারে ভাগবত মহাপুরাণ হয় না; কেননা ভাগবতে arts and sciences of the people নাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের B & O Research Society'র journalএর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পুরাণকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা (১) Encyclopaedia of literature—গরুড়, অগ্নি, নারদ, (২) তীর্থ ও ব্রত—স্কন্দ, পাদ্ম, ভবিষ্য; (৩) with two revisions apparent—ব্রহ্ম, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত; (৪) Historical Brahmanda, Lost Vayu and Visnu; (৫) Sectarian—লিঙ্গ, বামন, মার্কণ্ডেয়; (৬) Old Purana revised out of existence—বরাহ, কূর্ম্ম, মৎস্য। কোন একটি নীতি অবলম্বন করিয়া এই শ্রেণী ভেদ করা হয় নাই বলিয়া ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। লিঙ্গ, বামন ও মার্কণ্ডেয়কে sectarian বলিয়া অন্যগুলিকে রেহাই দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। With two revisions and many revisions ভাল শ্রেণীভেদ,

কিন্তু অন্য পুরাণগুলি সম্বন্ধে বলা যায় না যে revision হয় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যের ক্রম বিকাশের স্তরনির্ণয় হিসাবে নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ করা যায় কিনা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। সর্ব্বাগ্রে পুরাণ পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট ছিল, পরে দ্বিতীয় স্তরে দশলক্ষণ, তৃতীয় স্তরে মহাকোষ ও চতুর্থ স্তরে ব্রত ও তীর্থ। প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে এই চারি স্তরেরই ছাপ কিছু কিছু পড়িয়াছে। বসু মহাশয় "পুরাণ প্রবেশে" পঞ্চ লক্ষণের দুইটী লক্ষণ—মন্বন্তর ও বংশহচরিত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দুইটীই হইতেছে পুরাণের চাবিকাঠি। আমার মনে হয় তিনি হারাণো চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়াছেন ও পুরাণের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসুগণকে পুরাণে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

"পুরাণ প্রবেশ" বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি আমাদের সাহিত্যের গৌরব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চরিত্রের দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে এই জাতীয় গ্রন্থ কেহ লিখিলে তিনি সাধারণতঃ তাহা দুইটী কারণে ইংরাজীতেই প্রকাশ করেন—প্রথম, গবেষণামূলক বাঙ্গালা বই পড়িবার ও কিনিবার লোকের অভাব, দ্বিতীয়, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিলে বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজে নিজের পাণ্ডিত্য প্রচারের দেরী হয়। বসু মহাশয় বাঙ্গালায় এই বই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তবে সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে তাঁহার মূল্যবান আবিষ্কার বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য ও এবিষয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য বইয়ের মূল সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারসহ ইংরাজীতে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

যুক্তবেণী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস)।
বাড়ি বদল—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত।
অন্তরঙ্গ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত।
মৃর্ত্তপ্রশ্ন—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.)।
অদৃশ্য সঙ্কেত—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (রমচক্র)।

যুক্তবেণী একখানি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। গ্রন্থকারের মনোভাব কতকটা এই যে এই প্রকারের সাহিত্য শুদ্ধ রসসৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হওয়া উচিত নয়; সাহিত্যের সাহায্যে জাতির গঠন বাঞ্ছনীয়। আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম জীবনে অনেক গলদ আছে, আর সেই মিথ্যা মোহ ও ভ্রান্তি বশেই নরনারীর মিলন সম্পূর্ণ ও পবিত্র হয় না। মোটের উপর উপন্যাসখানি একটি আদর্শবাদী চিত্র। সাহিত্যের মানদণ্ডে উপন্যাসখানি বিশেষ সার্থক না হলেও তার উদ্দেশ্যর মহত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না। একটি আদর্শ পরিবার কিরূপে স্ত্রী পুরুষের অযথা সন্দেহে, ও মান অভিমানে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল, বইখানিতে তারই কাহিনী আছে। শেষভাগে জননীর পুত্র চরিত্র, গুরুর প্রভাব ও আশ্রমিক ধর্ম্ম, নষ্টপ্রায় জীবনগুলির

সমন্বয় সাধন করেছে। কিন্তু জ্যোৎস্না ও রঞ্জনের চরিত্র আমাদের কাছে বিশেষ রকম দুর্ব্বল মনে হয়েছে। বোধহয় আধুনিক জীবনের, স্বেচ্ছাকৃত গ্রন্থিগুলি কতদূর জটিল ও অভিমানপ্রসূত তাই দেখাবার জন্য তিনি চরিত্র দুটিকে স্থূল ও হৃদয়াবেগ-সর্ব্বস্ব করেছেন।

বাড়ি বদল একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস। এতদিন বুদ্ধদেববাবু কয়েকটি নিরর্থক আধুনিক সমাজের ছবিই এঁকেছেন, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের খণ্ড ইতিহাসের চিত্র সতই আমাদের মনে রেখাপাত করেছে। নানা বয়সী নানা রকমের চরিত্র এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য সাধন করেছে। প্রত্যেকটিকে আমাদের জীবন্ত মানুষ বলে ভ্রম হয়। বাড়ি বদল বইটির গল্পাংশ সহজ ও সাবলীল।

বুদ্ধদেববাবু আমাদের দিনাহ্নদৈনিক, জীবনপ্রবাহের কয়েকটি বাস্তবচিত্রের সুন্দর সমাবেশ দেখিয়েছেন। আদর্শবাদিনী বিধবা ভ্রাতৃজায়া সুধাময়ী, অধ্যয়নশিল্প কিশোর পুত্র অমল, দেবর মনোরঞ্জন, জা মহাকালী, প্রত্যেক চরিত্রটিকে আমাদের পরিচিত মনে হয়। জা মহাকালীর স্বার্থপরতায় নিপীড়িত হয়ে এবং সংসারের কুৎসিত আবহাওয়া থেকে অমলকে রক্ষা করবার জন্য অমলের বন্ধু, অঙ্কণের সাহায্যে অন্যত্র বাড়ি বদলের উদ্যোগ করেন। এইটুকুই আখ্যানবস্তুর মধ্যে মনোরঞ্জনের স্নেহপ্রবণা কিশোরী কন্যা 'ছোকাহুর' জ্যাঠাইমার প্রতি অভিমানটি যেন সরল অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণের বিকাশ। স্ত্রীর হাতে মনোরঞ্জনের অস্তিত্ব লোপের বিপত্তিও আমাদের কাছে কৌতুকপ্রদ ও হাস্যকর।

অচিন্ত্যকুমারের যে উপন্যাসগুলি আমরা পড়েছি তা থেকে অন্তরঙ্গ স্বতন্ত্র ধরণের। বইখানিতে নূতনত্ব আছে বলেই মোটের উপর আমাদের ভালো লেগেছে। আখ্যানবস্তু অতি অল্প পরিসর। চরিত্রও বেশি নেই। গল্পাংশও জটিল নয়। বনমালীবাবু, কন্যা অনুভার যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার জন্য, মৃত পুত্রের বন্ধু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিমাদ্রির হাতে রোগিণীর ভার দেন। অবশেষে হিমাদ্রি অনুভাকে তার পিতার মতকে তুচ্ছ করে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য নিয়ে যায়। এই গল্পের পরিণতি। হিমাদ্রির মনোভাব সরল ও সুন্দর, রোগিণী তার কাছে গবেষণার বিষয়। রোগের কুৎসিত অশুচিতা থেকে মুক্ত করে, নীরোগ জীবনের স্পৃহা উদ্বোধনই করাই হ'ল বৈজ্ঞানিকের আন্তরিক প্রয়াস। বইখানিতে কোথাও ভাববিলাসিতা নেই। যেমন অনেক বইতে এ রকম ক্ষেত্রে এসে পড়ে। যখনই হিমাদ্রি বুঝতে পারলে, যে তার বলিষ্ঠ সঙ্গ ও নির্ভীক আশ্বাসবাণী ভিন্ন রোগিণীর জীবন-স্পৃহা ক্ষীণায়মান হয়ে পড়বে তৎক্ষণাৎ সে আপনার স্বার্থ পসার সব ত্যাগ করে রোগিণীকে অকুণ্ঠ-ভাবে আপনার সাহায্য দান করেছে।

অনুভার বন্ধু বিনীতা বন্ধুর রোগশয্যার পাশে বসে হিমাদ্রিকে আকর্ষণ করবার ইচ্ছায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, আবার বাড়িতে ডেকে লঘু হাস্যচ্ছলে ডাক্তারকে স্বাধিকারভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করা বড়ই বিসদৃশ লেগেছে। এছাড়া পিতা বনমালীর চরিত্রও সুসঙ্গত মনে হয় না। হিমাদ্রির সঙ্গে তার পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তী ব্যবহারের বৈষম্য আছে। কন্যার প্রতি তার আচরণ কোমল ও সস্নেহ নয়; বরং বিধৃত, রূঢ় ও নিষ্ঠুর। হয়ত বা অচিন্ত্যবাবুর মতে বিনীতার চরিত্র নারীজনোচিত হবে;

কিন্তু আমাদের মনে হয় এই খণ্ডচিত্রটি অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট। রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে যে নিঃস্বার্থ অন্তরঙ্গ ভাবটি ফুটে উঠেছে, তাতে বৈজ্ঞানিকের অধুনা-বিরল আদর্শবাদের পরিচয় পাই।

মূর্তপ্রশ্ন একখানি দীর্ঘ উপন্যাস। বইয়ের ঘটনাস্থল প্রথমাংশে নায়ক অমূল্যর পল্লীগ্রাম দিগ্‌গঞ্জপুরে, শেষ অংশ আশ্রয়দাতা নরেন্দ্রবাবুর কলিকাতার বাসগৃহে। অমূল্যের পিতা হারাণ চাটুয্যের দাদা তারিণী গ্রামের কূটবুদ্ধি চাণক্যবিশেষ। স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও যাবতীয় কুৎসিৎ মনোভাবে এই সমাজের শিরোভূষণটি অগ্রণী। নিরপরাধ ভাইয়ের সংসার নষ্ট করে দিয়েও, তাঁর তৃপ্তি হয়নি। ছোট-ভায়ের অনুগত গ্রামের আর একটি খাঁটিমানুষ শঙ্কর মুখুজ্জের নামে কুৎসিত অপবাদ রটিয়ে তাঁকেও গ্রামছাড়া করবার চেষ্টা করেন। অবশেষে অমূল্য তার ছাত্রের পিতা নরেন্দ্রবাবুর কাছে কলিকাতায় আশ্রয় পেলে। তারপর যা হবার তাই হল, অর্থাৎ নরেন্দ্রবাবুর কন্যা বিদ্যুতের প্রতি তার একটা বিশেষ রকম আকর্ষণ দেখা গেল। এদিকে গ্রামে শঙ্করবাবু কন্যা ইন্দু ও স্ত্রীকে নিয়ে অমানুষিক নির্য্যাতনে পীড়িত হতে লাগলেন। শেষকালে তারিণীর প্ররোচনায় দুর্বৃত্ত দ্বারা ইন্দুর অপহরণ, ইন্দুর উদ্ধার ও প্রাণরক্ষার চেষ্টায় অমূল্যর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং ইন্দুর অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বিদ্যুতের উপর নরেন্দ্রবাবু কর্তৃক অমূল্যর অমূল্য ভারার্পণ, সবচিত্রগুলি দ্রুত নিশেষিত হয়েছে। গল্পাংশটি এতই জটিল যে ধৈর্য্য রাখা বিপদ। অত্যন্ত নাটকীয় ভাব বেশি পরিমাণে আছে। পল্লীসমাজের চিত্র অতি পুরাতন। একসঙ্গে, নির্য্যাতন ও আত্মত্যাগ, সবল ও দুর্ব্বলের সমাবেশ। একদিকে সবাই অদ্ভুত রকমের ভাল, অপরদিকে প্রতিপক্ষ শয়তানের সামিল। এক কথায় সস্তার আদর্শবাদ।

সৌভাগ্যক্রমে উপন্যাসের এযুগ কেটে গিয়েছে। স্থানে স্থানে গৃহস্থ চিত্র পল্লীদৃশ্য মন্দ হয়নি কিন্তু গ্রন্থকারের মূর্তপ্রশ্নে কি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা আমাদের কাছে মূর্তপ্রশ্নই থেকে গেল। ঘটনা-পরম্পরাও যেমন অসংলগ্ন গ্রন্থকারের চিন্তাধারাও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক।

অদৃশ্য সঙ্কেত অতি বৈচিত্র্যহীন প্রেমের উপন্যাস বা বড় গল্প। এই বইটিতে, প্রচলিত নভেলের প্রতাশিত ধারারই পরিচয় মেলে। অবশ্য আমাদের এ ধারণা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের দ্বারাই পরিপুষ্ট। গল্পটির সারাংশ এই। শ্রীপতিবাবু তাঁর কন্যা লেখাকে উচ্চশিক্ষিতা করবার অভিলাষে কলেজে পড়তে দেন। সেখানে সহপাঠী রণজিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমে মায়ের সহায়তায় প্রগাঢ় ভালবাসায় পরিণত হল। এদিকে রক্ষণশীল পিতা কন্যার অসবর্ণ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করেন। অবশেষে তাঁরই ইচ্ছায় আলাপিত বন্ধুপুত্র বিমানের সঙ্গে লেখার বিবাহ সংঘটিত হল। বিবাহের পূর্ব্বে রণজিতের প্রতি লেখার অনুরক্তির কথা বিমান ভাল করেই জানত। তাই লেখাকে করতলগত করে বিমান স্ত্রীর সহিত যে আচরণ সুরু করলে তাকে পাশবিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। লেখা তার অধিকারগত হলে তার স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের অধঃপতন নূতন করে আরম্ভ হলো। বাপ মায়ের সঙ্গে মেয়ের ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্বটাই আখ্যান ভাগের

ভিত্তি। এই যে পারস্পরিক বিরোধ ও ব্যক্তিগত আচরণের ওপর তারই প্রতিক্রিয়া এগুলিকে আরও শোভন করে অঙ্কিত করা যেত; কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ নাটকীয়। বইখানি পড়ে মনে হল কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তির এরূপ অশোভন প্রকাশ রুচিসঙ্গত নয়; তবে বইখানির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এই ত্রুটীপূরণের সহায়ক।

শ্রীছায়া দেবী

Patterns of Culture—by Ruth Benedict (Routledge).

নৃতত্ত্বে সংস্কৃতির একটি বিশেষ স্থান আছে। নৃতত্ত্ববিদগণের নিকট সভ্য জাতির সংস্কৃতি যেমন দামী, আদিম জাতির সভ্যতাও তেমনি দরকারী। এই বিভিন্ন সংস্কৃতির জ্ঞানের দ্বারা তাঁরা এদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ঠিক করেন এবং একটির সংস্পর্শে অপরটি কতটা লাভবান হয়েছে তাও দেখাতে সমর্থ হন। সময় সময় এরূপ দেখা গিয়েছে যে একটি জাতি তাদের সংস্কৃতির আমূল পরিবর্ত্তন করে অন্য জাতির সভ্যতা গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু এই চেষ্টা প্রায়ই সফল হ'তে পারে নি। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মানুষের সমাজের মেরুদণ্ড এবং এর আমূল পরিবর্ত্তন সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনে কারণ এক জাতির সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপর একটি জাতির উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং এই স্বধর্ম্মচ্যুতির ফলে জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে এও দেখা যায় বটে যে এক সংস্কৃতির মানুষ অপর একটি সংস্কৃতির পরিবেষ্টনের মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে কিন্তু তার কারণ সে বাল্যাবধি একটি ভিন্ন সংস্কৃতির রীতি নীতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই সংস্কৃতিই আয়ত্ত করেছে এবং তার নিকটও নিজের সংস্কৃতির রীতি নীতি ও প্রচলিত পদ্ধতিগুলি অদ্ভুত লাগে। যা হোক কোন একটি বিশেষ মানুষ ভিন্ন সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারে বলেই যে একটি জনসঙ্ঘ অপর জাতির সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। এবং এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানবজাতিকে ভাগ করা যায়। সাধারণতঃ মানুষের জাতিবিভাগ বাহ্যাকৃতির দ্বারা করা হয় কিন্তু সংস্কৃতির দ্বারা মানবজাতিকে যেরূপ নিখুঁতভাবে ভাগ করা যায় তা অনেক সময় বাহ্যাকৃতির দ্বারা সম্ভবপর হয় না; উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে ধরতে পারি। যদিও এদের শারীরিক গঠনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তবু এদের জাতিগত সংস্কৃতি একেবারেই বিভিন্ন। একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন থাকে তা কেবল একই সংস্কৃতির মধ্যে বাস বলেই সম্ভবপর হয়। যদিও মানুষের বিশ্বাস তারা একই দেশে বাস করে এবং তাদের সকলের মধ্যে একই রক্ত প্রবাহমান বলে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা আছে, তবু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে স্থিরভাবে চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই যে সত্যিকার বন্ধন তাদের সংস্কৃতি। কারণ প্রচলিত চিন্তাধারা যেটি তারা পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করে সেটি তাদের সকলের মধ্যেই এক এবং এই একই সংস্কারের মধ্যে মানুষ হ'য়ে

তাদের সকলের মন একই ধরণে গড়ে ওঠে এবং অজ্ঞানিতভাবে একের সহিত অন্যের যোগ নিবিড় হয়।

জাতিমাত্রেরই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং এই সংস্কৃতি তারা পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করে। প্রত্যেক সাংস্কৃতিক লক্ষণটি এই জাতিগত সংস্কৃতির একটি অংশমাত্র। এই জন্য কোন একটি কিংবা কতকগুলি সাংস্কৃতিক লক্ষণ দ্বারা যখন আমরা কোন জাতি সম্বন্ধে বিচার করি তখন আমরা এই ভুল করি যে আমরা জাতির সংস্কৃতির কেবল মাত্র একটি দিকই দেখতে পাই। অনেক সময় আবার আমরা এই লক্ষণ-গুলিকেও সঠিকভাবে দেখতে পাই না, তার কারণ আমাদের নিজেদের একটি জাতিগত সংস্কৃতি আছে এবং সেই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা অন্য জাতির সংস্কৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করি। ফলে আমরা আগাগোড়াই একটি ভুল জিনিষের অবতারণা করি। সত্যিকারের কোন সংস্কৃতিকে বুঝতে হ'লে আমাদের খুব সতর্ক ভাবে নিজেদের গোঁড়ামী ত্যাগ করে তাদের রীতি, নীতি, প্রচলিত প্রথা এবং তাদের সকল অনুষ্ঠানগুলিই সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এইগুলির মধ্যেই আমরা তাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তির খোঁজ পাব এবং একবার এই অনুষ্ঠানগুলির সঠিক কারণ বুঝতে পারলে আমাদের নিকট তাদের কার্য্যাবলী খুব সরল হ'য়ে পড়বে।

সামাজিক রীতি, নীতি ও চিরাচরিত প্রথা কিরূপভাবে একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে লেখিকা তা তিনটি বিভিন্ন আদিম জাতির সভ্যতার সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি নিউ মেক্সিকোর জুনি ইণ্ডিয়ানদের একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। জুনিরা মাতৃকুলজাতি এবং তারা খুব উৎসবপ্রিয়; প্রত্যেকটি উৎসবই কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সম্পন্ন করা হয়। অনুর্ব্বর উপত্যকায় বাস করার দরুণ জল এদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য সমস্ত উৎসবেই জলদেবতাকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় পৌরহিত্য করে এবং তাদের স্থান অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনেক উপরে। এই সমস্ত উৎসবে দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই যোগদান ক'রতে পারে না; সেইজন্য প্রত্যেক ছেলেকেই পাঁচ থেকে নয় বৎসরের মধ্যে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই সময় তাদের অনেক রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়। দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের একটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত শ্রেণীতে তাদের সংযম, ত্যাগ ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়। যারা এই সমস্ত কার্য্য সঠিকভাবে শিক্ষা করে এবং শ্রেণীর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ম মানে তাদের এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হয়। এইরূপে তারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে গিয়ে পৌছায়। সকলেই এই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করে, কারণ এই শ্রেণীই সকলের নিকট সম্মান পায় এবং সমাজে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সকলেরই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণিভুক্ত হওয়ার সাধনার ফলে জুনিদের সংস্কৃতির মধ্যে সংযম ও ত্যাগের দিকটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

পূর্ব্ব নিউগিনির ডবুয়ানরাও মাতৃকুল জাতি কিন্তু তাদের সংস্কৃতি একেবারে বিভিন্ন প্রকারের। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব খুব প্রবল এবং এদের ধ্রুব বিশ্বাস যে একজনের ক্ষতি না করে অন্যের কোন প্রকার উপকার

হ'তে পারে না। সেইজন্য বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস এদের সমস্ত রীতি নীতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ডবুয়ানের মনের বিশ্বাস যে তার চারপাশে যে সমস্ত লোক রয়েছে তারা সকলেই ডাইনী বা যাদুকর এবং তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে যাদুবিদ্যার আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই; সেইজন্য তাদের সমাজে কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন ক্ষতি হ'লেই তারা মনে করে যে এটি কোন একটি ব্যক্তির যাদুবিদ্যার ফলেই ঘটেছে। এই অবিশ্বাসের ফলে তারা বড় দল গড়তে পারে না এবং ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করে কিন্তু এক দলের সহিত অন্য দলের কোনরূপ সদ্ভাব থাকে না এবং একে অন্যকে খুব হীনচোখে দেখে। নিজেদের দলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় প্রত্যেকেই দলের বাইরে বিয়ে করে কিন্তু তাতেও দুদলের মধ্যে সদ্ভাব জন্মায় না কারণ গোষ্ঠীর মধ্যে পিতার কোন স্থান নেই এবং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। ছেলে মেয়েরা মায়ের দলে মানুষ হয় এবং বড় হ'য়ে এই দলের লোক বলেই পরিগণিত হয়। জুনি সংস্কৃতির মধ্যে যেমন ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের দিকটা দেখা যায় এদের মধ্যে তেমনি যাদুবিদ্যার দিকটাই প্রবল। সেইজন্য জুনিরা ত্যাগী ও সংযমী এবং ডবুয়ানরা বিদ্বেষী এবং অবিশ্বাসপরায়ণ।

আমেরিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলে যে সমস্ত আদিম জাতি বাস করে তাদের মধ্যে একমাত্র কোয়াকিউটল্ জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে অবগত আছি। কোয়াকিউটলরা পিতৃকুল জাতি এবং তারা ছোট ছোট দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। আদিম জাতির পক্ষে তারা খুব সমৃদ্ধ কারণ সামুদ্রিক মৎস থেকে তারা জীবন ধারণ করে এবং এর তেল বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই জন্যই কৃষিকার্য্যের কোন দরকার বোধ করে না। এদের সংস্কৃতির মধ্যে দুটি ভাগ আছে—একটি লৌকিক এবং অপরটি অলৌকিক; প্রতি বৎসরকেও সেইজন্য দুইটি বিশেষভাগে ভাগ করা হয়। গ্রীষ্মকালে সামাজিক অনুষ্ঠান এবং শীতকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের কর্ত্তারা আধিপত্য করেন।

সমস্ত কোয়াকিউটল্ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর প্রাধান্য করা এবং এইটিই তাদের সংস্কৃতির মূলসূত্র। এইরূপ প্রাধান্য অন্যান্য সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেখলে খুব বিসদৃশ লাগে কিন্তু তাদের সমস্ত সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলি বিশদভাবে পর্য্যালোচনা ক'রলে এগুলির কারণ খুব সরল হ'য়ে পড়ে। এখানে আমরা তাদের সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব খুব সহজেই বুঝতে পারব।

> "I am the great chief who makes people ashamed.
> I am the great chief who makes people ashamed.
> Our chief brings shame to the faces.
> Our chief brings jealousy to the faces.
> Our chief makes people cover their faces by what
> he is continually doing in this world,
> Giving again and again oil feasts to all the tribes." (P. 190)

এই তিনটি বিভিন্ন স্থানের আদিম জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদভাবে জেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটির সংস্কৃতির মূল ভিত্তি একেবারেই পৃথক। যদিও

দুইটি জাতির কতকগুলি সাংস্কৃতিক লক্ষণ এক তবু উদ্দেশ্য একবারেই বিভিন্ন; সেই জন্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক লক্ষণ দ্বারা জাতি বিচার করা যে সম্পূর্ণ অচল সে সম্বন্ধে আর কোন মতদ্বৈধই থাকতে পারে না। এই তত্ত্বগুলিই লেখিকা আমাদের নিকট খুব স্পষ্ট করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু

Selected Poems—By R. C. Trevelyan.
Selected Poems—By Elizabeth Daryush.
Selected Poems—By Hugh Macdiarmid.
(Macmillan's Contemporary Poets)

Trevelyan ইংলণ্ডের আধুনিক বিখ্যাত কবিদের অন্যতম। এই ক্ষুদ্র চয়নিকাতে তাঁর কবি-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক পাঠকের কাছে সুনির্দ্দিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানব তাহার সহজ ও সরল জীবনধারার মধ্যে সম্যক আনন্দ ও পরিস্থিতি লাভ করিতে পারে—এইটি হইতেছে কবির মনের একটি সদা জাগ্রত অনুভূতি। নানা কবিতার মধ্যে এই ভাবটি পরিস্ফুট। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য Sleep, The Figtree, Wood এবং A Winter Sunset। মানুষের জীবন দুঃখ ও নৈরাশ্যময় এবং চিরপরিবর্ত্তনশীল। সুখ অন্বেষণের চেষ্টার অবধি নাই। কিন্তু সুখ চিরদিনই আলেয়ার মত নিকটে আসিয়াই বহুদূরে চলিয়া যায়। ইহার প্রতিবিধান, কবির মতে, সম্মুখে যে সুখ সম্পদ ও সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা (Happiness)। শাস্ত্রগ্রন্থাদি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্তূপ মানব-মনকে বিক্ষিপ্ত করে, শান্তি দিতে পারে না। Time নামক শেষ কবিতাটি বিশেষ রূপে এই ভাবে অনুপ্রাণিত। Books কেবলমাত্র Dusty sepulchres wherein the thoughts of dead men lie embalmed (Figtree)।

The Oaks and The Caterpillars, The Wood প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয় ইংরাজী কবিতায় আবার nature poetry নবভাবে স্থান করিয়া লইতেছে। Cloudsএ কবি বলিতেছেন—

Their shapes change, imperceptively flowing from form to form,
With each form a new mood,
With each mood a new remorseful envy.
Their passion and grandeur make me ashamed of Man's littleness.
I long to forget it for ever,
And share in that life of measureless form and energy.
But alas, there is no road thither.

এই শেষ পদটিতে পূর্ব্বতন nature poetryর সহিত খুবই স্পষ্টভাবে আধুনিক nature poetryর পার্থক্য রহিয়াছে। কবি কখনই নিজের সত্তা ভুলিয়া Wordsworthএর মত প্রকৃতির সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন না।

Krishna and Radha কবিতাটি ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ কাব্যের স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং রাস-পঞ্চাধ্যায়ের গূঢ় রহস্য অতি মধুর ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

Elizabeth Daryushএর কবিতাগুচ্ছ Throw away the flowers নামক গীতি-কবিতা লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ এইটি সমস্ত কবিতাগুলির মূলসূত্রটি ধরাইয়া দেয়।

Throw away the flowers,
the tender songs ;
attune your powers
to eternal wrongs ;
have but hopeless hard
rebellion for bard.

কবির মন communistic ভাবে পরিপূর্ণ; মানব-আত্মার দুঃখ ও দারিদ্র্যের চিন্তায় কবির মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তাই তিনি গাহিয়াছেন—

Ah, this is not enough, I cry—
... ...
I too on action's stormy sea
Am fain to fight and further me,
To make that heaven my home (III)

ভাব-বিলাসের মোহ কাটাইয়া সংঘবদ্ধ মানবতার জন্য দুঃখ বরণ করিতে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে জগতের স্তূপীকৃত গ্লানি ও পুঞ্জীভূত জড়তার ধ্বংস হইতে নব সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠিবে এবং অসঙ্কোচে বলিতে পারা যাইবে

Blow celestial wind
Of warmth and stress,
Wake the world's loath mind
To loveliness,
এবং
Breathe, avenger vast,
Our troubles high ;
Bend and scourge and blast
And beautify. (LIV)

আজকালকার নারী প্রগতির দিনে কবি (নিজে নারী হইয়াও) নারী ও পুরুষের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া নিজের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

The woman I'd revere would be
* * *
a soul burning to bless
its circle, spent for cheer,
a life-giver, thoughtless

how its own life appear,
whether itself may seem
a fair or formless gleam.

এবং

The man I'd love
* * *
would be more than a tame
measured glow without flame,
one who'd be now and then
o'ercharged with primal power,
a furied, a sudden
flash in oppression's hour,
wrath's lightning, rightly hurled,
the dread of wrong's dark world.

সমগ্র কবিতা-সঞ্চয়নটি দুইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—কতকগুলি sonnet আর অন্যগুলি songs। Sonnetsগুলি traditional form বজায় রাখিয়াছে। Songs গুলি ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

Huge Macdiarmid স্বচ কবি। তাঁহার অনেক কবিতাই স্বচ dialectএ লেখা। মানে বুঝিবার সুবিধার জন্য Glossary দেওয়া আছে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে মন মোহিত হয়। Dialectএ কবিতা লেখা তখনই সার্থক হয় যখন ভাষার মোহে মন আকৃষ্ট হয়। ভাবের দিকে নজর দিবার ইচ্ছা থাকে না। নানা বিচিত্র formএ কবিতাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতির অপরূপ লীলার সহিত কবির মন নানা ভাবে সাড়া দিয়াছে। ধরিত্রীর প্রতি গভীর, ভালবাসায় কবির মন উদ্বুদ্ধ এবং বৃষ্টিধারা, চন্দ্র তারকা, জলরাশির ঝরঝর শব্দ, নরনারীর প্রেম কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী কবিতা সভ্যতাগ্রস্ত সহরের ও কোনও বিশেষ group mindএর কবিতা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন এই সব কবিদের রচনা পড়িয়া মনে আশ্বাস পাওয়া যায় যে কাব্য-সরস্বতী মুক্তি পাইয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রকৃতির লীলাভূমিতে, সাধারণ নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে বিরত হন নাই।

শ্রীমণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

সমাজ ও সাহিত্য—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। মোসলেম পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানি নানা বিষয়ে নানা সময়ে লিখিত প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ "নব পর্য্যায়" পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর এক সঙ্গে মিশেছে।" আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতেও এই জোর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু জোর ছাড়াও আর এক পদার্থ আমরা পুস্তকের পত্রে পত্রে দেখিতে পাইতেছি,

তাহা দরদ। আর সে দরদে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। তাহা উদার, মুক্ত মহাকাশের মত উদার। লেখক স্পষ্ট কথা বলিতে কোথাও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট কথার ভাষা এত সংযত, এমন ভব্য ও মার্জ্জিত, যে তাহা পড়িয়া কাহারও মনে ব্যথা লাগিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটী পড়িলে ইহা বেশ বোঝা যায়। কাজী সাহেব বঙ্গীয় হিন্দুমাত্রেরই শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমকে অসহিষ্ণু ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে এই কথা লিখিয়াছেন, "ভারতের হিন্দু-মুসলমানের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী রেশারেশি ঘেষাঘেষিও কালে হয়ত অর্থশূন্য কিন্তু অতি অদ্ভুত ঘটনা ব'লে মানুষের মনে হবে। তখন জ্ঞানী ও শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্রকে মানুষ ভালবাসতে পারবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা হবে তাদের জন্য পরম কৌতুকাবহ।" এর পরে কি আর কোনও বাঙ্গালীর মনে ক্ষোভ থাকিতে পারে? আর এক স্থলে (৫৪ পৃঃ) ওদুদ সাহেব বঙ্কিমের এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, "এদেশের যেসব মুসলমান গরু খায় তারা নরাধম।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোনরূপ কঠিন কথা না বলিয়া কেবল লিখিয়াছেন, "মানব প্রকৃতির সহিত তাঁর পরিচয় কত গভীর। কিন্তু তবু কেন সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্বের অভিমান তাঁর ভিতরে এত প্রবল তা আমি বহু ভেবেও তেমন সুমীমাংসায় পৌঁছুতে পারি নি।"

লেখকের বিচারশক্তি কিরূপ প্রবল, তিনি কিরূপ তার্কিক, তাহার পরিচয় আমরা পাই "রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে। সে প্রবন্ধে তিনি প্রতিপক্ষের তর্কগুলি একে একে অকাট্য যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু "মানুষের চরিত্রের বিচার এত হাল্কাভাবে করতে যাওয়া হাস্যকর, বিশেষ ক'রে প্রতিভাবানের চরিত্রের বিচার।" "সত্য ও কল্যাণের প্রেরণায় এমন চির-অনুপ্রাণিত প্রতিভাকে ধর্ম্ম-প্রতিভা না বলা কেবল মধ্যযুগীয় মনোভাবের পক্ষেই তেমন অশোভন নয়"—এর চেয়ে বেশী কঠিন কথা বিরুদ্ধপক্ষকে কিছু শোনান নাই, একি কম বাহাদুরী!

"মোহাম্মদ আলী" প্রবন্ধ মৃত মৌলানা সাহেবকে অর্পিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। এখানেও লেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "মোহাম্মদ আলী যে শুধু মুসলমানকে ভালবাসতেন তা নয়; জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁহার সমস্ত দেশবাসীকেও তিনি কম ভাববাসতেন না। কিন্তু সেই বৃহত্তর প্রেম বিকশিত করে তুলবার অবসর তিনি হয়ত পান নাই। তাঁর নিকটবর্ত্তী মুসলমানের দুর্দ্দশা হয়ত তাঁকে সারাজীবন আকুল করে রেখেছিল বেশী—।" আপন সম্প্রদায়কে লেখক এই সূত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য, "মোহাম্মদ আলীর সুবৃহৎ চিত্তে rationalism ও nationalsim-এর যে বীজ লুক্কায়িত ছিল তাকেই মহীরুহে বর্দ্ধিত করে তোলা তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের আজ হয়ত সবচাইতে বড় কাজ।"

আশী পৃষ্ঠায় লেখক এই Nationalism ও Rationalism সম্পর্কে নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তবু আমি হচ্ছি মোটের উপর একজন সাহিত্যিক—সংস্কারক ঠিক নই। * * * একালের ভারতবাসী আমরা, মুসলমান সমাজে জন্মেছি, সেই নানা বন্ধনে বদ্ধ মানুষ কেমন করে' স্বাভাবিক মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত

হতে পারে, মনে হয়, তাই হয়ত একটুখানি ফুটেছে বা ফুটতে চাচ্ছে আমাদের লেখায়।" এই "জ্ঞান ও প্রেম" প্রবন্ধে অনেক সার ও সত্যকথা লেখক সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "আপনি বলেছেন প্রাচ্যের অতীত মরে' ভূত হয়ে গেছে * * * কিন্তু আপনার কথার ত্রুটী এইখানে যে বাস্তবিকই প্রাচ্য মৃত নয়, মৃত হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ অমন জমত না।" "আপনি মোল্লা-পুরোহিতের নিশ্চিহ্ন ধ্বংস চেয়েছেন কিন্তু চাইলেই কি ধ্বংস হয়? * * * কতকগুলো মোল্লা-পুরোহিত না হয় কোতলই করলেন, কিন্তু যে অজ্ঞতার জলাভূমিতে মোল্লা-পুরোহিত গজায় তার ধ্বংস যদি না করতে পারেন তবে মোল্লা-পুরোহিতের উপর খাপ্পা হয়ে লাভ? * * * তবু আপনাদের মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রচার আমি অশ্রদ্ধার চোখে দেখি না। বেশ, করুন। শুধু এই বলতে চাই ওতে বেশী কাজ হবে না।" "শুধু আমার প্রার্থনা—আপনার বা আপনাদের এই চলবার সঙ্কল্প প্রবল হোক সক্রিয় হোক। মতামত মানুষের খুব বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস হচ্ছে সেই মতামত সার্থক করবার জন্য তার আয়োজন।"

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধটী পাঠক ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকাতেই পড়িয়াছেন। মুসলমান ভারতের নেতা ইকবালের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে আমাদের সঙ্কোচ হয়। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেও আমরা ইচ্ছা করি না। তবে আজ সুদূর পশ্চিমে যে মুসলিম জননায়ক এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির ভাগ্য পরিচালনা করিতেছেন, ইকবাল সাহেবের স্থান যে তাঁহার উর্দ্ধে নহে, ইহা নিশ্চিত। গ্রন্থকার একথা স্পষ্ট না বলিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং ইকবালও আর কামালপাশা বা আধুনিক তুর্কীকে এক পাশে সরাইয়া শুধু প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। কেন না সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন—"Most Muslim countries to day * * * are mechanically repeating old values, whereas the Turk is on the way to creating new values." ওদুদ সাহেব বলিতেছেন—"মুসলিম জনগণের সামনে এই যে দুই পথ তার বিচিত্র পাথেয় নিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে এর কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবলম্বন হবে সে উত্তর আজ দেওয়া সম্ভবপর নয়।" আমরা আশা করি মুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পথই তাঁহারা অবলম্বন করিবেন, আর স্বদেশবাসী হিন্দু খৃষ্টান পার্শীকেও তাঁহাদের পথের সাথী করিয়া লইবেন।

রাষ্ট্রনীতির কথা ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কথা বলি। ইকবাল সাহেব ভারতের একজন প্রথিতনামা কবি। অথচ আমরা বাঙ্গালীরা তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে প্রায় কিছু জানি না। আশা করি ভবিষ্যতে একদিন আমরা কবিবর ইকবালের কাব্যকলা সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত আলোচনা কাজী সাহেবের নিকট হইতে পাইব। বর্ত্তমান উর্দ্দ সাহিত্যের চিন্তার ধারার সহিত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় অশেষ মঙ্গলের কারণ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। ফারসী কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। এক দিন ছিল যখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই ফারসী

লিখিতে পড়িতে জানিতেন। কিন্তু সে দিন ত আর আজ নাই। এখন ইংরেজীর সাহায্যে আমাদিগকে হাফেজ রুমীর সহিত পরিচিত হইতে হয়। কাজীসাহেব প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকগণ যদি বাঙ্গলা ভাষায় সুফী সাধকদিগের কবিতার আলোচনা করেন ত ভাষাও সমৃদ্ধ হয়, আর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা cultural বোঝা পড়াও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যায়। নহিলে আজ যাহা অবস্থা তাহাতে আলোচ্য পুস্তকেরও অনেক স্থল শিক্ষিত হিন্দু পাঠক বুঝিবেন না। আমাদের মধ্যে কয় জন গাজ্জালি বা ইব্‌নেরোশদের নাম শুনিয়াছেন! কয় জনেরই বা হাফেজ বা রুমীর চিন্তার ধারা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে! এই সূত্রে আমাদের আরও একটী বক্তব্য আছে। তাহাও এখানে বলি। একদিন বাঙ্গলা ভাষার উপর ফারসীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ক্রমশঃ নানা কারণে সেই প্রভাব তিরোহিত হইয়া সংস্কৃতের প্রভাব একান্ত প্রবল হইয়া পড়িল। কালে তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল সাহেবী বিকৃতি, ফলে আজ বাঙ্গলার বড়ই দুর্দ্দশা। এ দুর্দ্দিনে আবার সে যদি বাল্য-সখী ফারসীর অঞ্চল ধরিতে পারে ত তাহা অশেষ মঙ্গলের হেতু হইবে। বাঙ্গলা ভাষাকে ধীরে ধীরে এই পথে চালান বঙ্গীয় মুসলমান লেখকগণের আজ কর্ত্তব্য। তাঁহারা ক্রমাগত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করিয়া ফারসী শব্দ ও ফারসী ইডিয়ম যদি পুনরায় বঙ্গভাষায় চল করেন তাহা হইলে ভাষার শ্রী ফিরিয়া যাইবে। ইহাতে দোষ কিছুই হইবে না, কেন না, একদিন ত "আমারে দাও মা তহবিল দারী আমি নিমক হারাম নই মা শঙ্করী।" 'রামজীর কুদরতে মোহিম হইল ফতে গালিব হইল নিমকহারাম।' "দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে স্থানে মুরচাবন্দি করিয়া সত্য সাবধানে রহিয়াছে।" এ সবই বাঙ্গলায় সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইত। উত্তর ভারতে আমরা দেখি যে উর্দ্দু ও হিন্দী মূলতঃ এক ভাষা হইলেও রাষ্ট্রনীতিক কারণে আজ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশে সে খেলা খেলিয়া লাভ কি।

আলোচ্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে 'রামমোহন রায়' নামক প্রবন্ধকে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে পুস্তকের সেরা প্রবন্ধ 'বাঙ্গলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ'। অবশ্য এই দুই প্রবন্ধের যোগ আছে। রামমোহন রায় বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের সূচনা করার পর তাঁহার স্বজাতীয় সাহিত্যিকগণ এক জনের পর এক জন কি করিয়া সেই জাতীয় আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন তাহাই শেষোক্ত প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। "এই সব হিন্দু সমাজতাত্ত্বিকদের সমস্ত চিন্তার মূলে রয়েছে এক শোচনীয় দায়িত্বহীনতা"—ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক বলিতেছেন যে "হিন্দুর মতো একটা সুপ্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাসে গৌরবজনক অনেক কিছু যে থাকবে এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত, তবু একালের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু চিন্তানায়কদের আত্মপ্রশংসা যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে ও যে ফল ফলিয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা একালের বাংলার জিজ্ঞাসুদের জন্য নানা কারণেই অবশ্যকর্ত্তব্য।" এই আত্মগৌরব বোধ হইতে ধীরে ধীরে স্বদেশপ্রেম কিরূপে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল তাহা ওদুদ সাহেব অতি

সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর এই সাহিত্যরথীদের অনেকেরই practical বা কার্য্যকরী স্বদেশ-প্রেমের যথার্থ ধারণা ছিল না। আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গালী জনসাধারণও সে কথা বুঝিত। সেই জন্যই সুরেন্দ্রনাথের মত সাম্প্রদায়িকবুদ্ধিহীন রাষ্ট্রনেতা জনগণের মন এত সহজে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের নাম কোথাও করেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে যে তাঁহারা বাগ্মী, সাহিত্যিক নহেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রায় সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তা-নেতাই জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন, বলা যেতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন জাতীয় জীবনে প্রকৃতই কার্য্যকরী হবার জন্য যে খুব বড় রকমের হওয়া চাই—হয়ত আমূল—সে বোধ জেগেছে দুইজনের ভিতরে—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ।" কিন্তু রবীন্দ্র প্রতীভাকেও তিনি কার্য্যকরী মনে করেন না। 'ভূদেবের স্বস্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের উগ্রতা, কেশবচন্দ্রের ভাবোন্মত্ততা, বিবেকানন্দের খেয়ালিত্ব, জাতীয় জীবনের জন্য এ-সমস্তরই অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন; কিন্তু তিনি যে কবি, মানুষের ও প্রকৃতির সভায় চির আনন্দময় গায়ক, এই বোধ কর্ম্মীর যোদ্ধবেশ গ্রহণে বারবার তাঁর ভিতরে কুণ্ঠা এনে দিয়েছে।

লেখক যে কেবলই খুঁত ধরিয়াছেন তাহা নহে প্রবন্ধের শেষভাগে আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য দুইটী কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন; যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন "সুব্যবস্থিত" "বীর্য্যবন্ত" ও "সত্যাশ্রয়ী" হইবে। ওহুদ সাহেবের সূচনার মধ্যে উগ্র বা উত্তেজক কিছুই নাই বলিয়া হয়ত কাহারও কাহারও ভাল লাগিবে না, কিন্তু প্রবন্ধটী সারগর্ভ কথায় ভরা, তাই আমরা সকলকেই যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাজা রামমোহনের জীবন ও চরিত্র আলোচনা—পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ—সুলিখিত ও সুপাঠ্য। আমাদের সমালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সে প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেছি না। দুই একটী কথা যাহা লেখক বলেন নাই তাহাই বলিতেছি। রামমোহন বেদান্ত হইতে একমেবাদ্বিতীয়ম মন্ত্রটী লইয়াছেন বটে কিন্তু তাহার অর্থ করিয়াছেন ইসলামী মতানুযায়ী। কারণ বেদান্তে ওই মন্ত্রের অর্থ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জগৎ ব্রহ্মই, অপর কিছুই নহে। রাজা উহার অর্থ করিয়াছেন, এক আল্লা বই দ্বিতীয় আল্লা নাই। রামমোহন পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন কিন্তু সুফী সাধকগণকে তাহা বলা যায় না, কারণ তাঁহারা বরাবর বলিয়াছেন যে ঈশ্বর যেমন মসজিদেও আছেন, তেমনই নসরানীর গির্জ্জাতেও আছেন, অগ্নি-পূজকের অগ্নিশালাতেও আছেন, পৌত্তলিকের মন্দিরেও আছেন। সুতরাং রামমোহন তাঁহার আইকনোক্লাজম্ সুফীদের নিকট হইতে পান নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তেমনই সুফীদের অদ্বৈতবাদ রামমোহনকে কোনও রূপে স্পর্শ করে নাই। কারণ বৈদান্তিক ও সুফী দুইজনেই বিশ্বাস করিতেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। অথচ রামমোহন এ কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম দ্বৈতবাদ। আমাদের মনে হয় যে রামমোহনের ধর্ম্মমত প্রধানতঃ কোরাণ শরীফ ও মোতাজেলা সম্প্রদায়ের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু শাস্ত্রের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগসূত্র ধরিয়াছিলেন রামমোহনের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ।

আলোচ্য পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কেবল এইটুকু বলিবার আছে যে তাহা স্থানে স্থানে যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয় নাই। যতদূর প্রাঞ্জলতা আমরা ওহুদ সাহেবের মত লেখকের কাছে আশা করি ততটা সর্ব্বত্র পাই নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Little Man, What Now—By Hans Fallada. (Putnam)

পুস্তক-প্রকাশ-প্রণালী ও মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি যেমন একদিকে উপন্যাস রচনার হার উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে তেমনি আর একদিকে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের আকস্মিক পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়বার মত সুযোগ হারাচ্ছে পাঠক-সম্প্রদায়। প্রতিধানের অযোগ্য সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়েও মনে হয় আজকালকার অধিকাংশ রচনা হচ্ছে উত্তেজনা-পূর্ণ সংসার-যাত্রার চিত্রল অভিব্যক্তি মাত্র—যার সঙ্গতি নিঃশেষ হয়ে যায় ব্যস্তবাগীশ বর্ত্তমানের চিত্তরঞ্জনে। লিপিবদ্ধ বর্ণনার সহিত আপন হৃদয়স্থিত বেদনা বা আনন্দের মিল পেলেই পাঠক অতি সাধারণ উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার মুদ্রণ-সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে ওঠবার পূর্ব্বেই সে সব রচনার সার্থকতা অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন নূতন ঢঙের কথাশিল্প নূতনতর বৈজ্ঞানিক বুলিতে অঙ্গ ঢেকে সাহিত্যের হাটে প্রবেশ করে। উদ্ভাবনের সাহিত্য-সৃষ্টি পূর্ব্বেও যেমন বিরল ছিল আজও তেমনি থেকে গেছে। আত্মকাহিনী বা সমর-সাহিত্য যেমন শিল্পের হাটে নূতনতর ভঙ্গিমা এনেছে, বোয়ারের 'পাওয়ার অফ এ লাই'র মত সুন্দরের সেই অনাড়ম্বর অবগুণ্ঠিত সঙ্গতি তেমনি আর বড় একটা দেখা যায় না। গল্পসওয়াদ্দি বা মানের রচনার মত সুবৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে বিধৃত সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ-সৃষ্টি সেকালে বিরল ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তেমনি বর্ত্তমান সময়ে রূপ-কথার সেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আর হয় কই।

আলোচ্য বইখানিতে উপরিউক্ত কোন গুণেরই সন্ধান পাইনি কিন্তু অকিঞ্চিত-করের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকৃষ্টতর প্রকাশ পূর্ব্বে দেখিনি। এই যদি সাহিত্যের নব ধারার পূর্ব্বাভাস হয়, হৃদয় আশান্বিত হয়ে ওঠে। কোন নিবিড় সৌন্দর্য্য বা নিগূঢ় সত্যের ইঙ্গিত এতে নেই। ঘটনাপরম্পরা সমস্তাশুন্ত লঘুগামী, আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের মত মামুলী। ইংরাজীতে অনুবাদ সুতরাং ভাষাও লাবণ্যহীন। এমন কি নন্দন-তত্ত্বের প্রচলিত বিশ্লেষণ-প্রথা অপ্রয়োজ্য বলে মনে হয়। গল্পের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া ব্যতীত পরিচয় প্রদানের আর কোন উপায় নেই।

নাৎসী শক্তির অভ্যুদয়-কালীন জার্ম্মানীর সাধারণ গৃহস্থালীর মধ্যে দৈন্য-দশার অবধি নেই। পিনেবার্গ অল্প-বেতন-ভোগী কেরাণী যুবক। বুনী শ্রমিকের কন্যা। প্রণয়ের সূচনা হলো সমুদ্র-বক্ষে, জল-ক্রীড়ায়। তারপর যখন প্রণয়ী-যুগল সন্তানরোধের উপায় অনুসন্ধানে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলো, প্রকাশ হয়ে পড়লো কুমার সম্ভাবনা। বুনী হাতের ওপর হাত রেখে বল্লে "ওগো, দুঃখ কর কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে—বইতে পারবো আমি এ ভার।" প্রেমের এই অপরিমেয় আত্মত্যাগের আভাস পেয়েও ছেলেটি চলে যাচ্ছিল বিদায় নিয়ে—

এমন সময় সহসা শরতের এলোমেলো বাতাস এসে তার চিত্ত দিলে দুলিয়ে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে বল্লে "আচ্ছা বিয়ে করলে কেমন হয়?" মেয়েটি মাটিতে বসে পড়লো—বিপুল পুলকে তার হৃদয়ের সহস্র দীপ জ্বলে উঠলো চোখের ভেতর, বল্লে সে, "ওগো সত্যি?" পর মুহূর্ত্তে সংযত হয়ে মাথা নাড়লে "কি দরকার? আমি ঠিক হয়ে যাব—তবে যদি বোঝ ছেলের বাপ থাকা ভাল—" পিনেবার্গের মনে সে সমস্যা জাগেনি। বুনীকে তুলে ধরে বল্লে—"চলো যাই।"

অনাদি-কালের জীবন-রহস্যের পরম্পরায় এমনি করে আর একটি গ্রন্থি পড়লো। অভাব-পীড়িত দাম্পত্য পথের প্রথমভাগে কলিও ওঠে ফুলও ফোটে কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সস্প্যানের প্যানপ্যানানি হয়ে ওঠে বাস্তব ও প্রচণ্ড সত্য। বুনী বুদ্ধিমতী, তাই ক্ষুদ্র সংসারের স্নিগ্ধ অঙ্গনে কলহের তরঙ্গ তোলে না। কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে যেটুকু পরিতৃপ্তি সংগ্রহ করে নিয়েছে তারই চক্রবালের মধ্যে রেখেছে আপন স্বপ্ন—স্ত্রীসুলভ চাহিদা।

জীবন-নির্ব্বাহের দাবী-পূরণে পিনেবার্গকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল আপন স্বাচ্ছন্দ্য। মনিব-কন্যা চির-অনূঢা—মনিব চাকুরির চার ফেলে জামাতা আহরণের চেষ্টায় সচেষ্ট, সুতরাং তাকে গোপন রাখতে হয়েছিল যে সে বিবাহিত। সে কম দুর্ভোগের কথা নয়—অসুবিধা প্রতিপদে। অবশেষে একদিন গ্রীষ্মের রবিবারে সমুদ্রের সান্ধ্য সমীরণে যখন কৃষ্ণাভ বৃক্ষ-শাখাগুলি হিল্লোলিত, দম্পতিযুগল মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে, এমন সময় মনিব প্রবরের সপরিবারে আবির্ভাব। আসন্ন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বুনী মূতকল্প; এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়লো শাশুড়ীর আমন্ত্রণ। বেরলীনে নাকি উচ্চ বেতনের চাকুরী যোগাড় তাঁর ইচ্ছা-সাপেক্ষ। দুষ্ট-চরিত্রা মাতার আশ্বাস-বাণীতে পিনেবার্গের আস্থা ছিল না; কিন্তু উভয় সঙ্কটের মধ্যে স্ত্রীর নির্ব্বাচনই গ্রাহ্য করে নিলে।

মাতা-পুত্র-সংবাদে যে বাক্য-স্ফুলিঙ্গ উঠলো তাইতে বুনীর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে নাড়ীর বন্ধন সত্য সত্যই ছিন্ন হয়েছে; কিন্তু ওষ্ঠ ও গণ্ড রঞ্জিত প্রোড়াকে তার মন্দ লাগলো না। গৃহে মজুত ছিল আর একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়। বিরাট আকৃতি এক পুরুষ—কৌতুকাতিশয্যে রসনা ও লোচন উন্মুখর; শীতের দিনে পরিধানে ফিন্‌ফিনে শার্ট—নাম জাকমান—শয্যার সম্পর্কে পিনেবার্গের পিতৃতুল্য। পুত্রবধূর প্রতি যত্নের আতিশয্য বয়োজ্যেষ্ঠাকে রীতিমত ঈর্ষান্বিত করে তুললো। এই নব সহরে অনাসৃষ্টি দেখে বুনী স্তম্ভিত হয়ে গেল; কিন্তু স্বামীর কাছে পর্য্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলো না।

জাকমানের চেষ্টায় চাকুরী যোগাড় হলো বটে কিন্তু জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো পাশের ঘরের নৈশ মজলীসের কোলাহলে। হয়ত' বা কোন গভীর রাত্রে দীপালোকহীন ঘরে দুজনায় নিবিড় আলাপনে মগ্ন—প্রাণের স্পন্দন হয়ত' এক হয়ে গিয়ে সুদূর লোকে চলে গেছে—এমন সময় মা ঢুকলেন ভাড়ার তাগাদায়। তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সরাতে না সরাতেই স্বয়ং কর্ত্তা ঢুকে পড়লেন, "ওহে দাও না আলোটা জ্বালিয়ে—আমাদের যে দাম্পত্য কলহ হয়েছে না হয় তোমাদের—" পিনেবার্গ চেঁচিয়ে বল্লে "বেরিয়ে যান"। কিন্তু কে শোনে। প্রকাণ্ড স্থূল হস্ত তখন বিছানা হাতড়াতে, ব্যস্ত। লেপের ভেতর থেকে অস্ফুট স্বর এলো "হাঃ ভগবান"—

তুমি ওদিকে—খুঁজে মরছ—ও লর্ড—এই নাও তিনশ' মার্ক। এক দিন খুব কামিয়েছি—দিয়ে দাও বেটির ক মাসের বাড়ী ভাড়া এক সঙ্গে—ওকে দেওয়ার চেয়ে তোমাদের দেওয়া ঢের ভাল। বাহির হতে রোরুদ্যমান কণ্ঠে ডাক এলো—"কোথায় তুমি?" মা আলুথালু বেশে পুনঃপ্রবেশ করে বল্লেন "রাস্তায় বেরিয়ে গেলে না ত?" পিনেবার্গ বল্লে "মা ভাড়ার কথাই হচ্ছিল—তুলে নাও নোটগুলি তোমার।" টাকা হাতে পেয়ে তিনি জাকমানের কথা তুললেন। পিছনে ফিরতেই পালঙ্কের পার্শ্বদেশ হতে জাকমান বেরিয়ে এসে বলে উঠলো, "বাবাঃ মেয়েমানুষ বটে—তিন তিন শ' মার্ক অম্লান বদনে মেরে দিলে—দেখে আসি মজাটা—কি বলে?"

এমনি করে দিন কাটে। একদিন ঘটলো বিপর্য্যয়। পিনেবার্গের সহকর্ম্মী কেসলার রটিয়ে দিলো যে ফ্রাউ পিনেবার্গ নাকি দাম্পত্যপীড়িত ভদ্রলোকদের প্রমোদের ব্যবস্থা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। শাশুড়ীর অপরাধ বর্ত্তালো বেচারা বুনীর ওপর। পিনেবার্গ কেসলারের নাসিকা লক্ষ্য করে ঘুসী চালিয়েছিল এবং ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াচ্ছিল; দৈবাৎ বন্ধু হিলব্রট্ মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিলে। বল্লে তারও ত' এক দূর সম্পর্কের খুড়ীমা সন্দেহজনক ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তা বলে কি তার দোষ?

অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে স্বামী স্ত্রী নূতন বাসা সন্ধান করে এক রাত্রি চুপি চুপি পালাতে গিয়ে জাকমানের কাছে ধরা পড়ে গেলো। তিনি কিন্তু কোন আপত্তি বা বিস্ময় প্রকাশ না করে বুনীর হাত থেকে সুট কেশটা নিয়ে মন্দ হেসে বল্লেন "তোমার কী এ অবস্থায় ভার বওয়া ভাল, চলো গাড়ীতে তুলে দিই।" তারপর স্বচ্ছায় পাখী উড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গৃহিণীকে বল্লেন "ওগো তারা গেছে—আর তোমাকে ঈর্ষায় দগ্ধ হতে হবে না।"

ডিসেম্বর মাসটা কায়-ক্লেশে কেটে গেলো। নববর্ষে মাণ্ডেল ষ্টোর্সে এক নূতন নিয়ম জারি হলো যে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে মাসিক বেতন হতে বিশ শুণের অধিক মূল্যের মাল বিক্রয় করতে হবে নতুবা বিতাড়ন অনিবার্য্য। প্রথম ক'দিন পিনেবার্গ হেসে খেলে বরাদ্দ টাকা তুলে দিলে। কিন্তু ক্রমে যখন প্রতিযোগিতার নেশা পেয়ে বসলো—প্রাণে ভয় ঢুকলো, মেজাজও চড়া হয়ে উঠলো। গশিকালয়ের মত খরিদ্দার শিকারের উগ্র পাশবিকতা তার সইলো না। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা প্রবল হয়ে উঠলো। এদিকে এরই মধ্যে একদিন বুনীকে নিয়ে ছুটতে হলো হাসপাতাল।

কদিন পরে সেই সনাতন কুশ্রী, কুঞ্চিত রক্তবর্ণের মুখ ও ভুমুরের মত মাথার এক বাণ্ডিল নিয়ে যখন বুনী বেরিয়ে এলো, তখন ঝলমলে রৌদ্রে ঘর দোর ভরে গেছে। স্বামীর কোলে ছেলেকে দিয়ে লঘু পদে ঘরময় বেড়িয়ে নিলো—চট করে একটা হেলে পড়া ছবি সোজা করে দিলো—ফুলের টবের ওপর ঝুঁকে পড়লো—কবাট খুলে বন্ধ করে দিলো—তারপর স্বামীর গলা জড়িয়ে নিবিড় ভাবে বলে উঠলো "ওগো, সত্যি আমি কত সুখী।"

একদিন দৈবাৎ জাকমানের সঙ্গে পথে দেখা। বুনীর ছেলে হয়েছে শুনে তিনি দোকান উজাড় করে নিয়ে চল্লেন ফুল আর মিষ্টান্ন। পিনেবার্গ বল্লে "দেখুন

মশাই আগে থাকতে বলে রাখছি খোকার বয়স মাত্র তিন মাস—খেলা দূরের কথা সে না পারে দেখতে, না পারে শুনতে, দয়া করে পুতুলের দোকানে ঢুকে বসবেন না যেন। জ্যাকমান অন্যমনস্ক ভাবে বল্লে—"হ্যাঁ পুতুল তাইত"—ঠিক বাপের মত কথা—তা এ অঞ্চলে পুতুলের দোকান আছে না কী?" জাকমান ক্ষুদ্র সংসারটিতে গ্যাঁট হয়ে বসে নড়বার লক্ষণটিও দেখালেন না। বুনী সত্যসত্যই বিব্রত হয়ে পড়লো। একটিমাত্র ঘর। বল্লে "এবার আমার খোকাকে দুধ খাওয়াবার সময়—আপনি যান।" জাকমান আরও জেঁকে বসে বল্লেন "আমি দুধ খাওয়ানো কখনও দেখিনি, দেখবো—" পরদিন কাজের ভীড়ের মাঝে পিনেবার্গ দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে কাটালো কিন্তু বাড়ী এসে শুনলে জাকমানের ব্যবহারে ভদ্রতার কোন ব্যত্যয় হয়নি—উপরন্তু খোকাকে নিয়ে সে সারাক্ষণ খেলা করেছে। সন্ধ্যার সময় তিন জনে সিনেমা দেখে কাটিয়ে এল; তারপর জাকমান সেই যে উধাও হয়ে গেলেন আর দেখা নেই।

পিনেবার্গের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হোল; বন্ধু হিলবুর্টের কর্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নিঃসহায় হয়ে পড়লো সে কর্মক্ষেত্রে এবং তার মানসিক অশান্তি প্রকট হয়ে উঠলো সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারে। বুনী তার প্রাণের উদ্বেগ গোপন করে রাখে কিন্তু নেহাৎ অসহ্য হয়ে উঠলে না বলে পারে না যে মানুষকে যারা যন্ত্র বানায় তাদের সে কখনই ভোট দেবে না—দেবে কমিউনিষ্টকে।

একদিন তারা সত্যসত্যই পথে বসলো। অনাবশ্যক বলে পিনেবার্গ বহিষ্কৃত হলেন কর্মক্ষেত্র হতে। অনাহার-ক্লিষ্টের নগ্নমূর্ত্তি অপেক্ষা বেকারের আশাহত অর্থহীন অস্তিত্ব অধিকতর নিষ্করুণ ও দুর্ব্বহ। বুনী সূচীকার্য্য করে যা কিছু উপায় করে তাইতে বেকার-জলপানি জুড়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায় কোনক্রমে, কিন্তু পরান্ন-জীবিকার অবমাননা পুরুষ-প্রকৃতিকে নিভৃতে নৃশংসভাবে হীন হতে হীনতর করে তোলে। বুনী তার নারীত্বের অপরিমেয় সৌন্দর্য্য দিয়ে স্বামীর হৃদয় ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে; আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টায় প্রাণপাত করে কিন্তু পেরে ওঠে না।

একদিন যেসময়ে অপরিচ্ছন্ন ভূষণের জন্য পিনেবার্গ জনসঙ্কুল পথে নিদারুণ-ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত গৃহাভিমুখে ধাবমান, বুনী কুটীরে শিশু পুত্রের সঙ্গে ক্রীড়ারত, এমন সময় জাকমানের পুনরাবির্ভাব হলো। তিনি মনে মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প করে এসেছেন দ্বিধাবিরহিতভাবে ব্যক্ত করবেন আপন ঈপ্সিত কামনা। বুনীর কাছে হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করলেন ভিক্ষার ভাষায়। মুক্ত কণ্ঠে বল্লেন কারাগারের মোয়াদ কাটিয়ে সেদিনই ফিরেছেন, পিনেবার্গের পরিত্যক্ত ছোট্ট একটু স্থান পেলেই তাঁর পাপ জীবনের অবসান হয়। বুনীর স্বামীর অন্তঃকরণে তখন উত্তাপের বড় অভাব—অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হতে কৃতজ্ঞতা-বিজড়িত কণ্ঠে বিদায় দিল জাকমানকে।

গল্প এখানে শেষ হলো। আখ্যায়িকাটি ত্রিধামূর্ত্তি সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কিন্তু চরিত্রত্রয়ের মধ্যস্থিত ব্যাস আজে বাজে দৈনন্দিন ঘটনা ও কথায় এত ঘনপল্লবিত যে সহজে আত্মপ্রকাশ করে না। প্রণিধান-অন্তে বইখানি মুড়ে রাখলে ধীরে ধীরে

সুস্পষ্ট সুগঠিত বুনী বেরিয়ে আসে শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা হতে, তখন প্রথম অধ্যায়ের বালিকার প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনটিও অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে—মমতা, সংযম ও শালীনতার নূতনতর প্রকাশ-ভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম হয়। লেখকের মৌলিকতা হচ্ছে তিনি মৌনের আধারে নারী চরিত্রকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন—বুনীর বহিঃপ্রকৃতি গৃহিণীপনায় উন্মুখর কিন্তু অন্তর গহনে যে মৃদুমন্দ সমীরণ বয়ে গেছে তার বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত না হয়েও পাঠকের অনুভূতিতে বিধৃত হয়। মদ্যপায়ী গাণিকাসক্ত জাকমান্ জীবনের সায়াহ্নকালে যখন প্রথম প্রকৃত নারীর সমীপ স্পর্শে আসে তখন তার বুভুক্ষু চিত্ত কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠতো বুনীর কোমল অন্তঃকরণ তা বুঝতো, কিন্তু একটি দীর্ঘশ্বাসেও ব্যক্ত করেনি সে কথা।

পিনেবার্গ দুর্ব্বল চিত্ত, ছাপোষা ভালমানুষ—নির্ম্ম নিষ্করুণ সংসারের ঘাত্যাঘাতে তৃণ-তুল্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কিন্তু স্বামিত্বের বহুমূল আভিজাত্য অনবনত অভ্রভেদী উচ্চ থেকে গেছে; অথচ চরিত্র চিত্রণে লেখক একটিও রেখা এই আইডিয়াটিকে ব্যক্ত করবার অভিপ্রায় টেনে আনেন নি।

পূর্ব্বেই বলেছি আখ্যায়িকাটি পারিপার্শ্বিক চরিত্রের দ্বারা পল্লবিত। লেখকের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে যখনই তিনি উপরিউক্ত চরিত্রত্রয় হতে দৃষ্টি উত্তোলন করে পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিবদ্ধ করেন—ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বর্ণনা তখন গল্পের ব্যাস হতে সরে গিয়ে স্বরূপ প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লেখকের অভিপ্রায় হয়ত তৎকালীন জার্ম্মানীর সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ সৃষ্টি করা; কিন্তু তাতেও তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন বলে মনে হয় না। হিলবুর্টের নগ্ন সম্প্রদায় হয়ত নূতন জার্ম্মানীর বিশিষ্ট অঙ্গ; কিন্তু বুনী যখন হাসপাতালে এবং পিনেবার্গ দুশ্চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত তখন অকস্মাৎ তাকে দিগম্বর-দলের ঘূর্ণিপাকে ফেলে লাভ কি হলো? আলোচ্য বইতে অসঙ্গত কথা ও আবাস্তর ঘটনার অভাব নেই। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় ছিদ্রান্বেষণের মত সঙ্কীর্ণচিত্ততা পরিহার্য্য—আমার আনন্দ যে মূলতঃ রসপ্রতিপত্তির কোন বিঘ্নেপ ঘটেনি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

সুর ও সঙ্গতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত (ভারতী ভবন)।

"সুর ও সঙ্গতি" রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদের কতকগুলি পত্র; সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব নিয়ে অনেক কথাই এতে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি বই হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় সঙ্গীত-রসিক মাত্রেই সুখী হবেন। এ পত্রগুলির কয়েকটি কথা ও মতামত আশ্রয় করে দুএকটি কথা, সমালোচক হিসেবে নয় গাইয়ে হিসেবে বলতে চাই। তাই এই প্রবন্ধটি বাণিজ্য-ধর্ম্মী নয় সাহিত্য-ধর্ম্মী।

সুরের জগতে আমরা চলি যুক্তির পথে নয় উপলব্ধির পথে। কারণ সেখানকার সাধারণ বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ যুক্তিই ব্যক্তিগত অতীত বিশ্বাসের কতকগুলি প্রথাসম্মত, সংস্কারবদ্ধ অপভ্রংশ। মানুষের যুক্তি চলে তার অন্তরের ধর্ম্ম

ও ভালবাসার পথে। সেই পথে গেলেই সুযুক্তি পাওয়া ও দেওয়া যায় এই আমাদের ধারণা। তাই চিঠির মতামত সমালোচনার মতামতের চেয়ে অনেক বেশী সত্যি, কারণ তার যুক্তির আবরণ থাকে না, যদিও নিজের কাছেই নিজের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার চেষ্টায় উপমার স্বরবিস্তার থাকে। তাই বিশেষভাবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং সাধারণভাবে আর্ট সম্বন্ধে যে কথাগুলি এই পত্রগুলিতে বলা হয়েছে তার পরিমাণ কম হলেও অর্থভার অনেক।

অধিকাংশ জায়গায় এতে কলাবিৎকে বাদ দিয়ে কতকটা ব্যাকরণ-সম্মত abstract আলোচনাই বেশী। ললিতকলার আলোচনা অনেক সময় কলাবিৎকে বাদ দিয়েই হয়ে থাকে, কারণ সঙ্গীত ছাড়া অন্য কলাসৃষ্টি কলাবিতের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ছাড়াও অনেক কাল সজীব থাকে। কিন্তু গানের অস্তিত্ব কলাবিতের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ছাড়া অন্ততঃ আমাদের দেশে নেই, কখনও ছিলও না। এর মধ্যে কতকগুলি পত্রে গায়কের সৃষ্টি-কৌশল ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি সম্বন্ধে দুএকটি গভীর প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা ভাল।

রবীন্দ্রনাথের পত্রে অনেক আলোচনাতে বারবার এই প্রশ্নই রয়েছে যে এই জাতীয় সঙ্গীতে সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি কি এবং কোথায়? কারণ সমস্ত আর্টেরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। গানেরও একটা স্বাভাবিক পরিণতি ও শেষ অবশ্যই আছে, কিন্তু সে পরিণতির ধারা অন্যান্য কলাসৃষ্টির ধরণে হওয়ার সম্ভাবনা কম। "নাদ-সঙ্গীতের" বিশিষ্ট পরিণতির আলোচনা করার আগে এই কথাটা একটু বোঝা দরকার। গান ছাড়া অন্যান্য ললিতকলার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব নির্ভর করে দৃষ্টি-চেতনার ওপর। দৃষ্টির সাহায্যে আমরা যা কিছু গড়ে তুলি তা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক থেকে পৃথক থাকে—তাই তার রূপ ব্যবধান-মূলক। তাই স্থপতি ও চিত্রশিল্পী নিজের সৃষ্টির পরিধি প্রথমে ঠিক করে নিয়ে তার পর রচনা আরম্ভ করেন। শ্রুতিচেতনার নিয়ম এর বিপরীত; পারিপার্শ্বিক থেকে পৃথকভাবে অবস্থান রক্ষা করার তার প্রয়োজন নেই। সেখানকার সৃষ্টি সমস্ত overlapping। সৃষ্টির এই একটা সমাধান-মূলক রূপ আছে যাকে দৃষ্টি-চেতনায় বা দৃষ্টির ভাষায় পাওয়া যায় না।

তবে গানের প্রথম ও গৌণ সম্পদ স্থাপত্যেরই, যদিও এই স্থাপত্য গতিশীল ও স্থিতিশীল দুইই। তার গঠন আছে, সৌষ্ঠব আছে—একটা পরিচিত স্বরূপ আছে। এই সম্পদ রাগের অথবা গানের শারীরিক সম্পদ, একে নকল করা চলে, আর একজনের কাছ থেকে শিক্ষা করে "আদায়" করাও চলে। রাগের এই সম্পদ নিয়েই সঙ্গীত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ—এই সৃষ্টি-পদ্ধতির সঙ্গে স্থাপত্য ও চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

তার দ্বিতীয় ও মুখ্য সম্পদ সাহিত্যের, তাই ভাষা-সাহিত্যের ধরণে তার শব্দ আছে, বাক্য, বিশেষ্য, বিশেষণ আছে, ক্রিয়া আছে, ভাবসমৃদ্ধি আছে, গদ্য আছে, পদ্য আছে, দর্শন আছে। এই দিক দিয়ে চিত্তের ব্যাপ্তি ও উপলব্ধির গভীরতা কলাবিতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। ব্যাকরণ একে আইনে বাঁধবার চেষ্টা করেননি—(শুধু বলেছেন যে এই তত্ত্ব যাঁর লাভ হয়েছে তিনি মোক্ষ লাভের অধিকারী)। এই

কথাটা বোঝানোর জন্যে সামান্য পারিভাষিক আলোচনা প্রয়োজন। মল্লার রাগে "মরেপ" তিনটি স্বরযুক্ত একটি তান, কথা বা শব্দ, এই তান একত্রে architectural design, ছবির রেখা, ও ভাষার শব্দ। এই রকম "নিধনিসা" "ধনিপ" "গমরেসা" ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে, সেই শব্দগুলি বহুকালের সংস্কার আশ্রয় করে সঙ্কেত ও অর্থপূর্ণ হয়ে আছে। গানের ইমারত গড়ে তোলার দিকটা নকল করা যায় এবং সেটা ছবি আঁকার মত বটে, কিন্তু কণ্ঠের ভাষার অভিব্যক্তিকে সুন্দর স্বরূপ দিতে হোলে কথার আড়ত অথবা vocabulary থাকাই যথেষ্ট নয়। শব্দের সঙ্কেতকে গভীর করে তুলতে হোলে বা বিরাট-স্বরূপ দিতে হোলে চাই উপলব্ধ শক্তি। এই শক্তির দৈন্য অধিকাংশ গাইয়ের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ায় সঙ্গীতের ওপর অশ্রদ্ধা হওয়া খুব আশ্চর্য্য নয়।

প্রতি রাগের সেইজন্যে একদিকে গঠন-প্রণালী আর একদিকে সাহিত্যে ব্যাপ্তি। প্রত্যেক রাগের একটা করে বিশেষ তান, কর্ত্তব্য অথবা significant form থাকে, যেমন বাগেশ্রীতে "মগরেসা নিধসা"। তারপর এর পাশে অন্যান্য তান বসিয়ে সৌষ্ঠব সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষাগত আন্তরিক অভিব্যক্তির জোরই বেশী থাকে সব সময়। তাই এর সঙ্গে ক্রমশঃ "ধনিধ", "পধনিধ" "মধনিসানিধ" এই রকম নানা "তান" যোগ করে যখন তা একত্রে আকৃতি ও প্রকৃতিতে সৌষ্ঠব ও সমতা লাভ করে তখন তাকে "সমে" শেষ করা হয়। এই রকম করে প্রতি "সমে" একটি sentence, idea, বহুবর্ণ চিত্র, ও স্বরসন্দর্ভ শেষ হচ্ছে—এটা রাগের আংশিক পরিণতি। কিন্তু এই আংশিক পরিণতি ক্রমাগত জড়ো করে চল্লেই সঙ্গীত, রাগ, বা রসসৃষ্টি হয় না। এই অংশের পরিণতি রাগের বৃহত্তর বহুত্বীহি* উপলব্ধিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা চাই। এই রকম ভাবে প্রতি অংশ যখন সমগ্রতার প্রকৃতি আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, তখন সেই সৃষ্টিকে শ্রুতি-ধর্ম্মী সৃষ্টি বলা যায়।—এ প্রসঙ্গ আবার পরে তোলা যাবে।

তাই গানের এই দুটি বিশিষ্ট ধারা। প্রথমটি pattern, form, অথবা design। একে ব্যাকরণ বলেছেন অলঙ্কার, যথা "বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভম্ অলঙ্কারম্ প্রচক্ষতে"—এবং "গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ"। যেমন "সাগ, রেম, গপ" অথবা "সারেগ, রেগম, গমপ, মপধ, পধনি"—এই ধরণের সন্দর্ভ হোল অলঙ্কার। কিন্তু "যস্য নাস্তি স্বয়ংপ্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্"—তাই যাঁরা ব্যাকরণ আশ্রয় করে গান শিখলেন তাঁরা শুধু স্থাপত্য-সম্মত pattern নকল করে গেলেন—তাইতে গায়ক-সমাজে কলাবিতের চেয়ে মিস্তিরীর সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে দাঁড়াল। এখন মল্লার গাইতে হোলে "মরেপ, নিধনিসা" সকলেই বলেন, কিন্তু প্রত্যেকের বলাই আলাদা হয়ে যায়। এরই মধ্যে কেউ বা ভয় দেখায়, কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা জোচ্চুরী করে, কেউ ভণ্ডামী, কেউ অপমান করে, কেউ ভিক্ষে চায়, কেউ বা কাঁদে, কেউ অনুযোগ আবেদন এই সব করে। এই যে বিরাট পার্থক্য এটা উপলব্ধিগত পার্থক্য—এটা ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরে, তার গতিতে, মিড়ে, কম্পনে, মুখের চেহারায়।

* বহুব্রীহি উপলব্ধি বলতে এই বোঝায় যে রাগের সমস্ত তান ছাড়িয়েও সঙ্গীতের একটা অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ আছে।

গানের এই ভাষার দিকটা সঙ্কীর্ণ ভাবে কাব্য-সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে; তাই তার form বা ইমারত ভাল না হলেও উপলব্ধির সাড়া পাওয়া যায়। এই আন্তরিকতা কাব্য-সঙ্গীতের প্রধান সম্পদ।

সঙ্গীতের উপলব্ধি যতই গভীর হয় কণ্ঠস্বর ততই শরীরের স্থূল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। আজ যদি হঠাৎ ভাল করে কানের ব্যবহার হয়, তাহলে বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ লোক নিজের কণ্ঠস্বরে চাতুরী, কৃত্রিমতা, দাম্ভিকতা, মূঢ়তা, আবেগ, লালসা ইত্যাদি শারীরিক বিকার শুনে নিজে শিউরে উঠ্‌বে। গায়ক এই ধরণের বিকার থেকে মুক্তি পেলে, তবে কলাবিৎ নামের ভবিষ্যৎ-অধিকারী হওয়ার আশা করতে পারেন। "নাদ-সঙ্গীতের" এই জায়গায় সব চেয়ে বড় সম্পদ ও বিপদ।

কাব্য-সঙ্গীতের এ অধিকার পাওয়ার আশা কম, এমন কি প্রায় অসম্ভব। কারণ মানুষের কথার ভাষার আরম্ভ স্থূল শারীরিক বৃত্তির স্তরে। শরীরকে আশ্রয় করেই তার সুখ দুঃখের কাহিনী। তাই রসনার গান আত্মাকে ক্রমাগত মনের স্তর থেকে শরীরের স্তরে টেনে আনে। এই টেনে আনাকে অবনতি বলে মনে করতে হবে যতক্ষণ এই অবনতি সম্বন্ধে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, কারণ স্বাধীন অবনতি অবনতিই নয়। যাঁরা একে অবনতি বলে মনে করেন না, তাঁরা এই গানের অনুশীলন অবশ্য করবেন। তবে গানের মধ্যেই যাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ তাঁরা এই ভাষার আশ্রিত সুরকে নিয়ে আনন্দ পাবেন না।

আমরা গানের ভাষাতীত স্বরূপ আলাপকেই সবচেয়ে উঁচু বলে জানি। এই সঙ্গীতের নাম "অনিবদ্ধ সঙ্গীত"। সঙ্গীতের অপর, ভাষা ও ছন্দোবদ্ধ অবস্থার নাম "নিবদ্ধ সঙ্গীত"—যেমন ধ্রুপদ, ধমার, দ্রুত লয়ের খেয়াল। বিলম্বিত লয়ের খেয়াল "আলাপচারী", অর্থাৎ তার প্রকৃতি অধিকাংশে আলাপ বা অনিবদ্ধ সঙ্গীতের। অনেকে আপত্তি তুলবেন যে বিলম্বিত খেয়ালেও কথা ও তানের ব্যবহার হয়—অবশ্যই হয়, তবে সে কথার কোনও মানে থাকে না, এবং তালও নির্ব্বিকার অবস্থায় পায়ের তলায় মাটিতে পড়ে থাকে, দেয়ালের মত চারিদিক থেকে চেপে ধরে না।

ধ্রুপদকে নিবদ্ধ সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও নীচু স্তরে ফেলায় অনেকে আহত হতে পারেন, কিন্তু উপায় নেই—ধ্রুপদ সত্যিই নিবদ্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ ছন্দ তাল ও ভাষাবদ্ধ—সে তাল আটচল্লিশ মাত্রার চৌতাল হোলেও এই সংজ্ঞার কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

ধ্রুপদের বিরাট বিপুলতা অনেকের মনেই সভয় শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছে, কিন্তু সে-বিপুলতা নিতান্ত শারীরিক বিপুলতা, চিন্তা বা পরিকল্পনার বিপুলতা নয়। রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে বাল্যকালে ধ্রুপদ শোনার কথায় এই বিপুলতার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তিনি যে-যুগে ধ্রুপদ শুনেছেন সেটা ছিল শারীরিক বিপুলতার যুগ—সে-যুগে কুস্তি, বড়মানুষী, দারোগা, ডাকাত এই সব বস্তুর ওপর লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তাই তখনকার গাইয়ের ছিল "তাজখাঁর মত পাগড়ী, বাজখাঁর মত গলা, চৌবেজীর মত "সিদ্ধি" আর মিশ্রজীর মত মাংসপেশী *। তার সঙ্গে থাকত

* এই কথাগুলি আমার নিজস্ব নয়—আমার মাতুল ৺হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথার পুনরুক্তি।

"পাথোয়াজ", তার ওপর মোটা আটার প্রলেপ, বাজাতেন বিরাট গালাপাট্টাধারী "মিরদঙ্গী"। ধ্রুপদের বিপুলতা ছিল এঁদের শরীরে, কণ্ঠে, ও যন্ত্রে বিশেষ করে যখন এরা "খাণ্ডার বাণী" ধ্রুপদ গাইতেন। এখন সেই ধ্রুপদ পাতলা গলায় গাইলে অজ্ঞ লোকে বলবেন "ঠুমরী হয়ে গেল"।

এ-যুগে এর পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখনকার কলাবিৎ উচ্চকণ্ঠের শব্দকে "চৌকিদারী আবাজ" বলে থাকেন; শাস্ত্রমতে এই কথাই যে ঠিক তা রত্নাকরের "দুর্গায়ক লক্ষণ" দেখলে বোঝা যাবে।

তবে সবশুদ্ধ কি সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে? এখনও হয় নি; একটা নতুন সৃষ্টি হওয়ার আগে যেমন সমস্ত এলোমেলো অগোছাল হয়ে পড়ে, এখন সেই অবস্থা। তার কারণ মানুষের চিত্তের সম্পূর্ণতায় সবদিক দিয়ে বাধা পড়েছে। সামাজিক জীবন ও বৈদগ্ধ্যের ভেতরকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কলাসৃষ্টির ভেতর সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে। তার জন্যে কলাবিৎকে দোষ দেওয়া ভুল।

বর্ত্তমান যুগে চিন্তার ধারা দৃষ্টিগত তাই লোকে গান দিয়ে গান বোঝে না—খানিকটা চিত্র, খানিকটা স্থাপত্য, খানিকটা সাহিত্য, খানিকটা norm অথবা ছুতোরের ফর্ম্মা, এই সব দিয়ে বোঝাতে হয়। কিন্তু এই কি সত্যিকার বোঝা?

আমাদের সংস্কার এ নয়। বৈদিক যুগ কিম্বা তারও বহু আগে থেকে আমাদের জ্ঞান ও সৃষ্টির ধারা ছিল শ্রুতি-ধর্ম্মী।* শ্রুতির ইন্দ্রিয়-চেতনা সমাধিপ্রকৃতি, অর্থাৎ যা দৃষ্টিতে অনেক, তাই শ্রুতি এক করে শোনে। যথা,—একটি তার যে এক সেকেণ্ডে তিনশ'বার কাঁপে, চোখ দিয়ে তা দেখা যায়, কিন্তু তাই শ্রুতি-চেতনার একটি মাত্র স্বর। এই একস্বরূপকে অনেক সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করে গানের মূর্খ বিশ্লেষণ-দৃষ্টি দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত। বিশ্বপ্রকৃতির শ্রুতিগত উপলব্ধির abstraction হোল "সারেগামা", দৃষ্টিগত উপলব্ধির abstraction রেখা ও সংখ্যা, অর্থাৎ "১, ২, ৩, ৪"। তাই গানের symbolism নির্ভর করে শ্রুতি-চেতনার ওপর, গণিতের symbolism নির্ভর করে দৃষ্টি-চেতনার ওপর, রেখাচিত্র অথবা চিত্রকলারও তাই। তাই সুরকে যেমন বৈজ্ঞানিক "১, ২, ৩" ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করেন, চিত্র-শিল্পী তেমনি গানকে ছবির লাইনে আঁকতে চান। এর কোনটাই সম্ভব নয়। যে ইন্দ্রিয়ের যা বিষয়, তাই দিয়ে তাকে বুঝতে হবে।

শ্রুতি-ধর্ম্মী সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হোল সমগ্রতার উপলব্ধ স্বরূপ অনুসারে অংশে রূপ দেওয়া। তার আরম্ভ ব্যবধানে নয়, সমাধানে। অতীত কালের যে কোনও সৃষ্টি দেখলে আজও তা বোঝা যায়। সেকালের মন্দিরগুলির গায়ে ছোট ছোট মন্দিরাকৃতি অঙ্গ দিয়ে সৌষ্ঠব সাধন করা হয়েছে। এই অংশগুলির প্রকৃতি সমগ্র মন্দিরেরই অনুরূপ। গানেও তাই হোত, প্রত্যেক স্বরসন্দর্ভ বা তান আজও রাগের সমগ্র স্বরূপের প্রকৃতির অনুসারী। মানুষকেও এই ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে আমাদের ছবিও ছিল শ্রুতিধর্ম্মী।

দৃষ্টি-ধর্ম্মী জ্ঞানের ও সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হোল ঠিক এর উল্টো। তার আরম্ভ হোল

* এই সম্বন্ধে "উত্তরায়" ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি। "শ্রুতি ও দৃষ্টি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্যবধানে অর্থাৎ দৃষ্টিলব্ধ সূক্ষ্মতম অংশে। তার উদ্দেশ্য হোল সমগ্রকে অংশের রূপ দেওয়া, তাই তার পরিমাণ ও আকৃতি বৃহৎ হলেও প্রকৃতি ক্ষুদ্র থাকে—এর উদাহরণ আধুনিক বৃহৎ অট্টালিকা, যার অর্দ্ধেক ছেঁটে ফেলে দিলেও প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। আবার এই পথের প্রদর্শক বৈজ্ঞানিক ব্রাহ্মণরাই বলেছেন এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড protons এবং electrons-এর সমষ্টি মাত্র—তবে এখন সব মিলিয়ে কতকটা ধোঁয়ার আকার ধারণ করেছে, এই যা ভরসা।* এমনি করে বিরাট স্বরূপকে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীতে টেনে এনে বর্ত্তমান ব্যবধানমূলক দৃষ্টি চিন্তাশীল মনের সৃষ্টি।

এই পথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের শারীরিক ও যান্ত্রিক বিরাটত্বকে সত্যিকার কল্পনার বিরাটত্ব বলে মানা হয়েছে। যেমন এক লক্ষ লোক এক সঙ্গে হাত তুললে কিম্বা পা ফেললে সেটা লোক সংখ্যার বিরাটত্ব বটে কিন্তু হাত কিম্বা পা ফেলার বিরাটত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। এই রকম সব দিক দিয়ে মানুষের চিন্তার unit অথবা প্রকৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়ে চলেছে। সেই ভাবে একই নিয়মে এখনকার খেয়ালের তানে সর্ষের মত ছোট ছোট দানা।

রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে "চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের" সম্বন্ধে কয়েকটি কথায় বোঝা যায়, সাধারণ বাঙালীর মত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে তিনিও পশ্চিমের দরওয়ানের কথা ভেবেছেন। "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত" শাস্ত্রীয় নাম নয়, ওটা "উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের" "দক্ষিণী" নাম। এর শাস্ত্রীয় নাম মার্গ-সঙ্গীত—যদিও মার্গ-সঙ্গীত বলতে যা বোঝাত, তার সঙ্গে এর এখন অনেক তফাৎ, তবু প্রকৃতির তফাৎ নেই। আপাততঃ একে "নাদ-সঙ্গীত" বললে সব চেয়ে সুবিধে হয়—কারণ এই সঙ্গীতের সঙ্গে কোনও প্রাদেশিক ভাষার সম্বন্ধ নেই।

তবু "চলৎশক্তিহীন" কথাটার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন। রাগ-রাগিণীর নতুন সৃষ্টিই যদি "চলৎশক্তি" হয়, তাহলে "নাদ-সঙ্গীত" দ্রুত-উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় যদি নতুন শব্দ বা ছন্দ বা গল্পের ছাঁচ ক্রমাগত সৃষ্টি না হয়, তাহলে কি বলা যায় যে বাংলা ভাষা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে? সাহিত্যের ভাব-সমৃদ্ধি কি অভিধানের আয়তন বা শব্দের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে? ভাষার কাজ চিন্তা ও পরিকল্পনার রূপ দেওয়ার সুবিধে করে দেওয়া, তাই ভাষার সত্যিকার ভাব-সমৃদ্ধি নির্ভর করে স্রষ্টা শিল্পীর ওপর। এখন যদি বলা যায় যে বাংলা ভাষা চলৎশক্তিহীন, কারণ তিন হাজার বছর আগেকার সংস্কৃত আজও অনেক ব্যবহার হয়—তবে "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত চলৎশক্তিহীন" বলতে ঠিক সেই বোঝায়। এ ভাষা যিনিই বোঝেন তিনিই জানেন যে রসনার ভাষার পরিবর্ত্তে কণ্ঠের ভাষা ব্যবহার করাই তার উদ্দেশ্য, মনের অবস্থা অনুসারে তার চেহারা ফুটে বেরোয়। তাই প্রত্যেকটা তান "সারিগামা" নয়, আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশ। "সারিগামার" দরকার অনির্দ্দিষ্টকে সাধনায় নির্দ্দিষ্ট করে পাবার জন্যে। তা নৈলে এই অনুভূতির প্রকাশ বোঝার জন্যে রাগ-রাগিণীর নাম অথবা "সারিগামা" জানবার দরকার নেই।

* Eddington প্রণীত New Pathways in Science. 88 পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি পত্রে আলাপ ও গানের আলোচনায় তিনি বল্‌ছেন, "আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার করা কঠিন, তার কারণ দৌড়তে দৌড়তে বিচার করতে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তাতে যে রস পাওয়া যায় সেইটি নিয়ে তারিফ করা চলে কিন্তু সমগ্রকে সুনির্দ্দিষ্ট করে দেখব কি উপায়ে? তানসেনের গান হোক বা গোপাল নায়কেরই হোক তারা তো নিরন্তর বিস্ফারিত মেঘের আড়ম্বর নয় তারা রূপবান ··।" কিন্তু আলাপ নিতান্তই অরূপ নয়, তাতে কখনও স্থিতি কখনও গতি, যখন তখন সে ছন্দের রূপে ধরা দেয়। ঠিক এই রকমে খেয়ালের সৃষ্টি, তার হিসেব মেলানোর তাগিদ্ নেই। কিন্তু এই যে গতি—এ গতি ভাষার বাধা-গতি নয়, এখানে দাঁড়ানোর জায়গা আছে, অবসর আছে। আর যদি দৌড়তে দৌড়তে বিচার করা অসম্ভবই হোত, তাহলে কাব্য, গল্প, সমস্ত ছাপার অক্ষরের সাহিত্য কি করে উপভোগ করা চলে? সেও ত ক্রমাগত দৌড় করাচ্ছে। আলাপ কালকে অতিক্রম করেও তাকে ভোগ করে, তাই সে কালের অতীত ও স্বাধীন। কণ্ঠের ভাষার দাঁড়াবার অধিকার আছে, রসনার ভাষা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই রসনার বাধ্য-গতি—ভাষার সঙ্গে চল্‌তে তার নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই ধরণের গতিশীলতার পূর্ণ স্বরূপ বোঝার জন্যে ব্যবধান-বুদ্ধি অথবা analytical sense যথেষ্ট নয়—এর প্রধান উপায় সমাধান-বুদ্ধি অথবা integrating consciousness। বাংলা দেশের দক্ষিণে হাওয়ার গতিশীল,—গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি পরমাণুর দিকে মন দিয়ে আমরা তার পূর্ণ স্বরূপ পাই না। এই প্রবাহে সমস্ত চেতনা যখন এক হয়ে ভেসে চলে তখনই গতি স্থিতি-স্বরূপ হয়। আলাপও ঠিক এই ভাবে শুনতে হবে, যদি গাইবার মত লোক পাওয়া যায়। এই অন্যমনস্ক উপভোগের ভূমানন্দই কোনও সুদূর অতীতে গন্ধর্ব্ব-লোক থেকে ভেসে এসেছিল।

বইটি পড়ে অনেক জায়গায় দুঃখ পাওয়ার কারণ থাকলেও, মোটের ওপর আনন্দ লাভ করেছি, এই ভেবে যে বর্ত্তমান ব্যবধি-প্রকৃতি, দৃষ্টি-চিন্তাশীল, বাণিজ্যধর্ম্মী যুগেও সঙ্গীতের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অস্পর্শী হয়ে আছে, নৈলে চিঠিগুলি লেখা হোত না।

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,

তৃতীয় খণ্ড (সাহিত্যপরিষদ)

আমার মনে হয় বাংলা দেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লেখা সুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই। তার পূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গ দেশের অতীত গৌরব উদ্ধার করতে সচেষ্ট যে হন নি তা নয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম কে না জানে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁরই শিষ্য। তাঁদের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত, তাঁদের দান চিরস্মরণীয়, কিন্তু সে কৃতিত্ব ও দানের রূপকে ভারতীয় পরিশীলনের

অথণ্ড কিংবা ক্রমবিবর্ত্তমান রূপ বল্লে অতিরঞ্জন করা হবে। বিশ্বকোষী পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও বিভেদকারী বুদ্ধির প্রাধান্যে রাজা রাজেন্দ্রলালের সমগ্রশক্তি নিয়োজিত হল বিশ্লেষণ কার্য্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম উড়িষ্যার খণ্ড ইতিহাসে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের কোন বিগ্রহ নেই; উপাদান পরীক্ষায়, কথোপকথনে এবং অনুপ্রেরণায় সে-পাণ্ডিত্য নিঃশেষ হল। কেন এমনটি হয় বিশ্লেষণ করলে আমরা পরবর্ত্তী যুগের বাঙালী ঐতিহাসিকদের দোষ গুণ বিচার করতে পারব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল ও শাস্ত্রী মশাইএর পূর্ব্বাচার্য্য কেউ ছিল না, তাঁরাই উপাদান আবিষ্কার করেছেন, অতএব সে উপাদনের পরিচয় তাঁদের নিজেদেরকেই দিতে হয়েছে; একটা কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল—এবং সেইটাই আমার মতে প্রধান। ইংরেজ আমাদের রাজা, আমরা তাঁদের দীন অধীন প্রজা। তাঁরা এমন ভাবে রাজ্য চালিয়েছেন যাতে সন্দেহ হয় যে গোটা কয়েক আচার ভিন্ন আমাদের একটা ইতিহাসও থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কিংবা দ্বিধা তাঁদের মনে ঘুণাক্ষরেও ওঠেনি। জন কয়েক ইংরেজ পণ্ডিত রাজ্য শাসনের জন্য আমাদের আচার ব্যবহার জানতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেন যে আমাদের একটা সভ্যতা ছিল, এবং সে সভ্যতা নিতান্তই দার্শনিক। অর্থাৎ দার্শনিকের জাত বলে রাজ্য-শাসন প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতের সব কাজেই আমরা ছিলাম অপাগণ্ড অপদার্থ। আমাদের অনেক কৃতিত্বে বুদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে বুদ্ধিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্পর্শে দুষ্ট, কলুষিত। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যেতো, সেটা আমাদের ছিল না, কারণ, সেটা আমাদের প্রকৃতির প্রতিকূল। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য ও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির ব্যবহার হল ঐ অভিযোগের জবাবে। তাই তাঁর জীবনে এবং কর্ম্মে তিনি ছিলেন উগ্রভাবে positive এবং বুদ্ধিবাদী, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-পদ্ধতিতে অন্ধ বিশ্বাসী। টুলো পণ্ডিত তিনি রাখতেন, তাঁদের মত খণ্ডন করতে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের টুলো পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁর মন যে প্রতিবাদী মন ছিল এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে ইতিহাসের ট্রাইপস নিতে যাননি; কিন্তু আধুনিক অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের ডন্-এরা যে তাঁকে একদিনেই পরমাত্মীয় করে তুলতেন তা বলতে পারি। সেই উপাদানের প্রতি-উপাদান হিসেবেই দরদ, প্রমাণের প্রতি সেই নৈয়ায়িক তথা উকীলের মোহ তাঁর ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রমাণনিষ্ঠা প্রতিপদে বাধা তুলত। তিনি যে কেন উকীল হন নি এ প্রশ্নটি তাঁর একটি উকীল বন্ধুর মনে প্রায় উঠত, আমি জানি। আর ঠিক এই কারণেই তাঁর কথাবার্ত্তা ছিল অত সারগর্ভ, অত মনোজ্ঞ, অত ইঙ্গিতপূর্ণ। কী না থাকত সে কথাবার্ত্তায়? সাবধানী মনের কি এই পরিণাম? য়ুরোপীয় বুদ্ধি চর্চ্চার গতি কি এই ভাবে নিজের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়? তার শেষ কি কথায়? ভাটপাড়ার স্মৃতি আর নবদ্বীপের নব্যন্যায় কি মানুষের সৃজনী শক্তিকে পঙ্গু করে, তার সঙ্কলনবুদ্ধিকে বিফল করে? এই কারণ? না, রাজেন্দ্রলাল ও শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের গোপন কোণের পশ্চিমী অভিযোগের বিপক্ষের মূক প্রতিবাদটি রূপান্তরিত হোলো পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ঐকান্তিক

অবলম্বনে, পশ্চিমী ঐতিহাসিকবৃন্দের প্রতি স্পর্দ্ধায়, প্রতিযোগিতায়? কিংবা, এই দুজন মহাপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের পিছনে কোন সামাজিক শক্তির আলোড়ন ছিল না বলেই তাঁরা কি কেবল পথ-নির্দ্দেশক হয়েই রইলেন? অথচ savant বলতে যা বোঝায় তার প্রতীক রাজা রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ ভিন্ন কাউকে বলা চলে না।

সে যাই হোক, স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে সমাজ-শক্তির অভাব আর রইল না। এ যুগের লেখকদের সম্বন্ধে আর বলা চল্‌ল না যে historical or scientific or legal conscience made cowards of them all। স্বদেশী আন্দোলন ঐতিহাসিক বিবেক-বুদ্ধিকে উল্টে দিয়ে ঐতিহাসিকদের অতিরিক্ত রকমের সাহসী করে তুললে, দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে জগতের কাছে দাবী জানাতে। দেশাত্মবোধের দৌলতে তাঁরা হয়ত অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠলেন। কিন্তু লাভ হলো অন্য দিকে। তাঁদের দৃষ্টি হল প্রসারিত। প্রত্যেকেই এক একটি যুগের রূপ উদ্ঘাটন করতে ব্যাপৃত হলেন। সমগ্রতা-বোধটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে স্খলনের ক্ষতিপূরণ করলে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বদেশী যুগের লেখক বলা চলে না, তাঁদের প্রতিষ্ঠা হল সেই যুগের পরেই। তাঁরা এক হিসেবে রাজা রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্লেষণ-বুদ্ধি নিতান্ত প্রখর, উপাদান সংগ্রহে তাঁদের আগ্রহ নিরতিশয়। কিন্তু দেশাত্মবোধ তখন সূর্য্যের খরতাপে জেগে উঠেছে। ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠার মোহ ও আলস্য থেকে তাঁরা সহজেই মুক্ত হতে পারলেন। তাই যদুনাথ রাখালদাসের ইতিহাসে আমরা সঙ্কলন-বিকলন-বুদ্ধির একত্র পরিচয় পাই। এঁরা দুজনেই নিজের নিজের পথ কেটেছেন, কিন্তু পথ কাটার কাজে গন্তব্য ভুলে যান নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ যদুনাথের শিষ্য। তাঁর সাধনার ইতিহাসে বাঙলা দেশের ইতিহাস লেখার পর্য্যায়গুলি ধরা পড়ে। প্রথমে তিনি 'বেগম সমরু' বাঙলায় লেখেন। বিষয়বস্তুর আকর্ষণী শক্তি ছিল বোধহয় পুস্তকখানির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তিনি কিন্তু শীঘ্রই যদুনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। বেগম-সমরুর দ্বিতীয় সংস্করণে যদুনাথের প্রভাব বেশ টের পাওয়া যায়। তারপরই অর্থাৎ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ সালে তিনি পুঁথিপত্র ঘেঁটে "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র দুই খণ্ড প্রকাশ করলেন। সঙ্কলন ও সম্পাদনের জন্য যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন সবগুলিই পুস্তকদ্বয়ের প্রতি ছাত্রে বর্ত্তমান। কিন্তু ব্রজেন বাবু তাইতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, তাই বোধ হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলেন, কারণ শেষ বইটাও প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। নাট্যশালার ইতিহাসে বেগম-সমরুর লেখককে আমরা পুনরাবিষ্কার করি। যে সমগ্র-দৃষ্টি ব্যতীত ঐতিহাসিকের কাজ অসম্পূর্ণ থাকে তাকে ফিরে পেয়ে অন্ততঃ একজন পাঠক উল্লসিত হয়েছিল। ব্রজেন বাবুর তৃতীয় বইখানিতে অর্থাৎ নাট্যশালার ইতিহাসে উপাদান সংগ্রহের আগ্রহ ও উপাদান পরীক্ষার শক্তির কোন কমতি ছিল না। যেটা বেশী ছিল তারই উল্লেখ করলাম। ১৩৪২ সালে সংবাদপত্রে সেকালের কথার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হোলো। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়কে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট বলা চলে, এবং

তাই বলা হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে ব্রজেনবাবু বিস্তর নতুন নথিপত্র খুঁজে পান। তারই জোরে সেই সময়কার, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিবিধ বিষয়ে নানা তথ্য আবিষ্কার ও নতুন সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হলেন। আমরা ঐ কালান্তরের একটা নক্সা পেলাম। এই তিন খণ্ডের জন্য প্রত্যেক বাঙালী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। পশ্চিমী শিক্ষা-বিস্তারের আদি কল্পনায় ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহনের তুলনা-মূলক দান, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বর্ণমালার প্রচলন সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক, বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র, সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রপাত, ভূমিকম্পের বর্ণনা, ভাষার অভিব্যক্তি এবং বেশভূষার পরিবর্তন সম্বন্ধে নানাপ্রকার জ্ঞানের এবং পুরাতন মিথ্যা সংস্কারকে দূর করবার নানা সুবিধা, তৃতীয় খণ্ডে বর্ত্তমান রয়েছে। বাঙলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনিই লিখবেন (কারণ ১৮৩০—৪০ সালে বাঙলাই ছিল বিদেশী সভ্যতার বীজ-ভূমি, বাঙলা থেকেই বীজ তুলে ভারতবর্ষের অন্যক্ষেত্রে রোপন করা হোতো), তাঁকেই এই তিন খণ্ড সমসাময়িক ইতিহাসের পৃষ্ঠা দেখতে হবে, তা তিনি যে বিষয়েই লিখুন না কেন। ইদানীংকার ভারতীয় কৃষ্টিধারার এমন Source-book ইংরেজী বা বাঙলা ভাষায় লেখা হয় নি।

কিন্তু এইখানেই আমার যা কিছু সামান্য আপত্তি। আপত্তি পেশ করতাম না, যদি না ব্রজেনবাবুকে ঐতিহাসিক বলে মেনে নিতাম, যদি তাঁর হাতেরই বেগম সমরু ও বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আমাদের লোভী করে না তুলত। যুগ-বোধ তাঁর আছে, যেমন তাঁর আছে অনুসন্ধিৎসা, বিচার-বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ক্ষমতা। তাঁর লেখার মধ্যে ইতিহাস লেখার দুটি পদ্ধতিরই পরিচয় মেলে, যেমন মেলে তাঁর আচার্য্য যদুনাথের লেখায়। অতএব আমার বক্তব্য এই, তিন খণ্ডেও তাঁর মহৎ কাজটি শেষ হয়নি—চার খণ্ডে, পাঁচ খণ্ডেও হবে না, যতক্ষণ তিনি নিজেই নিজের সংগৃহীত উপাদানের সমন্বয় না করেন। আমি জানি, অঙ্কে পারবে না, কারুর খাটবার ক্ষমতা নেই, কারুর অমন শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই। নক্সা চাই, কিন্তু ছবিও চাই। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেশী। স্কলারশিপের দোহাইএ আজকালকার ঐতিহাসিকরুন্দ হয়ে পড়ছেন বুদ্ধি-জগতের haberdasher, chapman দো দো আনা আজব চীজের ব্যাপারী। তাঁরা যত পারেন ব্যবসা চালান এবং ধনবান হোন, কিন্তু আমাদের দেশে এখন চাই এমন এক দৃষ্টিশক্তি যেটি কোন যুগের উপর পড়লেই সে যুগ জীবন্ত হয়ে উঠবে, বিশেষ বিলম্বিত হবে সামান্তের গলায়।

ঐতিহাসিক ব্রজেন বাবুর সম্বন্ধেই এত কথা লিখলাম। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলবার আমার অধিকার নেই। উপাদানের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মতামত ও নতুন তথ্যের স্থান দেওয়া ব্যতীত বোধ হয় Source-bookএর অঙ্গ সমালোচনাই হয় না, কেবল তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। আমি তাঁর শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করি, তাঁর সাজাবার ভঙ্গীকে তারিফ করি, এবং আমি নতুন পুঁথিপত্রের খবর দিতে অক্ষম। নিবেদনে যে কয়টি সিদ্ধান্ত তিনি লিখেছেন সেগুলির পিছনে যে যুক্তি আছে তা অগ্রাহ্য করা চলে না, কারণ সে যুক্তি হোলো ঘটনার তারিখ অবলম্বনে। এ যুক্তি

কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রসূত নয়, তাকে গ্রহণ করলে কারুর উপর অশ্রদ্ধাও আসেনা, কেবল বলা চলে গ্রহণ করলে অজ্ঞানতিমিরে ডুবে থাকার আনন্দের মাত্রা একটু কমে যায়। আর একটি কথা বইগুলির স্বত্ব সাহিত্যপরিষদকে ব্রজেন বাবু দিয়েছেন। অতএব কিনে পড়লে সাহিত্যপরিষদের উপকার করা হবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Fascism, Doctrine and Institutions,—By Mussolini, ("Aridita" Publisher—Rome)

Fascism and the Social Revolution—By R. P. Dutt, (International Publisher, New York)

রোম থেকে যে বইটি বেরিয়েছে তাতে আছে মুসোলিনির তিনটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা, আর আছে ফাশিষ্ট ইটালীয় রাষ্ট্রের একরাশ আইন কানুন। মুসোলিনির একটি বক্তৃতার বিষয়, "ফাশিজ্‌মের সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব (doctrine)"। বইটির মলাটের উপরেই Doctrine কথাটি জাজ্বল্যমান এবং তার পরেই লেখা লেখা আছে Institutions অর্থাৎ Doctrine নামক নিরাকার বস্তুটির বহিরঙ্গ প্রকাশ, মোটা বুদ্ধিতে যাকে আমরা ফাশিষ্ট ইটালির Constitution বলতে পারি।

সে যাই হোক ফাশিজ্‌মের Doctrineটা কি? ফাশিজ্‌মের Doctrine? কথাটা শুনলেই মনে কি রকম ধোঁকা লাগে। ফাশিজ্‌ম্‌ যে একটা বেশ জবরদস্ত রকমের "কেজো" জিনিস এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু একটা জিনিস "কেজো" হলেই যে তার একটা Doctrine থাকতে হবে এমন কি মানে আছে? একদা রাগের মাথায় বিদ্ধ গায়ের জোরে মুসোলিনি একটা কাজ করে বসলেন। করেই তাঁর ভাবনা হ'ল, তাইত, এখন জগতের লোককে বলা যায় কি? প্রায় দু' বৎসর রাজনৈতিক গুণ্ডামি চালানোর পর ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে National Assemblyর অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুসোলিনি লিখলেন—

Italian Fascism now requires, under pain of death, or worse, of suicide, to provide itself with a body of doctrines. * * * The expression is rather a strong one, but I would desire that in these two months between now and the National Congress the philosophy of Fascism must be created (Mussolini, Letter to Bianchi).

কি রকম জোর তাগিদ দেখুন একবার! মাত্র দুটি মাসের ভিতরে একেবারে আনকোরা নতুন একটা "philosophy" তৈরী করতে হবে। এ যেন ভাদুমতীর ঝুড়ি অথবা Whiteaway Laidlawর দোকান। যা ফরমায়েস কর, সঙ্গে সঙ্গে তাই বেরুবে। তা না হ'লে ফাশিজ্‌মের প্রাণসংশয়! হিট্‌লারও ঠিক এই কারণেই বলেছিলেন, Marxismকে শুধু গায়ের জোরে কাৎ করা চলবে না। একটা world theoryকে আর একটা world theory দিয়ে লড়তে হবে। এ বিষয়ে আর. পি. দত্ত বড় সুন্দর কথা বলেছেন: "It is obvious that no

world theory comes into existence in this fashion, but only a substitute for a world theory."

দত্ত মহাশয়ের মতে ফাশিজ্‌ম্ আসলে হচ্ছে ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান অন্তর্বিরোধকে গায়ের জোরে বন্ধ করার প্রচেষ্টা। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছে। যৌবনকালে ক্যাপিটালিজ্‌ম্ উৎপাদনের ও মননের ক্ষেত্রে প্রসারকেই নিরন্তর চেয়েছিল। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ছিল তার আনন্দের বিষয়। দৃষ্টি তার প্রতিনিয়ত থাক্‌ত যন্ত্রের অনন্ত উৎকর্ষের দিকে, কায়িক শ্রমকে লঘুতর করে উৎপাদনকে বাড়ানোর দিকে। বিখ্যাত সংখ্যা-বৈজ্ঞানিক Sir George Knibbs পৃথিবীর উৎপাদন শক্তির পরিমাণ হিসাব করে বলেছিলেন পৃথিবীর বর্ত্তমান জনসংখ্যার চারগুণ মানুষের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে হতে পারে। যতদিন ক্যাপিটালিজ্‌মের অন্তর্বিরোধ ঘন হয়ে ওঠেনি, ততদিন উৎপাদন-শক্তি বাড়ানোর ফলে রীতিমত লাভ হয়েছে। এই লাভের কিছু বখরা দিয়ে, "সমাজ সংস্কার" করে শ্রমিককে তুষ্ট রাখা গিছল। ফিউডালিজমের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিকের সহায়তা পাওয়ার জন্যে যে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয় তাকে লাভের দিনে লাভের অংশ দিয়ে বহুকাল জীইয়ে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু উৎপাদন শক্তি যখন এমন বেড়ে উঠ্‌ল যে মানুষের বদলে যন্ত্র ব্যবহার করলে বেকারের সংখ্যাই বাড়ে, মাল কেনবার খরিদ্দার পাওয়া যায় না, তখন লাভের পিছুটানে ক্যাপিটালিজ্‌মের রথচক্র হ'ল অচল, ঘর সামলানোর দুঃসহ দায়ে জয়যাত্রার ঘট্‌ল সমাপন। ইতিমধ্যে পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে ঔপনিবেশিক শোষণের পালায় অভিনেতৃবর্গের পরস্পরের ভূমিকা নিঃশেষে নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই সময় থেকে আরম্ভ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব লীলা, ভাগাভাগির পরিবর্ত্তে কাড়াকাড়ি, মারামারি; যার ভাগে কাটা সৈনিকের ভূমিকা পড়েছে তার সেনাপতি হওয়ার দাবী, যে বা সেজেছে বিদূষক তার হঠাৎ দুয়ন্ত বা আলমগীর হওয়ার প্রচেষ্টা। শ্রীবৃদ্ধির দিনে যে প্রতিযোগিতা সকলকেই শ্রীযুক্ত করত শ্রীহীনতার দিনে দেখা গেল তাতে সকলেরই সর্ব্বনাশ। কাজেই প্রতিযোগিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হ'ল একাধিপত্য (monopoly)। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ এখন ঘরে ফাইনান্স-ক্যাপিটালের মুষ্টিমেয় মালিকের একাধিপত্য, বাইরে নূতনতর সাম্রাজ্যবাদ যার এক মাত্র লক্ষ্য যুদ্ধ। মহাযুদ্ধের আগে থেকে ক্যাপিটালিজ্‌মের এই যুগ আরম্ভ হয়েছে। এই যুগের গোড়া থেকেই ক্যাপিটালিজ্‌মের ভাঙনের দশা, জরার লক্ষণ তাতে সুস্পষ্ট, ধ্বংসের বীজ তার আনাচে কানাচে অঙ্কুরিত। উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি নূতন আবিষ্কারে ভীত হওয়া আরম্ভ হয়েছে সেই সময় থেকেই। ধ্বংসপথ-যাত্রী অতি আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌মের যে সব লক্ষণ অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে ফাশিজ্‌মে তারই পূর্ণ প্রকাশ। আর. পি. দত্তের কথায়—

"Fascism, in fact, is no peculiar, independent doctrine and system arising in opposition to existing Capitalist socity, Fascism, on the contrary, is the most complete and consistent working out, in certain conditions of extreme decay, of the most typical tendencies and policies of modern capitalism".

অর্থাৎ ক্যাপিটালিষ্ট গণতন্ত্রের সহিত ফাসিজ্‌মের চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই। গণতন্ত্রের মুখোস বজায় রেখেও আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌ম্ বহুদিন থেকেই অগণতান্ত্রিক হ'তে আরম্ভ করেছে। আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌মের নীতিসমূহের মধ্যেই ফাশিজ্‌মের পূর্ব প্রকাশের বীজ সুস্পষ্টভাবে নিহিত। রুজভেল্ট ও ব্রুনিং গভর্ণমেণ্টকে ফাশিষ্ট-কল্প বা কাঁচা ফাসিষ্ট বলা যেতে পারে। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ গণতন্ত্রের ঠাট সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে ফাশিষ্ট রূপ গ্রহণ করবে কিনা, সেটা নির্ভর করে স্থানকালাপাত্রের উপর। তাতে করে' কোন সামাজিক বিপ্লব সূচিত হয় না। ফাশিজ্‌মের বিশেষত্ব বলে' যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে বুর্জ্জোয়া শাসন বজায় রাখার জন্য অভিনব উপায় প্রয়োগে, নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রের উদ্ভাবনে। নূতন উপায়ের স্বরূপটি হচ্ছে জাতীয় ঐক্যের নামে গুণ্ডামি ও ধাপ্পা-বাজী করে' দল পাকিয়ে স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনকে নষ্ট করা এবং আইন প্রণয়ন করে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধকে 'উড়িয়ে' দিয়ে সহযোগিতার ও পিরীতের সঞ্চার করা। উৎপাদন শক্তির সঙ্গে ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের ব্যবস্থা যতই বেখাপ হয়ে ওঠে ততই লাভ বজায় রাখার জন্যে ক্যাপি-টালিজ্‌মের আবশ্যক হয় উৎপাদন-সঙ্কোচ। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে তার স্থানে Monopolyর প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর Monopolyর কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছায় বোঝাপড়া (voluntary agreement) করে যদি কাজ হাসিল করতে পারেন, ত রইল গণতন্ত্র, রইল পার্লমেণ্ট। এতে যদি কাজ হাঁসিল না হয় তবে পার্লমেণ্ট তুলে দেওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না। তখন আবির্ভূত হয় ফাশিষ্ট রাষ্ট্র। প্রভেদ লক্ষ্যে নয়, উপায়ে। ফাশিজ্‌মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব থেকেই আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌ম্ সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্যে পরিণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে তার অনিবার্য্য গতি প্রমাণিত হয়েছে। ফাশিজ্‌মের অধীনে শিল্পে ফাইনান্স-ক্যাপিটালিষ্টদের একাধিপত্য রাষ্ট্রের একাধিপত্যের রূপ নিয়ে জাতে উঠেছে ও অধিকতর কার্য্যকরী হয়েছে মাত্র। প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক রাজ-নৈতিক ঐক্যকে উগ্রতর ও ঘনিষ্ঠতর করা হ'চ্ছে—যথা, অটোয়া চুক্তি—এবং পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরের জন্য ঘটা করে আয়োজন চলছে।

অনেকে মনে করেন ফাশিজ্‌ম্ একটা মধ্য শ্রেণীর বিপ্লব। ফাশিষ্ট আন্দোলন একটা প্রতিক্রিয়াশীল গণ-আন্দোলন। শ্রেণী-চেতনাহীন বস্তির শ্রমিক এর মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু এর বেশীর ভাগ লোক, বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় লোক, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। লোক ক্ষ্যাপানোর জন্যে ফাশিজ্‌মের কর্ত্তারা ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে থাকেন এবং তাঁদের প্রোগ্রামের ভিতরেও অনেক তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট উপাদান বা ভাব থাকে। এই ধরণের প্রোগ্রাম লোকের চোখে ধ'রে এবং পেটি বুর্জ্জোয়া বেকার যুবক, ঋণপ্রপীড়িত চাষী ও গুণ্ডা শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে ফাশিজ্‌ম্ যখন ক্ষমতা পায়, তখন এটা মনে করা আভাবিক ফাশিজ্‌ম্ বুঝি বা ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ও সোশ্যালিজ্‌ম্ উভয়কেই অতিক্রম করে' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভিত্তিতে একটা নতুন কোন অর্থনৈতিক "ইজ্‌ম্"। এটা খুবই ভুল কথা।

ফাইনান্স-ক্যাপিটালের কর্ত্তারাই টাকা দিয়ে ফাশিষ্ট আন্দোলন চালিয়ে থাকেন এবং তাঁরা জানেন যতদিন উৎপাদন যন্ত্রের অধিকার তাঁদের হাতেই থাকবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইন অটুট থাকবে ততদিন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতার মালিক আসলে তাঁরাই থাকবেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী নূতন কোন রকমের রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারবে না। জার্ম্মানিতে ও ইটালিতে ফাশিষ্ট আন্দোলন সফল হওয়ার পর ফাইনান্স-ক্যাপিটালের কর্ত্তারাই রাষ্ট্রের প্রভু হয়েছেন, গরম গরম "সোশ্যালিষ্ট" বুলির কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। আর. পি. দত্তের ভাষায় :—

"Fascism, in short, is a movement of mixed elements, dominantly petit bourgeois, but also slum-prolatarian and demoralised working class, financed and divided by finance capital, by the big industrialists, landlords and financiers, to defeat the working class revolution and smash the working class organisations.

ঘূর্ণায়মান শ্রমিক বিপ্লবের যুগে ফাইনান্স-ক্যাপিটাল বিশুদ্ধ সামরিক শক্তির সাহায্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করে। সেইজন্য সে এমন একটা আন্দোলন চালাতে চায় যার কিছু গণ-ভিত্তি আছে। এই রকম দুটি আন্দোলন যুদ্ধের সময় থেকে ফাইনান্স-ক্যাপিটাল চালিয়ে এসেছে। একটির নাম সোশ্যাল ডিমোক্রেসী এবং তারই অর্দ্ধাঙ্গ কর্ত্তাভজা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং অন্যটির নাম ফাশিজ্‌ম্‌। অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্রেসী—সোশ্যাল ফ্যাশিজ্‌ম্‌। এই মতবাদের স্বপক্ষে দত্ত মহাশয় ন্যাৎসি আন্দোলনের গোড়ার দিকে লিখিত জর্ম্মান ফাইনান্স-ক্যাপিটালের যে সব গোপনীয় চিঠি উদ্ধৃত করেছেন তা অমূল্য। শ্রেণী সংগ্রামে সোশ্যাল ডিমোক্রেসীর ভূমিকা সম্বন্ধে ফাইনান্স-ক্যাপিটালের ও কমিউনিজ্‌মের নির্ণয়ের আশ্চর্য্য মিল দেখে বাস্তবিকই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এমন ধারা একটি গোপনীয় চিঠি থেকে খানিকটা পাঠকদের অবগতির জন্যে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি :

"The problem of consolidating the bourgeois regime in post-war Germany is generally determined by the fact that the leading bourgeoisie, who have control of the national economy, have become too small in order to uphold this rule alone. They require for this rule, if they do not wish to rely on the extremely dangerous weapon of purely military force, an alliance with strata which do not belong to them socially, but which render them the indispensable service of anchoring their rule in the people, and thereby being the actual and final bearers of this rule. This last or "outermost bearer" of bourgeois rule was, in the first period of post-war consolidation, Social Democracy.....

...As the old sluice mechanism by which the privileged and organised working class was "chained fast to the bourgeois state" through Social Democracy and trade union bureaucracy thus creating a split in the ranks of the working class and obviating the dangers of communism, can no longer be sufficiently restored, (owing to the general crisis of capitalism), the only possible means of saving bourgeois rule from this abyss is to effect the splitting of the working class and its tying to the state apparatus by other and more direct means. Herein lie the positive possibilities and the tasks of National Socialism.

অর্থাৎ শ্রমিকদের বিভক্ত করে তাদেরই একদলের সাহায্যে বুর্জ্জোয়া শাসন বজায় রাখার জন্য ফাইনান্স-ক্যাপিট্যালের হাতে দুটি অস্ত্র আছে। যখন কিছু কিছু সুবিধা দান করে "বড়লোক" শ্রমিকদের হাত করে' কমিউনিজ্‌মকে ঠেকান যায় তখন সোশ্যাল ডিমোক্রেসী নামক প্রথম অস্ত্রই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু যখন ক্যাপিটালিজ্‌মের চির সঙ্কট, শ্রমিকদের সুবিধা দেওয়া দূরে থাক্ তাদের মাহিনা কাটলে নিজের লাভ বজায় থাকে না তখন সোশ্যাল ডিমোক্রেসীকে সরিয়ে তার জায়গায় ফাশিজ্‌ম্‌ নামক অস্ত্র প্রয়োগ করা দরকার; কেননা জাতীয় মত্ততার মদ খাইয়ে, গরম গরম বক্তৃতা ঝেড়ে, সকল রকমে গণসাধারণের মনে ধাঁধা লাগিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মারের চোটে বুর্জ্জোয়া শাসন বজায় রাখতে হবে।

এই হচ্ছে ফাশিজ্‌ম্‌—প্রথম অবস্থায় একটা "reactionary mass movement" এবং পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাওয়ার পর একটা "terrorist dictatorship of big capital"। সামাজিক জরাকে, মৃত্যুকে, প্রতিক্রিয়াকে, সঙ্কোচকে চিরস্থায়ী করার পন্থাকে যদি একটা "ism" বলতে হয় তবে তা হচ্ছে ফাশিজ্‌ম্‌—আর. পি. দত্তের কথায় "organisation of social decay"।

মুসোলিনির নামে যে বইটি বেরিয়েছে তার পাতায় পাতায় দত্ত মহাশয়ের বিশ্লেষণের জলন্ত প্রমাণ। মুসোলিনির মুখে খালি বড় বড় গালভরা কথার ছড়াছড়ি, "duty," "heroism," "greatness of the nation," "the conception of the State as an absolute," "the will to exercise power and to command," "spiritual and ethical imperial power," "spirit of self sacrifice," "faith," "justice," "acquired facts of history," "the will to live," ইত্যাদি ইত্যাদি। থেকে থেকে যুদ্ধের হুঙ্কার—"War alone brings up to its highest tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the peoples who have the courage to meet it"। উৎপাদন সঙ্কোচের দরুণ যাদের ভাল করে' মাহিনা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, যাদের শুকিয়ে মরতে হবে, তাদের শিক্ষা দেওয়া, "well-being—happiness"—এই মারাত্মক ফরমুলায় খবরদার বাপু ভুলোনা। খালি দেশের "ethical and spiritual" উন্নতির জন্য অল্প খেয়ে পরে, কষ্টসহিষ্ণুতা রোজ অভ্যাস কর, তা হলেই তোমরা "heroes and martyrs" হবে। এই হল ফাশিজ্‌ম্‌—একেবারে ষোল আনা আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, যার অন্য নাম ষোল আনা ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌। কিন্তু আসল জায়গায় মুসোলিনি ঠিক আছেন—"Guild or comparative economy respects the principle of private property. Private property completes human personality"। যতক্ষণ এই বিশ্বাসটা ঠিক থাকবে ততদিন ফাইনান্স-ক্যাপিটাল টাকা দিয়ে একে সাহায্য করবে না কেন?

মোটের উপর ফাশিজ্‌ম্‌ বড় মজার জিনিস এবং যাঁরা চোখ খুলে বই দুটি পাশাপাশি রেখে পড়বেন তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলেও হতে পারে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

লীলায়িতা, প্রাক্তনী—শ্রীসুশীলকুমার দে প্রণীত। (শ্রীগুরুদাস লাইব্রেরি)।

প্রেম ও বিরহ—শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। (বেঙ্গল পাবলিশিং হোম)।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে'র মতন সুস্রাব্য, সুখপাঠ্য, স্বচ্ছন্দ, কবিতা উত্তর-রবীন্দ্র যুগের কম কবিই লিখিতে পারেন। কোথাও ছন্দ পতন নাই, অর্থের জটিলতা প্রকাশভঙ্গীকে কোথায়ও আড়ষ্ট করে নাই, সাবলীল গতিতে পংক্তির পর পংক্তি ছত্র হইতে ছত্রে স্ফীত হইয়াছে, কবির নিপুণ লেখনী সকল বাধাবিঘ্নকে অতি সহজে অতিক্রম করিয়াছে। মনে হয় যেন কবি স্বয়ং ভুলিয়া গিয়াছেন তিনি কবিতা লিখিতেছেন—এবং কি লিখিতেছেন, এত সহজ তাঁহার লিখনভঙ্গী। কিন্তু এই লিখনভঙ্গী অতি সহজ হইলেও সহজাত নহে, ইহা যে প্রকৃত আয়াসের এবং পাণ্ডিত্যের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু অধ্যবসায়ের ফলে যে মহাশয় যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা এতই প্রচুর যে নিতান্ত সুলভ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন মধুর ভাষার ও নির্ঘৃৎ ছন্দের মৃদুবাহী স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছি, কখন যে একটি কবিতা শেষ হইয়া আর একটি কবিতা আরম্ভ হইল তাহা পর্য্যন্ত নজরে পড়ে না, শুধু যখন বই শেষ হয় তখন চমক ভাঙ্গে, মনে হয় কিছু একটা পড়িতেছিলাম—বা শুনিতেছিলাম।

বিশেষ করিয়া 'প্রাক্তনী' বই'র কবিতা সম্বন্ধই এই কথাগুলি প্রযোজ্য। 'লীলায়িতা' বইটির কবিতাগুলি সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ। চার লাইন আট লাইনের এই কবিতাগুলি আকারে যেরূপ ক্ষুদ্র ভাবেও প্রায় সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর হইলেও কবিতাগুলি বৈদগ্ধ্যবর্জ্জিত নহে, রসের প্রাচুর্য্যে তাহারা ভরপুর, এবং এই রস অধিকাংশ স্থলেই আদিরস, সুতরাং বিশেষ উপভোগ্য। সুশীলকুমারের বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য ও ছন্দনৈপুণ্য এই অনুবাদে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'লীলায়িতার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য অলঙ্কৃত হইল। নিতান্ত তুচ্ছ এই অলঙ্কার কিন্তু অত্যন্ত মধুর তাহার রচনা।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'প্রেম ও বিরহ' বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত কবিতা-পুস্তক। দোষ বা গুণ এমন কিছুই এই বইটির নাই যাহার উপর মন্তব্য করা চলে।

শ্রীস্বর্ণনন্দন শর্ম্মা

শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৪এ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

পরিচয়

বার্ষিক ৪।০ প্রতি সংখ্যা ১৲

পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ, ১৩৪২

বিষয়-সূচী

রাসলীলা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
আফ্রিকায় শ্বেত-কৃষ্ণ	শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
পুরানো কথা	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মুদ্রায় শিব-মূর্ত্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দাসগুপ্ত
ডিক্‌টেটরশিপ	শ্রীলীলাময় রায়
রূপকথা	অনুবাদ
কবিতাগুচ্ছ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
	শ্রীবিষ্ণু দে
	শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকী

পুস্তক পরিচয়

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশোভন সরকার, শ্রীশিবনাথ অধিকারী, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, ৺নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদি।

সম্পাদক :

ভারতী ভবন

কলিকাতা

৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ ১৩৪২

পরিচয়

রাসলীলা

(১)

রাস কি ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—রসো বৈ সঃ—রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—আনন্দ-কারণং রসবৎ ব্রহ্ম * * ব্রহ্মৈব রসঃ, রসত্ব-প্রসিদ্ধি ব্রহ্মণঃ অর্থাৎ আনন্দঘন ভগবান্ রসস্বরূপ।

রস কি ?

রসঃ সারোঽমৃতং ব্রহ্ম আনন্দো হ্লাদ উচ্যতে।
নিঃসারং তেন সারেণ সারবৎ লক্ষ্যতে জগৎ॥

—সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত দীপিকা

অর্থাৎ 'রস' শব্দের নানার্থ—সার, অমৃত, ব্রহ্ম, আনন্দ, হ্লাদ—কিন্তু (সুরেশ্বরের মতে) 'রসো বৈ সঃ' এস্থলে রসশব্দে সার বা নির্য্যাসই বুঝিতে হয়। শঙ্করানন্দ ইহার অনুমোদন করেন না—তিনি বলেন 'রসঃ আনন্দদ্রবঃ স্বয়ং প্রকাশমানানন্দ ইত্যর্থঃ'। এই অর্থই সঙ্গততর মনে হয় এবং ইহাই সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের অনুমোদিত। তাঁহারা বলেন, চিত্তের সত্ত্বোদ্রেকে রজঃ ও তমঃ তিরস্কৃত হইলে, এক যে অপূর্ব্ব,

লোকোত্তর, চমৎকার, অখণ্ড আনন্দচিন্ময় ভাব উদিত হয়—যাহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর', যাহা সহৃদয় বোদ্ধার অনুভবৈদ্য—তাহাই 'রস'।

সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥
লোকোত্তর চমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদ্অভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যাম্ অস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥ —সাহিত্যদর্পণ ৩।৩৪

এই 'রস' হইতেই 'রাস'। রাস কি?

প্রেমরস-পরিপাক-বিলাস-বিশেষাত্মকঃ ক্রীড়াবিশেষঃ অথবা পরমরসকদম্বময়ো ব্যাপার-বিশেষঃ (সনাতন গোস্বামী)। ভাগবতের প্রাচীন টীকাকার বিজয়ধ্বজ রাস শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন :—

নৃত্যাদিষু ভরতরীতিসংজ্ঞেষু গাতুমুপক্রান্তেষু যোঽধিরসোল্লাসো জায়তে স রসঃ, তৎসম্বন্ধী রসো রাসঃ তদুদ্রেকেণ ক্রীড়া নৃত্যবিশেষঃ।

এ সম্পর্কে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তি এই :—

নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তময়ী যা ক্রীড়া সা রাসক্রীড়া।

অর্থাৎ রাস সেই ক্রীড়া—যাহাতে রস পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, যেখানে মাধুর্য্যের চরম (acme)। এক কথায়, অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি, রসরাজ, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রস-ব্রহ্ম আস্বাদের জন্য ব্রজগোপী—বিশেষতঃ রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত যে চিদানন্দময়ী ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাই রাস। ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অনেকানেক মনোহর লীলা করিয়াছিলেন বটে—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥—ভাগবত, ১০।৩৩।৩৬

কিন্তু (বৈষ্ণবমতে) এই রাসলীলাই সর্ব্বলীলার চরম—

সন্তি যদ্যপি মে ব্রাহ্ম্যা লীলা স্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

সেই জন্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—এই রাসলীলা 'সর্ব্ব লীলা-সম্পৎ-শিরোমণি', 'সর্ব্বলীলোৎসব-মুকুটমণি'; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সার্থক নাম—'রাসরসতাণ্ডবী'।

বৃন্দাবনে এই রাসের ব্যাপার কিরূপ অভিনীত হইয়াছিল, লীলা-শুক বিল্বমঙ্গল একটিমাত্র শ্লোকে তাহা বিবৃত করিয়াছেন :—

অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরা মাধবঃ,
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থম্ আকল্পিত মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ।

ইহার মূল ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ —১০।৩৩।৩

ইহার অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

যত গোপসুন্দরী কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনা জল নির্ম্মল অঙ্গ করে ঝলমল
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥
* *
যত হেমাব্জ জলে ভাসে তত নীলাব্জ তার পাশে
আসি আসি করয়ে মিলন॥
—অন্ত্যলীলা, ১৮ অধ্যায়

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ১০।৩৩।২০

'রাসমণ্ডলে যতজন গোপী নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীভগবান্ নিজকে তত সংখ্যক করিয়া, সেই ললনাদিগের প্রত্যেকের সহিত বিহার করিলেন।'

রাস পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত রাসক্রীড়াই সবিশেষ বিখ্যাত—অতএব আমরা প্রথমে সেই বিবরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। কৌতূহলী পাঠক ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের ২৯ হইতে ৩৩ অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়ের আরম্ভ এইরূপ :—

ভগবানপি তা রাত্রীঃশারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

শরৎকালের রাত্রি যখন উৎফুল্ল মল্লিকাগন্ধে আমোদিত হইয়া পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রিরংসু (রন্তুমিচ্ছুঃ) হইলেন এবং সেজন্য 'যোগমায়া' আশ্রয় করিলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে বৃন্দাবন তাহার কৌমুদীতে স্নাত হইয়া "অতি রমিত" হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বেণু সহকারে মধুর গান করিলেন

—জগৌ কলং বামদৃশাংমনোহরম্।

সেই 'অনঙ্গবর্দ্ধন' সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ব্রজবধূরা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনোদ্দেশে ধাবিত হইল—আজন্মুঃ অন্যোন্যম্ অলক্ষিতোদ্যমাঃ। পতিপিতা প্রভৃতি গুরুজন তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাপহৃতচিত্তা গোপীগণ কোন মানাই মানিল না—

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ১০।২৯।৭

কারণ 'ডেকেছেন প্রাণনাথ—কে থাকিবে ঘরে?'

একলা ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ
দূর বিজনে ডাকছে আমায় শ্যামের বাঁশী গান।

গোপীদিগকে সমাগত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ঐকান্তিকতা পরীক্ষার জন্য লৌকিক হিতোপদেশ শুনাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

রজনোষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১০।২৯।১৯

'গোপীগণ! গোষ্ঠে ফিরিয়া যাও—পতিপুত্রের সেবা শুশ্রূষা করগে। দেখ, কুলাঙ্গনার পক্ষে ঔপপত্য অতি দোষাবহ।

তদ্ যাত মাচিরং ঘোষং, শুশ্রূষধ্বংপতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
অগুল্পিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥ ১০।২৯।২১,২৪

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে চান, গোপীদিগের ভক্তি 'বিধ্যনুগা' না 'রাগানুগা'। গোপীরা বলিলেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার জন্য আমরা সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াছি—আমাদের এরূপ নৃশংস বলিও না—মৈবং বিভো! অর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্। হে পুরুষ-ভূষণ! তোমার সুন্দর মুখশ্রী দর্শনে আমরা তীব্র কামতপ্ত হইয়াছি—আমাদের তোমার দাসী কর—

ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ! দেহি দাস্যং॥ ১০।২৯।৩৫
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১০।২৯।৪২

কারণ, ভয়হারী তোমার ভুজদণ্ড ও সমস্ত শোভার আধার তোমার বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া আমরা আপনা হইতেই তোমার দাসী হইয়াছি।'

গোপীদিগের এই কাতরোক্তি শুনিয়া যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি সদয় হাস্য করতঃ গোপীদিগের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন—

প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ। ১০।২৯।৪২

বৈজয়ন্তী-মালাধারী শ্রীকৃষ্ণ বনিতামণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া গোপীগণের সহিত স্বয়ং গান করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন—

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং॥

শুধু তাই নহে—শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, হস্তগ্রহণ, অলকা-উত্তোলন, নীবি ও বক্ষঃস্পর্শন, নখাঘাত, অপাঙ্গদৃষ্টি এবং হাস্য ও পরিহাস দ্বারা গোপীদিগের কামভাব উদ্দীপন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভনর্ম্ম নখাগ্রপাতৈঃ
ক্ষ্ব্যাবলোকহসিতৈঃ ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ১০।২৯।৪৬

শ্রীকৃষ্ণের আচরণে গোপাঙ্গনারা আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে

সবিশেষ সম্মানিতা মনে করিল—তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের গর্ব্ব নিবারণের জন্য অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০।২৯।৪৮

কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীরা একান্ত ব্যথিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং দলে দলে মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা গান করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা, বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।

তাহারা বৃন্দাবনের পশুপক্ষী তরুলতা সকলের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে লাগিল—

শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ

এবং নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তা হইল—

ইত্যন্যস্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ কাতরাঃ।
লীলা ভগবত স্তা স্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১০।৩০।১৪

এইরূপে সেই বনোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে তাহারা তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল—ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিল সেই চরণ-চিহ্নের সহিত এক রমণীর পদচিহ্ন মিলিয়াছে।

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা?

তাহারা বলিল, এই রমণী নিশ্চয়ই শ্রীহরির বিশিষ্ট আরাধনা করিয়াছিল, নহিলে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইহার সহিত নির্জ্জনে গেলেন কেন?

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১০।৩০।২৮

সেই রমণীর সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া গোপীরা ঈর্ষান্বিতা হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, ঐ কামিনী আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া একাকী কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছে।

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥ ২৬

এদিকে যে গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিবিড় বনে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তিনি নিজের সৌভাগ্যে মদগর্ব্বিতা হইয়া আপনাকে সর্ব্বোত্তমা মনে করিলেন—

যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে।
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্ ॥

এবং দর্পভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আর আমি চলিতে পারিনা আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বেশ আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। সেই রমণী যেমন কৃষ্ণস্কন্ধে আরূঢ়া হইতে গেলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥—৩৭।৩৮

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন যে এই রমণীই রাধা—যাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং যিনি গর্ব্বভরে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই—কিন্তু এই দৃপ্তা মদগর্ব্বিতা সৌভাগ্যমূঢ়া গোপী যে শ্রীরাধা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এ ঘটনা দ্বারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কোন ভাবই প্রকাশিত হয় না, বরং শুকদেব ভাগবতে যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ কামীর দৈন্য ও কামিনীর দৌরাত্ম্যই প্রকটিত হয়।

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্—১০।৩০।৩৪

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ব্যথিতা ও অনুতপ্তা হইয়া সেই গোপবধূ বিলাপ করিতে লাগিল—

হা নাথ রমণশ্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৩৯

কৃষ্ণান্বেষিণী অন্যান্য গোপিকারা ইতিমধ্যে সেই বিরহ-বিধুরা,

শোকার্ত্তা গোপীকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার মুখে তদীয় আচরণের কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইল—

অবমানঞ্চ, দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ। ৪১

তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার মধুর আলাপ ও লীলার ধ্যানে তদ্‌গত হইয়া দেহ গেহ সমস্তই বিস্মৃতা হইল এবং যমুনা-পুলিনে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতে লাগিল—

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ৪৩, ৪৪

এ স্তুতিগানই প্রসিদ্ধ গোপীগীত—ইহার অপূর্ব্ব কবিত্ব ও মাধুর্য্য আস্বাদনের বস্তু। গোপীগীতের আরম্ভ এই ;—জয়তিতেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ। ইহার আদ্যোপান্ত কামের কমনীয় উচ্ছ্বাসে মুখরিত—

স্মরতনাথ তেঽঙ্ঘ্রিদাসিকাঃ—১০।৩১।২
অধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ—ঐ, ৮
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং—১০।৩১।১৪
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি—ঐ, ১৬

এইরূপে কৃষ্ণদর্শন-লালসায় গোপীরা যখন বিবিধ বিচিত্র বিলাপ করিতেছিলেন, তখন পীতাম্বর বনমালী সাক্ষাৎ-মন্মথমন্মথ হাসিতে হাসিতে সেই গোপীমণ্ডলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ১০।৩২।১,২

এই যে রাসমণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব ও পুনরাবির্ভাব—ইহার একটি গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা ইহাকে 'Ludus Amoris'(Game of Love) বলেন—

The 'game of love' in which God plays, as it were, 'hide and seek' with the questing soul'—

তিনি তাহার নিকট Flying Perfect. (Emerson)

যতদিন ভক্ত ভগবানের সহিত সঙ্গত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ না করে, ততদিন তিনি এই লুকাচুরির খেলা খেলেন—

In our terms, it is the imperfectly developed spiritual perception, which becomes tired and fails.—Underhill

আমরা দেখিয়াছি, রাসের আরম্ভে গোপীদিগের দম্ভদর্প মানমক্ষ বেশ প্রবল ছিল—সেইজন্য তিনি 'প্রশমায় প্রসাদায়' অন্তর্দ্ধান করিলেন। তারপর গোপীরা যখন বিলাপ অনুতাপে বিদগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ—তাসাম্ আবিরভূৎ শৌরিঃ।

Thou wast but hidden from me and not lost.—Madam Guyon With the souls who have arrived at perfection, I play no more the 'game of love' which consists in leaving and returning again to the Soul,—St. Catherine of Siena.

শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া গোপীদিগের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা নির্নিমেষে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিলেন এবং বিবিধ কাম-প্রচেষ্টা দ্বারা স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥১০।৩২।৯

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কামিনীদিগের সঙ্গে যমুনা-পুলিনে প্রবেশ করিলেন—যথায় বিকশিত কুসুম-গন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ গন্ধবহ প্রবাহিত হইতেছিল এবং ভ্রমর ভ্রমরী মধুগন্ধে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঝঙ্কার করিতেছিল।

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যাঃ নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদম্॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন মূর্ত্তিতে সেই গোপীমণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিলেন—

চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ॥

অনন্তর গোপীগণ হাস্য, বিলাপ, প্রেমবীক্ষণ, ভ্রূকুঞ্চনাদির দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার হস্ত ও পদ স্ব স্ব উরুদেশে গ্রহণ করতঃ সংমর্দ্দন করিতে লাগিল এবং প্রণয়-কোপ প্রকাশে তাঁহার ব্যবহারের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সভাজয়িন্ত্য তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্কৃতাভ্যি হস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন—সখিগণ! তোমাদিগের ঋণ আমি কোন কালে শোধ দিতে পারিব না—তোমরা আমার অনুরাগে লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম আত্মীয় স্বজন সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল সুমধুর বাক্যে গোপীরা উৎফুল্ল হইয়া বিরহ তাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। তখন রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল—

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ১০।৩৩।২

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে এই রাসের বর্ণনা। সে বর্ণনা কামায়ন-প্রচুর। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণের সহিত নৃত্যপরা গোপীদের লাস্যলীলায় কেবল নূপুর কিঙ্কিণী ও বলয়ের কলধ্বনি মাত্র শ্রুত হয় নাই—আরও কত কি ঘটিয়াছিল।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

শেক্‌স্পীয়র উন্মাদিনী ওফিলিয়ার মুখে যে গানটি বসাইয়াছেন তাহার ভাষায় বলিতে গেলে,—

To-morrow is Saint Valentine's day,
All in the morning betime,
And I a maid at your window,
To be your Valentine.

Then up he rose, and donn'd his clothes,
Ane dupp'd the chamber-door;
Let in the maid, that out a maid
Never departed more.

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী গোপীগণ কৃষ্ণস্পর্শে প্রমোদিতা হইয়া মধুর রাগে রক্তকণ্ঠীর ন্যায় উচ্চকণ্ঠে গীত করিতে লাগিল। কেহ অনুরাগভরে চন্দনচর্চ্চিত উৎপলগন্ধী শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধারণ করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিল—কেহ বা শ্রম নিবারণের জন্য অচ্যুতের করকমল স্বীয় বক্ষে ধারণ করিল—

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপল সৌরভং।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ১২১
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জ আস্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং॥ ১৩

আর শ্রীকৃষ্ণ? তিনি আলিঙ্গন, করস্পর্শ, সানুরাগ বিলোকন এবং চুম্বনাদি প্রেমোদ্দীপক ভাবে ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শজনিত আনন্দে আকুল হওয়ায় ব্রজসুন্দরী-দিগের কবরী বন্ধন, দুকূল ও কুচপট্টিকা শিথিল হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের এমন ক্ষমতা হইল না যে সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করেন। প্রত্যুত তাঁহাদের মণিময় হার ও অঙ্গের আভরণ কোথায় কিভাবে স্খলিত হইল তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেই পারিলেন না।

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ॥১৭
তাস্তু ভগবদ্ বিলাসৈঃ আকুলা বভূবুঃ ইত্যাহ তদঙ্গেতি—শ্রীধরস্বামী

এইরূপে রাসক্রীড়া সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ললনাগণের শ্রমাপনোদন জন্য অতঃপর যমুনাতে অবগাহনপূর্ব্বক জলক্রীড়া আরম্ভ

করিলেন—যেন গজরাজ করিণী-পরিবৃত হইয়া সলিলে অবগাহন করিতেছেন।

তাভির্যূতঃ শ্রমমপোহিতুম্ অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্ব পালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২২

হাস্যমুখী গোপীগণ প্রেমবীক্ষণে নিরীক্ষণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল, অমরীগণ বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং সুরবৃন্দ বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিল। আর শ্রীকৃষ্ণ? রোমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ—২৩।—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের লীলার অনুকরণ করিয়া সেই সকল গোপীদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট রাসের বর্ণনা শেষ করিয়া বলিতেছেন—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃস সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥২৬

'শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম—গোপীগণ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্তা—তথাপি তিনি অচ্যুত। শরৎকালীন সমস্ত রসালাপের আশ্রয়ীভূত এবং শশাঙ্কের বিমল জ্যোৎস্নায় ধবলিত সেই রাত্রি তিনি 'আত্মনি অবরুদ্ধ-সৌরত' (এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতঃ যস্য—শ্রীধর) হইয়া গোপীদিগের সহিত যাপন করিলেন।'

ইহাই ভাগবতের বর্ণিত রাস। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহার মধ্যে প্রচুর Eroticism আছে (Eroticismএর প্রতিশব্দ 'কামায়ন')। কয়েকটা পক্তির পুনরুল্লেখ করি।

নিশম্য গীতং তদ্ অনঙ্গবর্দ্ধনং—১০।২৯।৪
জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ—ঐ ১১
হৃৎশয়াগ্নিঃ—ঐ ৩৫
তীব্রকামতপ্ত—ঐ ৩৮
উৎতম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার—ঐ ৪৬
কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং—১০।৩০।৩৩
সুরতনাথ! তেঽঙ্ঘ্রিদাসিকা—১০।৩১।২
কুণু কুচেষু নঃ কৃদ্ধি হৃচ্ছয়ং—ঐ ৭

চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ! নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্—ঐ ১৩
স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু—ঐ ১৯
মনসি নঃ স্মরং বীর! যচ্ছসি—ঐ ১২
মুহুরতি স্পৃহা মুহুতে মনঃ—ঐ ১৭

পরবর্ত্তী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাসের বর্ণনায় ঐ কামায়ন (eroticism) অধিমাত্রায় উঠিয়াছে—যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এখন প্রশ্ন এই—রাসলীলা কি কামক্রীড়া না প্রেমোৎসব? আগামী বারে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সাহিত্য। বহু শতাব্দী ধরে এই বিশাল সাহিত্য গঠিত হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত যে বিপুল জ্ঞানসম্ভার সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস এখনও নির্ভুল ভাবে রচিত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার এই যে কীর্ত্তি তা যেমনি উজ্জ্বল তেমনি গৌরবজনক। কিন্তু এত বড় বিরাট্ সাহিত্যের পর্য্যালোচনা কোনও প্রবন্ধেই সম্ভবপর নয়। এ সাহিত্যের এত ভাগ ও বিভাগ আছে, যে তাদের যে কোনো একটির অংশবিশেষ নিয়ে উৎকৃষ্ট মৌলিক-গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের বৈদিক যুগ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে লৌকিক। আবার সেই লৌকিক যুগের ভিতরই ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি নানাজাতীয় উপসাহিত্য এসে পড়ে। সুতরাং আমরা এখানে 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যাপ্তি অর্থ না ধরে কাব্য অর্থে ব্যবহার করছি।

এই সংস্কৃত কাব্য প্রাচীন সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব রচনা। দেবভাষা আধুনিক যুগে অচল ও বিগতপ্রাণ হলেও, সেই ভাষায় লিখিত কাব্য-গুলি আজও দেশে বিদেশে বিশিষ্ট সম্মান ও সমাদর লাভের অধিকারী। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের যুগ আয়ত। এরি মধ্যে তার উত্থান ও পতন, সম্ভব ও পরিণতি। সংস্কৃতানুরাগী পাঠক মাত্রই জানেন যে দীর্ঘ পনর-শত বৎসর ব্যাপী সাধনা ও অভ্যাসের ফলে সাহিত্যে কয়েকটি আদর্শ গঠিত হয়েছিল, আর বিভিন্ন মার্গে প্রসারিত হলেও সেই কাব্য-সাহিত্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলির আলোচনা বোধ হয় অরুচিকর হবে না।

সংস্কৃত সাহিত্যের যেটি প্রধান বিশেষত্ব সেটি আমাদের মতে তার কল্পনা-শক্তির প্রখরতা। খুব কম প্রাচীন সাহিত্যেই এইরূপ রোম্যান্টিক

সুর পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কল্পনা-প্রিয়তা কয়েকজন কবির কাছে হয়ত ভাববিলাসিতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির লেখনী যে অপরূপ কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে, তা সৌন্দর্য্যে ও সুষমায় সত্যই অনবদ্য। অবশ্য এ কথা সত্য যে সকল কাব্যের মূল উৎসই প্রেরণা ও কল্পনা; তবুও সংস্কৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে সে কল্পনা অতি উচ্চাঙ্গের ও সুদূর বিস্তৃত। য়ুরোপীয় অথবা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মত তাতে অভিনব চিন্তাধারার স্বকীয়তা অথবা উৎকর্ষ নেই; কিন্তু মানব-হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জনায় অথবা প্রকৃতি বর্ণনায় সে কল্পনার সূক্ষ্মতা ও বিশেষত্ব ধরা পড়ে।

কল্পনা যেখানে সূক্ষ্ম, তাকে শারীর রূপ দেবার জন্য সেখানে উপমার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যে উপমার এত প্রাচুর্য্য। একটি প্রাচীন শ্লোক আছে,—

কবিরিব বঞ্চিতনিদ্রস্তরুণি ভবার্থং ভৃশং স যুবা
পদশব্দলীনহৃদয়ো রূপালঙ্কারভাবনা-নিপুণঃ।

অর্থাৎ হে তরুণি! তোমার জন্য সেই যুবক নিদ্রা বিষয়ে কবির মতই নিতান্ত বঞ্চিত হয়েছেন। কবিরা যেমন ব্যাকরণসিদ্ধ পদ ও শব্দ চিন্তায় গভীর মনোনিবেশ করেন এবং রূপ অর্থাৎ পদমাধুর্য্য ও উপমাদি অলঙ্কার উদ্ভাবনে তৎপর হন, তেমনি ইনিও তোমারি পদশব্দে সমগ্র চিত্তবৃত্তি অভিনিবিষ্ট করে রূপ অর্থাৎ অবয়ব-সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার শোভার চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। এই আদিরসাত্মক শ্লোকটিতে পদমাধুর্য্য ও উপমা-লঙ্কারের সাহায্যে কি সুন্দর অর্থ করা হয়েছে! গুণী শিল্পীর হাতে এ উপমার শোভনতা প্রকৃতই সার্থক, তার আবেদনও সকলের হৃদয়স্পর্শী।

ভারতীয় মতানুসারে উপমার যাথার্থ্য ও সৌন্দর্য্যে কবিকুলগুরু কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা হয়েছে। বাণভট্ট, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, 'প্রসন্নরাঘব'-রচয়িতা জয়দেব প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ তাঁদের পূর্ব্বসূরিকৃত উপমা-মাধুর্য্যের যশোগান করেছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে কালিদাস উপমালঙ্কারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছেন। স্বয়ংবরা ইন্দুমতী যখন সমবেত রাজন্যবর্গকে বিনীত

নমস্কার করে একে একে অতিক্রম করে গেলেন, নৈরাশ্যজনিত তাঁদের মুখের পাণ্ডুরতা লক্ষ করে কবি বলেছেন,—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।

এস্থলে অদৃশ্য মনোবিকারের তুলনা দিতে কবি কী মনোহর বাস্তব চিত্রের অবতারণা করেছেন! কালিদাস-সাহিত্যে উপমার অনটন বা অপ্রাচুর্য্য নেই। তাঁর শকুন্তলা, মেঘদূত, ঋতু-সংহার অথবা অন্য যে কোনো কাব্যের আলোচনা করলেই আমরা নানাবিধ উপমার পরিচয় পেয়ে থাকি। তবে আমাদের মনে হয় যে এক রঘু ত্রয়োদশেই তাঁর উপমা-শক্তির অজস্র উদাহরণ রয়েছে। কি 'ধারাস্বনোদ্‌গারিদরীমুখ' চিত্রকূটের গম্ভীর রূপব্যাখ্যানে, কি ধবলকৃষ্ণ 'কচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ মুক্তা-ময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা' গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বর্ণনায় তাঁর কল্পনাচাতুর্য্য, উপমা-মাধুর্য্য ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-প্রতিভা ধরা পড়ে।

কালিদাস ছাড়া ভবভূতির উত্তররামচরিতেও অনেক উৎকৃষ্ট উপমা আছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তমসা মুরলাকে বিরহক্ষীণা, ধৃতৈকবেণী, শীর্ণদেহা জানকীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।" এখানে একটি হৃদয়াবেগ বা চিত্ত-বৃত্তির উপর যে ভাবে মানবত্ব আরোপিত হয়েছে তা প্রকৃতই অপূর্ব্ব।

কিন্তু একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন মনোহর উপমার অভাব নেই, অপর পক্ষে অনেক স্থলে তার মধ্যে একটা গতানুগতিকতার আভাস পাওয়া যায়। এমন কি স্থান বিশেষে সেগুলি নিষ্প্রভ ও অর্থ-হীন মনে হয়। একই অলঙ্কার অথবা একই উপমা যদি বারংবার প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অতি ব্যবহারের ফলে তাতে বৈচিত্র্যহীনতা ও মালিন্যদোষ আসা স্বাভাবিক। এর জন্য কবিদের সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না; আলঙ্কারিকদেরও কিছু পরিমাণে দায়ী করা যেতে পারে। সাহিত্যদর্পণ খুললেই দেখা যাবে কয়েকটি গুণ কয়েকটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং মালিন্য বোঝালেই আকাশ ও পাপ, ধবলতা বললেই হাস্য ও যশ, রক্তিমার উল্লেখ করলেই ক্রোধ অথবা

রাগের প্রসঙ্গ তুলতে হবে। চকোরের জ্যোৎস্নাপান, বর্ষাগমে মরাল-গণের মানসযাত্রা, যোষিদ্‌গণের পদাঘাতে বিকসিক অশোকপুষ্প, মুখ-মদিরার স্পর্শে প্রস্ফুটিত বকুলমঞ্জরী, বিপ্রয়োগতাপে বিশীর্ণ বক্ষে দুঃসহ অলঙ্কারভার, ভ্রমর-জ্যারোপিত পুষ্পময় বিশিখক্ষত, যুবতী-কটাক্ষের অব্যর্থ শরসন্ধানে যুবজনের হৃদয়-লক্ষ্যভেদ, এই অলঙ্কারগুলি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে আবহমান কাল থেকে আমল পেয়ে এসেছে। অবশ্য গতানুগতিকতার মোহ কাটিয়ে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ অনেক স্থলে স্বতন্ত্র ধরণের সজীবতা ও নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করেছেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি অতি প্রয়োগে দুষ্ট, সুতরাং সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে যে কিছু পুরাতন ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকবে তা অস্বাভাবিক নয়।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের কল্পনা-প্রবণতার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কল্পনাশক্তি নানাবিধ বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনাভঙ্গী সত্যই চমৎকার। পুঞ্জীভূত দীর্ঘ সমাস ও রূপকাদি বহুবিধ অলঙ্কার সাহায্যে তাঁদের বর্ণনা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে তাঁদের বাক্যবিন্যাস কোনও কোনও স্থানে তেমন সতর্কতা লাভ করেনি। ধরা যাক্ কাদম্বরীতে রাজা শূদ্রকের বর্ণনা। তাঁর চরিত্রে অসাধারণ ধীশক্তি, অতিবদান্যতা, পরাক্রম, প্রবল প্রতাপ প্রভৃতি যে গুণগুলি আরোপিত হয়েছে, সেগুলি অনায়াসে যে কোনও প্রাচীন রাজার পক্ষেই প্রযুজ্য। দণ্ডী-কৃত দশকুমারচরিতের পূর্ব্বপীঠিকায় প্রথম উচ্ছ্বাসেও আমরা এইরূপ আর একটি বর্ণনা দেখতে পাই। রাজা রাজহংসের সম্বন্ধে "সকলরিপুগণকটকজলনিধিমথনমন্দ-রায়মাণসমুদ্দণ্ডভুজদণ্ডঃ, বিরচিতারাতিসন্তাপেন প্রতাপেন সতত তুলিত-বিয়ন্মধ্যহংসো" প্রভৃতি যে বিভূষণ বিশেষণগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে আমরা একজন পরাক্রান্ত নরপতির চিত্র পাই, তাঁর চরিত্রের অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের সন্ধান পাই না। আবার শূদ্রকের রাজধানী বিদিশার বর্ণনাচ্ছলে বাণভট্ট যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতে নগরীর সংস্থান কোন্‌দিকে অথবা কোন প্রদেশে তা ভিন্ন আর সব

কথাই জানা যায়। এই রকম বিদ্ধ্যাটবী বর্ণনাতেও ঐ ক্রটিটুকু আমাদের নজরে পড়ে। প্রাচীন কবিগণ ঐতিহাসিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক সংস্থান সযত্নে পরিহরণ করেছেন।

এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্বতঃই মনে আসে। সেটি হল প্রাচীন কবিগণের নারীরূপের সৌন্দর্য্যকীর্ত্তন। নানা কবি নানা ভঙ্গীতে নারীরূপের বর্ণনা করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। তাঁদের এই রূপ-পরীষ্টি রমণীর সৌন্দর্য্যকে সংস্কৃত সাহিত্যে অমরত্বদান করেছে। কালিদাস, বাণভট্ট, ও শ্রীহর্ষ থেকে আরম্ভ করে অপেক্ষাকৃত নগণ্য রচয়িতা পর্য্যন্ত সকলেই বিধিমতে, সুকৌশলে ও মধুরভাষায় অঙ্গনাবয়বের যথাযথ সৌন্দর্য্যবিকাশ বর্ণনা করেছেন। ললিত দেহযষ্টিকার এই পুনরাবৃত্ত পরিশীলনের ফলে অনেক সময়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি। কোনও কবি হয়ত মস্তকের কেশ জাল থেকে সূত্রপাত করে পদনখাশ্রিত সৌন্দর্য্যের চিত্র এঁকেছেন, আবার কেহ বা সরোরুহ লাঞ্ছিত পদযুগল থেকে উর্দ্ধায়িত হয়ে শিরোভূষণ পর্য্যন্ত উঠেছেন। উদাহরণস্বরূপ বাসবদত্তায় কন্দর্পকেতুর স্বপ্নদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অষ্টাদশবর্ষ-দেশীয়া কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যের বর্ণনা অতি অদ্ভুত ও বিরতিবিহীন বললেও অতিরঞ্জন হয় না। প্রথমে অধমাঙ্গ শোভা, অনিচ্ছাকৃত পরিসমাপ্তিতে অতঃপর উত্তমাঙ্গের রূপবর্ণন। টীকাকার এরূপ বর্ণনার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। উৎস্বপ্নায়মান পুরুষ শয্যায় শয়ান, স্বপ্নদৃষ্টা রমণী ঈষৎ উর্দ্ধাবস্থায়, সুতরাং এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বর্ণনার বিপর্য্যয়ই রুচিসঙ্গত।

কিন্তু এই শতধা রূপব্যাখ্যানেও প্রাচীন ও অভিজাত প্রথার আনুগত্য আছে। মেঘদূতে কালিদাস—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ"

প্রভৃতি শ্লোকে যে নারী সৌন্দর্য্যের একটি আদর্শাভাস দিয়েছেন তা সকলের সুপরিচিত। এই আদর্শকেই অন্যান্য প্রাচীন কবিরা অল্পবিস্তর স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তারি সবিস্তার বর্ণনা যদি পঙক্তির পর

পঙক্তি-ব্যাপী দীর্ঘ ও পরিস্পৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে একটু বৈচিত্র্যহানি হতে বাধ্য। শ্রীহর্ষের নৈষধীয় কাব্যে সমস্ত সপ্তমসর্গখানি দময়ন্তীর রূপবর্ণনে নিয়োজিত হয়েছে। ছটি শ্লোকে কেশজালের, তিনটি শ্লোকে ভ্রূদ্বয়ের, নয়টিতে নয়নযুগলের, সাতটিতে অধরোষ্ঠের, তিনটিতে কুন্দ-দন্তের, চারটিতে মধুর বাণীর, পুনরায় নয়টি শ্লোকের সাহায্যে ভৈমীর সাবয়ব মুখবর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। এই ত গেল শুদ্ধ বদন মণ্ডলের বর্ণনা; শ্রোণী, জানু, গুল্‌ফ ও চরণাঙ্গুলির শোভা বাদ দিলাম। তারপর উপমাগুলিতেও সেই একই প্রকারের উপমিত পদপ্রয়োগ। নেত্রের সহিত সফরীর, কেশজালের সহিত শৈবালদামের, উদরস্থিত ত্রিবলীর সহিত সোপানরাজির আর অপরিমেয় দেহলাবণ্যের সহিত অগাধ সরোবরের তুলনা বহু কবিই গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব তার বিস্ময়কর বাক্‌চাতুর্য্য। নানারকমের শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস ও বাক্যবিন্যাস সাহিত্যে প্রচলিত আছে। যেখানে অর্থগৌরব সংরক্ষিত হয়েছে, সেখানে এগুলির সার্থকতা নিঃসংশয়। কিন্তু যেখানে রসসৃষ্টির অভাব ঘটে, সেখানে লিপিকুশলতা নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হয়। রঘুর নবম সর্গে বসন্তবর্ণন-প্রসঙ্গে কালিদাস লিখেছেন,

"সুরদনাবদনাসবসম্ভৃতস্তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ
মধুকরৈকরোন্মধুলোলুপৈর্বিকুলমাকুলমায়তপঙ্‌ক্তিভিঃ।"

অর্থাৎ মদগন্ধি বকুল পুষ্পরাশি সুমুখী কামিনীগণের মুখমদিরার সংস্পর্শে শীঘ্র উৎপন্ন হইলে মধুলোভী অলিকুল দলে দলে সমাগত হইয়া বকুলবৃক্ষকে আকুল করিয়া তুলিল।

পুনরায়—

"উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ"

অর্থাৎ শ্বেত পরাগসংশ্লিষ্ট তিলকমঞ্জরী ভ্রমর পঙক্তির সংসর্গ লাভ করাতে অঙ্গনাদিগের অলকার্পিত মুক্তাগুম্ফিত অলকাভরণের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। এই উল্লিখিত শ্লোক ছুটিতে যে অর্থ-গৌরবের

ও পদবিন্যাসের মধুর সমন্বয় সাধিত হয়েছে তার সন্দেহ নেই। একটি উল্কট শ্লোক আছে,—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া কিমু
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া ন হ্রিয়তে মনঃ।

অর্থাৎ পদবিন্যাস মাত্রেই যে কবিতা অথবা বনিতা মানুষের চিত্তহরণ করতে না পারে সে কবিতাতে বা বনিতাতে কিছুমাত্র ফল নেই। উপরকার শ্লোকটি থেকে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে যে সেকালে কাব্যরচনার আদর্শ কতটা শোভন ও সুললিত ছিল।

এ রকম উচ্চাঙ্গের পদবিন্যাস রচনায় কালিদাস কতদূর পারদর্শী ছিলেন সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার জনশ্রুতি আছে। গল্পের সত্যাসত্য নির্ণয় পাঠক করবেন, তবে প্রবাদ আছে, একদা কালিদাস ও বররুচির মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য হয়েছিল 'প্রকৃত কাব্য কি ?' এই তর্ক নিয়ে। অবশেষে জরতীবেশিনী সরস্বতী উভয়কে পরীক্ষা করবার জন্য তাম্বুল ভক্ষণ উপলক্ষ্য করে এক একটি শ্লোক রচনা করতে আদেশ করেন। বররুচি বললেন,—

তূর্ণমানীয়তাং চূর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি শীর্ণাঙ্গাকর্ণলোচনে।

হে পূর্ণচন্দ্রমুখি! শীঘ্র চূণ নিয়ে এস। অয়ি আকর্ণলোচনে তাম্বুলপত্রগুলি স্বর্ণবর্ণ হয়ে উঠেছে, শীঘ্রই শীর্ণ হয়ে যাবে। আর কালিদাস উত্তর দিলেন,—

বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণীদৃশঃ
নাধরে জায়তে রাগো নান্থরাগঃ পয়োধরে।

খদিরসার ব্যতীত মৃগনয়না অঙ্গনার অধরে রক্তিমাপ্রতিফলিত হয় না, আর হার ব্যতিরেকে পয়োধরেও অনুরাগ জন্মায় না।

শ্লোক দুটির মধ্যে কোনটির উৎকর্ষ হৃদয়কে মুগ্ধ করে পাঠান্তে তা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রথমোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য কিছুই নেই, কেবল শব্দচ্ছটা ও কৃতক অনুপ্রাসের দ্বারা ওটি অলঙ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে ভাবের গভীরতা আছে আর যেটুকু অনুপ্রাস ব্যবহার করা

হয়েছে সেটুকু সরল ও অকৃত্রিম। কাহিনীটি সত্য হোক আর মিথ্যা হোক্, রচনা দুইটির তারতম্যের সাহায্যে উৎকৃষ্ট পদরচনার মাধুর্য্য দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আরো অন্যান্য কবির অনেক রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে যেখানে পদলালিত্য ও অর্থগৌরব একত্র অতি সুন্দর ভাবে গ্রথিত হয়েছে। অপর পক্ষে এমন অনেক রচয়িতা আছেন যাঁদের কাব্য কেবল গাঢ়বন্ধ শ্লেষে ও অকল্প বাক্‌চাতুর্য্যে পরিণত হয়েছে। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কাব্যমার্গ অনুসরণ করেন নি, করেছেন কাব্যশিল্পমার্গকে।

উপমার জন্য কালিদাস যেমন বিখ্যাত, অর্থগৌরবের জন্য ভারবি তেমনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যেও যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। কিরাতের চতুর্থসর্গে শরৎকাল বর্ণনে, নবমসর্গে সন্ধ্যা, চন্দ্রোদয় ও প্রভাত বর্ণনায় বীররসপ্রধান কাব্যের ভিতরও কবি উচ্চদরের কাব্যশক্তি স্ফুরিত করেছেন। আবার মধ্যে মধ্যে প্রকৃত কাব্যাংশ চাপা পড়ে গিয়েছে, সেই সব স্থানে বর্ণ ও শব্দবৈচিত্র্যের আধিক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই শ্লোকের ভিতর তিনি কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সন্নিবিষ্ট করেছেন। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' যে সকল শব্দ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের উদাহরণ আছে, ভারবির কাব্যে সেগুলির অনেক সন্ধান মেলে। পঞ্চদশ-সর্গে এমন অদ্ভুত শ্লোক আছে যার উভয় দিক থেকে একই পাঠ হয়। চতুর্দ্দশ শ্লোকটিতে মাত্র একটি 'ৎ', নতুবা 'ন' কার ভিন্ন অন্য কোনো শব্দের প্রয়োগই নেই।

ন নোননুন্নো নুন্নোনো ননা নানানা ননু
নুন্নো নুন্নো নুন্নেনো নানেনা নুন্নুন্নমুৎ।"

সমগ্র শ্লোকটি আবৃত্তি করে গেলে মনে ভ্রম হয় বুঝিবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তেলেনা শুনছি। বলা নিষ্প্রয়োজন এ ধরণের অর্থহীন কারু-কার্য্য অতীব হাস্যকর। আমাদের মনে হয় সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অবনতির যুগ এইখান থেকেই সুরু হয়েছে।

নৈষধীয় কাব্য আর একখানি বিপুল ও সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দ্বাবিংশসর্গে কাব্যখানি সমাপ্ত হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্কট উদাহরণে

আর কামশাস্ত্রের সুচতুর ব্যাখ্যায় কাব্যগ্রন্থ এতটা স্ফীত। অত্যুক্তি-দোষ, যমক, অপ্রযুক্ত অনুপ্রাস অধিকাংশ স্থলেই বিরাজমান। এ জন্য বিশুদ্ধ কাব্য তাঁর রচনায় স্বল্প, কৃত্রিম কাব্যশিল্পই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। জনশ্রুতি আছে কবি শ্রীহর্ষের মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট-ভট্ট ভাগিনেয়ের রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল মন্তব্যপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্বকৃত 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে যদি নৈষধীয় কাব্য রচিত হত, তাহলে 'দোষপরিচ্ছেদের' নিদর্শন চয়ন করবার জন্য তাঁকে বহুকাব্য অনুসন্ধান করে ফিরতে হতনা। এক নৈষধীয় কাব্যেই যাবতীয় দোষের দৃষ্টান্ত মিলত।

যদি প্রাচীন সাহিত্যের এমন কোনো কবি থাকেন যিনি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী, তা হলে আমরা একবাক্যে সুবন্ধুর নামোল্লেখ করতে পারি। মাঘের 'শিশুপালবধে' শব্দ ও অলঙ্কার-সম্পদ্ প্রচুর পরিমাণেই বর্ত্তমান। বক্রোক্তিমার্গের কবিকুলের মধ্যে কবিরাজও একজন খ্যাতনামা শিল্পী। তাঁর 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক কাব্যগ্রন্থে রাঘব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের অর্থোপপত্তি সাধন করে তিনিও অশেষ শ্রম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তুচ্ছ শব্দার্থের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি বলে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার অপব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ সকল কবিকে একেবারে ছাড়িয়ে গেছেন 'বাসবদত্তার' প্রণেতা সুবন্ধু। তাঁর গ্রন্থখানি কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে আখ্যানবস্তু অপেক্ষা কাব্যনৈপুণ্যই তাতে অধিক। বর্ণনা ও কাব্যশিল্পই তাঁর কাব্যের প্রাণ স্বরূপ। অলঙ্কারশাস্ত্রের যতগুলি বিধান আছে সবগুলির প্রয়োগই বোধ হয় তাঁর গ্রন্থে মিলে যাবে।

নগরার্ণবশৈলর্ত্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ
উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ॥
বিপ্রলম্ভবিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি॥ কাব্যাদর্শ, ১।১৭

উল্লিখিত বর্ণনা শিল্পেই সুবন্ধুর সমগ্র কাব্যশক্তি নিয়োজিত হয়েছে। 'বাসবদত্তা'য় বোধ করি এমন কোনো পৃষ্ঠা নেই যেখানে

শ্লেষের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর সেই সব শ্লেষ অতি কূট ও দুরূহ। ঐতিহ্য, পুরাণ, আখ্যায়িকা প্রভৃতি নানাবিধ স্থান থেকে সেগুলি সমাহৃত। তাঁর বাক্য বা পদসমূহের প্রকৃত অর্থ সাধারণ পাঠকের নিকটে দুর্ব্বোধ ত বটেই, ব্যুৎপন্ন টীকারেরাও সে অপ্রমেয় অর্থসন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়েছেন। দ্ব্যর্থ ও অপ্রধান অর্থ সমন্বিত সমাসে ও অতিবিস্তর শব্দ-প্রাচুর্য্যে সুবন্ধু অপ্রতিপক্ষ। তাঁর কাব্য গৌড়ী রীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুবন্ধু যেন পরম আত্মতৃপ্তিভরেই বলেছেন, "কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া"। প্রতি অক্ষরে তাঁর শ্লেষ, তা যেমনি বহুল তেমনি অপ্রকট। তাই 'বাসবদত্তা'র শেষভাগে তিনি নিজেই শ্লেষের প্রাধান্য সম্বন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন,—

প্রত্যক্ষর শ্লেষময়প্রপঞ্চ-
বিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিং প্রবন্ধং
সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদ
শ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে অনেক উৎকট ভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁর রচনায় উপভোগ্য বস্তু আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শেষাংশের সহিত শৃঙ্খলিত পদরচনায় তিনি কেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, পাঠক নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারবেন,—

"যস্য চ সমরভুবি ভুজদণ্ডেন কোদণ্ডম্, কোদণ্ডেন শরাঃ, শরৈররিশিরঃ, অরিশিরসা ভূমণ্ডলং, ভূমণ্ডলেন অনন্তভূতপূর্ব্বো নায়কঃ, নায়কেন কীর্ত্তিঃ, কীর্ত্ত্যা সপ্ত সাগরাঃ, সাগরৈঃ কৃতযুগাদিরাজচরিতস্মরণম্, স্মরণেন স্থৈর্য্যম্, স্থৈর্য্যেণ প্রতিক্ষণ-মাশ্চর্য্যমাসাদিতম।"

হয়ত সংক্ষেপে বলা চলত, তবুও এই অন্যোন্যবদ্ধ বাক্যবলয়গুলি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এ যেন অনেকটা শ্রুতিমধুর একাবলী রচনা, কেবল কার্য্যকারণ-সম্পর্কের অভাব। সুবন্ধুর এই ভিন্নমুখী আলঙ্কারিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বক্রোক্তিমার্গের অপর একজন শিল্পী কবিরাজ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবির যশঃকীর্ত্তন করেছেন,—

"সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ
বক্রোক্তিমার্গনিপুণশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা।"

আত্মগৌরবের পরাকাষ্ঠা বটে, তবে সৌভাগ্যক্রমে কবিরাজ অপর দুই কবিকে একেবারে নিরাকৃত করেন নি। এ প্রশংসা সুবন্ধুর প্রকৃত প্রাপ্য, অযোগ্য নয়।

এতক্ষণ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অপ্রতীত শ্লেষের উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু এ শ্লেষ সত্ত্বেও পদলালিত্য সে সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ। নৈষধে পদলালিত্য প্রবাদবাক্যের অন্তর্গত, অতএব তাই থেকে দৃষ্টান্ত সঞ্চয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত।

"অহো অহোভির্হিমা হিমাগমেঽপ্যভিপ্রেম্নে প্রতিতাং স্বরাদিতাম্
তপর্ত পূর্ত্তাবপি মেদসাং ভরা বিভাবরীর্ভির্বিভরাং বভূবিরে।" নৈষধ ১।৪১

আবার "পতত্রিণা তক্ষচিরেণবর্ধিতং শ্রিয়ঃ প্রয়াস্ত্যাঃ প্রবিহায় পল্বলং
চলৎপদাস্তোরুহ নূপুরোপমা চুকূজ কূলে কলহংসমণ্ডলী।" নৈষধ ১।১২৭

শ্লোক দুটি, বিশেষতঃ শেষ চরণ গুলি, বার বার আবৃত্তি করলে তবে এদের সুকুমার পদলালিত্য ধরা পড়ে। এই লালিত্যগুণই নৈষধের চরম প্রকর্ষ, এই কারণেই তার অন্যান্য ত্রুটি মার্জ্জনীয়। কয়েকটি উদ্ভট শ্লোকেও আমরা এই ললিত পদরচনা লক্ষ্য করেছি, নিম্নে তারই একটি উদ্ধৃত করলাম।

যুষৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু
যাতানি নাশং জনকাজ্ঞার্থে
দশাননেনাপি দশাননানি।

অর্থটিও মনোহারী। হে খঞ্জননয়নে। যদি তোমার জন্য আমার মস্তক যায়, যাক্—তাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। দশানন রাবণ যখন জানকীর জন্য দশটি মস্তকেরই বিনাশ সাধনে পশ্চাৎপদ হননি, তখন আমার একটি মাত্র শিরের কথা কি আর বলব। মিলনভিক্ষায় মুখর প্রণয়ীর মুখে চাটুবাক্য ও পুরাণের উল্লেখ অতি শোভন হয়েছে; কিন্তু তার চেয়ে মোহন, শ্লোকটির পদলালিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাগ্‌বিস্তার ও শব্দচাতুর্য্যের কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে তার আরো একটি বিশেষত্বের কথা বলা দরকার। সেটি হল এর বিপরীত গুণ, অর্থাৎ বাক্‌সংক্ষেপ। সংস্কৃত কবিরা যেমন অতিবিস্তর পদ ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন, তেমনি আবার অল্প কথাতেও তাঁদের বৈদগ্ধ্যপ্রকাশ করেছেন। সূত্রগুলির কথা বাদ দিলাম, যদিও তারা অতিসংক্ষেপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ সূত্র কাব্য বিষয়ের বহির্ভূত। কাব্য সাহিত্যেও অবিস্তর বাক্যের ভূরিনিদর্শন আছে। যে বাণভট্ট প্রচুর শব্দালঙ্কার আর বর্ণনা-প্রাগল্‌ভ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তাঁর কাদম্বরীর মত গ্রন্থেও অনেক মূল্যবান্ ও সামাসিক কথা লিপিবদ্ধ আছে। মদনশরে বিক্ষত বন্ধুকে যখন কপিঞ্জল সান্ত্বনা-বাণী শোনাচ্ছেন, প্রত্যুত্তরে কুমার বলছেন, "বয়স্য! সবই বুঝি, কিন্তু মন বোধ মানে না। ব্যথার ব্যথী না হলে পরকে উপদেশ দেওয়া সহজ কাজ—সুখমুপদিশ্যতে হি পরস্য।" আবার গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে শুকনাস কুমার চন্দ্রপীড়কে যে নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দিচ্ছেন, সেগুলিও সংক্ষেপগুণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যস্থলে, বিলাসবতীর সান্ত্বনাতেও লঘুপদা সরস্বতীর প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে।

সংস্কৃত প্রবাদ-বাক্যগুলিও এই শ্রেণীর ভিতরে পড়ে। সংক্ষিপ্ত ও সহজস্মরণ বাক্যের সাহায্যে অনেক সারগর্ভ বাণী তাতে লিপিবদ্ধ আছে।

"বরং রামশরঃ সহো ন চ বৈভীষণং বচঃ
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।"

শ্লোকটিতে রচয়িতার যেমনি উচিত উপমা-সঙ্কলন তেমনি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যাঁদের উদ্ভট শ্লোকের প্রতি অনুরক্তি আছে তাঁরা এ উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। নিম্নে এই ধরণের আরো কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"বিদ্বৎকবয়ঃ কবয়ঃ কেবলং কবয়স্তু কেবলং কপয়ঃ
কুলজা যা সা জায়া কেবল জায়া তু কেবলং মায়া।"

বিদ্বান্ হয়েও যাঁরা কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, তাঁরাই প্রকৃত কবি। নতুবা যাঁদের বিদ্যা নাই অথচ কবিত্ব আছে, তাঁরা বানর অভিধেয়যোগ্য।

সৎকুলজাতা সহধর্ম্মিণীই প্রকৃত জায়া, তদ্ভিন্ন যিনি কেবলমাত্র জায়া তিনি মায়া ব্যতীত আর কিছুই নন।

অথবা বিদ্যানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্।
কিংবা উপ্তায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব।

শেষোক্ত শ্লোকদুটিতে প্রথম চরণে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, আর শেষ চরণে উক্তির প্রামাণ্য হিসাবে একটি উপমা নিহিত হয়েছে। উদ্ভট শ্লোক ছাড়া হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের উপদেশগুলিও এইরূপ সংহত বাক্যের শীর্ষস্থানীয়।

সংস্কৃত সাহিত্য আবেগ ও অনুভূতি প্রধান। মানুষের হৃদয়াবেগ বর্ণনা করা সেকালের কবিগণের প্রীতিকর ছিল। কখনও এ ভাবব্যঞ্জনা অতি গভীর ও ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত, কখনও বা তা সুস্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত। সংস্কৃত কাব্যে নানা প্রকার রস আছে। তার মধ্যে আদিরস ও করুণ রসই প্রধান আর প্রাচীন কবিগণও এই দুই রসের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। করুণ রসে ভবভূতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, তিনি মুখ্যতঃ বিষাদচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তররামচরিতে জানকীর সহিত মিলিত শ্রীরামচন্দ্র বিশ্রামসুখের ভিতরেও বলছেন, 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা', 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। আলেখ্যদর্শন চিত্রটি এই কারুণ্য-গুণে সাহিত্যে অতুলনীয় সৃষ্টি। সীতা বিসর্জ্জনেও ভবভূতি তাঁর কাব্য-প্রতিভা নিযুক্ত করেছেন। লবকুশের কথোপকথনে অথবা বাসন্তীর তিরস্কারে রামচন্দ্রের বিষাদসিন্ধু উদ্বেলিত হয়েছে। 'শরীরিণী বিরহব্যথা' জানকী দেবীর দুঃখে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। গোবর্দ্ধনাচার্য্য সত্যই বলেছেন,

"ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি
এতৎকৃত কারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা।"

কালিদাসের রঘুবংশেও এই কারুণ্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে। বিচ্ছেদ ও বিরহবর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহ-

গমন কালে কালিদাস যে করুণ ভাবের উৎসধারা খুলে দিয়েছেন, তা সকল হৃদয়কেই প্লাবিত করে। পিতাপুত্রীর এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ-বেদনা মূক প্রকৃতিকেও যেন উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করেছে। আশ্রমবাসী কণ্বের পরম স্নেহ ও গভীর ব্যথা ভুলবার সামগ্রী নয়।

কিন্তু স্থানে এই করুণ রসও অতিমাত্রায় দীর্ঘ হয়ে যায়। কালিদাস কৃত রতিবিলাপ অথবা ভবভূতির উত্তররামচরিতের সমগ্র তৃতীয় অঙ্কটি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। রঘুর অষ্টম সর্গে অজ-বিলাপ অযথা দীর্ঘ নয়, তবে অকৃত্রিম কারুণ্য সত্ত্বেও সে দৃশ্যটি অনেক খানি স্থান অধিকার করেছে। আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন কাল ছিল অবকাশের যুগ। সেখানে মানুষের অন্যান্য কাজের মত হৃদয়াবেগ অথবা অনুভূতিও যেন দীর্ঘ মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রসর্পিত হয়েছে। কোনো কোনো পাঠকের কাছে সীতাবিসর্জ্জনের পর দণ্ডকারণ্যে শম্বূকবধ উপলক্ষ্যে জানকীর স্মৃতিমণ্ডিত দৃশ্যগুলির দর্শনমাত্রেই শ্রীরামচন্দ্রের মর্ম্মভেদী বিলাপ করুণ রসের পরাকাষ্ঠা বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু সমস্ত অঙ্কব্যাপী এই কারুণ্যের চিত্রাঙ্কনে আমাদের চিত্ত ভারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আলঙ্কারিকদের মতেও এটি প্রাগ্‌ভাব নয়, অপকর্ষ সূচনা করে—'অঙ্গানামতিবিস্তৃতিঃ' কাব্যোৎকর্ষের হানি করে।

সে যাই হোক, কালিদাস ও ভবভূতি উভয় কবিই তাঁদের কাব্যে করুণ রসের অবতারণা করেছেন। সমালোচকগণও উভয়ের কাব্যশিল্প তুলনা করে রসসৃষ্টিতে ভবভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এ উক্তি যথার্থ হলেও আমাদের মনে হয় ভবভূতি যেখানে সুস্পষ্ট প্রকাশ করেছেন, কালিদাস সেখানে স্বল্পকথায় ও ইঙ্গিতে কার্য্য সমাধা করেছেন। একটি উদাহরণ দিলে অর্থ পরিষ্কার হবে। কালিদাসের শকুন্তলায় সপ্তম অঙ্কে

'বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।'

আর ভবভূতির উত্তররামচরিতের তৃতীয়াঙ্কে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক দুটি—

'পরিপাণ্ডুছর্বল কপোল সুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননং
করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।'

এবং 'কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলুনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ
রূপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদ্বিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকী গর্ভপত্রং।'

পাশাপাশি রাখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে কালিদাসের উক্তি অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ। তাঁর কাব্যে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য; ভবভূতির কাব্যে দ্যোতনা অধিক। দুজনের কবিত্ব শক্তির পার্থক্য এই স্থলেই। কালিদাস রঘু ত্রয়োদশে 'শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্' সেতু-বিভক্ত উদ্বেল জলধি, 'সৈষা বনস্থলী' যেখানে শোকার্ত্ত, অনুসন্ধিৎসু রামচন্দ্র জানকীর পাদপদ্মভ্রষ্ট 'বদ্ধমৌনম্ নূপুরম্' দেখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, অথবা জনস্থানের প্রাচীন স্মৃতিসমন্বিত দৃশ্যাবলী ও পুণ্যসলিলা গোদাবরীর উপকূলে বানীরগৃহে মধুর মিলনের দিনগুলি, সমস্তই অতি করুণভাবে চিত্রিত করেছেন। আবার ভবভূতিও আলেখ্যদর্শনাঙ্কে সমজাতীয় অনেক দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেছেন যা কারুণ্যে মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু কালিদাস সেই চিত্রগুলি ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন মাত্র, আর ভবভূতি সেগুলি স্পষ্ট ও পরিব্যক্ত করেছেন। ভবভূতির সকরুণ বর্ণনায় পাষাণও দ্রবীভূত হয়; কিন্তু কালিদাসের কাব্যে বিরহ ও শোক বর্ণনায় মানব হৃদয়ের সহিত জড় প্রকৃতিও স্তব্ধ ও বিষাদগম্ভীর হয়ে যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিচ্ছেদ দৃশ্যের প্রাচুর্য্য থাকলেও অন্যান্য রসের অভাব নেই, বিশেষতঃ আদিরস। কালিদাসের প্রায় সমস্ত কাব্যেই এবং তাঁর পরবর্ত্তী জয়দেব প্রভৃতি অনেক কবির রচনায় আদিরসের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কি মেঘদূতে, কি ঋতুসংহারে অথবা অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত রচনায়, সর্ব্বত্রই আদিরসের বাহুল্য আছে। কারণ

বোধ হয় আমাদের দেশে একটা কাব্যিক সংস্কার প্রচলিত আছে যে আদিরসই হল শ্রেষ্ঠ ও অকৃত্রিম রস। বাস্তবিক পক্ষে তাই বটে, কারণ আদিরসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান ও প্রথমতম রস। তা ভিন্ন, রসসৃষ্টির কার্য্যে রসস্বরূপ বিষ্ণুর অর্চ্চনা বাঞ্ছনীয়; যেহেতু 'মোক্ষমিচ্ছেদ্ জনার্দনাৎ' আর স্বয়ং কামের পিতা 'শৃঙ্গারো বিষ্ণুদৈবতঃ'। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আদিরসের সবিশেষ চর্চ্চা স্বাভাবিক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে যে নরনারীর সঙ্গমই চরম আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতীক বিশেষ। চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের একবিংশ খণ্ডে লিখিত আছে,

"তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ
নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন
বেদ নান্তরং।"

তবে এই সূত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে যদি ঐ মিলন নিষিদ্ধ, পরকীয় অথবা তির্য্যগ্‌গত হয়, তা হলে রসাভাস হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটে। বোধ করি, এই সব শাস্ত্রোল্লিখিত কারণে এবং অংশতঃ দেশের স্বকীয় জলবায়ুর গুণে সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরস শ্রেষ্ঠরস বলে প্রকীর্ত্তিত হয়েছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। উদ্ভট সাহিত্যে আদিরসাত্মক যে শ্লোকগুলি পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে একটু নূতন ধরণের বিশেষত্ব আছে। সে আদিরসের প্রকাশভঙ্গীতে কিছু পরিমাণে শব্দ-চাতুর্য্য আর অবশিষ্ট সবটুকুই অসরল ও আভিমানিক উক্তি। যেমন

"সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

অর্থাৎ যোগ ও বিয়োগ এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনটি ভাল তার বিচার করতে গেলে বিরহই শ্রেষ্ঠ, সংসর্গ নয়। অবিয়োগ অবস্থায় কেবল একমাত্র তাঁকেই দেখা যায়, কিন্তু বিরহে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তন্ময় হয়ে যায়। অথবা

"নৈকতালিঙ্গনে যূনো নিমেষঃ প্রিয়সঙ্গমে
ইত্যেব বিরহঃ সাক্ষাৎ তদন্য পরলৌকিকঃ।"

অর্থাৎ, যুবক যুবতির আলিঙ্গন সময়ে উভয়ের দেহ যে এক হয়ে যায় না, এবং প্রিয়দ্বয়ের পরস্পর মিলনক্ষণে যে নয়নের পলক পড়ে, এ দুটিই সাক্ষাৎ বিরহপদবাচ্য। তা ছাড়া যে বিরহ সে পারলৌকিক, ইহলোকের নয়।

নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বাক্‌চাতুর্য্যের সহিত আদিরসের সংমিশ্রণ হয়েছে,

"কুচৌ লেভে হারং ঘনকঠিনপীনোন্নততয়া
নিতম্বো বিস্তারাৎ কনকময়কাঞ্চীমলভত।
তয়োর্মধ্যদেশো বসননিগড়ৈর্বন্ধনমগাৎ
ন কোঽপি ক্ষীণানাং জগতি কুরুতে সম্ভ্রমপদং।"

অর্থ হল—তরুণীগণের স্তনমণ্ডল অতি কঠিন, স্থূল এবং উন্নত হওয়াতে তাকে কেমন রমণীয় হার ভূষণে অলঙ্কৃত করা হয়; নিতম্বও অতি গুরু সেই কারণে তাকেও স্বর্ণকাঞ্চীতে ভূষিত রাখা হয়। ঐ উভয় দেশের মধ্য স্থলে থেকেও ক্ষীণতা বশতঃ কটিদেশ নীবিপাশে আবদ্ধ থাকে। এতে প্রতীতি হয় যে জগতে দুর্ব্বলের সম্ভ্রম নেই।

জগতের অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্যই বর্ণনাত্মক। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য ও বর্ণসম্পদের চিত্রণ কেবল একটি বৈশিষ্ট্য নয়, তা প্রকৃতই সৃষ্টি। কবিগণের লেখনী কখনও প্রকৃতির শান্ত ও সাহস মূর্ত্তির অঙ্কনে নিযুক্ত হয়েছে যেমন কিরাতে অথবা ভট্টিকাব্যে শরদ্বর্ণনে; আবার কখন বা গম্ভীর রসাত্মক বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে যেমন কালিদাসের হিমালয় চিত্রণে। এ ছাড়া বীভৎস রসের অবতারণাও প্রাচীন কবিরা করেছেন। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় ও ভবভূতির 'মালতী মাধবে' অতি ভয়াবহ শ্মশানের বর্ণনা আছে। আবার উত্তররামচরিতের পঞ্চমাঙ্কে "পাতালোদর কুঞ্জপুঞ্জিততমশ্যামৈর্ভোজস্তকৈঃ" এবং দ্বিতীয়াঙ্কে "কুজৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘূৎকারবৎকীচকঃ" প্রভৃতি শ্লোক দুটিতে মনোহর বাক্যবিন্যাসের সহিত যথাক্রমে প্রকৃতির সংক্ষুব্ধ ও গম্ভীর, ভয়াবহ মূর্ত্তির বর্ণনা সাধিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি ন্যায্য মত প্রকাশিত হতে পারে, যে সংস্কৃত কবিগণ কেবল বহিরঙ্গবর্ণনা নিয়েই

ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের কাব্যে অন্তরঙ্গ বর্ণনার অভাব লক্ষিত হয়। এ মন্তব্য আংশিক ভাবে সত্য। কালিদাসের কাব্যে, বিশেষতঃ ঋতুসংহারে, ভিন্নরূপিণী প্রকৃতির বাহ্যবর্ণনায় তাঁর প্রতিভা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবির বৈশিষ্ট্য কেবল প্রকৃতি বর্ণনে নয়, মানবহৃদয়ের সহিত প্রকৃতির গূঢ় সংযোগ সাধনে। মূক ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের যে সুগভীর ও অশিথিল সংশ্লেষ আছে, এ কথা কবি কদাপি বিস্মৃত হন নি। এই কারণে, রসসৃষ্টির কার্য্যে প্রকৃতির কাছেই শুধু তাঁকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়নি। মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অর্দ্ধস্ফুট আবেগগুলি তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছে। বাহ্য ও স্থূল বস্তুর চেয়ে বিষয়ের অন্তর্লীন প্রতিকৃতি তাঁর কবিতায় বেশী ফুটে উঠেছে। উপমাই তাঁর কাব্যের একমাত্র সারবস্তু নয়, সুন্দর ও সুগভীর অর্থ-রিকাশেও তাঁর বৈদগ্ধ্য প্রমাণিত হয়।

সংস্কৃত কাব্যের আর একটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের মনকে যুগপৎ আকৃষ্ট ও বিদ্বিষ্ট করে। সংস্কৃতে গদ্য-সাহিত্যে বাহ্য-শোভার বাহুল্য আছে। তার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখে অনেক পাঠক পিছিয়ে গেছেন, কিন্তু যিনি প্রকৃত রসলিপ্সু তিনি এরি মধ্যে উপভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। সেকালের গদ্য সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য ছিল না। আখ্যায়িকাগুলিও যথেষ্ট অবকাশের পরিবেষে বিদগ্ধ নরপতির প্রাসাদকক্ষে কথিত হত। সেই জন্যই বোধ হয় সেকালের ভাষাও ধীর ও মন্থর চালে চলত। তাতে গতির চাঞ্চল্য ছিল না, ছিল প্রচুর অবসরের স্থিতিশীলতা। শ্লথ অবকাশের মুহূর্ত্তে মদালসাক্ষীর পরিধান অঙ্গচালনার মতই ছিল তার মৃদু ও দীর্ঘায়িত বিকাশ-ভঙ্গী। যিনি এরূপ কাব্যরস উপভোগ করতে চান, তাঁকে আধুনিকতার বেগমোহ অতিক্রম করে প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ও ভাবের বিশাল প্রসারের ভিতর প্রবেশ করতে হবে। কাদম্বরীর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন যে যিনি এ বিশিষ্ট সাহিত্যের রসভোগে উৎসুক, তাঁকে "মনে করিতে হইবে যে তিনি বাক্যরস-বিলাসী রাজেশ্বর বিশেষ, রাজসভামধ্যে সমাসীন এবং 'সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপ-

লোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ'।" কিন্তু এ সমাস ও বিশেষণ বাহুল্যের মধ্যে থেকেও চিত্রগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। বর্ণপ্রাচুর্য্য থাকলেও চিত্রগুলির সজীবতা ও স্পষ্টতা সংরক্ষিত হয়েছে। সেগুলি সকল জায়গায় হয়ত ধারাবাহিক নয়, তবুও তাদের কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করে।

এ সমাস-বাহুল্যের অন্য একটি কারণও আছে। প্রাচীন সাহিত্যের অপূর্ব্ব ছন্দোবদ্ধ কাব্য কাদম্বরীর কথাই ধরা যাক্। এ গ্রন্থে ভাষার আড়ম্বর, শব্দের ঘটা ও লিপিচাতুর্য্য আছে। কিন্তু কয়েক পঙক্তি ব্যাপী দীর্ঘ সমাসভারগ্রস্ত পদের প্রয়োগ কাব্যের অর্থকে সাধারণের নিকট অধিকাংশ স্থলে দুর্ব্বোধ্য করেছে। বোধ হয় কেবল বাণভট্টের ন্যায় বিচক্ষণ কবিই এই বিপুল পদ রচনার সাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এক হিসাবে এ কাব্য ভীতিপ্রদ নয়, এর রস, মাধুর্য্য ও সুষমা উপভোগের বস্তু। 'সমস্ত' পদগুলি সুদীর্ঘ হলেও সেগুলির গ্রন্থি উন্মোচন করলেই অর্থবোধ হয়। এ ছাড়া এই শ্রেণীর কাব্যরচনার বিশেষ সুবিধা এই যে এতে ক্রিয়াপদের সংখ্যা প্রতিপাদকের তুলনায় অনেক কম। দীর্ঘ বিসর্পিত বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সংখ্যাল্পতাও আরেকটি লক্ষ্য করবার বিষয়। সমাস প্রয়োগের অপর একটি কারণ যে অনভীপ্সিত বিভক্তি বর্জ্জন করেও ব্যাকরণের নিয়ম পালিত হতে পারে। নূতন নূতন 'সমস্ত' বাক্য ব্যবহার না করলে ভাষা সজীব থাকে না, ব্যাকরণের নাগপাশে জড়িত হয়ে তা স্বল্পকালের মধ্যেই আড়ষ্ট ও মৃতকল্প হয়। প্রকৃত কবির রচনায় এ নিগড় শৃঙ্খল নয়, নূপুরে পরিণত হয়।

কাদম্বরীর ভাষাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন সাহিত্যে রীতির প্রাধান্য বেশী ছিল। এ স্থলে রীতির বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয়। যাঁরা উৎসুকচিত্ত তাঁরা শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধগুলি পাঠ করে পরিতৃপ্ত হবেন। রীতি সম্প্রদায়ের প্রধান আলঙ্কারিক

বামন রীতিকেই কাব্যের মূল অঙ্গ বলে নিরূপণ করেছেন—"বিশিষ্টপদরচনা রীতিঃ।" মোটামুটি রীতি দু প্রকারের, গৌড়ী ও বৈদর্ভী। কাব্যাদর্শের প্রথম অধ্যায়ে দণ্ডাচার্য্য বলেছেন,

'শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃকান্তিসমাধয়ঃ। ৪১
ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ
এষাং বিপর্য্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি। ৪২

সংস্কৃত কবিগণ সকলেই এ বিধান পালন করেছেন। তবে কালিদাস ভারবি প্রভৃতি কবিরা 'অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরং' এই নিয়ম স্বীকার করে কাব্যের অকৃত্রিমত্ব রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে রসাভাস ঘটেছিল। পাণ্ডিত্যাভিমানে কবিগণ কেবল চমকপ্রদ শব্দ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে, শ্লেষ প্রয়োগে, এক কথায় শুষ্ক জ্ঞানবিচর্চ্চিকায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গৌড়ী রীতির প্রধৃষ্ট কবিগণ প্রাতিজনীন উক্তি দ্বারা বিপক্ষীয় কবিদের উদ্ব্যস্ত করেছিলেন, বলেছিলেন মূর্খতা নিবন্ধনই তাঁরা এ সব শ্লোকের অর্থ করতে পারেন না, নতুবা প্রসাদ প্রভৃতি গুণরাশিও তাঁদের নিজ কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। সে যাই হোক গৌড়ী রীতিতে সুবন্ধু ও বাণভট্ট এবং বৈদর্ভীতে কালিদাস শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এই দুটি শ্লিষ্ট ও শিথিলবন্ধের মধ্যপথ ছিল পাঞ্চালী রীতি।

বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের বিভিন্ন মত। ভামহ রসকে কাব্যের মূল বলে অঙ্গীকার করেন না, আর রুদ্রট অলঙ্কারকে কাব্যের অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। বামন বলেছেন, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য', ধ্বনিকার বলেন 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'। কুন্তক লিখেছেন 'বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গী' আর নব্যালঙ্কারিকদের অগ্রণী মম্মটভট্টের ধারণা ব্যঞ্জনাই কাব্যের মূল। এ সকল বিতর্ক সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান অনেক উচ্চে। অবশ্য গ্রীক সাহিত্যেও অলঙ্কার বিভাগ ছিল; কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ব্বাচার্য্যগণ অলঙ্কারের যেরূপ সূক্ষ্ম ও দার্শনিক বিচার করেছেন, তা অন্য কোনো সাহিত্যে হয়েছিল

কি না জানি না, তবে সংস্কৃত সাহিত্যকে একটি পরম বৈশিষ্ট্য দান করেছে সে কথা অবিসংবাদিত সত্য।

প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বশেষ বিশেষত্বের উল্লেখ করে প্রবন্ধের উপসংহার করব। সেকালের কবিগণ অতিমাত্রায় আত্মগোপন করতেন। ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য চিরকালই উদাসীন, এই কারণেই তার সুসংবদ্ধ ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। আত্মগুপ্তি এত অধিক ছিল যে কালিদাসের জন্মস্থান ও তারিখ নিয়ে আমরা এখনও নিঃসংশয় হতে পারিনি এবং ভাসের অমূল্য নাটকরত্নাবলি এযাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল; পণ্ডিতবর্গের চেষ্টা ও ধৈর্য্য ব্যতীত সেগুলি বিস্মৃতিগর্ভে সমাধি লাভ করত। অবশ্য সব কবিই যে আত্মলাঘবে প্রয়াসী ছিলেন, একথা বলা যায় না। কারণ অনেক কবির রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগৌরব আছে। সকলেই বিনয়ী কালিদাসের ন্যায় 'ক্বচাল্পবিষয়ামতিঃ', 'তনুবাগ্ বিভবো' অথবা 'উদ্বাহুরিব বামনঃ' ছিলেন না। তবে ভবভূতির মত শ্রেষ্ঠ কবির গৌরববাণীর সার্থকতা আমাদের বোধগম্য হয় কিন্তু 'রাঘব পাণ্ডবীয়' প্রণেতা কবিরাজের মত রচয়িতার বাগাড়ম্বর মাত্র আত্মশ্লাঘাতেই পর্য্যবসিত হয়েছে। বোধ করি কাব্যশিল্পের যুগে কবিরা যে উচ্চাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন সেই তথ্যটি গোপন করবার জন্যই তাঁদের আত্মবিজ্ঞপ্তির এত সকরুণ প্রয়াস।

পরিশেষে এই কথা বলতে চাই, যে সংস্কৃত সাহিত্য ছিল আদর্শ-বাদী। নতুবা এত টীকা, টিপ্পনী ও ভাষ্যরচনা, এত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণয়ন একেবারে ব্যর্থ মনে হয়। এগুলিকে কেবল নিয়মকানুনের নাগপাশ বলে ভাবলে ভুল করা হবে, এগুলি হল সেকালের কাব্য-ব্যাখ্যান ও তার লক্ষণ-বিজ্ঞান। প্রাচীন কবিরা স্বকীয় বৃত্তি ও চর্য্যাকে কত সাদরে বরণ করেছিলেন, নিম্নোক্ত শ্লোকটি তারই উদাহরণ স্বরূপ।

"কবিতা কোমলবনিতা, রসেনবসিতা রসয়তি রসিকং।
যদি সা পততি কঠিনহৃদয়ে, ভবত্যলগ্না প্রতিপদভগ্না॥"

অর্থাৎ, কবিতা ও কোমলবনিতা উভয়েই রসবতী অথবা মাধুর্য্য-

সম্পন্না ও অনুরাগশালিনী। এরা রসিক জনকে পরম প্রীতিদান করে; কিন্তু যদি অরসিকের হস্তে পতিত হয়, তাহলে প্রতিপদেই তারা দুরবস্থাপন্ন ও নিতান্ত অশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত ভাষা আজ জড়ত্ব ও অচলতা প্রাপ্ত হয়েছে। সে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও অন্যান্য জ্ঞানচর্চ্চার উচ্ছেষ মাত্র। কিন্তু তার অপরূপ লিপি-চাতুর্য্য, তার অভিনব বিশেষণ ও সুমিষ্ট সামাসিক বাক্যগুলির ব্যবহারিক সার্থকতা আধুনিক বিদগ্ধ কবিগণের প্রাণবান্ প্রয়াসের প্রতীক্ষা করে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকায় শ্বেত-কৃষ্ণ

জীওফ্রে গোরের রচিত আফ্রিকা ডানসেস্ বইখানি সমালোচনার জন্য পেয়েছিলাম। রচনাটি আফ্রিকার পশ্চিম দেশীয় কাফ্রীদের জীবন চিত্র এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পূর্ব্বাঞ্চলে আবদ্ধ; তবু সম্পাদকের অনুরোধ অঙ্গীকার করে নিই, কারণ গোরের বর্ণিত ফরাসী কলোনী বাসী কাফ্রীর সঙ্গে ইংরাজ আশ্রিত নিগ্রোর অবস্থাগত প্রভেদ ও সাদৃশ্যের একটি তুলনামূলক পর্য্যালোচনা বর্ত্তমান সময়ে প্রনিধানযোগ্য। তাছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে তাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাংবাদিক মূল্যও আজ কিছু কম নয়। বিশেষ করে যখন মুসোলীনির কল্যাণে আফ্রিকার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন ভূখণ্ড অচিরেই আর একটি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির স্নেহাস্পদ হতে চলেছে এবং তদ্দেশবাসীর আশু-অবস্থা-বিপর্য্যয়ের যথার্থ রূপ অবধারণে সহায়তা করে এমন সাহিত্য বাংলা দেশে বিরল।

অবশ্য পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম আফ্রিকার উলঙ্গ ও অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সঙ্গে তাম্রবর্ণ আবিসিনিয়ানদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য যে কতখানি তা বলা কঠিন; কিন্তু শাসকের ঐতিহ্যজ্ঞান ও বর্ণাভিজাত্য যেখানে প্রকট সেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাসিতের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকেনা, এইটাই প্রতিপাদ্য।

বর্ণাভিজাত্যের সমস্যা যে কতখানি জটিল বোঝা যায় ইংরাজের ব্যবহারে। ভারতবাসী এবং নিগ্রোদের সম্বন্ধে সাধারণ ইংরাজের মনোভাব এক নয় যদিও উভয় জাতিই তার মানস চক্ষে সমান নিকৃষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন। ভারতীয়ের ঐশ্বর্য্যময় ঐতিহ্যের কূল কিনারা সে পায় না, তাই এড়িয়ে চলে; নিগ্রো জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি সম্পদ মূর্ত্ত নয়, তাই কাঁচা ভেবে মনোমত করে গঠন করতে চায়। এই মনোভাবটি সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হয়েছে বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ জুলিয়ান হাক্সলীর কয়েকটি কথায়। তিনি 'আফ্রিকা ভীয়ু' বইতে লিখেছেন:

The negroes are willing to learn and have a natural barbaric cleanliness; the Indians do not want to change any of their ways and combine an ancient civilization with squalor.

অনেক ইংরাজ নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের আলেখ্যেও এই বদ্ধমূল সংস্কারের ইঙ্গিত পাই। তাঁরা বলেন নিগ্রো চিত্ত পাশ্চাত্য জাতীয় শিশুর মতই পাশ্চাত্য প্রথায় প্রবর্দ্ধনক্ষম। এর মূলে নিগ্রো ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা বই কিছু দেখি না।

আফ্রিকার অনাহুত অতিথিদের মধ্যে একমাত্র মিশনারী কর্ম্মীই শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক নিঃসঙ্গতা সহ্য করে সুদীর্ঘকাল নিগ্রোদের মধ্যে বাস করে এসেছেন—কোন কোন বিশিষ্ট মহাত্মা তাদের ব্যাধি, তাদের ক্লেদ, মলিনতা অঙ্গে মেখে নিতেও দ্বিধা করেন নি, কিন্তু দেশ বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য-হিতৈষণার মত অভ্রস্পর্শী যাঁদের জীবনের ব্রত তাঁদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়বস্তু এমনই অলৌকিক যে অকিঞ্চিতকর নিগ্রো ঐতিহ্যের অন্তর্গূঢ় প্রাণ-স্পন্দন তাঁদের শ্রবণ-সান্নিধ্যে আসেনা।

স্বার্থান্বেষী ঔপনিবেশিক ও ক্ষণস্থায়ী পশুশিকারীর কথা ছেড়ে দিলে রাজকর্ম্মচারীর কথা মনে আসে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম জীবনে নূতন জগতের অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গাছ পালা ও মানুষের পর্য্যবেক্ষণে মেতে যান। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি বস্তু-বিশেষের গভীরতর অন্তরে প্রবিষ্ট হবার পূর্ব্বেই ক্ষীণ হ'য়ে আসে কর্ম্মক্ষেত্রের আদর্শ-বিবর্জ্জিত কর্ত্তব্যের চাপে—পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের স্তব্ধতায়। সে দেশে দূরাগত বাদ্যভাণ্ডের সমাপ্তি-হীন তালহীন ঝঙ্কার আকাশে বাতাসে অবসাদের দীর্ঘ ছায়া টেনে আনে—স্নায়বিক ধৈর্য্য অবসন্ন হ'য়ে আসে উদ্দেশ্য-বিবর্জ্জিত অর্থহীন সময়ের জীর্ণ শ্লথ চারণে। ফলে অনেকে নিষ্ঠুর নির্ম্মম হ'য়ে পড়েন; কেউ কেউ যৌন-চর্চ্চার মত হীন পরিতৃপ্তিতে নিমজ্জিত হয়ে রসাতলে তলিয়ে যান।

আফ্রিকায় শ্বেতকায় নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের গতিবিধি অবিরত এবং এও স্বীকার্য্য যে তাঁদেরই কল্যাণে নিগ্রো জাতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণ-প্রবাহের

দু-একটি বাহ্য-ধারা সংস্কারকদের চেষ্টা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে—কিন্তু নিগ্রো চিত্তের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা তাঁদের কাজ নয়। তাঁদের কাজ নিগ্রোর সামাজিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আহরণ করা; অস্থি-মজ্জার গঠন ও প্রকৃতির তথ্য সংগ্রহ করা। তাঁদের মধ্যে অনেকে পেশাদার দোভাষীর সাহায্যে পুঁথির মশলা যোগাড় করেন—অনেকে দীর্ঘকাল ভাষাও শিক্ষা করেন, কিন্তু সে দৈনন্দিন সংসার যাত্রার প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। তার অন্তরালে যে সাঙ্কেতিক পরিভাষার প্রচলন আছে তার সম্যক পরিচয় পেতে হ'লে যে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয় সেরূপ অনন্ত অবকাশ তাঁদেরও থাকে না।

যে কোন বড় পাঠাগারে আফ্রিকা সম্বন্ধে বই প্রচুর মেলে; কিন্তু সে সকল সাহিত্যে মানুষ অপেক্ষা শিকারের উপযোগী পশুর প্রশস্তি অধিক থাকে। ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীর পরিকল্পনা অনেক বড় বড় গ্রন্থকার করেছেন বটে, কিন্তু তাতে শ্বেতাঙ্গ-জাতির আভিজাত্য ও দায়িত্বের কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, আর কিছু নয়। একমাত্র গোরেরের রচনা দেখছি ভিন্নতর। তাঁর তথ্য সংগ্রহের প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি প্রথমে আপন বর্ণমর্য্যাদা উপেক্ষা করে বিখ্যাত নিগ্রো নর্ত্তক বেঙ্গাকে স্বীয় গৃহে আমন্ত্রণ করে প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হন এবং পরে একত্রে উত্তর-আফ্রিকা পর্য্যটনে গমন করেন। সৌভাগ্য-ক্রমে কোন স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীর নামে পরিচয়-পত্র গ্রহণ না করে সহযাত্রীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী নগরের বহির্ভাগে রাজবর্ত্ম হতে দূরে– ছোট ছোট গ্রাম হতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর আলেখ্যে কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা আছে যার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই, তবু আমার মনে হয় তিনিই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি নিগ্রো জীবনের প্রচ্ছন্ন ধারাকে পুঁথি-গত করতে পেরেছেন।

কিন্তু গোরের উদার হলেও ইংরাজ। তিনি একই চক্ষে নিগ্রো জাতির স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিণতি দেখতে চান, মিশনারী প্রভাবের আমূল উচ্ছেদ দেখতে চান, ফরাসী আধিপত্যের শেষ দেখতে চান—অথচ চান কেনিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশে শাসন-পদ্ধতির দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা।

গোরেরের উদাহরণ থেকে মনে হয় নিরাসক্তভাবে কোন জাতিই অপর জাতির মঙ্গল কামনা করতে পারে না।

মানব সংস্কৃতির পুষ্টি সাধনে নিগ্রোর কি দেবার আছে বিচার করতে হলে তার স্বভাবের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার আলোচনা করতে হয়। নিগ্রো তার জীবনের নিবিড়তম অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করে নৃত্যের ছন্দে, দেহের হিল্লোলে। অন্তরে পুঞ্জীভূত অপার আনন্দ বা নিবিড় নিরাশা, গভীর দুঃখ বা উদ্বেল প্রেম, তীব্র ঘৃণা বা অসহনীয় ক্রোধ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে অঙ্গলীলার তালে তালে—সে ছন্দের মাত্রা হয়তো অদ্ভুত, সে আবেগের আতিশয্য হয়তো লাবণ্যহীন, উৎকট—কিন্তু আশে পাশের প্রকৃতির সঙ্গে কি বিরাট সামঞ্জস্য! সময়ের অনন্ত বিরতি, দিন রাত্রি অর্থহীন; পল, ঘণ্টা, যুগ অলীক—অধ্যাস। দূরাগত সিংহ গর্জ্জন, ঝিল্লীর আর্ত্তনাদ, অভ্রভেদী বৃক্ষরাজীর মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অশরীরী প্রেতাত্মার সমাগম—দীর্ঘ তৃণগুচ্ছ, জীরাফ, উটপক্ষী, এই সবের সমীপ স্পর্শে পাশ্চাত্য হৃদয় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। অন্তর্লীন প্রতীক উপলব্ধি হবে কেমন করে?

তবু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিগ্রো ভাস্কর্য্য-শিল্পের আকস্মিক পরিচয়ে পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-পরিকল্পনায় প্রচণ্ড আলোড়ন লেগেছিল; রেখার অদ্ভুত ভঙ্গিমা, সমমাত্রিকা, উপকরণের ব্যবহার শিল্প-প্রতিভার নবতর বিকাশ বলে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। গোরের বলেন এক সমমাত্রিকা ব্যতীত সকল গুণই আকস্মিক প্রাপ্ত অর্থাৎ পরিশীলন-শূন্য, তথাপি ব্যঞ্জনার ওজস্বিতা এমনই অপ্রত্যাশিত যে চমক লাগিয়ে দেয়। এই ওজস্বিতার নিদান হচ্ছে আপন ধী-শক্তির উপর অখণ্ড ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস। সেই জন্যেই নিগ্রোকে শিশুর সমতুল্য জ্ঞান করা বাতুলতা—বরং তাকে উন্মাদ বলা চলে, কারণ, তার মনের কাঠামো সময়ের শাসনে বদ্ধ না হওয়াতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একীভূত হয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। নিগ্রোর কাছে স্বপ্ন বাস্তবের মত সত্য, ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস; নিগ্রো জগতে আত্মার গতি সর্ব্বত্র, তার অবস্থিতি অন্তরীক্ষে, জীবে, মৃতে এবং বস্তুতে।

নিগ্রোর ধর্ম্মে কোনো রহস্যনিগূঢ় তর্কবাদ নেই—আছে দুর্ব্বার ভয় ও অসীম ভক্তি।

এ ত গেলো অন্তরের কথা। হৃদয়ের সঙ্গে ব্যবহার একতন্ত্র বলে সমাজ গঠন হয়েছে সুন্দর সরল হয়ে। সাধারণ ইউরোপীয় কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে কোন বিচিত্রতা দেখে না। তারা জানে না যে মুষ্টিমেয় মৃতকল্প পিগ্‌মী ও বুশম্যান ব্যতীত প্রায় সকল আফ্রিকান জাতিই প্রশস্ত ও প্রশংসনীয় সামাজিক বিধি ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের নিজস্ব আইন এবং স্বতন্ত্র বিচার পদ্ধতি, মালিকীয়ানা স্বত্ব, ব্যবস্থা সভা, নীতি শাস্ত্র ইত্যাদি সভ্য জগতের যাবতীয় উপকরণ আছে। তারা জানে না যে নিগ্রো ইতিবৃত্ত সুদূর ঘটনার বৈচিত্র্য দ্বারা পরিশোভিত। নিগ্রো রাজ্যে বৃত্তিভোগী ঐতিহাসিকের কথা তারা শোনেনি।

আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্টতম ছিল কেনিয়ার কিকুয়ু জাতির সঙ্গে। তারা ঘোরতর অসভ্য জাতি। আবিসিনিয়ান, বাগাণ্ডা বা দাহোমিয়ানদের মত কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নেই তাদের। তাদের কথা এখানে বললে যথা-ইচ্ছা-নির্ব্বাচনরূপ অতিরঞ্জনের কারণ থাকবে না।

কিকুয়ু কেনিয়ার উচ্চভূমিতে এসেছে মাত্র তিন শতাব্দীর মধ্যে; কোথা থেকে, কেন—তার কোন হদিশ নেই। কিন্তু তাদের প্রথম অভিযান যখন এলো, সেই গভীর অরণ্যসমাকীর্ণ ভূমিতে বাস করতো গুম্‌রা নামক এক চতুর লোমশ-পগমী জাতি—কলো পিগমীর আত্মীয়। কোন কোন অঞ্চলে বাস করতো ওয়াণ্ডারোবো নামে আর একটি ব্যাধ জাতি। তখন কিকুয়ুও মৃগয়াজীবী ছিল—তারা প্রথমে ওয়াণ্ডারোবোদের নিকট হতে পশু শিকারের অধিকার ক্রয় করে নেয়, পরে, সংখ্যা-নিকৃষ্ট গুম্বাদের ঠেলে দেয় কেনিয়া পর্ব্বতের তুষারাবৃত উচ্চ ভূমিতে কিম্বা আর কোনও মৃত্যুমুখে।

কিকুয়ুরা যে অধিকার ক্রয় করে নিয়েছিল তাকে বলা হতো গিথীকা। গিথীকা প্রথা পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হ'তে হ'তে আজও

অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে—যদিও ইত্যবসরে তারা পশু শিকার ছেড়ে ফসল উৎপাদনে আপন অর্থ নৈতিক ভিত্তি বদল করে নিয়েছে, ঝোপ কেটে জঙ্গল কেটে স্থানটিকে সুগম সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আজও সেই পুরাতন প্রথামত এক একটি গোষ্ঠীর আয়ত্তে ছেড়ে দেওয়া হয় এক একটি গিথীকা অর্থাৎ খণ্ডভূমি, আয়তনে প্রায় পনর একার হ'তে দশ স্কোয়ার মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। সে ভূমির মালিকীয়ানা স্বত্ব গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের এবং গোষ্ঠী-নির্ব্বাচিত কর্ত্তাদের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে ন্যস্ত থাকে। কেবল মাত্র এক খণ্ড ভূমি নিয়ন্ত্রিত থাকে সমবায়ের ব্যবহারার্থে এবং নূতন অংশীদারের আবির্ভাব হ'লে এই অংশ হ'তেই বণ্টন করা হয়।

কর্ত্তাদের মধ্যে থেকে নির্ব্বাচিত এক ব্যক্তির (মুরামাটি) হাতে ন্যস্ত থাকে পরিচালনার ভার। তথা-কথিত সভ্য দেশের অর্থনৈতিক আদর্শে প্রণোদিত মানদণ্ড দিয়ে নিগ্রোর বিষয়-বুদ্ধি নিরূপিত করা যে কতখানি অসম্ভব তা প্রতীয়মান হয় গিথীকার অন্তর্গত অংশ বিক্রয়ের আইন দিয়ে। ব্যক্তি-বিশেষের জমি বিক্রয় করবার অধিকার আছে এবং অনেকে বিবাহের যৌতুক—অর্থাৎ গরু, বাছুর, ছাগল সংগ্রহ করবার ইচ্ছায় স্বীয় অংশ হস্তান্তরিত করে; এবং যথাযথ মূল্য প্রদান করবামাত্র ক্রেতার জমির ওপর অধিকার-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার দিক থেকে ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ হওয়া এমনই গর্হিত যে অভাবনীয়। বিবাহের ইচ্ছা বা আবশ্যকতা প্রকট হলে বিক্রেতা সচরাচর স্বীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন ধনী প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে যখন ইচ্ছা-মূল্য প্রত্যর্পণে বিক্রয় নাকচ হয়। বিচিত্র সে প্রত্যর্পণের মূল্য নির্দ্ধারণ। জমি পতিত থাকলে ক্রেতা ফিরিয়ে পায় তার দেওয়া গরু, ছাগল এবং ইত্যবসরে তাদের যত বংশ বৃদ্ধি হয়েছে, তার সবই। যদি সে ফসল উৎপন্ন করে ভোগ করে থাকে, তাহলে মূল্যের অতিরিক্ত একটি কানা বাছুরও ফিরে পায় না। নিগ্রোর চক্ষু দিয়ে দেখলে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

কিকুয়ুদের বিখ্যাত বাজার হাটের কথা বর্ণনার যোগ্য—কিন্তু

মানস চক্ষে ভেসে উঠছে বিচিত্রতর ছবি—সুন্দর সুঠাম স্কন্ধদেশের নিম্নে আলুলায়িত উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্র পরিহিত বাগাণ্ডা মহিলা, স্বাভাবিক লাবণ্য ও মর্য্যাদা সহকারে রাজপথ দিয়ে চলে যায় মনের আনন্দে—হয়তো মাথার উপরে একটি ছোট কিছু ভার,—দিয়াশালাই কিম্বা ঔষধের বোতল, কিন্তু শরীরের ভঙ্গিমা সম্রাজ্ঞীর মত উদার। পথপ্রান্তে দুই বন্ধুর উচ্চৈস্বরে আলাপন কত সহজ ও সরল। অপরিচিতের সঙ্গে দেখা—সে অভিবাদনও আত্মীয়তায় উন্মুখর—কে কেমন আছে? স্বাগত জিজ্ঞাসার ছন্দ রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তিরও শারীরিক কুশলাদি জ্ঞাপন প্রচলিত প্রথা।

সভ্য জগতের অভীষ্ট লক্ষ্য সাম্যবাদতন্ত্রের সে দেশে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রচলন আছে। অঙ্গীভূত বসন ব্যতীত কোন সামগ্রীর ওপরই ব্যক্তি-বিশেষের স্বত্ব নেই। মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা, যখন বাড়ীর চাকর মালীর অগ্নিকুণ্ডের আড্ডায় গুরুজনের অলক্ষ্যে বসে পশু-পক্ষী জলঝড়ের কত রোমহর্ষক গল্প শুনতাম। সেই সঙ্গে দেখতাম তাদের আহার্য্য প্রস্তুতের ঘটা—অত্যন্ত সাদাসিধা খাদ্য, রাঙাআলু অথবা ভুট্টা-সিদ্ধ—পাক হতো প্রয়োজনের দ্বিগুণ অনাহূত অতিথিদের প্রতীক্ষায়। পথচারী স্বজাতিই হোক অথবা বিজাতিই হোক, সপ্রতিভ ভাবে আসতো, খেয়ে যেতো। প্রথম আলাপনে কদাচিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ পেতো।

মনে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের সেই জাতির কথা যাদের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে 'এজ্‌গ্রুপ্' প্রথা। এখানে সামাজিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ত্তা হচ্ছে পঁচিশ হতে বত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক-সঙ্ঘ—যারা এককালে দীক্ষিত হয়ে যৌবনে গৃহীত হয়েছে। বত্রিশ পার হওয়া মাত্র শাসকদলকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে নবাগত দলের হাতে কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করতে হয়। স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্টতর উদাহরণ কোথায় মেলে? শুনেছি উগাণ্ডায় একটি বাৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠান হয় যখন পল্লীবাসীরা পরস্পরের গৃহকার্য্যে সাহায্য করে। সে কদিন ঘর গড়া বিধি-নিষেধের ও ঘর ভরা দ্রব্য সামগ্রীর উপর নিত্য দখলের অহঙ্কার চূর্ণ করা হয়।

উপরে নিগ্রোর যে জীবন-চিত্রটি সাধ্যমত উদ্ঘাটিত করেছি তার আয়ু বিগতপ্রায়। আজ ভাঙন ধরেছে তার চারিভিতে। অনেকে মনে করেন এ ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ও মঙ্গলকর, কারণ বিমানযানের উদ্ভাবনায় আজ পৃথিবী এতই সঙ্কুচিত যে জগতের যাবতীয় জ্ঞান ও অনুশীলন সম্পদ একত্র হ'য়ে প্রগতির প্রবাহ-ভুক্ত হতে বাধ্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে মিলন হবে যাকে নিয়ে সে মৃত-প্রায়। মিশনারীদের আমি এই কথাই বার বার বলে এসেছি। আমার মনে হয় আফ্রিকায় ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রবেশ মানব ইতিবৃত্তে একটি চরম শোচনীয় ঘটনা।

মিশনারীর প্রবল প্রভাবের কথা কারো অবিদিত নেই। এই প্রবল ধনবল ও লোকবল প্রবলতর শাসকগণের আশ্রয়ে নিগ্রোর মসীলিপ্ত অন্তর-গহনে দাবানলের আলোক জ্বালাতে বদ্ধপরিকর;—কিন্তু নিগ্রো প্রথম মাটির আশ্রয় ছেড়েছে আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে নয়—পাদ্রীর ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক সাধনের প্রতি বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায়। আজ সেদিন আর নেই। ক'য়েক বৎসর হতে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের গীর্জ্জা-সঙ্ঘের মধ্যে যে হীন ও লজ্জাকর প্রতিযোগিতা চলেছে নিগ্রোর শ্রদ্ধা ভক্তি তাইতে সঙ্কুচিত। মিশনারীর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রশংসার্হ এবং নিগ্রো সে জন্য কৃতজ্ঞ—কিন্তু এখানেও উপকার-বৃত্তিটি নিছক শারীরিক কল্যাণ সাধনের মত সাধু উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করে উদ্‌ভ্রান্ত স্বার্থান্বেষণে নিরুদ্ধ হয়েছে। বিদ্যাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে বাইবেল পাঠের নিমিত্তমাত্র—জ্ঞান বিতরণ হয়েছে সাম্প্রদায়িক ছুৎমার্গের প্রাচীর গড়ার কারণ। যখন পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এত প্রকট এর বেশী কিছু আশাও করা যায় না; কিন্তু অসহ্য লাগে যখন শুনি যে টাবোরার সেমিনারীতে এক একটি নিগ্রোকে বিশ বৎসরের ন্যায় দীর্ঘকালের জন্য ভক্তি-রসের জারকে জরিয়ে পাদ্রী তৈরী করা হয়—তাও অধ্যয়নের মিডিয়াম সোহাইলি নয়—ইংরাজীও নয়—একেবারে লাটিন। শোনা যায় যে লাটিন ভাষার কূট তর্কে রোমের বিশিষ্ট পণ্ডিতেরাও এদের কাছে হার মেনে যান।

১৯২৯ সালে কলোনীয়াল অফিসের অনুরোধে জুলিয়ান হাক্সলী পূর্ব্ব আফ্রিকায় যান নেটিভ শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের অনুসন্ধানে। সেখানে একটি কিকুয়ু বিদ্যালয়ের মিশনারী কর্ত্তা তাঁকে গর্ব্বভরে বলেছিলেন যে সে অঞ্চলে কিকুয়ু ভাষাই শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পন্থা অথচ সোহাইলিতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার একমাত্র কারণ পুরাতন টেষ্টামেণ্টটি তখনও কিকুয়ু ভাষায় আদ্যন্ত অনুদিত হয় নি।

বাইবেল অনুবাদে ভাষার বিপর্য্যয় কিছু কম হাস্যোদ্দীপক নয়। একটা উদাহরণ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

আফ্রিকার বহু জাতির মত কিকুয়ুদের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা আছে যে বালক ও বালিকা শৈশব অবস্থা অতিক্রম করবার সময় একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা যৌবনাবস্থায় নীত হয়। অনুষ্ঠানের পর কয়েক বৎসরের জন্য তাদের বিবাহ করবার অনুমতি দেওয়া হয় না, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলবার উৎসাহ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সময় দীর্ঘ—সেই অবসরে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যবাদ, যৌন সম্পর্কীয় অভিজ্ঞান, সামাজিক শিষ্টাচরণ ও দেশভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যায়ন শেষে, বয়ঃপ্রাপ্তির বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ, তাদের একটি অস্ত্রোপচারের ক্লেশ সহ্য করতে হয়।

বালিকার ওপর এই প্রকার অস্ত্রোপচার অনাবশ্যক অত্যাচার সন্দেহ নাই, কিন্তু বংশ পরম্পরায় প্রচলিত এই প্রথা বিদেশীর আকস্মিক হস্তক্ষেপে বিদূরিত হতে পারে কিনা সে বিষয় চিন্তা না করেই মিশনারীরা তাঁদের দীক্ষিত কিকুয়ুদের ওপর আদেশ জারি করে বসেন যে বর্ব্বরোচিত অভ্যাসটি অচিরাৎ পরিত্যাগ করতে হবে। ফলে যে দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাতে মিশনারী নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

নূতন টেষ্টামেণ্টের অনুবাদে 'সার্কামসিশান' অর্থাৎ 'ইরুয়া' কথাটির বার বার উল্লেখ আছে। কিকুয়ু ভাষায় ইরুয়ার অর্থ উভয় লিঙ্গের অস্ত্রোপচার—কিকুয়ুরা ভেবে পেলে না মিশনারীর ধর্ম্মগ্রন্থে যে আচার

সমাদৃত হয়েছে তা তাদের সমাজে গর্হিত বলে গণ্য হবে কোন অপরাধে। এতদ্ভিন্ন ইরুয়া শব্দটি বৃহত্তর অর্থে সর্ব্বাঙ্গীণ অনুষ্ঠানটিকে বোঝায়। মিশনারীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার সংস্কার-চেষ্টা সমুদায় অনুষ্ঠানটির উপর আক্রমণ স্বরূপ প্রতীয়মান হলো, উপরন্তু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো ইংরাজি ভারজিন্ শব্দটির অর্থ নিয়ে। কিকুয়ু ভাষায় ভারজিন্ অর্থব্যঞ্জক কোন শব্দ নেই বলে 'মুইরিতু' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটির কিকুয়ু অর্থ হচ্ছে অনুষ্ঠান-উত্তীর্ণ বালিকা—সুতরাং যীশুর পবিত্র মাতা স্বয়ং যখন অস্ত্রোপচার সহ্য করেছেন তখন মিশনারীর অনুজ্ঞা নিশ্চয় অগ্রাহ্য।

পূর্ব্বেই বলেছি মিশনারীর মধ্যে সহৃদয় কর্ম্মীর অভাব নেই—তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা গোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন দীক্ষিত নিগ্রোদের নীতি-শৈথিল্যের জন্য যারপর নাই ব্যথিত ও অনুতপ্ত—কিন্তু তাঁদের পেশার দোষ একবার কর্ম্মপ্রবাহে গা ভাসালে আর মোড় মেলে না। আবার অনেকে আছেন—দুঃখের বিষয় তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—যাঁরা নিগ্রোর আচার অনুষ্ঠানগুলিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক উন্মূলিত করতে সচেষ্ট। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক স্থানে কোন এক জাতির বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাদের আরাধ্য দেবতার প্রতীক একটি বিশাল বৃক্ষ। তারা সেই বৃক্ষ হতে লতা পাতা এনে গৃহ-দ্বার শোভিত করতো সকল প্রকার অলৌকিক অত্যাচারকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে। মিশনারীরা এসেই নিগ্রোর অন্ধ বিশ্বাস চূর্ণ করবার উপলক্ষে সেই বৃক্ষ কেটে গীর্জ্জা প্রস্তুত করালেন। পশ্চিম যুগাণ্ডায় অনেক স্থানে কুটীর-সম্মুখে ছোট ছোট মন্দিরে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উপাসনা হয়—স্থানীয় মিশনারী সেই সকল মন্দিরকে শয়তানের আবাস বলে দীক্ষিত নিগ্রোদের দিয়ে ধ্বংস করাতে লাগলেন।

কেনিয়াতে দেখেছি মিশনারী ইচ্ছা করলেই অশ্বেতীয় হিথেনদের কর্ম্ম, আতিথেয়তা বা স্ত্রীলাভের পথে কণ্টক রোপণ করতে পারেন এবং করেন। সুতরাং তাঁদের ক্ষমতা অসীম। তথাপি পৃষ্ঠপোষকদের মনরঞ্জনের জন্য দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার এমনই প্রবল প্রতিযোগিতা যে

অজ্ঞান অবস্থায় ব্যাপটাইজ করবার জন্য পাদ্রী হাসপাতালে পর্য্যন্ত ধাওয়া করেন। গীর্জ্জা বনাম ক্রায়িষ্ট প্রসঙ্গ আজও তর্কাধীন—ছলে বলে দীক্ষা প্রদানের সার্থকতা সম্বন্ধে তর্ক তুলে লাভ নেই, কিন্তু গীর্জ্জা-ভুক্ত নিগ্রোর মানসিক অবনতির কথা পাদ্রীরাও স্বীকার করেন।

কথায় কথায় মিশনারী প্রচেষ্টার বর্ণনা একটু বিস্তৃত করে দিয়ে ফেললাম। তার কারণ শ্বেত শাসনযন্ত্রের সঙ্গে গীর্জ্জার প্রভাব নিবিড় ভাবে বিজড়িত।

এইবার ফরাসী রাজ্যের বর্ণনা করি। আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার আয়তনে বিশাল কিন্তু উত্তর প্রান্ত মরুভূমি হওয়ার জন্য প্রায় লোকশূন্য। পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে স্মরণে রাখা উচিত যে ফরাসী চরিত্র স্বভাবতঃই কুণো অর্থাৎ বাঙ্গালীর মত ঘরমুখো। সেইজন্যই বোধ করি উপনিবেশ পরিচালনায় কোন ঐতিহ্য বা অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠেনি তাদের প্রকৃতিতে, তবু অন্যজাতির সঙ্গদোষে ঘাড়ে ঝুঁকি যখন এসে পড়েছিল তখন নেপোলিয়ানের বাঁধা কতকগুলি মোটামুটি শাসন প্রণালীর সামান্য কিছু সংস্কার করে ফরাসী আফ্রিকার রাজ্য শাসনের গোড়া পত্তন হয়। আজ অবধি শাসন-যন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত হলোনা—অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ও আনুষঙ্গিক অসন্তোষ চিরস্থায়ী হয়ে রইল। রাজকর্ম্মচারীর দৈন্যও সেই অনুপাতে প্রকট হয়ে রইলো; অথচ কাজের চাপ আর কর্ত্তৃপক্ষের কর আদায়ের তাগিদের বিরতি নেই। তার ওপর প্রাকৃতিক আবহাওয়াও শ্বেতাঙ্গের প্রতিকূল।

এই সকল কারণে প্রকৃত ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিকে পশ্চিম আফ্রিকা কখনও আকৃষ্ট করতে পারে না। উচ্চপদের চাকুরী সচরাচর পূরণ হয় সঙ্গতিপন্ন তপ্ত মস্তিষ্কের দ্বারা যাদের স্বদেশবাস প্যারিসের মন্ত্রীসভাকে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। নিম্নস্তরের পদগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ দরিদ্র ছাত্রের দ্বারা পূরণ হয় যাদের দেশত্যাগ করা ব্যতীত অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন উপায়ই থাকেনা। ১৯২৭ সালে প্রথম শ্রেণীর অবিবাহিত কর্ম্মচারীর বাৎসরিক বেতনের হার ছিল মাত্র দুইশত পাউণ্ড

—পরে আরও নাকি হ্রাস হয়েছে। এর উপর ফরাসীর স্বাভাবিক মিতব্যয়িতা যোগ হলে অত্যাচার বর্ত্তায় শাসিতের ওপর। নিগ্রো ব্যবসায়ীর প্রতি আজ্ঞা জারি হয় যে তারা য়ুরোপীয় খরিদ্দারকে আহার্য্য দ্রব্য বাজার দর অপেক্ষা তিন ভাগ অল্প মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য—এই সুবিধার জন্য অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে বাণিজ্য-স্পৃহা এমন প্রবল ভাবে জাগরূক হয়ে ওঠে যে মসিয়ে কার্দ্দে ১৯২৪ সালে, বাধ্য হয়ে বিধান করেছেন যে কোন কর্ম্মচারী দুই টার্ম্মের অধিককাল এক কলোনীতে থাকতে পারবে না। ফল দাঁড়িয়েছে হিতে বিপরীত। আজ প্রায় কোন কর্ম্মচারী নিগ্রোভাষা শিক্ষার ক্লেশ স্বীকার করেন না, অথবা নিগ্রো সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন না। তাঁরা মনে করেন যে ক্লেশলব্ধ জ্ঞান যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার অবসর নেই তখন বৃথা কাল-ক্ষেপে লাভ কি। এই একই কারণে সেই দেশের উন্নতির চেষ্টায় কোন সঙ্কল্পের পরিকল্পনা হয় না। রাজ্য শাসিত হয় কতকটা দোভাষীর ব্যাখ্যা ও অভিরুচির ওপর। এক একটি প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার স্বৈরাচারে প্রজাবর্গ আতঙ্ক-বিহ্বল কিন্তু আপিলের কোন পথ নেই। গোরের বলেছেন: Most of the French administrators I met were not bourgeois turned gentille-homme: they were petit bourgeois turned Caesars.

স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্যারিস কোন প্রতিবাদ করতে পারে না; তার কারণ প্যারিস জানে যে কর আদায়ের অঙ্ককে উচ্চস্তরে রাখতে হলে এবং কৃষ্ণকায় সৈন্যবাহিনীর উদর পূরণ করতে হ'লে কয়েকটি অমানুষিক অত্যাচারের প্রবর্ত্তনা অনিবার্য্য, সুতরাং শাসন-কর্ত্তা যদি তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচিকে একটু বিচিত্রতর করে বিন্যাস করেন তার জন্য অস্থির হবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া অত্যধিক কাজ, অত্যল্প আয় ও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু—এই ত্রিত্বের প্রভাবে স্নায়বিক অধৈর্য্য আসা স্বাভাবিক।

অনেকে নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্র কয়েদী শ্রমিক হচ্ছে P. W. D.র বিনা বেতনের লোকবল এবং সে হতভাগ্য

দেশে শ্রমিকের অভাব হ'লে করের মাত্রাধিক্য করা হচ্ছে প্রচলিত রীতি। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার কর্ত্তারা কর আদায়ের বেলায় অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে শ্রম গ্রহণ করেন—অর্থাৎ অর্থ প্রত্যাখ্যান করা তাঁদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণও তাঁদের অভিরুচি।

সাধারণ করের হার মাথা পিছু ছয় হ'তে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক সঙ্গতির সরকারি হিসাব অনুযায়ী ধার্য্য হয়েছে। নিছক কায়িক পরিশ্রম দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করা সাধারণ নিগ্রোর পক্ষে দুঃসাধ্য, সুতরাং বছরের পর বছর কর আদায়ের সময় অমানুষিক অত্যাচারের আবর্ত্তন হয়।

কঙ্গো-ওসান-রেলপথের নির্ম্মাণ-কার্য্য স্মরণ করে আলবের্ট লোঁড্রে বলেছিলেন যে এক একটি স্লীপার এক একটি মৃত নিগ্রো শ্রমিকের প্রতীক; ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার উৎকৃষ্ট মোটর পথে কোন স্লীপার পাতা থাকলে হয়ত ঐ কথাই শুনতে হতো—কারণ ক্ষুদ্র হাতলের টাঙ্গী ব্যতীত কোন যন্ত্র সম্বল না করে যে শ্রমিকের দল কাজে নেমেছিল, তাদের বেতনের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয়েছিল যে পরিমাণ ও যে প্রকৃতির খাদ্য কোন সারময়ে তাই খেয়ে জীবিত থাকতে পারতো কিনা, গোরের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সেখানকার নিগ্রোদের আর একটি নিরন্তর বিভীষিকা হ'চ্ছে সৈন্যবাহিনীর অসীম ক্ষুধা। মহাযুদ্ধের সময় আঠার হতে পঁইত্রিশ বছর বয়সের প্রত্যেক পুরুষ প্রেরিত হয়েছিল জার্ম্মান অনলের আহুতি স্বরূপ; আজও মনুষ্য-শিকার চ'লেছে।

এই আত্মদানের বিনিময়ে ফরাসী-সভ্যতা তাকে কি দিয়েছে? গোরের কথনচ্ছলে ব'লেছেন—but the brutal and abusive manner in which the French treat them in every occasion, and the systematic way in which they are cheated in every transaction which the cheaters quite erroneously believe their simplicity prevents them from realising that

actually it is their fear or their experience with the results of complaints which keep them apparently quiet.

ইংরাজের পূর্ব্ব-আফ্রিকায় অধিকার-বিস্তার আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ভাবে হয়নি। অন্তঃসঙ্গতির বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে যখন সে সাম্রাজ্য বিস্তারে নেমেছিল তার বিজয়-উন্মাদনার অন্তরালে ছিল সাধন-সুকঠিন সংযম ও কর্ম্ম-প্রেরণার উৎসাহ। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্ম্মিবৃন্দ প্রবুদ্ধভাবে চেয়েছিল মাতৃভূমির সুমহান পরিণতি। বর্ণী-ভিজাত্যের উগ্রতা নিহিত ছিল উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদে। ইংলণ্ডের সুধী-জন কল্পনাচক্ষে দেখেছিলেন এক গৌরব-রঞ্জিত সুদূর ভবিষ্যৎ যখন তাঁদের জাতীয় প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রকাশ প্রস্ফুট হয়েছে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত নিগ্রোর প্রতীকে।

কিন্তু সেদিন বিগত। আজ ইংলণ্ডের সুধীজন কল্পলোকে দেখেন কেনিয়া হ'তে তাঙ্গানিকার মধ্যে দিয়ে নায়াসাল্যাণ্ড, এবং রোডেসিয়া হয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা পর্য্যন্ত এক বিরাট "শ্বেত মেরুদণ্ড"—যাকে পুষ্ট করবার জন্য সংরক্ষিত থাকবে নিগ্রো শোণিত, যার বাতাস পরিশুদ্ধির জন্য বিতাড়িত হবে ভারতীয়।

আজও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর অন্তঃস্থ আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হয়নি,—মাতৃভূমির গৌরব কামনায় সে আজও আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত; কিন্তু তার বিশ্ব পরিকল্পনার ব্যাস সার্ব্বজনীনতা হ'তে স'রে গিয়ে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বাদে নিবদ্ধ হয়েছে বলে সে বিজাতীয় প্রজাবর্গের বিশ্বাস হারিয়েছে।

সেদেশে ইংরাজ শাসন পদ্ধতি 'ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের' ন্যায়নিষ্ঠ আস্তরণে মণ্ডিত এবং বাহ্যতঃ ফরাসী-শাসন যন্ত্র হতে অনেক উন্নত কিন্তু শাসিতের সঙ্গে শাসকের আন্তরিক টান যদি সাফল্যের পরিচায়ক হয় স্বীকার ক'রতে হবে যে আফ্রিকার গগনে ইংরাজের অভ্যুদয় বিফলতর হয়েছে। খোলাখুলি নিষ্ঠুরতা হতে অর্থ নৈতিক আধিপত্য চিরস্থায়ী করবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস যে অধিক দূষণীয় সে অভিজ্ঞতা আজ ভারতীয়

মাত্রেরই হয়েছে। তাছাড়া ফরাসীর নিষ্ঠুরতা যতই নৃশংস হোক না কেন, পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল জনসঙ্ঘ তার প্রতিঘাতে তাসমানিয়ার মুষ্টিমেয় দুর্ভাগাদের মত বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে না। একদিন নিশ্চয় আসবে যখন নিষ্ঠুরতার বহ্নিশিখা আপনি আপনাকে দগ্ধ ক'রে অবসন্ন হয়ে পড়বে। তখন হবে নিগ্রোর উত্থানের সময়। ঈশ্বরদত্ত প্রতিফলের ইঙ্গিত করছি না। কারণ কে না জানে যে সে-স্পেন আজও বেঁচে আছে যে এককালে বিজিত ইণ্ডিয়ানদের পেরুর খনি-গহ্বরে অমানুষিক অত্যাচার ক'রে খাটিয়েছিল। যে বেলজিয়ান ও পর্তুগীজ দাস ব্যবসায়ীরা কাফ্রীদের ওপর অসহনীয় নির্য্যাতন করে প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছিল, তাদের বংশধরেরা আজও আভিজাত্যের বিলাসে জীবন যাপন করছে। যে মার্কিন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বুনোমহিষ নিঃশেষ ক'রে রচনা করেছিল রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের রিসার্ভ অর্থাৎ অন্তিম শয্যা, সেই আবার হয়েছিল আন্তর্জাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

আফ্রিকান্ নিগ্রোর প্রাণ-প্রবাহ নিছক পাশবিকতার সংঘাতে নিঃশেষ হবার নয়—ফরাসীর শোষণ বড় জোর শাসিতের হৃদয়ে বিদ্রোহ বা আতঙ্কের সৃষ্টি করে প্রগতির স্বাভাবিক গতিকে শ্লথতর করে আনে, কিন্তু ইংরাজ তার অভিসন্ধিকে হিতৈষণার বাহ্যাড়ম্বরে এমন সুচারুভাবে অবগুণ্ঠিত করে, মনে হয় যেন বেচারাদের জন্য মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত; তারপর কোন্ অবসরে দৃষ্টির অন্তরালে দেহের এক একটি তন্তু ছিন্ন হ'য়ে যায় কে তার সংবাদ রাখে ?

কেনিয়ার অধিকাংশ শ্বেতকায় রাজকর্ম্মচারী শিক্ষিত, হৃদয়বান্ ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। কিন্তু স্বজাতির স্বার্থ যখন নিয়ন্ত্রিত এবং কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারিত তখন তাদের ব্যক্তিগত মতামত মূল্যহীন। অনেকের অন্তরের বিদ্রোহ পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ পায় পর্য্যটকের দিন-পঞ্জিকায় বিধৃত কথোপকথনে, কিন্তু কর্ম্মজীবনে কার্য্যের শৃঙ্খলা অটুট রাখাই তাঁদের জাতীয় সৌকর্য্য। একাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারী খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন যে নিগ্রোকে শিক্ষার প্রথম স্তরে ইংরাজী কেতাবে পুষ্টি করলে ফল হয় শোচনীয়। কিন্তু তাঁরাই কার্য্যক্ষেত্রে আদর্শবাদ পরিহার

করেছেন যখনই প্রতীয়মান হয়েছে যে ভারতীয়দের বিতাড়িত ক'রতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর নিগ্রো কেরাণী।

অবশ্য বর্ণাভিজাত্যের আতিশয্যে কেনিয়ার বিচারালয়ে, পথে, ঘাটে, ন্যায়ের ব্যত্যয় প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। কিন্তু সে এতই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার যে দোষাবহ বলে মনে হয় না। অন্ততঃ আমি এ-ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য-জাত অন্যায় বিচারকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলে ধরে নিয়ে ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে হৃদয়বান বলেছি। যে দেশে শিক্ষা প্রদানে ব্যয়ের বৈষম্য মাথাপিছু চারিশত গুণ সেখানে সাধারণ প্রচলিত মাপকাঠির প্রয়োগ চলে না।

এখন বিচার্য্য যে "শ্বেত মেরুদণ্ড" প্রতিষ্ঠার সংকল্প যখন কার্য্যে পরিণত হবে এবং যখন শ্বেত ঔপনিবেশিক সংখ্যায় অপর্য্যাপ্ত হওয়ায় শ্বেত-কৃষ্ণে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বাধবে, তখন ইংরাজ সরকার কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করবে। কেনিয়ার মুষ্টিমেয় শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকরা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের জন্য পীড়াপীড়ি সুরু ক'রে দিয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনায় কৃষ্ণকায়দের বস্তিবাসী মজুরের অতিরিক্ত সম্পদসম্পন্ন কোন স্থান নেই। অনেকে মনে করেন বিলাতের প্রভাব যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে নিগ্রোর ফসল উৎপন্ন করবার অধিকার অন্ততঃ হস্তচ্যুত হবে না। এ ধারণা যে কতখানি ভ্রমাত্মক নিম্নোক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে পরিষ্কার বোঝা যায়।

কিলিমানজারো পর্ব্বতের ঢালুর ওপর চাগাজাতির আবাসভূমি। সেখানে জমির উর্ব্বরতা কফি চাষের উপযোগী বলে তারা যুদ্ধারম্ভের কিছু পূর্ব্বে 'রবুস্তা' ও 'এরাবিকা' কাফির চাষ আরম্ভ করে। যুদ্ধ শেষে যখন জার্ম্মাণ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে বহু ইংরাজ ঔপনিবেশিককে সরকার হ'তে অল্প মূল্যে জমি প্রদান করা হয়। তার পর তাদের উৎপন্ন কফি যখন বাজারে নিগ্রোর প্রতিযোগিতা পেলো সমগ্র পূর্ব্ব আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ মণ্ডলীর মধ্যে উত্তেজনার অবধি রইলো না। তাঙ্গানিকা Mandated Territory, সুতরাং সরকার সরাসরি নেটিভ্ চাষ বন্ধ না করে কতিপয় বিশেষজ্ঞকে একত্রিত ক'রে শ্বেতাঙ্গ

চাষীর অনুযোগের যথার্থতা—(অর্থাৎ নেটিভ্ চাষ জঞ্জাল ও পোকা মাকড়ে পরিপূর্ণ সুতরাং উচ্ছেদ-যোগ্য) অনুসন্ধান ক'রতে লাগিয়ে দিলেন। বিশেষজ্ঞরা রায় প্রকাশ করলেন যে চাগা জাতির কফি চাষ যে কোন শ্বেতকায় চাষীর বাগান অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট। কেনিয়ায় সরকারী কৃষি কমিটি তৎক্ষণাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে সরকারকে পরামর্শ দিলো যে যদিও আইনতঃ নেটিভদের কোনও বিশেষ ফসলের চাষ বন্ধ করানো সম্ভবপর নয়, তবু বাৎসরিক দশ পাউণ্ড করে লাইসেন্স ফী ধার্য্য করে দিলে কলমের এক খোঁচাতেই পনের আনার অধিক নেটিভ চাষীকে মাটি হ'তে উৎক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে মাসাই প্রদেশের মানচিত্র। সর্পসম অদ্ভুত আঁকা বাঁকা রেখা দৃষ্ট হয় সীমান্ত প্রদেশে—কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে জানা যায় যে শ্বেতকায়দিগের জন্য সংরক্ষিত ভূমিতে সমুদায় জল নির্গমের উৎসগুলিকে স্থানান্তরিত ক'রতে গিয়ে সীমান্তের ঋজু রেখা বঙ্কিম হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

বিজাপুরের বাদশাহী আমলের ইমারৎ সম্বন্ধে গবেষণা একটু বেশী মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে। পাঠক হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন। তবু আর একটি সাবেক ইমারতের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। এই ইমারতের নাম আসার মহল। এর আগে নাম ছিল দাদ মহল, কেন না তখন এইখানে রাজ্যের প্রধান আদালত বসত। পরে যখন মহম্মদ আদিল শাহ হজরৎ পয়গম্বরের শ্মশ্রুর দু চার গাছি কেশ সংগ্রহ করে এই মহলের এক কামরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন থেকে এর নূতন নাম হল আসার (Relic) মহল, আর, এটা একটা পবিত্র পীঠস্থান বলে গণ্য হতে লাগল। বিজাপুরে এই মহাপুরুষের শ্মশ্রুর কেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নেই। কিন্তু কয়েকবছর পরে সিন্ধের রোহরী শহরে বার মুবারক (Sacred Hair) বলে আর-এক মন্দিরে দেখেছিলাম। মন্দির লোকে লোকারণ্য। ধূপের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। স্তোত্রগানের গুরুগম্ভীর স্বরে মন্দিরের চূড়া ধ্বনিত। এই আবেষ্টনের মাঝে যখন প্রধান মুল্লা ইসলাম-গুরুর পবিত্র কেশ বার করলেন, তখন আমাদের মতন বাজে লোকেরও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, চোখ ভারী হয়ে এল।

আসার মহল বাড়ীখানা আমার সময়ে বেশ ভাল অবস্থাতেই ছিল, প্রায় ভাঙ্গে চোরে নেই। এর দোতালায় একটা কামরায় অনেক সেকেলে গালিচা ইত্যাদি আসবাবপত্র রাখা থাকত। তারই একটা গালিচার নকশী নকল করে বিজাপুর জেলের বিখ্যাত লাল রঙ্গের Prayer Carpet, পূজার আসন, তৈরী হয়ে দেশ বিদেশে চালান যেত। কিন্তু এই মহলের বিশেষত্ব আর এক কারণে। দোতলায় অনেক কুঠরীর দেওয়ালে অতি সুন্দর নানা রঙ্গের ছবি আঁকা ছিল। আলম-

গীর বাদশাহের হুকুমে সেই চিত্রগুলি, বিশেষ করে মহম্মদ আদিল শাহের প্রতিমূর্ত্তি, নষ্ট করা হয়। দিল্লীর বাদশাহ বিজাপুরে শুধু যে এই একটা নিরর্থক ধ্বংসের কাজ করেছিলেন, তা নয়। নগর অবরোধের সময় বিখ্যাত সমাধি মন্দির ইব্রাহিম রোজার এক অংশও তিনি তোপ মেরে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আদিল-শাহীর পতনের পরে মোগল বাদশাহের বোধ হয় রাগ কতকটা পড়ে গেল, কেন না তিনি দয়া করে রোজার এই ভাঙ্গা অংশ মেরামত করে দিলেন। কিন্তু আসার মহলের ছবি যেমনকার তেমনি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রইল। কে জানে, হয়ত মুসলমান ধর্ম্মমন্দিরে মানুষের মূর্ত্তি আঁকা দেখে অতি-ভক্ত মোগল ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিজাপুরে থাকতে কেবলই মনে হত যে মূর্খ মোগল দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলো ধ্বংস করবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়েছিল, কেন এই পাগলামি করতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনলে? আমার এক দরজী ছিল। সে উত্তর ভারতের গোঁড়া মুসলমান। নিতান্ত ভালমানুষ হলেও দিল্লীর অতীত গৌরবে তার মনপ্রাণ সদাই মশগুল থাকত। তার ভাবটা ছিল এই রকম—ভারী ত বিজাপুর রাজ্য, আমাদের বাদশাহ এসে কেমন সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছলেন! তার কথায়বার্ত্তায় এই ভাবটা কেবলই ব্যক্ত হয়ে পড়ত। তাই বিজাপুরের বাজারে নেটিব মুসলমানদের সঙ্গে বেচারাকে অনবরত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করতে হত। আমার কাছে এসে ক্রমাগত নালিশ করত যে এই সব বেতমিজ ছোটলোকদিকে হুজুরের এজলাসে মোকর্দ্দমা করে সে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেবে। শেষ, একদিন বাজারে খুব মারধর খেয়ে লোকটা একেবারে হিন্দুস্থানমুখো হয়ে পলায়ন দিলে। আর ফিরল না। আলমগীরের বিজাপুর অভিযানের ফল কতদূর গড়াল,দেখুন।

দিল্লীর মোগলেরা কি ভাবতেন জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বিজাপুরের আদিল শাহেরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে কি করে রাজ্য চালাতে হয়, তা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। আগেই বলেছি যে প্রথম বাদশাহের মহিষী ছিলেন হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়া।

এ কথাও বলেছি যে আর্ক কেল্লার মাঝে একটি পুরানো হিন্দু মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ এমনও বলেন যে বাদশাহেরা সময়ে অসময়ে সেই মন্দিরে পূজা দিতেন। বিখ্যাত ইব্রাহিম আদিল শাহ জগৎগুরু এই হিন্দু-নাম নিয়েছিলেন। তাঁর আমলের অনেক কাগজ পত্রের উপর "শ্রীশ্রীসরস্বতী জয়তি" এই পাঠ দেখা যায়। এই জনপ্রিয় সুলতান ফারসী ও কানাড়ী মিলিয়ে এক নূতন ভাষা তৈরী করে তাতে স্বয়ং কবিতাদি লিখে গেছেন। কিন্তু শুধু এই সব কারণেই আমি আদিল শাহী সুলতানদিকে প্রজারঞ্জন বলছি না। বিজাপুর অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে বিনষ্ট কোন মন্দিরেরই চিহ্ন আমি দেখি নেই। সে প্রদেশের বাসিন্দা ছোট জাতের হিন্দুরা যে কখনও অত্যাচার জুলুমের ভয়ে দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছল, তারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেনাপতি আফজল খান শিবাজীকে সাজা দিতে বেরিয়ে যখন তুলজাপুরের ভবানী মন্দিরের অবমাননা করলেন তখনই না বিজাপুরের ব্রাহ্মণ পেশোয়া শিবাজীর কাছে দূত পাঠালেন! সে পর্য্যন্ত তিনি বা ক্ষত্রিয় সেনানীরা কোন রকম নিমক-হারামী করেন নেই। এই জেলায় দুবছর ঘুরতে ঘুরতে আদিল শাহীদের দেওয়া দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদির কত দলিল যে দেখেছিলাম তার সংখ্যা নেই। কিন্তু এ সকলের চেয়ে এক আশ্চর্য্য জিনিস আমার নজরে পড়েছিল এক দূর পল্লীগ্রামে। গাঁয়ের বাইরে এক টিলার উপর পীরের সমাধি। আর টিলার ভিতরে ভূগর্ভে গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি। সমাধি ও লিঙ্গ দুই স্থানেই নিয়মিত পূজা চলছিল, যখন আমি সে গ্রামে গেছলাম। তার পর দেখুন, বিজাপুরের নগর প্রাচীরের উপর মলিক-ই-ময়দান বলে যে প্রকাণ্ড তোপ বসান রয়েছে, হিন্দুরা ফুল-সিন্দুর দিয়ে সেই তোপের আজও নিত্যপূজা করে থাকে। তোপটার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে যে কার্জ্জন লাটসাহেব এই তোপের উপর বসে ফটো তুলিয়েছিলেন। আলমগীরের মাথায় বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয়ের এত জেদ চেপেছিল বোধ হয় এইজন্য যে এ রাজ্য-গুলো ছিল হিন্দুঘেঁসা।

পাঠকের হয়ত মনে আছে যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি বিজাপুরাদি দক্ষিণের পাঁচ মুসলমান রাজ্য মিলে বিজয়নগরের মহা-পরাক্রান্ত হিন্দুরাজাকে তালিকোটার যুদ্ধে হারিয়ে দেন। যুদ্ধের পর হিন্দু রাজার কাটা মুণ্ডটা দখল করলেন আহম্মদ নগরের নিজাম শাহ। তিনি সেটাকে বল্লমের মাথায় বিঁধে নিয়ে গিয়ে তাঁর রাজধানীর ফটকের উপর লাগিয়ে দিলেন। বিজাপুরের আদিল শাহ করেন কি? তাঁরও ত একটা মুণ্ড চাই? তাই তিনি রামরাজার এক পাথরের মুণ্ড তৈরী করিয়ে সেটাকে এনে আর্ক কেল্লার ফটকের মাথায় লটকে দিলেন। একথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা আছে। কিন্তু পরে সেই পাথরের মুণ্ড যে কোথায় গেল, তার কি হল, তা দেড়শো দুশো বছর অবধি কেউ কিছু জানত না। আমি বিজাপুর যাবার বছর খানেক আগে এক ব্যাপার ঘটল। তাজবাউড়ী বলে সহরের যে প্রধান ইঁদারা আছে, সেটা অনাবৃষ্টিতে প্রায় শুকিয়ে গেছল। তার পঙ্কোদ্ধার করতে করতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরা তলার কাদা পাঁকের মধ্যে পেলেন এক প্রকাণ্ড পাথরের মাথা। পুরানো ছবি ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন যে ওইটাই সেই রামরাজার মুণ্ড যা তালি-কোটার যুদ্ধের পর আদিল শাহ তৈরী করে এনেছিলেন। স্থির হল যে সম্ভবতঃ মারাঠারা রাগের মাথায় ওটাকে তুলে জলে ফেলে দিয়ে থাকবে। এখন সে মাথা কোথায় আছে তা ঠিক জানি না। তবে তখনকার দিনে আমাদের আনন্দ মহলের নীচে এক কুটুরীতে অন্যান্য পুরানো পাথরের সঙ্গে রাখা থাকত। সাহেব সুবো অনেকে এসে দেখে যেতেন।

ইতিবৃত্ত, পুরাতত্ত্ব নিয়ে মিথ্যা অনেক জটলা করলাম। এইবার আবার নিজের কথা বলি। আহমদাবাদ ছিল বড় সহর। সেখানে থাকতাম ইংরেজ-পল্লী ও ক্লাব থেকে বহুদূরে। মনের মতন দেশী বন্ধুও সেখানে বিস্তর জুটেছিল। তাই ইংরেজী সমাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আহমদাবাদে হতে পারে নেই। কিন্তু বিজাপুর ছোট জায়গা। সাহেবী সমাজ মানে জনা ছয় সাত মাত্র কর্ম্মচারী। আনন্দ মহলেই

ক্লাব, আনন্দ মহলেই আমার বাস। কাজেই এখানে এসে রীতিমত সাহেব বনে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজী সমাজে মেলামেশার ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। ইংরেজ বললেই ত আর জুজু বোঝায় না! হাকিমী মুখোসের আর সরকারী উর্দ্দীর পেছনে যে মানুষটা থাকে, তার দেহে দয়ামায়া যা আছে, তা আমাদের চেয়ে ত কম নয়ই, বরং এমন কতকগুলো গুণ আছে যা আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ। তবে সব সময়ে এ সব কথা ত মনে থাকে না! তাই মাঝে মাঝে একটু আধটু ঠোকাঠুকি লেগে যায়। এ ঠোকাঠুকির জন্য শুধু ইংরেজের দম্ভই যে দায়ী, তা নয়; আমাদের দৈন্য, আমাদের হীনতাও কম পাঞ্জী জিনিস নয়। এ সব ব্যাপারের আলোচনা অপ্রিয়, কিন্তু সত্য কথা আর সব সময় প্রিয় কি করে হবে!

বিজাপুরে এসে যাঁকে আমার বড় সাহেব বলে পেলাম, তিনি বয়সে প্রবীণ আর চরিত্রে একেবারে আসল জন্ বুল। মনে খল কপট এতটুকু ছিল না। বর্ণভেদ-জ্ঞানও অতি সামান্য। তাঁরই কথা আগে বলেছি যে কার্জ্জনলাটের শুভাগমন উপলক্ষে এক ছোটখাটো Guide Book লিখিয়ে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু ছেলে ছোকরাকে একেবারে হেয় জ্ঞান করতেন। আমি ত তখন সবে দু বছরের সিবিলিয়ান। আমাকে পিঠ চাপড়ে বললেন, "ভাল করে কাজ কর্ম্ম শেখ, আপাততঃ তোমাকে একটা ছোট মহকুমার ভার দেব।" বলা বাহুল্য কথাটা আমার খুব মিষ্টি লাগল না। তবে বুড়ো মানুষকে বলিই বা কি? কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্যতঃ পাল্টা জবাব দেওয়ার সুযোগ মিলল। আমি বিজাপুর আসার ঠিক আগে কালেক্টার D. ও তাঁর সিনিয়ার সহকারী দুজনে একমত হয়ে এক মামলতদারকে (Sub-Deputy) ঘুস খাওয়ার অপরাধে বরতরফ করে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালানোর অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কমিশনারের কাছে। কমিশনার সাহেব আমাকে হুকুম দিলেন—তুমি নূতন লোক, তোমার কোন পক্ষপাত নেই, তুমি সব সাক্ষীসাবুত নিয়ে তোমার মতামত রিপোর্ট কর। আমি এক মাস ধরে

খুব খুঁটিনাটি রকম বিচার করে আমার রায় পেশ করলাম যে মামলত-দার সাহেব কোন কোন ব্যাপারে নিজের বন্ধু-বান্ধবের অযথা সুবিধা করে দিয়েছেন বটে, তবে ঘুস খেয়েছেন এ কথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। D. খুব চটে গেলেন। আমাকে ধমকালেন, "লোকটা ঘুস নেয় নেই, তুমি কি করে জানলে। যত সব ছেলেমানুষ—!" কমিশনার কিন্তু আমার মতই গ্রাহ্য করে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাতে দিলেন না। এতে আমার একটু খাতির বাড়ল বই কি!

D. র আর এক বড় দোষ ছিল। জেলা সংক্রান্ত কোন জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হলে, দুজন প্রবীণ ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন, তাঁদের ডাকতেন। আমি বা আমার সহকর্ম্মী T কে কস্মিন কালেও কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। প্রথমে আমার মনে হত যে আমি স্বদেশী রঙ্গীন সিবিলিয়ান বলে কর্ত্তা আমাকে এই হেনস্তা করছেন। কিন্তু পরে T'র মুখে শুনলাম যে তারও সেই দশা। সে আমার চেয়েও জুনিয়ার ছিল। কখন কখনও আবার D. করতেন কি, আমাদের অধীনস্থ মামলতদারদিকে, আমাদের কিছু না জানিয়ে, সরাসরি হুকুম পাঠাতেন। আমি T'কে বললাম, "এস, বুড়োর কাছে গিয়ে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসা যাক, আমরা কি কেউ নই না কি!" সে কিছুতেই রাজী হল না। বললে, "কাজ কি গোলমালে, করুক না যা খুসী ওর!" অগত্যা আমি একলাই গিয়ে নালিশ করলাম। সাহেব কোন জবাবই দিলেন না। শুধু একটা কি রকম ঘোঁক্ গোছের আওয়াজ করে অন্য কথা পাড়লেন। T'কে জানাতে সে খুব ঠাট্টা করলে, "তোমারও যেমন কাজ নেই, ইচ্ছে করে অপমান হতে গেলে।" ভাবটা এই যে সে বীরপুরুষ, তাই দূরে দূরেই রইল।

মাস দুই পরে ব্যাপারটা আরও ঘনিয়ে এল। হল কি, মামলতদারদের কাছ থেকে কালেক্টারের নামে খানছয়েক রিপোর্ট আমার কাছে এসে জমা হল। আমি সেগুলোকে আটকে রেখে বেশ চেপে বসে রইলাম। দিন কয়েক বাদে কালেক্টারের তাকীদ এল,—তোমার আপিসে আমার নামে অনেকগুলো তালুকা রিপোর্ট আটকে

রয়েছে, অবিলম্বে সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ো। আমি জবাব দিলাম,—জমাবন্দীর কাজে বড় ব্যস্ত আছি, একটু সময় পেলেই ওগুলো ভাল করে দেখে আমার মতামতসুদ্ধ আপনার কাছে পাঠাব। দুই দিন না যেতেই এক সওয়ার এল আমার ক্যাম্পে D.র জরুরী হুকুম নিয়ে,—এই লোক মারফৎ রিপোর্টগুলো পাঠাবে, অনর্থক আমার কাজের ক্ষতি কোরো না। আমি সওয়ারের হাতে রিপোর্টগুলো তৎক্ষণাৎ দিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখানা formal চিঠিও লিখলাম—মহাশয়ের হুকুম মুজব রিপোর্টগুলো পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ যেন ভবিষ্যতে আমি আমার মহকুমা সংক্রান্ত কথায় আমার মতামত জানাতে পাই, নইলে আমার কাজেরও অনেক ক্ষতি হয়। যখন সদরে ফিরলাম কর্ত্তার কাছে মুখে খুব খানিকটা বকুনি খেলাম বটে. কিন্তু সেই দিন থেকে আমার পদোন্নতি হয়ে গেল, অর্থাৎ কর্ত্তার Inner Councilএ, পরামর্শদাতার দলে, দাখিল হলাম। ভবিষ্যতে জেলা সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তিনি আমার সলা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। T'টা করলে না কিছুই, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তারও হিল্লে হয়ে গেল।

এর পরে D. যতদিন আমার জেলা হাকীম ছিলেন তাঁর সঙ্গে কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বা অন্য সহকারীর কোন রকম বোঝা-পড়ার অভাব হয় নেই। সামাজিক বিষয়ে ত ওরকম মাথাঠাণ্ডা মানুষের ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা এক রকম ছিলই না!

কিছুদিন বাদে আমাদের জেলায় R. বলে এক জজ এলেন। বয়স অপেক্ষাকৃত কম। বেচারার স্বাস্থ্য খারাপ, আর বোধ হয় সেই কারণেই মেজাজ একটু রুক্ষ। একবার তাঁর খপ্পরে পড়লে কোন আসামীর খালাস পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। আসামী তরফের উকীলদের সঙ্গে তাঁর নিয়ত খিটিরমিটির চলত, ও এই বাবতে দুই একবার হাইকোর্টে দরখাস্ত পর্য্যন্ত হয়ে গেছল। আমাদের একটু মুস্কিল হল। সাধারণতঃ খুনের ব্যাপারে মোটামুটি কিঞ্চিৎ প্রমাণ থাকলেই আমরা মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ করতাম। করাও বোধ হয় উচিত। কিন্তু R সাহেবের গতিক দেখে আমি ত ভয় পেয়ে গেলাম। খুব ভাল করে সাক্ষীদের

নাড়াচাড়া না করে মোকদ্দমা তাঁর এজলাসে পাঠানর সাহস রইল না। শেষ কি হল, দু-দুটো খুনের মোকদ্দমা একেবারে ছেড়ে দিলাম। আমার বড়সাহেব আমাকে ডেকে খুব ধমক লাগালেন। জবাবে আমি তাঁকে স্পষ্ট বললাম, "রীতিমত প্রমাণ না পেলে R এর কাছে মোকদ্দমা পাঠাতে আমার সাহস হয় না। আপনি এ দুটো মোকদ্দমার নথীপত্র বেশ করে পড়ে দেখুন।" মজা হচ্ছে এই যে এ দুটোর একটাতে চারজন খুনের Direct (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী ছিল, অন্যটাতে দুজন। প্রথমটা পড়ে D সাহেব আমার সঙ্গে একমত হলেন। দ্বিতীয়টা দায়রায় পাঠাতে হুকুম করলেন। আমি পাঠালাম। বিচার অন্য জেলার এক বিচক্ষণ জজের কাছে হল। তিনিও প্রত্যক্ষ সাক্ষী দুজনকে অবিশ্বাস করে আসামীকে ছেড়ে দিলেন। মোটের উপর আমারই জিত রইল।

Rএর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও বে-বনতি ছিল না, যদিচ মাঝে মাঝে দুজনে খুব তর্ক লেগে যেত। তর্ক করতে করতে যখন তিনি খুব গরম হয়ে উঠতেন, তখন সকলে হেসে ফেলত। জনা ছয় সাত মানুষ নিয়ে ছিল আমাদের সমাজ। ঝগড়া-ঝাঁটি করার উৎসাহ কারও ছিল না। একবার কিন্তু Rএর সঙ্গে ঝগড়া লেগে যেতে যেতে কোনক্রমে বেঁচে গেল। গল্পটা মন্দ নয়, অপেনাদের শোনাই। আগেই বলেছি, আমি থাকতাম আনন্দমহলের এক দিকটায়, আর আমার অপিস ছিল অপর দিকটায়। মাঝখানে নীচে তলায় ছিল ক্লাব, আর দোতলা তে-তলায় বাস করতেন জজ সাহেব। আমি কি কাজে কদিনের জন্য পুণায় গেছলাম। আমাদের খাড়া হুকুম ছিল যে রাত্রে চারিদিক বন্ধ করে সদর দরজার বাহিরে দালানে একজন চাপরাসী শোবে। দুতিন রাত বেশ কাটল। চতুর্থ রাত্রে ভোরের দিকে একটা চীৎকার শুনে আমার চাপ-রাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেচারা ছিল বুড়ো মানুষ, ভয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখে যে জজ সাহেব দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছেন, "যাও, নিকল যাও, একদম নিকল যাও, ইধার ক্যা করতে হো!" সে থতমত খেয়ে জবাব দিলে, "সাহেব, আমি আমার মনিবের হুকুমে এখানে রোজ রাত্রে শুয়ে থাকি।" জজ সাহেব তার ছাতির উপর একটা ধাক্কা মেরে

বললেন, "আব্ ভি নিকল যাও ইধারসে, বাঙ্গলেকে অন্দর যাকে শোও।" লোকটা বৃদ্ধ চাপরাসী হলেও জাতে মারাঠা। উত্তর দিলে, "আমি অন্য সাহেবের নোকর,—তুমি আমার গায়ে হাত দাও কিসের জন্য সাহেব? মনিবের হুকুম এইখানে দালানে শোবার, আমাকে এখানে শুতেই হবে। আনন্দ মহলের দালানটা প্রকাণ্ড, মাপে অন্ততঃ সাত আট কাঠা হবে।" সেটা আমার একলাকার এলাকা না হলেও R সাহেবের তার উপর কোন বিশেষ হক্ ছিল না। সাহেব আর ধাক্কাধাক্কি করলেন না। একটু গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেলেন,—"কাল সকাল বেলায় তোমাকে দেখে নেব।" পরদিন সকালে আমার চাপরাসীরা দল বেঁধে গিয়ে কালেক্টার সাহেবকে সব ঘটনা জানিয়ে বললে, "আমাদের সাহেব পুণা গেছেন, এখন হুজুরের যে রকম হুকুম হবে, সেই রকম আমরা করব।" D তাদিকে আমার আদেশ-মত দালানে শুতে বললেন। জজ সাহেবকে তিনি কিছু বলে থাকবেন, কেন না আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত তিনি আর কোন গোলযোগ করেন নেই। আমি ফিরে এসে সব শুনলাম। বুড়ো চাপরাসী নামদেও কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এ বিষয়ের বিচার হুজুরকে করতেই হবে।" সন্ধ্যা বেলায় ক্লাবের সবাই চলে গেলে আমি আস্তে আস্তে R-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার চাপরাসীর সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল, জজ সাহেব?" দেখি, D. তখনও চলে যান নেই, ঘরের কোণে কি একটা অছিলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। R. চটে গেল। মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিলে, "তোমার চাপরাসী আমার সঙ্গে বেয়াদবী করেছিল, তাকে সাজা দিয়েছি। আবার কি হবে?" আমি বললাম, "কিন্তু সে ত কবুল করছে না যে সে কিছু বেয়াদবী করেছিল। তা যাই হোক, আমার চাকরকে মারবার অধিকার তোমার আছে কি? এটা ত তোমার ভাবা উচিত ছিল। আমি লোকটাকে ডাকি, তাকে তুমি বল দেখিনি সে তোমার সঙ্গে কি রকমে বেয়াদবী করেছিল।" D একটু কাছে ঘেঁসে এসে বললেন, "দেখ, আমার সঙ্গে R-এর এ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হয়ে গেছে। ওর সেদিন শরীর খারাপ ছিল, ঘুম হয় নেই, তাই মেজাজটা ভাল ছিল না।" R ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, "হ্যাঁ, সত্যিই

সেদিন আমার শরীরটা বড় খিঁচ্রী ছিল। সারারাত ঘুম হয় নেই, তার উপর তোমার ওই চাকরটার সেই ভীষণ নাসিকা-গর্জ্জন!" আমি দেখলাম R-এর রাগ পড়ে গেছে। তাই একটু হেসে D-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি চাপরাসীকে ডাকি। জজ সাহেব তাকে দুটো মিষ্টি কথা বললেই সে খুশী হয়ে যাবে।" নামদেও আসতে R তাকে বললে, "দেখো নামদেও, হাম তুমকো ধাক্কা মারা, এ কাম আচ্ছা নেই কিয়া।" বুড়ো একগাল হেসে সেলাম করে উত্তর দিলে, "হুজুর মালিক হুজুর মা-বাপ।" গোলমালটা এত সহজে মিটে যাওয়াতে আমাদের তিন জনেরই খুব আহ্লাদ হল। বিজাপুর ছাড়ার পর R-এর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নেই। তবে অন্য ইংরেজ বন্ধুদের কাছে পরে শুনেছিলাম যে বিয়ে-থা করে তার মেজাজ বেশ শুধরে গেছল। যাওয়াই সম্ভব!

১৯০৩ সালে কার্জ্জন বাহাদুর দিল্লীতে যে ব্যাপার করেছিলেন, আমরাও তার একটা ছোটখাটো রকম অভিনয় করলাম বিজাপুরে। D, আমি ও T মর্নিং-কোট ইত্যাদি পরে বড়লাটের ছোটলাটের ভূমিকা নিলাম। পুলিস সাহেব সমর সাজে তলোয়ার ঝুলিয়ে D এর সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের দরবার বসল চীনী মহলের সেকালের বাদশাহী দরবার হল্-এ। সুতরাং নট-মণ্ডলী সব চুনোপুঁটি জাতীয় হলেও আমাদের রঙ্গমঞ্চকে ত কেউ ফেলনা জিনিস বলতে পারবে না! D যখন গম্ভীর স্বরে সম্রাটের ঘোষণা পাঠ করলেন তখন তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। পরে আমাকে চুপি চুপি বললেন, "আমার কি এসব পোষায়, নাটুকে ঢঙ্গ ত কখন শিখি নেই!" তাঁর মহিষী কিন্তু তাঁর মতন ছিলেন না। তিনি বেদীর উপর চন্দ্রাতপের নীচে যে রকম জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাতে প্রাচীন চীনী মহলের অবমাননা হয় নেই। সন্ধ্যাবেলায় D. এক মস্ত পার্টি দিলেন আনন্দ মহলের দালানে। সারা জেলার গণ্যমান্য সবাই এসেছিলেন। আসর সাজানোর ভার ছিল আমার গৃহিণীর উপর। আনন্দ মহলের দালানের বহর ত আপনাদিকে আগেই জানিয়েছি। সে

দালান সাজান কি সহজ কথা! তায় আবার বিজাপুরে ফুল জিনিসটা দুর্লভ। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধি কি হার মানে কখন! খেজুরপাতা, কাগজের ফুল, রঙীন কাপড়ের থান, জাপানী ফানুস দিয়ে ভদ্রমহিলা যেন ভেল্কী লাগিয়ে দিলেন। কলেক্টার বক্তৃতার সময় গদগদ কণ্ঠে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

এর দুচারদিন পরে D. ছুটীতে বিলেত চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন B বলে একজন স্বদেশী কলেক্টার। এতে আমার খুব আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু ষ্টেশনে ভদ্রলোককে দেখেই হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল। একে ভয়ানক সাহেব, তায় আবার পদগৌরবে আত্মহারা! আমার ইংরেজ সহযোগী T. ত নূতন কর্ত্তাকে দেখেই কেমন মুষড়ে গেল। আমাকে কানে কানে বললে, "By Jove, এ যে ভীষণ কলেক্টার!" সাহেব গাড়ীতে উঠেই আমাকে খুব মুরুব্বীয়ানা চালে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিজাপুর কি রকম জায়গা হে, দত্ত? আমি আসছি রত্নাগিরি থেকে, জান ত? সে এক অতি হতভাগা জায়গা। Fancy! আমার ছেলের জন্য একটা ফরাসী মাষ্টার পেলাম না সেখানে!" তিনি যে রত্নাগিরিতে ছিলেন সেটা আমাদের সকলেরই জানা ছিল, কেন না সেখানে তিনি এক ভয়ানক কেলেঙ্কারী করে এসেছিলেন। শহরের কাছে দালদী (মুসলমান জেলে) পাড়ায় কি মারপিট হয়, সেথায় গোলমাল থামাতে গিয়ে জনা দুই মারাঠা কনেষ্টবল দালদীদের হাতে মার খায়, তাতে সারা পুলিশ লাইন ভয়ানক খাপ্পা হয়ে ওঠে। এই ব্যাপার নিয়ে আরও একটু আধটু গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তা নয়। তবে রত্নাগিরির লোক স্বভাবতঃ শান্তশিষ্ট। সেখানে এমন কি গণ্ডগোল হবে, যা জনাদশেক বন্দুকওয়ালা কনেষ্টবল আধ ঘণ্টায় ঠাণ্ডা করতে পারবে না? অথচ এই কলেক্টার সাহেব ঘেবড়ে গিয়ে বোম্বাই সরকারকে তার করে জঙ্গী ফৌজ চেয়ে পাঠিয়ে বসলেন। ফৌজ ত এলই না। উপরন্তু সাহেবকে বেশ একটু রগড়ানি খেতে হল। এ ব্যাপার খবরের কাগজেও জাহির হয়ে গেছল। সুতরাং কর্ত্তার রত্নাগিরির উপর আক্রোশ দেখে বেশ একটু হাসলাম মনে মনে।

সে কথা যাক। বিজাপুরে আমাদের ক্লাবটী ছিল মোটামুটি গেরস্থ ঘরের ব্যাপার। কলেকটার D সেটা বুঝেই চলতেন, যদিও তাঁর গৃহিণী মাঝে মাঝে একটু আধটু ভুলচুক করতেন। কিন্তু আমাদের নূতন হাকীম প্রথম থেকেই এমন বেজায় চাল দিতে আরম্ভ করলেন যে আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। T.কে ও আমাকে দিবারাত্র "my assistant, my assistant" করে লোকের কান ঝালাপালা করে তুললেন। আমার ত ছুঁচো গেলা গোছ হয়েছিল। স্বদেশী Boss (কর্ত্তা), ঝগড়া করতেও পারি না। দেখতাম ইংরেজেরা কানাকানি করছে, অথচ মুখটী বুজে থাকতে হত। কিছুদিনের মধ্যে, বোধ হয়, সাহেব আমাদের ভাবগতিক দেখে বুঝলেন যে আমরা তাঁকে নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি, একটা কিছু খোলাখুলি গোলমাল হওয়াও অসম্ভব নয়। তিনি চট করে মফস্বলে বেরিয়ে পড়লেন। পালালেনও বলা যায়। কেন না, তখনও সফরের মৌসুম আরম্ভ হয় নেই। কয়েকদিন বাদে যথাসময়ে আমরা সকলেও চারিদিকে ক্যাম্পে রওয়ানা হলাম। বাহিরে ঘুরতে আরম্ভ করে দেখি যে চাষা-ভুষোরা আদপে বুঝতে পারে নেই B. সাহেব নূতন জেলার হাকীম। তারা ধরে নিয়েছে যে আমিই কর্ত্তা, কেন না তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম নালিশ আমার কাছে করতে লাগল। তার মধ্যে একটা ছিল বেশ মজার। সেইটের কথা আপনাদিগকে বলি। দরখাস্তটা করেছে অমুকগ্রাম-বাসীরা মেহেরবান দত্ত সাহেব জেলা হাকীমের হুজুরে। আর্জীর মজকুর এই যে গত মাসে আপনার সহকারী B. সাহেব এই গ্রামে দশ দিন ডেরা করেছিলেন, তিনি নানা রকমে গ্রামের লোককে উত্যক্ত করে গেছেন, নিজের খাবার জন্য গ্রাম থেকে রোজ একটা ভেড়া আনিয়ে তার একটা leg (পা) রেখে বাকীটা মালিককে ফেরত দিতেন, আর legটার জন্য চার আনা দাম দিতেন। পাঠকের মনে আছে ত যে তখনকার দিনে একটা ছোট ভেড়ার কি পাঁঠার জন্য মোট এক টাকা দাম দেওয়াই হাকীমদের দস্তুর ছিল। আমার বড়সাহেব আবার এর উপরও কারদানি করলেন না কি। কিন্তু আমি কি করি? অনেক

ভেবে চিন্তে আর্জীখানা কর্ত্তাকেই পাঠালাম। সঙ্গে একখানা চিঠিও লিখলাম যে এ দরখাস্ত কলেকটর সাহেবকেই করা হয়েছে যদিচ ভুলক্রমে এতে আমার নামটা জুড়ে দিয়েছে,—আপনার কাছে পাঠাচ্ছি for favour of disposal। আমি দরখাস্তখানা সব পড়েছি কি না, তার কিছুই উল্লেখ করলাম না। কর্ত্তা পড়ে কি ভাবলেন বা কি করলেন, তা আমি আজও জানি না। কেন, না দু চার মাস বাদে আমি ছুটী নিলাম আর ছুটীর পরে অন্যত্র বদলী হয়ে গেলাম।

বিজাপুরে আমি থাকতে থাকতে সেখানে Irrigation Commissionএর পদার্পণ ঘটল। এই কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন Scott Moncrief সাহেব। সভ্যমণ্ডলী সবই ইংরেজ, কেবল একটী ভারতীয়। আরম্ভে জয়পুরের মন্ত্রীপ্রবর কান্তিবাবু মেম্বর ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় বাহাল হলেন মাদ্রাজের এক প্রবীণ সরকারী কর্ম্মচারী, রাও বাহাদুর রাজরত্নম্ মুদেলিয়ার। কলেকটর Dর মুখে শুনলাম যে সাহেব মেম্বর কজন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে আমি মুদেলিয়ার মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করি?" D. উত্তর দিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আবার মিছেমিছি এত খরচ পত্র কেন করবে? আর কি জান, তোমার সঙ্গে কি একজন সেকেলে গোঁড়া মাদ্রাজীর বনবে?" কথাটা বললেন একটু বিদ্রূপের ছলে। আমার জাতীয় ভাব জেগে উঠল। একটু ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দিলাম, "আমার স্বদেশী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বনবে না, তুমি বল কি!" D. হেসে উঠলেন, "বেশ ত! তুমি ওঁকে বাড়ীতে রাখতে চাও, ত রাখ না!"

আমি রাও বাহাদুরকে আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করলাম। তাঁর কমিশন তখন পুণায়। ফেরত ডাকে উত্তর পেলাম,—আমাকে নিয়ে তুমি বিব্রত হয়ে পড়বে। মাদ্রাজীরা কি রকম গোঁড়া হিন্দু, তা কি তুমি জান না! আমার সঙ্গে লোকজন আছে, আমি সেলুন-এই থাকব। আমি নাছোড়বান্দা,আবার লিখলাম—আপনার জন্য আলাদা ঘরদোরের ব্যবস্থা করে দেব। আপনার লোকই না হয় রান্না-বাড়া করবে।

যথাসময়ে আমার অতিথি এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে আদর করে বাড়ী নিয়ে গেলাম। তাঁর বসবাসের জন্য একটা তলা ছেড়ে দিলাম। বাদশাহী আনন্দ মহলে ত আর চাকরদের ঘরের অভাব নেই। তিন চারটে কুঠুরী ঠিক করে দেওয়া গেল তাঁর লোকজনের জন্য। কিন্তু সুরুতেই এক মুস্কিল হল। আমার চাকরেরা পেছনের যে সিঁড়ী দিয়ে যাতায়াত করত, সেটাতে ত ছোট জাতের ছোঁয়াচ লেগে গেছে! রাও বাহাদুরের সাত্বিক পাচক জানালে যে সে পথ দিয়ে তার মনিবের খাবার আনা চলবে না। মনিবকে কিছু বলতে আমার সাহস হল না। তবে তাঁর বছর কুড়ি বাইশের একটি ছেলে সঙ্গে এসেছিল, তার শরণাপন্ন হলাম। মনে করলাম সে ইংরেজী জানা একেলে তরুণ, আমার দুঃখ বুঝে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু ব্যবস্থা যা করলে সে অতি অপরূপ। সে বললে যে আনন্দ মহলের সদর Staircase দিয়ে তাদের খাবার নিয়ে আসতে বলে দিয়েছে। আমার ত চক্ষু স্থির! অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও সিঁড়ী দিয়ে নানা রকমের অহিন্দু যাতায়াত করে ওখান দিয়ে হিন্দুর খাবার আনা চলতে পারে না! ছোকরা খুব বিজ্ঞের মত বার দুই তিন মাথা নেড়ে বললে যে আজকালকার দিনে কতকটা progressive (উদার) না হলে চলে কি? আসতে লাগল রাও বাহাদুরের খানা সদর পথে। পাঠকের মনে আছে ত, যে ওইটেই আমাদের ক্লাব? প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আমরা দালানে বসে জটলা করছি এমন সময়ে ধীরে ধীরে এক মিছিল সিঁড়ী বেয়ে এল। আগে আগে আমার চাপরাসী লণ্ঠন হাতে আলো দেখাতে দেখাতে আসছে। তার পর আসছে একজন চাকর ঘটী হাতে জল তড়তড়া দিতে দিতে। তার পেছনে আর একজন ভৃত্য সেই জলের উপর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে আসছে। আর সব পেছনে পাচক ঠাকুর দুই থালে মনিব ও মনিব পুত্রের অন্নব্যঞ্জন নিয়ে গুরুগম্ভীর চালে আসছেন। দৃশ্য দেখে সমবেত সাহেবরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। আমার কেমন লজ্জা বোধ হল। Slave Mentality কি না! "আমাকে মাপ করবেন

আমার অতিথিরা এইবার খাবেন" বলে তাড়াতাড়ি আমি পলায়ন দিলাম। অতিথিদের বসে খাওয়ালাম। অবশ্য পাশের ঘরে দোর গোড়ায় বসে। রাওবাহাদুরের ছেলে আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তাঁদের খাবার সময় আমরা কেউ যেন ঘরের ভিতর না ঢুকি। কিন্তু পরের দিন বিষম বিভ্রাট ঘটল। ওঁরা খাচ্ছেন, আমি চৌকাঠের বাইরে বসে গল্প করছি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ছোট্ট দেড়বছরের মেয়ে। হঠাৎ এক সেকেণ্ড আমি যেই আনমনা হয়েছি কি আমার বেবী চট করে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। অজাতের মেয়ে ঘরে ঢোকবামাত্র বৃদ্ধ ও তরুণ মুদেলিয়ার দাঁড়িয়ে উঠলেন, আর কিছুতেই খেতে বসলেন না। আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হলাম, কিন্তু রাগও হল বই কি। এ কি রকম বিকট শুদ্ধাচার! তবু যদি না শূদ্র মুদেলিয়ার হত! আমাদের বুড়ী ঝি ত চটেই অস্থির, চীৎকার করতে লাগল, 'মুয়ে আগুন অমন হিঁদুয়ানির। দু বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি মুরগী মটন পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছে, ওরা তো মোছলমান!" আমার স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও ভীষণ চটেছিলেন। পরদিন মুদেলিয়ার আমাকে বললেন "মিসেস দত্তের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমার আজও হল না। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেব তাঁর কত সুখ্যাতি করলেন। আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নেই।" আমার স্ত্রীকে জানালাম। তিনি কিন্তু বলে পাঠালেন, "আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের বাহিরের লোকের কাছে বেরোতে নেই। রাও বাহাদুরের মতন একজন মাননীয় হিন্দু অতিথির সামনে আমি কেমন করে এত বড় অনাচার করব!" রাও বাহাদুর সত্যি কি ভাবলেন জানি না, তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার এ রকম অন্যায় অনুরোধ করাই ভুল হয়েছে। আমি জানতাম না যে আপনাদের সমাজে পর্দা প্রথা আছে।"

চতুর্থ দিনে আমার অতিথি বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক বিদ্বান বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ। বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে এ রকম বিকট Dont-touchism কি করে খাপ খায়, কে জানে? পরে গল্পটা আমার

কলেক্টার D. কে বললুম। তিনি উত্তর দিলেন "তোমাকে ত বাপু আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি শুনলে কই!"

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মুদ্রায় শিব-মূর্ত্তি

যে সমস্ত উপকরণ দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তন্মধ্যে মুদ্রা অন্যতম। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠনের উপকরণ চারি প্রকার, যথা প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সাহিত্য, প্রাচীন বৈদেশিক সাহিত্য, অনুশাসন ও মুদ্রা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস-গঠনে মুদ্রা কতদূর সাহায্য করিয়াছে ও করিতে পারে তাহা মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন। একটী বক্তৃতাতে মুদ্রা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠনে কি প্রকার সাহায্য করিয়াছে তাহা অধ্যাপক ডাক্তার কর অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'As datable objects they are above all valuable as the grammar of art. Not only do they throw light on local forgotten schools and preserve representations of long lost master-pieces, but it is from them that the chronology of ancient art has been fixed. A long series of coins of a Greek town, ranging from the archaic period to the decline of art, sets a standard of comparison which enables sculptures and other objects to be dated'। যিনি এই কথা বলিয়াছেন তিনি প্রাচীন গ্রীষীয় ও রোমক মুদ্রা উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষীয় মুদ্রা সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, ও মূর্ত্তিতত্ত্বের ইতিহাস গঠন-কার্য্যে মুদ্রাতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মুদ্রায় কত প্রকার শিব-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা কোন যুগের তাহা আলোচনা করিব। মূর্ত্তিতত্ত্ববিশারদ ৺গোপীনাথ রাও মহাশয় শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে

বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন. কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কোন কোন মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায় এবং তাহারা কোন যুগের সে সম্বন্ধে তিনি কোন প্রকার আলোচনা করেন নাই।

উজ্জায়িনীতে প্রাপ্ত একপ্রকার মুদ্রার সম্মুখে একটী মূর্ত্তি আছে। ইহা একটী দণ্ডায়মান ত্রিমুখ মূর্ত্তি। ইহার গলদেশ হইতে কটী পর্য্যন্ত নগ্ন, কটী হইতে জানু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত ও জানু হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত নগ্ন। ইনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা একটী যষ্টি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও বামহস্তে জলপাত্র রহিয়াছে। কানিংহাম ইহা শিবমূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়াছেন ; এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"The figure on the coins seem to carry a club in one hand, and a water vessel in the other, both of which symbols are characteristic of Siva. This coin may, therefore, be accepted as a single evidence of Brahmanism at Ujain।' চক্রবর্ত্তীও কানিংহামকে অনুসরণ করিয়া ইহাকে শিব-মূর্ত্তি বলিয়াছেন। এই মুদ্রাতে কোন লিপি লিখিত নাই ; সুতরাং ইহা কোন যুগের মুদ্রা সে সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে কিছু বলা অসম্ভব। সেইজন্য ইহার যুগ সম্বন্ধে কানিংহাম, র‍্যাপ্‌সন্ ও চক্রবর্ত্তী কোন প্রকার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু মুদ্রাটী দেখিলে ইহা যে অতি প্রাচীন যুগের মুদ্রা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

ইহার পর যাঁহার মুদ্রাতে আমরা শিব মূর্ত্তি দেখিতে পাই তিনি হইতেছেন মহারাজ গুহুফর। তাঁহার নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলিতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে যথা :—

(১ বিপরীত দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি ; কটীদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত কিন্তু দেহের অন্য অংশ নগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মস্তকে জটামুকুট বর্ত্তমান ; তিনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ত্রিশূল ধরিয়া রহিয়াছেন ও কট্যবলম্বিত বামহস্তের দ্বারা খর্জ্জুর পত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(২) বিপরীত সম্মুখ দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি শিবমূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্ত

শিবমূর্ত্তির ন্যায় ইহারও কটী-দেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত ও দেহের অন্য অংশ নগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও মস্তকে জটামুকুট বর্ত্তমান। কিন্তু ইহার হস্তদ্বয়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির হস্তদ্বয় তুলনা করিলে ইহা যে বিভিন্ন প্রকারের শিবমূর্ত্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ইনি বামহস্তে ত্রিশূল ধরিয়াছেন ও দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

এই দুই প্রকার মুদ্রাতে অঙ্কিত দুই প্রকার বিভিন্ন শিবমূর্ত্তি ব্যতীত এই রাজার অন্য কোনও মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। এই দুই প্রকার শিবমূর্ত্তি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ইহাদের যুগ জানা প্রয়োজনীয় এবং ইহাদের যুগ জানিতে হইলে, রাজা গুহুফরের যুগ জানিতে হইবে। নিম্নলিখিত শিলালিপি, মুদ্রা ও ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে মহারাজ গুহুফরের যুগ জানা যায় যথা (ক) তাখ্‌তিবাহী শিলালিপিতে প্রাপ্ত গুহুফরের নাম—'মহরয়স গুহুহ্বরস বষ. [এ] ২০৪১১ স [ং] ব [ৎসরএ তি] শতিমএ ১ ১০০ ১১১ বেনখুস মসস দিবসে [প্র] ঠম [এ] [দি ১] ; (খ) মহারাজ গুহুফরের একপ্রকার মুদ্রা যাহার বিপরীতে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'জয়তস এতরস ইন্দ্রবর্ম পুত্রস ব্রতেগস অশ্‌পবর্ম'স' লিখিত আছে। এই মুদ্রার সহিত মহারাজ অয়ের যে মুদ্রার বিপরীতে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'ইন্দ্রবর্ম পুত্রস' অশ্‌পবর্ম'স ব্রতেগস জয়তস' লিখিত আছে তাহার সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইবে, কারণ অশ্‌পবর্ম মহারাজ গুহুফর ও মহারাজ অয়—দুই জনেরই ব্রতেগ ছিলেন। (গ) প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মমতানুসারে সেণ্ট টমাস রাজা গুহুফরের সভাতে আসিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল। যখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য দ্বাদশজন ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হইল, তখন সেণ্ট টমাসের ভাগ্যে ভারতবর্ষ ন্যস্ত হইল। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে যাইতে সম্মত হইলেন না ; সেই সময়ে গুহুফর নামে এক-জন ভারতীয় রাজার নিকট হইতে, রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য একজন দক্ষ কারিগর আনিবার জন্য, হাব্‌বান নামক একজন দূত উক্ত

দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। যীশুখৃষ্ট হাব্বানের নিকট আবির্ভূত হইয়া কুড়িটী রৌপ্যমুদ্রাতে সেণ্ট টমাসকে তাহার নিকট বিক্রয় করিলেন এবং গুদুফরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেণ্ট টমাস হাব্বানের সহিত ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি রাজা গুদুফরকে বলিলেন যে ছয় মাসের মধ্যে তিনি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন কিন্তু ছয় মাস ধরিয়া রাজার নিকট হইতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য যত অর্থ লইয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দান করিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। যখন রাজা তাঁহার নিকট প্রাসাদ চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে তিনি রাজার জন্য প্রাসাদ পৃথিবীতে করেন নাই, স্বর্গে করিয়াছেন। এই কথাতে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি, তাঁহার ভ্রাতা গ্যাড্ ও তাঁহার অনেক প্রজা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে সেণ্ট টমাসকে ভারতবর্ষের অন্য একজন নৃপতি মারিয়া ফেলেন। খৃষ্টধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত রাজা গুদুফর ও মুদ্রাতে প্রাপ্ত মহারাজ গুদুফর যে অভিন্নব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেণ্ট টমাস যে যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক ছিলেন ও যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহাও এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। সুতরাং মহারাজ গুদুফর যে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর কিছু পরেও জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেইজন্য সেণ্ট টমাসের কাহিনীটি মহারাজ গুদুফরের যুগ বাহির করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই তিনটী তথ্যের উপর মহারাজ গুদুফরের কালনির্ণয় নির্ভর করিতেছে। তাম্রশিবাহী শিলালিপিতে আমরা দুইটী তারিখ পাই—একটী হইতেছে মহারাজ গুদুফরের ২৬ রাজ্যাঙ্ক (regnal year) ও অন্যটী হইতেছে সম্বৎসর ১০৩। এই দুইটী তারিখ লইয়া অনেক বাদ বিসংবাদ হইয়া গিয়াছে ও দুইটী মতবাদ হইয়াছে। প্রথমটী হইতেছে যে ১০৩ সম্বৎসরকে বিক্রমাব্দ বলিয়া ধরিতে হইবে; বিক্রমাব্দ ৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এই সম্বৎসর ও ৪৬ খৃষ্টাব্দ এক বলিয়া ধরিতে হইবে (১০৩-৪৬=৫৭) এবং যে-হেতু ৪৬ খৃষ্টাব্দ ও মহারাজ গুদুফরের ২৬ রাজ্যাঙ্ক এক, সে হেতু মহারাজ গুদুফর যে

২০ খৃষ্টাব্দে (৪৬-২৬=২০) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে নাই। শিলালিপিতে প্রাপ্ত যুগের সহিত টমাস্-বিবরণের যুগের বেশ একটী সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টী হইতেছে যে সম্বৎসর ১০৩কে ৮৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে প্রচলিত পুরাতন শকাব্দ বলিয়া ধরিতে হইবে ও বর্ষ ২৬কে অয় প্রচলিত একটী অব্দের বৎসর বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং ১০৩ সম্বৎসর হইতেছে ১৯ খৃষ্টাব্দ (১০৩-৮৪=১৯ খৃষ্টাব্দ)। এই মত হইতে মহারাজ গুদুফর কবে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এই মতটীর প্রচারক হইতেছেন অধ্যাপক ষ্টেন্‌কোনো। এই দুইটী মত আলোচনা করিলে প্রথমটী অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া আমরা মহারাজ গুদুফরের প্রথম রাজ্যাঙ্ক ২০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরিতে পারি। সুতরাং এই যুগে ভারতবর্ষে যে পূর্ব্বে উল্লেখিত দুই প্রকার শিবমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এই দুইটী মূর্ত্তি যে শিবের তাহা আমরা মস্তকে জটা-মুকুট ও হস্তে ত্রিশূল হইতেই বুঝিতে পারি কিন্তু খর্জ্জুরপত্রের সহিত শিবমূর্ত্তির সম্বন্ধ কি প্রকারে হইল তাহা বলা দুষ্কর।

মহারাজ গুদুফরের পরে আমরা যে রাজার মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি পাই তিনি হইতেছেন বিম কঠ্‌ফিশ। ইনি কুষাণবংশীয় রাজা। ইঁহার তিন প্রকার শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায়—(১) শিব মুদ্রার মধ্যস্থলে দক্ষিণদিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি বৃষের পৃষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শিব দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ত্রিশূল ধরিয়াছেন ও কট্যবলম্বিত বাম হস্তের দ্বারা ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধরিয়া রহিয়াছেন। এই শিবমূর্ত্তি যে পূর্ব্বে বর্ণিত উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি ও মহারাজ গুদুফরের দুই বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রায় অঙ্কিত শিবমূর্ত্তি হইতে অন্যরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে আমরা বৃষমূর্ত্তি দেখিতে পাই ও ব্যাঘ্র চর্ম্ম বামহস্তে দেখিতে পাই—এই দুইটী বিশেষত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী তিন প্রকার মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না।

(২) মুদ্রার বিপরীত দিকে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির

সহিত মহারাজ গুহুফরের পূর্ব্বে আলোচ্য প্রথম প্রকার শিবমূর্ত্তির এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে বিম কঠ্‌ফিশ যে এই প্রকার শিবমূর্ত্তি-পরিকল্পনাতে মহারাজ গুহুফরের মুদ্রায় অঙ্কিত সেই মূর্ত্তির নিকট ঋণী তাহা বলা খুব সম্ভব অযৌক্তিক হইবে না। কেবলমাত্র মহারাজ গুহুফরের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির বামহস্তে খর্জ্জুরপত্রের পরিবর্ত্তে আমরা মহারাজ বিম কঠ্‌ফিশের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির বামহস্তে ব্যাঘ্র চর্ম্ম ও অলাবু দেখিতে পাই—এই প্রভেদ ব্যতীত আর কোনও বিভিন্নতা এই মুদ্রা দুইটীতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না। এই দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষাতে যে লিপি রহিয়াছে তাহাতেও বিম কঠ্‌ফিশের বিশেষণরূপে মহিশ্বরস বলিয়া একটী শব্দ রহিয়াছে। মহেশ্বর অর্থাৎ শিব, তাঁহার পূজক অর্থাৎ মহিশ্বর। সুতরাং এই উপাধি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে অ-ভারতীয় রাজা বিম কঠ্‌ফিশ নিজের মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজে মহিশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন।

(৩) আরএক প্রকার মুদ্রার বিপরীত দিকে আমরা বিভিন্ন প্রকারের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহার সহিত বিম কঠ্‌ফিশের মুদ্রাতে অঙ্কিত প্রথম প্রকার শিবমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রথম প্রকার মূর্ত্তিতে আমরা মস্তকে কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই না কিন্তু ইহার মস্তকে মুকুট রহিয়াছে—ইহা ব্যতীত আর সর্ব্বপ্রকারে এই শিবমূর্ত্তি ও প্রথম প্রকারের শিবমূর্ত্তি দেখিতে একরূপ। কোন সময় ভারতবর্ষে এই প্রকার শিবমূর্ত্তিগুলির প্রচলন ছিল, তাহা জানিতে হইলে বিম কঠ্‌ফিশের যুগ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কুজুল কঠ্‌ফিশ ও বিম কঠ্‌ফিশ যে একই বংশের রাজা, কুজুল কঠ্‌ফিশ যে বিম কঠ্‌ফিশের পূর্ব্বে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ও এই দুইজন রাজা যে কণিষ্ক ও তাঁহার পরবর্ত্তী কুষণবংশীয় রাজাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিম কঠ্‌ফিশ কুজুল কঠ্‌ফিশের পরে ও কণিষ্কের পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাজ গুহুফর আনুমানিক ২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুতরাং বিম কঠ্‌ফিশ বোধ হয় ৪৬ খৃষ্টাব্দের পর রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কবে শেষ হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে কণিষ্কের যুগ নির্ণয় করিতে হইবে। অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতানুসারে কণিষ্ক শকাব্দের প্রচলিতা এবং সেই হইতে কণিষ্কের রাজত্ব ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং বিম কঠ্‌ফিশ যে আনুমানিক ৪৬ খৃষ্টাব্দ ও ৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই যুগে ভারতবর্ষে কিপ্রকার শিবমূর্ত্তি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি।

বিম কঠ্‌ফিশের পর যে রাজার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই তিনি হইতেছেন কণিষ্ক। ইঁহার তিন প্রকার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই যথা—

(১) বিপরীতে দিকে গ্রীক্‌ভাষাতে ওমৃশো অর্থাৎ উমেশ (শিব) লিখিত আছে ও শিবের মূর্ত্তিও আছে। মহারাজ গুহুফর ও মহারাজ বিম কঠ্‌ফিশের মুদ্রাতে আমরা যথাক্রমে দুই প্রকার ও তিন প্রকার শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই পাঁচ প্রকার শিবমূর্ত্তি হইতে এই শিবমূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার শিবমূর্ত্তির আমরা দুই হাত দেখিতে পাই কিন্তু এই শিবমূর্ত্তির চারি হাত। এই বিশেষত্বই এই মূর্ত্তিকে অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন করিয়াছে। এই মূর্ত্তির উপরের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, নিম্নের দক্ষিণহস্তে ডমরু, উপরের বামহস্তে ছাগশিশু ও নিম্নের বামহস্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মও রহিয়াছে। ইহার মাথায় জ্যোতি রহিয়াছে ও গলদেশে হার আছে।

(২) অন্য একপ্রকার মুদ্রার বিপরীতে চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে ও গ্রীক্‌ভাষাতে ওমৃশো অর্থাৎ উমেশ (শিব) লিখিত আছে, কিন্তু হস্তে বিভিন্ন প্রকারের প্রহরণ থাকার দরুণ আমরা ইহাকে আরএক প্রকার শিবমূর্ত্তি বলিয়া ধরিতে পারি। এই মূর্ত্তির উপরের দক্ষিণ হস্তে ডমরু, নিম্নের দক্ষিণহস্তে পাশ, উপরের বামহস্তে ত্রিশূল, নিম্নের বামহস্তে অলাবু রহিয়াছে।

(৩) বিপরীত, প্রথম ও দ্বিতীয় শিবমূর্ত্তির ন্যায় চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে ; কিন্তু হস্তে ত্রিশূল না থাকার দরুণ ইহাকে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(৪) বিপরীতে, শিবমূর্ত্তি আছে কিন্তু ইহা দ্বিভুজ। আমরা এই মুদ্রাতেই সর্ব্বপ্রথম কণিষ্কের মুদ্রাতে অঙ্কিত দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি পাই। এই শিবমূর্ত্তির সহিত বিম কঠ্‌ফিশের মুদ্রায় অঙ্কিত একপ্রকার শিবমূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কণিষ্কের পর আমরা হুবিষ্কের মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই। কণিষ্কের মৃত্যুর পর যে হুবিষ্ক কুষণ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের শিলালিপির কাল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। হুবিষ্কের মুদ্রাতে নিম্নলিখিত শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায় যথা।—

(১) বিপরীত, গ্রীকভাষাতে নানা ও উম্‌শো লিখিত আছে ; নানা ও শিব পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। এই মুদ্রাটী খুব ছোট এবং দেবতাদ্বয়ের অবয়ব খুব পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত না করায় ইহার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না।

(২) বিপরীত, গ্রীক্ অক্ষরে উম্‌শো লিখিত আছে ; দ্বিভুজ শিব বামদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম হস্তে অলাবু রহিয়াছে। দুই হস্ত এই একই প্রকার জিনিষ ধরিয়া রহিয়াছে। এরূপ শিবমূর্ত্তি আমরা কণিষ্কের মুদ্রাতে দেখিতে পাই ও এই জন্য কণিষ্কের মুদ্রার নিকট ইহা যে ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে এই যে কণিষ্কের মুদ্রার সৌন্দর্য্য ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে বর্ব্বরতার প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য ইহাকে এক নূতন প্রকারের শিবমূর্ত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(৩) বিপরীত, গ্রীক্ অক্ষরে উমশো লিখিত আছে ও শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির সহিত কণিষ্কর একপ্রকার চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তির আকারগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি অঙ্কনেও হুবিষ্ক কণিষ্কের অনুসরণ

করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা বলা চলিবে না। এই তিন প্রকার শিবমূর্ত্তি ব্যতীত আর কোনও বিভিন্ন প্রকারের শিবমূর্ত্তি হুবিষ্কের মুদ্রাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। হুবিষ্কের যুগ আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার অনুশাসনগুলির তারিখ দেখিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত হুবিষ্কের যে সকল শিলালিপি রহিয়াছে তাহাতে ৩১ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত সম্বৎসর রহিয়াছে। কণিষ্কের অনুশাসনের সহিত হুবিষ্কের অনুশাসন তুলনা করিলে ৩১ সম্বৎসর যে কণিষ্ক প্রচলিত অব্দ হইতে গণনা করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। সুতরাং হুবিষ্ক যে অন্ততঃ পক্ষে ১০৯ খৃষ্টাব্দ (৩১ + ৭৮)—১৩৮ খৃষ্টাব্দ (৬০ + ৭৮) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

হুবিষ্কের পর যে রাজার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই তিনি হইতেছেন বাসুদেব। কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব এক বংশোদ্ভূত কিন্তু বাসুদেব এতদূর ভারতবর্ষীয় ভাব ও চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজে ভারতবর্ষীয় নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুদ্রাতে নিম্নলিখিত শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

(১) বিপরীত, গ্রীক্‌ভাষাতে উম্‌শো লিখিত আছে। এই শিবমূর্ত্তি দ্বিভুজ ; দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে ত্রিশূল রহিয়াছে ; মস্তকে জটা বিদ্যমান ; শিব সম্মুখদিকে তাকাইয়া বৃষের পিঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যদিও আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বিম কঠফিশের মুদ্রাতে বৃষের পৃষ্ঠে হেলাইয়া দাঁড়ান দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তথাপি নিম্নলিখিত কারণবশতঃ ইহাকে নূতন প্রকারের শিবমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, আমরা ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে ত্রিশূল রহিয়াছে এইরূপ শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই না ; দ্বিতীয়তঃ, এই শিবের মস্তকে যে জটা দেখা যায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শিবমূর্ত্তিতে পরিলক্ষিত হয় নাই। এই একপ্রকার শিবমূর্ত্তি ব্যতীত বাসুদেবের মুদ্রাতে ভিন্ন রকমের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাসুদেবের অনেক শিলালিপি ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অনুশাসনে যে তারিখ পাওয়া গিয়াছে তাহা ৭৪ সম্বৎসর হইতে ৯৮ সম্বৎসর ; সুতরাং বাসুদেব যে অন্ততঃপক্ষে ১৫২ খৃষ্টাব্দে (৭৪+৭৮) হইতে ১৭৬ খৃষ্টাব্দ (৯৮+৭৮) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাসুদেব কণিষ্ক-স্থাপিত কুষণবংশের শেষ বড় রাজা। বাসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করেন—ইহাদের মুদ্রাতেও আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। বাসুদেবের পরবর্ত্তী তাঁহার বংশজাত কণিষ্ক বলিয়া এক রাজার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই কণিষ্ক পূর্ব্বোক্ত কণিষ্ক হইতে বিভিন্ন লোক। ইহার মুদ্রাতেও একপ্রকার শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিবমূর্ত্তির সহিত বাসুদেবের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে ; কেবলমাত্র বাসুদেবের মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তিতে আমরা যে জটা দেখিতে পাই, তাহা এই মুদ্রাতে পাই না।

কুষণবংশের পতনের পর কুষণ-সাসানীয় বংশ উত্তর পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। এই বংশীয় রাজগণের মধ্যে বাসুদেবের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহার একপ্রকার মুদ্রাতে আমরা শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই শিবমূর্ত্তির সহিত কণিষ্কের বংশধর বাসুদেবের মুদ্রায় অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রাতে অঙ্কিত শিবমূর্ত্তিতে কোন বর্ব্বরতার ছাপ নাই কিন্তু ইহাতে রহিয়াছে। এই বংশজাত দ্বিতীয় হোমজাদ ও প্রথম বারাহানের মুদ্রাতেও এই প্রকার শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেও বর্ব্বরতার চিহ্ন রহিয়াছে।

কুনিন্দ জাতির একপ্রকার মুদ্রার উপর শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিব দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কুঠার সংযুক্ত ত্রিশূল ও বামহস্তের দ্বারা হরিণ চর্ম্ম ধরিয়াছেন। এই মুদ্রা সম্বন্ধে র‍্যাপ্‌সন্ বলিয়াছেন, 'The latter which seems to show the influence of the large copper

money of the Kushanas, and which bear inscription in a later form of Brahmi characters, may, perhaps, belong to the 3rd or 4th centuries, A. D.। কুষণ তাম্র মুদ্রার সহিত ইহার যে সাদৃশ্য আছে তাহা যে সত্য তাহা কুষণ তাম্র মুদ্রার সহিত ইহা মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহার পর গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সুবর্ণ মুদ্রাতে একপ্রকার শিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই শিবমূর্ত্তি পূর্ব্ব বর্ণিত শিবমূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিভুজ শিব দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া বৃষের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাথায় জটা রহিয়াছে ; শিব বাম হস্তের দ্বারা একটী জিনিষ ধরিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তে কিছু আছে কিনা তাহা বুঝাইতেছে না। কেবলমাত্র গাঞ্জাম তাম্রলিপিতে শশাঙ্কের একটি তারিখ পাওয়া যায়, সেটি হইতেছে ৩০০ গৌপ্তাব্দ। তাহা হইলে শশাঙ্ক যে অন্ততঃপক্ষে (৩০০+৩১৯) ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সময়ে ভারতবর্ষে যে কি প্রকার শিবমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল তাহা এই মুদ্রাতে জানা যায়। এই যুগের পর হইতে ভারতের নানাস্থানে প্রস্তরে শিবমূর্ত্তি উন্নততর ভাবে গঠিত হইতে থাকে ও সেসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ৺গোপীনাথ রাও মহাশয়ের পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মুদ্রায় অঙ্কিত শিবমূর্ত্তির সহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তির যে একটি সংযোগ আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীচারুচন্দ্র দাসগুপ্ত

ডিক্‌টেটরশিপ

১

ডিক্‌টেটরশিপ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে তা ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নয়। ডিক্‌টেটর নন সীজর। মুসোলিনীকে নেপোলিয়ন বর্গীয় বলে মনে করলে ভুল করব। ডেমক্রেসীর সঙ্গে ডিক্‌টেটরশিপের পার্থক্য হচ্ছে দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের। ডেমক্রেসীর দুই পক্ষ। এক পক্ষের নাম পার্টি ইন পাওয়ার। অপর পক্ষের নাম পার্টি ইন অপোজিশন। ডিক্‌টেটরশিপ অপোজিশন সইতে পারে না, তাই অপর পক্ষচ্ছেদ করে নিরঙ্কুশ হয়। ডিক্‌টেটরশিপ হচ্ছে ডানা-কাটা ডেমক্রেসী। তার যিনি কর্ণধার তিনি পার্টির তেজে তেজীয়ান, পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাঁর সত্তা। তিনি রাষ্ট্রের ডিক্‌টেটর হলেও পার্টির ডিক্‌টেটর নন। ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর থাকে তবে তা নিতান্ত আকস্মিক, না থাকলেও অচল হত না। যেমন কনষ্টিটিউশনাল রাজার।

আদত কথা দুই হাতে যে তালি বাজে তার নাম ডেমক্রেসী। আর এক হাতে যে কাঁসি বাজে তার নাম ডিক্‌টেটরশিপ। হাত এ স্থলে পার্টি। উভয়েরই প্রাণ পার্টিগত। পার্টিকে নির্ম্মূল করে দাও, দেখবে ডেমক্রেসীও নেই, ডিক্‌টেটরশিপও নেই। পক্ষান্তরে পার্টিকে ডালপালা মেলতে দাও, একদিন পাবে হয় ডেমক্রেসী নয় ডিক্‌টেটরশিপ। একই বীজ থেকে কি করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভাল। নইলে বুনব ডেমক্রেসী আর ফলবে ডিক্‌টেটরশিপ।

২

ইংলণ্ডে যখন রাজার হাত থেকে প্রজার হাতে ক্ষমতা আসে তখন প্রজাদের দুই দল দাঁড়িয়ে যায়। তাদের এক পক্ষ নেয় রাজার

অংশ, করে শাসন। অপর পক্ষ নেয় প্রজার অংশ, করে সমালোচনা। চক্রের আবর্ত্তনে সমালোচকরাও শাসক হয়, শাসকরাও হয় সমালোচক। তারা পালা করে ক্রিকেট খেলে, কখনো এর হাতে ব্যাট ওর হাতে বল, কখনো ওর হাতে ব্যাট এর হাতে বল। হুইগ ও টোরি এই দুই দল ওস্তাদ খেলোয়াড় ইংলণ্ড সরগরম করে তুল্লে, অন্যান্য দেশেও সাড়া পড়ে গেল। সবাই বল্ল, আমাদেরও অমন দুটি টিম চাই। উঠল ডেমক্রেসীর জয়ধ্বনি।

ইংরাজের মত সবাই ত ক্রিকেট বোঝে না। অন্যান্য দেশে টিম তৈরি হল বটে, কিন্তু দুটি নয়, তার বেশী। জোড়াতালি দেওয়া দলের খেলা ঠিক ইংরাজী খেলা নয়। তা হলেও তা খেলা। তা পার্লামেণ্টারী গবর্ণমেণ্ট।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত জগৎ যখন ডেমক্রেসীর নাম জপছে তখন এক বেসুরা গলায় উচ্চারিত হল, ডিক্‌টেটরশিপ। রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্ক্‌স্। কার ডিক্‌টেটরশিপ? কোনো ব্যক্তি বিশেষের? না। প্রোলিটারিয়াটের। শ্রমিকগোষ্ঠীর।

মার্ক্‌সের মতে রাজার ক্ষমতা প্রজার হাতে এসেছে বটে, কিন্তু প্রজা এ ক্ষেত্রে কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পার্লামেণ্ট হয়েছে তাদের পাঁঠা। সেটাকে তারা যেমন ইচ্ছা কাটছে। তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রবেশ নেই, প্রবেশ থাকলেও স্বার্থসিদ্ধির ভরসা নেই। শ্রমিক কি চায়? কোন পক্ষ কত দৌড় করল? কয়টা ছোট ছোট উপকার করল? না। শ্রমিক চায় সে তার সম্পূর্ণ মূল্য পাক। যারা তাকে তার ষোলো আনা পাওনার জায়গায় পাঁচ আনা দিয়ে বলে, খুব পেয়েছে, যারা তার বকেয়া এগারো আনা পকেটে পুরে বড় লোক, তাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে তর্ক করা বৃথা। তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে তাদের সোজা বিদায় কর। কেড়ে নাও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা। নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে নয়। সরাসরি গায়ের জোরে। রাষ্ট্র পরিচালনা ছেলেখেলা নয়, ক্রিকেট নয়। যারা শ্রম করবে না তারা বাঁচবে না। তাদের বাঁচা বারণ। আর যারা শ্রম করবে তাদের কি

নিয়ে দলাদলি হতে পারে? তাদের নিয়ে যে সমাজ তাতে একাধিক দলের স্থান নেই।

মার্ক্সের সময় থেকে ডিক্টেটরশিপের আইডিয়া ডেমক্রেসীর আইডিয়ার সপত্নী হল। কিন্তু তার প্রতি বিশেষ কেউ ভ্রূক্ষেপ করেন নি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতে টোরি হুইগের মত পার্টি খাড়া করল, নির্ব্বাচনের আসরে নামল। ধীরে ধীরে তারা দলে ভারি হয়ে একদিন অপোজিশনের আসন নিল। তারপরে ব্যাট ধরল। হুইগ বনাম টোরির খেলায় হুইগ দলে ফাটল দেখা দেয়, য়াস্কুইথ ও লয়েড জর্জ পৃথক হয়ে যান। ফলে উভয় উপদল নগণ্য হন। লেবার লিবারলের বদলে খেলার আসর জমায়।

ইংলণ্ডের লেবার পার্টির অনুরূপ জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডেমক্রাট পার্টি। অন্যান্য দেশে বিশুদ্ধ সোশ্যালিষ্ট পার্টি। এদের সকলেরই পলিসি পার্লামেণ্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে টোরি বা হুইগের মত রাষ্ট্র শাসন করা। অর্থাৎ বিপক্ষকে খেলায় আউট করে তার ব্যাট ধরা। এরা বিপক্ষকে খেলার মাঠ থেকে খেদিয়ে দিতে চায় না, এরা চায় ওরা বল ছুঁড়ুক। সমালোচনায় এদের আপত্তি নেই, এরা অপোজিশনের রসগ্রাহী।

মাঝখানে একটা মহাযুদ্ধ না ঘটে গেলে ডেমক্রেসীর উপর জনগণের আস্থা অচলা হয়ে রইত। কোনো দেশেই ডিক্টেটরশিপের প্রশ্ন কাফিখানা বা লেখকের দপ্তর ছাপিয়ে উঠত না। কিন্তু মহাযুদ্ধের দিন ইংলণ্ডের মত খেলোয়াড়ধর্ম্মী দেশেও ডেমক্রেসীর খেলার ভোল বদলায়। য়াস্কুইথকে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে লয়েড জর্জ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গড়লেন। সমালোচনা করবার জন্য কেউ রইল না। সকলের এক তনু এক মন এক ধ্যান। অপোজিশনের অভাব যদি হয় ডিক্টেটরশিপের সংজ্ঞা তবে ইংলণ্ডে এই সময় ডিক্টেটরশিপই স্থাপিত হয়েছিল। ডিক্টেটরশিপের লক্ষণ এই যে তার অধীনে ব্যক্তির অধিকার সঙ্কুচিত হয়, ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মহাযুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের মানুষ যা খুসী করতে পারত না, যা খুসী বলতে পারত না। খবরের উপর সেন্সরশিপ, খাবারের উপর

ভাগবাঁটোয়ারা, আলোর উপর নির্ব্বাণের আদেশ, সব জিনিষের উপর খাজনা। গবর্ণমেণ্ট নিজেই গোলাবারুদের কারখানা চালান, অন্য অনেক ব্যবসার উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ চলে। যার ইচ্ছা নেই তাকেও পাকড়িয়ে সেপাই করে যুদ্ধ পাঠানো হয়, তার বিবেকের বাধা থাকলে কয়েদ করা হয়।

ইংলণ্ডের মত বনেদী ডেমক্রেসীও যুদ্ধের দিনে ফেল মারল। শুধু যুদ্ধের দিনে নয়। ডিপ্রেশন যখন ঘনিয়ে এল তখন ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সমস্ত কনসারবেটিব, সমস্ত লিবারল ও বহু সংখ্যক সোশ্যালিষ্ট মিলে ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট পত্তন করলেন। নামমাত্র একটি বিপক্ষ দল রইল, তাদের মৃদু স্বরের সমালোচনা দুর্ব্বলের প্রতি অনুগ্রহ করে শুনলেন কর্ত্তারা, কিন্তু কর্ম্মের ইতরবিশেষ লক্ষিত হল না। সুখের বিষয় ইংলণ্ডকে এই ডিপ্রেশন জখম করতে পারেনি, যেমন করেছে আমেরিকাকে। যদি করত তবে ব্যবসার উপর দস্তুরমত হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হত।

৩

মহাযুদ্ধে যখন ক্রিকেটের জন্মভূমির এই দশা তখন অন্যে পরে কা-কথা। মার্কসের মানসকন্যা রুষকে মাল্যদান করলেন। নির্জ্জলা ডিক্টেটরশিপ বৎসারের মসনদ দখল করল।

বোলশেবিক রুষ পৃথিবীর প্রথম নিরাবরণ ডিক্টেটরশিপ। ইংলণ্ডে যা অল্পের উপর দিয়ে গেল, রুষে তা ষোলো কলায় পূর্ণ হল। অন্নের ভাণ্ড রাষ্ট্রের হাতে। বস্ত্রের ভাণ্ডার রাষ্ট্রের জিম্মায়। গহনার বাক্স রাষ্ট্রের সিন্দুকে। একটি পয়সাও কারুর পকেটে নেই। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য রাষ্ট্র। নিজেকে ব্যক্তি বলে ভাবাটাও রাষ্ট্রদ্রোহ, সমষ্টির অকল্যাণ।

সবচেয়ে বড় কথা, কোনো সমালোচক রইল না। দেশে কেবল একটি বাণী, একটি সুর, একটি সত্য। তার প্রতিবাদ নেই। তার সংশোধন নেই। বিপক্ষের সংবাদ পত্র বাহির হয় না, বই ছাপা হয় না, বক্তৃতা উচ্চারিত হয় না। বিপক্ষীয়রা হল নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ,

নিহত। সব জমিই খাসমহল, সব ব্যবসাই খাস ব্যবসা, সব কারখানা খাস কারখানা। এর সামান্য ব্যতিক্রম স্থলে স্থলে অনুমোদিত হলেও আইনে স্বীকৃত হল না। ভোগোপকরণের উৎপাদনে ও বিতরণে রাষ্ট্রের কেউ প্রতিযোগী নয়, কোনো প্রতিযোগী নেই। ঘরেবাইরে নিরঙ্কুশ হয়ে রাষ্ট্র স্থির করিল প্ল্যান করে সেই বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের অশনবসনের অভাব পূরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির সহজ প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে ধন সৃষ্টি করবে, রাষ্ট্র জোগাবে মূলধন, ব্যক্তি জোগাবে শ্রম, রাষ্ট্র জোগাবে দিশা, ব্যক্তি জোগাবে মনীষা। ব্যক্তির পারিশ্রমিক বিভিন্ন হবে, কিন্তু সেই পারিশ্রমিককে মূলধনে পরিণত করা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খাটাতে পারবে না। অপরের জন্য খাটতে পারবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রত্যেককে কাজ দেবে, খোরাক দেবে।

এখন এই ব্যবস্থা একদা ডেমক্রেসীর সাহায্যেও সাধিত হতে পারত। সেই সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে মার্কসপন্থীরা রাজি নয়, তাই তারা দিনটাকে সরাসরি উপায়ে এগিয়ে নিল। তাদের কৈফিয়ৎ এই যে মধ্যবিত্তরা ভোটে হেরে রাষ্ট্রের পায়ে সম্পত্তি সমর্পণ করবার পাত্রই নয়, ভোটে হারজিৎ তাদের ঘরোয়া তামাসা, তার সুযোগ নিয়ে অন্য শ্রেণীর লোক যে তাদের ঘর সংসার বেদখল করবে এর সম্ভাবনা দেখলে তারা তামাসার টিকিট বেচবে না, জুয়াখেলায় বাজি রাখতে দেবে না। তার মানে ডেমক্রেসীর আটঘাট বেঁধে তাকে নিজেদের পক্ষে নিরাপদ করে তুলবে। আধুনিক পরিভাষায় তাদের ডেমক্রেসী সেফগার্ডে সমাচ্ছন্ন পর্দানশীন সাজবে।

৪

মার্কস্‌পন্থীদের আশঙ্কা অমূলক নয়। তার প্রমাণ ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ তাদের আশঙ্কার প্রতিষেধকরূপে তারা যে ঔষধ উদ্‌ভাবন করেছে তা এমন সদ্য ফলপ্রদ যে দেশে দেশে তার জাল হতে লেগেছে। রুষবিপ্লবের অনতিকাল পরে ইটালীতে ফাসিষ্ট ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাসিষ্টরা পার্লামেণ্ট উঠিয়ে দেবার

দরকার দেখল না, রাজারাও মাথা কাটল না। চার্চের সঙ্গে তাদের একটু ঝগড়া বাধল বটে, কিন্তু চার্চ তাদের স্বার্থে বাদ সাধল না, সুতরাং চার্চের স্বার্থকেও তারা মেনে নিল।

ফাসিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ইটালীকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্য্যায়ে উন্নীত করা। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া যখন পৃথিবী ভাগ করে নিচ্ছে ইটালী ও জার্ম্মানী তখন বহুধা-বিভক্ত। উপরন্তু ইটালী তখন পরাধীন। অন্যেরা অনেক দূর যাবার পর এই দুই জাতি জাগে। জেগে দেখে তাদের ভাগে বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই, আফ্রিকার মাংস নিঃশেষ, খানকয়েক হাড় পড়ে রয়েছে। এশিয়াও পরের গ্রাসে। অবশ্য ঘরের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হলে খুব চলত। কিন্তু তা হলে প্রথম শ্রেণীতে নাম ওঠে না। প্রথম শ্রেণীই স্বর্গ, প্রথম শ্রেণীই ধর্ম্ম, প্রথম শ্রেণীই পরম তপ। নবজাগ্রত ইটালীর নবপ্রতিষ্ঠিত ডেমক্রেসী আফ্রিকার দিকে হাঁ করল। কিন্তু হাঁ ভরল না। আদোয়াতে আবিসিনিয়ার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ইটালী আর ও মুখো হল না। বলকান যুদ্ধের মরসুমে তুর্কীর কাছ থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নিয়ে সে কোনোমতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল বলা চলে। মহাযুদ্ধে তার মহদভোজ্য সমুপস্থিত হয়, তার বিভীষিকার হেতু অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। আড্রিয়াটিক সাগরের বন্দরগুলি ত সে আহার করসই, অধিকন্তু দক্ষিণ টিরোল দক্ষিণা পেল। বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়া রাশিয়া ও তুর্কীর যে প্রতিপত্তি ছিল একা ইটালী তার সবটা করায়ত্ত করল। অষ্ট্রিয়ার জাহাজগুলি বগলদাবা করে ভূমধ্য সাগরে ইটালীর ভার বাড়ল। ওদিকে জার্ম্মানীর বাণিজ্যের একাংশ তার ভাগ্যে জুটেছে। এক কথায় ইটালীর সামনে সীমাহীন আশা, প্রাণে সদ্যলব্ধ সাহস। অন্ধ যেন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, খঞ্জ ফিরে পেয়েছে চলৎ শক্তি।

বাছুরের নতুন শিং উঠেছে, সে যত্র তত্র ঢুঁ মারবার জন্য অধৈর্য্য। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হবার জন্য ইটালীর ফাসিষ্ট দলের ত্বর সইল না রাশিয়ার বোলশেবিকদের দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সুমুখে। রোমান

ক্যাথলিক চার্চের আদর্শও নিত্য পরিচিত। এবং এমন আশঙ্কাও ছিল যে কমিউনিষ্ট দল বাহুবলে রাষ্ট্র অধিকার করবে। ডিক্‌টেটরশিপ যদি ইটালীর কপালে লেখা থাকে তবে কমিউনিষ্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন? ফাসিষ্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন নয়? ফাসিষ্টরা কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করল। অবিকল কমিউনিষ্ট পদ্ধতি দিয়ে কমিউনিষ্টকে পরাস্ত করল। যেন জিউজুৎসু দিয়ে জাপানীকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ল বেচারা উলুখাগড়া লিবারলরা। সোশ্যালিষ্টরা বেকুব বনল। ডেমক্রেসীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঘটল প্রাণান্ত। ফাসিষ্টরা বিরুদ্ধবাদীমাত্রকেই টিপে টিপে মারল, সরাল, তাড়াল, বাঁধল। অপোজিশনের নামগন্ধ রাখল না।

আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, ফাসিষ্টদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য স্বদেশের শক্তিবৃদ্ধি। এর জন্য রাষ্ট্রকে দিয়ে যাকিছু সম্ভব তাই করণীয়। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বাঘকে হরিণকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে। রাষ্ট্রের চাপে ধনিক ও শ্রমিক আপোষ করল। রাষ্ট্র সাহায্য করল উভয়কেই। কারুর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে খাস করতে হল না, সকলের সম্পত্তির উপর ক্ষমতা জাহির করাই যথেষ্ট বোধ হল। একটা উদাহরণ দিই। ইটালীতে বেড়াবার সময় লক্ষ করেছি হোটেলের প্রত্যেক ঘরে ফাসিষ্ট পার্টি একখানি কাগজ এঁটে দিয়েছে, তাতে লেখা আছে ঘরভাড়া এত, বিদ্যুতের ভাড়া এত, মিউনিসিপাল ট্যাক্স এত ইত্যাদি। মনোযোগের বিষয় এই যে রাষ্ট্র নয় ফাসিষ্ট পার্টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষই এই সব হোটেলের মা বাপ। পার্টি রাষ্ট্র দখল করেছে বলে নিজের দুর্গ ছাড়েনি। ওটুকু রাণীর স্ত্রীধন।

যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফাসিষ্ট ইটালীর তুলনা সর্বাধিক সঙ্গত। ফাসিষ্টরাও বলে যে তাদের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা, যুদ্ধ জগতের সনাতন ধর্ম্ম, তা শান্তির দিনেও অন্য আকারে রয়েছে। প্রাণে মারার চেয়ে ভাতে মারা কম মারাত্মক নয়। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চড়িয়ে শান্তির দিনেও এক দেশ অন্য দেশের অন্ন মারছে। আবার দেশী মালের ব্যবসাদারকে অর্থসাহায্য করে সেই সব মাল

সস্তায় বিদেশী হাটে চালান দিয়েও বিদেশীর অন্ন কাড়ছে। এই অন্ন যুদ্ধ কি কম হিংস্র? এ কি কোনো অংশে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু?

ইংলণ্ডে যা ছিল আপদ্ধর্ম্ম ইটালীতে তাই সনাতন ধর্ম্ম, যেহেতু আপদ হচ্ছে সনাতন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় অন্নযুদ্ধ, সব সময় এক প্রকার না এক প্রকার যুদ্ধ। সুতরাং ফাসিজম্ ইটালীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেদেশে অন্য বাণী হতে পারে না, অন্য সুর হতে পারে না, অন্য সত্য হতে পারে না। ইংলণ্ডের লোক যা দু বছরের বেশী বরদাস্ত করতে পারে না ইটালীর লোক তা তের বছর পছন্দ করে এসেছে।

ইটালীতে পার্লামেণ্ট আছে, কিন্তু তাতে মেজরিটি মাইনরিটি নামক দুই দল নেই। তাতে আছে বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বার্থের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি। তারা সমালোচনা করে না, তাদের কেউ মন্ত্রীপদ পাবার অধিকারী নয়। মন্ত্রীপদ ফাসিষ্ট পার্টির লোককে পার্টির দান। রাশিয়াতে পার্টির কর্ত্তারা রাষ্ট্রের কর্ত্তা নিযুক্ত করেন, লোকপ্রতিনিধি-দের ইচ্ছা খাটে না।

৫

ইটালীর অনুকরণে যেসব দেশে ডিক্‌টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে জার্ম্মানীই উল্লেখযোগ্য। পোলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে পিল্‌সুডস্কি প্রিমো প্রভৃতি ব্যক্তি সৈন্যদলকে হাতে করে রাষ্ট্রের গাড়োয়ান হয়েছিলেন, তেমন ত অহরহ দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটছে। তুর্কী ও ইরানের নায়কদের সম্বন্ধে আর একটু বেশী বলা যায়, তাঁরা নেপোলিয়নবর্গীয়।

বোলশেবিক ও ফাসিষ্ট পার্টির মত জার্ম্মানীর ন্যাশনাল সোশালিষ্ট পার্টি। ওরফে নাৎসী পার্টি। এই পার্টির পত্তন যুদ্ধের অল্প পরে। অথচ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে এদের দীর্ঘকাল লাগল। ফাসিষ্টদের যেমন ভয়ের কারণ ছিল যে ওরা না হলে কমিউনিষ্টরা ডিক্‌টেটর হবে নাৎসী-দের তেমন অজুহাতও ছিল না। এদের পথ পরিষ্কার করে দিল সোশ্যাল ডেমক্রাট ও কমিউনিষ্টদের গজকচ্ছপ কলহ। এরা গরুড়ের

মত দুটোকেই ভক্ষণ করে অসপত্ন হল। বোলশেবিক ও ফাসিষ্টকেও এরা বিপক্ষদলনে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা সহজে নিজ্‌ক্রিয় হতে পারছে না। প্রথমত কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিঃসত্ত্ব করলেও কমিনিউষ্ট-ভাবাপন্ন ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয় না জার্ম্মানীর মত কমিউনিষ্ট তীর্থে। নিকটে রাশিয়া। তার ছোঁয়াচকে অতিমাত্র ভয়। দ্বিতীয়ত ইহুদীর সংখ্যা কেবল যে ছয় লাখ তাই নয়, তারা সর্ব্বঘটে বিদ্যমান ও সর্ব্বত্র তারা জাতজার্ম্মানের চেয়ে অবস্থাপন্ন ও উন্নতিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে মিশ্রণ সম্ভব নয় বলে তারা চিরকালই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হিসাবে দ্রোহিতা করবে। বিশেষত তাদের মিত্র ইউরোপের সব দেশে। জার্ম্মানীর শত্রু রাজ্যের যদি তারা চর হয়, যদি গোপনে তাদের আত্মীয়দের কাছে স্বর্ণ রপ্তানী কিম্বা তাদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করে, যদি যুদ্ধের দিনে পরের পক্ষে চক্রান্ত করে, তবে দেশ বিপন্ন হবে। ইহুদীদের অনেকে কমিউনিষ্ট, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। নাৎসীরা ইহুদীকে আমেরিকার নিগ্রোর মত দীনহীন দশায় উত্তীর্ণ না করে ছাড়বে না। ওদেরও দেশে দেশে আপনার লোক রয়েছে, আন্দোলন করে জার্ম্মান পণ্যের বাজার খারাপ করে দিচ্ছে। তৃতীয়ত জার্ম্মানীর ক্যাথলিকরা পার্লামেণ্টেও প্রতিনিধি পাঠায়, তাদের একটা স্বতন্ত্র পার্টি আছে। ধর্ম্মের নামে পলিটিকল পার্টি কেবল ভারতবর্ষে নয় জার্ম্মানীতেও আছে, তা নইলে ওদেশের এমন দুর্দ্দশা হবে কেন? এখন ইহুদির মত ক্যাথলিকও অন্যান্য দেশে আছে, তাদের সঙ্গে জার্ম্মানীর ক্যাথলিকদের ভাব থাকা ভাল নয়। জার্ম্মানীর মহাশত্রু ফ্রান্স আবার ক্যাথলিক কিনা। তদ্ব্যতীত রোমের পোপ জার্ম্মানীর ক্যাথলিকদের ব্যাপারে কথা কন। এক্ষেত্রেও সেই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র। এ জন্য নাৎসীরা ক্যাথলিকদের প্রতি বিরূপ। এরাই কতকটা অপোজিশনের কাজ করছে। এমনি কপাল যে প্রোটেষ্টাণ্টদের সঙ্গেও নাৎসীদের বনছে না। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট উভয়কে এক সূত্রে গেঁথে একটা "দীন এলাহি" প্রবর্ত্তন করতে এ যুগের আকবর বাদশাহের সখ। গায়রিং আবার প্রাক্‌ক্রিশ্চান পেগান যুগকে ফিরিয়ে আনতে চান।

নাৎসীদের মর্ম্মগত উদ্দেশ্য কি? ইতিহাসের মঞ্চে তারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে অবতীর্ণ? এর উত্তর তারা জার্ম্মানীকে পুনরায় মহাশক্তির আসনে বসাতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধে জার্ম্মানী পরাভূত হয়েছে, এই তথ্যটাকে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে রবার দিয়ে মুছে ফেলতে পণ করেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের মত তারা বেকারসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে। ভাবী যুদ্ধের আয়োজনে জার্ম্মানী যা খরচ করেছে তাতে বেকার সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। দেশরক্ষার্থে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলে সর্ব্বস্বীকৃত। তাদৃশ কারণে সংবাদের, অভিমতের ও আর্টের নিয়ন্ত্রণও মাথা পেতে নিতে হয়। নাৎসী জার্ম্মানীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ফাসিষ্ট ইটালী ও বোলশেবিক রাশিয়ার মত রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে বিলীন হয়েছে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মায়।

ব্যক্তির ত এই জীবন্মুক্ত দশা। নাৎসী পার্টি কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করছে, রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে আত্ম দেহ ত্যাগ করেনি।

রাশিয়া, ইটালী ও জার্ম্মানী এই তিন দেশেই রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজের জারক রসে জীর্ণ করেছে, কিন্তু পার্টিকে উদরস্থ করতে পারেনি, বরং পার্টিই রাষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়েছে। এইখানেই ডিক্‌টেটর-শিপের ভণ্ডামি। তিন দেশেই ডিক্‌টেটরশিপ রাষ্ট্রের মহিমা গান করছে, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় নেই, না ভগবান না ধর্ম্ম। নমো রাষ্ট্র নমো রাষ্ট্র বলে ত্রি সন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে, রাষ্ট্র নামক অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের চরণে আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নিবেদন করে চরণামৃত সেবন করতে হবে। তা হলে যে অপূর্ব্ব আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হবে তাই হচ্ছে ইহজীবনের সার্থকতা। এই যাদের মতবাদ, যাদের ফিলসফি, তারা কিন্তু পার্টিকে শিকায় তুলে রেখে দিয়েছে ঠাকুরের ঠিক মাথার উপরে। অন্যান্য দেশে এই ফলার চুরি নেই। এর থেকে অনুমান হয় যে পার্টি বাইরে থেকে রাষ্ট্রের লাগাম কেড়ে নিয়েছে, ভিতর থেকে তার মন কাড়তে পারেনি। নাৎসী ফাসিষ্ট ও বোলশেবিক নিজ নিজ দেশের সমস্ত মানুষকে পার্টির সদস্য করতে সাহসী নয়, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটের মর্য্যাদা আছে, ব্যক্তির মতামতের মূল্য আছে, যদি অধিকাংশের

আনুকূল্য না পাওয়া যায় তবে পার্টির পলিসি পণ্ড হবে ও নেতৃত্ব পাত্রান্তরিত হবে।

শেষপর্য্যন্ত দাঁড়াল এই যে মঙ্গলের জন্য গৌরবের জন্য পরাভবের গ্লানি ধৌত করণের জন্য মুষ্টিমেয়ের নেতৃত্বে মহাজনতাকে চালিত হতে হবে, সঙ্কল্প অল্পের, সমর্পণ অধিকাংশের। রাষ্ট্র হচ্ছে জগন্নাথের রথ, জনসাধারণ তাকে টানবে, পার্টি হবে তার পাণ্ডা। এ যদি দুর্দ্দিনের ব্যবস্থা হত তবে ডেমক্রেসীর পক্ষে ভয়াবহ হত না, কিন্তু যেমন দেখা যচ্ছে তাতে মনে হয় উক্ত তিনটি দেশে এই ব্যবস্থা সুদিনেও অটুট থাকবে, যাতে অটুট থাকে তার জন্য পার্টি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপিচ ঐ তিন দেশে এর সাফল্য একে অন্যত্র সংক্রামক করতেও পারে। অতএব ডিক্‌টেটরশিপ ডেমক্রেসির স্থায়ী প্রতিযোগী হতে উদ্যত হয়েছে। হয় ডিক্‌টেটরশিপ জিতবে, নয় ডেমক্রেসী। দুটোর প্রভেদ যাঁরা বোঝেন না তাঁদের যত্ন পত্ন জ্ঞান নেই। ডেমক্রসী হচ্ছে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের শাসন, ডিক্‌টেটরশিপ সংখ্যালঘিষ্ঠের।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেও ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া বহু মনীষীর মনঃপূত হয়েছে। আমি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ মস্‌লের কথা ভাবছিনে, ভাবছি ক্রিপ্‌স্‌ কোল লাস্কির কথা। এঁরা ডেমক্রেসীর ঠাট বজায় রেখে ডিক্‌টেটরশিপের প্রাণবস্তু চান। এঁদের প্রস্তাব এই যে লেবার পার্টি সাধারণ নির্ব্বাচনে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে পার্লামেণ্টে আসুক, এসে ভোটের জোরে বিনা সময়ক্ষেপে রাতারাতি ব্যাঙ্ক, খনি, রেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবসায় রাষ্ট্রের খাসদখলে আসুক।

এই প্রস্তাব শুনে প্রতিপক্ষ হেসে বল্লেন, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ক্রিকেট নয়। সমালোচনার সময় দিতে হবে। পদে পদে জবাবদিহি করতে হবে। দেশের লোককে ফলাফল অনুধাবন করবার অবসর দিতে হবে। রাতারাতি একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের একরতফা উলটপালট ঘটানোর জন্য পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা পার্লামেণ্ট ধ্বংস

করার সামিল। তোমরা যদি ভোটের জোরে অন্যায় করতে উদ্যত হও আমরাও গায়ের জোরে অন্যায়কে ঠেকাতে জানি।

এঁরা প্রত্যুত্তর করলেন, দেশের লোক যদি আমাদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ রূপে পাঠায় তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভাল করে বুঝেসুঝেই আমাদের পাঠিয়েছে। আমরা ম্যাণ্ডেট পালন করছি মাত্র।

এই যুক্তির দ্বারা আদালতে মামলা জেতা যায়, কলেজে ছেলে ভোলানো যায়। কিন্তু এ ক্রিকেট নয়। কোনোমতে একবার সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হলেই যে ডালে বসেছি সে ডাল কাটবার অধিকার জন্মায় না। গোড়া ঘেঁষে কোপ মারার প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া দরকার। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ত চিরদিন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নয়। পাঁচ বছর পরে তারাই হতে পারে সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমাজ ব্যবস্থা কি প্রতি পাঁচ বছরে বিপরীত হবে? কাটা ডাল গজাবে কি?

মোট কথা ডেমক্রসী বিপ্লবের বাহন নয়। কামারের দোকানে দইয়ের ফরমাস বৃথা। মার্কস্‌ এ সত্য জানতেন বলে তাঁর শিষ্যদের সোজাসুজি বিপ্লবের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। লেবার পার্টি কনফারেন্সে মনীষীদের এই প্রস্তাব সহজবুদ্ধির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হল। এতে আছে ডিক্‌টেটরশিপের সারবস্তু। লেবার ডিক্‌টেটরশিপের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে ব্যগ্র। কারণ লেবার ডিক্‌টেটর হবার উপক্রম করছে টের পেলে তার আগে প্রতিপক্ষ ডিক্‌টেটর সেজে বসবে। গায়ের জোর প্রতিপক্ষের বেশী। প্রেস প্রতিপক্ষের হাতে। সাফাই সৃষ্টি করা একান্ত সোজা। ব্যাঙ্ক প্রতিপক্ষের হাতে। আতঙ্ক সৃষ্টি করা কয়েক মিনিটের কর্ম্ম। লেবার জানে যে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে ক্রিকেট খেলাই নিরাপদ, তাতে মাঝে মাঝে ব্যাট ধরবার সুযোগ মেলে।

৭

ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুভেদ্য, নির্দ্দিষ্টকালে নিবদ্ধ। ডেমক্রেসীর কোনো লক্ষ্য নেই। যদি থাকে তবে তা মৃদু মন্থর প্রগতি। ডিক্‌টেটরশিপ বলে, সাত বছর সময় দাও। জার্ম্মানীকে

পরাক্রান্ত ও নিরভাব করে দিচ্ছি। পাঁচ বছর সময় দাও। রাশিয়া শিল্পপ্রধান দেশ হবে; যন্ত্রের সাহায্যে জমিতেও বহুগুণ ফসল ফলবে। দশ বছর সময় দাও। ইটালী উপনিবেশ জয় করে নেবে। ডেমক্রেসী তেমন কোনো অঙ্গীকার করে না। প্রত্যেক নির্ব্বাচনে প্রত্যেক দল কার্য্যতালিকা দাখিল করে বটে, কিন্তু সে সব খুচরা ঘরমেরামতি, তাতেও তারা ঢিলে দেয়। তাদের দোষ নেই। গৃহস্থ যে ট্যাক্স দেয় সেই খরচে তার বেশী হয় না। ট্যাক্স বাড়াবার নাম করলে নির্ব্বাচনে মাৎ হতে হবে, বাড়ালেও পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ইটপাটকেল ভাঙ্গা বোতল পচা ডিম দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করবে দেশের লোক।

বলা যায় না ডিক্‌টেটরশিপ যদি লক্ষ্য ভেদে অক্ষম হয় তবে তার সম্বর্দ্ধনা কিরূপ হবে। যারা চড়া পণে জুয়া খেলতে যায় তারা জুয়াড়ির পরিণাম জেনেশুনেই যায়, বিনাশ তাদের অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁরা রাশিয়ার ডিক্‌টেটরশিপের দীর্ঘজীবন অথচ জার্ম্মানী ও ইটালীতে তার অকালমৃত্যু কামনা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তত্রত্য ক্যাপিটালিসমের পতনকামী। তাঁদের সে অভিলাষ ডেমক্রেসী কর্ত্তৃক পূরণ হবে না, তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ডিক্‌টেটরশিপের মরণ নয় তার লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ডেমক্রেসী ক্যাপিটালিসমের মিত্র। তার কাছে সোশ্যালিসমের প্রত্যাশা আকাশ-কুসুম। তবু এই প্রত্যাশাই অধুনাতন বামমার্গীয় আদর্শবাদীকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়। সামঞ্জস্যের ভরসায় সে ধৈর্য্যের সহিত দিন গুণছে। তার বিশ্বাস রাশিয়াতেও একদিন ডেমক্রেসীর সূচনা হবে। সোশ্যালিষ্ট ডেমক্রেসী।

ওদিকে দক্ষিণমার্গের আদর্শবাদীর মানসে ক্যাপিটালিসমের সঙ্গে ডেমক্রেসীর সমাহার নব নব বর্ণে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। ডিক্‌টেটরশিপ তার প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সোশ্যালিসমের চেয়ে ডিক্‌টেটরশিপ স্পৃহণীয়। সে প্রথমে ক্যাপিটালিষ্ট, পরে ডেমক্রাট। ইটালী জার্ম্মানী যেদিন ক্যাপিটালিসমের পক্ষে নিরাপদ হবে সেদিন ডিক্‌টেটরশিপের পরিবর্ত্তে ডেমক্রেসী সংস্থাপিত হলেই সে প্রীত হবে। সে

খেলোয়ার মানুষ, জুয়াড়ি নয়। ডিক্‌টেটর সম্বন্ধে তার মোহ নেই, আছে বিপৎ কালে নির্ভর।

বিশ্লেষণ করলে দ্বন্দ্বটা মূলত ক্যাপিটালিসমের সঙ্গে সোশ্যালিসমের। ক্যাপিটালিসম্ তার মিত্রের সঙ্কট দেখলে আত্মরক্ষার জন্য ডিক্‌টেটরশিপের বায়না দেয়। তা থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে ডিক্‌টেটর তার পোষা বরকন্দাজ তবে ভুল করবেন। ডিক্‌টেটরকে যে নিয়োগ করে সে তার। রাশিয়ায় সে প্রোলিটারিয়াটের, ইটালী জার্ম্মানীতে সে ক্যাপিটালিষ্টের। সে প্রভুভক্ত গুর্খা ভৃত্য। মালিকের বিচার করে না, যদি খোরাকী পায়। ডেমক্রেসী ভদ্রলোক। ক্যাপিটালিসম তাকেই খাতির করে বেশী। কিন্তু সম্পত্তির গায়ে হাত পড়লে লোকে ভাল মানুষ বন্ধুর চেয়ে বিশ্বস্ত লাঠিয়ালের দিকে বেশী ঝোঁকে। সোশ্যালিস্‌ম্ যখন নূতন দখল নিচ্ছে তখন লাঠিয়ালই ত তার একমাত্র অবলম্বন। সম্পত্তি রাখতে গেলেও যেমন কাড়তে গেলেও তেমনি, সম্পত্তির বেলায় ভদ্রতা করতে গেলে সর্ব্বনাশ। যে মানুষ দু বেলা মালা গড়ায় তত্ত্বকথা আওড়ায় নিরামিষ খায় সেও সম্পত্তির জন্য জাল করে, মিথ্যা জবানবন্দী দেয়, ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়।

অতএব দ্বন্দ্বটা মুখ্যত সম্পত্তিঘটিত।

লীলাময় রায়

রূপকথা

আমার ব্রহ্ম-বিতর্কের খাতা যখন ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে চল্‌লো, তখন তার যে শোভা দেখেছিলুম, তা খুবই বিরল। সেটা ডুব্‌লো প্রথমে একখানা কালো শ্লেটের মতো; কিন্তু অবিলম্বেই তার পাতাগুলো খুলে গেলো—হাল্‌কা সবুজ পাতা, কেঁপে কেঁপে নীলে বদ্‌লে যাচ্ছে। থেকে থেকে কেতাবখানা হারায়, থেকে থেকে তার প্রসারে অসীমের যাদু লাগে, আবার মাঝে মাঝে তাকে বই ব'লেই চিনি, কিন্তু বিরাট বই, সমস্ত জ্ঞাননির্ঘণ্টের চেয়েও বিপুলায়তন। নিচে পৌঁছতে তার কুহক যেন আরো বাড়লো, এবং একমুঠো বালি তার অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে চোখের আড়াল করলে। কিন্তু কিছু পরেই পুঁথিটা আবার নজরে এলো,—সাধারণ খোলা পুঁথি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, কেবল তার পাতাগুলো কার অদৃশ্য অঙ্গুলিস্পর্শে মৃদুসঞ্চালিত।

পিসিমা বল্‌লেন, "আসল আক্ষেপের কথা এই যে তুমি কোনো-মতেই ঘরে ব'সে কাজ সারবে না। তাহলে ঝাড়া হাত-পায়ে আমোদ করাও হতো, এমন দুর্ঘটনাও কিছুতেই ঘটতে পারতো না।"

পাদ্রী সাহেব ইনিয়ে বিনিয়ে আবৃত্তি করলেন, "কিছুই তাহার অধিকার নাহি রবে, অরূপ রতনে সবি পরিণত হবে"; এবং চমক ভেঙে তাঁর ভগ্নী যোগ দিলেন, "ওকি! খাতাখানা যে জলে পড়লো!" আর মাঝিরা? তাদের একজন হেসে ফেল্‌লে, এবং অন্যজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ছাড়তে লাগ্‌লো।

কার্নেল্ সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী সর্ব্বনাশ! লোকটা পাগল নাকি?"

পিসিমা বল্‌লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে কৃতজ্ঞতা জানাও, অর্থাৎ বলো যে অতটা দয়ায় আজ প্রয়োজন নেই; হয়তো ভবিষ্যতে—"

আমি অনুযোগের স্বরে জবাব দিলুম, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু

আমার যে খাতাখানা ফেরৎ চাই। ওটা আমার ফেলোশিপ্ পরীক্ষার নোট। ভবিষ্যতে কি আর ওর কিছু বাকি থাকবে?"

কে এক ভদ্রমহিলা ছাতার আড়াল থেকে প্রস্তাব করলেন, "আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। এই স্বভাবশিশুটি বরং জলে নেমে বই উদ্ধার করুক, আর আমরা ইতিমধ্যে অন্য গুহাটা দেখে আসি। এই পাহাড়টায় কিম্বা ভিতরে ওই পাথরের ফলকে ওকে নামিয়ে দেওয়া যাক, আমরা ফিরতে ফিরতে ও কাজ গুছিয়ে রাখবে।"

যুক্তিটা ভালোই লাগলো, এবং আমি তার সংস্কার করলুম এই ব'লে যে আমাকেও ছেড়ে গেলে নৌকার ভার কমবে। ফলে আমরা দুজনেই ছোটো গহ্বরটার বাইরে একখানা প্রকাণ্ড রৌদ্রজ্জ্বল পাথরে স্থান পেলুম। আশ্চর্য্য সে-পাথরখানা, যেন গুহাভ্যন্তরীণ বর্ণসঙ্গীতের প্রহরী; আরো অনির্ব্বচনীয় ভিতরকার বর্ণবিন্যাস যাকে শব্দাভাবে নীলই বল্‌তে হয়, যদিও সে-নীল নির্ম্মলতারই নির্য্যাস। সে-রকম নির্ম্মলতা হয়তো গৃহস্থের পরিমার্জ্জিত ভদ্রাসনেই জন্মায়, কিন্তু তার পরিণতি পারমার্থিক পরাকাষ্ঠায়, সাত সমুদ্রকে একত্র করলে, তবে তেমন ভাস্বর নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ মেলে। কাপ্রির নীল গুহার নীল জল পরিমাণে অনেক বেশী বটে, কিন্তু রঙে আরো গাঢ় নয়। সে-সাধারণ রঙে, সে-সামান্য সত্তায় ভূমধ্যসাগরের সকল গুহাই উত্তরাধিকারী; যেখানেই সূর্য্যের আলো পৌঁছয় আর সমুদ্রের স্রোত বয়, সেখানেই সেই নির্ব্বিশেষ নীলের পর্য্যাপ্তি।

সে যাই হোক, নৌকো চলে যেতেই বুঝলুম যে একখানা ঢালু পাথরের ধারে একজন অপরিচিত সিসিলিয়ানের হাতে নিজেকে অসহায় অবস্থায় সঁপে দিয়ে অত্যন্ত বোকামি করেছি। কারণ আমার সঙ্গী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অতিজীবন্ত হয়ে উঠলো, এবং আমার হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুত স্বরে বল্‌লে, "গুহার শেষে যান দিকি, একটি চমৎকার দৃশ্য দেখবেন।"

তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে, একপ্রস্থ জলন্ত জল ডিঙিয়ে, পাহাড় ছেড়ে পাড়ের উপরে লাফ দিলুম। তার পর আলো থেকে

সরিয়ে এনে সে আমাকে ছায়ার মধ্যে যেখানে দাঁড় করালে তার প্রত্যন্তে এক-ফালি বালির চড়া গুঁড়ো পান্নার মতো উঁকি পাড়ছিলো। সেখানে আমায় তার কাপড়-চোপড়ের জিম্মেয় রেখে সে ত্রস্তপদে আবার গৃহামুখের পাথরটায় ফিরে গেলো, এবং সূর্য্যালোকে নিমেষকাল নগ্নদেহে দাড়িয়ে, নিচে চেয়ে একবার দেখে নিলে পুঁথিখানা কোথায় পড়ে আছে; তার পর কপালে ক্রুসচিহ্ন এঁকে, উর্দ্ধবাহু হয়ে সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলে।

বইখানা বিস্ময়কর ঠেকেছিলো, মানুষটিকে লাগলো বর্ণনার অতীত। মনে হলো সমুদ্রগর্ভে সে বুঝি এক সচেতন রজতপ্রতিমা নীল আর সবুজের পুলক যার সর্ব্বাঙ্গে জীবনসঞ্চার করেছে। কিন্তু সেই অসীম আনন্দের ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, প্রাণময় পুরুষটিই যে মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ব্রহ্মবিতর্কের খাতাখানা দাঁতে ধ'রে রৌদ্রদগ্ধ সজল শরীরে অতল থেকে উঠে আসবে এমন সম্ভাবনাও সে-সময়ে আমার মনে জাগেনি।

এই রকম ডুবুরীরা সাধারণত দক্ষিণার প্রত্যাশী। আমি যাই দিই না কেন, সে নিশ্চয়ই তার বেশি চাইবে; অথচ সেই সুন্দর, যদিও জনশূন্য, স্থানে তর্ক করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিলো না। কাজেই সে যখন আলাপ জমাবার স্বরে বললে, "এমনতর জায়গায় অপ্সরী সন্দর্শনও সম্ভব," তখন আমি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলুম।

সে যে পরিবেষ্টনের সঙ্গে এমন ভাবে নিজের সুর মিলিয়ে নিয়েছে, তাতে তার উপরে খুশি না হয়ে পারলুম না। সঙ্গীরা যে-মায়ালোকে আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলো, সেখানে বস্তু-নামক আষ্ট-প্রহরিক উৎপাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সমুদ্র সে-নিভৃত জগতের ভিত্তি, তার প্রাকার ও পটল সমুদ্র-প্রতিবিম্বিত বেপমান শিলারাশি। সেখানে এক কবিকল্পনা ভিন্ন অন্য সমস্তই দুর্ব্বিষহ। সুতরাং আমিও তার খেয়ালের প্রতিধ্বনি ক'রে বললুম, "এখানে অপ্সরী সন্দর্শন শুধু সম্ভব নয়, সহজও বটে।"

কাপড় পরতে পরতে বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে আমার দিকে

চাইতে লাগলো। বালির উপরে ব'সে আমি ব্যাপৃত হলুম আমার চট্‌চটে খাতাখানার পাতা ছাড়াতে।

অবশেষে সে আবার বললে, "তাহলে গত বছর যে বইটা বেরিয়েছিলো, তা আপনিও হয়তো পড়েছেন। কে জানতো, এ-দেশের অপ্সরী বিদেশীদেরও টানে!"

(পরে কেতাবখানা আমি পড়েছি। তরুণীটির ছবি ও গানের কথাগুলি থাকা সত্ত্বেও, সে বিবরণ স্বভাবতই অসম্পূর্ণ।)

"তিনি এই নীল জল থেকেই ওঠেন, নয় কি? তার পর গুহা-মুখের পাথরে বসে চুল আঁচড়ান", এই ব'লে আমি গল্পের প্রস্তাবনা করলুম।

তার হঠাৎ গাম্ভীর্য্যে আমার ঔৎসুক্য জেগেছিলো; ইচ্ছা হলো ফুসলিয়ে তার মনের খবর বের করি, কারণ তার শেষ কথাগুলোর মধ্যে একটা বিদ্রূপের ইঙ্গিত ছিলো, যার রহস্য আমি ঠিক বুঝলুম না।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি তাঁকে কখনো দেখেছেন?"

"লাখো বার।"

"আমি, একবারও নয়।"

"কিন্তু তুমি তো তাঁর গান শুনেছো?"

সে ফোঁপ ক'রে অধীর স্বরে বললে, "জলের নিচেই গাইবেন? কে পারে? কখনো কখনো গাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তার ফলে মস্ত মস্ত বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।"

"পাহাড়ের উপরে চ'ড়ে বসলেই হয়।"

সে একেবারে চ'টে জবাব দিলে, "কী ক'রে? পাজীরা হাওয়াকে যাদু করেছে, তাঁর নিঃশ্বাস নেওয়া বারণ; পাথরগুলোর শুদ্ধি হয়েছে, ওতে বসা নিষেধ। মানুষ কেবল সমুদ্রকে মন্ত্রপূত করতে পারেনা, কারণ তার কোথাও শেষ নেই। তাই সমুদ্রেই তাঁর বাস।"

আমার উত্তর জোগালো না।

ফলে তার মুখের ভাব একটু নরম হলো। সে আমার দিকে এমন ক'রে চাইলে যেন তার মনে কি একটা লুকিয়ে আছে। তার পর

গুহামুখের পাথরটার উপরে গিয়ে সে কিছুক্ষণ বাইরের অসীম নীলের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, এবং খানিক বাদে ভিতরের প্রদোষান্ধকারে ফিরে এসে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, "সাধারণত সৎলোকেই তাঁকে দেখতে পায়।"

আমি কোনো মন্তব্য করলুম না। তখন নীরবতা ভেদ ক'রে সে আবার বলতে লাগলো, "এই নিয়মটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত, পাদ্রীরাও এর মানে বোঝেনা; কেননা অপ্সরী নিজে নেহাৎই মন্দ। যারা রীতিমতো ব্রত-উপবাস করে, শুভদিনে গির্জ্জেয় যায়, বিপদ শুধু তাদেরই নয়, এমন-কি যারা আটপৌরে ভালোমানুষ, নিতান্ত গোবেচারা, আশঙ্কা বেশি তাদেরই। গত দু-পুরুষের মধ্যে গ্রামের কেউই তাঁকে দেখেনি, না দেখাই স্বাভাবিক, কারণ জলে নামার আগে আমরা সকলেই কপালে ক্রুসচিহ্ন আঁকি। কিন্তু অত সাবধান হওয়ার দরকার নেই। জুসেপের বেলায় তো আমরা কেউ কখনো স্বপ্নেও ভয় পাইনি। অবশ্য আমরা প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করতুম, আর আমাদের অনেককেই তারও লাগতো ভালো। কিন্তু ভালোবাসা কখনোই ভালো হওয়ার সমান।

জুসেপে কে, জিজ্ঞাসা করলুম।

"সে অনেক দিনের কথা—আমার বয়স তখন সতেরো আর দাদা ৬ পেরিয়ে আমার চেয়ে আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেইবারেই f ..... অঞ্চলে প্রথম আসতে সুরু ক'রে আমাদের গ্রামের ভোল ফিরিয়ে দেয়। এই উন্নতি আর অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে আমরা প্রধানত এক ঘরোয়ানা ইংরেজ মহিলার কাছেই ঋণী। তিনি আমাদের বিষয়ে বই লিখেই থামেননি, আমাদের সংস্কার-সমিতির গোড়াপত্তনও তাঁরই চেষ্টার ফল।"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, "এ গুহার মধ্যে সে-ভদ্রমহিলার কথা পেড়ে কাজ নেই।"

"সেদিন তাঁকে আর তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আমরা গুহা দেখাতে যাচ্ছিলুম। নৌকো যখন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছে, তখন সকলকে

চমকে দেবার ইচ্ছেয়, আর পাঁচজনের মতো, আমিও খালি হাতে একটা ছোটো কাঁকড়া ধ'রে, তার দাড়া উপ্‌ড়ে, তাঁদের সামনে ধরলুম। ফলে মেয়েরা সবাই কাৎরাতে লাগলো, কিন্তু ভদ্রলোকটি খুশি হয়ে আমায় বক্‌শিস্ দিতে চাইলেন। আমি তখনো পাকিনি, তাই তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিলুম এই ব'লে যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, সেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! আমার পিছনে ব'সে দাঁড় টানছিলো জুসেপে; এই ব্যবহারে চ'টে গিয়ে, সে এত জোরে আমাকে এক চড় কষিয়ে দিলে যে দাঁতে ঠোঁট কেটে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেলো। আমিও তাকে ঘুরিয়ে মারবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু সে ছিলো অত্যন্ত চট্‌পটে, আমি ফিরতে না-ফিরতেই আমার বগলে সে এমন এক লাথি চালালে যে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকো টানাও আমার সাধ্যে কুললো না। এই ব্যাপারে মেয়ে-মহলে মহা চেঁচামেচি সুরু হলো। পরে শুনেছি, দাদার অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে আমাকে ওয়েটারের কাজ শেখানোর জল্পনা-কল্পনাতেও তাঁরা তখুনি মেতেছিলেন। ভাগ্যিস্, সেটা আর কোনোদিন ঘ'টে ওঠেনি।

"আমরা যখন গুহায় পৌঁছলুম—এটা নয়, একটা আরো বড়ো গুহায়—তখন ভদ্রলোকটির হঠাৎ সখ হলো যে আমাদের মধ্যে একজন ক্রেউ জলে ডুবে টাকা কুড়োই। মেয়েমাত্রেই মাঝে মাঝে লজ্জার মাথা খায়, তাই এ-ক্ষেত্রেও তাঁরা আপত্তি তুললেন না। কিন্তু জুসেপে আবিষ্কার করেছিলো যে আমাদের জলে নাম্‌তে দেখ্‌লে বিদেশীরা বিশেষ আমোদ পায়; কাজেই রূপো ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে সে ডুব দিতে রাজি হলো না। ফলে ভদ্রলোকটি একটা ডবল লিরা ছুঁড়ে ফেল্‌লেন।"

"ঝাঁপাবার ঠিক আগে আমায় কালশিরা-পড়া গালে হাত দিয়ে অসহায়ভাবে কাঁদতে দেখে, দাদা হেসে বল্‌লে, "যাক, এবারে অন্তত আর অপ্সরীর নজরে আসবোনা।" তার পর কপালে ক্রুসচিহ্ন না এঁকেই, সে জলে পড়লো। কিন্তু ঠিক সেইবারেই সে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে।"

গল্প অসমাপ্ত রেখে, সে আমার দেওয়া সিগারেট নিলে। আমি গুহামুখের পাথরটার পানে তাকিয়ে দেখলুম, সেই মায়ামুগ্ধ জল থেকে ক্রমান্বয়ে বড়ো বড়ো বুদ্বুদ ফুটে উঠে প্রবেশপথের দু-পাশকে আলোর ঝলকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

অবশেষে পদপ্রান্তের ছোটো ঢেউগুলোর উপরে সিগারেটের গরম ছাই ঝেড়ে, সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "দাদা টাকা না নিয়েই ফিরে এলো। আমরা তাকে কোনোক্রমে টেনে নৌকোয় তুল্‌লুম। সে ফুলে এমনি প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিলো যে মনে হতে লাগলো, সে যেন একলাই নৌকোখানা জুড়ে রয়েছে, এত ভিজে গিয়েছিলো যে আমরা তাকে কাপড় পরাতে পারলুম না। এত ভিজে মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আমি আর সেই ভদ্রলোকটিই নৌকো নিয়ে এলুম, জুসেপেকে চটে মুড়ে কোণে হেলান দিয়ে বসালুম।"

আমি ভাবলুম, জুসেপের প্রাণহানিই হয়তো গল্পের মর্ম; তাই আস্তে আস্তে বললুম, "আহা, বেচারা তাহলে ডুবে মারা গেলো।"

সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে, "নিশ্চয়ই না। এই না বললুম, সে অপ্সরী দেখেছিলো।"

আমায় আবার চুপ করতে হলো।

"দাদা বিছানা নিলে, যদিও তার শরীরে রোগের নামগন্ধ ছিলো না। ডাক্তার এলো, টাকা নিয়ে চ'লে গেলো; পুরুৎ এলো, শান্তিজল ছিটিয়ে পালালো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা; সে যেমন প্রকাণ্ড, ঠিক তেমনটিই রয়ে গেলো। কী প্রকাণ্ড—যেন খানিকটা সমুদ্দুর! সান্ বিয়াজোর বুড়ো আঙুলের হাড় দাদাকে ছোঁয়ানো হলো, ফলে হাড় শুকলোনা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

আমি সাহস ক'রে শুধালুম, "ফুলে তার চেহারা কি রকম হয়েছিলো?"

"অপ্সরী দেখলে যেমন হয়। আপনি না তাঁকে 'লাখোবার' দেখেছেন? তবে আবার জিগ্‌গেস করছেন কেন? ওঃ, কি দারুণ তার বিষণ্ণতা, যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য সে ভেদ করেছে! জীবন্ত সকল কিছুর

সংসর্গেই তার শোক উথ্‌লে উঠতো, কারণ সে জানতো যে শেষে সবাই মরবে। ঘুম ছাড়া আর কিছুতেই তার আগ্রহ ছিলোনা।"

আমি ভিজে খাতাখানায় মুখ গুঁজে রইলুম।

"দাদা কাজকর্ম্মে ইস্তফা দিলে, সে খেতে ভুলে যেতো, গায়ে কাপড় আছে কিনা তার মনে থাকতো না। সব ভার এসে চাপলো আমার ঘাড়ে, বোনকে চাকরি নিতে হলো। আমরা দাদাকে ভিখিরী সাজাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার সবল শরীর দেখে কারো দয়া জাগলো না। তাকে হাবা ব'লে চালানোও অসাধ্য হলো, কারণ তার চোখে উপযুক্ত চাউনির অভাব ছিলো। কাজেই দাদা শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকের মুখে তাকিয়ে থাকতো, আর সে যতই চাইতো, ততই তার কষ্ট বাড়তো। কারো ছেলে জন্মালে, সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতো, কেউ বিয়ে করলে, তার অবস্থা এমনি ভয়ঙ্কর হতো যে তাকে গির্জ্জের বাইরে দেখে নবদম্পতীরা উঠতো শিউরে। কে ভেবেছিলো, সে আবার নিজেই বিয়ে করবে! আমি, আমিই সে-কাণ্ড বাধাই, আমিই একদিন তাকে খবরের কাগজ থেকে প'ড়ে শোনাই যে রাগুসার একটি মেয়ে সমুদ্রে নাইবার ফলে পাগল হয়ে গেছে। খবর পেয়েই জুসেপে বিছানা ছেড়ে উঠলো, এক হপ্তা বাদে আবার যখন বাড়ী ফিরলো, তখন তার সঙ্গে সেই মেয়েটি।

"সে নিজে আমায় কিছু বলেনি; কিন্তু শুনেছি, দাদা সিধে গিয়ে মেয়েটির বাড়ি চড়োয়া হয়; তারপর তার ঘরের দরজা ভেঙে তাকে লুটে আনে। মেয়েটির বাপ ছিলো ধনী খনিওয়ালা, কাজেই আমাদের সঙ্কট আপনি কল্পনা ক'রে নিতে পারবেন। এক ধূর্ত্ত উকিলকে সঙ্গে নিয়ে, মেয়ের বাপ এসে হাজির হলো; কিন্তু আমার মতো তাদের জারিজুরিও খাটলোনা। তারা বচসা করলে, ভয় দেখালে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদেরও ফিরতে হলো খালি হাতে; আমাদের কিছুই লোকসান,—অর্থাৎ অর্থদণ্ড, গেলোনা। আমরা জুসেপে আর মারিয়াকে গির্জ্জেয় নিয়ে গিয়ে, তাদের বিয়ে দিয়ে আনলুম। হ্যাঁ! বিয়ে বটে! এমন বিয়ে যে তার পরে পাদ্রীসাহেব সুদ্ধ একটা

রসিকতা করলেন না, আর রাস্তায় বেরুতেই ছেলেরা ঢিল ছুঁড়তে লাগলো।···আমার মনে হয়, বৌদিকে সুখী করতে পারলে আমার মরতেও আক্ষেপ থাকতো না; কিন্তু সচরাচর যেমন দেখা যায়, এখানেও কারো কর্ত্তাত্বি খাটলো না।"

"তাহলে বেচারাদের ঘরকরণা সুখের হয় নি?"

"তারা দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসতো, কিন্তু ভালোবাসাই সুখ নয়। ভালবাসা সব মানুষের কপালেই জোটে, তার কোনো দামই নেই। বরং এক বেকারের জায়গায় দু জন আসাতে আমার খাটুনি বাড়লো। কারণ বৌদিও ছিলো হুবহু দাদার মতো—তাদের মধ্যে কে কখন কথা কইছে, তা সুদ্ধ বোঝা যেতোনা। আমি বাধ্য হয়ে নিজেদের নৌকো বেচে, আজকের ওই রাঘববোয়ালের তাঁবে চাকরি নিলুম। ক্রমশ আমরা সারা গ্রামের চক্ষুশূল হয়ে উঠলুম। প্রথমটা ছেলেদের বিদ্বেষ জাগলো—যত হাঙ্গামের গোড়া ওইখানে—তার পর মেয়েদের, সব শেষে যোগ দিলে পুরুষেরা। কারণ যত অনর্থের মূল ছিলো—দেখবেন, শেষকালে যেন বিশ্বাসঘাতক হবেন না!"

আমি পণবদ্ধ হতেই, সে স্কুলপালানো বেসবদ ছেলের মতো মুখ ছুটিয়ে দিলে, যাজকদের গাল পেড়ে বলতে লাগলো, তাদের জন্যেই তার সারা জীবন অধঃপাতে গেছে। শেষে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "এমনি ক'রে আজন্মকাল আমরা শুধু ঠ'কেই আসছি", এবং তার উত্তেজিত পদাঘাতে বালি উড়ে, গুহামধ্যের নীল তরঙ্গভঙ্গকে চোখের আড়াল করলে।

আমিও কেমন বিচলিত হয়ে পড়লুম, অনুভব করলুম যে শত অসন্তাব্যতা ও কুসংস্কার সত্ত্বেও জুসেপের গল্প যথার্থ, এত দিন সংসার-সম্বন্ধে যত কথা শুনেছিলুম, সে সমস্তের চেয়ে নিগূঢ়তর ভাবে যথার্থ। জানিনা কেন, হঠাৎ আমার মনে জাগলো পরোপকারের আকাঙ্ক্ষা, যেমন দুর্দ্দম, তেমনি নিষ্ফল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে ঘোর কাটলো অচিরেই।

"বৌদির সন্তানসম্ভাবনাই হলো সোনায় সোহাগা। লোকে

বলতে সুরু করলে, 'তোমার সোনার চাঁদ ভাইপোটি কবে জন্মাচ্ছে? এ-রকম বাপ-মায়ের সন্তান নিশ্চয়ই খুব হাসিখুশি, নিশ্চয়ই খুব টুক-টুকে হবে।' আমি কোনো মুখভঙ্গি না ক'রেই জবাব দিতুম, 'সেটা হওয়াই খুব সম্ভব। দুখের চূড়াই সুখের গোড়া'—ওটা আমাদের একটা প্রবাদ। কিন্তু আমার উত্তরে তাদের ভয় বাড়তো বই কমতোনা; তারা গিয়ে নালিশ জুড়তো পাদ্রীদের কাছে, তখন পাদ্রীরাও আবার প্রমাদ গণতেন। এমনি ক'রে ক্রমশ একটা গুজব কানাঘুষোয় রটতে লাগলো যে সেই ছেলেটাই স্বয়ং কল্কী, একেবারে এণ্টিক্রাইষ্ট্। ভয় নেই, বেচারা ভূমিষ্ঠই হয়নি।

"হঠাৎ একদিন এক বুড়ি ডাইনি ভবিষ্যৎ বাণী সুরু করলে, কেউ তাকে বাধা দিলে না। সে বলতে লাগলো যে দাদা বৌদিকে পেয়েছে বোবা ভূতে, তাদের দ্বারা খুব বেশি অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। কিন্তু ছেলেটা মুখে ওলোপ দিয়ে থাকবে না; সে হেসে হেসেই দেবে সকলকে গিলে। তার পর একদিন যখন সমুদ্র সেঁচে সে অপ্সরীকে ডাঙ্গায় তুলে আনবে, তখন মানুষের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচবে একসঙ্গে। অপ্সরী একবার গান ধরলে, কে আটকাবে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয়? তখন পোপ যাবেন মারা, মন্‌জিবেলোতে জ্বলবে আগুন, পুড়ে ছাই হবে সান্তা আগাতার ওড়না। তখন অপ্সরীকে বিয়ে ক'রে সে পৃথিবীতে পাতবে তাদের অবিনশ্বর যৌথ রাজ্য।

"সারা গ্রামে হৈ চৈ প'ড়ে গেলো; তখন যাত্রীর মুরসুম, কাজেই হোটেলওয়ালারা ভয় পেলে। তারা একজোটে সাব্যস্ত করলে যে ছেলে না-হওয়া পর্য্যন্ত দাদা বৌদিকে বাইরে বাইরে কাটাতে হবে, খরচের টাকা উঠলো তাদেরই চাঁদায়। যাত্রার আগের রাত্রে পূর্ণিমার আকাশ পুবে হাওয়ায় নির্ম্মল হয়ে গেলো, আর রূপালী মেঘের মতো সমুদ্রের ঢেউ উথ্‌লে উঠতে লাগলো পাহাড়ের ধারে ধারে। সে-দৃশ্য চিরদিনই অপরূপ সুন্দর; তাই মারিয়া বল্‌লে, সেটা আরেক বার না দেখে সে কিছুতেই যাবে না।

"আমি বললুম, 'কাজ নেই, একটু আগে একজন কার সঙ্গে

পাদ্রীসাহেবকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছি। তাছাড়া হোটেলওয়ালারা চায় না যে লোকে তোমায় দেখে, তাদেরও চটালে আমাদের অনাহারেই মরতে হবে।'

"বৌদি বল্‌লে, 'আমি যাবোই। সমুদ্রে ঝড় এসেছে, এমন রাত আর হয়তো কপালে জুটবে না।'

"জুসেপে বল্‌লে, 'না, যেওনা, ও ঠিকই বলেছে। তবে যদি একান্তই যাও, তা হলে আমাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

"কিন্তু বৌদি জবাব দিলে, 'আমি একলা যেতে চাই।' গেলোও একলাই।

"তাদের যৎসামান্য মালপত্র আমি একখানা ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধতে বসলুম। কিন্তু অল্পক্ষণেই তাদের হারাবার আশঙ্কায় আমার মেজাজ এমনি খারাপ হয়ে উঠলো যে আমি কাজ ফেলে, দাদার পাশ ঘেঁষে না-ব'সে পারলুম না। ক্রমশ আমার হাত দাদার কাঁধে ঝুলে দিলুম, আর সেও আমায় ধরলে তার হাতে ঘিরে। এক বৎসর যাবৎ এতখানি ভালোবাসা সে আমাকে একবারও দেখায়নি; কাজেই আস্তে আস্তে আমাদের মন থেকে সময়ের হিসেব মুছে গেলো।

"হঠাৎ আপনা থেকে দরজাটা খুলে গিয়ে ঘরের মধ্যে একত্রে ঢুকলো জ্যোৎস্না আর হাওয়া, আর সেইসঙ্গে ছোটো ছেলের গলায় বাইরে থেকে কে একজন হেসে বল্‌লে, 'পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে দিয়েছে তাকে সমুদ্রে ফেলে'।

"যে-দেরাজে আমার ছোরা-ছুরি থাকতো, চট ক'রে উঠে আমি তার সাম্‌নে দাঁড়ালুম।

"জুসেপে, এত লোক থাকতে স্বয়ং জুসেপে, বল্‌লে,'বোস্ সীগ্‌গির। ও তো মারা গেছেই, তাই ব'লে কি অন্যদেরও প্রাণদণ্ড হবে?'

"আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'লোকটা কে, আমি আন্দাজ করতে পারছি, তাকে খুন করবোই।'

"আমি প্রায় ঘর থেকে বেরিয়েছি, এমন সময় দাদা ল্যাং মেরে আমায় ফেলে, আমার বুকে হাঁটু চেপে বসলো; তারপর আমার হাত

ধ'রে কব্জি দুটোকে দিলে মুচ্‌ড়ে—একে একে, প্রথমে ডান, তার পরে বাঁ। জুসেপে ছাড়া আর কারো মাথায় এই মৎলব আসতো না। আমার কী ভয়ানক লেগেছিলো, তা আপনি ভাবতে পারবেন না, আমি জ্ঞান হারালুম। যখন চৈতন্য ফিরলো, তখন দাদা উধাও হয়েছে; তাকে আর দেখতে পাইনি।"

কিন্তু জেসেপেকে আমার আর সইছিলো না।

সে আবার বললে, "বললুম তো দাদা মোটেই ভালোমানুষ ছিলোনা। সেইজন্যেই কেউ কখনো কল্পনাও করেনি যে অপ্সরী সন্দর্শন ঘটবে তারই বরাতে।"

"কি ক'রে জানলে যে জুসেপে তাঁর দেখা পেয়েছিলো?"

"কারণ দাদা তাঁকে 'লাখো বার' দেখেনি, মাত্র একটি বার প্রত্যক্ষ করেছিলো।"

"কিন্তু সে যদি এতই মন্দ, তবে তাকে ভালবাসো কেন?"

লোকটি এইবার প্রথম হাসলে, সেই হাসি ছাড়া তার কাছে আর অন্য জবাব পেলুম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তবে কি এইখানেই গল্পের শেষ?"

"বৌদিকে যে খুন করেছিলো, তাকে আমি মারতে পারিনি; আমার কব্জি সারবার আগেই সে এমেরিকা পালালো; তাছাড়া যাজকহত্যা নিষিদ্ধ। আর জুসেপে? সেও সারা জগৎ ঘুরে বেড়ালো, যার ভাগ্যে অপ্সরী সন্দর্শন ঘটেছে, এমন একজন পুরুষ বা মেয়ের খোঁজে। অবশ্য সেই রকম কোনো মেয়েকেই সে বেশি চেয়েছিলো; কারণ তাহলে হয়তো তখনো সেই ছেলের জন্ম সম্ভবপর হতো। কিন্তু দাদার আশা মেটেনি। শেষকালে সে লিভারপুলে—পাড়াটা কি নেহাৎ আজগুবী শোনাচ্ছে?—এসে কাশির সঙ্গে রক্ত তুলতে তুলতে মারা গেলো।

"আমি মনে করিনা, আজ এমন মানুষ জীবিত আছে যে সত্যিই অপ্সরীকে দেখেছে। এক পুরুষে একাধিক লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটেনি। অন্ততপক্ষে আমার জীবদ্দশায় এমন একজোড়া

স্ত্রী-পুরুষ নিশ্চয়ই জুটবে না, যারা সেই কুমারসম্ভবের উপলক্ষ হবে। সমুদ্র থেকে অপ্সরীকে ডেকে এনে পৃথিবীর মৌন বিনাশ করবে যে-জগত্রাতা, তাকে দেখা আমার অদৃষ্টে নেই।"

আমি চমকে উঠলুম। "জগত্রাতা? ভবিষ্যৎ বাণীর শেষে কি ও-কথাও ছিলো?"

সে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো, এবং অজস্র প্রতিবিম্বের নীলাভ সবুজ রং ভেদ ক'রে আমি দেখলুম তার মুখে উত্তেজনার লালিমা লেগেছে। শুনলুম, সে বলছে, "মৌন জনশূন্যতারও নিশ্চয়ই শেষ আছে। এ-অত্যাচার একশ বছর টিঁকতে পারে, হাজার বছর চলতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের আয়ু আরো দীর্ঘ; সেই চিরস্থায়ী জলে যাঁর বাস, তাঁর গানকে চিররুদ্ধ করে, এমন শক্তি মানুষের নেই।" আমি তাকে আরো অনেক কথা শুধাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সারা গুহাটা অন্ধকার ক'রে আমাদের প্রত্যাগত নৌকা সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে ঢুকে পড়লো।

[E. M. Forster প্রণীত The Story of the Siren নামক ইংরেজী গল্পের অনুবাদ]

কবিতাগুচ্ছ

ওহারু

(নোগুচির "From the Eastern Sea" হইতে।)

কুমারী ওহারু জাপানী তরুণা নয়ন-ভুলানি শোভা,
(বুক ভরি' তার চেরিমঞ্জরী সুকুমার মনলোভা।)
নতজানু হয়ে পূজায় নিরতা প্রজাপতি মন্দিরে,
দেবতার কাছে মাগে পতি-বর ভূমিলুণ্ঠিত শিরে।
পুষ্প পরাগে চারুগ্রীবা তার সুরভিত রঞ্জিত,
('ক্রিসান্থিমাম্' গুচ্ছে গুচ্ছে বুকে তার সঞ্চিত।)

কহে বালা, "প্রভু, দাও মোরে হেন পতি যার নিঃশ্বাসে
দীপ্ত সুরভি করিবে অন্ধ আমারে মদির বাসে।
(ওহারু যে চিতে যতনে নিভৃতে চেরিমঞ্জরী ধরে,
আর সেথা আছে ক্রিসান্থিমাম্ পুঞ্জিত থরে থরে।)

"ওগো প্রজাপতি, তোমার প্রসাদে পাই যেন হেন বর
কণ্ঠে যাহার গিরি-সানুভূমি-নিরালার মর্ম্মর,
যেথায় লুকায়ে আসে চন্দ্রমা মধুপূর্ণিমা রাতে।
(ক্রিসান্থিমাম্ চেরির গুচ্ছ ওহারুর সে হিয়াতে।)

"দাও হেন পতি দৃষ্টি যাহার মন্ত্র প্রস্ফুটানী,
আফিমের রাঙা কুঁড়িরে পবন ফুটায় যে যাদু হানি,'
ভালবাসা যার একটি পাখীর গানে ভরা ঘন বন।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরির মুঞ্জরণ।)

"দাও সেই স্বামী গম্ভীর বাণী শুনিব কণ্ঠে যার,
সেই সাগরের কল্লোলসম,—যেথা সৌরভ-ভার

বহি' আনে বায়ু অজানা দ্বীপের পুষ্প-পরাগ হরি'।
(ওহারুর বুক ক্রিসান্থিমাম্ চেরিতে রয়েছে ভরি'।)

"দাও হেন পতি অঙ্গুলি যার যাদুহানা পরশনে
স্বপন বুলায়ে ফুটাবে আমারে পুষ্পিত জাগরণে,
ওই কাশে ঘাসে যথা সমীরণ বুলায় পরশখানি।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরিফুল আছে জানি।)

"দাও প্রাণপতি পরাণ যাহার আপনারে পরকাশি'
সরল তরল দিঠিতে আমার নয়নে উঠিবে ভাসি',
—লজ্জা অরুণা অহনার পানে প্রান্তর যথা চায়।
(ক্রিসান্থিমাম্ চেরিমঞ্জরী ওহারু ধরে হিয়ায়।)

"দাও সে প্রাণেশ চুম্বনে যার আমার কুমারী হিয়া
একটি নিশীথে নারী হয়ে সুখে উঠিবে প্রস্ফুটিয়া।
(চেরিমঞ্জরী ওহারুর বুকে ফুটেছে যে থরে থরে,
আর তারি সনে ক্রিসান্থিমাম্ হিয়া তার আলো করে।)

"দাও সে দোসর জীবনের পথে রহিবে যে সাথে সাথে,
কবিতার সনে চাঁদের জোছনা মিশে যথা মধুরাতে
শান্তি-নিথর বীথিপথ পরে ছায়ালোকে অভিরাম।
(ওহারুর বুকে ফুটেছে পুলকে চেরি ক্রিসান্থিমাম্।)

"সেই স্বামী চাই হৃদয় যাহার ভরপুর সৌরভে,
যে সুরভি আমি পেয়েছি নিদাঘে কাননে ঘুরেছি যবে,
কলনিস্বনা ঝরণার বুকে পেয়েছি যে পরিমল।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ আর চেরিফুলদল।)

"দাও হেন পতি মধুর মূরতি আঁকা যার এ নয়ানে,
পেয়েছিনু যারে জনমের আগে আমার পরাণ জানে।

হারায়েছি যারে এ ধরায় আসি', আমি যে তাহারে চাই।
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরির তুলনা নাই।)

"দাও দাও সেই বাঞ্ছিতধনে যার বুকে 'প্রিয়তম'
এই কথাটি যে আছে অঙ্কিত এই হাতে লিখা মম,
পাইবে দেখিতে বসন আড়ালে মুছিবেনা কোনোদিন।"
(ওহারুর বুকে ক্রিসান্থিমাম্ চেরিরা অন্তরীণ।)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুরু ও শেষ

প্রীতির মদিররাতে চেয়েছিনু তারাভরা আকাশের তলে,
চারিচোখে ফুটেছিল ভাষাহীন প্রকাশের তীব্র আকুলতা,
দৃষ্টির আদিমরূপ স্পর্শের উত্তাপে তাই লভিল পূর্ণতা
ওষ্ঠাধর পথ বাহি মুষ্টিভরা স্বরগের নীবিমোক্ষফলে।

উচ্ছল প্রাণের ছন্দ দেহতটবন্ধ মাঝে নাচিল উল্লাসে,
আন্দোলিত মুক্তবক্ষে ঊর্শিভঙ্গ-ব্যাকুলতা উঠিল চঞ্চলি,
যৌবন-মানস-ঝঞ্ঝা মেঘে মেঘে সঞ্চারিল প্রেমের বিজলি,
নিষ্করুণ বজ্র তারে বরে নিল পূর্ণতার আবর্ত্ত-উচ্ছ্বাসে।

চম্পকের তীব্রগন্ধে অন্ধকার বনচ্ছায়া উঠিল চমকি,
কদম্বের শিহরণ নৈশবায়ুলীলাভরে চলিল ভাসিয়া,
আকাশের সর্ব্বঅঙ্গে তারকারোমাঞ্চ-হর্ষ লাগিল আসিয়া,
অকস্মাৎ স্তব্ধরাত্রি কৃষ্ণাবগুণ্ঠন টানি দাঁড়াল থমকি।

বলেছিলে এ আকাশ তৃপ্তিহীন অন্ধকারে হইবে বিলীন,
স্বাদহীন মেঘলোক নির্বিচ্ছেদে ছাইবে অন্তর,
বিরক্ত উদাস ছায়া কায়াশূন্য নিরন্তর অন্ধ ও মন্থর
তোমার বিরহরূপে এ জীবন আবরিয়া রবে চিরদিন।

গুঞ্জরিয়া কয়েছিনু প্রেয়সীরে বক্ষে টানি অন্ধকার রাতে,
জীবনে কামনা সত্য, মৃত মিলনের স্মৃতি বৈধব্যছলনা,
দেহের সৈকতপ্রান্তে জোয়ারের ক্ষতচিহ্ন ক্ষণ আলিম্পনা
লুপ্ত হয় কক্ষচ্যুত তারকার মৃত্যুদীপ্ত শর্ব্বরীবেলাতে।

আজি অমানিশারাতে আবার ফুটেছে তারা আকাশের তলে,
স্নিগ্ধগন্ধ অন্ধকারে মনে পড়ে বিন্ধ্যগিরি-পরপারে তুমি,
হয়তো উন্মার্গ দেখে তোমারে করেছে গ্রাস লুব্ধ মরুভূমি,
হয়তো লভেছে প্রীতি মৃত্যুর নীলিম মুক্তি দিনান্তের জলে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

কবিতার মৃত্যু

কাল্‌কের আব্‌ছায়া রাত্রের আঁধারে, জান্‌লার ঠিক নীচে দেখ্‌লাম্—
ঝোপে ঝাড়ে যেখানটা বেল ফুল ফুটেছে মেটে মেটে জ্যোৎস্নার
আলোতে—
ঢল্‌ঢলে লতা পাতা লুটোপুটি খাচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া এসে লাগ্‌তে,
আলো আর কালোতে কি কানাকানি চ'ল্‌ছে—সেইখানে মেয়ে এক
অপরূপ!
—চোখে তার চম্‌কায় তারাদের ইসারা, মেঘ-ডুরে শাড়ী তার পরণে,
দুই হাতে পরা তার রবারের লাল রুলি, চুলে তার বুনো ফুল জড়ানো;
চৈতালী ফসলের পাকা শীষ এক গোছা—তার মাঝে মুখ ঢেকে কাঁদছে,
আব্‌ছায়া নিশীথের তারা-ভরা বিজনে, দেখ্‌লাম্ মেয়ে সেই অপরূপ।

* * * *

কাল্‌কের আব্‌ছায়া রাত্রের আঁধারে, শুন্‌লাম্ মেয়ে সেই অচেনা—
আমাকেই ডেকে যেন কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ছে, "চ'ল্‌লাম, চ'ল্‌লাম্ ঢের দূর—
ঐ নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঝর্ণার ঠিক্‌রিয়ে পড়া জলে ছোট নদী
ছুটছে,

যার তীরে পরীরা জাফ্‌রাণী চুল খুলে আন্‌মনে বাজাচ্ছে এস্রাজ;
হাল্কা পায়ের তলে খেলে চলে নীল জল—কালো চোখে তারাফুল ফুটছে;
দিন নেই, রাত নেই, চির-হাসি চির-আলো—সেই দেশে এতদিন
থাক্‌তাম,
কেন তুমি ভুলিয়ে যে নিয়ে এলে এখানে, শেষকালে অবহেলা হান্‌তে?
আব্‌ছায়া নিশীথের তারা-ভরা বিজনে, শুন্‌লাম কথা সেই অদ্ভুত!

* * * *

ভরা এই দিবালোকে ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি, কাল্‌কের ব্যাপার কি স্বপ্ন?
কার মেয়ে কোত্থেকে এলো এই বাগানে, ব'ল্‌লো যা কিছু তার
মানে হয়?
ঘুমে ভারা চোখে যাকে দেখ্‌লাম কাঁদ্‌তে, সত্যিই সে কি এসে
কাঁদে নি?
অল্‌জ্বলে মুখ তার এখনো যে মনে পড়ে……সে আমারি কবিতা
কি অতীতের?

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কবিকিশোর

(১)

God's in his Heaven
All's right with the world.

সহরের বুকে পাঁচতলায়
নেবো সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট্।
ট্রাম বাস্ ভিড় নিত্য যায়—
উচ্চবৃক্ষচূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়!

গোলমাল যেন পায়েতে ম্যাট্।
সহরের বুকে পাঁচতলায়
মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্ল্যাট্।

ঘুঘুনি ও ঘুঘু রইবো তায়—
আর্কেডিয়া কি, বুঝবে তাই।
সে ছোট্ট ফ্ল্যাট্, চৌমাথায়—
এলসি ও বব্ রইবো তায়—
ক্ষীণ কোলাহল ভাসে হাওয়ায়
ঘেঁসাঘেঁষি করে' দিন কাটাই।
এল্‌সি ও বব্ রইবো তায়—
কবিজীবন কি বুঝবে তাই।

(২)

প্রিরাফায়েলাইট্

প্রতিটি মুহূর্ত্তে মোর মূর্ত্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্ব্বাসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা শাপান্ত কৌতুক।
সূর্য্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক।
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন।
ভুলে' গেছি কিবা ভুল—দিন মোর ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র বনানীর মতো।
প্রত্যহপ্রভাতে জানি দিন মোর ব্যর্থতা আহত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস।

দীর্ঘিকায় ভাসিলাম—তোমাদের তরঙ্গের মাঝে
খাণ্ডবদাহের ক্ষত জুড়ালো না হায় নারী হায়!
কাজলগভীর মৃগনয়নের ঘনপক্ষ্মছায়ে
প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এলো শ্যামপত্রসাজে
শীতমরুচিত্তে মোর নিঃশ্বাসের দক্ষিণহাওয়ায়।

(৩)

হেলেনিষ্ট্

চাঁদ চলে' গেছে,
কৃত্তিকা গেলো,
মধ্য রাত্তি।
প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন।

(৪)

মোনালিসা

মনে-মনে বলি,
হে মোনালিসা!
সাইনারা!
এসো মলিন আলোয়।
সহরের মুখে ধূসর সন্ধ্যা নামে।
হৃদয়ে আমার ঘরছাড়া যে গো ডাকে।
আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী।
আমি তাই তো আকাশে কান
পেতে শুনেছি তোমার গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা!
মলিন আলোয় বইয়ের পাতায়
স্বপ্ন আতুর বিদেশী ভাষার মায়ায়
তোমাদের পদপাত
করেছে আমাকে একাগ্র ব্রতচারী।
সাগরের ঢেউয়ে বহুদিন হলো তুলে' তো দিয়েছি পাল,
অশেষ যাত্রা, অসীম সাগর, শুধু পদপাত গুণি।

হে মোনালিসা, শুধু হাসো তুমি মধুরহাসিনী
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা,
ক্লান্ত ঘরের নীরবতা দেখো তোমাকে ডাকে
পেটারের মেয়ে,
কুমারের মন ঘরছাড়া হলো তোমার খোঁজে
কবিতার বাঁকা ইন্দ্রধনুর দুরূহ পথে,
হে সাইনারা, কালো রাত্রির ক্লান্ত ঘুমে,
পরিশ্রান্ত স্বপ্নে তোমার
কুমারের মন কামনাছটায় তোমার আসা
ধমনীর তালে শুধু পদপাত, অকারণ পদপাত।
সাইসিফাস্ যে মরণক্লান্ত, শুধায় তোমায় আসবে ? তো এসো
হে মোনালিসা, হে সাইনারা, স্বপ্নসঞ্জীবনীর বীজনে এসো
এসো এই মলিন আলোয় সাগরের শ্বেত কেশর পাণ্ডু দুপায়ে মেখে।
বহুদূরদেশে জড়তার গ্লানি বুকে, সহরের মুখে ক্লিষ্ট সন্ধ্যা নামে।

(৫)

প্রলাপকম্পন

কবিকিশোর ফিরেছি পথে পথে
সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যতো পাণ্ডু মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে ছুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত ;
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে,
কাহারো হাসি আঁখিজলেরি মতো।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।

কেহ বা কারে কহে নি কোন কথা,
কেহ বা জিন্ খায় নি ধীরে ধীরে।
এমনি করে' ফিরেছি পথে পথে
অনেক দূরে ফীটনে পদরথে ;
রূপার দেশে রূপালী রাজবালা
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।
ঘুরেছিলাম মোনালিসার খোঁজে,
লিসির মাঝে তাহার হাসি বুঝি !
দাভিঞ্চির দৈবী নিপুণতা !
সুদূরদেশে রচনা তার খুঁজি।
বাদলমেঘ খুলেছে বেণী তার।
বৃষ্টি ভেজা পার্ক্ ষ্ট্রীটের মুখে
প্রহরী আলো জাগালো চিকিমিকি
কদম্বের পুলক মোর বুকে।
সন্ধ্যা আর মেঘের আশ্লেষে
পূরবী বায়ু ফেলিছে দ্রুতশ্বাস,
ওয়াল্ট্স্ধ্বনি পায়েতে গতি আনে,
হঠাৎ লিসা দাঁড়ালো মোর পাশ।
সাইনারার পূর্ব্বস্মৃতি চোখে !
লিসার হাসি দেহী যে মরলোকে !
রূপার দেশে রূপালী রাজবালা
তাহারি গলে পরায়ে' দিনু মালা !

(৬)

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের স্বপ্ন

চলে' গেছে চাঁদ,
শান্ত ধূসর অন্ধকার,
সূর্য্য এখনো আসে নি,

শীতল স্থির আকাশ,
গ্যাস্ নিবে' গেছে,
জাগে নি কো কাক,
বাতাস চুপ—
শুধু কাঁপে তার, শুধু বাজে শ্বেত বক্ষ তার।

বিষ্ণু দে

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে,
মরুময় দীর্ঘতিয়াসার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে।
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে ॥

যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে, মাটিতে।

ধ্বনিত টিনের ছাদে, গলিতে, গ্রামের আর্দ্র মাঠে
জলের ডাহুকী ডাকে, প্রাচীন জলের রলরবে ;
খাঁ-নৌড় ; বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গ শীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্ম্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে ॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে ॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর,
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লয়হীন সুর ॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকী

সম্প্রতি কলিকাতা দর্শন পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এক নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যেও জুটেছিলো। দার্শনিক না-হয়েও সে-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার লোভ আমি সাম্‌লাতে পারিনি, কারণ শুনেছিলুম যে তাতে সনাতন সমস্যাগুলোর চর্ব্বিত চর্ব্বণ বন্ধ রেখে, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহকর্ম্মী ও সহধর্ম্মীরা তাঁর সত্তর বৎসরব্যাপী জ্ঞান সাধনার রহস্যোদ্‌ঘাটন করবেন। দুঃখের সঙ্গে মান্‌ছি যে এ-ক্ষেত্রেও আশাকে কুহকিনী ব'লে চিনেছি; ওজস্বিনী বক্তৃতার অনন্ত বন্যায় বারম্বার তলিয়ে গিয়ে এ-কথা যদিও নিঃসন্দেহে জেনেছি যে আচার্য্যদেবের সকল শিষ্যই বিদ্যা-বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তবু সেই ধুরন্ধরদের আলোচ্য বস্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, হা'য় পূর্ব্বে যে-তিমিরে ছিলো, এখনো সেই তিমিরেই সমাচ্ছন্ন। অবশ্য আমার মূঢ়তার দায় সেই কৃতকর্ম্মাদের উপরে চাপানো অনুচিত; ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশত আমি প্রায়ই বাগবিস্তারের মর্ম্ম হারিয়ে ফেলি, পরে যখন ভাববার অবসর মেলে, তখন দেখি যে প্রথমে যে-কথাকে নিরর্থক লাগে, ক্রমশ প্রকাশ পায় তারই অর্থগৌরব। এবারেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি; স্মৃতিতে সে-সভার কার্য্যাবলী অশোভন ঠেকলেও তার আত্মজৈবনিক বাক্যচ্ছটায় এখন আর আমি অভিভূত নেই, অনেক অনুচিন্তার পরে আজ স্পষ্টই বুঝেছি যে দার্শনিকদের গুরুভক্তি স্বপ্রাধান্যের ছদ্মবেশেই লোকসমক্ষে আসে। খুব সম্ভব প্রাচ্য দর্শনের একীভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সেদিনকার পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বিজ্ঞাপনে গুরুকে বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ শতমুখ আত্মপ্রসাদের মধ্যেও তাঁরা আচার্য্যদেবের নাম নিতে ভোলেননি, প্রত্যেকেই নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে বলেছিলেন যে ভারতীভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যাপনা বা সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী ফল।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ-প্রশস্তি সুশ্রাব্য হলেও মূল্যহীন; কারণ নাটকের সূত্রধার যদিও অপরিহার্য্য, তবু দর্শক স্বভাবতই শুধু কুশীলবদের মনে

রাখে। অবশ্য স্মৃতি-বিস্মৃতির অনেকখানিই দৈবাধীন, এবং লোক-যাত্রার সুপিচ্ছল পথে অধিকাংশ মহাপুরুষের পদরেখাই দুর্নিরীক্ষ্য। বিশেষত যাঁরা দিশারী, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছননি, শুধু সম্ভাবনার নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা হয়তো ঐতিহাসিক মানুষই নন, ঋণকুণ্ঠ সংসার তাঁদের ধার শুধেছে পুরাণের যাদুঘর নির্ম্মাণে। কিন্তু সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় নিয়ামকেরা শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ছেড়েছেন, এবং ব্রজেন্দ্রনাথ আজও জীবিত, ভারতবাসী এখনো তাঁর পরম বাণীর প্রত্যাশায় সমুৎসুক। সুতরাং নিরুদ্দেশের যাত্রী ব'লে তাঁকে এরই মধ্যে রূপকথার রাজ্যে পাঠানো অবিচার তো বটেই, অত্যাচারও কম নয়। কারণ বিদ্যানুরাগ যতই প্রগাঢ় হোকনা কেন, কেবল পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্রই উপহাস্য; এবং নানাশাস্ত্র-বিশারদ আখ্যা ব্যতীত যদি অন্য কোনো বিশেষণ শীলুমহাশয়কে না-মানায় তবে তাঁর গুণমুগ্ধ গত তিন পুরুষের বাঙালীরা যেমন নির্ব্বোধ, তাঁর প্রেরণায় প্রবর্ত্তিত অগণ্য ভাবুকের দলও তেমনি কপোলকল্পনা। আসলে আচার্য্যদেব বিদ্যা-দিগ্‌গজদের চেয়ে অনেক উর্দ্ধ স্তরের লোক, তাঁর সর্ব্বজ্ঞতা নিশ্চয়ই অবিসংবাদিত, কিন্তু আরো অবিসংবাদিত তার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে এত দিন ধ'রে বাঙালী মনীষার প্রতিভূকল্প ক'রে রেখেছে, এরই কল্যাণে তিনি এত লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষণার পাথেয় জুগিয়েছেন; এবং এরই দৌরাত্ম্যে তাঁর কোনো স্থায়ী অবদান হয়তো মানুষী চিৎপ্রকর্ষে থাকবে না। কারণ অনেকের মতে অহমিকাই ব্যক্তিত্বের পাদপীঠ, তার সংঘাতে অনুযাত্রের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে তাকে জ্ঞানান্বেষণে নামানো গেলেও, স্বতন্ত্র সত্যের সন্দেশ আনে মমত্বমুক্ত নিরাসক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তিবাদী ভূমাবাদীর বিধর্ম্মী; এবং তত্ত্বরচনার জন্যে একটা কোনো নৈর্ব্যক্তিক তন্মাত্রের অখণ্ড উপলব্ধি যেহেতু অত্যাবশ্যক, তাই নীট্‌শে-প্রমুখ সোহং স্বামীরা দর্শনের অছিলায় কাব্যচর্চ্চাতেই মাতেন, হিউম্-পন্থী যুক্তিসর্ব্বস্বদের আয়ত্তে আসে অলক্ষ্যভেদের ব্রহ্মাস্ত্র।

আমি জানি, পূর্ব্ব প্যারাগ্রাফের সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই অসঙ্গত ঠেক্‌বে; এবং আর কেউ তার প্রতিবাদ না-করলেও, অন্ততপক্ষে

আচার্য্যদেবের শিষ্যমণ্ডলী সমস্বরে বলবেন যে নিরহঙ্কার ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু বিনয়ব্যবহারের জন্যেই বিশ্ববিশ্রুত নন, ভূমানন্দও তাঁর জীবনের আদিম ও অবিকার অনুভূতি। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই তাঁদের প্রথম প্রস্তাবের সাক্ষ্য ; এবং তাঁদের দ্বিতীয় দাবি যে অনতিরঞ্জিত, তার প্রমাণ শীলমহাশয়ের তরুণ বয়সের অপ্রকাশিত মহাকাব্য 'দি কোয়েষ্ট্ অব্ ইটার্নাল'। অধিকন্তু শুনেছি যে ব্রজেন্দ্রনাথ সত্যের যূপে একাধিক বার স্বার্থবলি তো দিয়েইছেন, এমন-কি বৈষ্ণবদের খৃষ্টের পদান্তে বসিয়েও তিনি ঐতিহাসিক সততাকে দেশাত্মবোধরূপ শনির দশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তাহলেও আমার বিবেচনায় আচার্য্যদেব আত্মরত মানুষ ; তাঁর চিন্তাজগতের ভিত্তি যদিও একটা বিরাট উপলব্ধির উপরে, তবু সে-উপলব্ধি আপাতত আত্মোপলব্ধি, তাতে বোধহয় নৈরাত্ম্যের বীজ নিহিত নেই। অবশ্য এ-আত্মোপলব্ধিকে দৈনন্দিন আত্মস্তরিতার সম-পংক্তিতে ফেলা হঠকারিতা ; কিন্তু সাংসারিক অহংজ্ঞানের মতো, দৈন্যবোধের গ্রন্থি থেকেই এরও উৎপত্তি। তবে সে-দৈন্যবোধে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের স্থূল হস্তাবলেপ নেই, ঐকপদিক অসম্পূর্ণতা সেখানে জাতীয় আত্মগ্লানিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমী ঐতিহ্যের তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির অকিঞ্চিৎকরতাই তার উপলক্ষ, রামমোহনী গৌরতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তার সাফল্য, তার ব্যসন প্রাদেশিক কূপমণ্ডূকত্ব। কারণ রামমোহনের পরবর্ত্তীরা অনেক ঠেকে শিখেছিলেন যে সে-অগ্রদূতের নবাবিষ্কৃত ভাবরাজ্যে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ আদৌ মঙ্গলময় নয় ; সে-অঞ্চলের বাসিন্দারা অতীতের অবরোধ এড়িয়েছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের স্বায়ত্তশাসন তাদের হাতে আসেনি ; তারা এক দাসখৎ ছিঁড়ে ফেলে আর এক দাসখতে সই দিয়েছে মাত্র, ভিক্ষাজীবিকার বদলে স্বোপার্জ্জনের সামর্থ্য পায়নি। তাই ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ স্বাবলম্বনসাধনায় আত্মনিয়োগ করলে ; তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে নেতৃত্বে ব'রে ত্রিভুবনে খবর পাঠালেন যে পশ্চিমের অমূল্য ধনরত্ন প্রাচ্য কোষাগারেরই লুণ্ঠনাবশেষ। অচিরেই সাংখ্যে হিন্দু 'পজিটিভ্ সায়ান্স'-এর আহার বেরুলো ; কণাদ অণুবাদী বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠীপতি হয়ে

উঠলেন ; যে-নব্যন্যায় নবজাত শিশুর ক্রন্দনকে কর্ম্মবাদের অখণ্ডনীয় প্রমাণ হিসেবে গুণে এসেছে, বলা হলো, পাশ্চাত্য লজিক তার সামনে নিরবধি অধোবদনে থাকবে। উপরন্তু আমরা ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারেই থামলুম না ; যে-সর্ব্বনাশা ব্যবকলন ও অমানুষিক সত্যানুরক্তি য়ুরোপীয় বুদ্ধিব্যবসায়ীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, তাতেও তাকে হারানোর আয়োজন চলতে লাগলো। বলাই বাহুল্য সেই উত্তেজিত বিদ্রোহের মধ্যে দার্শনিকশোভন প্রশান্তির সুযোগ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথেরও জোটেনি। হয়তো সেইজন্যেই তিনি ভেবে দেখেননি যে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে যদি অর্ব্বাচীন অন্যদেশের অশরীরী প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই না-মেলে, তবে তার নামসঙ্কীর্ত্তন যতটা লজ্জাকর, তার পুনরুজ্জীবন ততোধিক পণ্ডশ্রম।

দৈবকৃপায় সে অনাসৃষ্টির প্রকোপ সম্প্রতি কমেছে ; এবং মানসিক পরিশ্রমের আধিক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ না-ঘটলে শীলমহাশয় নিশ্চয়ই 'নিউ এসেজ্ ইন্ ক্রিটিসিজম্' অথবা 'পজিটিভ্ সায়ান্সেজ্ অফ্ দি এন্‌শ্যেণ্ট্ হিন্দুজ্'-এর অপেক্ষা মহার্ঘ বই এত দিনে অনেক লিখে ফেলতেন। কিন্তু তাহলেও তত্ত্বদর্শনের একটা নূতন সময়য় আমরা তাঁর কাছ থেকে ইতি-মধ্যে পেতুম কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান জীবনের অশেষ বৈচিত্র্যই যদিও এই সংশয়ের প্রথম কারণ, তবু ব্রজেন্দ্রসাহিত্যের সর্ব্ববাদিসম্মত দুর্ব্বোধ্যতা, এবং পক্ষান্তরে তাঁর অনুষঙ্গপ্রধান চিন্তাপ্রকরণের বিশৃঙ্খলাও, এজন্যে কিয়দংশে দায়ী। অবশ্য এই দুরূহতা, এই অবচ্ছেদ যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাক্তন অভিজ্ঞার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তাতে হয়তো মতান্তর নেই ; এবং সেইজন্যেই তাঁর মনকে আবাল্য পরিণত বলাও সমীচীন। তার মানে এ নয় যে আচার্য্যদেবের মতামত জন্মাবধি বদলায়নি ; বরং উল্‌টোটাই সত্য, এবং তাঁর কৈশোরিক হোগেল্-ভক্তি বার্দ্ধক্যে স্বভাবতই বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে মিশে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হলেও অনিবার্য্য নয় ; এর মধ্যে কোনো অকাট্য যুক্তিসূত্রের চিহ্ন মেলেনা ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে তাঁর অগাধ আস্থাই তাঁকে সমস্ত তুলামূল্য উৎরিয়ে অবাধ নিঃশ্রেয়সের সামনে এনেছে। সুতরাং এই

ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে হোগেল্-এর ডায়ালেক্‌টিক্-প্রসূত নির্বিকল্প কৈবল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এ-নিরুপাধিক অনুভূতি অচিন্ত্য; অপবাদ-ন্যায়ের নেতি-নেতিই এর একমাত্র সংজ্ঞা; এবং তত্ত্বদর্শনের উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের অতিবিশিষ্ট অভিজ্ঞতাকেও সামান্যের অনুবন্ধে বাঁধা, তাই ব্রজেন্দ্রনাথের স্বয়ংসিদ্ধি এ-পর্য্যন্ত কোন চিন্তাপরম্পরা গড়তে পারেনি, মরমী প্রভাবে অন্তরঙ্গদের অন্তঃপ্রেরণাই জুগিয়েছে। সে-ইষ্টাপত্তিও নিশ্চয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যাঁরা তত্ত্বসমন্বয়ের প্রণেতা, তাঁদের ধরণ-ধারণ অন্য রকমের; বুদ্ধি ও ধারাবাহিকতাই সে-প্রতিভার গুণ; সে-প্রকৃতি মুখ্যত হেতুপ্রভব। তবে হেতুবাদে নির্ভর ঘুচলেই অধীক্ষা অধঃপাতে যায় না; এবং ব্যাড্‌লি-বর্ণিত সত্যের স্বরূপে সদসদের নির্দ্বন্দ্বও তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত। অতএব উপরোক্ত মন্তব্যের সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথকে অ-ন্যায় আচরণের জন্যে সনাক্ত করা আমার অনভিপ্রেত। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর গণিতবিলাসী বিপরীত পথের পথিক; এবং শেষোক্তের শুচিগ্রস্ত নিত্যপদ্ধতি প্রায়ই প্রথমোক্তের ব্যবহারে আসে না। কারণ তথ্যই যদিও সব অনর্থের মূল, তবু তা ছাড়া তত্ত্বের অন্য উপকরণ নেই; এবং তত্ত্বের পক্ষে অন্তর্দর্শন আবশ্যক বটে, কিন্তু ভূয়োদর্শনও দুরাক্রম্য। এইখানেই সমন্বয়ের প্রয়োজন; এবং তাত্ত্বিক যখন নিজেকে কোনো নির্ব্বিভাষিক নিয়মের নিমিত্তমাত্র ভেবে, পুরুষার্থ আর পরমার্থের দুস্তর ব্যবধানে লজিকের সেতুবন্ধ গড়েন, তখনই তিনি তথাগত, তার আগে পর্য্যন্ত ব্যাসকূটের পদকর্ত্তা দ্বৈপায়ন।

আমার অনুসারে ব্রজেন্দ্রসাধনার অন্তর্গূঢ় নিঃসম্পর্কতাই আর্য্য আদর্শের অমোঘ অভিব্যক্তি। প্রতিকূল জনশ্রুতি সত্ত্বেও আমি মনে করি যে আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রকৃত ফিলজফির অনুকম্পায়ী নয়; আমাদের কাছে প্রামাণ্য এখনো প্রজ্ঞার অগ্রগণ্য; এবং সে-প্রামাণ্য যদিও আধুনিক কালে আপ্তবাক্যের আঁচল ছেড়ে আত্মবেদের ভেক নিয়েছে, তবু যুক্তিকে আমরা জাল ব'লেই জানি, তার বিশ্লেষণেই যে আবদ্ধ বুদ্ধির লোকোত্তরযাত্রা সম্ভব, এমন বিশ্বাসে আমরা অনভ্যস্ত। কাজেই

বৈনাশিকেরা এ-দেশে তিরস্কার কুড়িয়েছে, প্রাচী পূজা করেছে ধর্ম্মধ্বজদের। সেইজন্যেই হিন্দু দর্শন সার্থক গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়নি, সূত্রাকারে অথবা সংক্ষিপ্ত শ্লোকে তা স্বাধিকারপ্রমত্ত ভাষ্যকারদের আশ্রয় দিয়েছে। সেই কারণেই একই ন্যায়নিষ্ঠার তাগিদে জ্যামিতির গড়া-ভাঙা ভারতীয় কীর্ত্তিকলাপের অন্তর্গত নয়, পাশ্চাত্য ধীশক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু বিদেশের আত্মঘাতী বিচারবুদ্ধি বিজ্ঞানের পক্ষেই অপরিত্যাজ্য, জ্ঞানের নিকষে স্বদেশের আধ্যাত্মিক সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতাও অতিশয় উপকারী; এবং জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অভিধা যেকালে আজ অবধি আলাদাই আছে, তখন এ-ক্ষেত্রে একাগ্রতা নিশ্চয়ই মারাত্মক। বস্তুত ব্যক্তির মতো জাতির মধ্যেও অধিকারভেদ বিদ্যমান; এবং পশ্চিমের ভাবধারা যেমন অভিব্যাপ্ত স্বতোবিরোধের আবিষ্কারে যুগযুগান্তর কাটিয়েছে, পূর্ব্বের ধ্যান-ধারণা তেমনি সেই বিরোধের পরপারে আবহমান কাল খুঁজেছে অনির্ব্বচনীয় প্রজ্ঞাপারমিতাকে। বিশ্বমানবের ঐশ্বর্য্য বাড়াতে দুই পরিশীলনই সমান মর্য্যাদাবান, এবং এই সত্যকে সর্ব্বাগ্রে অঙ্গীকার করেছিলেন ব'লেই রামমোহন রায় অবিস্মরণীয়। শুনেছি, শীলমহাশয়ও রামমোহনের পরম ভক্ত; এবং তাঁর অবচৈতন্যে সে-মৈত্রীর ঝঙ্কার বাজুক কি না-বাজুক, তাঁর বিশ্বম্ভর পাণ্ডিত্য যে সে-সঙ্কলনধর্ম্মেরই রূপান্তর, তাতে প্রতর্কের অবকাশ নেই। সুতরাং আজকের বহুধাবিভক্ত সমাজে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁর দীর্ঘায়ু সকল মানবপ্রেমিকের অবশ্যকাম্য। কারণ কোষ্ঠীবিচারে আচার্য্যদেব সক্রেটিস্-বংশের শেষ কুলপ্রদীপ; সুসম্বদ্ধ 'সিস্‌টেম' রচনা তাঁর কর্ত্তব্য নয়, প্রতিবেশকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েই তিনি ভারমুক্ত। তাঁর ঐকান্তিক অন্তর্দৃষ্টি জাগতিক বীক্ষায় পর্য্যবসিত হবে পশ্চাদ্‌গামী প্লেটোর প্রয়োগে; এবং সে-প্লেটোর কণ্ঠস্বর যদি আজও বাঙালী না-শুনে থাকে, তবে ব্রজেন্দ্রনাথের কোনো দোষ নেই, অপরাধ বাংলার দুরদৃষ্টের।

* * * *

স্থানের কার্পণ্যে গত সংখ্যায় টমাস্ মান্-এর ষষ্টিতম জন্মোৎসবের

খবর পরিচয়ের পাঠকবর্গকে দিতে পারিনি। সৌভাগ্যক্রমে বাংলা বৎসর গণনায় তিনি এখনো ষাটে। কিন্তু তা না-হলেও এ-প্রসঙ্গে সাহিত্যামোদীরা সানন্দেই কান পাততেন। কারণ কেবল বয়সের গুণেই মান্ আমাদের নমস্য নন; এমন-কি বর্ত্তমান উপন্যাসিকদের পুরোবর্ত্তী ব'লেও তিনি আজ আমাদের মন জুড়ে নেই; তাঁর উপরে হিট্‌লার-রাজ্যের অত্যাচারই তাঁকে সম্প্রতি স্মরণীয় করেছে। যুদ্ধ শেষে বিজেতাদের নির্য্যাতনে তিনি যেমন তাঁর উদারনীতি ভোলেন নি, আজ তেমনি স্বদেশের হাওয়া বদ্‌লেছে জেনেও তিনি তাঁর স্বাধীনতা-বিলাসী বন্ধুদের ছাড়তে অনিচ্ছুক; এবং এই অপরাধে, শুধু তিনি নন, তাঁর সমগ্র পরিবার এখন নাৎসিদের চক্ষুশূল। আজ তাঁর বিষয়সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত, তাঁর পুস্তকাবলীর প্রচার নাকি জার্ম্মানিতে অবিহিত, স্বভাষী পত্রিকাগুলি তাঁর নিন্দারটনার ব্রত নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছে, এবং তিনিও তাঁর আত্মীয়-স্বজন কিছু দিন থেকে স্বদেশবিতাড়িত হয়ে অগতির গতি সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে বাসা বেঁধেছেন। অবশ্য তাঁর উপস্থিত অবস্থায় বিস্ময়ের কারণ নেই; কেননা জার্ম্মান্ চরিত্র চিরদিনই বৈশিষ্ট্যবিনাশী, এবং কাণ্ট্ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক জার্ম্মান ভাবুকই রাজপুরুষের নিগ্রহ সয়ে গিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও মানুষের অক্ষয় উত্তরাধিকারে জার্ম্মানির দান যে নগণ্য নয়, তার জন্যে দায়ী মান্-এর মতো আত্মমর্য্যাদাবান ব্যক্তির ধৈর্য্য ও ক্ষমা, তাঁদের অদম্য সত্যানুরক্তি ও অসামান্য স্বার্থত্যাগ। জার্ম্মান মেধা মন্থরগামী, ল্যাটিন্ জাতির কাছে যে-সত্য নিমেষে ধরা দেয়, তাকে জার্ম্মান পণ্ডিত খুঁজে পান আমরণ অনুসন্ধানে। কিন্তু হয়তো এইজন্যেই তাঁদের জেদ কুরুদুর্লভ, মানস সংগঠনে স্থিতিস্থাপকতার অভাববশত তাঁরা যখন সকল পথ মাড়িয়ে চরম পথে দাঁড়ান, তখন তাঁদের সেখান থেকে টলানো প্রায় অসাধ্য। মান্-এর মুক্তিমার্গও সেই সনাতন উপায়ে আবিষ্কৃত, এবং যুদ্ধের সময়ে তিনি কাইজারী ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা ও চিরাচারের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক পক্ষপাত কোনোমতেই টিঁক্‌লোনা, এবং কর্ত্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার অসংখ্য নমুনা দেখে তিনি

অবশেষে বুঝলেন যে রাষ্ট্রচালনার ভার জনগণের হাতে আসা উচিত। তাহলেও উচ্চ অলতায় তিনি চিরকালই বীতশ্রদ্ধ, এবং তাঁর অভ্যস্ত মিতভাষণের ফাঁকে ফাঁকে যে-দু-একটা রাজনৈতিক মতামত আমরা শুনেছি, তার ধূয়া সংযম ও শালীনতা। এই পরিপ্রেক্ষণিকা তিনি এখনো হারাননি; এবং দেশবাসীর যে-ধ্বংসতাণ্ডব স্বয়ং আইন্‌ষ্টাইন্-কেও তিতো ক'রে তুলেছে, সে বিভীষিকায় মান্-এর মুখ ফোটেনি। 'য়োসেফ্ উণ্ড্ জাইনে ব্রুডার'-নামক তাঁর সদ্য প্রকাশিত ত্রিপিটক প্রতি পৃষ্ঠাতেই শান্ত, শিব, সুন্দরের অবিকল আরাধনায় পূর্ব্ববৎ তন্ময়; বাইবেল-বর্ণিত জোসেফের নির্ব্বাসনকাহিনীর আনুকূল্য পেয়েও তিনি তাঁর উৎপীড়িত সহধর্মীদের মতো, উপন্যাসকে অভিযোগ জ্ঞাপনে লাগাননি; এবং এই বইগুলির গল্পাংশের সঙ্গে লেখকজীবনের ঘটনাগত সাদৃশ্য যদি বা কোনো গভীরদর্শী পাঠক খুঁজে পান, তবু এ-কথা না-মেনে গত্যন্তর নেই যে নায়কচরিত্রের নিষ্ঠুর বিশ্লেষণ সর্ব্ববিধ আত্মপ্লাঘার পরিপন্থী। এই রকমের নির্লিপ্তিই রসস্রষ্টাকে মন্ত্রস্রষ্টার পর্য্যায়ে আনে, ভোগাসক্ত শিল্পিসমাজে এর দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল; তাই মান্-কে আজ আর আমি শুধু রূপদক্ষ হিসেবেই দেখছি না, তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি তিনি মুমূর্ষু মানবসভ্যতার অবশিষ্ট কেতনবাহীদের অন্যতম ব'লে। আমার বিশ্বাস, একদিন য়ুরোপে এই রকম মানুষ একাধিক জন্মাতো; এবং সেইজন্যেই পশ্চিম আজও জগজ্জয়ী। কিন্তু তাঁদের যুগ আর নেই, তাঁদের জীবনকাহিনী এখন কিংবদন্তীর সামগ্রী, তাঁদের পুনরুত্থানও হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মেই নিষিদ্ধ।

* * * *

চিত্রগুপ্তের অফুরন্ত খাতার প্রতিযোগিতা পরিচয়কে সাজে না। গত কয়েক বছর ধরে কৃতী মানুষের তিরোধান যে-দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হয় পৃথিবীর মহাপ্রাণ সন্তানগণ স্বৈরিণী মায়ের সঙ্গে ধর্ম্মঘট করতেই বদ্ধপরিকর। তাছাড়া এই কর্ম্মবীরেরা শুধু সংখ্যাতে অগণ্য নন; তাঁদের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এত স্তরভেদ আছে যে হাতে স্থান ও সময়ের পর্য্যাপ্তি থাকলেও, সর্ব্বমুখীনতার অভাবে আমি

সে-সকল জীবনবৃত্তান্তের সংক্ষেপসার দিতে পারতুম না। কিন্তু শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার পক্ষে অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি-র মৃত্যুকে নীরবে মেনে নেওয়া শক্ত। তার কারণ এ নয় যে অসংখ্য ভারতবাসীর মতো আমিও অধ্যাপক লেভি-র সঙ্গে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাঁর সম্বন্ধে এ-কথাও বলা চলে না যে তিনি ভারতবেত্তা সুধীমণ্ডলের শিরোমণি। কিন্তু এ-প্রশংসা বিদ্বজ্জনের মধ্যে বোধহয় তাঁর একলারই প্রাপ্য যে বিশেষজ্ঞ হয়েও তিনি মনুষ্যধর্ম্মের বাদ সাধেননি, এবং বৈদগ্ধ্যকে পাণ্ডিত্যের উপরে তুলে, নিজের ও শিষ্যদের জীবন থেকে টিউটনিক একদেশদর্শিতার ভূত তাড়িয়েছিলেন। হয়তো তাঁর সহজ সভ্যতা আর মৌল সংস্কৃতিই তাঁকে প্রাচ্য পুরাবৃত্তে টেনেছিলো; এবং শুনেছি, আধুনিক ভারতে ওই দুই সম্পদের শোকাবহ স্বল্পতা দেখেই তিনি এ-দেশে বৃটিশ শাসনের চিরপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। খুব সম্ভব শেষ অভিমতটি দুর্মুখদেরই কপোলকল্পিত; অন্ততপক্ষে তাঁর রচনাবলী ঘেঁটে এমন কোনো প্রক্ষিপ্ত হঠোক্তির আবিষ্কার দুঃসাধ্য, যার অনুমোদনে লেভি-কে ভারত সরকারের অন্ধ স্তাবক বলা চলে। কারণ তাঁর প্রকৃতি শান্তিপ্রিয় ও রক্ষণশীল ছিলো বটে, কিন্তু লেভি-র আচারে ব্যবহারে অন্যায় বর্ণাভিমানের নাম-গন্ধও কোনোদিন ধরা পড়েনি; এবং আকস্মিক জাতিদ্রোহে উত্তরসামরিক য়ুরোপ কী পরিমাণে বিষিয়ে উঠেছিলো, তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন ব'লেই প্যালেষ্টাইনে য়িহুদি রাজ্যের পরিকল্পনা তাঁর সমর্থন পায় নি। লেভি-র জার্ম্মানি-বিদ্বেষও সেই নির্ব্বিরোধনীতির বিপরীত দিক; এবং তাঁর মৃত্যুর অনতিপূর্ব্ব থেকে সে-দেশের নৃশংস বর্ব্বরতা যে-সংহারমূর্ত্তি ধরেছে, তার পরে তাঁর আতঙ্কের হেতুনির্ণয়ে স্বার্থসিদ্ধির নাম নেওয়া শক্ত। কিন্তু লেভি-র মাতৃভূমির অবস্থাও নিরাপদ নয়, এবং তাঁর অন্তর্দ্ধানে ফরাসীর ধ্বংসোমুখ মাত্রাজ্ঞান আর একটি মানদণ্ড হারালো।

পুস্তক পরিচয়

বীথিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি একদা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ব'লেছিলেন—

> The moving accident is not my trade,
> To freeze the blood I have no ready art,
> 'Tis my pleasure alone in a summer shade
> To pipe a simple song for a thinking heart.

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীর একমাত্র স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ফরাসী বিপ্লব। সমাজ বা রাষ্ট্রতন্ত্রের যে নিশ্চিত ভিত্তিকে আশ্রয় ক'রে মানুষ দিন কাটাচ্ছিল, সেটা এই আকস্মিক বিস্ফোভে কতকটা টাল্ খেয়েই আবার সাম্‌লে গিয়েছিল। তাই তখনো মানুষের জীবনে ছিল প্রচুর প্রশান্তি—সেই যুগের কবি নিদাঘের পল্লবচ্ছায়ায় বাঁশী বাজাবার অবকাশ পেয়েছিলেন। জীবনের এই সরল অবাধ গতি প্রতিহত হ'ল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—সমরোত্তর পৃথিবীর জীবন যখন অন্তর ও বাহিরের অজস্র দুর্য্যোগের আবর্ত্তে ঘূর্ণপাক্ খেতে আরম্ভ ক'রলো, তখন দেখা গেল ভাবপ্রবণ হৃদয় হয়ত এখনও আছে, কিন্তু কালধর্ম্মে পল্লবচ্ছায়া অপসারিত হ'য়ে গেছে—রৌদ্রতপ্ত নিদাঘের কঠিন বাস্তবই চোখের সামনে জল্‌জল্ করছে! বিংশ শতাব্দীর কবি তখন ব'ল্‌লেন—

> To sing of rolling wheels of multifarious parts,
> Of dust-marked cities resonant with their noise,
> And blindfolded vapid clouds in curling dirts,
> I stand a poet here of undreaming stifled voice.

উভয় শতাব্দীর কাব্য-দৃষ্টির মধ্যে এই যে মূলগত বিভিন্নতা একে যুগধর্ম্ম ব'লে এক কথায় বাতিল করা যায় না। প্রচলিত রসশাস্ত্রের আইন কানুনকে উপেক্ষা ক'রেই আজকের কবিতা তার স্বীকৃতির দাবী উপস্থিত ক'রেছে। যে প্রত্যক্ষ সংসারের গণ্ডীবদ্ধ বিচরণ-ক্ষেত্রকে আমরা অভ্যাস-মলিন ও মাধুর্য্য-বর্জ্জিত ব'লে মনে করি, যাকে আশ্রয় ক'রে আমাদের সত্তা অথচ যার সম্বন্ধে আমাদের অসন্তোষের অন্ত নেই, তাকে আমাদের চিন্তা, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার আলোকে অনুরঞ্জিত ক'রেই আজকের কবিতা অভিনবত্ব অর্জ্জন ক'রেছে। বন্ধাহীন কল্পনা-বিলাসের তাই আজ অবসর কম, আজ তাই মাত্র সুন্দরকেই কাব্যরাজ্যের সার্ব্বভৌম প্রভু ব'লে স্বীকার করা চলেনা! বিংশ শতাব্দীর কবির ভাষায় তাই বিদ্রোহের সুর শোনা গেল!

কিন্তু একটা যুগ থেকে আর একটা যুগের ক্রমাভিব্যক্তি ত পদার্থ-বিজ্ঞানের শাসনাধীন নয়—কাজেই উভয় শতাব্দীর মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্র থাক্‌বেই। যাঁরা

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গোড়া ঘেঁষে জন্মেছেন তাঁদের বেশীর ভাগটা থাকে পূর্ব্বে নিবদ্ধ, কমটা আসে পরের দিকে—আবার যাঁরা বর্ত্তমান শতাব্দীর ভাব-ভূমিতেই ভূমিষ্ঠ তাঁরাও প্রাক্তন ধারাকে সম্যকরূপে পরিহার ক'রে যেতে পারেন না। অবশ্য অনেকটা নির্ভর করে চিত্ত-ধর্ম্মের ওপর, নইলে ব্রিজেস্, ইয়েট্‌স্, হাউস্‌ম্যান, এ-ই উনবিংশ শতাব্দীর ধারাকে অবলম্বন ক'রলেন, অথচ তাঁদের চেয়ে তরুণ নন্ এমন যে লরেন্স, এলিয়ট্, ফ্রেকার, নয়েজ তাঁরা হ'লেন বিংশশতাব্দীর অগ্রদূত! অতি আধুনিক স্পেণ্ডার প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁদের মনোবৃত্তির অধিকতর সম্বন্ধ। তবে একথা অবশ্য কেউ ব'লবে না যে কাব্য-রাজ্য থেকে সুন্দর নির্ব্বাসিত হ'য়েছে, কল্পনার পক্ষচ্ছেদ হ'য়েছে, স্বপ্নের অবগুণ্ঠনমুক্ত ক'রে তাকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ ক'রে ফেলা হ'য়েছে—সবই আছে এখনো, তবে আকার বদ্‌লে গেছে। শুধু উনবিংশ শতাব্দীর Transcendentalismএ মানুষ আজ বিশ্বাস করে না—অর্থাৎ যে স্বপ্ন শূন্যাশ্রয়ী তাতে আজ আমাদের মোহ নেই, আজ মানুষ চায় স্বপ্নই হয়ত, কিন্তু তার পায়ের তলায় মাটিটা শক্ত হওয়া দরকার। তার জান্তব অস্তিত্বটা তার কাছে আজ অনাবশ্যক নয়, সেটাই বোধ হয় ষোল আনা। উভয় শতাব্দীর রসবোধের মধ্যে তফাৎটা যা তা বোধ হয় এই।

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার প্রারম্ভে এ গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা কি? সার্থকতা কি জানিনে, তবে মনে হয় রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে আমরা যে পাকা-পাকি সিদ্ধান্ত ক'রে বসেছিলাম তা পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। পূরবী থেকে বীথিকা পর্য্যন্ত, মোটামুটি এই দশবৎসরের রবীন্দ্র-কাব্য একটি বিশেষ ধারার সূত্রপাত ক'রেছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস—এর মাঝখানে আছে বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ ইত্যাদি। শেষ সপ্তক ও পুনশ্চকে না হয় এই পর্য্যায় থেকে বাইরে দিলাম কারণ কবি নিজেই ওদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী করছেন।

এই দশ বৎসরকে রবীন্দ্র কাব্যের আধুনিক যুগ বা প্রতিক্রিয়ার যুগ নামে অভিহিত ক'রলে কবি কুপিত হবেন কিনা ব'লতে পারি না। কিন্তু তিনি পুনঃপুনঃ স্ফুট কণ্ঠে যদিও প্রচার ক'রেছেন যে তিনি আধুনিকতার সমর্থক নন তবু তাঁর অজ্ঞাতসারেই এই কয় বৎসরে তাঁর কাব্যের দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় আধুনিকতা প্রবেশ ক'রেছে প্রচুর! নইলে আমাদের কৈশোরকালের পরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে আমরা কি এই একেবারে আধুনিক রেশটুকু পেতাম?

গৌরবরণ তোমার চরণ-মূলে
ফল্‌সা বরণ সাড়ীটি ঘেরিয়ে ভালো,
বসন-প্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোল-প্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
এক গুছি চুল বায়ু উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
* * * *
মনে আসে তুমি পূব্ জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ ব'সে,

উৎসুক চোখে বুঝি আশা করো কারে,
আলুথা আঁচল মাটিতে প'ড়েছে খ'সে।
অর্দ্ধেক হাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্দ্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া,
পাঁচিলের গায়ে টিনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া! ইত্যাদি

অবশ্য একথা ব'লতে পারি না যে পূরবী থেকে বীথিকা পর্য্যন্ত আসতে আসতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র outlookই বদ্‌লে গেছে—সেটা গায়ের জোরে বলা হবে। তবে আমাদের অতি-সন্নিহিত লোকায়ত আবেষ্টনীর মধ্যে একান্ত সহজভাবেই তাঁকে বার বার আসতে দেখেছি—যেটা মানসী, সোনার তরী, খেয়া বা চিত্রার আমলে আশাতীত ছিল! বলাকার যুগে ত বটেই। পূরবী থেকেই এই মানুষী ভাবের সূত্রপাত—এই সঙ্গে কবি সময় সময় অন্তঃসরকেও তাঁর কাব্যে আশ্রয় দেবার চেষ্টা ক'রেছেন, 'পশুর কঙ্কাল' থেকেই তার আরম্ভ—বীথিকাতেও সে রকম কবিতা দুষ্প্রাপ্য নয়। যেমন—

বাহ্যহীন বীর্য্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন,
গর্ব্বথোবা কৃমিগণ
তারি অনুচর,
অতি ক্ষুদ্র, তাই তারা অতি ভয়ঙ্কর;
অগোচরে আনে মহামারি,
শমির কলির দন্ত সর্ব্বনাশ তারি।

এর তুলনায়—

আরণ্যক তীব্র হিংসা নেও
শত গুণে শ্রেয়।

বলা বাহুল্য উর্ব্বশী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, বা বসুন্ধরার রবীন্দ্রনাথ আর এ রবীন্দ্রনাথ এক ধারার কবি নন্। এ রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যান্, শ্তাওবার্গ, লরেন্স, প্রভৃতির সগোত্রীয়!

আর একটি নূতন সুর দেখা যায় এই পর্য্যায়ের কাব্যগুলিতে—সেটারও দাবী আধুনিক। একান্ত সাধারণে ঘরোয়া জিনিষকে কাব্য ক'রে তোলা—দেখ্‌তে শুন্‌তে, নাড়্‌তে চাড়্‌তে যাতে রং ঝক্‌মক্ ক'রে ওঠে, কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রতে গেলে যাতে কিছুই মেলে না একটু সুর একটু ছবি ছাড়া—এও রবীন্দ্র-রীতির বহির্ভূত জিনিষ!

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল, উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ডোরের কোকিল, ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন গ্রাম পারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা—
প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্, যে যাহারে খুসী দেয় ডাক,
যেথা সেথা করে চলা ফেরা।

বিংশশতাব্দীর কাব্যের প্রত্যক্ষতা, স্পষ্টতা, সর্বত্র-গমন-প্রবণতা এইভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো আকারে রবীন্দ্র-কাব্যের অতীন্দ্রিয় কল্পময় অঙ্গনে প্রবেশ ক'রেছে। রবীন্দ্রনাথ ওদের সস্নেহে আশ্রয় দিয়েছেন। ওরা তাঁর কাব্য-ধারার সঙ্গে ত অতি অনায়াসেই গায়ে গা মিলিয়ে আছে—মধ্য যুগের সাহিত্যের ড্রাগনের মতো বিকট কাঁটা-গাঁথা লেজ তুলে ত ওরা আধুনিকতার ফতোয়া জারী ক'রছে না—অথচ পুরানো অপার্থিব রসাত্মকতা ও সপ্তলুতা থেকে রক্তমাংসের ছনিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়েছে! এই জিনিষটিকেই আমরা ব'ল্‌ছিলাম রবীন্দ্র কাব্যের প্রতিক্রিয়া এবং বলছিলাম এর সুরু পূরবীতে এবং পুষ্টি বীথিকায়।

অবশ্য পূর্বেই আমরা ব'লেছি যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পূর্ব্বতন যুগের কবি এবং উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা তাঁতে চরমস্ফূর্ত্তি পেয়েছে—লিরিক্‌কাব্যের সে আমল পর্য্যন্ত যতটা উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছে, (হাইনে, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ণ, হুগো, মিস্তাল, টেনিসন্ ইত্যাদির কথাই যে প্রসঙ্গে মনে হয়) রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণতম বিকাশ সাধন ক'রেছেন। রোমান্টিক আইডিয়ালিজমের কবি তাঁর চেয়ে বড় আর কল্পনা করাও কঠিন। তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ধারাকে তিনি পরিহার ক'রতে পারেন না, আর ক'রবেনই বা কেন? তাঁর স্বকীয় আদর্শের কবিতা সেই জন্যে বীথিকায় অজস্র আছে—প্রকৃতি, প্রেম ও পরমার্থ সম্পর্কীয় বিচিত্র লীলা-বিলাসের অপূর্ব্ব অনুভূতি-সঞ্জাত সেই কবিতাগুলির কথা বর্ত্তমান আলোচনায় কেন উল্লেখ করিনি সে কৈফিয়ৎ এখানেই দেওয়া দরকার। সেই সুর, সেই ব্যঞ্জনা, সেই গাঢ়বন্ধ সুষমা-মণ্ডিত শব্দালঙ্কার আমাদের সুপরিচিত—তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাতে এখনো যৌবনের সতেজ প্রাণবত্তা বিদ্যমান, বার্দ্ধক্যের কোন আভাসই নেই তাতে—কতকগুলো কবিতার নাম করে যাই; পাটিকা, নাট্যশেষ, পোড়োবাড়ী, ভুল, অপরাধিনী, বনস্পতি, সাঁওতাল মেয়ে ইত্যাদি। তবে যে সুর, যে দৃষ্টি, যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথে আমরা আগে পাইনি, এবং না পেয়ে অনুযোগ ক'রেছি, তাই অল্প পরিমাণে হ'লেও পেয়েছি যে কবিতাগুলোতে সেইগুলোই আমাদের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে ক'রেছি। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্‌মহাসমর পৃথিবীর অদ্বিতীয় লিরিক কবি হ'লেও সমরোত্তর পৃথিবীরও তাঁর ওপর দাবী কম নয়—এই বীথিকাই সেই দাবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নজীর—যা উত্তর যুগকে অববাহিকার মতো সংযুক্ত ক'রেছে এবং আমাদেরকে এই ভরসা করার সাহস দিয়েছে যে কবির আগামী কাব্যে আমরা শুনতে পাবো যান্ত্রিকতার প্রতিধ্বনি, শুনতে পাবো আজ্‌কের এই বিক্ষোভ ও হানাহানির অনুরণন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Seven Pillars of Wisdom—By T. E. Lawrence,
(Jonathan Cape)

বেশী দিনের কথা নয়, টি, ই, লরেন্স—অথবা এয়ারক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান শ-এর অকাল মৃত্যুতে, মোটর-সংঘর্ষের আকস্মিক অপঘাতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যময় ও তাহার বাহিরেও শোকের শিহরণ তরঙ্গায়িত হইয়া যায়। লরেন্সের জন্মবৎসর ১৮৮৮;

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে যে যশোরাশি তাঁহার ভাগ্যে মিলিয়াছিল তাহা অপর কোন সৌভাগ্যবানের ঈর্ষ্যাস্থল। বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্যাতির ভিত্তি প্রচারশক্তি। কোটিকণ্ঠ সংবাদপত্র, নিযুতকর্ণ-প্রসারী রেডিয়ো প্রভৃতির করুণা ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তিকাহিনীকে একটি দিনের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত করিয়া তোলে। এ-শক্তিকে উপেক্ষা করিলে প্রভূত গুণরাশিও নষ্টোন্মুখ হয়। এপথে লরেন্সের সাধনাকে বৈরীভাবের সাধনা বলা চলে। আধুনিক প্রচারশক্তির বিশ্বদৃষ্টিকে তিনি যতই এড়াইতে চাহিতেন, ততই তাহার তীব্র-জ্যোতিঃ তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইতে চাহিত। প্রতিচ্ছাপথের সম্বন্ধে এখনকার কালে সাধারণের কৌতূহলের অন্ত আছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত মহাসমরে তুর্কীর বিরুদ্ধে আরব স্বাধীনতা-অভিযানে সহায়তা করিয়া লরেন্স্ লোকগোচরে আসেন। আর তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। তাঁহার আত্মগোপনের সচেষ্ট ব্যবস্থা, বেশ কর্ম্ম বাসস্থান ও নামোপাধির বহুবিধ ও পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, সে স্পৃহাকে নিবারণ করা দূরে থাকুক, অতিমাত্রায় উদগ্র করিয়া তুলিয়াছিল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত লরেন্সের মহাগ্রন্থ, সেভ্‌ন্ পিলার্‌স্ অব উইজডম্ পড়িয়া মনে হইল বিধাতা ভুল করেন নাই, তাঁহার সৌষ্ঠববোধ অম্লান আছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বৃদ্ধবয়সে পরনির্ভর হইয়া যদি ধীরে ধীরে লরেন্সের মৃত্যু ঘটিত, তবে হইত তাহা অ্যাণ্টী-ক্লাইম্যাক্স্; আর শিল্পীমাত্রেই জানেন রসোপপত্তির পথে ইহাপেক্ষা গুরুতর বাধা অভাবনীয়। দুর্দ্ধমেতজ্ঞ আরব যোদ্ধারা যাহাকে সসম্ভ্রম আদরে আখ্যা দিয়াছিল "আমির ডিনামাইট" তাহার সহিত চিরাচরিত ব্যবহার কি মরণের পক্ষে অশোভন হইত না?

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার, বইটির শিরোনাম বিভ্রমোৎপাদক। ইহার বিষয় তত্ত্বজ্ঞান বা ঈশাহুসন্ধিৎসা নহে; এমন কি আত্মচিন্তাও নহে,—সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহা আরব বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত ও প্রসঙ্গতঃ লরেন্সের আত্মকাহিনী। দুই দিক দিয়াই ইহা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। লরেন্সের জীবনের আদি ও উপান্ত পর্ব্ব ইহাতে নাই। ইতিবৃত্ত হিসাবেও ইহা পূর্ণাবয়ব নহে। লরেন্স্ নিজেই বলিতেছেন,

Please take it as a personal narrative pieced out of memory. I could not make proper notes; indeed it should have been a breach of my duty to the Arabs if I had picked such flowers while they fought.

ঐতিহাসিক অপূর্ণতার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। সেভ্‌ন্ পিলার্‌স্ প্রথম প্রকাশিত হয় মুখ্যতঃ তাহাদের জন্য যাহারা আরব সমস্যায় সংশ্লিষ্ট ও প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাস, ভূগোল ও রাজনীতি যাহাদের নখদর্পণে। ইহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক হইবে না। কাজেই লরেন্স্ অনেক বিষয় উহ্য রাখিতে দ্বিধা করেন নাই। সাধারণ পাঠকের কাছে, সেভ্‌ন্ পিলারস্ অনেকস্থলে ক্রমভঙ্গ-দোষে দুষ্ট লাগিবার সম্ভাবনা। সেভ্‌ন্ পিলার্‌স্ উপভোগ করিতে হইলে তাই একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন। লরেন্সের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবিখ্যাত লেখক রবার্ট গ্রেভস্ প্রণীত "লরেন্স্ এণ্ড দি অ্যারাবস্", এপথে প্রধান ও আমার মতে অপরিহার্য্য সহায়।

সেভ্‌ন্ পিলারস্ অব উইজডম্—এই নামটি বিভ্রমোৎপাদক হইলেও ইহার

একটি সকৌতুক ইতিহাস আছে। অক্‌স্‌ফোর্ডে লরেন্‌স্ ছিলেন প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র। ক্রুসেড সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাহার ফলে তিনি আসেন প্রাচ্য দেশের খৃষ্টীয় অংশে, পর্য্যটনে ও অন্বেষণে; ও পরে তথাকার সাতটি বিখ্যাত শহরের ইতিবৃত্ত গাঁথিয়া বাইবেল হইতে গৃহীত বাক্যাংশটিকে নাম হিসাবে লাগাইয়া রচনা করেন। রচনা করেন কিন্তু প্রকাশ করেন নাই; কারণ লেখকের মতে সে লেখা ছিল কাঁচা। স্বীয় রচনার এ-হেন নির্দ্দয় সমালোচক লেখক জগতে দুর্ল্লভ। লরেন্‌স্ ছিলেন নিজের লেখার কোর্ট-মারশাল। এরূপ বেপরোয়া খেয়ালী লোকও বোধ হয় দুনিয়ায় খুবই কম জন্মিয়াছে। বইটি নষ্ট করিলেও তাহার নামটি লইয়া লরেন্‌স্ অন্য একটি পুস্তকে নির্ব্বিবাদে জুড়িয়া দিলেন, স্মৃতিহিসাবে।

সেভন্ পিলারস্-এর রচনা ও প্রকাশ-পরিক্রমাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ইহা একটি ভূমিকা ও দশটি খণ্ডে বিভক্ত। বর্ণিত বিষয়, ১৯১৬ সালে লরেন্‌সের আরব দেশে প্রথম পদার্পণ হইতে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লরেন্‌স্ ও ফৈজালের দামস্কস-বিজয় পর্য্যন্ত। বিগত মহাসমরে ইংলণ্ড যখন জার্ম্মেনীর সহিত যুদ্ধিতেছিল, তখন কিচনার-প্রমুখ কয়েকজন ইংরাজের বিশ্বাস হয় আরবগণকে তুর্কীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে ইংলণ্ড জার্ম্মেনীর মিত্রশক্তি তুরস্ককে সহজে পরাজিত করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যেই ও-দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও মানচিত্র-অঙ্কনের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে লরেন্‌স্ ঐতিহাসিক হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে সমরবিভাগে প্রেরণ করা হয়। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জুনের মধ্যে, তথাকথিত শান্তি-বৈঠকে ফৈজালের সহিত যোগদান করিতে আসিয়া প্যারিসে বসিয়া লরেন্‌স্ সেভন্ পিলার্‌স্ লিখিতে আরম্ভ করেন ও সাতটি খণ্ড লিখিয়া ফেলেন। ভূমিকাটি লেখা হয় কায়রো-যাত্রী এরোপ্লেনে বসিয়া। অষ্টম খণ্ড লণ্ডনে রচিত হইবার পর রিডিং ষ্টেশনে ট্রেণ বদলাইবার সময় ভূমিকাটি ও দুইটি খণ্ডের খসড়া ব্যতীত সমস্ত বইটি হারাইয়া যায়, কাহারো কাহারো মতে চুরি যায়। এই দারুণ ক্ষতি কারলাইলের "ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন" পুড়িয়া যাওয়ার সহিত তুলনীয়। লরেন্‌স্ও কারলাইলের মতো পুনঃ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। দুটি খসড়াই পড়িয়াছেন এমন লোকে বলেন, লরেন্‌স্ নাকি অনেক স্থানে কমা সেমিকোলন পর্য্যন্ত পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চল্লিশ ঘণ্টায় ৩৪০০০ কথার একটি খণ্ড লিখিয়াছিলেন। ইহাকে কি তাহা হইলে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলা চলে না? ইহাই ১৯২২ সালে পরিমিত সংখ্যায় মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ইহারই একটি সচিত্র সংস্করণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য তিরিশ গিনি মূল্যে বিক্রীত হয়। সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, লরেন্‌স্ যাহার নাম দেন, "রিডোক্ট ইন দি ডেসার্ট" তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া লরেন্‌স্ সেভন পিলার-এর ভাষা পালিশ করিতে থাকেন। এ সম্বন্ধে তাহার উক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

Beginners in literature are inclined to fumble with a handful of adjectives round the outline of what they want to describe, but by 1924 I had learnt my first lessons in writing and was often able to combine two or three of my 1921 phrases into one.

তাঁহার জীবদ্দশায় সেভন্ পিলারস্ সম্পূর্ণ প্রকাশ করায় লরেন্‌সের নিষেধ ছিল। অকালমৃত্যু সে-অর্গল অপ্রত্যাশিত ত্বরায় উত্তোলিত করিয়াছে। প্রথম সংস্করণের বহুমূল্য চিত্রগুলিও বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে; শুধু সংখ্যায় তিনখানি কম ও বহুবর্ণরঞ্জিত নহে। চিত্রগুলি সম্বন্ধে লরেন্‌স বলেন—

It seems to me that every portrait drawing of a stranger partook some what of the judgment of God. If I could get the named people of this book drawn, it would be their appeal to a higher court against my summary descriptions. So I took pains to bring objects and artists together.

শিল্পিগুলির নাম শুনিলে লরেনসের আগ্রহাতিশয্যে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের মধ্যে আছেন এরিক কেনিংটন, সার্জ্জেণ্ট, অগষ্টাস জন, মেষ্ট্রোভিক প্রভৃতি মহারথিবর্গ।

সেভন্ পিলারস্ স্মৃতি-উন্মথিত পুস্তক। গ্রেভস্ লিখিয়াছেন, লরেন্‌সের memory for details was extra-ordinary, even morbid। এই প্রখর স্মৃতিশক্তির ফলে রচিত হইয়াছে এমন একটি গ্রন্থ যাহা যে কোন ভাষার সমর ও ভ্রমণ-সাহিত্যের তুঙ্গ শীর্ষে স্থান পাইতে পারে। আরব মরুভূর নির্জ্জন মহিমা, শত শত মাইল ব্যাপী উষ্ট্রযাত্রায় অনুচরগণের সহিত সহচরভাব, শিবিরাগ্নির পাশে বসিয়া সহাস্য আলাপ আলোচনা, তুর্কীদিগের নৃশংসত্ব; ফিপ্রগতি ও ফিপ্রবুদ্ধি জার্ম্মান ও তুরস্ক বাহিনীকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করা; শারীরিক যন্ত্রণায় লরেনসের ভীষণ ভীতি; অথচ তাহাকে দমিত রাখিয়া কতবার শত্রু শিবিরে প্রবেশ ও পলায়ন; একবার ধরা পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণা; বিজেতা সেনাপতির বন্দীর প্রতি কামাচরণে বাধা তাহার কারণ; বন্দীর পরিচয় না জানায় মুক্তিলাভ—এই সব দৃশ্য লরেনসের লিপি-চাতুর্য্যে পাঠকের মনে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাচ্যসীমার সমরব্যাপারে আধুনিকতা অপেক্ষা মধ্য যুগের বাবস্থার প্রাধান্য ছিল প্রবলতর। তাই লরেনসের মধ্যযুগ-প্রবণ মন তাহাতে পাইত পরমা তৃপ্তি। আরবের স্বাধীনতা তাঁহার বাল্য-স্বপ্নের অন্যতম। সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পাইয়া লরেন্‌স্ জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বপ্নও অজ্ঞাত স্বপ্নের মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল। কূটবুদ্ধি বৃটিশ রাজনীতিনায়কের অভিসন্ধিতে আরবের প্রাপ্য ব্রিটিশ-স্বার্থের নিকট নিবেদিত হইল। রাগে, অভিমানে, নৈরাশ্যে লরেন্‌সের চিত্ত শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ব্রিটিশশাসকগণের সহিত লরেন্‌সের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে অনেক উদ্ভট মত প্রচলিত আছে। তাহারা যে কি পরিমাণে ভিত্তিহীন, তাহা ১৯২০ সালের ২২শে জুলাই তারিখে টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত লরেন্‌সের একখানি চিঠি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পত্রখানি গ্রেভস-এর পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

লরেন্‌সের রচনাশিল্পের পরাকাষ্ঠা সেভন্ পিলারস্-এর ভূমিকার প্রথম পরিচ্ছদে। এই পরিচ্ছদের বিষয়বস্তু আত্মজিজ্ঞাসা। ইংরাজীভাষায় সুলিখিত আত্মচরিতের অভাব নাই, গদ্যরচনার মণিমাণিক্যে তাহার ইতিহাস ঝলোমলো,

তাহাদেরই মধ্যে এই পরিচ্ছদটি অত্যুৎ গৌরবে আসন দাবী করিতে পারে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না।

Some of the evil of my tale may have been inherent in our circumstances. For years we lived anyhow with one another in the naked desert, under the indifferent heaven. By day the hot sun fermented us ; and we were dizzied by the beating wind. At night we were stained by dew, and shamed into pettiness by the innumerable silence of stars. We were a selfcentred army without parade or gesture, devoted to freedom, the second of man's creeds, a purpose so ravenous that it devoured all our strength, a hope so transcendent that our earlier ambitions faded in its glare.

As time went by our need to fight for the ideal increased to an unquestioning possession, riding with spur and rein over our doubts. Willy-nilly it became a faith. We had sold ourselves into its slavery, manacled ourselves together in its chain-gang, bowed ourselves to serve its holiness with all our good and ill content. The mentality of the ordinary human slaves is terrible—they have lost the world-and we had surrendered, not body alone, but soul to the overmastering greed of Victory. By our own act we were drained of morality, of volition, of responsibility, like dead leaves in the wind.

* * * * * * * * * * *

In my case, the effort for these years to live in the dress of the Arabs, and to imitate their mental foundation, quitted me of my English self, and let me look at the West and its conventions with new eyes ; they destroyed it all for me. At the same time I could not sincerely take on the Arab skin ; it was an affectation only. Easily was a man made on infidel, but hardly might he be converted to another faith. I had dropped one form and not taken on the other, and was become like Mohammed's coffin in our legend, with a resultant feeling of intense loneliness in life, and a contempt, not for other men, but for all they do. Such detachment came at times to a man exhausted by prolonged physical effort and isolation. His body plodded on mechanically, while his reasonable mind left him and from without looked down critically, on him, wondering what that futile lumber did and why. Sometimes these selves would converse in the void ; and then madness was very near, as I believe it would be near the man who could see things through the veils at once of two customs, two educations, two environments.

এই দ্বিত্বের ফলে লরেন্‌স্‌কে কিরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত একটি উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হয়। আমির ফৈজাল একবার বেসরকারীভাবে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে ইংলণ্ডের রাজার সহিত সাক্ষাতে আসেন। সঙ্গে ছিলেন লরেন্‌স্‌, আরব সেনাপতির বেশে। তাহা দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজনায়ক ভ্রুকুটিভঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজার সম্মুখে বিদেশী বেশ ধারণ কি কর্ণেল লরেন্‌সের পক্ষে উচিত হইয়াছে? সসম্ভ্রমে অথচ শান্তভাবে লরেন্‌স্‌ উত্তর দেন—

When a man serves two masters and has to offend one of these, it is better for him to offend the more powerful.

লরেন্‌সের ব্যক্তিত্বের সমস্ত জটিলতা, শক্তিমত্তা, সূক্ষ্ম বিচার-বোধ ও আদর্শ-নিষ্ঠা, এই একটি উক্তিতে অমরত্ব পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The State in Theory and Practice—by Harold J. Laski (Allen & Unwin).

The Nature of Capitalist Crisis—by John Strachey (Gollancz).

"Grammar of Politics" প্রকাশ হ'বার পর হ'তে অধ্যাপক ল্যাস্‌কি যে ক'খানি বই লিখেছেন, তার মধ্যে আলোচ্য বইটী সব চেয়ে দামী। "Democracy in Crisis" প্রভৃতি লেখায় তিনি যে সমস্ত মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি এই বইয়ে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লেখনী-কৌশলের প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন।

রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস ও দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতির অন্বেষণে বেরিয়ে ল্যাস্‌কি এর পূর্ব্বে রাষ্ট্রের অনন্যাধীন সার্ব্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রান্তর্গত নানা জনসমষ্টির স্বতন্ত্র প্রভাবের বিষয় বিশেষ করে বলেছিলেন। গিয়ের্ক্‌, মেইট্‌ল্যণ্ড ফিগিস্‌, দ্যুগ্যুই প্রভৃতির চিন্তাধারা তিনি তখন অনুসরণ করছিলেন; রাষ্ট্রশক্তির বহুত্ববাদ (Pluralism) প্রচারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল থেকেই মনে হচ্ছিল—আর এ বই পড়ে সে ধারণা প্রায় স্থির হয়ে এল—যে রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনার অপর একটা পথ তিনি ধরেছেন, আর তাঁর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন মার্ক্‌স্‌। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের "Modern Monthly" পত্রিকায় তিনি নিজেকে মার্ক্‌সবাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন আর বলেছেন যে বর্ত্তমান জগতের যে অবস্থা, তাতে মার্ক্‌সবাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত না করলে অজ্ঞানতিমিরান্ধ হ'য়ে থাকতেই হ'বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁর এই অতি সুপাঠ্য ও চিন্তোদ্দীপক গ্রন্থ পড়ে মনে হয় তাঁর চক্ষু এ পর্য্যন্ত শুধু অর্দ্ধোন্মীলিত হ'য়েছে। আমাদের সমাজব্যাধির তিনি রূপনির্ণয় করেছেন অনবদ্যভাবে, কিন্তু ব্যাধি নিরাকরণের সম্বন্ধে তিনি অস্থিতপ্রজ্ঞ।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কি অতি স্বচ্ছ ভাষায় এই বলতে চেয়েছেন যে জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রতত্ত্বান্বেষীদের বিশেষ করে উচিত, রাষ্ট্রের কাল্পনিক রূপ চিন্তার পরিবর্ত্তে তার বাস্তব ইতিহাস আলোচনা করা। রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু সমাজজীবনকে রাষ্ট্র কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে সে বিষয়ে জ্ঞানই হ'চ্ছে রাষ্ট্রপ্রকৃতিনির্ণয়ের একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদাই প্রাচীন পদ্ধতি সমর্থন করার চেষ্টা করে' এসেছে, ভবিষ্যতের মুক্তিপথ নির্ম্মাণে সহায়তা করে নি। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতে হ'লে পৃথিবীর যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, তা সুদূর পরাহত হ'য়ে

যায়। আমাদের আজ বোঝা উচিত যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রসৌধ গড়া হ'য়েছে বলে' আমরা যথার্থ সুভ্যতা থেকে বঞ্চিত রয়েছি। রাষ্ট্রের এই নিরাভরণ মূর্ত্তি দেখলে মনের বহু প্রবঞ্চ অপসৃত হ'বে। সংশয়চ্ছেদী বিবৃতিগুণে অধ্যাপক মশায় এই কথাটা এমন ভাবে বল্‌তে পেরেছেন, যা' অতিক্রান্ত।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি, যুদ্ধ, বিপ্লব, গণতন্ত্র, একাধিপত্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ লেখক আলোচনা করেছেন। ধনিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক শাসনের সম্পর্ক, নিয়মানুগ শাসনব্যবস্থার অসিদ্ধি, বর্ত্তমান রাষ্ট্রে যোদ্ধৃসঙ্ঘের স্থান, ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য তিনি দিয়েছেন। কয়েকটী বিশেষ মূল্যবান্ অধ্যায়ে তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদের বিচার করেছেন। আমরা জানি যে হোগেল্ রাষ্ট্রকে প্রায় এক অলৌকিক স্তরে স্থাপন করেছিলেন; তাঁর মতে একমাত্র রাষ্ট্রজীবনেই ব্যক্তিগত ও সর্ব্বগত স্বাধীনতার সমবায় হ'তে পারে, রাষ্ট্রেই ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সুযোগ মিল্‌তে পারে, অন্যত্র নয়। সদসদ্বিবেকের অন্তর্বর্ত্তিতা ও সমাজ-শাসনবিধির বহির্বর্ত্তিতার মধ্যে সামঞ্জস্য একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব ("reconciling the inwardness of morality with the externality of law")। কিন্তু হোগেল্ রাষ্ট্রতত্ত্বের এই অত্যুচ্চ ব্যাখ্যা প্রচার করেও তাঁর সমসাময়িক Prussiaকে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলেছিলেন! তাই, অন্যান্য যুক্তির মধ্যে ল্যাস্‌কি এই বলে' বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করেছেন যে বিজ্ঞানবাদ অনুরাগের উপর রাষ্ট্রের দাবী স্পষ্ট করেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রের সে দাবী ভিত্তিহীন কি না, সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না। ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানবাদ আলোকপাত করছে না, ভবিষ্যতের দাস হ'য়ে কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করার সহজ আনন্দ দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ধনিকবাদ যুদ্ধের জনক; বর্ত্তমান সমাজে ধনিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়েছে। হেগেল্ একবার বলেছিলেন যে যুদ্ধের সময়েই রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হয়। রাষ্ট্রের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে "অস্ত্রবল" বা "ক্ষাত্রবলের" চেয়ে অর্থবলই মহীয়ান্; তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যাল্প অর্থবান্‌দের কল্যাণ-কল্পেই রয়েছে। আসলে রাষ্ট্র হ'চ্ছে, লেনিনের ভাষায়, ধনিক শ্রেণীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ("the executive committee of the capitalist class")। এই কথাটী যুক্তিতর্ক দিয়ে, দৈনন্দিন সংশয়াতীত ঘটনা দেখিয়ে ল্যাস্‌কি সাহেব প্রমাণ করেছেন।

লেখকের উপসংহার আমাদের হতাশ করেছে। তিনি বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রক্ষমতা বর্ত্তমান শাসকদের কাছ থেকে যা'রা অর্থবলবঞ্চিত তাদের হাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেমন করে এই হাত বদল হ'বে, তা তিনি বল্‌ছেন না। কবে হ'বে, এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিতে রাজী ন'ন্। নিয়মানুগ উপায়ে, বিনা বিপ্লবে উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে হ'বে, তা তিনি ইতিহাস আলোচনা করে স্বীকার করতে পারছেন না। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্ত কিছু হ'ল না। নিয়মানুগতায় বিশ্বাস আর নেই, বিপ্লবরূপ দ্যূতক্রীড়াও ভীতিপ্রদ।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কির মনের গড়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের মতো; বিংশশতাব্দীর বিলোড়নে তিনি তাই বিক্ষুব্ধ, কিন্তু সেই ক্ষোভকে খড়্গরূপে ব্যবহার

তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। তা সত্ত্বেও আলোচ্য বইখানি এখানকার রাষ্ট্রচিন্তাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

প্রায় তিন বছরের আগে "The Coming Struggle for Power" লিখে ষ্ট্রেচি বিখ্যাত হ'য়েছিলেন। বয়স অল্প হ'লেও তাঁর বিদ্যার ব্যাপ্তির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তা একরকম বিস্ময়কর বলা যেতে পারে। তা ছাড়া ব্রিটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতাও খুব বেশী; প্রথমে তিনি ছিলেন লেবর পার্টিতে; তার পর সে দলের স্থবিরতা দেখে Oswald Mosley'র New Partyতে যোগ দিয়েছিলেন। Mosley'র ফাশিষ্টভাব দেখে সে দল ছেড়ে কিছুকাল রাজনৈতিক বিজনবাস করে এখন কম্যুনিষ্ট পার্টিতে রয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে এই মত পরিবর্ত্তনের ইতিহাসকে তিনি ব্যর্থ মনে করেন না, কারণ বর্ত্তমান যুগের জটিলতার দরুণ কেউই কুণ্ঠা ও ভ্রম এড়িয়ে যেতে পারেন না।

সম্প্রতি যে বিরাট অর্থনৈতিক সঙ্কট চলেছে, তা'র তাৎপর্য্য বোঝার চেষ্টাই আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য। ধনিকবাদ কি বিনা সঙ্কটে অগ্রসর হ'য়ে যেতে পারবে? যদি এইরূপ ও এর চেয়ে কঠিন সঙ্কট মাঝে মাঝেই ধনিকবাদের সঙ্গী হয়, তবে আমাদের সকলের কর্ত্তব্য হ'বে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা; কারণ আমরা জানি যে ১৯২৯-৩৩ সালে যে বিষম সঙ্কট গেছে, তা'র পুনরাবির্ভাব হ'বে সভ্যতার সমাধি।

বইয়ের প্রথম ভাগে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ নির্ণয়ের যে নানা চেষ্টা হ'য়েছে, তা'র আলোচনা আছে। মেজর ডগ্‌লাস্, জে, এ হবসন্, আরভিং ফিশার, হায়েক্ ও রবিন্‌সের মত বিচার ক'রে লেখক দেখিয়েছেন যে বহু মতভেদ সত্ত্বেও এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ধনিকের লাভের হার পুনঃস্থাপন। একদল জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে, আর একদল শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে, ব্যবসার খুঁটি শক্ত করতে চান্; ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের এই নিয়েই বচসা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লাভের হার বাড়াতে হ'লে জিনিষপত্রের সরবরাহ কমে যায়, আর সরবরাহ পর্য্যাপ্ত করতে হ'লে লাভের হার কমে যায়। মোটের ওপর এই প্রতীতি হয় যে ধনিকবাদ পৃথিবীতে যান্ত্রিক সভ্যতা স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বটে; কিন্তু সে কাজ সাঙ্গ হ'লে ধনিকবাদের আর কিছু করার থাকে না।

একটী সুলিখিত পরিচ্ছদে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে এখন অর্থনীতি ধন-বিজ্ঞানে পরিণত হ'য়ে সমাজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য হ'য়ে পড়েছে। ধার্ম্মিকেরা যেমন বলেন যে যথার্থ ধর্ম্ম কোথাও ঠিক্ পরীক্ষিত হয় নি, তেম্‌নি রবিন্‌সের মত পণ্ডিতেরা (এখানে বলা উচিত যে রবিন্‌সের বা হায়েকের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের স্থান নেই) বোধ হয় বল্‌বেন যে laissez-faire economicsএর এখনও পরীক্ষা হয় নি। রবিন্‌স্ একবার বলেছেন যে বছরে একশো পাউণ্ড আয় যা'র, তা'র চেয়ে যা'র হাজার পাউণ্ড আয়, সে বেশী ধনি ("richer") কি না, তা জানা সম্ভব নয়; বিজ্ঞান বিচারকের আসনে বস্‌বে না, ঐ দুই আয়ভোগীর পরিতুষ্টির পরিমাপ অসম্ভব!

ব্রিটিশ চিকিৎসাপরিষদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী প্রতি পরিবারের (লোকসংখ্যা

অনুসারে) থাইধরচা কত হওয়া উচিত, তা'র সঙ্গে তুলনা ক'রে ষ্ট্রেচি দেখিয়েছেন যে দেশের বহু পরিবারই স্বাস্থের জন্য যা একেবারেই প্রয়োজন, তা'র চেয়ে কম খেয়ে' থাকতে বাধ্য হয়। অবশ্য ধনবিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে মাথাঘামানো বিশেষ দরকার মনে করেন না। ধনিকবাদের মূলসূত্র অনুসারে লর্ড রদারমিয়ারের চার কোটী পাউণ্ডের সম্পত্তি আছে বলে তাঁকে বছরে বিশ লক্ষ পাউণ্ড না দিলে তিনি সে টাকা ধনোৎপাদনে খাটাবেন না; সুদটী হ'চ্ছে রদারামিয়ারের কষ্টের পরিমাণ, যে কষ্ট তিনি ভোগ করছেন তাঁর সমস্ত টাকা তখনই খরচ না করতে পেরে, যে কষ্ট তিনি দয়া করে' "অপেক্ষা" করছেন বলে' পাচ্ছেন! অথচ, অনেক ইংরেজ কয়লা-খনিতে কাজ করছে বছরে একশো পাউণ্ডের জন্যে; এ টাকাটা হ'চ্ছে তা'র কষ্টের ও চেষ্টার পরিমাপ! ধনবিজ্ঞান দীর্ঘজীবী হো'ক!

যাঁরা অর্থনীতিবিদ্, তাঁরা মার্ক্‌সের "Labour Theory of Value"এর ওপর প্রখ্যাত অষ্ট্রিয়ান্ পণ্ডিত বোম-বাওর্ক (Bohm Bawerk) যে আক্রমণ করেছিলেন তা জানেন। ষ্ট্রেচি সে আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়েছেন; এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় আলোচনা মার্ক্‌সের পক্ষে নেই বল্‌লেই চলে। সে হিসেবে ষ্ট্রেচি খুব দামী কাজ করছেন।

চতুর্থ ভাগে ষ্ট্রেচি অতি বিশদভাবে ধনিক্‌বাদের সঙ্কট সম্বন্ধে মার্ক্‌সের মত বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। মার্ক্‌স্ দেখিয়েছেন যে ধনিকবাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হ'লে বিশেষ প্রয়োজন হ'চ্ছে মূলধন সঞ্চয়, কিন্তু আবার বর্ত্তমান অবস্থায় লাভের হার কমে যাওয়াও অপরিহার্য্য। এই লাভের হারকে ঠিক্ রাখার জন্যেই ধনিক-সভ্যতার অভিযান দেশদেশান্তরে গেছে; এই প্রচেষ্টাই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা করেছে, সমুদ্রবক্ষে জাহাজের পর জাহাজ ভাসিয়েছে, হাজার হাজার কারখানা আর খনি স্থাপন করেছে, জলা পরিষ্কার করেছে, শহর নির্ম্মাণ করেছে। আজ ঐ একই কারণে ধনিকরা পৃথিবীর যে সব দেশে ব্যবসা চল্‌লে লাভের হার এখনও কিছুকাল বেশীই থাকবে, তা অধিকার করার চেষ্টায় ব্যস্ত, সে চেষ্টার ফলে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ হো'ক্ বা নাই হো'ক।

যাঁরা বিলেতে ফ্যাবিজ্‌মের সম্বন্ধে খবর জান্‌তে চান্, তাঁরা Labour Party'র মধ্যে কতকগুলি বিপজ্জনক মতবাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে ষ্ট্রেচির কথা দামী মনে করেন। এমন কি কোলের মত আজীবন সাম্যবাদীও মাঝে মাঝে যেন বেফাঁস কথা বলে ফেলেন। সেগুলো একটু চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো দরকার ছিল।

ষ্ট্রেচির লেখা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সহজ ভাষায় শক্ত কথা স্পষ্ট করে বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর মত খুব অল্প লোকেরই আছে। একটা ব্যাপারে তিনি যেন একটা ভুল করে ফেলেছেন। তাঁর বই পড়ে' মনে হয় যে বর্ত্তমান অবস্থায় লাভের হার কমে আস্‌তে বাধ্য, এবং ঐ এক কারণেই ধনিকবাদ ধ্বংস হ'বে। কিন্তু মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স্ বা লেনিন্ কখনই বলেন নি যে জরাগ্রস্ত হ'লেও ধনিকবাদ বা অন্য কোন সমাজব্যবস্থা স্বতই ধ্বংস হ'বে। "ধ্বংস হওয়ার" চেয়ে "ধ্বংস করার" কথা তাঁরা জোর করে বলেছেন। ষ্ট্রেচি অবশ্য একথা জানেন্, কিন্তু তাঁর এ বইয়ে দুনিয়ার মজুরদের চেষ্টায় গড়ে' তোলা বিপ্লবী দলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু নেই।

ধনিকবাদের কল্যাণে সঙ্কটের পর সঙ্কট এসে আমাদের বিধ্বস্ত করছে ও করবে। মাঝে মাঝে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হ'বে, একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেবার সময় মিল্‌বে, কিন্তু তার স্থায়িত্ব পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমশঃই কমে যেতে বাধ্য। জোড়াতাড়া দিয়ে কতকাল এই সমাজ পদ্ধতিকে ঠেকিয়ে' রাখা যায়, তা জান্‌তে খুব বেশী দেরী হ'বে না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দৃষ্টি-প্রদীপ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
(পি সি সরকার এণ্ড কোং লিমিটেড)

সম্প্রতি বিভূতি বাবুর দৃষ্টি প্রদীপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এটি তাঁর আরণ্যক পর্ব্বের আধুনিক অবদান। মেঘ মল্লারের যুগ থেকে তাঁর কাছে একটা বিশেষ রসের আস্বাদ পেয়ে আসছি। সে রস একটা মধুর স্বচ্ছ গ্রাম্য রস যেটা প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতায় সহজে চোখে পড়ে না বা রসাল হয়ে ওঠে না। বিভূতি বাবু তাঁর অনুভূতি-মহাত্মো অনাড়ম্বর মর্ম্মস্পর্শী ভঙ্গীতে তাকে সঞ্জীব করে তোলেন। স্বকীয়তাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পথের পাঁচালীতে পেলাম বাঙলার পল্লীর অন্তর্লীন রূপ অপুর দৃষ্টি দিয়ে। তার আরণ্যকতা, গ্রাম্য জীবনযাত্রা অদ্ভুত সুসঙ্গতি পেলো পারিপার্শ্বিক সহানুভূতিতে। প্রথম বোঝা গেল, মেঠো সুর ধরবার এক বিশেষ ভঙ্গীতে তাকে সুধীসমাজের কাছে উপাদেয় করে তোলা যায়। এ জন্যে লেখককে সাম্প্রতিকদের আসরে প্রাথম্য না দিই প্রাধান্য দিতে বাধলো না। তারপর অপরাজিততে অপুর জীবন সহরে এসে রসসঙ্গতি পেল না। লেখকের স্নায়বিকতা পড়ল ধরা সহরের চলিষ্ণু রূপ ফোটাতে গিয়ে। তাঁর হাতের তুলি গেল কেঁপে। এ ব্যাপারটা একটা লজ্জার মত সমস্ত বইটাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। মনে হল পথের পাঁচালীর এ অনুবৃত্তিটুকু না এলেই ভাল হত। মোটের ওপর বিভূতি বাবুর সৃজনী-প্রতিভার সীমানা পাওয়া গেল।

দৃষ্টি প্রদীপে আমরা আশা করেছিলাম লেখক সত্যিই নতুন কিছু পরিবেশন করছেন। আসলে দেখলাম, ভাব-বস্তু, রস-বস্তু বা প্রকাশ-ভঙ্গী কোনটাই বদলালো না আশাহতরূপ। আত্মজীবনচরিতের ভঙ্গীতে বই লেখা বাংলা সাহিত্যে বা পাশ্চাত্য সাহিত্যে নতুন না হলেও স্বকীয়তা ফোটাবার ক্ষেত্র বা উপাদান যথেষ্টই আছে এতে। লেখকের পক্ষ থেকে হয়ত চেষ্টার ত্রুটি নাও থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা জানাতে কোনো কুণ্ঠা নেই যে তিনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন। যে মন্তব্যের সন্ধান আমরা প্রচ্ছদপত্রে পাই বস্তুত সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন নি বলেই মনে হয়। "বিভূতি ভূষণ এই উপন্যাসে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে একটি নতুন জগৎ খুলে দিয়েছেন" যেটা বিশেষ ভাবে অতীন্দ্রিয় জগৎ। তারপর, খবর পাওয়া গেল—"আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে গহন রহস্য লুকানো, যে বিশ্ব প্রসারিত সেই অদৃশ্য বিশ্বের আবছায়া রূপ মাঝে মাঝে দেখতে পায় বালক জিতু" তার অস্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—যে অন্তর্দৃষ্টির বুদ্ধি বা যুক্তির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বড়

বেশী। আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে জিতুর Clairvoyance-এর ওপর ঝাণিজ্য করার দরকার ছিল না। St. Francis of Assisi র জীবন চরিত জিতুই পড়ুক বা বিভূতি বাবুই পড়ুন, রসসৃষ্টির দিক থেকে এই অতীন্দ্রিয়তার সংযম বিশেষ দরকার ছিল। ফলত জিতুর জীবনের নাক্ষত্রিক বিলাস তার সমস্ত অস্তিত্বকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। পাতায় পাতায় তার নাক্ষত্রিকতা আর Clairvoyance আমাদের পীড়িত করে তোলে। অতীন্দ্রিয়-বিলাস একটা বিশেষ কোনো কবিতায় ঐক্য পেতে পারে কিন্তু তাকে তিন-শো পাতা ব্যাপী বইয়ে ছড়িয়ে দিলে পাঠকমণ্ডলী লেখকের ওপর প্রসন্ন হতে বাধ্য নয়। অবশ্য Clairvoyance-কে কেন্দ্র করে খুব ভাল বই লেখা সম্ভব। কিন্তু লেখক এ বইটাতে তাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হন নি। Clairvoyanceটা অবান্তরই থেকে গেল। লেখক ভুলেছেন যে মাধ্যাকর্ষণের টান অগ্রাহ্য করা মারাত্মক। প্রসঙ্গত লেখক অবশ্য জিতুর এই আবেশিক অবস্থাটা 'নিউরোসিস' বলে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দুর্বলতাটুকু অরক্ষিতই রয়ে গেল।

কড়া সাহিত্যাচার্যদের সূক্ষ্ম রসবিশ্লেষণের সামনে বইটার উপরোক্ত ত্রুটি ছাড়া আরও অনেক ত্রুটি প্রকট হওয়াই সম্ভব। পুনরাবৃত্তি তার মধ্যে একটি। এ ব্যাপারটি অবশ্য প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদেই বেশী পরিলক্ষিত হয়। লেখককে এজন্যে একটু অসাবধান বলেই মনে হয়। কারণ সতর্ক পুনর্লিখনে এই ধরণের ত্রুটির হাত থেকে তিনি হয়ত অব্যাহতি পেতে পারতেন। এই সূত্রে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি পথের পাঁচালীর বা অপরাজিতর যুগের উচ্ছ্বাসগুলি এখনও ভুলতে পারেন নি। থেকে থেকে একই জাতীয় নভস্চারী ব্যসন ক্লান্তিদায়ক। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ বইটার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মাঝে মাঝে ভাষার পাণ্ডিত্য-দোষও ঘটেছে। সময়ে অসময়ে বঙ্কিমী ধরণের মর্মোচ্ছ্বাস দেখে নিরাশ হতে হয়। এই সব কারণে লেখকের মনন-শক্তির ওপর আস্থা থাকে না। নায়কের মনের গ্রন্থিউন্মোচনের চেষ্টায় যদি এই সব ত্রুটি ঘটে থাকে তা' হলে লেখকই দায়ী। প্রসঙ্গত এটাও বলতে হবে যে বইটাকে যদি আগাগোড়া ডায়েরীগুচ্ছ ধরণে লেখা হত তা' হলে আমাদের তর্ক বা মন্তব্যের ধারা ভিন্ন দিকে বইত। সে ক্ষেত্রে নায়ক হতেন একক। পারিপার্শ্বিক সেখানে গৌণ। মনের কোনো বিশেষ অবস্থায় অসম্বদ্ধ প্রলাপও পেত সুসঙ্গতি ও ঐক্য। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট যে দৃষ্টি প্রদীপে লেখক সেরকম ধরণের কিছু করতে যান নি। এটাকে যে 'Journal Intime' বলে ধরে নেব এমনতর ইঙ্গিত লেখকের তরফ থেকে পাওয়া যায় নি। ফলে, এ মন্তব্য অবশ্যম্ভাবী বে বইটার অঙ্গসংস্থানের হানি হয়েছে।

পক্ষান্তরে, লেখক যে সব সামাজিক ও শাস্ত্রীয় তথ্যের আভাস দিয়েছেন বইটার ভেতর তার সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নেই। জিতুর সার্বিক দৃষ্টির সামনে বাংলার সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ফুটে উঠেছে। বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের দুর্দশা ফোটাতে গিয়ে লেখক অনেকটা স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন দেখা গেল। জিতুর জ্যাঠাইমার ওপর আমাদের বিতৃষ্ণাও আন্তরিক। সীতার সৃষ্টি 'দুর্গা' জাতীয়। শেষের দিকটা অবশ্য সীতার চলাফেরা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জিতুর ধোঁয়াটে দৃষ্টি প্রদীপের

আলোয়। সমস্ত বইটাই অল্প বিস্তর স্বল্পালোকিত জিতুর রূপায়। ছোট বৌঠাকরুণকেও ভাল চেনা গেল না। কিন্তু তাঁর কম্বসচাপার ব্যাপারটা ভীষণ হাস্যকর ও অসম্ভব।

লোচন দাসের আখড়ায় এসে জিতু পেলো জীবনাহুগ বেগ। সেটা রূপ পেলো মালতীর প্রেমে, যে প্রেম—জিতুর বালপ্রৌঢ়ি সত্ত্বেও—প্রচ্ছন্ন ছিল আন্তর্জানিক স্তরে মিস্ নর্টনের যুগে। আখড়ার আবহাওয়ার বৈষ্ণবিক দিকটা কিছু বাধা পেয়েছে জিতুর আতিথ্যে। শরৎচন্দ্রের কমললতাকে মনে হয় এই সূত্রে। পাশাপাশি রাখলে কমললতা উন্নততর সৃষ্টি বলেই মনে হয়। এর তুলনায় মালতী কিছু আড়ষ্ট হয়েছে। তবু মালতীকে মন্দ লাগে না। তার মাংসল বিকাশ জিতুর স্বপ্নালু দৃষ্টির আবরণ ভেদ করেও ফুটে উঠেছে। হিরণ্ময়ীর সঙ্গে জিতুর প্রথম পরিচয় গ্রাম্য পাঠশালায়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের গল্প-গুচ্ছে। এই কিশোরী বালিকার চাপল্যের মধ্যে জিতুর প্রেম পেলো স্থিতি। এরকম আবহাওয়ায় জিতুকে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ানো লেখকের পক্ষে ত্রুটি। হয়ত তাঁর ধারণা যখন তখন ব্রাউনিঙের কবিতা পড়াটা মানসিক আভিজাত্যের লক্ষণ। এ রকম দুর্বলতা প্রকাশ না পেলেই ভাল ছিল। অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে এ বইটা লেখকের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে কিছু বেগবান হয়েছে। কিন্তু মননশীলতার চর্চ্চা না করলে এর চেয়েও উন্নত ধরণের কিছু লেখা সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না। এ যাবৎ যে নৈহারিকতার চূড়ায় লেখক আশ্রয় নিয়েছেন সেটা ত্যাগ না করলে, ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পাঠকদের উৎপীড়িত করেই তুলবেন। এবার তাঁর Cerebral Cortexএর দিকে নজর দেবার সময় হয়েছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

Voltaire—By H. N. Brailsford (Home University Library)
Religion and Science—By Bertrand Russell
(Home University Library)
We Europeans—By Julian Huxley, A.C. Haddon and A. M. Carr-Saunders (Jonathan Cape)

প্রথম বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে ঐ মহাকায় বিষয়টির সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য তথ্য এবং যথাযথ বিচার যে-রকম সুচারুভাবে লিখিত হয়েছে সেটি রসজ্ঞ পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। আমি বইখানিকে একটি আদর্শ জীবন-চরিত মনে করি। পলিটিক্যাল ঘটনার বিবরণ ও তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটনে ব্রেলস্‌ফোর্ড সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া তিনি সত্যকারের সাহিত্য-রসিক—শেলী গডউইনের গোষ্ঠীর ইতিহাসে তাঁর রসজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল—ভলটেয়ারের সাহিত্য-সৃষ্টির বিচারে তিনি সে-পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বইখানির সাহিত্যিক মূল্য খুবই বেশী।

কি জানি কেন—ইদানীংকার রাসেলের লেখা আমার তত ভাল লাগে না। হয়ত আমারই দোষ। কিন্তু অন্য কারণও থাকতে পারে। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করছি—তিনি সমস্যাগুলিকে সরল প্রতিজ্ঞায় পরিণত করেন। মনোভাবটা এইরূপ—"ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়, একটু সুস্থির হয়ে আমার তর্ক শোন—এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি—যদি না বোঝ তবে তুমি একটি আস্ত বোকা।" পাঠক বোকা-নাম কিনতে চায় না, তাই লেখকের পরিগৃহীত বাক্যগুলি প্রমাণিত হয়েছে বলে সহজেই স্বীকার করে নেয়। রাসেল সাহেবের ইদানীংকার বইগুলিতে জাদু আছে—তাই পড়তে পড়তে মন ও বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আজকাল তাই তাঁর লেখা পড়ি না—গলাধঃকরণ করি, গলায় বাধে না তবে ফলে শক্তিলাভও হয় বলা যায় না।

তাই সন্দেহ হয় তাঁর লেখার চমকে। সোজা করে বোঝান অত্যন্ত শক্ত কাজ জানি—যদি সমস্যার জটিলতা স্বীকার করা যায়। কিন্তু সমস্যাগুলির মধ্যে যদি ভাষায়, বাক্যে, প্রতিজ্ঞায়, উদাহরণে কিংবা উপনয়ে পরিণত হবার ক্ষমতা ভিন্ন অন্য সত্তা কিংবা গুণ থাকা অসম্ভব মনে করি তবে ভাষাটাও সহজে চিকণ হয়। অবশ্য অতটা ঝকমকে করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এইখানেই আমার খটকা বাধে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই ভাষাতিরিক্ত কোন কোন বস্তু কি ভাবে আছে যাকে বাদ দেওয়া বুদ্ধির গোঁড়ামি। রাসেল সাহেবের মন অতিশয় মুক্ত হতে পারে—তাঁর বুদ্ধি ক্ষুরধার, তাঁর বিদ্যার শেষ নেই—তবু তিনি গোঁড়া—প্রায় মধ্য-যুগের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মতনই, পার্থক্য কেবল একধারে বাইবেল এরিস্টটলে এবং অন্যধারে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির প্রামাণিকতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। রাসেল সর্ব্ব প্রকার স্বৈর-শাসনের বিপক্ষে কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জবরদস্তির বিপক্ষে নন। তাঁর বইএর ষষ্ঠ অধ্যায় আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের এবং সপ্তম অধ্যায় ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুদের পড়তে অনুরোধ করি। যোগ-ধর্ম্মের আলোচনায় রাসেলের যুক্তির বিপক্ষে বোধ হয় একাধিক আপত্তি তোলা যায়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ফলিত বিজ্ঞান থেকে পৃথক করা এবং সেই পার্থক্যকে বর্ত্তমান যুগের নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচারের জন্যে দায়ী করাও বোধ হয় অসঙ্গত। বিশেষতঃ রাসেলের মতো বুদ্ধিমান লোকের যুক্তির এই প্রকার ফাঁকি যে বুদ্ধিবাদের গলদটুকুকেই ধরিয়ে দেয়, তা নয়, philsophy of history ভিন্ন মানবপ্রেম অর্থাৎ humanismও অন্ততঃ এ-যুগে অত্যন্ত হাল্‌কা ও ঠুন্‌কো লাগে। অবশ্য বুদ্ধির দিক থেকে—ব্যবহারের দিক থেকে নয়। সত্যের প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি, স্বাধীনচিন্তার প্রতি তাঁর মনোভাব নিতান্তই সাহিত্যিক। সত্যই তাঁর ভগবান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই তাঁর সাধনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সতর্কতা সে-কালের জেনিভা এবং একালের ঢাকা সহরের চরিত্র-রক্ষিণী সভারই উপযুক্ত। রাসেল প্রকৃতপক্ষে একজন বিশ্বাসী জীব—নচেৎ তিনি যাকে অন্যায় বিবেচনা করেন তার বিপক্ষে লড়াই করবার নামে হাতের কলম শাণিত খড়্গ হয়ে উঠত না।

এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁর নতুন বইটায় গোঁড়ামি অত্যন্ত কম—অর্থাৎ যতটা সংযত হলে গোঁড়ামি আমার ভাল লাগে ঠিক ততটাই সংযত। এই বইখানিতে রাসেলের পুরানো হাত ফিরে এসেছে। Religion and Science

পড়ে আমার Voltaireএর Treatise on Toleranceএরই কথা মনে পড়ল। অবশ্য রাসেলের বইএ শুদ্ধ চিন্তার খোরাক অনেক বেশী—সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

রাসেল যেন ভলটেয়ারেরই বংশধর। পার্থক্যের জন্য দায়ী সমাজ-গঠন; অষ্টাদশ শতাব্দীর অত্যাচার ছিল ধর্ম্মের নামে—এখন আর সেটা নেই—তার বদলে আছে নব-গঠিত রাষ্ট্রধর্ম্ম, যেমন রাশিয়া, জার্ম্মানী ও ইটালীতে, বোধ হয় জাপানেও। তখনকার অত্যাচারের উপলক্ষ ছিল ভিন্ন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—এখনকার, গরীব শ্রেণী এবং অর্থনীতি। জ্ঞানের মাত্রা ও প্রসার এখন বেড়েছে। তাই ভল্‌টেয়ারের দান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে উদারনীতির পরিবর্জনে এবং রাসেল একজন নামজাদা সোশ্যালিষ্ট। ভলটেয়ার বণিক সম্প্রদায় এবং বাণিজ্যেরই গুণগান করে গিয়েছেন; দেড়শ' বছর পরে সেই শ্রেণীর প্রভুত্বের কুফল সম্বন্ধে রাসেল নিতান্তই সচেতন। ভল-টেয়ার লিখছেন: "the labourer and the artisan must be cut down to necessaries, if they are to work: such is human nature. It is inevitable that the majority should be poor, but it is not necessary that it should be wretched"—ব্রেলস্‌ফোর্ড টিপ্পনী করেছেন, "What he states is the authentic middle class doctrine; but it revolts his humanity।" ভলটেয়ারের যুগে মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি জন্মগ্রহণ করেনি—তখনকার ফরাসী অর্থনীতি ছিল physiocracy এবং ইংরেজী অর্থনীতি ছিল mercantilism—যাদের বোধ হয় পুরোপুরি অর্থনৈতিক মতবাদই বলা চলে না—রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারই বলা যায়। রাসেল এই বিষয়ে নিতান্তই ভাগ্যবান—মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে তিনি অভিজ্ঞ। তাই ভলটেয়ারের মতন তিনি Deist ও নন, mercantilist ও নন। ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় রাসেল economic interpretationকে অগ্রাহ্য করেন না, যেমন ভলটেয়ার অজ্ঞানতা-বশতঃ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভলটেয়ার বিশ্বাস করতেন natural law (inevitable কথাতেই তার প্রমাণ) এবং natural religionএ—রাসেল তা করেন না, প্রমাণ তাঁর পঞ্চম অধ্যায়ে। তবু দুজনের মানব প্রেম—humanity লক্ষ্য করবার জিনিষ। মানুষের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস ও ক্ষমতাই দুজনের যোগসূত্র।

আমার মনে হয়, কোনো না কোনো প্রকার গোঁড়ামি না থাকলে জনপ্রিয় লেখক হওয়া যায় না। সকলের প্রিয় হবার জন্য সকলেরই গোঁড়ামি লেখকের থাকা চাই। কিন্তু ভলটেয়ার ও রাসেল সকলের জন্য নয়—বলাই বাহুল্য তাঁরা যে শ্রেণীর প্রিয় সে শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা, ভদ্রতা এবং চিন্তার অবসর থাকা চাই, তবেই তাঁদের সরসতা উপভোগ করা সম্ভব। যাঁরা রাজ্য চালান, কিংবা যাঁদের হাতে অত্যাচার করবার প্রভূত শক্তি ও সুযোগ আছে এঁদের লেখা পড়ে তাঁদের হবে গাত্র-দাহ। গাত্রদাহের ফলে লাঠি নিয়ে মারতে যাওয়া যে শ্রেণীর রচিত আইনে বরদাস্ত করে এঁরা সে-সমাজেরই শত্রু। দৈহিক শক্তির বদলে যখন যুক্তির প্রভাব বেশী হয় তখনই ভল্‌টেয়ার-রাসেল সম্ভব। কেবল তাই নয়, লোকেদের হাসবার ক্ষমতাও থাকা চাই। গান্ডীর্য্যের মধ্যে, কাপুরুষতার মধ্যে ঠাট্টার উত্তর লাঠি কিংবা

জেলখানা—দুজনের ভাগ্যেই তা ঘটেছিল। রাসেল ভারতবর্ষে এলে কি হয় জানতে ইচ্ছা করে।

ভলটেয়ার-রাসেলের লিখনভঙ্গীতে অনেক মিল পাই। অতি অল্প কথায় অমন ভীষণ ঠাট্টা আর কেউ করতে পারে আমার জানা নেই। তাঁদের প্রত্যেক বাক্য যেন ঝক্ ঝক্ করছে—ইস্পাতের ধারাল ফলার মতন—ইস্পাতের মতনই কঠিন ও concrete এবং ফলার মতনই শত্রুকে নিধন করতে লোলুপ, এর সাহায্যে হাতের সামান্য একটি দক্ষ সঞ্চালনে আততায়ীর প্রাণ বিনাশ অতি সহজে সম্পন্ন হয়। দুজনেরই লেখা যে ঝক্‌মক করে সেটা কেবল প্রখরতায় নয়, সংযত ভাবাবেগে, অন্যায়ের প্রতি রাগে। সে রাগ যতই দমিত ততই ভয়ঙ্কর। ভলটেয়ার বিংশ শতাব্দী কিংবা রাসেল অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক হলে যে হাঁপিয়ে উঠতেন বলা যায় না—এইটাই বোধহয় তাঁদের সব চেয়ে বড় সুখ্যাতি—এবং বর্ত্তমান-সভ্যতার সব চেয়ে মারাত্মক সমালোচনা। দু'জনেই চিরন্তন—কিন্তু সমাজ যা ছিল অনেকটা এখনও তাই আছে বলেই। এ-যুগে অত্যাচারের নামান্তর ঘটেছে মাত্র।

য়ুরোপে আবার বুঝি গোঁড়ামির যুগ এল। এবার আর অত্যাচার ধর্ম্মের নামে নয়, জাতের দোহাইএ। সর্ব্বত্রই দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে, বিশেষত জার্ম্মানীতে এবং ইটালীতে। একতাবোধের জন্য নাৎসীদলের কর্ত্তারা সুপ্রজনন বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন; তাঁরা নিতান্ত সক্রিয়ভাবে জাতিগত শুদ্ধতার পক্ষপাতী। অন্তর্ধারে ইটালীর হাবসীদের ওপর অত্যাচারের মূলে রয়েছে বর্ণবিদ্বেষ, বিশেষত কালা আদমীর ওপর। ইংরেজ ফরাসীদের মধ্যে জাত্যাভিমান খুব প্রকট নয় বটে, অন্তত লিখিত পঠিত ভাবে নঁয়, কিন্তু তাঁদের অধীনস্থ ভিন্ন বর্ণের প্রজাবৃন্দের প্রতি মনোভাবে যে ঐ প্রকার অভিমান খুঁজে পাওয়া যায় না এমন কথা শপথ করে বলা চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অন্যান্য ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশে অধীনের সঙ্গে অধিপতিদের ব্যবহারে, আইন কানুনে, যুক্তদেশে নিগ্রোদের এবং পীতজাতির বিপক্ষে বিপরীত আচরণে একাধিক বার পূর্ব্বোক্ত অভিমান লক্ষ্য করেছেন। আমাদের দেশে স্বদেশী যুগে আর্য্যামির প্রকোপ ছিল, তখন মোক্ষ-মুলারের অস্বীকারোক্তি অগ্রাহ্য করে নিজেদের প্রত্যেককে আর্য্য জাতির বিশুদ্ধ সংশধর ভাবতাম। এখনও হয়ত হিন্দু সভার পণ্ডিতবর্গ ও মৌলানা সম্প্রদায়ের একাধিক নেতার মধ্যে ধারণা আছে যে প্রত্যেক হিন্দু সন্তান এক কল্পিত ভারতোত্থিত আর্য্য জাতির সর্ব্বগুণের উত্তরাধিকারী এবং প্রত্যেক মুসলমানের ধমনীতে আরবী কি ফার্সী কি তুর্কী জাতির রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। জাতিবোধ (ন্যাশনালিজম্) যখন তীব্র হয় তখন জাতিগত শুদ্ধতা (racial purity) নামক মিথ্যার নিতান্ত প্রয়োজন। এবং সেই সঙ্গে প্রতিবেশী 'অ-শুদ্ধ' জাতিকে দোষী সাব্যস্ত করার তাগিদ আসে। বিজ্ঞানকে জবরদস্তী করে নিজের কাজে লাগান এবং নিজের দোষ কি অপূর্ণতা ঢাকবার প্রয়াসে পরের স্কন্ধে দোষ অর্থাৎ অশুদ্ধতা চাপান—গণ-মনের নিতান্ত পরিচিত প্রবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার পাবার দুটি উপায় কল্পনা করা যায়। প্রথমত রাসেলের বুদ্ধিবাদ, মাত্রাজ্ঞান ও শ্রেয়োবোধের একাগ্র সাধনায় জাতীয়তা

ও দেশভক্তিকে অতিক্রম করা। হাক্সলী-প্রমুখ লেখকত্রয়ের পক্ষে সেটা বিষয়-বহির্ভূত এবং We Europeans-এর ২৮৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারা পড়লে মনে হয় যেন তাঁরা দেশাত্মবোধ হ্রাসের আশু সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। দ্বিতীয় উপায় হোলো, সুপ্রজনন বিদ্যা নামক অপূর্ণ বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ বর্ত্তমানে সে বিজ্ঞানের যতটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি ততটুকুই প্রচার করা, এবং অন্তর্ধারে তার অতিরিক্ত সিদ্ধান্তের ভুল দেখান। এই উপায়টি বইখানিতে গৃহীত হয়েছে, সেইজন্য তার মূল্য অত্যন্ত বেশী। লেখকদের সাধু উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রকাশকেরা দাম কমালে ভাল করতেন। কিন্তু যাঁরা বইএর দামের দিকে লক্ষ্য করেন না তাঁরা যদি প্রত্যেকে বইখানি কেনেন ও পড়েন তা হলে অন্তত আংশিকভাবে পৃথিবীর উপকার হবে।

আংশিকভাবে লেখবার মূলে আমার একটি দৃঢ় ধারণা রয়েছে। সত্যকারের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের শত্রু মিথ্যা সিদ্ধান্ত কিংবা আধ-কাঁচা আধ-পাকা সিদ্ধান্ত ততটা নয় যতটা হোলো সেই তত্ত্ব যার আশীর্ব্বাদে দৈনিক খবরের কাগজ জনগণ-মনের অধিনায়কত্ব করে। দৈনিক কাগজ সত্যার খবর যোগান দেয়, এবং তারই জোরে অপক্ক হট্টমনের সৃষ্টি করে। তখন নিজের তৈরী আজব চীজের ওপর প্রভাব বিস্তার করা কাগজের কর্ত্তাদের পক্ষে সহজ হয়। অতএব সুপ্রজনন বিদ্যার সুসিদ্ধান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী দৈনিক তত্ত্ব এবং তারই রচিত হট্টমন। আবার বলি, সত্যের বৈরী মিথ্যা নয়, মিথ্যাপ্রচারের সহায়গুলি অর্থাৎ দৈনিক কাগজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং হট্টমন। সেই জন্য We Europeansএর মত উৎকৃষ্ট বইখানিকে যদি জোনাথান কেপের মতন উচ্চশ্রেণীর প্রকাশক সস্তায় বাজারে ছাড়তেন উপকারের মাত্রা বেড়ে যেতো নিশ্চয়। হিটলার, মুসোলিনিকে দোষ দেওয়া লেখকত্রয় যাকে collective scapegoat তৈরী করবার প্রবৃত্তি বলেছেন, তারই একটি রূপ। কেন হিটলারের অনুপ্রেরিত ইতিহাস ও জাতিতত্ত্ব জার্ম্মানরা গ্রহণ করছে সেটাও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানকে কেন জনসাধারণের মনের দ্বারে উপস্থিত করা যাচ্ছে না তার কারণ খুঁজব না?

সে যাই হোক—বইখানির পরিচয় দিই। এতে ভূমিকা নিয়ে নিম্নলিখিত নয়টি অধ্যায় আছে। জাতিতত্ত্বের ইতিহাস, মানুষের বেলা সুপ্রজনন বিস্তার, বিশেষত: মেণ্ডেলীয়ান তত্ত্বের প্রয়োগ, জাতিবিভাগের ভিত্তি, জাতিবিভাগ সংক্রান্ত সাধারণ কয়েকটি মারাত্মক ভুলের তালিকা ও বিচার, য়ুরোপের জাতিবিভাগ, য়ুরোপীয়ান গোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব বিচার এবং কার সণ্ডার্স লিখিত য়ুরোপের বাইরে য়ুরোপীয়ান লোক-সমূহ, এই হোলো আটটি অধ্যায়। উপসংহারটি সমগ্র বইখানির সংক্ষিপ্তসার।

বইখানির গোটাকয়েক প্রকৃত বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত আমি পরিচয়ের পাঠক-বর্গের নিকট উপস্থিত করছি।

(১) Race কথাটির বিভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করে মনে হয় যে তার বদলে primary subspecies ব্যবহার করাই শ্রেয়।

(২) মেণ্ডেলীয়ান-তত্ত্বের প্রয়োগ ফলে দেখা যায় যে দুটি বংশের ধারা মেশে না, কিন্তু দুটি বংশের আদিম charactersগুলি বিচিত্র ভঙ্গীতে সজ্জিত হয়, কোনটার পুনরাবির্ভাব, কোনটা থাকে পাশাপাশি, কোনটা থাকে লুকিয়ে। সেইজন্য গোড়ায় যদিবা কালো চামড়ার সঙ্গে খাঁদা নাক কি মোটা ঠোঁট কল্পনা করা যায় তবু পাৎলা রঙ এবং সুচারু অবয়বের সঙ্গে মেশবার পর কাল চামড়ার সঙ্গে টিকল নাক ও পাৎলা ঠোঁটের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব এবং মেণ্ডেলীয়ান মতবাদ-সম্মত।

(৩) জন্তু জানোয়ারদের বেলা তবু familytree এবং একটা মূল কাণ্ড কল্পনা করা যায়। তার শাখা-প্রশাখাস্থিত জন্তুদের মধ্যে সঙ্কর সম্ভব নয়, কারণ তার ফলে বংশ লোপ হয়। মানুষের বেলা সাঙ্কর্য্য সম্ভব, কারণ জীবতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাতে মানুষের বংশ লোপ হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে কাল্পনিক শ্রেণী বিভাগ অবৈজ্ঞানিক। রক্তের শ্রেণী বিভাগ কল্পনা করা যায় এবং করা হচ্ছে।

(৪) অতএব জীবজন্তুর মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ তাতে অচলতার বদলে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিতে হবে; পরিমাণ-যোগ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতেই হবে; কিন্তু এখানে ভিন্ন ভিন্ন দলে কোন্ স্পষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্য অন্য কোন্ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে একত্রে কতবার লক্ষিত হচ্ছে এবং তাদের অন্যবন্ধের সাংখিক অনুপাতই আমাদের বিচার্য্য। প্রত্যেক দলের contour map of frequency, তার উচ্চতা নিম্নতা বিভিন্ন হতে বাধ্য। দল অর্থে ethnic group, race নয়। ও কথাটির নির্ব্বাসন প্রয়োজন।

(৫) ভাষার দ্বারা জাতিবিচার অচল। আর্য্যজাতি নেই—আর্য্য বলে ভাষার গোষ্ঠী কল্পনা করা যায়।

(৬) একটি জাতি অন্য জাতির চেয়ে কৃষ্টিতে বড় হলেও তার মূলে কোন বীজগত প্রাধান্য নেই।

(৭) Race আর nation কিংবা people এক বস্তু নয়।

(৮) য়িহুদীরা race নয় people—তাদের নিজেদের মধ্যের দেহগত পার্থক্য তাদের থেকে অন্য জাতির পার্থক্য অপেক্ষা কম নয়। আফ্রিকান য়িহুদী আর পর্ত্তুগীজ য়িহুদীর মধ্যে দেহগত পার্থক্য অনেক। তেমনি জার্ম্মান জাতি বলে কোন একটা বিশেষ race নেই। জার্ম্মান-য়িহুদী সমস্যা genetic কিংবা racial নয়, কেবল সংস্কারগত। য়িহুদীরা একটা pseudo national group, তাদের বন্ধন ধর্ম্ম ও কৃষ্টি, সবচেয়ে বড় বন্ধন বোধ হয় অত্যাচার।

(৯) নর্ডিক জাতির প্রাধান্য সর্ব্বৈব মিথ্যা।

(১০) জাতিমিশ্রণের দোষ বীজগত নয়, তার গুণও বীজগত নয়। দোষের জন্য দায়ী সামাজিক সংস্কার ও শ্রেণী-বৈষম্য, গুণের জন্য দায়ী কৃষ্টির আদান প্রদান।

(১১) ভিন্ন বর্ণের বিবাহ সম্বন্ধে লেখকত্রয় অত্যন্ত সাবধানে মত প্রকাশ করেছেন। ঐ প্রকার বিবাহ সমাজ সহ্য করতে পারে না, তাতে সমাজ ভেদে চুরে যায়। একটি কোন nation মাত্র খানিকটা বিদেশী stock হজম করতে পারে। তার বেশী যে পারে না সেজন্য বিদেশী genesকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, করা যায় কেবল বিদেশী অভ্যাস ও সংস্কার এবং সেই সংক্রান্ত নানা প্রকার ভুল

ধারণা ও বাধাবিঘ্নকে। এ-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কেবল উপদেশই দিতে পারেন, রাষ্ট্রিক রীতি বাৎলাতে পারেন না। ঔপনিবেশিক সমস্যাও জীবগত নয়।

(১২) Racial purity আদর্শ হিসেবেও অগ্রাহ্য, কারণ সেটি অসম্ভব, অতএব বিপজ্জনক, এবং সত্যকারের সম্ভাব্যতার প্রতিকূল।

বইখানি পুরোপুরি না পড়লে তার কদর করা যায় না, তাই যাঁরা পারবেন তাঁদের প্রত্যেককে কিনে পড়তে অনুরোধ করছি। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমাজতত্ত্বে বিরল। দাম সাড়ে আট শিলিং।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

The Serial Universe—By J. W. Dunne (Faber and Faber.)
Problems of Mind and Matter—By John Wisdom (Cambridge)

"Expriment with Time" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ডানের নাম সুপরিচিত। সেই বইখানাতে স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে তিনি কালের শ্রৈণীকত্বের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আলোচ্য পুস্তকখানাতে তারই পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য হিন্‌টন্-এর The Fourth Dimensionএর একটা মন্তব্য থেকেই ডানের চিন্তাধারার আরম্ভ; কিন্তু তিনি তাঁর থেকে বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছেন। নূতন পুস্তকখানাতে তিনি তাঁর মতবাদের সাহায্যে পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের আপাত-বিরোধী সিদ্ধান্ত-সমূহের সামঞ্জস্য সমাধানের পথ প্রদর্শন করেছেন বলে দাবী করেছেন। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে; British Institute of Philosophy থেকে প্রকাশিত Philosophy নামক ত্রৈমাসিক দার্শনিক পত্রিকার ১৯৩৫ সালের এপ্রিল ও জুলাই সংখ্যায় অধ্যাপক ব্রড্, গ্রেগরি ও নিউম্যানের আলোচনায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানির কয়েকটি অধ্যায়ের সারাংশ লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব সায়ান্সে বক্তৃতাস্বরূপ পঠিত হয়েছিল।

বইখানার প্রথম ভাগে যে দার্শনিক আলোচনার ভিত্তিতে কালের শ্রেণীকত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ও শেষভাগে বিজ্ঞানের আপাত-বিরোধের মীমাংসায় তার প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমাংশ সম্বন্ধে বহু সমালোচনার অবকাশ আছে আর দ্বিতীয়াংশের বিষয়ে এই বলা যায় যে বিজ্ঞানের রাজ্যে এ জাতীয় বিরোধ আজ নূতন নয়, চিরকালই চলে এসেছে; এবং তার সামঞ্জস্যও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই হয়েছে। পদার্থবিদ্যার অনিশ্চয় বিধি প্রভৃতির বর্ত্তমান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে বিরোধের সমাধানের চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে মন স্বতঃই একটু সন্দিহান হয়, কারণ এরূপ প্রচেষ্টার বিফলতার উদাহরণ প্রচুর আছে।

যে আলোচনার ভিত্তিতে অনন্ত প্রত্যাবৃত্তি (infinite regress) স্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা যেতে পারে। আত্মজ্ঞান (self consciousness) বিশ্লেষণ করলে যে বিষয় ও বিষয়ী সম্পর্ক পাওয়া যায়, তাকে সাধারণ আধীক্ষিকী

রীতিতে অনুধাবন করে লেখক প্রথম বিষয়ী হতে দ্বিতীয় তৃতীয় পর্য্যায়ক্রমে নূতন নূতন বিষয়ীতে পৌঁছাতে পারেন বলে মনে হয় না; জ্ঞানের একমাত্র উপায় স্মৃতি; কিন্তু স্মৃতিতে জ্ঞানের পরে আত্মজ্ঞান, বড়জোর কল্পনা ও চিত্রকল্পাদির সাহায্যে তৃতীয় পর্য্যায় পর্য্যন্ত অনুসরণ করে আভাসিক স্বাত্মজ্ঞান অভিধেয় কোন অবস্থায় উপনীত হওয়া হয়তো যেতে পারে; অনন্ত প্রত্যাবৃত্তিতে উপস্থিত হবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তাদৃশ প্রত্যাবৃত্তি ভিন্ন লেখকের অমর সমীক্ষণকারীর সাক্ষাৎ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। 'বর্ত্তমানের বেগ' (Velocity of the 'Now') শীর্ষক অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে প্রত্যাবৃত্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার ভিত্তিতে বিখ্যাত দার্শনিক ম্যাক্‌ট্যাগার্ট কালের সত্তা অস্বীকার করেছিলেন। বাস্তব কালের অস্তিত্ব হয়তো জ্ঞানকেও অস্বীকার করতে বাধ্য হতে হবে, কারণ তিনি কালকে দেশভুক্ত করে ফেলেছেন তাঁর মতবাদের খাতিরে। এ সম্পর্কে বার্গসনের Simultaneate et dureeতে আপেক্ষিকতত্ত্বে কালের দেশীভূততত্ত্বের সমালোচনা এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য মনে হয়। তবে হয়তো কালের এ মূর্ত্তি কল্পনা না করলে গাণিতিক পরিকল্পনার মধ্যে তাকে আনা সম্ভব হয় না; কিন্তু দার্শনিক তার প্রতিবাদ না করেও পারবেন না।

প্রকারক পরিকল্পনার (formal structure) অন্তর্বিরোধশূন্য চিত্র সম্ভব হলেই যে তার কোন বাস্তব রূপ থাকতে বাধ্য এমন কোন কথা নেই। যদি মনোবিজ্ঞানের রহস্য কখনো সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়, তবেই এ জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে মানসিক তথ্যের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। নতুবা এ জাতীয় চমকপ্রদ প্রকারক পরিকল্পনা সত্যে উপনীত হতে কতটা সাহায্য করবে তা বলা শক্ত। তবুও নূতন চিন্তাভঙ্গির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এ পুস্তকখানি পাঠ করলে পাঠকের কিঞ্চিৎ কৌতূহল নিবৃত্তি হতে পারে; আর পুস্তকের ভাষাও বেশ সাবলীল—স্থানে স্থানে প্রায় সাময়িক পত্রের ভাষার কাছে এসে পৌঁছেছে। কাজেই পড়তে বেশ ভালই লাগবে আশা করা যায়।

ডানের পুস্তকে যেরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, তার চেয়ে বহুগুণে উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় জন্ উইজডমের পুস্তকখানিতে। যে বিশ্লেষণীশক্তির জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি, মুর, রাসেল ও ব্রড প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে উইজডমও কেম্ব্রিজের সে খ্যাতি অব্যাহত রেখেছেন। রাসেলের Problems of Philosophy বা ব্রডের Mind and its Place in Nature-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে পুস্তকখানি খুব বিশিষ্ট না হলেও অযোগ্য নয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে হোয়াইটহেডের চিন্তাধারা কেম্ব্রিজে আরম্ভ হলেও, এখন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য বিশ্লেষণী শক্তির অভাব তাঁর আছে এ কথা কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে দার্শনিক প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা একা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই যা মুর, রাসেল বা ব্রডের মধ্যে পাওয়া যায় না—উইজডমের মধ্যে তো নয়ই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা উচিত যে উইজডমের বইখানি স্বল্পপরিসর ও অল্প কয়েকটি প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত, —অবশ্য বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে। উপরন্তু ষ্টাউটের গিফোর্ট বক্তৃতার সমালোচনাও এই

পুস্তকখানির অন্যতম অঙ্গ; কাজেই বাদানুবাদের প্রাচুর্য্য রয়েছে। অবশ্য এ জাতীয় বাদানুবাদ পরিহার করে বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে অন্যের মতামত সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ বিশ্লেষণী পদ্ধতির সামান্য কিছু পরিচয় দিয়েছেন; পরে কয়েকটী সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত এই পদ্ধতির বিশেষ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে পদ্ধতির পরিচয় সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন। বিশ্লেষণী পদ্ধতির সাধারণ পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক বিধি, চৈতন্য, জড়, সামান্য, বিশেষ, অস্তিত্ববত্তা ও ঘটনা প্রভৃতি বিষয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। পরে দেহ ও মনের সম্পর্কে, স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক ঘটনার পার্থক্য, দেহাত্মবাদ ও জড়বাদের দোষ, শারীরিক ও মানসিক ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্ক, স্বতন্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর জ্ঞানের বিষয়ে বিচার সম্পর্কে, প্রত্যক্ষ, ভৌতিক পদার্থের জ্ঞান ও সত্যের সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করেছেন। * কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিষয়ে আলোচনার সময়ে তিনি একটি অত্যন্ত বিস্ময়জনক কথা বলেছেন—যে আমাদের পাপবোধের জন্য জন্মের পূর্ব্বেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এত বেশী বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব। তবে দুএকটী বিষয়ে যেখানে অসঙ্গতি-বোধ হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। "বক্তব্য"কে (proposition) তিনি জ্ঞানাতিরিক্ত অস্তিত্ব বা জ্ঞানক্রিয়ার (act of judging) অংশরূপে কল্পনা না করে একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন (২০০—২০ পৃঃ)। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সময় এ দুই থেকে বিচ্ছিন্ন করে যা পাওয়া যায়, তাকেই 'বক্তব্য' বলেছেন। কিন্তু সে পদার্থটী কি তার কোন স্বরূপ এর থেকে স্পষ্ট হয় না। Ewingও তাঁর Idealism পুস্তকে প্রায় এর অনুরূপ কথাই বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যকে যদি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতেই হয়, তবে বাচনিক ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখানই বেশী যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। এত অল্পপরিসরের মধ্যে জ্ঞান ও সত্য সম্বন্ধে মুষ্ঠু আলোচনা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু আরও বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন এ বিষয়ে মত প্রকাশ করা অযৌক্তিক। অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ ও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সম্পূর্ণ নিরসন না করে, নিজের মত প্রকাশ করা সমালোচনা ও বিশ্লেষণী পদ্ধতির আদর্শের পরিপন্থী।

তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এ পুস্তকখানি প্রত্যেক দার্শনিক ও ও দর্শনশাস্ত্রানুরাগী পাঠকের পড়ে দেখা উচিত। অনার্শ ক্লাসের ছাত্রদের পক্ষেও এ পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী। আমরা এ পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

* কার্য্যকারণসম্পর্ক বিষয়ে তিনি তিনটী বিধির উল্লেখ করেছেন—(১) ঘটনার কারণ সম্ভবত বিধি (২) অখণ্ডক্রমত্ব বিধি (৩) জাতীয় সাদৃশ্য বিধি।

The Root and the Flower—By L. H, Myers (Jonathan Cape,)

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস। তিন খণ্ডে বিভক্ত—সন্নিকট ও সুদূর, রাজকুমার জালি ও রাজা অমর। প্রথম দুই খণ্ড ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাতে তৃতীয় খণ্ড সংযোজিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এক অবিচ্ছিন্ন উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ছয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুদীর্ঘ পুস্তকেও আখ্যায়িকা সমাপ্ত হয় নাই। প্রস্তাবনাতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,"the new portion,while it does not bring the story to an end, does bring it to an important climax"। ভবিষ্যতে কোনদিন আখ্যান সম্পূর্ণ করিবেন, এরূপ আশাও তিনি দিয়াছেন। পাঠক এই climax অবধি গল্প পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন কি না, জানি না। আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।

পুস্তকখানি সম্বন্ধে যথার্থ মতামত বিবৃত করা কঠিন কাজ। বিবিধ ইংরেজ সমালোচক ইহার এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, যে তাহার পরে আর সাধারণ লোকের কথা চলে না। তথাপি আমাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। স্পষ্টতঃ না পারি, ইঙ্গিতে আভাসে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুস্তকখানি সুদীর্ঘ। গল্প সম্পূর্ণ হইলে হয়ত ইহার আয়তন সহস্র পৃষ্ঠা হইবে। দীর্ঘ উপন্যাস লেখা যে দোষাবহ তাহা আমরা বলিতেছি না। দীর্ঘ উপন্যাসের একটা সার্থকতা অবশ্যই আছে। তবে আমাদের মনে হয় যে, উপন্যাস অতিদীর্ঘ হইলে তাহার একটা epic quality থাকা চাই। এরূপ গ্রন্থ মহামানবের কীর্ত্তিগাথা হইতে পারে, কিংবা কোন মহাযুগের গৌরব-কাহিনী হইতে পারে, কিংবা, এমন কি, কোন অধঃপতিত মহাজাতির বিষাদগীতি হইতে পারে। নানাবিধ দীর্ঘ উপন্যাসের সহিত আমরা পরিচিত। Galsworthyর Forsyte Saga, Dumasএর Three Musketeers, দস্তয়েভস্কির People ইত্যাদি গ্রন্থ এই epic qualityর জন্যই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে এই গুণের একান্ত অভাব। আখ্যায়িকার স্থান ভারতবর্ষ, কাল আকবরের যুগ, পাত্র স্বয়ং বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার ছোট বড় মানুষ। কিন্তু গ্রন্থকার সেই গৌরবময় যুগকে দেখিয়াছেন এমন এক জোড়া ভাঙ্গা চোরা রঙ্গীন চশমার মধ্য দিয়া যে তাঁহার পুস্তকের কোন পাত্রকে আর চিনিবার উপায় নাই। মুখবন্ধে তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা মোটামুটি এই, "এ পুস্তক ঐতিহাসিক উপন্যাসও নহে, প্রাচ্য জাতিসমূহের চাল চলন বা চিন্তার ধারার বিবৃতিও নহে। ভারতীয় রীতি-নীতি, ভারতের ইতিহাস বা ভূগোল কিছুই আমি মানিয়া চলি নাই। যেখানে যতটা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি সত্যের অপলাপ করিয়াছি।" (Fact have been distorted or ignored where inconvenient)

বেশ করিয়াছেন! তবে আমাদের বক্তব্য যে গ্রন্থকার মাঝুদিগের চীন কি টোলেমিদিগের মিসর সম্বন্ধে উপন্যাস লিখিলে তাঁহারও কোন ক্ষতি হইত না, আমাদেরও এতটা আপত্তি থাকিত না। ভারতবাসীর অতি সাধের, অতি গৌরবের একটা যুগ লইয়া এ খেলা না খেলিলেই ভাল হইত। আর এ কথাও বোঝা কঠিন যে ঐতিহাসিক গল্প লিখিতেছেন না বলিয়া ইতিহাসকে ও বাস্তবকে

Myers সাহেব এরূপ নির্দ্দয় ভাবে বিকৃত করিলেন কি মতলবে। প্রস্তাবনাতে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা সযত্নে পড়িয়াও আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হইল না। বুঝিলাম মাত্র এইটুকু যে সাহেব অসাধারণ ও আশ্চর্য্য চিত্র অঙ্কিত করিবেন বলিয়া ঐক অসাধারণ ও আশ্চর্য্য canvas গাড়া করিয়াছেন।

পুস্তকখানি যে অসাধারণ হইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঠিক এই ধরণের উপন্যাস আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই অসাধারণত্বের জন্যই হয়ত এক আধজন অসাধারণ high brow পাঠকের এই পুস্তক ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের আদ্যোপান্ত পড়িবার ধৈর্য্য থাকিবে কি না, সন্দেহ। ভারতীয় পাঠকের চক্ষে আবার তাহার আপন দেশবাসীর এই বিকৃত ও অদ্ভুত চিত্র অপ্রিয় ও অসুন্দর ঠেকাই সম্ভব। আগেই বলিয়াছি যে উপন্যাসের পাত্রগণের মধ্যে স্বয়ং আকবর শাহ একজন। সম্রাটের চিত্র সম্বন্ধে Mr. Myers বলিয়াছেন, "The only personage drawn with any regard for the truth is the Emperor"। কিন্তু আমাদের মত যাঁহারা সম্রাটকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন তাঁহারা Myers সাহেবের আকবর চরিত্রাঙ্কন দেখিয়া সুখী হইতে পারিবেন না, বরং ক্ষুণ্ণ হইবেন। গল্পে আর তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি স্থান পাইয়াছেন—দুই শাহজাদা, সেলিম ও দানিয়াল, এবং রাজগুরু মুবারক। ইহাদের চরিত্রের সহিতও ইতিহাস বা সত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। বাকী পাত্রগণ ও তাহাদের কার্য্যকলাপ সত্যই অদ্ভুত। দুই চারিজনের নাম করিব। পাঠক নিজেই বিচার করিবেন।

উপন্যাসের নায়ক, অমর, মধ্যভারতের মরু প্রদেশের একজন রাজা। জাতিতে রাজপুত, ধর্ম্মে বৌদ্ধ। তাঁহার রাণী জন্মিয়াছিলেন কর্কেসস্ প্রদেশে। ধর্ম্মে খৃষ্টান। পূর্ব্বে নাম ছিল হেলেন, এখন নাম হইয়াছে সীতা। সীতার পুত্রের নাম জালি। সেও খৃষ্টান। অমর সিংহের ভগ্নীর নাম অম্বিস্সা। তিনি বিবাহ করিয়াছেন একজন পাঠান যোদ্ধাকে। এই পাঠানের নাম হরি খান। হরি খানের প্রেমিকা এক আফগান সরদারের দুহিতা। তাঁহার নাম ললিতা। এ কথা শুনিয়া পাঠক হাসিবেন না। কারণ একজন তুর্কী সরদারের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইবে যাহার নাম নরসিংহ খান। Myers সাহেব একজন বাঙ্গালীকে পর্য্যন্ত আসরে নামাইয়াছেন। অবশ্য বাঙ্গালীকে আর কি কাজ দিবেন, তাহাকে গোয়েন্দা বানাইয়াছেন! নামও দিয়াছেন অতি চমৎকার—মাবুন দাস। হরি খান ও ললিতার প্রণয়-কাহিনী বেশ আধুনিক রকমের। তথা, হরি খান ও তাঁহার জালক-পত্নী সীতার গুপ্ত প্রেম একেবারে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ব্যাপার! এই সব কাহিনী রচনা করার জন্য আকবরযুগের অবতারণার কোন প্রয়োজন ছিল না। অমরকে বৌদ্ধ করারই বা কি সার্থকতা! ধর্ম্ম-প্রবণ সংসার-ত্যাগী পুরুষ ত সকল দেশে সকল যুগেই থাকিতে পারে!

ললিতা, সীতা, অম্বিস্সা প্রভৃতি গল্পের পাত্রীগণ নিতান্ত একেলে মহিলা। সীতা শাহজাদা দানিয়ালের সহিত লাঞ্চ খাইতেছেন। হরি খান ললিতাকে প্রথম দেখিলেন তাহার পিতার ডিনার টেবিলে। ললিতা তাহার মাতা ও ভগ্নীদের

লইয়া ডিনার খাইলেন অপরিচিত অতিথির সহিত এক টেবিলে। এই নায়িকাগণ উপন্যাসাদি পড়িতেছেন, কাব্যচর্চ্চা করিতেছেন, আমাদের পরিচিত আধুনিকাদের মতই। দ্বিতীয় খণ্ডে বালক বালিকাদের একটা চায়ের বৈঠকের পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে।

আমাদের মনে হয় যে এই সমস্ত অসঙ্গতি ইচ্ছাকৃত এবং সেই কারণেই আমাদের নজরে বেশী আপত্তিজনক। গ্রন্থকার যে ভারতবর্ষ ও মোগলযুগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের নানা স্থলে বিবিধ ধর্ম্মমত ও লোকাচার সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম বিচার আছে তাহা গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তথাপি Myers সাহেব কেন যে একটা কৃত্রিম অস্বাভাবিক আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়া গল্প লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

গল্পের ঘটনাবলীও যত দূর সম্ভব জটিল। মূল কথাটা এই যে আকবর বাদশাহ ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মমন্থনে মন দিয়াছেন ও দীন ইলাহীর প্রতিষ্ঠায় আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র জীবিত—সেলিম ও দানিয়াল। সেলিমকে গোঁড়া মুসলমান দল আপন নেতা বলিয়া মনে করেন। দানিয়ল ধর্ম্মের ধার ধারে না—সে সুন্দরের উপাসক, কলা-চর্চ্চাই তাহার প্রধান কাজ। সেলিম কিন্তু গোপনে তান্ত্রিক বামাচারে রত। আকবর তান্ত্রিকদের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া আদেশ দিয়াছেন যে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রধান লোককে হস্তীপদদলিত করিয়া মারিয়া ফেলা হউক। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি গল্প এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু এই যে পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ বাধিয়াছে এই যুদ্ধের জন্য উভয় পক্ষই লোক সংগ্রহ করিতেছেন। নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগণ সকলেই অল্পবিস্তর এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আবার নানা অবান্তর কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে এরূপ গোলযোগ বাড়িয়াছে যে পড়িতে পড়িতে গল্পের মূলসূত্রটী অনেক স্থলেই হারাইয়া যায়।

এত ক্ষণ বইখানির দোষই ধরিয়াছি। কেন না ইহার গুণ অপেক্ষা দোষ অনেক বেশী। অন্ততঃ আমাদের এই মত। তবে এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পুস্তকের লিখন-ভঙ্গী চমৎকার, ভাষা অতি সুন্দর—স্থানে স্থানে কবিতার মত, গানের মত প্রতিমধুর। তেমনই মনস্তত্ত্ব-ঘটিত ব্যাপারের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ খুব কম উপন্যাসেই দেখিয়াছি। এই বিশ্লেষণ সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু ইহার নৈপুণ্য সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। উপন্যাসের পাত্রগুলি exotic, তাহাদের আবেষ্টন কৃত্রিম হইলেও Myers সাহেব তাহাদের যে চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন তাহা পাকা হাতের কাজ; চিত্রে যে রেখা টানিয়াছেন, তাহাতে যে রঙ ফলাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও কাঁচা কাজ নাই। রাজকুমার জালিকে আমাদের বিশেষ ভাল লাগে নাই। দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের বালকের পক্ষে কিছু বেশী অকালপক্ক মনে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে Myers সাহেব জালির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, সুন্দর। তিনি ইচ্ছা

করিয়াই জালিকে অকালপক্ক করিয়াছেন, কেন যে এরূপ করিয়াছেন তাহার পরিষ্কার কারণও দেখাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই এই রকম। হরি খানকে ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু হরি খানের চিত্রে যে এতটুকু অস্পষ্টতা আছে তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। মোট কথা আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা ও লিখনভঙ্গী সুন্দর। চরিত্রাঙ্কন ও চরিত্র-বিশ্লেষণ চমৎকার, কিন্তু আখ্যায়িকা অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত এবং অযথা দীর্ঘ। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। পুস্তকের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার এমন আশ্চর্য্য সুন্দর বর্ণনা আছে যাহা একবার পড়িলে সহজে ভোলা যায় না। তবে এরূপ স্থল খুব বেশী নাই, আর সেগুলি সমগ্র পুস্তকের মাঝে এমন ভাবে লুকান আছে যে পরে খুঁজিয়া বাহির করাই কঠিন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

A Study of History—By Arnold J. Toynbee-Vols, I, II and III
(Oxford University Press)

ইংরাজ অধ্যাপক আর্ণল্ড্ টয়েন্‌বির শ্রেষ্ঠ রচনা মানব ইতিহাসের এক বিরাট বিবরণের প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশ ঐতিহাসিকদের জগতে বোধ হয় গত দু বছরের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা বলে' গণ্য হবে। যে-উচ্চ আশা নিয়ে টয়েন্‌বি প্রায় অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা' যে সফল হয়েছে একথা বল্‌ছি না কেন না আমার বিশ্বাস এই যে ইতিহাসের সমগ্ররূপের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা মাত্রই অসম্পূর্ণ ও অনেকখানি একদেশদর্শী হ'তে বাধ্য এবং সে সম্বন্ধে মতভেদও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের এই খণ্ড খণ্ড সত্যানুসন্ধানের যুগে টয়েন্‌বির প্রচেষ্টার ব্যাপকতা বিস্ময়জনক ও প্রশংসনীয়; এবং তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অদম্য অধ্যবসায়, চিন্তার প্রসার ও লেখার প্রাঞ্জলতা পাঠকদের মন মুগ্ধ করবে একথা জোর করে বলা চলে।

আর্ণল্ড্ টয়েন্‌বি প্রবীণ ঐতিহাসিক নন, তিনি উত্তর-সাময়িক যুগের লেখক। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবস্থা সম্বন্ধে একটি ছোট অথচ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা এবং আধুনিক আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর বাৎসরিক বিশদ বিবরণীগুলির সম্পাদনা-কার্য্য তাঁকে ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতি এনে দিয়েছে। তবুও সভ্যতার সূত্রপাত থেকে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত সমগ্র ইতিহাসের পর্য্যালোচনা এবং সে সম্বন্ধে এক বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যে নিজের জীবন নিয়োগ করেছেন এ-কথা সাধারণের অগোচর ছিল। সভ্যতার এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তের ভাগে সম্পূর্ণ হবে। তার মধ্যে প্রথম তিনটি অংশ মাত্র এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এই তিন খণ্ডে টয়েন্‌বি তাঁর মতামতের সংক্ষিপ্তসার উপক্রমণিকায় লিপিবদ্ধ করবার পর সভ্যতার উৎপত্তি এবং বিকাশ এই বিষয় দুটি মাত্র আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির একটি বিশিষ্ট রূপ পাঠকের চোখে ধরা দিচ্ছে।

টয়েন্‌বি মানব-সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেন নি, সভ্যসমাজগুলির জীবনের বাহ্যিক ঘটনার বিবৃতি অথবা তাদের কীর্ত্তিস্পর্শ বিচারও

তাঁর লক্ষ নয়। তিনি শুধু মানুষের ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ রূপ দেখতে চেয়েছেন; তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সত্য বা নিয়ম নির্দ্ধারণই তাঁর উদ্দেশ্যে। ফলে তাঁর গ্রন্থ ইতিহাসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার রূপ নিয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন ঘটনা অবিসংবাদিত সত্য হ'লেও সমস্ত ইতিহাসের রূপ বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সকলের একমত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। ইতিহাসের সমগ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে, আর সে দৃষ্টি ভঙ্গী শ্রেণী জাতি বা ব্যক্তিগত পার্থক্য ও যুগধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের উপর গড়ে ওঠে। ভাববাদীয় ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা বস্তুতান্ত্রিকের মন স্পর্শ করবে না একথা সহজেই বোঝা যায়। সমাজ-সম্পর্কিত সকল বিদ্যার আলোচনাতেই এ-জাতীয় মতানৈক্য স্বাভাবিক বলেই আমার বিশ্বাস—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে বোধ হয় অচল। সেইজন্য টয়েন্‌বির মতবিশেষ খণ্ডন করার চেষ্টার চাইতে তাঁর বিশ্বাস ও ধারণার কিছু পরিচয়ই বর্ত্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

বিপুল আয়োজন ও ব্যাপক দৃষ্টির দিক থেকে টয়েন্‌বির উদ্যম অনেকখানি নূতন, কেন না বহুকাল ধরে ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখার অভ্যাস আমাদের মন অভিভূত করে' রেখেছে। টয়েন্‌বির মতে এ অভ্যাসের মূল যুগধর্ম্মে। পণ্যোৎপাদন প্রণালীকে যেমন এখন নানাভাগে বিভক্ত ক'রে বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক-বিশেষের আলোচনার ক্ষেত্রও তেমনি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; ফলে সমাজ-জীবনের সমগ্র রূপ কারও চোখে প্রতিভাত হয় না। মম্‌সেন্ যৌবনে এক বিশাল ইতিহাস রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিণত জীবন তিনি অতিবাহিত করলেন রোমান লিপিমালা ও শাসনপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে। য়্যাক্টন্ মনস্থ করেছিলেন যে স্বাধীনতা বিকাশের বিচিত্র ইতিবৃত্ত তিনি উদ্ঘাটিত করবেন কিন্তু সারাজীবনের পরিশ্রমেও তিনি তার যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করে' উঠতে পারেন নি। অনেক সময় সামান্য আয়াসের লেখার ভিতরও গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকে—টুর্গো বা হু গোবিনোর প্রবন্ধগুলি এর উদাহরণ। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় মহাশক্তিদের উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়েছে যে জাতি বা দেশই হচ্ছে ইতিহাসের মূল আধার। এইজন্য ফরাসী ইতিহাস-লেখক জুলিয়ান্ সুদূর প্রস্তর যুগের মধ্যেও ফ্রান্সের স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় পেয়েছেন। যুগবৈশিষ্ট্যের প্রভাব এত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও টয়েন্‌বি কিন্তু বিশ্বাস করেন যে ইতিহাস চর্চ্চার মধ্যে কিছু সার-সত্য নিহিত আছে এবং সেই সত্যানুসন্ধান ঐতিহাসিকের ধর্ম্ম ও সে-সত্যনির্দ্ধারণই ইতিহাসের সার্থকতা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে অন্ততঃ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বোধগম্য কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ থেকে আরম্ভ ক'রে পণ্যোৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সে ইতিহাসের সকল প্রধান ঘটনাগুলি বুঝতে গেলেই অন্য অনেক দেশের কথা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন দেশের ইতিহাসই সম্পূর্ণ পৃথক নয় —অংশবিশেষের সম্যক্ পরিচয় পেতে গেলে সমগ্রের রূপ প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে। ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাই বলে ইংল্যাণ্ডের কথা জানতে গেলে সমস্ত জগতের ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে

একথাও সত্য নয়। ঐতিহাসিক পরিচয় বা জ্ঞান রাষ্ট্র বা জাতিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না বটে কিন্তু তার ক্ষেত্র সর্ব্বদাই জগদ্ব্যাপী হবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ একই সময় আমরা পৃথিবীতে একাধিক সভ্য সমাজের পরিচয় পাই—তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ সামান্য; তাদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তা আছে; তাদের ইতিহাস পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে বোধগম্য; কিন্তু প্রতি সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে গভীর যোগসূত্রে আবদ্ধ, তাদের মিলন অত্যন্ত নিবিড়। টয়েনবি বলেন যে বর্ত্তমানে পাঁচটি বিভিন্ন সভ্যতা বা সমাজ বিরাজ করছে—পাশ্চাত্য জগৎ, পূর্ব্ব ইউরোপের সনাতনী খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান জাতিগুলি, হিন্দু সভ্যতা এবং সুদূর প্রাচ্য। আমরা আজকাল পৃথিবীর যে একতা অনুভব করি সে ঐক্য নিতান্ত অভিনব ও অসম্পূর্ণ—আর্থিক বা রাষ্ট্রিক মিলনের চাইতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য নাকি এখনও প্রবলতর।

কিন্তু এইভাবে যে সভ্যসমাজগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হ'ল তারা কেউ চিরদিনের নয়, ব্যক্তিবিশেষের মত সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু (এমন কি অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত) আছে। সুতরাং আজকের দিনের পাঁচটি সভ্যতা ছাড়াও অন্য সমাজের পরিচয় আমরা পুরাকালের তথ্যানুসন্ধান করে পেতে পারি—তারা এখন মৃত, যদিও তাদের মধ্যে কারও কারও সন্তানসন্ততি হিসাবে আধুনিক সমাজ কয়েকটিকে গণ্য করা যায়। ঠিক একশ' বছর আগে ফরাসী অভিজাত দ্য গোবিনো সমাজ সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচার করেছিলেন—তখন তাঁর তালিকায় দশটি সভ্যতা স্থান পেয়েছিল। মানুষের সমস্ত ইতিহাস বিচার করে' টয়েনবি সবশুদ্ধ উনিশটি সভ্যসমাজের সন্ধান পেয়েছেন। জীবিত পাঁচটি ছাড়া অন্যগুলির নাম এখানে করা যেতে পারে—ইরানীয় ও আরব (ষোড়শ শতকে উভয়ের মিলনে বর্ত্তমান ইস্‌লাম্ সমাজের উৎপত্তি হয়), হেলেনিক্ (গ্রীস্ ও রোম) ও মিনোয়ান্ (লাটীন দ্বীপমালার সভ্যতা), সিরিয়াক (হিব্রু জাতি ও পারস্যের অভ্যুদয় থেকে ইস্‌লামের উত্থান পর্য্যন্ত), হিটাইট ও বাবিলোনীয়, প্রাচীন চৈনিক ও প্রাচীন ভারতীয়, সুমেরীয় ও মিশরী এবং আমেরিকার আণ্ডেস্ অঞ্চলের সমাজ ও মায়া সভ্যতা ও শেষোক্তটির থেকে উদ্ভূত মেক্সিকো ও য়ুকাটনের সমাজ। ইরানীয় ও আরব সভ্যতা ইস্‌লামী সমাজে একত্র অবস্থান করছে বলে' অবশ্য তালিকায় কুড়িটির জায়গায় উনিশটি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

এই বিভিন্ন সমাজগুলির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় টয়েন্‌বি প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। এর মধ্যে মিশরী ও আণ্ডেস্-সভ্যতার সঙ্গে পূর্ব্বগামী বা পরবর্ত্তী কোন সভ্যতার যোগ তিনি স্বীকার করেন না—এ দুটি স্বয়ম্ভু ও সন্তানহীন। আর চারটি সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সভ্যতার সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এদের নাম প্রাচীন চৈনিক, সুমেরীয়, মিনোয়ান্ ও মায়া। অন্য সবকয়টি সমাজই পূর্ব্বগামী কোনও সভ্যতার উত্তরাধিকারী। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে হেলেনিক্ সভ্যতা মিনোয়ান্ থেকে উদ্ভূত ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ এবং সনাতনী খৃষ্টীয় সমাজের জননী। আধুনিক হিন্দু সমাজ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সন্তান ও সে-সভ্যতা (মহেঞ্জোদোরোর প্রমাণে) টয়েন্‌বি সুমেরীয় সমাজের থেকে উৎপন্ন বলে'

সন্দেহ করেছেন। মিনোয়ান জননীর আর এক সন্তান সিরিয়াক সভ্যতা আর তার থেকে ইরানীয় ও আরব সমাজের উৎপত্তি।

কিন্তু এক সমাজ অন্য সভ্যতার সন্তান এ-তথ্য আবিষ্কারের উপায় কি? টয়েনবি হেলেনিক্ সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্ক বিচার করে কতকগুলি চিহ্ন পেয়েছেন এবং খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে সে চিহ্নগুলির অনুসন্ধানে মন দিয়েছেন। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের উৎপত্তির ইতিহাস (অনেক ক্ষেত্রে, যদিও সর্ব্বত্র নয়) খানিকটা এই রকম। সমাজের জীবনে একটা অরাজক অবস্থা আসতে পারে যাকে আমাদের সাহিত্যে মাৎস্যন্যায় বলা হত। তার ফলে ক্রমে ক্রমে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় (ঈজিপ্টের দ্বাদশ বা অষ্টাদশ রাজবংশ, সুমের ও আক্কাদ, আকেমেনীয় রাজত্ব, হান্ রাজকুল, মৌর্য্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্য, রোম, খিলাফৎ, ইন্‌কা ও আজটেক রাজ্য প্রভৃতি)। সভ্যতাবিশেষের জীবনী-শক্তি যতদিন প্রবল থাকে ততদিন সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য সামাজিক ঐক্য সংরক্ষণ করতে পারে, তারপর আসে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু। সেই শেষযুগে মুষ্টিমেয় শাসকসম্প্রদায় প্রাচীন সভ্যতাকে আবার ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে; তখন একদিকে সে সমাজের সীমান্তস্থিত বর্ব্বরেরা তাকে বিধ্বস্ত করে' তোলে (যেমন টিউটনেরা রোমকে ও শক-হুণেরা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করেছিল) এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরস্থিত নিম্ন শ্রেণীরা উদীয়মান কোন সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আশ্রয়ে নূতন জীবন লাভ করে (রোম সাম্রাজ্যের অবসানে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবের মতন)। যদি পূর্ব্ব ও পর দুই সভ্যতার মধ্যে কোন সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সেতু পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয়টি প্রথমের সন্তান, একথা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় (খ্রীষ্টধর্ম্মের কল্যাণে হেলেনিক সভ্যতা পাশ্চাত্য জগতের জননী রূপে গণ্য হচ্ছে)। নূতন ধর্ম্ম উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রাচীন সমাজের বাইরে থেকে এসেছিল অবশ্য; কিন্তু অন্যত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম পুরাতনের ভিতর থেকে উত্থিত হয়েছে—ইস্‌লামের উৎপত্তি যেমন সিরিয়াক্ সভ্যতার মাঝখানেই। যদি পুরাতন সভ্যতার প্রচলিত ধর্ম্মই নূতন সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় তবে পরবর্ত্তী সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহ ওঠে—সুমেরীয় ও বাবিলোনীয় সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অন্যদিকে যদি দুই সমাজের মধ্যে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সেতু না পাওয়া যায় তবে তাদের পারস্পরিক যোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না—সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ স্থাপন এইজন্য সুসাধ্য নয়।

এরপর টয়েনবি আলোচনা করেছেন যে বিভিন্ন সমাজের তুলনা চলে কি না। মানবজাতির জীবনের অধিকাংশই বর্ব্বর অবস্থায় কেটেছে—এখনও অসভ্য জাতির বিশেষ অভাব নেই। মানুষ হয়ত এই পৃথিবীতে তিন লক্ষ বছর বাস করেছে কিন্তু সভ্যতার প্রথম উদয়ও ছয় হাজার বছরের বেশী নয়। সুতরাং এক হিসাবে সকল সভ্য সমাজই প্রায় সমসাময়িক। মূল্যবিচারের দিক থেকে দেখতে গেলেও স্বীকার করতে হবে যে একদিকে অসভ্য অবস্থা ও অন্য দিকে মানুষের যে চরম সিদ্ধি সম্ভব এ উভয়ের তুলনাতেই ইতিহাসের পরিচিত সকল সভ্যতাই প্রায় একই গোত্রের—অন্ততঃ টয়েনবির তাই বিশ্বাস। তিনি একথাও

বলেন যে এক হিসাবে ইতিহাসের প্রতি ঘটনারই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে বটে কিন্তু ঐতিহাসিকের ব্যাপক দৃষ্টিতে ঘটনার সাদৃশ্যও ধরা পড়তে বাধ্য; এই সাদৃশ্যজ্ঞানই ইতিহাস লেখকের মূলসূত্র এবং এরই উপর সভ্যতার তুলনামূলক পর্য্যালোচনার প্রতিষ্ঠা।

তবুও প্রশ্ন উঠতে পারে যে সকল সভ্যতাই কি মূলতঃ এক নয়? অনেক সময় ইতিহাসকে অবিচ্ছিন্ন স্রোতের রূপে কল্পনা করা হয়েছে, সামাজিক বিবর্ত্তনকে বলা হয়েছে সরল রেখায় প্রগতি। টয়েনবি এর কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য জগৎ সারাপৃথিবীর আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব হস্তগতপ্রায় করেছে বলে পশ্চিমের ঐতিহাসিকেরা মনে রাখেন না যে এ-ঐক্য সাম্প্রতিক মাত্র। সেই কারণেই তাঁরা সমসাময়িক অন্যান্য জীবন্ত সমাজগুলিকে অগ্রাহ্য করেন এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলিকেও হয় তুচ্ছজ্ঞান নয়ত পাশ্চাত্য সমাজের উপাদান মাত্র গণ্য করেছেন। প্রাচ্য দেশগুলি তাঁদের অনেকের মতে পরিবর্ত্তনহীন স্থবরাং তাদের ইতিহাস নেই। এগানে ইতিহাসকে শুধু রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ব জগতের বিভিন্ন সমাজের পার্থক্যের কথাও মনে রাখা হয় না। সামাজিক গতির রূপ সরল রেখা রূপে কল্পনা করাও শিশুসুলভ—তাতে ইতিহাসের যথার্থ বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ লোপ পেতে বাধ্য। আসলে গত ষাট শতাব্দীতে নানা সভ্যতার উৎপত্তি ও লোপপ্রাপ্তি ঘটেছে, ঐতিহাসিককে তাদের সকলের কথাই মনে রাখতে হবে। মানুষ একদা মনে করত যে পৃথিবীই বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রস্থল; স্বজাতি বা নিজের সমাজই যে মানুষের ইতিহাসের কেন্দ্র নয়, এ বিশ্বাস এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সভ্যতার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা টয়েন্‌বির লেখায় অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। যে-কয়েকটি সভ্যসমাজকে প্রাথমিক আখ্যা দেওয়া চলে তাদের উদ্ভব নিশ্চয় বর্ব্বর অবস্থার রূপ-পরিবর্ত্তনের মধ্যে। অপরাপর সভ্যতার বিকাশের মূলে এক বা ততোধিক পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের প্রভাবও বিদ্যমান থাকে। সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনের একটা দ্রুতগতি; পক্ষান্তরে সভ্যতার উদ্ভবের পূর্ব্বাবস্থার প্রকৃতিই হচ্ছে স্থিতিশীল। এই স্থিতি ও গতির পর্য্যায়কে টয়েন্‌বি জগতের মূলছন্দ বলেছেন—কবি ও ভাবুকের ভাষায় তিনি সমস্ত বিশ্বসংসারে এই স্পন্দনের লীলা দেখেছেন। চীন ভাষায় এই দুই প্রকৃতিকে নাকি ইন্ ও ইয়াং বলা হয়, টয়েন্‌বি অন্ততঃ সে কথা দুটি তাঁর গ্রন্থে স্থিতি ও গতির অর্থে ব্যবহার করেছেন।

প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরতার সুদীর্ঘ যুগকে টয়েন্‌বি ভাববাদের ভাষায় সাধারণ ভাবে গতিবিমুখতার নিদর্শন বলেই ব্যাখ্যা করেন কিন্তু সভ্যতার উৎপত্তির বিশেষ কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টার অভাবও তাঁর লেখার মধ্যে নেই। অনেকে মনে করেন জাতিগত বৈশিষ্ট্যই সভ্যসমাজ গঠনের আদি কারণ। গত শতাব্দীতে গোবিনোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে' প্রথমে আর্য্যরক্তাভিমানী জার্ম্মান পণ্ডিতেরা ও পরে চেম্বারলিন্ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা নর্ডিক্ পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইয়োরোপীয় প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচারিত হয়েছে। আমেরিকা-বিজয়ের সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল; প্রটেষ্টাণ্টেরা আবার বাইবেলের

পুরাতন বিধান পাঠের থেকে নিজেদের বিধাতার আশ্রিত ও নির্ব্বাচিত জাতি হিসাবে গণ্য করতে শেখে। কিন্তু জাতির এই স্পর্দ্ধার ভাব আধুনিক, ও সর্ব্বত্র সমান প্রবল নয়; জাতির কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাও নির্দ্দেশ করা শক্ত। শারীরিক সাদৃশ্য থাকলেই একতার ভাব উদয় হয় না—পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ রেসের সন্ধান বাস্তব জগতে দুর্লভ। এইরূপ নানা কারণে মনে হয় যে সভ্যতার উৎপত্তির কারণ রেসের শ্রেষ্ঠত্ব নয়। গ্রীকদের অবশ্য মত ছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের কারণ। কিন্তু নীল নদ মিশরের সভ্যতার মূল হলে মিসিসিপি উপত্যকায় তার অনুরূপ সমাজের উদয় হয়নি কেন? মায়া সভ্যতা মেক্সিকোর মালভূমিতে আবির্ভূত হলেও দক্ষিণের নিকটতর অনুরূপ দেশে পৌছাতে পারেনি। সুদূর প্রাচ্যের সভ্যসমাজ জাপানকে জয় করে কিন্তু ইন্দোনেসিয়ায় তার প্রসার হল না। টয়েন্‌বি এজন্য সিদ্ধান্ত করেছেন যে রেস্ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর কোনটাই সভ্যতার উৎপত্তির অবিমিশ্র হেতু নয়।

কিন্তু যে কারণকে টয়েন্‌বি শেষ পর্য্যন্ত বৈধ বলে' ঘোষণা করেছেন তা' নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকবে বলে আমার মনে হয় না। তিনি তাকে challenge and response নাম দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক কিম্বা মানুষিক অবস্থার মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন হয়, তার ফলে বিভিন্ন লোক-সমষ্টির জীবনে সমস্যা বা পরীক্ষার আকস্মিক আবির্ভাব হয়ে পড়ে। কেউ কেউ সে বিপদ সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের শক্তির বিকাশ লাভ করে; কারো পক্ষে সঙ্কটের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। টয়েন্‌বি ইজিপ্ট, সুমের, চীন প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এইভাবে সর্ব্বত্রই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্য্যয় ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সদ্ব্যবহারের মিলিত ফলে সভ্যসমাজের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু কোনখানেই সংগ্রামের শেষ ফল আগে থাকতে নিশ্চিত থাকে না কেন না সমস্যার সামনে কে কেমন আচরণ করবে সে কথা পরীক্ষার আগে কেউ বলতে পারে না।

উপরে টয়েন্‌বির ইতিহাস সম্বন্ধে বিশ্বাসের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হ'ল তার প্রতি কথারই প্রতিবাদ করা যায় কিন্তু সে তর্কের কোন শেষ আছে কিনা সন্দেহ। সমাজের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার তালিকা সম্বন্ধে মতভেদ খুবই স্বাভাবিক। টয়েন্‌বির প্রধান দোষ বোধ হয় analogy বা ঐতিহাসিক সাদৃশ্যের অনুসন্ধান; আমার বিশ্বাস তার ফলে অনেকস্থানে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটা অনিবার্য্য। তাছাড়া অনেক সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত স্বল্পপরিসর যে তার উপর নির্ভর ক'রে তুলনা দুঃসাহসিকের কাজ বলে' মনে হয়। কিন্তু টয়েন্‌বি তাঁর সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রতিপন্ন করবার বিশেষ প্রয়াস করেছেন, সেজন্য তাঁর বক্তব্য প্রণিধান করা সকলের উচিত। লেখার কৌশলে ইতিহাসের এক অভিনব রূপ তাঁর রচনায় মূর্ত্তি পেয়েছে, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁর গ্রন্থের পাঠক মাত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়তে বাধ্য, এজন্য আর্ণল্ড টয়েন্‌বি ইতিহাসের সকল ছাত্রের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেছেন এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীসুশোভন সরকার

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়

সপ্তপর্ণ—শ্রীকিরণশঙ্কর রায় প্রণীত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)

বাঙলা কথা-সাহিত্যে স্বরাজ-পার্টির নায়ক বঙ্গীয় কংগ্রেস সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্করের শুভাগমনে আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। তাঁর কংগ্রেসের দলপতি হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা সমলোচকের স্মরণ আছে। সবুজ-পত্র প্রকাশিত হবার অল্প কয়েকদিন পরেই যে-সব যুবক সবুজ-দল গঠন করেন, প্রমথ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে, কিরণশঙ্কর ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। সে দলের বিশেষত্ব ছিল পঠনে ও মননে। তারা ছিল সর্ব্বগ্রাসী অথচ রসিক; দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা ফোটানই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। চলতি ভাষায় তারা লিখত এবং দু-একজন ব্যতীত তাদের প্রত্যেকের ভাষা ছিল স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। কিরণ শঙ্করের রচনায় একটি অধিক গুণ ছিল, মাধুর্য্য।

সবুজ-পত্র উঠে গেল—তার পূর্ব্বেই বোধ হয় কিরণশঙ্কর কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সেও আজ প্রায় এক যুগ হয়ে গেল। মধ্যে তিনি আর কিছু লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে না। আজ হঠাৎ তিনি তাঁর পুরানো গল্পগুলি একত্রিত করে সাহিত্যের দরবারে হাজির। সুখবরটা ঠিক সংগ্রহ করার মধ্যে নয়, সুখবর হোল এই যে সাতটি গল্পের একটি,নাম তার 'কাহিনী',অল্প কিছুদিন পূর্ব্বের লেখা। কাহিনী পড়ে দেখলাম কিরণশঙ্করের রচনাভঙ্গীতে তিলমাত্র দোষ বর্ত্তায়নি, অনভ্যাসে কলম আড়ষ্ট হয়নি, আমার পরিচিত সদ্‌গুণের সবগুলিই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কাহিনীতে যে প্রচ্ছন্ন পলিটিক্যাল মতবাদ রয়েছে তাই থেকে প্রমাণ হয় অন্ততঃ এইটুকু যে কিরণশঙ্কর আসলে সাহিত্যিক। 'সেকাল আর নেই'—সেকালের দোষ ছিল, গুণও ছিল—কিন্তু 'সেকাল আর নেই' বাক্যটি একটি বিশেষ সাহিত্যিক মনোভাব-প্রসূত আক্ষেপ ছাড়া কোন পলিটিক্যাল জ্ঞানের কথা নয়। অতীত গৌরবের স্মৃতি, এই sense of romance সাহিত্যিকের উপকরণ, বিলাসবস্তু, দেশ-নায়কের নয়। কাহিনী ব্যতীত অন্য দুটি গল্পে, 'কবির বিদায়' ও 'স্বপনপসারী'তে কিরণশঙ্করের পূর্ব্বোক্ত senseটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে। 'হেঁয়ালি'ও ঐ সুরের একটি ছোট্ট তান।

তাই বলে কিরণশঙ্করকে romantic ভাবা ভুল হবে। তাঁর রসজ্ঞান- এতই উন্নত যে ভাববিলাসকে তিনি আসকারা দেন না। তিনি নিজেকে ঠাট্টা করতে জানেন, পরকেও তাই পারেন। কিন্তু সে ঠাট্টা মৃদু ও হাল্‌কা—কড়া বিদ্রূপ নয়। 'শুকতারা'য় বাল্য প্রেমের বর্ণনা পড়লে না হেসে থাকা যায় না—কিন্তু অট্টহাস্যও অসম্ভব। তেমনি গ্রামের 'সাহিত্য সভা' পড়তে পড়তে হাসিও পায় কান্নাও আসে—কিন্তু কোথাও লেখকের মনে সহানুভূতি কিংবা বিদ্বেষের আধিক্য ধরা পড়ে না।

লেখকের এই ভদ্রতা, এই সংযম, হালকা রসিকতা ও দরদ তাঁর সব গল্পগুলিকেই নিতান্ত সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

'ক্ষেমী' গল্পটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বাড়ির পোষ্যা এক ননদ ও তার বৌদি—ননদ পাড়াগাঁয়ের বুনো মেয়ে, বৃহৎ জমিদার পরিবারের চাপে পিষ্ট অথচ তেজিয়ান—বৌদির আছে হৃদয়। ননদের বিবাহ হোলো—অল্প কয়েক দিনের জন্য বোধ হয় সে সুখীও হয়—দুঃখ আবার চাকার তালে ঘুরে আসে। হোলো তার যক্ষা, ফিরে এলো ননদের কাছে—তারপর যা বাঙালী মেয়েদের হয় তাই হোলো। মারা গেল অল্প বয়সে। এই ত সাধারণ ঘটনা—এতই সাধারণ যে তাকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, গল্প লেখা, সব কিছুই চলে। কিন্তু মাত্র বিশ পাতার মধ্যে ঐ মেয়েটির মানসিক পরিবর্ত্তনের সুসংযত ও সুচারু বর্ণনা ক'জনের হাতে সম্ভব জানি না।

কিরণ শঙ্করের হাত পাকা, পাকা হাতের আরো লেখা চাই।

টাকার কথা—শ্রীঅনাথ গোপাল সেন প্রণীত। (মডার্ণ বুক এজেন্সী) শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত।

বইখানিতে সাতটি অধ্যায় আছে—রাজনীতি বনাম অর্থনীতি, স্বর্ণমান, ভারতে মুদ্রানীতি, আমাদের রেশিও সমস্যা, বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কট, দেশীয় শিল্পের অন্তরায় এবং 'যে দেশে টাকা নেই'।

অধ্যায়গুলি দেখেই পাঠকবর্গ বুঝবেন যে লেখকের বিষয় হোলো সেই দুরূহ ইকনমিকস্ যা নিয়ে বাঙলা ভাষায় অত্যন্ত কম আলোচনা হয়েছে। অবশ্য তার কারণও আছে—প্রথম হোলো সেই বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের নিরাগ্রহতা এবং বিশেষজ্ঞের অজ্ঞানতা। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের ভাষার অক্ষমতা। কিন্তু অনাথবাবুর বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে আমার ধারণা আংশিকভাবে বদলেছে। আর আমি বাঙলা ভাষার দোষ দিই না। সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষায় যে ইকনমিক্সের গভীর সমস্যাগুলো অমন স্পষ্টভাবে বোঝান যায় আমার বিশ্বাসের বাইরে ছিল। অনাথ বাবু অধ্যাপক নন, এবং বিশেষজ্ঞ কিনা তাও জানি না, তবে তাঁর রচনা পড়ে মনে হোল যে বিশেষজ্ঞের হাতে পড়েই সঙ্কটময় অবস্থার নিরাকরণ শক্ত হয়ে উঠেছে। আজ প্রায় চোদ্দ পনেরো বৎসর আমি ঐ সব সমস্যার সমাধান নিয়ে পড়ছি, চিন্তা করছি, কতদিন ধরে বাঙলা ভাষায় তার খসড়া করছি—কিন্তু অমন প্রাঞ্জলভাবে আমি বুঝিও নি, বোঝাতেও পারি না অকপটভাবে স্বীকার করছি। ইকনমিক্স্ সংক্রান্ত মতবাদে দু-একস্থলে আপত্তি তুলতে হয়ত পারা যায়। কিন্তু অনাথবাবু যে সুসাহিত্যিক সে বিষয়ে আমি প্রমথবাবু ও অতুল গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। বইখানি ইতিমধ্যে সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, তাই আমি কেবল তার বহুল প্রচার কামনা করেই ক্ষান্ত হলাম।*

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* স্থানাভাববশতঃ এবং সময়ের অভাবে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলীর "রাগ ও রাগিণী" এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র সেনের 'Studies in the Land Economics of Bengal'এর সমালোচনা পরিচয়ের এ সংখ্যায় ছাপানো গেল না।

From Wrong Angles—By Gaganvihari Mehta. Published by the author.

মানুষের জীবনের উপর রসিকতা আদিম কাল থেকে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষের সাহিত্যে অবশ্য এর আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প দিনের। কিন্তু আমাদের জীবনে অথবা ভাষায় আমরা এই প্রাচীন ব্যাপারটাকে নিত্য নূতন ভাবে ও ভঙ্গীতে দেখতে চাই, নতুবা এর সার্থকতা নষ্ট হয়। এর কাজ আমাদিগকে খুসি করা। রসিকতার মোটামুটি তথ্য এইরূপ।

রসিকতার আর একটা দিক আছে। জীবনে যেটা অশোভন অথবা অসমঞ্জস তাকে সোজাপথে সিধে করা শক্ত কথা। তাকে খুসির পথে দূর করা রসিকতার কাজ। এই শেষোক্ত কথাটা মুখবন্ধে সরসভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী মেটা তাঁর 'বে-কায়দা কোণ থেকে'-নামক ইংরাজী পুস্তক আরম্ভ করেছেন। পুস্তকখানি কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। এগার বৎসরের মধ্যে নানা সময়ে বিভিন্ন পত্রে এই সকল প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত, এবং (আমরা জানি) সমাদৃত হয়েছিল। আলোচ্য বিষয়গুলি তিনভাগে বিভক্ত, যথা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিবিধ। সমসাময়িক বাগ্বিতণ্ডা, ঘটনাঘটন, উদ্যম, উদ্বেগ, আশা, নিরাশা, প্রভৃতিকে আশ্রয় করে প্রবন্ধগুলি লিখিত। সুতরাং সেই সকল ব্যাপারের সংবাদ যাঁরা রাখেন, তাঁরা পুস্তকখানি পড়ে খুসি হবেন; যাঁরা রাখেন না, তাঁরাও লেখকের রসিকতা উপভোগ করবেন। পুস্তকের মুদ্রণ এবং বাঁধাই সুন্দর।

রসিকতা পদার্থটা অতি প্রাচীন, নিত্য, উপাদেয় এবং উপযোগী বলেই এর প্রয়োগ এবং শেষ রক্ষা করা কঠিন কাজ। সামান্যমাত্র তারতম্য, ত্রুটি, স্খলনে আকস্মিক মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়। একটিমাত্র বিষয়, ঘটনা অথবা চিন্তা উপলক্ষ্যে অনেক সময়ে উপযুক্ত রসিকতার সম্যক প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু প্রবন্ধাকারে এবং বহুপ্রবন্ধের সমষ্টিতে, রসিকতাকে সমভাবে সঞ্জীবিত রাখা কঠিনতর ব্যাপার। গতযুগের বাংলার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা 'হুতুম প্যাচার নক্সা' ভুলে যান নাই। নক্সাখানি মেটা মহাশয়ের পুস্তকের ধরণেই প্রবন্ধ সমষ্টি, অবশ্য তাতে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা নাই; সেদিনে ও আপদ ছিল না। নক্সাখানি বাংলায় কেন, যে কোন ভাষায় রসিক-সাহিত্যে উচ্চস্থান নিতে পারে, তথাপি তার মধ্যে যে কোথাও রসভঙ্গ হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। একথা সত্য যে নিজের ভাবে এবং নিজের ভাষাতেই রসিকতাকে ঠিকপথে নিয়ে যাওয়া কঠিন। তারপর পরদেশী ভাষায় একে সচেতন এবং প্রাণবান করা আরও দুরূহ। সুতরাং স্থানে স্থানে শ্রীযুত মেটা মহাশয়ের কষ্টকল্পিত রসিকতার অবতারণা সমালোচকের দৃষ্টির বাইরে রাখাই কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে অঙ্গবিশেষ হয়ে না এলে রস ধারণ করা যায় না। কথাটা সত্য। রসগ্রহণেচ্ছু হলেই ত আমরা রসের সন্ধান পাই। কীর্ত্তনীয়া তাঁর অক্ষরে (আসরে) বলেছেন—

রসিক সে যে, রসিক সুজন,
সে জন জানে রসিক যে জন।

শ্রীশিবনাথ অধিকারী।

দোলা (উপন্যাস) প্রথম ভাগ—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)

"'দোলা' আদ্যন্ত লিখিত—য়ুরোপে—তিন সপ্তাহে ১৯২৭ সালে—বোধ করি এপ্রিল মাসে।" বই-এর প্রথমেই এই রোমাঞ্চকর সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া লেখক পাঠকের চিত্তকে তিন সপ্তাহব্যাপী য়ুরোপীয় বায়ু সেবনের ফলভোগের জন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঠকের প্রতি তাঁহার মমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু, এই প্রস্তুতি সত্ত্বেও 'দোলা' আরম্ভ হইতে না হইতেই পাঠকের মানসিক ও স্নায়বিক সাম্য প্রায় বিপর্য্যস্ত হয়, কেননা দোলার একেবারে একেবারে প্রথম পাতাতেই কলির এপ্রিল মাসে মন্থিত পশ্চিম সাগর হইতে উত্থিতা হন্ কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা উর্ব্বশী নয়—আর্টিষ্টের মডেল ফরাশী তরুণী শ্রীমতী আনা।

শ্রীমান্ স্বপন সেন—দোলার নায়ক—অকস্মাৎ অলক্ষিতে তাঁহার শিল্পগুরুর ইুডিয়োতে ঢুকিয়া এই দৃশ্যে যে বিহ্বল হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু, স্বপন সদ্বিদ্বিসম্পন্ন চরিত্রবান যুবক, তদুপরি বিবাহিত এবং পত্নীগতপ্রাণ, সুতরাং তাহার বিহ্বলতা ঠিক রূপমত্ত শিল্পীর ন্যায় না হইয়া হয় অনেকটা ভয়চকিতা হরিণীর মতন। অনেকটা, সম্পূর্ণ নয়। কেননা, ভগবানের দত্ত চক্ষু, তদুপরি শিল্পীর চক্ষু, এবং ভগবানের সৃষ্টি তথীর মহিমা, সুতরাং চোখে যাহা ভালো লাগে, মন তাহাতে একটুও সায় না দিয়া কি পারে? এই অবস্থার বর্ণনা লেখক যে-ভাবে করিয়াছেন তাহাতে যদি আদিরসের প্রাচুর্য্য থাকিত তাহা হইলে আপত্তি ছিল না। লেখকের উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যাইত। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য তিনি 'ভূমিকায়' ব্যক্ত করিয়াছেন—মানব মনের নানামুখী সত্য সন্ধানকে ফুটাইয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-পন্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা এক ভারতীয় যুবকের উন্মুখ ও সুকুমার চিত্তের উপর য়ুরোপীয় জীবন ও সাধনার বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনা ও সেই প্রসঙ্গে বিশ্বজগতের একাধিক গুরুতর সমস্যার আলোচনা। এই উদ্দেশ্যে যে বই লিখিত ঠিক এই ভাবে তাহার গোড়া পত্তন কি জাতীয় রুচির ও বুদ্ধির পরিচায়ক তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

কিন্তু, যাই হোক, দোলা সুখপাঠ্য, কেননা লেখক গল্প বলিতে পারেন এবং সেই কারণে তাঁহার নানা তর্কবিতর্কের অবতারণা পাঠক উপভোগ না করিলেও অবশ্যই সহ্য করিবেন। কিন্তু লেখক ভূমিকায় এই বলিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার উপন্যাসে গল্প (তাঁহার মতে) গৌণ হওয়া সত্ত্বেও নানা সমালোচক 'আমার উপন্যাস পড়তে গিয়ে তাতে গল্পই খোঁজেন।' শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় আশ্বস্ত হউন। আমি তাঁহার উপন্যাসে গল্প খুঁজি নাই, না খুঁজিয়াই পাইয়াছি, এবং পরম আনন্দে তাহা উপভোগ করিয়াছি।

বোধ হয় একটু অবিচার করিলাম। গল্প নয়, পাইয়াছি গল্পের সমষ্টি। কেননা, শ্রীমান স্বপন সেন-এর য়ুরোপীয় জীবনের যে সকল অভিজ্ঞতা দোলার উপকরণ, তাহার প্রত্যেকটিকে এক একটি 'এপিসোড্' বলা যাইতে পারে এবং এপিসোড্গুলির নায়ক বা নায়িকা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। উপন্যাসের

যিনি নায়ক তাঁহার জীবনের একমাত্র নায়কোচিত কার্য্য অকল্পিতা বিবসনা মডেল দর্শন। এই রমণীয় অভিজ্ঞতার পর তাঁহার এমনই বিরতি আসে যে এপিসোড্ হইতে এপিসোডান্তরে সেতুবন্ধন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু, এই সেতু-বন্ধনের প্রণালীর মধ্যে বিলক্ষণ মৌলিকতা আছে, এবং দিলীপকুমারের প্রধান কীর্ত্তি সেইখানে। শ্রীমান স্বপন একএকটি অধ্যায়ের পর প্রথম অত্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তাহার পর যেই চেতনার সঞ্চার হয় অমনি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবীকে অলঙ্কার-বহুল এমন এক প্রেমপত্র প্রেরণ করেন যাহা প্রজ্ঞাপতির যে কোনো উপাসক আদর্শ রচনা বলিয়া নিরাপদে অনুকরণ করিতে পারেন। অবশ্য সন্ধ্যাদেবীও যোগ্য ভাষায় এবং যথাসময়ে—অর্থাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের অবসরে—তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। অত্যন্ত আশা হয়, তিনি ইহার বেশি আরও কিছু করিবেন—শুধু নেপথ্যে সঞ্চার না করিয়া অকস্মাৎ সমারোহে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাহা না করিলেও শব্দভেদী বাণ প্রয়োগে এমন এক মহাপ্রলয়ের সৃজন করিবেন যে দোলার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের একাধিক পাত্রপাত্রীদের খণ্ডযুদ্ধ এক অখণ্ড সর্ব্বনাশের সূত্রে গ্রথিত হইয়া দোলা সম্পূর্ণ শিল্প সৃষ্টিতে পরিণত হইবে। হায়, সে আশা পূর্ণ হয় না। সন্ধ্যাদেবী নেপথ্যেই থাকিয়া যান, শুধু তাই নয়, তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অবশেষে একেবারে মিলাইয়া যায়।

দোলার কি আর কোনো বিশেষত্ব নাই? অবশ্য আছে। ইহার রচনাভঙ্গী। ইহা একান্তই দিলীপীয়। যদিও তাঁহার পাত্রপাত্রীরা অন্য একাধিক বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ন্যায় হয়তো একটু আগে 'বসিয়াছিল' তাহার পর উদাস 'হইয়া যায়', হয়তো ডিনার 'খাইতেছিল' হঠাৎ শ্যাম্পেন 'খায়' এবং কত কি 'ভাবে' এবং এই অতি সহজ উপায়ে তুচ্ছ অতীত ঘটনাকে চিরন্তন অভিজ্ঞতায় ব্যাপ্ত করে, তথাপি দিলীপবাবুর রচনারীতি অতীত ও বর্ত্তমান এবং আশা করি ভবিষ্যৎ সকল লেখকের রচনা-রীতি হইতে আমূল ভিন্ন। The style is the man—এই আপ্তবাক্যের তিনি জলন্ত প্রমাণ। এই ষ্টাইল কিরূপ তাহা বলা আমার অসাধ্য। শুধু এই বলিতে পারি বাংলাদেশের নিরীহতম পাঠক দোলার লেখকের নাম না দেখিলেও উচ্চতম আদালতে নির্ভয়ে শপথ করিয়া বলিতে পারেন—দোলার রচয়িতা স্বয়ং দিলীপকুমার, সম্পূর্ণতঃ দিলীপকুমার এবং দিলীপ কুমার ব্যতীত অন্য কেহ নহেন।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

আই হ্যাজ—শ্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত (গুরুদাস লাইব্রেরী)

'এই দুনিয়াটা চিড়িয়াখানা'—সেই চিড়িয়াখানার তর বেতর প্রাণীদের নিখুঁত চিত্র। চল্লিশের উপরদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক চিত্রই মিলে যাবে এবং তারা আনন্দ পাবে প্রচুর। তরুণদের ভাল না লাগলে, আশ্চর্য্য হবার নেই। "গ্রাম্যার দুরন্ত" লোকদের কানে "আই হ্যাজ্" "বেস্থরো" লাগলেও, সেটাই যে কেন ঠিক, সে কথা বইখানির শেষ ছত্রখানি পাতায় বিশদ করে বোঝান হয়েছে। বিশেষ করে যখন "বিশ্বটা সজ্ঞানে ভূলের ওপর দে' বুক ফুলিয়ে চলেছে" আর সেটা দশ ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়েই বেস্থরো লাগেনা, যত লাগে কিনা "আই হ্যাজ্" শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে? "I (আই) বলে কিছু নেই রে—সব it—third person singular ! I টা আমাদের ঝুটো অভিনয়ের মুখোশ"। সুতরাং আলবৎ—'আই হ্যাজ্"। আর তা ছাড়া "পাসের পরীক্ষাপত্র ছাড়া" সর্ব্বত্রই "আই হ্যাজ"-ই যে "কাজ দেয়" তা পুত্রের জন্য Deputy-mountainship (ডেপুটী গিরি) ভিক্ষাপ্রার্থী বিচক্ষণ সবজজ্ রায় বাহাদুর হরগোবিন্দের উক্তিতে concrete example হিসাবে বড়ই উপভোগ্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

রস-সাহিত্যিক শ্রীকেদার বন্দোপাধ্যায় পাঠকবর্গের নিকট নিজগুণে সুপরিচিত। তাঁর মানস-গুরু রসসিন্ধু ৺ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ তাঁর উপর সুপ্রচুর ভাবেই বর্ষিত হয়েছে লক্ষিত হয়। একটা কথা কিন্তু না বলে থাকা যায় না সেটা হচ্ছে লেখকের বড় বেশী অসুপ্রাস-প্রিয়তা। অনেক যায়গায় মতি রায়ের যাত্রার কুপীলবদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নচেৎ সুন্দর বই ; সুন্দর বাঁধানো।

নিরালায়—শ্রীপ্রমথনাথ রায় প্রণীত (মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট)

শ্রীপ্রমথ নাথ রায়ের এই পুস্তিকাটিতেই চারটি ছোট গল্প আছে। আখ্যানবস্তুগুলি বড়ই মামুলী। সকল গুলিই নিরাশ প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসের রেশ্ পাঠকের মনে রেখে যেতে চায়। ভাষা শুদ্ধ সুন্দর মোলায়েম। আখ্যানবস্তু সুনির্ব্বাচিত ও সুচিন্তিত হ'লে, ছোটগল্পলেখকদের মধ্যে উচ্চ আসন লেখকের অত্যল্প আয়াসসাধ্য বলে মনে হয়।

সমর্পণ, অন্তর্য্যামী—শ্রীমতী আশালতা সিংহ প্রণীত। (মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট)।

"তা'ও ছাপালি গ্রন্থ হ'ল"র দেশে এক অভিনব আমদানী। এ "হাল ফ্যাসানে নূতন ঢংএ লেখা উপন্যাস" নয়। "মানুষের যা কিছু নিভৃত যা কিছু সুন্দর তা'কেই আধুনিক উপন্যাস প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছনা" করে যে গোলমালের সৃষ্টি করেছে সে "হাটের গোলমাল" এতে নেই। বিদুষী মহিলার ছাপ এ পুস্তকখানিতে সর্ব্বত্র।

শ্রীমতী অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর পর এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক কোন লেখিকার কলম থেকে নির্গত হয়েছে কিনা সন্দেহ। "একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের একান্ন খোপের" অধিবাসিনীদের বিভক্ত হবার পর সেই পরিবারের "অন্ধ-দৌঁষা" শিক্ষিত ছোট বৌয়ের "দিন যাপনের সাধারণ পদ্ধতি" এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তার জোড়া মেলা ভার। সেই ছোট বৌএর কন্যা সুরমা এই গল্পের নায়িকা। ছোট বেলায় একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড পরিবারে মানুষ হয়েছিল সে। সেখানে ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়েছে তার কত কুশ্রীতা, চিত্তবৃত্তির কত দৈন্য। কিশোর বয়সে স্কুলে পড়তে যেয়ে স্কুলের মেয়েদের যে আবেষ্টনে দেহে মনে একটা স্কুল ক্লেদসিক্ত আবরণ পড়ে যায়, যে সব অভ্যাস গড়ে ওঠে, যাতে করে ফুলের বিমর্দ্দিত পাপড়ির মত মনের কত সুমধুর, সুকুমার বস্তু ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে পড়ে, তার মধ্যেও পড়েছিল সে। তার পরে তরুণ বয়সে যে সমাজে মেলা মেশা করতে হোলো সেখানকার কৃত্রিম আবহাওয়া আর অর্থপূজার চরম দুর্গতির কাঁদেও তাকে পা দিতে হয়েছিল। কেমন করে সেই সব প্রভাব এড়িয়ে সে নিজকে খুঁজে পেয়েছিল আর পরে মনোমত স্বামীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুখী হয়েছিল, বইখানি তারই ইতিহাস। বড় সুন্দর বই। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টান অসম্ভব। ঘন ঘনই পাতা মুড়ে ভাবতে হয়। 'সুধারা' 'প্রেমের চেয়ে বড়ো' প্রভৃতি নামীয় পুস্তক দ্বারা লেখিকা যে সব উপন্যাসগুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেই উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে যে 'অসুন্দরের' সৃষ্টি করেছে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অন্তর্যামী—শ্রীমতী আশালতার লেখা আর একখানি পুস্তক। এতে পাঁচটি গল্প আছে। প্রথম গল্প "অন্তর্যামী" অবহেলেই প্রথম স্থান পাবার যোগ্য। কবিগুরু শ্রীমতীকে তাঁর "মনন-শক্তি অসাধারণ" বলে কেন সার্টিফিকেট দিয়েছেন তা' একমাত্র এই গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। আর চারটি গল্পও ভারি সুন্দর। যেমন সুন্দর লিখনভঙ্গী তেম্নি শুদ্ধ ও সুন্দর ভাষা—আখ্যান-বস্তুর ত কথাই নেই।

৺নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

'অর্কেষ্ট্রা'—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, (ভারতী ভবন)।

শ্রীসুধীন্দ্র দত্তের নতুন কবিতার বই 'অর্কেষ্ট্রা' পড়তে বসে প্রথমেই তার কৈফিয়ৎ খোঁজ করবার কৌতূহল যে হয়েছিল একথা স্বীকার না করে পারছি না। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়। 'অর্কেষ্ট্রা'র কবিতা সে জাতের নয় যাকে বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরী অহৈতুক আনন্দের উচ্ছ্বাসে যখন তখন নিজের মনে এ সব কবিতার কলি আবৃত্তি করছে, এ কথা কল্পনা করা শক্ত। এ কবিতা তার চেয়ে অনেক পরিণত মনের বায়না নিয়েছে। 'অর্কেষ্ট্রা'-কে বুঝতে হলে শুধু নয়—উপভোগ করতে হ'লেও তার জাতকের রাশিচক্র প্রভৃতি জানতে হয়।

অর্কেষ্ট্রার জন্ম-পত্রিকায় যাদের প্রভাব পড়েছে সে সমস্ত নক্ষত্র নির্ণয় করা কিন্তু একটু কঠিন। গ্রন্থাবরণে প্রকাশকের ইঙ্গিত থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য বাদ দিলাম কারণ আমাদের আকাশের ধূমকেতুরাও এখনো সৌরমণ্ডলের সম্পর্ক ছাড়াতে পারে নি। কিন্তু আর যে সব প্রভাব এ কাব্যের রূপ নিয়ন্ত্রিত করেছে তাদের উৎস সহজে ধরা যায় না। এ যুগের আরো অনেক কবির মত আধুনিক বিদেশী কবিতার আওতাতেই অর্কেষ্ট্রার কবির প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু সে ধারণা ধোপে টেঁকে না। অডেন প্রভৃতিকে পেরিয়ে গিয়ে ইলিয়ট পাউণ্ডের সঙ্গেও তাঁর কুলজি কোন রকমে মেলে না। তার আগের নক্ষত্রেরা ত' অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

বিদেশ থেকে দৃষ্টি স্বদেশে ফিরিয়েই 'অর্কেষ্ট্রা'র প্রেরণার উৎস যেন পাওয়া যায়। পশ্চিমের দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলেই বোধহয় সন্ধান গোড়ায় দুরূহ মনে হয়েছে। 'সোণার পাথর বাটির' মত অসম্ভব শোনালেও অর্কেষ্ট্রা দেশী সুরেরই ঐক্যতান। সংস্কৃত কবিদের পাহাড়-বাঁধান হ্রদ, খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তার পিতৃ-পরিচয় প্রচ্ছন্ন নয়। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায় ভঙ্গিমার যে নূতনত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রকাশ-রীতির যে দুর্বলতাহীন ঋজুতা আমাদের কৌতূহলী করে তোলে, ভুঁইফোড় অর্থে তা মৌলিক নয়। তার ভিৎ সত্যই আছে ঐতিহ্যে।

অর্কেষ্ট্রার কবিতা কিন্তু তাই বলে ধ্রুবপদী নয়। মোহিতলালের ক্ল্যাসিসিজমের পরিণামই বোধহয় তাঁর পরবর্ত্তী কবিদের সে প্রবণতা অনেকটা শুধরে দিয়েছে। সুধীন্দ্র দত্ত গীতি-কবিতাকেই অতি-লালিত্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার দুরূহ সাধনায় লেগেছেন। তাকে দিতে চেয়েছেন ধ্রুপদের মর্য্যাদা।

বাঙ্গালা কবিতায় এ চেষ্টা সুধীন্দ্র দত্তের রচনা প্রকাশিত হবার আগে থাকতেই হচ্ছিল, হওয়া অনিবার্য্য ছিল। সে চেষ্টা নানা কবির মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। কবি মোহিতলালই এ বিষয়ে আধুনিক কবিদের অগ্রণী। বাঙ্গলা কবিতায় ভাস্কর্য্যের ছায়া প্রথম তাঁর লেখাতেই পাই। সত্যেন্দ্র দত্তের খ্যাতি-নিনাদিত যুগে রচনা সুরু করলেও তিনি আধ আধ ললিত ভাষণ ও নিছক ছন্দ-চাতুর্য্যের মোহ পেরিয়ে এসেছিলেন দৃঢ় ব্যঞ্জনার পৌরুষত্বে। শেষ পর্য্যন্ত প্রাণহীন ক্ল্যাসিসিজমের নীরস মরুতে গিয়ে না পড়লে তাঁর কাব্য-প্রতিভা এমন অকালে শুকিয়ে বোধহয় যেত না। বাঙ্গলা কাব্য তাঁর দ্বারা আরো সমৃদ্ধ হতে পারত। তবু মোহিতলালের ভাস্কর্য্যে মসৃণ মার্ব্বেলের লীলায়িত রেখাই পাই—আয়নার মত তা পালিশ করা। সে লীলায়িত রেখাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা বা সাহস তাঁর ছিল না। অপ্রত্যাশিত কোণ তুলে ধরে দুঃসাহসিক নূতন বিন্যাসের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করবার কল্পনাই তিনি সম্ভবতঃ করেন নি। সচেতন ভাবে যাঁরা এ চেষ্টা করে সার্থক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্র দত্তের নাম কিন্তু সর্ব্বাগ্রে নয়। তাঁর কাব্যে ঋজু দৃঢ়তা আছে কিন্তু তাকে কেমন আড়ষ্টতা বলেই সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। তাঁর বলিষ্ঠতা অধিকাংশ সময়ে কাঠিন্যের বেশী আর কিছু নয় এবং সে কাঠিন্য কৃত্রিম না হলেও নিতান্ত বাহ্যিক। নরম 'পুরের'

ওপর তিনি প্রধানতঃ শব্দের কড়াপাক লাগিয়েছেন। শব্দ-কণ্টকিত তাঁর কাব্যের চেহারা তাই বেশীক্ষণ ধোঁকা দিতে পারে না, তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। বোঝা যায় আধুনিক অন্যান্য কবিদের তুলনায় তিনি অনেক বেশী মামুলি। কিন্তু সেই মামুলিয়ানাতেই তাঁর শক্তি ও সার্থকতা।

মামুলি শব্দটা আমাদের ভাষায় দাগী হয়ে গেছে, বর্ত্তমানে আমরা কথাটা প্রায় গালাগালির সামিল করে তুলেছি। তাই এখানে একটু টীকা বোধহয় প্রয়োজন। 'অর্কেষ্ট্রা'র কবি এই অর্থে মামুলি যে রসের সনাতন উৎসেই তাঁর নিষ্ঠা অটুট আছে। কাব্যের ছাঁচ বদলাবার উত্তেজনায় জীবনের ছকও বাতিল করবার উন্মত্ততা তাঁর ভেতর দেখা যায় নি, কোন কোন সমসাময়িক কবির মত। ভাবাবেগ-ভীতিও ব্যাধিরূপে তাঁর ভেতর সংক্রামিত হয় নি। সুধীন্দ্র দত্ত এ দিক দিয়ে একান্তভাবে সনাতন-পন্থী। উদ্ভট ইঙ্গিত ও উল্লেখের ছড়াছড়ি করে রচনাকে ঝুটা জৌলস দেবার আধুনিক বাতিক থেকেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে মুক্ত। তাঁর রচনায় শব্দের ভ্রূকুটি যতই থাক, তার অন্তরালে সেই পরিচিত পৃথিবীই দেখতে পাই যেখানে সূর্য্য ওঠে, মানুষ ভালবাসে, বেদনা পায়, ব্যাকুল প্রশ্ন তোলে। সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ আধুনিক মনের আধারে তাই চিরন্তন রস-ধারাই উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২৩।৩এ, কলেজ ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বার্ষিক ৪।০
প্রতি সংখ্যা ১৲

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪৩

বিষয়-সূচী

প্রাচীন ও আধুনিক	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
বাংলা কাব্য সঙ্কলন	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
রাসলীলা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সৌন্দর্য্যের মূল্য কি স্বাশ্রয়ী	আবু সয়ীদ আইয়ুব
সিল্‌ভ্যা লেভি	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
পুরানো কথা	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
ধর্ম্ম, যাদুবিদ্যা ও আর-আর ম্যারেট্ ...	শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র
সংস্কৃতি-সঙ্কট	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কবিতাগুচ্ছ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত
	শ্রীবিষ্ণু দে
	শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী
সম্পাদকী	
পুস্তক-পরিচয়	

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ইত্যাদি।

সম্পাদক :
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ভ
কলিকাতা

৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৩

পরিচয়

প্রাচীন ও আধুনিক

মানব জীবন ও মানব সভ্যতা সম্বন্ধে, মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, আচরণ সম্বন্ধে মানুষ চিরকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়া, আলোচনা করিয়া আসিতেছে। এই সকল চিন্তা ও আলোচনার ইতিহাস মানুষের অন্তরঙ্গ ইতিহাসের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছে। মানুষের বহিরঙ্গ ইতিহাসে যেমন দেখা যায় জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের, স্বার্থের সহিত স্বার্থের, অনবরত সংঘর্ষ চলিতেছে, মানুষের অন্তরঙ্গ ইতিহাসও সেইরূপ বিভিন্ন মতবাদের দ্বন্দ্বকোলাহলে মুখর। অদ্বৈতবাদের সহিত পরমাণুবাদের, জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের, সমষ্টিবাদের সহিত ব্যষ্টিবাদের, স্বদেশিয়ানার সহিত বিদেশিয়ানার, প্রাচীনের সহিত আধুনিকের বাদ-প্রতিবাদ আমাদের চিন্তাজগৎ উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই তাপ ও সংঘর্ষ অবশ্য জীবনেরই লক্ষণ, সুতরাং আক্ষেপের বিষয় নহে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই বাদ-প্রতিবাদ ঘিরিয়া এমন একটা ভাবের তাপ-মণ্ডল গড়িয়া উঠে যাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয় চাপা পড়িয়া যায়, উত্তেজনার নেশাই আমাদিগকে পাইয়া বসে। মতের সংঘর্ষ তখন আর চিত্তস্বাস্থ্যের অনুকূল হয় না, চিত্তবিকারেরই সৃষ্টি করে।

সেইজন্য মাঝে মাঝে আবশ্যক ভাবের কুজ্ঝটিকা সরাইয়া দিয়া বিচার-বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকে এই সকল পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের পরিচ্ছিন্ন

স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা। তাহাতে বিরোধের সমাধান না হইতে পারে কিন্তু তর্কবিতর্কের ঘূর্ণিবাত্যায় বাস্তব সত্যের যে সমস্ত দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়, বিরোধের উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং চিত্তের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে।

আজকাল সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, আচারে সর্ব্বত্রই নানা চিন্তা, নানা মনোভাবের যে জটিল সংঘর্ষ চলিতেছে, অনেকে তাহা সহজ করিয়া বুঝিয়া লইয়া বলেন—ইহা মুখ্যতঃ প্রাচীন ও আধুনিকের দ্বন্দ্ব। আমাদের আলস্যপ্রিয় মন কেবল চায় বাস্তবের জটিলতা এড়াইয়া তাড়াতাড়ি একটা সাধারণ সংজ্ঞা, একটা ফরমুলা আশ্রয় করিতে। ফরমুলা একবার পাওয়া গেলে আর সত্যানুসন্ধান আবশ্যক হয় না, ব্যাপক চিন্তার আবশ্যক হয় না; ফরমুলা তখন হয় রণ-পতাকা, তাহার চারি ধারে ঘিরিয়া আসে উদ্দীপনার ঝটিকাবর্ত্ত, পক্ষপাতী যুক্তির মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণবাণ।

কিন্তু 'প্রাচীন' ও 'আধুনিক' এই দুই শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, কি ইহাদের আনুষঙ্গিক দ্যোতনা, মানবজীবনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে কি ইহাদের বিশিষ্ট উপযোগিতা, এ সকল প্রশ্ন ধীরভাবে বিচার করিতে বসিলে কি প্রাচীন-পন্থী, কি আধুনিক-পন্থী, কাহারও নিকট একরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে না। দেখা যাইবে শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয় কতকগুলি অস্পষ্ট মনোভাবের, অনির্দ্দিষ্ট প্রবণতার প্রতীক-স্বরূপ, কোন সুসম্বদ্ধ চিন্তা বা সুনির্দ্দিষ্ট তথ্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ নহে। সুতরাং শব্দের অর্থ যে ক্ষেত্রে এত পিচ্ছিল ও বিবর্ত্তনশীল সে ক্ষেত্রে বিচার-প্রণালীর প্রয়োগ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উভয় পক্ষের তর্কযুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া একটা সালিশী মীমাংসা করিয়া দেওয়া আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এমন একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে চাই যেখান হইতে দৃষ্টি করিলে এ দ্বন্দ্ব-সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান না হউক অপ্রমত্ত ভাবে ইহাকে ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

মানব জীবন সম্পর্কে এত যে দ্বন্দ্ব এত যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার মূল কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত। মানব প্রকৃতির গঠন

সরল নহে। তাহাতে নানা তত্ত্ব দ্বন্দ্ব করিতে করিতে চলিয়াছে। সে চলিতেও চায়, আবার বসিয়া থাকিতেও ভালবাসে; তারকামণ্ডিত সুনীল আকাশ দূর হইতে তাহাকে ডাক দেয়, আবার শ্যামল ধরণীর স্নেহ-বন্ধনও সে ছিঁড়িতে পারে না; আত্মা তাহার ভূমা ও অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে চাহে, ইন্দ্রিয় তাহাকে সসীম সান্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখে; সে কখনও বাহিরের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া ব্যক্তি-স্বরূপের স্বাধীন স্ফুরণ চাহে, কখনও সে ব্যক্তিত্বের দাবী সঙ্কোচ করিয়া সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় চাহে, সমাজের সঞ্চিত শক্তি ও সম্পদে নিজকে সম্পন্ন ও শক্তিমান্ করিতে চাহে। সুতরাং মূল সমস্যা হইল মানুষ, মানুষের নানা-মুখী প্রবৃত্তি, মানুষের প্রকৃতির জটিল বৈচিত্র্য।

আবার যে রঙ্গমঞ্চে মানুষের জীবন-নাট্য প্রকটিত হইতেছে, দেশে কালে বিস্তীর্ণ সেই বিশ্বব্যাপারও জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে মানব প্রকৃতিরই অনুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন কালে সে যে মানব-চিত্তকে কত বিচিত্ররূপে প্রভাবিত করিতেছে তাহা ধারণা করিতে গেলে অভিভূত হইতে হয়। এই বিশ্ব-ব্যাপারের সহিত মানব প্রকৃতির কারবারই মানবজীবন। সুতরাং মানবজীবনের মূলে রহিয়াছে নানা বিরোধী তত্ত্বের দ্বন্দ্ব। প্রাচীন ও আধুনিকের যে দ্বন্দ্ব তাহা এই মূলগত দ্বন্দ্বেরই প্রকার-ভেদ।

মানুষ অনেক সময়ে এই মৌলিক দ্বন্দ্বের একদেশদর্শী সমাধান করিয়া জীবন-সমস্যা সরল করিয়া লইতে চাহিয়াছে। কখনও সে নিছক প্রাচীন-পন্থী হইয়া বলিয়াছে—"যদি শান্তি চাও, শৃঙ্খলা চাও, রক্ষা চাও, তাহা হইলে প্রাচীন পন্থা ধরিয়া থাক। নবীন কেবল অশান্তি আনে, বিক্ষোভ আনে, অরাজকতা আনে, ধ্বংস আনে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখ, তাহাকে বর্জ্জন কর।" আবার কখনও সে নিছক নবীন-পন্থী হইয়া বলিয়াছে—"প্রাচীনের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য নাই, মৃত্যুর ছায়া তাহাকে ঘিরিয়া আছে; যদি বাঁচিতে চাও ত অতীতের ইতিহাস, অতীতের দলিল ভস্মসাৎ করিয়া নবীনকে বরণ কর; প্রচলিত পদ্ধতির গণ্ডী কাটাইয়া জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া লও।"

মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন-নবীনের এই দ্বন্দ্ব পুনঃপুনঃ অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি এই একদেশদর্শী সমাধান কখনই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, বারবার ইহার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া আসিয়াছে। তাহার যেন দুই দিকেই সমান আকর্ষণ, যে সমাধানে এই উভমুখী আকর্ষণের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না মানবসভ্যতার মূল ধারায় তাহা স্থায়ী আসন পায় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বিশ্বব্যাপারের সহিত মানবপ্রকৃতির কারবারই মানবজীবন ও মানবসভ্যতা। এই বিশ্বব্যাপার দেশে ও কালে বিস্তীর্ণ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বেষ্টনী ও আবহাওয়ার মধ্যে মানব-প্রকৃতি বিভিন্নরূপে বিকশিত হয়, মানবসভ্যতা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। তেমনি আবার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থানের মধ্যে মানবসভ্যতার রূপান্তর হয়। দেশ ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া মানুষ একপদও চলিতে পারে না, ইহা বাস্তব তথ্য। কিন্তু এই বৈষম্যই কি চরম কথা? সকল বৈষম্যের অন্তরালে মানুষের মধ্যে এমন কিছু কি নাই যাহা দেশাতীত ও কালাতীত? মানবসভ্যতার ইতিহাস কিন্তু বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালে মানুষ যে সমস্ত মূল্য-বিচারের মানদণ্ড অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি আছে স্থানীয় ও সাময়িক; কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যাহাদের প্রসার সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিত না; তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীসের কবি হোমার যে বীরত্বগাথা রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমার মনে কোন স্পন্দনই জাগাইতে পারিত না। সুতরাং মানুষের একটা বিশ্বজনীন রূপ আছে। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই রূপটি বজায় রাখিবার চেষ্টাই মানবসভ্যতার ইতিহাস।

অনেকে মনে করিতে পারেন মানুষের এই বিশ্বজনীন রূপ ত মানুষের সহজ প্রতিকৃতি, ইহা বজায় রাখিবার জন্য আবার সাধ্যসাধনার আবশ্যক কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবপ্রকৃতি জটিল, তাহার মধ্যে

নানা তত্ত্বের বিরোধ চলিতেছে। এই সকল বিরোধী শক্তিকে সংযত করিয়া, শোধিত করিয়া, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া, তবে মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ ফুটাইয়া রাখিতে পারে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সজাগ সতর্কতার সহিত মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। যখনই সে শৈথিল্য করিয়াছে, উদ্দাম প্রবৃত্তি বা উদ্দাম কল্পনার কাছে অবশভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখনই তাহার স্বরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সহজ পন্থা মানুষের পন্থা নহে। পূর্ব্বে যে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীর কথা বলিয়াছি উভয়েই সহজ পথের পথিক। প্রাচীনপন্থী বলিতেছেন, "শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করে, তুমিও তেমনি প্রাচীনপন্থা ও প্রাচীন পদ্ধতির ক্রোড়ে আশ্রয় লও। যাহা চিন্তা করিবার, যাহা চেষ্টা করিবার পূর্ব্বপুরুষেরাই করিয়া গিয়াছেন, আমাদের আর কিছু করিবার নাই। পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করিয়া যাওয়াতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা।" নবীনপন্থী বলিতেছেন, "প্রাচীন কেবল শৃঙ্খল রচনা করিয়া গিয়াছে, শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নবীন কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দাও, কল্পনাকে মুক্তি দাও, প্রবৃত্তিকে মুক্তি দাও, ব্যক্তিত্বকে মুক্তি দাও, সহজকে বরণ কর।"

একথা বলা বাহুল্য উপরে যে নিছক প্রাচীনপন্থী ও নিছক নবীন-পন্থীর অবতারণা করিলাম তাহা কল্পিত মূর্ত্তি মাত্র। কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি জীবনের ক্ষেত্রে নিছক আদর্শ সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজকাল হাওয়ার মধ্যে এই দুই ছাঁচের সহজপ্রবণতা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

প্রথমে ধরা যাউক নবীনপন্থীকে। তিনি অতীতের ঋণ স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নহেন। তাঁহার দাবী তিনি আগাগোড়া নূতন উপাদানে গঠিত। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ভাব, তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার মূল্য-বিচারের মানদণ্ড সমস্তই তিনি নিজে গড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? যে পরিবারের মধ্যে তিনি মানবসম্বন্ধের বিচিত্র মাধুর্য্যের প্রথম আস্বাদ পাইয়াছেন, যে সাহিত্য বিজ্ঞানের সম্পদ আত্মস্থ

করিয়া তিনি শিক্ষিত হইয়াছেন, যে সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি সভ্যতাসুলভ সংস্কার ও মনোভাব লাভ করিয়াছেন, যে ভাষায় তিনি তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার নিজের সৃষ্টি? পরম্পরাগত মানবসভ্যতা ও জাতীয় সভ্যতার দান তিনি অস্বীকার করিবেন কিরূপে? সভ্যতা একদিনের সৃষ্টি নহে, সহজের অভিব্যক্তি নহে, বহু যুগের সাধনা ও অভিজ্ঞতায় ইহা পুষ্টিলাভ করে, বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রীতি পদ্ধতির মধ্যে ইহার দেহাবয়ব গড়িয়া উঠে। যুগে যুগে নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া, নানা বিরোধী শক্তির ঘাত প্রতিঘাত সামলাইয়া মানুষ তাহার সভ্যতার মধ্যে তাহার আদর্শস্বরূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস নহে। মানুষের সাধনায় মাঝে মাঝে শৈথিল্য আসে, অবসাদ আসে, বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা আসে। সে সময় প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপনাহীন অনুষ্ঠান ও জড় অভ্যাসের চাপ মানবাত্মাকে পীড়ন করিতে থাকে। তখন বিদ্রোহই হয়ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু নিছক বিদ্রোহের মধ্যে সৃষ্টির বীজমন্ত্র নাই। ইউরোপে এই বিদ্রোহের সুর সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া উগ্র হইতে উগ্রতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর ভাবে ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের উপর আর আস্থা রহিল না, সভ্যতার ইতিহাস সয়তানের লীলাক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হইল। আস্থা স্থাপিত হইল মানুষের স্বাভাবিক শুভবুদ্ধির উপর, সহজাত প্রবৃত্তির উপর। বাস্তবক্ষেত্রে সে আস্থা ফলবতী হইল না বটে, কিন্তু কল্পজগতের স্বপ্নরাজ্যে বাস্তববিমুখ মন একটা আশ্রয়স্থল গড়িয়া লইল। তাহার পর চেষ্টা হইল ভিক্টোরীয় যুগের বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে একপ্রকার আদর্শবাদ জুড়িয়া দিয়া বাস্তবজগৎকে কল্পনার রঙে রঙ্গীন করিয়া তোলার। তারপর আসিল মানবজীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—কল্পনার রঙ্ মুছিয়া গেল, আদর্শবাদের আকাশ হইতে এক একটি করিয়া নক্ষত্র খসিয়া পড়িল, গণতন্ত্রের উদ্ধত পতাকা উঠিতে উঠিতেই শ্লথ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল—রহিল শুধু উলঙ্গ প্রবৃত্তির কর্দ্দম। এ কর্দ্দম লইয়া শিশুসুলভ ক্ষণিক উত্তেজনা

চলে কিন্তু জীবন চলে না। ফলে আসিল অবসাদ ও অকালবার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর সাধনা। ঐতিহ্য ছাড়িয়া, মানবসভ্যতার ধারা ছাড়িয়া, সহজ পথের এই যে অভিযান ইহার ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ। 'নবীন' ও 'আধুনিক' শব্দ বিগত শতাব্দীর মধ্যে কতবার যে কত বিচিত্র দ্যোতনার সহিত ধ্বনিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে এই 'নবীনের বিদ্রোহ' এখন তাহার নবীনত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, এ যেন একটা বহু শ্রুত সুরের একঘেয়ে প্রতিধ্বনি।

তাহা হইলে উপায় কি? প্রাচীন কোথাও মৃত, কোথাও মুমূর্ষু, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের শুষ্ক কঙ্কাল ভিন্ন তাহার মধ্যে আর ত কিছু দেখিতেছি না, তাহার মধ্যে জীবনের রসদ ত কিছু খুঁজিয়া পাই না। এদিকে নবীনের সহজ অভিযানও ত দেখিতেছি মৃত্যু-পথেরই শ্মশান-যাত্রা। দেখা যাউক প্রাচীনপন্থী কি বলেন। নবীন-পন্থীর ন্যায় প্রাচীন পন্থীও আছেন নানা তন্ত্রের। কেহ কেহ বলেন—"উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছ তাহা বজায় রাখিয়া যাও; প্রগতির পথ আপদ-সঙ্কুল, বিক্ষুব্ধ, আয়াসসাধ্য; স্থাবরতার মধ্যেই আরাম আছে, শান্তি আছে। নূতন করিয়া চিন্তা করিতে গেলে, কর্ম্ম করিতে গেলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।" এ দলের মতে স্থাবরতাই মানবধর্ম্ম, নিরাপদে টিঁকিয়া থাকাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রাচীন ইঁহাদের মতে অব্যবহিত প্রাচীন, যে প্রাচীনের জীর্ণ প্রাকার পরিখা বিনা আয়াসে আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সেই প্রাচীন। আমাদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কালই এই অব্যবহিত প্রাচীন। মানস জগতে রোম্যান্টিক ভাবধারার একটানা স্বপ্ন-প্রবাহ, রোম্যান্টিক ও ভিক্টোরীয় চিন্তার পৌনঃপুনিক প্রতিধ্বনি, কর্ম্মজগতে প্রাচীন প্রথা পদ্ধতির শীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে ব্যক্তিতন্ত্র অর্থনীতির সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা, সবে মিলিয়া যে একটা এলোমেলো অসম্বদ্ধ গোঁজামিলের সংসারে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহাই আমাদের সহজলব্ধ প্রাচীন, তাহার মধ্যেই আমাদের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু এই প্রাচীনকে কি শুদ্ধমাত্র জড়তার দ্বারা টিঁকাইয়া রাখা যায়? কাল-প্রবাহের প্রচণ্ড শক্তিকে চক্ষু মুদিয়া অস্বীকার করিতে পারি, কিন্তু

কেবল নিষ্ক্রিয়তার বাঁধ দিয়া তাহাকে কি ঠেকাইয়া রাখিতে পারি? পুরাতন জীর্ণ সেতুর কঙ্কাল যদি বা টিঁকিয়া যায় জীবন-প্রবাহ কাল-প্রভাবে চলিবে অন্য খাতে; জীবন ক্রিয়াশীল, চঞ্চল, নিষ্ক্রিয় জড়তার দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না; তাহার গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে সক্রিয় শক্তির প্রয়োজন।

আর একদল প্রাচীনপন্থী আছেন, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়তায় আস্থাবান্ নহেন। সহজে বিনা আয়াসে যাহা হাতে আসিয়াছে সেই অব্যবহিত প্রাচীনদের জীর্ণকঙ্কাল তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করে না। তাঁহারা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে এক গৌরবোজ্জ্বল জীবন্ত প্রাচীনের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার তুলনায় আধুনিক হইয়া যায় ম্লান বিবর্ণ অশোভন। সেই অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠা করা, এই হইল তাঁহাদের সাধনা। এ সাধনায় সক্রিয়তা আছে, হৃদয়াবেগ আছে, কিন্তু সীমাজ্ঞান নাই। মানুষ কল্পনার সাহায্যে দেশকালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে এ সীমা তাহাকে মানিয়াই চলিতে হয়। জীবন একখানি রোম্যান্টিক কাব্য নহে। বাস্তবের সীমার মধ্যে কাম্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা এই হইল মানবজীবনের যথার্থ সংজ্ঞা। বাস্তবের সীমা, দেশকালের সীমা অস্বীকার করিয়া রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি করা চলে, সৌখীন খেলাঘর তৈরি করা চলে, কিন্তু জীবনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা চলে না।

তাহা হইলে দাঁড়াইল কি? প্রাচীন ও নবীনের বিষম সমস্যার মধ্যে পাক খাইয়া মানুষ কি কেবল ব্যর্থতার আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরিবে? মানুষের জীবনসমস্যার কি কোন সমাধান নাই? পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবপ্রকৃতির বহুমুখী জটিলতার মধ্যেই এই সমস্যার মূল নিহিত। দেশ-বিশেষে বা যুগ-বিশেষে যদি এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইয়া যাইত তাহা হইলে সেই স্থলেই বিশ্বরঙ্গমঞ্চের মানবলীলানাট্যের যবনিকা পতন হইত, মানুষের ভাগ্যবিধাতা যে এ রঙ্গমঞ্চ দেশে ও কালে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন তাহার কোন সার্থকতা থাকিত না। এক দেশ অন্য দেশের, এক যুগ অন্য যুগের, এক মানুষ অন্য মানুষের

হুবহু প্রতিচ্ছবি হইত। সে অচলায়তন তাসের ঘরে বিশ্বনটের বিচিত্র রসপিপাসা মিটিত না। সুতরাং চূড়ান্ত সমাধানের সন্ধান মৃত্যুরই সন্ধান, জীবনের নহে।

অথচ জীবনের ধর্ম্ম চলা, নিরুদ্দেশ চলা নহে, এলোমেলো ঘুরিয়া মরা নহে, একটা উদ্দেশ্য ধরিয়া সেই অভিমুখে চলা। সুতরাং চলিতে গেলে একটা পথ বাঁধিয়া লইতে হয়। মানবসভ্যতা বহু আয়াসে এইরূপ একটা পথ কাটিয়া লইতে চাহিয়াছে। তাহা প্রাচীন পন্থাও নয় নবীন পন্থাও নয়, অথবা তাহা এককালে প্রাচীন ও নবীন পন্থা। তাহার নাম দেওয়া যায় ধারাবাহিক পন্থা। মানবসভ্যতা স্বীকার করে না যে মানুষ বহুরূপীর মত যুগে যুগে কেবল রং বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার কোন চিরন্তন স্বরূপ নাই। রঙ্গমঞ্চে ঘন ঘন পট পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে কিন্তু মানুষ চাহিয়াছে নানা বিবর্ত্তনশীল শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিজের এই নিত্যস্বরূপটি সমগ্র সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে। সে সকল তথ্য, সকল তত্ত্বকে স্বীকার করিতে চাহিয়াছে, তাহার জীবনের নক্সার মধ্যে সকলকেই যথাযোগ্য স্থান দিতে চাহিয়াছে। এই চেষ্টার ইতিহাসই মানব সভ্যতার মূল ধারা। এ ধারা কখনও ক্ষীণ, সঙ্কীর্ণ ও মন্দগতি হইয়া পড়িয়াছে, কখনও বা পরিপূর্ণ সম্প্রসারিত ও খরপ্রবাহিণী হইয়াছে। সে কালকে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু কালের নিকট মস্তক নত করিতে চাহে নাই। নূতন নূতন কালে যে সমস্ত নূতন শক্তি, নূতন অবস্থানের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার চিরন্তন শুভবুদ্ধির মানদণ্ডে যাচাই করিয়া লইয়া তাহার সহিত বোঝা-পড়া করিতে চাহিয়াছে। ধারাবাহিক পন্থায় আলস্যের স্থান নাই, জড়তার স্থান নাই, প্রাচীন সাধনায় উত্তরাধিকারী হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকার উপায় নাই। এ উত্তরাধিকার টাকার থলি নয় যে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্টভাবে ভোগ করা চলে। এ যেন ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার। ইহার ফলভোগ করিতে হইলে বৎসরের পর বৎসর অক্লান্তযত্নে সার দিয়া ইহাকে সজীব করিতে হয়, লাঙ্গল ধরিয়া ইহাকে চাষ করিতে হয়, সজাগ সাবধানতার সহিত বেড়া

বাঁধিয়া, বাঁধ বাঁধিয়া ইহাকে আকস্মিক আপদ হইতে রক্ষা করিতে হয়। আবার কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবারও উপায় নাই। কাল নূতন সমস্যা আনে, নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান আনে, কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধিকে আমূল বদলাইয়া দিতে পারে না। মানবসভ্যতার ধারা আধুনিকতাকে ধর্ম্মের মর্য্যাদা দেয় নাই। কালের স্রোতে যাহা কিছু ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই মূল্যবান্ ও বরণীয় এ কথা সে স্বীকার করে নাই। এ ধারা এককালে আধুনিক ও প্রাচীন। সে প্রাচীন কেন না মানবের যুগব্যাপী সাধনায় যে মূল্যবান্ ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে, মানুষের যে সমগ্র সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সে অপচয় করিতে চাহে না, বিকৃত করিতে চাহে না। সে আবার আধুনিক, কারণ বিশেষ বিশেষ যুগের বিচিত্র উপাদানের মধ্যেই তাহার জীবনলীলা, এই সমস্ত উপাদান লইয়াই সে মহামানবের সমগ্র সম্পূর্ণ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছে। এ লীলার শেষ নাই, এ গঠনক্রিয়ার পরিসমাপ্তি নাই, যদি শেষ হয় তাহা হইলে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মানুষের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতা থাকে না।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বাংলা কাব্য সঙ্কলন

ছাত্র বয়সে Arthur Quiller-Couch সম্পাদিত Oxford Book of English Verse-এর আদর্শে বাংলা কবিতার একখানি ধারাবাহিক সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল—সেই উদ্দেশ্যে তখন থেকেই কিছু কিছু মালমসলা সংগ্রহ ক'রতে থাকি, তারপর কলেজের এলাকা পার হ'য়ে সেই সব কাগজপত্র ঘেঁটে একখানি পাণ্ডুলিপিও তৈরি ক'রে ফেলি। কিন্তু ইতিমধ্যে জানতে পারি যে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশক দুর্লভ—এদেশে উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর হ'লেও অপ্রকাশিত থাকে না, অপুরস্কৃতও হয় না; কিন্তু প্রবন্ধ বা কবিতা মূল্য দিলেও কেউ ছাপ্‌তে চায় না—যেহেতু বাজারে তার চাহিদা নেই।

এ জন্যে দোকানদারদের কোন দোষ দেওয়া চলে না—তারা সবাই কেন সাহিত্য-রসিক নয় বা দেশের রুচি ও মনোবৃত্তি গ'ড়ে তোলার কঠোর দায়িত্ব কেন নেয় নি, এ সমস্ত তর্কও অপ্রাসঙ্গিক। যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে যোগ-রহিত এবং সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে দেশে গ্রন্থ-বণিকের কাছে রসজ্ঞতার দাবী অন্যায় আবদার ছাড়া আর কিছুই নয়! বাংলা বই এদেশে পড়েন মেয়েরা এবং সেই পাঠিকা-সমাজের শতকরা নব্বুই জনই প্রাথমিক শিক্ষার কিছু দূর গিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন, কাজেই তাঁদের কাছে প্রবন্ধ বা কবিতার কদর কি থাক্‌তে পারে? আমরা যাঁরা লেখা-পড়া নিয়ে কারবার করি, আমরা ক'খানা বাংলা বই কিনি বা পড়ি? আমাদের পড়াশুনা মূলতঃ ইংরাজীগত এবং ইংরাজীর মারফতে ইউরোপের অন্যান্য ভাষাগত—বাংলা বই আমরা পড়ি সাহিত্যিক বন্ধুর দ্বারা উপহৃত হ'লে, নয়ত পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'লে, আর সাময়িকপত্রে সমালোচনা ক'রতে হ'লে। কাজেই চাহিদার অনুযায়ী গল্প উপন্যাস

নিয়েই বাংলার লেখক ও প্রকাশক সম্প্রদায় ব্যস্ত এবং নারী-সমাজের তুষ্টি-রুষ্টির ওপর সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ নিবদ্ধ।

কিন্তু এ কথা আমি বিশ্বাস করি এবং সকলেই নিশ্চয় করেন যে সঙ্কলন-গ্রন্থের উপযোগিতা সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থের চেয়ে বেশী। একান্ত ভাবে প্রথম শ্রেণীর লেখক ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের কোন লেখকই স্বকীয়তার জোরে অবিনশ্বর হ'তে পারেন না—এমন কি প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টারও সমুদয় রচনা বাঁচ্‌তে পারে না—যেগুলো সার্ব্বজনীন আকর্ষণের বস্তু, সকলের হৃদয় যেগুলিকে অপরিহার্য্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছে, সেগুলিকে তাদের অদৃষ্টের ওপর নির্ভয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়; কিন্তু বাকীগুলোকে বাঁচাবার জন্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা দরকার হয়—স্বয়ং শেক্‌সপিয়ারের ক্ষেত্রেই তার দরকার বার বার অনুভূত হ'তে দেখা গেছে। অদ্বিতীয়ের অবস্থাই যখন এই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে তখন আরো কি করা দরকার তা সহজেই অনুমেয়। তাঁদের অধিকাংশ রচনাই জীবনকাল অতিক্রান্ত হ'লে লোকে ভুলে যায় এবং এক শতাব্দী পর তাঁদের নাম গল্পের বিষয় হ'য়ে ওঠে। বলা বাহুল্য তাঁদের সমস্ত রচনা টেঁকার কোন প্রয়োজন নাই; তা টেঁকাবার সার্থকতাও কম—কিন্তু গ্রহণযোগ্য রচনা যে অতি সাধারণ লেখকের গ্রন্থেও ছড়ানো থাকে, একথা প্রত্যেকেই স্বীকার ক'রবেন। এই লেখাগুলোকে সঙ্কলন গ্রন্থে আহরণ ক'র্‌লে এরা স্থায়িত্ব লাভ ক'রে থাকে।

ধরা যাক্ এলিজাবেথের যুগের অগণ্য কবিদের কথা—এঁদের মধ্যে স্পেন্সার, শেক্‌সপিয়ার, মার্লো, বেন্-জন্‌সন্, বোমণ্ট-ফ্লেচার ছাড়া আর কারুরই নিজস্বতার দাবী বড় বেশী নেই—কিন্তু ওয়াট্, সারে, সিড্‌নি, বার্ণফিল্ড, গাইল্‌স্ ফ্লেচার এঁরাও ত দিব্যি বেঁচে আছেন। তার কারণ Tottle's Miscelleny, Passionate Pilgrim, England's Helicon প্রভৃতি তদানীন্তন সঙ্কলনগুলিতে এঁদের বাছা বাছা কবিতা-সমূহ স্থান পেয়েছিল—তাই মার্লোর Come with me and be my love এবং ওয়াল্টার রালের লেখা তার উত্তর; ফ্লেচারের Faithful shepherdess, সারের ও ওয়াটের সনেট্, গান প্রভৃতি টিকে

গেছে, শেক্‌সপিয়ারের Sunday Notes পর্য্যন্ত টিঁকেছে—আজ আমরা এঁদের তারিফ্ ক'র্‌ছি, কিন্তু এঁদের নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে ঐ সঙ্কলনগুলি—সে কথা আমাদের ভাবা দরকার। তারপর ধরা যাক্ গ্রীন্, পীল্, ন্যাশ্, কীড্, শার্লি, ওয়েবষ্টার প্রভৃতি নাট্যকারদের কথা—তদানীন্তন থিয়েটারে তাঁদের কদর ছিল নিশ্চয়, কিন্তু চার্লস্ ল্যাম্বের Specimens from the Dramatic Poets না বের হ'লে এঁদের নাম লোকে ভুলে যেতো নিশ্চয়! এমন কি Restoration নাট্যকারদের মধ্যেও ড্রাইডেন্, কন্‌গ্রীভ্, সেরিডান্ প্রভৃতির দু'এক খানা বই ছাড়া আর গুলিকে বাঁচাতেও লে হাণ্টের সঙ্কলন প্রয়োজন হ'য়েছিল—উইচার্লি, ফার্কোয়ার, অটোয়ে, ভ্যান্‌ব্রুর্গ, এথ্‌রেজ বাঁচলেন এই বইখানির জন্যে এবং 'এডিন্‌বরা রিভিউ'এ এর সমালোচনা প্রসঙ্গে সেকালের সুদীর্ঘ প্রবন্ধের জন্যে! এর পর নাম করা যেতে পারে Bishop Percyর Reliques of Ancient Poetryর,—এই বইখানি ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত গাথা-কবিতাগুলিকে বাঁচিয়েছে —সেই অপূর্ব্ব Nut Brown Maid, Cherry Chase, Robin Redbreast—যা আজ ইংরাজী কবিতা-পাঠকদের মুখে মুখে তা কি এতদিন পৃথিবীতে থাকত? আর নাম করা যায় পল্‌গ্রেভের—এলিজাবেথীয় যুগ থেকে সুরু ক'রে টেনিসান্ পর্য্যন্ত ইংরাজী কাব্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস মন্থন ক'রে তিনি বাছা বাছা কবিতা ও গানগুলিকে যে ভাবে বিষয় ও সময় অনুসারে গ্রথিত ক'রে গেছেন, তা তাঁর অসামান্য রসজ্ঞতার পরিচায়ক—হেরিক্, জর্জ হার্ব্বার্ট, এণ্ড্রু মারভেল্, ডেন্‌হাম্, ব্রাউন্, ডন্, হেন্‌রি ওটোন্, লাভ্‌লেস্, বানিয়ানের পর্য্যন্ত যে একাধিক ভালো কবিতা আছে এর সন্ধান পল্‌গ্রেভই প্রথম দেন। তারপর সাহিত্যিকদের নজর পড়ে কেরোলাইন্ কাব্য-সাহিত্যের দিকে—এখন ডনের যে খ্যাতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হ'য়েছে, এর মূল হ'চ্ছেন পল্‌গ্রেভ। এ ছাড়া গ্রে, ব্লেক্, উল্‌ফ্, ক্যাম্পবেল্ প্রভৃতি গৌণ কবিদেরও পল্‌গ্রেভই অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। বর্ত্তমান কালে Ward প্রভৃতি যে সমস্ত সুবৃহৎ সঙ্কলন প্রকাশ ক'রেছেন তার মূল

উৎস হচ্ছেন পল্‌গ্রেভ্‌—এমন কি আধুনিক কাব্যের সঙ্কলয়িতারা—যেমন লরেন্স্‌ বিনিয়ান্‌, হ্যারলড্‌ মান্‌রো, নিউবোল্ট্‌ পর্য্যন্ত পল্‌গ্রেভের আদর্শের কাছে ঋণী।

প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা কথাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভালো শোনায় না—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের মতো সমস্ত জগতে প্রচলিত সচল সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা গেল যথেষ্ট প্রোপাগ্যাণ্ডা ছাড়া এর বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা আসে নি—অবশ্য এই সঙ্গে ছিল ল্যাম্ব্‌, কোল্‌রিজ্‌, হেজ্‌লিট্‌ প্রভৃতির সমালোচনা-সাহিত্য, যা এই সব পরিত্যক্ত সাহিত্যকে নূতন দৃষ্টির আলোকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছিল! আর ছিল ও দেশের শিক্ষায়তনের সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা-বোধ—নইলে শুদ্ধ-মাত্র সাহিত্যিকের প্রচেষ্টায় এঁরা স্বীকৃতির দাবী উপস্থিত করতে পার্‌তেন কিনা সন্দেহ!

কথা উঠতে পারে মানুষের মন যা স্বাভাবিক প্রীতিবশেই ধ'রে না রাখ্‌লো, কবর খুঁড়ে তাকে টেনে তোলা নিষ্ফল! একথা আমরা স্বীকার কর্‌তে পারিনে—কারণ পুরাণো গহনা বা পোষাকের মতো মানুষের মানস-সৃষ্টি সময়াতিক্রম ক'র্‌লেই যাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হয় না—মানুষের মন যা কিছু ধ'রে রাখেনি তাই যে বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত তাও না হ'তে পারে। সমসাময়িক সমাজে অনেক সময়ই বড় স্রষ্টাকে পেতে হয় উপেক্ষা—গতানুগতিকতার বিরোধী কোন নূতন পথের পথিকই সমকালবর্ত্তীয়দের প্রীতি লাভ ক'রে গেছেন কিনা সন্দেহ! ভাসের নাটক, অজন্তা ইলোরার শিল্প তাই হাল আমলে নূতন ক'রে আবিষ্কৃত হ'য়েছে—যদিও হাজার বছরের আগে এদের উদ্ভব। এছাড়া প্রতিভার সঙ্গে যশের সম্পর্কও প্রায়শঃ অহি-নকুল জাতীয়, তাই কালিদাস-ভবভূতির অতিথ্যাতির আড়ালে এক সময় বিশাখদত্ত বা শূদ্রক চাপা প'ড়ে গিয়েছিলেন। রাজতন্ত্রীয় শোষণ বা সামাজিক মর্য্যাদার অভাবও অনেক সময় খ্যাতির পথ অবরুদ্ধ করে—এ অবস্থায় সাধারণ-কর্ত্তৃক বিস্মৃত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, বা অন্যায়ও নয়। এসবের হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় Anthology.

এখনকার মতো প্রাচীনেরাও এর উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে-ছিলেন—তাই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সঙ্কলন গ্রন্থ—চীনের 'শীকিং', মিশরের 'মৃতের বই', জাপানের 'মাইনো সু', আরবের 'মুল্লাকাৎ,' সবই সঙ্কলন-গ্রন্থ! নানা জনের রচিত কবিতা, গান, গাথা, স্তোত্র এই সকল গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে, অতি প্রাচীন আমলে—একেবারে মানব-সভ্যতার বা বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম যুগে। এই দিক থেকে বাংলা 'সাহিত্য' কথাটার চমৎকার সার্থকতা দেখা যায়। দুঃখের বিষয় ক্ল্যাসিক্যাল্‌ সংস্কৃতের কোন প্রাচীন Anthology পাওয়া যায় নি—যদি না ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য-শতক, শান্তি-শতক বা অমরুর (প্রেম) শতক মৌলিক গ্রন্থ না হয়ে সঙ্কলন হয়! পারসিক, জার্ম্মান, প্রভেন্সাল্‌ এমন কি আইস্‌ল্যাণ্ডিক্‌ সাহিত্যেরও প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ পাওয়া গেছে—এই সংরক্ষণীবৃত্তি মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত—নইলে পিরামিড্‌ বা গ্রীসিয়ান্‌ আর্ণেরই বা মূল্য কি?

পূর্ব্বে যে সঙ্কলনগুলির নাম ক'রেছি সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে আধুনিক কাল আবার নিজের প্রয়োজনানুরূপ অনুবাদ-সঙ্কলন প্রকাশ ক'রেছে। খাস ইউরোপেও আজ মুষ্টিমেয় লোক মূল গ্রীক্‌, ল্যাটিন্‌ বা হিব্রুর চর্চ্চা করে—এই সব ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা এখন এংলো স্যাক্সন্‌ বা নর্স্‌ ভাষার মতোই অতীতের বস্তু ব'লে গণ্য। যেমন এসিয়ার সংস্কৃত, আর্বি, ফার্সি প্রভৃতিও এখন antiquated হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেছি চীন খুব রক্ষণশীল, তবে জাপানেও ক্লাসিকের মৌলিক চর্চ্চা কম, একথা Lafcadio Hearn লিখেছেন—এ সমস্তই আজ অনুবাদ-সঙ্কলনের সাহায্যে সুলভে এবং সহজে আমরা আয়ত্ত ক'রে থাকি। আধুনিক পল্লবগ্রাহিতাকে নানা কারণে বিদ্রূপ করা হ'য়ে থাকে, কিন্তু প্রাচীন পুষ্পগ্রাহিতার চেয়ে এই দ্রুততার যুগে এ অনেক বড় জিনিষ একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে।

কিন্তু আমার ভূমিকা আমার মূল বক্তব্যের অনেকখানি স্থান অপহরণ ক'রেছে—কাজেই এখন সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের কথায় নেমে আসা যাক্‌।

প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার যে আবাল্য ইংরাজী সাহিত্যের আবেষ্টনে পুষ্ট আমাদের মন বাংলা কাব্যের সমালোচনা বিষয়ে ইংরাজী রসাদর্শেরই অনুসরণ ক'রে থাকে—কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সমগ্র ভাবে ইংরাজী রসাদর্শ আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রেছে মাইকেল থেকে। কাজেই আদি থেকে আরম্ভ ক'রে মাইকেলের আবির্ভাব পর্য্যন্তকার বাংলা সাহিত্যে তৃপ্তি পাবার উপাদান আমরা বড় বেশী পাইনে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মূলতঃ লোকায়ত—অনুষ্ঠান ও নীতিমূলক, পুনরাবৃত্তি-দুষ্ট, আধিদৈবিক উপপ্লবে ক্লিষ্ট এবং অনেকাংশে অসংস্কৃত। শুধু বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্য কিয়ৎপরিমাণে লোকোত্তর এবং আধ্যাত্মিক কঙ্কালের ওপর সংস্থিত হ'লেও আসলে রোমান্টিক্ রচনা—তাই ওতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। তাছাড়া সুফী মিষ্টিক্‌দের বা ভারতীয় মিষ্টিক্‌দের কাব্যের নিগূঢ়ার্থ যাই হোক, আমরা ওর লৌকিক ব্যঞ্জনা-কেই গ্রহণ ক'রে থাকি—ওরা আমাদের কাছে দৈবী প্রকাশ নয়, পুরোদস্তুর লিরিক্ কবিতা—বৈষ্ণব কবিতাকে আমরা এর বেশী কিছুই মনে করি না। বরং এও আমরা মনে করি যে সুফী মিষ্টিকদের সঙ্গে বৈষ্ণব মিষ্টিক্‌দের কোথাও কোন রকম প্রচ্ছন্ন যোগ ছিল এবং তা আধ্যাত্ম-সম্পর্কীয় যোগ নয়, তা রক্তমাংসের ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপলক্ষ ক'রেই উৎসারিত, অথচ এদের স্থূল অস্তিত্বকে অতিক্রম ক'রে তা রসায়িত। বলাবাহুল্য এখানে আমরা ইংরাজী রসাদর্শের অনুসরণেই কাব্য বিচার ক'রছি এবং এই জন্যই রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আমাদের হিসাবে কাব্যের লৌকিক কঙ্কাল ছাড়া অন্য কিছুই মনে হ'চ্ছে না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ব'লতে আমরা মূলতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যকেই বুঝে থাকি—হয়ত প্রাচীনেরাও তাই বুঝেছিলেন। তাই এদেশে পদাবলী সাহিত্যের অনুশীলন ও সংরক্ষণ যে পরিমাণে হয়েছে—অন্য জাতীয় সাহিত্যের তা আদৌ হয়নি। কারণ যা রসায়িত সৃষ্টি নয়, তার জন্যে কারুরই আগ্রহ থাকার কথা নয়!

দীর্ঘ কাল আগেই পদকল্পতরু নামক anthologyতে বিভিন্ন মহাজনের পদ সঙ্কলিত হ'য়েছিল। এই বইকে কেন্দ্র ক'রেই পরবর্ত্তী

গবেষণাদির উদ্ভব—এবং বর্ত্তমানের সটীক শোভন সংস্করণ-সমূহের মূলও এই গ্রন্থ।

কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যই বাংলার সবচেয়ে পুরাণো সাহিত্য নয়—ওর সময় চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব থেকে চৈতন্যের পরবর্ত্তী শ' দুই বৎসরের ভেতর। এর আগে ধরা হ'ত কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও মুকুন্দ-রামকে—এঁরা, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা এবং রামপ্রসাদ এই নিয়েই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সীমাবদ্ধ ছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লেখেন তখন তাঁর পুঁজিও এর বেশী ছিল না—হারাণ রক্ষিতের 'ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য' বা রমেশ দত্তের 'Literature of Bengal'ও আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। সৌভাগ্যবশতঃ দীনেশ বাবুর বই প্রকাশের সময় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—নেপালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন—আশ্চর্য্যের বিষয় এটিও একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। বৌদ্ধতন্ত্রের ভাঙার অবস্থায় কয়েকজন মঠাশ্রয়ী ভিক্ষুর লেখা কতকগুলি হেঁয়ালি—এই হ'ল প্রাচীনতম বাংলা রচনা—এদের অল্প পরের রচনা ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন—এদের রচনা কাল নাকি ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে সুরু, কারণ বৌদ্ধ দোঁহার অন্যতম লেখক কাহ্নপাদের সঠিক তারিখ পাওয়া গেছে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এই আমলটাকে তুর্কীবিজয়ের সমকাল বা তার প্রাক্কাল ব'লেছেন—মোটা কথায় এই যুগটাকে বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ বলা হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ মহাযান ও হীনযান উভয় তন্ত্রের ছাপই এই সাহিত্যে সুস্পষ্ট—মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি হীনযানী রীতি ও ত্যাগ নিষ্ঠা সংযম প্রভৃতি মহাযানী রীতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হয়ে এই আড়ষ্ট পুঁথিগুলির কলেবর বৃদ্ধি ক'রেছে—কিন্তু অসাহিত্য হ'লেও এদের উপেক্ষা করা কঠিন—কারণ পরবর্ত্তী সাহিত্যে এদের প্রভাব জাজ্বল্যমান। কৃষ্ণকীর্ত্তন বৈষ্ণব লিরিক্ পর্য্যায়ের সাহিত্যে এদের অগ্রদূত, আর গোপীচাঁদে পরবর্ত্তী মঙ্গল কাব্যাদির প্রথম পত্তন—শূন্যপুরাণ বা দোঁহার ছায়া পরবর্ত্তী পরকীয়া-

বাদী বৈষ্ণবের ও বামাচারী শ্যামাসাধকের রচনায় নিজেকে সূক্ষ্ম বা স্থূল ভাবে প্রকাশ ক'রেছে—অর্থাৎ বৌদ্ধগান থেকে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপ-ধর্ম্মের আধিপত্য চলেছে এবং তারই অয়নকে কেন্দ্র ক'রে সুসাহিত্য কুসাহিত্য দুইই গড়ে উঠেছে—এই বাঁধা রাস্তার মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছিন্ন পারম্পরিকতা বিদ্যমান যে পুনরাবৃত্তি-দোষে ও উদ্ভাবনের অভাবে এই সুদীর্ঘ ইতিহাস দস্তুর-মতো ভারাক্রান্ত।

শুধু ময়মনসিংহ গীতিকা যদি শূন্যপুরাণী আমলের লেখা হয় তো বিস্ময়ের সঙ্গে ব'লতে হবে যে এই আটঘাট-বাঁধা orthodoxy'র ভেতর কি ক'রে অতবড় একটা ধর্ম্মসম্পর্কহীন লৌকিক পর্য্যায় গ'ড়ে উঠ্‌লো। কিছু মাত্র পরমার্থিকতার ভান্ নেই— সম্পূর্ণ মানুষী সুখ দুঃখ, প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের মুখোমুখী সম্বন্ধ—তার ভেতর বৈষ্ণবের রূপকের অবকাশ নেই, নেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহ বিতরণের সুযোগ—বর্ণাশ্রমকে এমন নিশ্চিন্ত উপেক্ষা এবং হৃদয়বৃত্তিকে সমস্ত নীতি বা রীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া এ কি ক'রে অত পুরাণো আমলে সম্ভব হয়? পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলি—সে একেবারে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্তই—যে পরিমাণ আড়ষ্ট এবং আধ্যাত্মিকতার পুটপাকে শোধিত অপধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ বারমাস্যা, দেবদেবীর কোঁদল, রস-শাস্ত্রানুযায়ী রূপবর্ণনার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, তাতে ওদের রীতি-মতো আধুনিকই মনে হয়! কবিকঙ্কণে, ঘনরামে, কেতকা দাসে, ভারতচন্দ্রে আমরা মানুষের দেখা পাই না এমন নয়—মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার পার্থিব চেহারা দেখি না এমন নয়—কিন্তু তাদের সমস্ত সুখ অসুখের পরিধিকে বেষ্টন ক'রে যে দেবদেবীরা ভীড় ক'রে আছেন, তাঁদের উপদ্রবেই ওদের মানবীয় শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা পদে পদে বিড়ম্বিত হ'য়েছে এবং এককে অপরের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দিয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এরই জের চ'লেছে—শ্যামাসঙ্গীত, সখীসংবাদ, পাঁচালী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যেরই জারক রসে সঞ্জীবিত এবং একই মামুলি রীতির অনুধাবক। রামপ্রসাদ, দাশুরায়,

কৃষ্ণকমল সবই একই দলভুক্ত। শুধু গোপাল উড়ে ও নিধুবাবুতে মানুষের সামাজিক মনের ব্যথা বেদনার ভাষা ভাঙা ভাঙা ভাবে শুনতে পাওয়া যায়—আর যায় বাউলদের গানে। বাউল গানের যে তাত্ত্বিকতা-টুকু বহু তারিফ পেয়েছে, ময়মনসিংহ গীতিকার মতো তাও সংগ্রাহক-বৃন্দের রিপুকর্ম্মজাত ব'লে মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আদি থেকে এই পর্য্যন্ত হ'ল প্রাচীন বাংলা সাহিত্য—অর্থাৎ ইংরাজী আমলের ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যকে মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগে ক'রে নেয়া যাক্—

১। বৌদ্ধ কাব্য
২। ময়মনসিংহ গীতিকা
৩। বৈষ্ণব কাব্য
৪। মঙ্গল কাব্য
৫। লোকসঙ্গীত

এর মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়েই অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে—পুরাণো 'পদকল্পতরু'র কথা আগেই ব'লেছি—আধুনিককালে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পদামৃতমাধুরী' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এছাড়া আরো অনেকগুলি প্রচলিত বই বাজারে পাওয়া যায়—এ সমস্ত বইই পালা অনুসারে সাজানো। গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে এদের সুরু এবং যে melodramatic ধরণে কীর্ত্তনীয়ারা গান গান্ সেই অনুযায়ী নানা কবির রচিত পদ সন্নিবেশে এরা গ্রথিত—কাজেই সাধারণ কাব্য-রসিক পাঠকের পক্ষে এই বই-গুলো বিশেষ উপযোগী নয়—অবশ্য ভক্তেরা ব'ল্‌বেন বৈষ্ণব কাব্য আসলে সাহিত্য নয়, ও হ'চ্ছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা-সমূহের দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু আমরা ভক্ত ন'ই—সুতরাং সাহিত্য হিসাবেই আমরা ওর বিচার ক'র্‌বো! আর চারু বাবুর সচিত্র 'পদাবলী' সম্বন্ধে কি ব'ল্‌বো? ও বই ত সাহিত্যিকদের জন্যে আহূত হয় নি! দীনেশচন্দ্র ও খগেন্দ্রনাথের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট সঙ্কলনখানিই আমার মনে হয় কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্য্যায় নিয়ে একমাত্র সংগ্রহপুস্তক যা আমার নজরে প'ড়েছে, তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক প্রকাশিত Typical Selections। কিন্তু এই বিশালকায় বইটির মূল্য ততটা সাহিত্যগত নয়, যতটা ইতিহাসগত—তাই ডাক ও খনার বচন থেকে সুরু ক'রে কিছুই এ থেকে বাদ পড়ে নি। সত্যিকার কবিতা অপেক্ষা কাব্যের উপকরণ সংগ্রহকেই সঙ্কলয়িতা সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন—উপধর্ম্মের উৎপত্তি, পূজাবিধি, নায়িকা-লক্ষণ থেকে সুরু ক'রে বেশ-বিন্যাস পদ্ধতি সমরসজ্জা, গৃহস্থালী-বর্ণন পর্য্যন্ত এতে নির্ব্বিচারে সবই সংগৃহীত হ'য়েছে—অবশ্য Ballad ও বৈষ্ণব-পর্য্যায় ছাড়া সত্যিকার কবিতাও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সুলভ নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুকেই কাব্যের পক্ষে ষোল আনা প্রয়োজনীয় মনে করার দরুন এই অসংলগ্ন বস্তুপিণ্ড অকাব্যের গুদামঘরে পরিণত।

পঞ্চম পর্য্যায়ের যে কখানা সঙ্কলন আছে, তার মধ্যে দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বাঙ্গালীর গান,' ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাউল গান' এবং মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' উল্লেখযোগ্য। দুর্গাদাস বাবু রামপ্রসাদ থেকে সুরু ক'রে পাঁচালী, ঢপ্, দেহতত্ত্ব, সখীসংবাদ নানাজাতীয় গানই সংগ্রহ ক'রেছেন—আধুনিক গান পর্য্যন্ত। কিন্তু মালগাড়ীলক্ষণাক্রান্ত এই বইয়ে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে আয়তন বা বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সতর্কতা—এর থেকে বেছে নিয়ে ছোট একখানি সুন্দর সংগ্রহ হ'তে পারে। বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত শাখার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা-সঙ্গীত সখীসংবাদ ও লোকসঙ্গীত—বাউল, ভাটিয়াল—টপ্পা প্রভৃতি সাহিত্যকে কি ভাবে আশ্রয় ক'রেছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি এবং পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য তাদের কোন ধ্বংসাবশেষ কি না—এ সব বইয়ে তার কোন উল্লেখ নেই। তাই ওরা অনায়াসে পরস্পর মিশে প্রাচীন সাহিত্যের সাধারণ তালিকাভুক্ত হ'য়েছে—ওদের বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

উৎকৃষ্ট সঙ্কলনগ্রন্থের অভাবে এই আনুমানিক এক হাজার বছরের কাব্য-সাহিত্য সমগ্রভাবে সকলের পড়াও যেমন অসম্ভব হয়েছে,

এদের মূল্য সম্বন্ধেও তেম্‌নি বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসর ঘটেছে—বস্তুতঃ কাব্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং তার পরিণতি বোঝানোর এবং জীবনের সঙ্গে সেই পরিণতির সম্বন্ধ নির্ণয় করার উপযোগী সংক্ষিপ্ত কোন উপায় থাকা যে প্রয়োজন ছিল একথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে। Orthodox ও Secular উভয় শাখার কাব্যসাহিত্যের ধারা কি পারিপার্শ্বিকের ভেতর থেকে পুষ্টিলাভ করেছে এবং বর্ত্তমান সাহিত্যের ভেতর তাদের কোন চিহ্ন আর পাওয়া যায় কি না, অথবা প্রাচীন সাহিত্য নিজস্ব ভাবেই শেষ হ'য়ে গেছে এবং যা'কে আমরা আধুনিক বলি তার উৎপত্তি একেবারে স্বতন্ত্র, এসব কথা অনেকেই জানেন না। হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামি, আধ্যাত্মিকতার নামে ধর্ম্মকোলাহল, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নামে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বাঁধা বুলি আবৃত্তি ও ধার্ম্মিকতার আবরণে কুৎসিৎ দেহসর্ব্বস্বতা নিয়ে যে সনাতন সাহিত্য, তার সঙ্গে প্রাক্-চৈতন্য লিরিক্, গীতিকা বা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগের লোক-সঙ্গীত পর্য্যায়ের তফাৎটা কোথায়—তা বুঝতে হ'লে হাজার পাতা কুগ্রন্থ পাড়ি দিতে হয়। একত্র আহৃত সুন্দর সংক্ষিপ্ত বই নেই—গন্ধমাদন গোত্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের ভালো-মন্দ তাই নিবদ্ধ র'য়েছে তথাকথিত পণ্ডিতদের হাতে, লোকের ঘরে ঘরে তার প্রচার হয় নি।

এরপর আসে আধুনিক কালের কথা—এই আমলের পায়োনিয়র ঈশ্বর গুপ্ত, যাঁর অর্দ্ধেক হাফ্ আখ্‌ড়াই, তরজা, পাঁচালীর যুগে সংস্থিত, বাকী অর্দ্ধেক গোপালভাঁড়ী হাস্যরসে ভরপুর। ভারতচন্দ্রের মোগলাই রুচির আমরা বিরোধী, কিন্তু গুপ্ত কবি কি তাঁর চেয়ে বেশী রুচিপ্রাপ্ত ছিলেন? কিন্তু তবু ঈশ্বর গুপ্ত এ দেশের সাহিত্যের জন্‌সন্ স্বরূপ—যে লেখক-গোষ্ঠী তিনি গ'ড়ে যান তার মধ্যে আমরা বড় কবিদের পেয়েছি—যদিও প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা তাঁর সাগ্‌রেদ্ ছিলেন, বড় কবি তাঁরা কেউ নন্—বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ—সবাই চলনসই কবি—কিন্তু মাইকেল, নবীন সেন এবং হেমচন্দ্র এই যুগের ছায়াতেই আবির্ভূত এবং ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের সমাধির ওপর যে খাল কেটেছিলেন এঁরা তারই ওপর একটা মজবুত্ ইমারত

গ'ড়ে তুল্‌লেন—মালমশলা এলো সবই পাশ্চাত্য থেকে। মাইকেল হ'লেন অগ্রদূত—বাকী দু'জন অনুগামী। হেমচন্দ্র অকবি ছিলেন, তবে অধ্যবসায় তাঁকে দিয়ে কিছু কিছু কাব্য লিখিয়ে নিয়েছে; নবীনচন্দ্রের মধ্যে কবির মেরুদণ্ড ছিল, হাতে ভাষাও ছিল, শুধু ক্ষেত্রের অভাব তাঁকে আট্‌কেছিল। তবু মহাকাব্য নামধারী এঁদের উপাখ্যানগুলি এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী অগণ্য কাব্য-লেখকের গ্রন্থগুলিই লিরিকের পুনর্জ্জন্মে সহায়তা ক'রেছে—যাঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মিত্র, দীনেশ বসু, হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, বলদেব পালিত প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই যুগের ফ্যাশান্ অনুযায়ী কারুকে মিল্টন, কারুকে বাইরন্ ব'লে নিজের দৈন্যকে আরো বড় ক'রে তুলে লাভ নেই—তবে ইংরেজী কাব্যের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের বইগুলোকে এঁরা আদর্শ মেনেছিলেন—তার ফলে বাংলা কাব্যে সর্ব্বপ্রথম দেব-মাহাত্ম্য থেকে এলো দেশমাহাত্ম্য—পদ্মিনী, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি তারই ফল। অবশ্য এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম পয়গম্বর—আর বঙ্কিমচন্দ্রে এর গতি সম্পূর্ণ! মুকাব্য এখনো দেখা দেয় নি, তবে কাব্যের মন্দিরাঙ্গন প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে এঁদের হাতে—মাইকেলই সে বিষয়ে ক্ষণজন্মা কর্ম্মী-বিশেষ!

এই যুগের সাহিত্যের অপমৃত্যু হয়নি—ঈশ্বরগুপ্ত থেকে যাঁদের নাম ক'রেছি, তাঁরা সকলেই পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় বেঁচে রয়েছেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো সবই চাপা প'ড়েছে। তবে নাম ডোবে নি—ছেলেরা সবাই তাঁদের লেখা প'ড়ে থাকে। আমাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এখানেই সমাপ্ত হ'য়েছে; তবু মন্দের ভালো। কিন্তু উপাখ্যান-কাব্য-শাখার উদ্ভব ও লয় এদেশে আকস্মিক ও মরসুমী ধরণের কেন, তা বোঝাবার উপযোগী সত্যকার কোন সঙ্কলন নেই—হবারও আশা নেই। Childe Harold হয়ত আমরা এখনো প'ড়বো, কিন্তু প্রভাস-কুরুক্ষেত্র, কি বৃত্রসংহার, কি হেলেনাকাব্য আর প'ড়বো কিনা সন্দেহ! সুতরাং ও সবের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি সঙ্কলিত হওয়া খুবই দরকার ছিল—সেটুকু কি সত্যকিঙ্কর বাবুর 'কবিতা রত্নাবলী'তেই সমাপ্ত হবে?

তারপরের যুগ বর্ত্তমান যুগ—মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আস্‌তে মধ্যে বিহারীলাল, সুরেন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরকে নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সময়টা তাকে আর একটা স্বতন্ত্র যুগ বলা যায় না—ওটা রবীন্দ্র যুগেরই প্রস্তাবনা, যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের সময় পর্য্যন্ত সময়টা হ'চ্ছে রবীন্দ্র যুগেরই পটভূমি। মাইকেলেই আমরা দেখেছি পুরাণো traditionএর সর্ব্বাঙ্গীণ বিলোপ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবার বৈষ্ণব শাখা ও বাউল শাখাকে নিজের গীতের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন, সেই সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে সুইনবার্ণ পর্য্যন্ত ইংরাজী কাব্যধারাকে নিজের কবিতায়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা এসবকে অতিক্রম ক'রে সুদূরস্পর্শী উচ্চতাকে আশ্রয় ক'রলো। বাংলা কাব্যের সমস্ত ইতিহাস তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হ'ল এবং সেই সঙ্গে এমন আরো কিছু তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পোলো যা তাঁকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে দিল সমানজ্ঞাতিত্ব। সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্য গ্রন্থাবলী থেকে ক্রমিক রীতিতে সঙ্কলন ক'রে সঞ্চয়িতা নামক anthology নিজেই সম্পাদন ক'রেছেন—আর রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লিরিক কবিদের থেকে সুরু ক'রে একেবারে আধুনিক কাল পর্য্যন্তকার কবিতা অবলম্বনে নরেন্দ্র দেব 'কাব্যদীপালী' নামক সঙ্কলন বের ক'রেছেন।

'কাব্য দীপালী'র সঙ্কলনে বিবাহের বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'য়েছে—কাজেই কবিদের বিশেষত্ব অনুসারে কাব্য সঙ্কলিত হয়নি। তা ছাড়া বহু অবাঞ্ছিতের ওতে প্রবেশ হ'য়েছে, অথচ যোগ্যের স্থান হয় নি—স্বয়ং বিহারীলালই ওতে নেই, আর আধুনিকদের অনেকের সম্বন্ধেও পক্ষপাত আছে—এর ওপর কেবলমাত্র প্রেম-কবিতাকেই প্রাধান্য দিতে গিয়ে সম্পাদক তাঁদের ওপর অন্যায়াচরণ ক'রেছেন, যাঁরা প্রেম-কাব্য লিখে প্রসিদ্ধ নন্। বিশেষ ক'রে আধুনিক সম্বন্ধে—আধুনিক বাংলা কাব্য অবয়বের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ষোল আনা ঋণী, দৃষ্টি ভঙ্গিমার জন্যেও প্রায় ততটাই—কিন্তু তার আত্মায় বিংশ

শতাব্দীর ইংরেজ ও মার্কিন কবিদের চিন্তার ঢেউ এসে লেগেছে—সুতরাং একই লেবেলে রবীন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে তাদের গুদামজাত করাও সঙ্গত হয় নি। কালিদাস রায় ও সত্যেন্দ্র দত্ত রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কিছুটা অবহিত হ'য়েছিলেন—তাঁহাদের নিজস্বতার দাবী আছে, পক্ষান্তরে যতীন্দ্র বাগচী রবীন্দ্র-প্রভাবে অভিভূত—আবার যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিত লাল, নজরুল অনেকাংশে নূতন পথের পথিক—তারপর নবীনেরা যাঁরা আজো স্বীকৃতির অধিকার পাননি—অথচ সকলকেই 'কাব্য দীপালী' এক সূত্রে গেঁথেছেন এবং এক জাতীয় ক'রে বেছে নিয়ে—আধুনিক ইংরাজী কাব্যের যে সব Anthology'র কথা ইতিপূর্ব্বে ব'লেছি তাদের সঙ্গে তুলনা ক'রলেই আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত একখানি বইয়ের আমি উল্লেখ করিনি—তা হ'চ্ছে চারু বন্দোপাধ্যায় ও ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গবীণা'—রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর আঁকা একখানি তম্বুরা-ধারিণী মোগল মহিলার ত্রি-বর্ণ চিত্র এর গোড়াতেই দেওয়া হ'য়েছে—অর্থাৎ অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটীই এতে করা হয় নি—এটি হ'চ্ছে সমগ্র বাংলা কাব্য সাহিত্যের সটীক সঙ্কলন—মানে শূন্য পুরাণ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও মৃত রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের আমল পর্য্যন্ত অনেক কবিতা এতে গৃহীত হ'য়েছে। যুগ-পর্য্যায়ে এর কবিতাগুলিকে সাজানো হয় নি—তাই ময়নামতীর গান প্রভৃতির পরই ভারতচন্দ্র আছেন, তারপর বৈষ্ণব পদাবলী আছে, তারপর ময়মনসিংহ গীতিকা, মঙ্গল কাব্য, তারপর কৃত্তিবাস, তারপর পাঁচালী যুগের কবিতা গান—ধর্ম্ম-মঙ্গল, পদ্ম-পুরাণ, মনসা-মঙ্গল, শিবায়ন লৌকিক-শাখার এই সব বইকে সম্পাদকরা ধরেন নি—কাশী দাসকেও ধরেন নি—বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যথেচ্ছ ছাঁট কাট ক'রেছেন। আধুনিক কালে এসে তাঁদের এই mutilation policy একেবারে মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে—রবীন্দ্রনাথের এবং সত্যেন্দ্র দত্তের বহু কবিতাকেই তাঁরা সাঙ্গে পিছনে ছেঁটে ছোট ক'রে ফেলেছেন—

তা ছাড়া নির্ব্বাচন বিষয়ে যে পরিমাণ বে-পরোয়া রুচির অবসর নিয়েছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যের যে পরিণতি, তা স্বভাবতঃই প্রত্যাশিত নয়—ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত খুব স্বাভাবিক, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেল কতকটা অভাবনীয়—কিন্তু মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে আসা যেন অলৌকিক গোছের—প্রচলিত সাহিত্য-ধারার সঙ্গাগ অনুসরণে, এমন কি অপরিমিত গঠনশক্তি ব্যবহারেও বাংলা কাব্যের দেহ ও মনে এই পূর্ণতা সাংসাধন অন্য যে কোন কবির শক্তির বাইরেই ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যের বৈশিষ্ট্য আমার আলোচনার অন্তর্গত নয়—আমি বলতে চাচ্ছিলাম বাংলা কাব্যের বর্ত্তমান যুগ তার নিজস্ব ঐতিহ্য গ'ড়েছে—রবীন্দ্রনাথই সে গঠনের পুরোধা। কিন্তু চারু বাবু ও ললিত বাবুর বই প'ড়ে মনে হয় পরের পর আমরা স্বাভাবিক রীতিতেই আস্‌ছি এবং একের সঙ্গে অন্যের তফাৎ বিশেষ কিছুই না। প্রকৃত পক্ষে ব'লতে গেলে এখনো পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার একমাত্র কবি, আর আদি থেকে যাবতীয় প্রাক্-রবি কাব্য রবীন্দ্র কাব্যের ভূমিকা স্বরূপ—কিন্তু এই অধ্যাপক সাহিত্যিকদ্বয় মুড়ি-মিছরি এক গোত্রীয় ক'রে যে ভাবে এই পসরা সাজিয়েছেন, তাতে নির্ব্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বাংলা সাহিত্য যদি এই হয়, তবে তার দাম কিছু নেই।

যুগ-পর্য্যায়ে সঙ্কলন করার অর্থ হ'চ্ছে প্রত্যেক যুগের ভাব-ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীকে আবিষ্কার করার মতো সূক্ষ্ম মাত্রা-বোধ থাকা—অবশ্য সাহিত্যের যুগ-ভাগ প্রত্নতত্ত্বের অনুরূপ নয়—এক যুগের চিন্তাধারা পূর্ব্বতন কোন যুগে বীজাকারে থাকে; পরে হঠাৎ তার বিকাশ হয়—কত ধারার আবার যুগপৎ উদ্ভব ও বিলয় হ'য়ে থাকে—এগুলোকে রসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, ঐতিহাসিক মাপকাঠি এখানে অচল! তবু মোটা কথার হিসাবে সময়কে ত উপেক্ষা করা যায় না—কারণ সময়ের ধারা অমিত শক্তিধরকেও স্পর্শ না করে ছাড়ে না—ইংল্যাণ্ড এমেরিক'র যে কবিরা সমরের পূর্ব্ব থেকে পর

পর্য্যন্ত লেখনী চালনা ক'রেছেন, তাঁদের outlook-এর ভেতর রীতি-মতো পরিবর্ত্তনের বন্যা বয়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এ দেশের পাঠক এ ভাবে সাহিত্যকে প'ড়তে অভ্যস্ত নয়—কারণ এ ভাবে সাহিত্যকে নির্ব্বাচন ও সঙ্কলন ক'রে তাঁদের সাম্নে ধরা হয় না। উপযুক্ত সঙ্কলনের অভাবই এর প্রধানতম কারণ।

শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত।

রাসলীলা

২

কাম না প্রেম ?

বিগত মাঘ 'পরিচয়ে' আমরা রাসলীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে, রাস সেই ক্রীড়া, যাহাতে 'রস' পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ 'রস-ব্রহ্ম' আস্বাদের জন্য রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নাকি এই চিদানন্দময়ী রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তের ভাবদৃষ্টিতে এই রাসলীলা 'সর্ব্বলীলোৎসবের মুকুটমণি'।

মহাভারতের খিল পর্ব্ব হরিবংশে এবং ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে এই রাসলীলার কথা আছে। তন্মধ্যে ভাগবতের বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভাগবতের ঐ অংশের নাম রাস-পঞ্চাধ্যায়। আমরা গত বারের 'পরিচয়ে', ঐ রাস-পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত রাস-ক্রীড়ার যথাসম্ভব পরিচয় দিয়াছি। পাঠক নিশ্চয়ই তন্মধ্যে প্রচুর কামায়ন (eroticism) লক্ষ্য করিয়াছেন।

'নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং' 'জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা' 'উৎতস্তয়ন্ রতিপতিং রসয়াঞ্চকার' 'সুরতনাথ! তেঽশুল্ক-দাসিকাঃ' 'মনসি নঃ স্মরং বীর! যচ্ছসি' 'কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন এই—রাসলীলা কি কাম-ক্রীড়া না প্রেমোৎসব ?

কাম ও প্রেমে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কাম = Lust ; প্রেম = Love. ঐ Love kills Lust.

অতএব কাম প্রেমে বহুত' অন্তর
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর—চরিতামৃত

কামে রিরংসা (রন্তুম্ ইচ্ছা), সে চায় দেহের মিলন,—প্রেম অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধ—'Wedding of the Soul.'

'Now will I wed thy *Soul*' says the Voice to St. Catherine of Siena, 'which shall ever be conjoined and united to me.'

I will draw near to Thee in silence, and will uncover Thy feet that it may please Thee to unite me to Thyself, making *my Soul* Thy bride ; I will rejoice in nothing till I am in *thine* arms.—St. John of the Cross.

কামে সঙ্গম সুখ—প্রেমে 'সব দুখসুখমন্থন' 'আনন্দং নন্দনাতীতম্'—কবিরাজ-রাজ ভবভূতির ভাষায়,—অদ্বৈতং সুখদুঃখয়ো রণুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ। ইহাকেই পাশ্চাত্যেরা Platonic Love বলেন —যাহা আধিদৈহিক নয়, আধ্যাত্মিক। যে প্রেমে 'মনের মিলন চাহে দেহের মিলন', সে প্রেম কাম-ভাবিত,—কাম-বর্জ্জিত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপীর কি ভাব ?

'শ্রীঅঙ্গ রূপে হরে গোপিকার মন'।

গোপী বলেন—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং • • • ভবাম দাস্যঃ—ভাগবত, ১০।২৯।৩৬

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে-গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

গোপীদিগের এই কৃষ্ণ-লালসাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা কাম বলিতে নারাজ—তাঁহারা বলেন, উহা কাম নয়—প্রেম।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম

• • •

শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন—
গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়' ভাব নাম
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম।—চরিতামৃত

তাঁহাদের মতে যদিও গোপীপ্রেমের কামের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকে, তথাপি উহা কাম নয়—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম
কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম।—চরিতামৃত
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

এ মত কিন্তু ভাগবতের বিরোধী। ভাগবত স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

ব্রজপুরবধিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং—১০।২৯।২৪

ভাগবতের মতে যেমন—'দ্বেষাৎ চৈদ্যঃ', তেমনি 'কামাৎ গোপ্যঃ' —অর্থাৎ, শিশুপাল যেমন শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিল, গোপীরা তেমনি তাঁহাতে কামার্পণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল।

এ সম্পর্কে শুকদেবের উক্তি এই :—

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥
—ভাগবত, ১০।২৯।১২,১৪

'শিশুপাল যেরূপে ভগবানে দ্বেষ অর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই হৃষীকেশকে যাহারা কান্তভাবে ভজনা করিল, তাহারা যে তাঁহার সাযুজ্যলাভ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি ? কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহার্দ্দ্য, শ্রীহরিকে যিনি ইহার কোন একটিও অর্পণ করেন, তাঁহার তন্ময়তাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।'

ইহাতে দেখা গেল, শুকদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর ভাব কামগন্ধহীন প্রেম নয়—সত্যকার কাম। সেই জন্যই রাসের বর্ণনায় এত কামায়ন—সেইজন্যই রাসের ব্যাপারে দেখা যায় অষ্টাঙ্গ মৈথুনের সকল অঙ্গই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ॥

আর একটি কথা লক্ষ্য করিতে হয়। শুকদেব গোপীর কৃষ্ণ-সঙ্গম লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা—ভাগবত ১০।

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা বটেন কিন্তু গোপীদিগের তাঁহাতে 'জার'-বুদ্ধি (উপপতি ভাব)।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে !

অর্থাৎ গোপীরা কৃষ্ণকে 'স্ব রমণং বিদুঃ—ব্রহ্মতয়া ন বিদুঃ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

তবেই গোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ "রমণ"—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে গোপীরা "রমণী"।

অর্থাৎ রাসে গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সঙ্গম, তাহা কামকৃত—কামীর সহিত 'পরকীয়া' কামিনীর দেহ-সম্বন্ধ। এ ভাবে রাসবিলাস উল্লসিত কাম-ক্রীড়া। সেই জন্য ভাগবতে দেখি, আকাশ হইতে এ ক্রীড়া দর্শন করিয়া দেববালাগণ "কামার্দ্দিতা" হইয়াছিলেন—হইবারই কথা !

কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ, শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মতোঽভবৎ ॥—১০।৩৩।১৯

আরও দেখা যায়, গোপীভাবে ভাবিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সর্ব্বদা বলিতেন,—

'এইত' পরাণনাথে পাইনু, যার লাগি মদন-দহনে দহিনু।'

অতএব গোপিকার প্রেমকে কিরূপে 'কামগন্ধহীন' বলিব ?

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গোপিকা-দিগের প্রেমকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রেমে আত্মবিস্মৃতি থাকিলেও ঐ প্রেম কামসম্ভূল,—কামগন্ধশূন্য নয়।। গোপীপ্রেমের পরিচয় দিতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ—
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল ॥ ...
সর্ব্বত্যাগ করিয়ে করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণসুখ হেতু করে—প্রেমের সেবন।
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ।

—চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ অধ্যায়

নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য—
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য।
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার।

—চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম অধ্যায়

এইরূপে গোপিকার প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি দেখি বটে—সেই রাজকবি টেনিসনের কথা—

Love took up the harp of life and smote
the chords with might
Smote upon the chord of *self*, which trembling passed
in music out of sight.

ইহাও ঠিক যে, গোপীর যে কাম-সেবা, তাহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় নহে—কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা-প্রণোদিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা চন্দ্রাবলীর সহিত রাধিকার প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। চন্দ্রাবলী একজন spiritual glutton, প্রকৃত vampire—সে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি চায়—সে নিঃশেষে নিঙাড়িয়া কৃষ্ণকে ভোগ করিতে চায়—তাই সে কামুকী। গোপীমহলে তাই তাহার এত অপযশঃ। তাই উপভুক্ত শ্রীকৃষ্ণের 'কষায়িতম্ অলসনিমেষং' দেখিয়া জয়দেব রাগ করিয়া বলেন—'হরি ! হরি ! যাহি, মাধব যাহি !'

আর রাধিকা ? তিনি প্রেমিকা—তাঁহার মাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা। তিনি নিজে ভোগ করেন না—কৃষ্ণকে ভোগ করান—

কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।

তাঁহার আদান নাই—কেবলই প্রদান—

কিছু নাহি চা'ব, চরণ সেবিব, দেহ নাথ এই বর।

রাধা বলেন,—আমি তোমার বিনি মূল্যে কেনা দাসী

—হৃষ্ণনাথ ! তে অশুষ্কদাসিকা—Do with me what you will। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ (শ্রীচৈতন্য)

খৃষ্টীয় Mysticism-এও আমরা এই ধরণের কথা শুনিতে পাই—

"Oh Love," said St. Catherine of Genoa, "I do not wish to follow thee for sake of these delights, but solely from the motive of true love."

The true mystic claims no promises and makes no demands••

Only with the annihilation of self-hood, comes the fulfilment of love.

এসব খুব উচ্চাঙ্গের কথা এবং গোপীপ্রেম এই ভাবেই উদ্ভাসিত বটে। কিন্তু তাহা কি 'কামগন্ধহীন'?

এই কাম ও প্রেম লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছেন দেখা যায়।

মৈথুনং সহ কৃষ্ণেন গোপিকাচরিতঞ্চ যৎ।
তত্র কামাদ্ অকামাদ্ বা ভাবদেহেন তৎ কৃতম্॥

—রাসোল্লাসতন্ত্র

অর্থাৎ, গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম মৈথুন বটে—যৌনসম্মিলন বটে, কিন্তু উহা অপ্রাকৃত রমণ, যেহেতু ভাবদেহ-কৃত।

ভাবদেহ কি? বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত ঐ 'রসোল্লাস'-তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে শিব দেবীকে বলিতেছেন—

যথা শরীরে দেহানি স্থূলং সূক্ষ্মং কারণম্।
তথৈবান্যং দেহং জ্ঞেয়ং ভাবদেহং প্রকীর্তিতম্॥
কৃপালব্ধমিদং দেহং সহজং জন্মজন্মনি।
অথবা সাধনালব্ধং কদাপি বা মহেশ্বরি!
ন সগুণং নির্গুণত্বা দেহমিদং পরাত্মিকে।
কুত্রাপি নহি দ্রষ্টব্যম্ লোকে বৃন্দাটবীং বিনা॥

প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে কিন্তু এ ভাব-দেহের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা কতকটা থিয়সফির 'মায়াবী রূপে'র অনুরূপ। চণ্ডীদাস একটি পদে লিখিয়াছেন,—

সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

—কিন্তু সে অন্য ভাবের কথা - যে ভাবে শ্রীরাধা 'মহাভাবময়ী'। রাসে বর্ণিত গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম যদি যৌন সম্মিলন (Physical মৈথুন) না হয়, তবে ভাগবত—

'উত্তস্তয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার' বলিলেন—কেন? এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'অবরুদ্ধ-সৌরত' (১০।৩৩।২৬)—এই বিশেষণের প্রয়োগ করিলেন কেন?

আত্মনি অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ, নতু স্খলিতো যস্ত ইতি কামজয়োক্তিঃ
—শ্রীধর।

ইহা হইতে বুঝা যায়, রাসে অপ্রাকৃত যাহা থাকে থাকুক,—প্রাকৃত রমণও ছিল।

বৈষ্ণবেরা একথা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চ রূপে রমণ পঞ্চধা—

ততো রূপপ্রপঞ্চস্য পঞ্চধা রমণং মতং।
আত্মনা প্রথমা লীলা, মনসা তু ততঃ পরা॥
বাক্ প্রাণৈস্তু তৃতীয়া স্যাদিন্দ্রিয়ৈস্তু ততঃ পরা।
শারীরী পঞ্চমী বাচ্যা ততো রূপং প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ, প্রথম রমণ আত্মাতে, দ্বিতীয় মনে, তৃতীয় বাক্যে ও প্রাণে, চতুর্থ ইন্দ্রিয়ে—পঞ্চম রমণ শরীরে (Physical Bodyতে)।

ভাগবত পুরাণের প্রবীন সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, রাসপঞ্চাধ্যায়ের উত্তরোত্তর পাঁচ অধ্যায়ে এই পঞ্চবিধ রমণলীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি একথাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়া গোপিকাগণ আন্তর ও বাহ্য—উভয়বিধ রমণফলই লাভ করিয়াছিল—

অতোহি ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্ত্রীষু রেমে হ্যহর্নিশম্।
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন, আন্তরং তু পরং ফলম্।

বলা বাহুল্য, এই বাহ্যফল যৌনসম্মিলন—Physical Union.

আর এক কথা। পুরাণে রাসের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় কয়েকজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া

রাসে যাইবার নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও গুরুজনের বাধায় যাইতে পারে নাই। এসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক এই

কাচিদ্বাবসথস্যান্তঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গতান্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা॥

ভাগবতে এ শ্লোকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধ-বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত-লোচনাঃ॥—১০।২৯।৮

'কোন কোন গোপী গুরুজনের ভয়ে নিজালয়ের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রহিল।' এই শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—

ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তা ইতি পতিভিঘার্য্যৈব সতর্জ্জনং সযষ্টিকম্ উপবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ।

আমি আশা করি, ইহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অত্যুক্তি। কারণ, 'গোঁয়ার' হইলেও সেই সকল অবরুদ্ধা গোপীর বৃন্দাবনবাসী স্বামীরা যে দ্বারদেশে পত্নীদিগকে লগুড় উঠাইয়া তাড়না দ্বারা নিরুপদ্রব বৃন্দাবনে violence-এর অভিনয় করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

সে যাহা হউক, আমাদের সম্প্রতি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাসে গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম যদি ভাবদেহকৃত হইত, তবে এই সকল অবরুদ্ধা গোপীরা রাসে যোগ দিতে পারিল না কেন? তাহারা অন্তঃপুরেই নিরুদ্ধা রহিল। সেখানে তাহাদের কি দশা হইল?

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ॥—ভাগবত, ১০।২৯।৯-১০

'প্রিয়তমের তীব্র বিরহতাপে সেই ব্রজবধূদিগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত কান্তের আলিঙ্গনসুখে তাহাদের সমস্ত পুণ্যপুঞ্জ তুচ্ছ হইয়া গেল। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জার-বুদ্ধিতে সঙ্গতা হইয়া তাহারা সমস্ত ভববন্ধন-নির্ম্মুক্ত হইয়া সদ্য সদ্য ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগ করিল।'

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা আরও মনোহর—

তচ্চিন্তা-বিপুলাহ্লাদ ক্ষীণ পুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তি-মহাদুঃখ বিলীনাশেষপাতকা॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গত্যান্যা গোপকন্যকা॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।২১-২২

'গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধা গোপী তন্ময়চিত্তে গোবিন্দের ধ্যান করিতে লাগিল। তজ্জনিত বিপুলাহ্লাদে তাহার সমস্ত পুণ্যপুঞ্জ অবসিত হইল এবং তাঁহার সঙ্গমের অভাবজাত মহাদুঃখ দ্বারা তাহার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইল। জগৎসবিতা পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া নিস্তরঙ্গ চিত্তে সেই গোপী সদ্যঃ সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিল।' ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—

তদেবং তৎক্ষণমেব ভোগেন ক্ষীণাঃ সমস্তপুণ্যপাপা ভগবদ্ধ্যানমহিম্না চ লব্ধাপরোক্ষাত্মজ্ঞানাৎ সদ্য এব মুক্তিং প্রাপ।

অতএব গোপিকার শ্রীকৃষ্ণ-রমণ ভাব-দেহকৃত—এ মত ভিত্তিহীন মনে করা অসঙ্গত নয়।

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই রাসলীলা যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় তিনি গোপীতে কামগন্ধহীনতা আরোপ করিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, এই রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের কামবিজেতৃত্ব প্রকটিত হইয়াছে। তপোবিঘ্নকারী মদনকে উমাপতি দহন করিয়াছিলেন—রাসলীলায় রমাপতি মন্মথকে মথন করিলেন। রাস পঞ্চাধ্যায়ের মুখবন্ধে শ্রীধরস্বামী মঙ্গলাচরণরূপে এই শ্লোকটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি-জয়সংরূঢ় দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ॥

'ব্রহ্মাদির উপর জয়লাভ করিয়া কামদেবের মহাদর্প হইয়াছিল। গোপীদিগের রাসমণ্ডলে কামবিজেতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ সেই কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ করিলেন।' রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—

নন্থ বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন কন্দর্পবিজেতৃত্ব প্রতীতেঃ? মৈবং—'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' 'আত্মারামো ন্যরীরমৎ' 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ' ●● ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাৎ রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায় ইত্যেব তত্ত্বম্।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ—তখন সেই স্বতন্ত্র মদন-মোহনের রাসক্রীড়ায় কামবিজয়িত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

আমার এক বন্ধু প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম দিয়া একখানি ইংরাজী পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার অনুরোধে আমি ঐ পুস্তিকার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিই। ঐ পুস্তিকায় গ্রন্থকার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—

Srikrishna is represented (in the Rasha) as immaculate, cold in the midst of temptation. Just imagine His position when surrounded by a number of lovely damsels, burning in love for Him and using various artifices to ensnare Him. And yet He remains perfectly unmoved, when any amount of love-making on His part would have had the full sanction of His own society.'

ঐ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম—

Is it enough that Srikrishna remained cold as stone, whereas the Gopis were burning with lust for his sake? This may be very wonderful self-possession in an ordinary mortal who has yet to subdue his flesh * * It is unlikely that the authors of the Puranas should deem it necessary to record of the Supreme that He did what is expected of every Yogi of any pretentions * * And even assuming that Srikrishna came out scatheless in this ordeal, what about the poor Gopis who had their moral constitution shattered by this combat, who thirsted but were not allowed to drink the nectar though at hand and experienced the misery of Tantalus?

যিনি অচ্যুত, যিনি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—যিনি 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম'—তিনি কামজয়ী—এই স্বতঃসিদ্ধ প্রতিপন্ন করাই রাসলীলার প্রয়োজন—একথা স্বীকার করিতে বেশ দ্বিধা হয়।

কিন্তু জবর উকিলির (যাহাকে special pleading বলে) অন্ত আছে কি? এক দল বলেন শ্রীকৃষ্ণের কামবিজেতৃত্ব নয়—গোপীদিগের নির্লিপ্তভাবে কামসেবা-প্রদর্শনই রাসের উদ্দেশ্য। চণ্ডীদাসের নামের সহিত জড়িত একটি পদে এই ধরণের কথা আছে :—

তোরা, পর পতি সনে, শয়নে স্বপনে,
সদাই রাখিবি লেহা।
সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা।
কহে চণ্ডীদাসে, এমতি হইলে
তবেতো পিরীতি সাজে।
(তোরা) না হবি গো সতী না হবি অসতী,
থাকিবি রমণী মাঝে।

বাউলের গানেও আমরা শুনি—

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
সাপ না গিলিবে তায়
অমিয় সাগরে, সিনান করিবি
কেশ না ভিজিবে তায়।

গীতায় ও উপনিষদেও ঐ ধরণের কথা আছে—

উদাসীনবৎ আসীনং পদ্মপত্রমিবাম্ভসা—গীতা

যথা পুষ্করপলাশে আপো না শ্লিষ্যন্তে তথা এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য

যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বুদ্ধদেবও তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন—

মাতরং পিতরং হত্বা রাজানং দ্বে চ শোত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হত্বা অনীহো যাতি ব্রাহ্মণো।—ধম্মপদ

কিন্তু গোপীদিকের কামক্রীড়া কি বাস্তবিকই ঐরূপ ছিল? শুকদেবের বর্ণনায় ত' তাহা মনে হয় না। বরং ইহাই মনে হয়, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্টা হইয়া জারবুদ্ধিতে কৃষ্ণ-ভগবানে কামার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরানির্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবানে কামার্পণ! তাঁহার সহিত রমণ! হাঁ, তাহা-ই। তাঁহাকে প্রিয়তম—'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ' জানিয়া, তাঁহাকে কান্তভাবে ভজন—চৈতন্যমহাপ্রভু গোপী-

ভাবের অনুকরণ করিয়া যে প্রণালী "আপনি আচরি ধর্ম্ম" অপরকে শিখাইয়াছিলেন, এ সেই প্রণালী। কিন্তু এস্থলে এবিষয়ের বিস্তার করিব না। কারণ, ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাঁহার অনুসন্ধিৎসা আছে, তিনি ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'যৌনাতীত' প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। এভাবের ভজনে কামের বর্জ্জন করিতে হয় না, শোধন করিতে হয়—suppression করিতে হয় না, sublimation করিতে হয়। এ প্রণালীর ভজনের একটা গভীর আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক উস্‌পেনস্কির (Ouspensky) কয়েকটি সার কথা আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical, a taste of ecstasy. Nothing else in our life brings us so near to the limit of human possibilities, beyond which begins the unknown. And in this lies, without doubt, the chief cause of the terrible power of sex over human life.

তিনি আরও বলেন—

Love, 'sex', these are but a foretaste of mystical sensations... Consequently in true mysticism, there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love, only infinitely higher and more complex.

ইহাই ভগবানে কামার্পণের সার্থকতা। অতএব কামশব্দে গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেরূপ ভয় পান, তাহা ভিত্তিহীন মনে হয়। ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিয়াছেন—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি

উপনিষদেও কয়েকবার ব্রহ্মসম্বন্ধে শোনা যায়—'স অকাময়ত'। সৃজনের মূলে যে কাম—স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব যে কামকে আশ্রয় করিয়া প্রলয় হইতে সৃষ্টির উদয় করিয়াছেন, সেই কামকে ভয় করিবার হেতু আছে কি?

শেষ কথা। রাসলীলার আস্বাদন করিবার অধিকারী কে? রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শুকদেব বলিয়াছেন,—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদংচ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদ্ অথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য, কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

অর্থাৎ, যিনি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি অচিরে শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া জীবের যে হৃদ্‌রোগ কাম—তাহাকে নিঃশেষে নিঃসংশয়ে নিরসন করিতে পারেন।

ঠিক্ কথা—যাঁহাদের প্রাণমনঃ ভগবানে নিবেদিত, যাঁহারা কন্দর্প-বিজয়ী, রাসলীলার শ্রবণবর্ণনে তাঁহারাই চিরনির্বৃতি লাভ করেন। কিন্তু অপরের পক্ষে এ পথ বড় কঠিন পথ—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত। অনধিকারীর রাসলীলার চর্চ্চায় কামবৃদ্ধি ঘটে। তাই শুকদেব সতর্ক করিয়াছেন—warning দিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেৎ জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

এ জহরকা পুরিয়া—নীলকণ্ঠ নহিলে কে এ গরল পান করিতে পারে? Physically ত' দূরের কথা, mentallyও—কার্য্যতঃ নয় ভাবতঃও ইহার অনুকরণ করিলে আশু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য কল্যাণ-ইচ্ছুর প্রতি মহাজনদিগের উপদেশ—

বর্ত্তিতব্যং শম্ ইচ্ছদ্ভিঃ ভক্তবৎ ন তু কৃষ্ণবৎ।

কারণ, একটুকু পদস্খলন হইলেই সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ি! সহজিয়ার কয়েকটি পদ শুনুন—ইহা 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' হইতে গৃহীত।

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৬১ পৃষ্ঠা
'রমণই পরম মহাসুখ—ইহাই প্রজ্ঞার উপায়, ইহা হইতেই সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।'
জোইনি তুই বিনু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

'হে যোগিনী! তোমা বিনা এক ক্ষণও রহিতে নারি। তোমার মুখ চুম্বিয়া কমলরস পান করি।'

সহজিয়ারা বলেন—সহজ পথই একমাত্র পথ—যদি ভববন্ধ খণ্ডন করিতে চাও তবে 'সইপর রজ্জহ'।

আরে বট! (মূঢ়) সহজ সইপর রজ্জহ।
মা ভববন্ধ গন্ধ পড়ি বজ্জহ॥

ইহার প্রতিবাদে মহাপ্রভু বলিতেন—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন॥

ইহাই নিরাপদ পথ (safe method)। কিন্তু যাঁহারা সাহসিক পুরুষ—যাঁহারা adventurous souls, যাঁহারা প্রকৃত 'রসিক', যাঁহাদের 'শ্রীহরিস্মরণে সরসং মনঃ'—যেমন জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ—মনে হয়, ইঁহারা সাধনজীবনে ঐ রাসবিহারীর রাস-লীলার অনুকরণ করিতেন—হয়ত' তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইত না—লাভই হইত। কারণ, তাঁহারা ছিলেন উত্তম অধিকারী। জয়দেব আপনাকে 'পদ্মাবতী-রমণ' বলিয়াছেন (জয়তি পদ্মাবতীরমণো জয়দেবঃ) এবং নিজেকে 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি-ঘটিত ব্যাপার সুপরিচিত—বারাঙ্গনা চিন্তামণি ঐ লীলাশুকের সাধনপথে উত্তর সাধিকা। তাঁহার 'কর্ণামৃতের' মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মুখেই চিন্তামণির নাম—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরি র্গুরুর্মে
প্রেম-পথ প্রদর্শিলে তুমি চিন্তামণি!
বন্দ্যগুরু! তোমারে প্রণমি;
প্রেমমন্ত্রে সোমগিরি! করিলে উদ্ধার,
দীক্ষাগুরু! করি নমস্কার।

—শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী-কৃত অনুবাদ

চণ্ডীদাসের জীবন নাটকের নায়িকা রজকিনী রামী—'তুমি কামহীনা রতি'—

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়

বিদ্যাপতির কবিতার উৎস লছিমা দেবী—তাঁহার সঙ্গীত ঐ লছিমার লাবণ্যঝঙ্কারে মুখরিত, তাঁহার পদাবলীর 'ধ্রু' 'লছিমা দেবী পরমাণ'। আর রায় রামানন্দ? চৈতন্য চরিতামৃতের বিবরণ শুনুন—

এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস-বিভূষণ
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ মন
নানা ভাবোদ্গম তায় করায় শিক্ষণ
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠপাষাণ-সম
আশ্চর্য্য! তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

এই নয় জনকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবেরা 'নবরসিকে'র কথা বলেন—জয়দেব-পদ্মাবতী, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, চণ্ডীদাস-রামী, বিদ্যাপতি-লছিমা এবং রায় রামানন্দ। বৈষ্ণবজগতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ঐ নয়জন প্রকৃত রসিকের আবির্ভাব হইয়াছে—চার জন পুরুষ ও চার জন প্রকৃতি—এই আট জন, আর নবম রায় রামানন্দ, যিনি একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ। খৃষ্টানেরা যে বলেন, এই ২০০০ বৎসরে একজন মাত্র খৃষ্টানের উদ্ভব হইয়াছে—তিনি স্বয়ং যীশু খৃষ্ট—There has so far been only one Christian and he died with Jesus Christ—এও সেই ধরণের কথা। এই সকল উচ্চ অধিকারী 'রসিক' মহাজন—স্বয়ং চৈতন্য দেব যাঁহাদের 'পদ' রাত্রিদিনে আস্বাদন করিতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

—তাঁহাদের সমালোচনা আমার পক্ষে অশোভন। প্রথমতঃ তাঁহারা 'মহাজন'—আমরা তাঁহাদের খাতক, চির-ঋণে আবদ্ধ—

তাঁহাদের পদাবলীর ধার অশোধ্য। তাঁহারা (খৃষ্টান Mysticism এর ভাষায়)—are the Troubadours of God, Poets of the Infinite, Minne-singers of the Holy Ghost.

দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা প্রকৃত রসিক—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে ভরপুর—full of the love of God. তাঁহারা সমালোচনার উর্দ্ধে। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে ঐরূপ রসিক সুদুর্লভ, অতিশয় বিরল—কোটিতে একজন।

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়—চণ্ডীদাস

অনেক বৈষ্ণবই বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত রাসলীলাকে নায়ক-নায়িকার সত্যকার দেহের মিলন মনে করেন—গোলোকে রাসেশ্বর ও রাসেশ্বরীর যে নিত্য রাস, তাহারই ভৌম প্রতিকৃতি জ্ঞান করেন—সেইজন্য কাম শব্দে এত আপত্তি।—যিনি মদনমোহন, যিনি অপ্রাকৃত কামদেব, তাঁহাতে প্রাকৃত কামের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু, রাস যদি ঐতিহাসিক ঘটনা না হয়—ইহা যদি একটা অলৌকিক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রূপক (Spiritual Allegory) হয়, মিষ্টিকের অনুভূতি-সাপেক্ষ হয়, ভক্ত-ভাবুকের হৃদয়রাসমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বংশীহস্তে ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে শ্রীরাধাকে বামে লইয়া যে দণ্ডায়মান হ'ন, তাহাই যদি প্রকৃত রাস হয়—তবে আর কামপ্রেমের সূক্ষ্ম ভেদ লইয়া বিবাদ করিতে হয় না। অতএব আগামী বারে আমাদের আলোচ্য হইবে—রাস কতটা রূপক, কতটা ইতিহাস।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সৌন্দর্য্যের মূল্য কি স্বাশ্রয়ী?

মহাযুদ্ধে যে-প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কেবল শত সহস্র মানুষের ধনপ্রাণই তলিয়ে গেল না, তার ক্রমপ্রসারী আলোড়ন একদিন এসে পৌঁছুল মনের তটভূমিতে, তোলপাড় ঘটাল বহু শতাব্দীর সংস্থাপিত বিশ্বাস ও সংস্কারের স্তরে স্তরে। মর্য্যালিটির শাশ্বত নীতি-গুলি ফাঁকা ঠেকতে লাগল, গির্জ্জের পাদ্রিরা পাত্তাড়ি গুটোতে ব্যস্ত হলেন, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থায় সাহিত্যে আদর্শবাদের দিন এল ফুরিয়ে। এমন কিছুই টিঁকল না যাকে মানুষ আপন চিন্তায় ও কাজে চরম ব'লে গ্রহণ করতে পারত, যার অটল ভূমির উপর তার বহুবিচিত্রিত সাধনার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারত। এই মূল্যবোধের বিনাশই গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সব চেয়ে অবিস্মরণীয় অধ্যায়। প্রগতির বিবিধ উপকরণ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, কিন্তু তার লক্ষ্যের কথা ভাবাটাকে ভিক্টোরীয় ভাবুকতা নাম দিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে যুদ্ধপরবর্ত্তী মেজাজ। চরম মূল্য সম্বন্ধে অনাস্থা ও অবজ্ঞা আজ এত সার্ব্বজনীন যে সে বিগত সমস্তার পুনরুত্থাপনে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি অপ্রত্যাশিত নয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য পাটীগণিতের গোটাকয়েক সংখ্যার মধ্যে নিহিত, মুনিপ্রবর পাইথাগোরসের এই বচনটাকে যাঁরা আষাঢ়ে ব'লে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরাও মানবজীবনের উপর "তিন" সংখ্যাটির প্রভাবের কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হবেন। খৃষ্টানধর্ম্মের ত্রিত্ব আর হিন্দুদের ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিগুণ প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও, জার্ম্মানির একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সমগ্র দর্শনকে তিনের নামতা বললে খুব অন্যায় হয় না; এবং নবজগতের চতুর্থ মহাশিল্পেও ঐ সংখ্যাটির অখণ্ড প্রতাপ বর্ত্তমান, কারণ এমন ফিল্ম কমই পাওয়া যায় যার মূল বিষয় নরনারীর eternal triangle নয়। কাজেই উল্লিখিত চরম মূল্যও যে ওর ঐন্দ্রজালিক গণ্ডির মধ্যে পড়বে, এবং সত্য, শ্রেয় ও সুন্দর, এই ত্রিমূর্ত্তি রচনা

ক'রে বিশ্ববিধান রক্ষা করবে, তা আর আশ্চর্য্য কী। তবু পাটীগণিত আর গ্রীক দর্শনের নিতান্ত অভক্ত যারা, তারা প্রশ্ন তুলতে পারে যে সে-মূল্যত্রয়ের চরমত্বের পক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যার উপর আমাদের পক্ষপাত ছাড়া কোনো প্রকৃষ্টতর যুক্তিও আছে কি না। এ-প্রবন্ধে প্রশ্নটা বিশেষ ক'রে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেই তোলা হবে; সত্য ও শ্রেয় যে চরম, তাদের মূল্য যে স্বাশ্রয়ী (intrinsic), একথা আমরা আপাতত মেনে নিচ্ছি।

অবশ্য এমন মতবাদেরও অভাব নেই যাতে পূর্ব্বোক্ত মূল্যের কোনোটাকেই চরম ব'লে গ্রাহ্য করা হয় নি। উনিশ শতকে ডারুয়িন স্পেন্‌সর প্রভৃতির কল্যাণে জীববিজ্ঞানের প্রতিপত্তি ও পরাক্রম এমনি দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল যে মূল্যজ্ঞানও তার কবল এড়াতে পারে নি। জীবনের মূল্যই হয়ে দাঁড়াল পরম ও স্বাশ্রয়ী, আর সব কিছুর মূল্য স্বীকৃত হল কেবল জীবনধারণের উপায় বা সহায়রূপে। জীবের ধর্ম্মই হ'ল জীবনকে পরম জ্ঞান করা, এবং মানুষের বেলাতেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটত না, যদি তার অস্তিত্বের পরিধি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে না যেত। জড়প্রকৃতির সঙ্গে জীবপ্রকৃতির সংঘাত ও সমন্বয় যে-নিয়মের প্রবর্ত্তনায় পরিচালিত তার অমোঘ জালে মানুষও বন্দী। তবু এই বন্ধনের মাঝখানে সে আপন মুক্তির পথ ক'রে নিয়েছে জৈব-প্রয়োজনের তাগিদকে উপেক্ষা ক'রে, জীবনের মূল্যকে তুচ্ছ ক'রে। চারিদিকে নিঃসীম নিরাত্ম প্রকৃতির অন্ধ শাসন, অসংখ্য ও অটল তার নিয়মকানুন তার রীতিনীতি,—সেই বিরাট শক্তির চরণে প্রণত আমরা নগণ্য মনুষ্যকীটরা কোনো গতিকে বেঁচে বর্ত্তে থাকব, অথবা বাঁচবার নিদারুণ সংগ্রামে ম'রে মিটে নিঃশেষ হয়ে যাব,—এই তো আমাদের জৈবধর্ম্মকৃত বিধান। সে বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রকৃতির অপরিসীম রাজত্বে আমরাই রাজদ্রোহী। আমাদের কাছে বাস্তবের চেয়ে আদর্শের প্রেরণা প্রবল, অবস্থাবিশেষে জীবনের চেয়ে মৃত্যু বরণীয়।

কোনো জিনিষের মূল্য স্বাশ্রয়ী কি পরাশ্রয়ী, এটা অবশ্য ন্যায়-শাস্ত্রের আইনগত যুক্তিতর্কের দোহাই পেড়ে প্রমাণ করবার উপায়

নেই। ব্যক্তিভেদে রুচিভেদে সিদ্ধান্ত ভিন্ন হতে পারে বইকি। যদি সংস্কারমুক্ত পক্ষপাতশূন্য চিত্তে কোনো বিষয়ে সম্যক বিবেচনা ক'রে আমার মনে হয় যে তার মূল্য চরম, কিম্বা চরম নয়, তা'হলে সে বিষয়ে সেইটা আমার পক্ষে শেষ কথা। এ-সূত্রে মূল্য বিষয়গত কি বিষয়ীগত, সে-চিরন্তন দার্শনিক উৎপাত টেনে এনে প্রবন্ধকে অযথা পারিভাষিক ও পীড়াদায়ক করা আমার অভিপ্রায় নয়। এইটুকু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে মূল্যের বিচার ব্যক্তিগত, সর্ব্বসম্মতিগত নয়। এমন একটি সুস্পষ্ট স্বীকৃতি চোখের সামনে থাকতে, সৌন্দর্য্যের মূল্য চরম কি না বিচার করতে যাওয়া হয় বদ্ধ পাগল নয় বিশুদ্ধ দার্শনিকের কর্ম্ম—এ-সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক। তবে সে-উভয়সঙ্কট বাঁচিয়েও কয়েকজন বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিকের মতামত আলোচনা ক'রে দেখানো যেতে পারে যে সৌন্দর্য্যের যে-ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তাঁরা করেছেন তাতে তার মূল্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। প্লেটো টল্‌ষ্টয় অথবা কাণ্ট্, হেগেল প্রভৃতি অবশ্য প্রকাশ্যতই সৌন্দর্য্যকে পরাশ্রয়ী ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, এবং সত্যান্বেষণের কিম্বা শ্রেয়সাধনের অঙ্গরূপেই তার মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন। এঁদের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক, কিন্তু এ সি ব্র্যাড্‌লি বা মোর্‌র মতো ঐকান্তিক সৌন্দর্য্য-স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও যে তাঁদের লেখায় সে-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছেন, এমন কথা বলা চলে না।

ব্র্যাড্‌লি তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধে কাব্যকে অনন্যাধীন প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন যে তার মূল্য তো অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়ই, বরঞ্চ কোনো কাব্যেতর মূল্যের আমেজ ঘটলে তার স্বকীয় মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাঠকের একাগ্র কাব্যরসবোধের তন্ময়তা ভেঙ্গে যায়। অথচ, এই প্রবন্ধেরই শেষ পৃষ্ঠায়, আত্মবিরোধের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, তিনি লিখেছেন যে কাব্যের তাৎপর্য্য তার প্রকাশ্য রূপে নয়, সে-রূপের অতীত কোনো এক বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনায়। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রই একটি রহস্য-নিবিড় ইঙ্গিতের স্পর্শে অনুপ্রাণিত। তার বিষয় হয়তো অতি সামান্য—"আকন্দ ফুল", কি "বলাকা" পাখী, কি পাঠশালা-পলাতক "ছেলেটা", কিন্তু সেই তুচ্ছ সামান্যতায় কবি

দেখতে পায় অমরাবতীর ছায়া। এ ধরণের কথা আমরা হেগেল এবং তাঁর শিষ্যবর্গের মুখে শুনতেই অভ্যস্ত। তাঁরাই তো ইন্দ্রিয়গম্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভার দিয়েছেন শিল্পীর উপর। তবে হেগেল গোড়া থেকেই এবং খোলাখুলি ভাবেই সৌন্দর্য্যবোধকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের মার্গ ব'লে গণ্য করেছেন। অবশ্য প্রথম মার্গ মাত্র। ধর্ম্ম-সাধনা ও দর্শন হল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ। সৌন্দর্য্যানুভূতিতে যে-পরম সত্তার সুদূর ইঙ্গিতটি কেবল পাওয়া যায়, দর্শনে তার পরিপূর্ণ ও অনাবৃত প্রকাশ। দর্শনকে নিয়ে এতখানি বাড়াবাড়ি হয়তো ব্র্যাড্‌লির কাছে আত্মস্তুতি ব'লে ঠেকবে, কিন্তু গোড়ার কথা যখন দু'জনের এক তখন ব্র্যাড্‌লি সৌন্দর্য্যকে সত্যাশ্রয়ী বলতে কুণ্ঠা বোধ ক'রে অকারণে দলভ্রষ্ট হয়েছেন। বিশেষত যখন প্রসঙ্গক্রমে তিনি এক জায়গায় কবুল ক'রেই নিয়েছেন যে কাব্যের এই যে স্বাতিক্রমণশীল নির্দ্দেশ, পরমার্থ-লোকের সূচনা—এর উপরই তার মূল্যের অনেকখানি নির্ভর করে।

সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের যে-অক্রিয় উপলব্ধিগত স্বরূপ সচরাচর বিবেচনায় আসে, তার চেয়ে তার সক্রিয় প্রবর্ত্তনাগত দিকটাকে রিচার্ড্‌স্ মূল্য-বিচারের পক্ষে অধিকতর প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন। বহির্জ্জগতের কোনো বস্তুর অভিঘাতে যখন আমাদের মনে তার বোধ জন্মায়,তখন সেই সঙ্গে কতকগুলো উন্মুখীন ও বিমুখীন প্রবর্ত্তনারও (appetitive and aversive impulses) উদ্রেক হয়। সে-প্রবর্ত্তনাগুলির মধ্যে সাধারণত কোনো ঐক্য থাকে না, প্রত্যেকটি উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী ভাবে নিজের তৃপ্তি খোঁজে। অভিজ্ঞতার এই অরাজকতা স্বভাবতই পীড়াদায়ক। সৌন্দর্য্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য রিচার্ড্‌স্-এর কাছে এই যে তার আনুষঙ্গিক প্রবর্ত্তনাসমূহ অন্তর্বিরোধে বিক্ষুব্ধ নয়, তারা যে-সমাহিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার সৃষ্টি করে তা' একটি নিবিড় অক্ষণভঙ্গুর শান্তির বাহন। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মূল্য এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আর্ট ও ধর্ম্মনীতির সম্বন্ধ আর পরোক্ষ থাকে না। নির্বিরোধ আত্মসমাহিতি যে চরিত্রোৎকর্ষেরই পরিপূর্ণতা, এমন কথা ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে বিরল নয়; প্লেটো তো স্পষ্টই বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান পুরুষ সেই যার মনের অভিমুখীনতা বহুধা-

বিভক্ত নয়, যার বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিবিড় সংযোগ ও সহকারিতা। পরিপূর্ণ সমন্বয় ম্যাথিউ আর্নল্ডের আদর্শ; আর্টের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু প্রবর্ত্তনাগত সংহতি, তা' হলে সুন্দরকে শ্রেয়ের আংশিক বিকাশ মনে করাতে আপত্তি হতে পারে না।

রিচার্ড্‌স্-এর প্রায় বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন ফরাসী সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক শার্ল্ মোর্। তাঁর বিশ্বাস যে সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য প্রবর্ত্তনার সমন্বয় নয়, প্রবর্ত্তনার বিরতি। আমাদের আটপৌরে জীবনে প্রাণধর্ম্মের অনুশাসনই সব চেয়ে প্রবল, সেই জন্য প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে আমরা দেখি উদ্বর্ত্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে। অভিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যবহারিক দিকটাই সর্ব্বপ্রধান হয়ে ওঠে, আমরা জানতে চাই তার সঙ্গে আমাদের লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধ কেমনতরো, চেষ্টা করি তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং তাকে জৈবপ্রয়োজন-সিদ্ধির কাজে লাগিয়ে নিতে। প্রাণধর্ম্মের এই আধিপত্য থেকে অব্যাহতি দেয় শিল্পী। তার রচনার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই, প্রয়োজন-সিদ্ধির দিক থেকে তার কোনোই সার্থকতা নেই। তাকে আমরা দেখি বিশুদ্ধ প্রয়োজনমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে। আর্টের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিষয় কী তাতে কিছু এসে যায় না, অভিজ্ঞতার ভঙ্গিটাই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। যদি ষ্টল্‌ষ্টয়ের কথা মেনে নেওয়া যায় যে আর্ট বিশেষরূপে হৃদয়াবেগেরই বাহন, তা হলেও মোর্ বলতে পারেন যে প্রকৃত রসানুভূতি তখনই ঘটে যখন সে-হৃদয়াবেগ আমাদের সম্ভোগের বিষয় না হয়ে, নৈর্ব্যক্তিক নির্ব্বিকার ধ্যান-দৃষ্টির বিষয় হয়। সে-শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ যাতে স্রষ্টার মন আবেগ ও সংরাগে অভিভূত হয়ে যায়, তার অন্তর্দর্শনের অপার্থিব স্ফটিক-স্বচ্ছতা স্নায়বিক চাঞ্চল্যের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়। মোর্'র এই মতবাদের উপর আরিষ্টট্‌ল্-এর সুবিদিত ক্যাথার্সিস্-তত্ত্বের ছায়াপাত নিঃসন্দেহ। অবশ্য তিনি ট্র্যাজেডির যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তার যদি সোজাসুজি এই অর্থ করা হয় যে প্রেক্ষাগৃহে ভয় ও করুণার উদ্রেক ক'রে ঐ আবেগদ্বয়ের ভারলাঘব ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য, তা হলে পুরাতত্ত্বের পরিধির বাইরে এর অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আবেগ

জিনিষটা এমন নয় যে হাত খুঁলে খরচ ক'রে দিলেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ তলায় এসে ঠেকবে, বরঞ্চ আবেগের পুনঃ পুনঃ উদ্রেকে আবেগ-প্রবণতা বাড়বারই কথা। তবু যে সে-ঐতিহাসিক সংস্কার প্রভাব আজও দুর্নিরীক্ষ্য নয় তার কারণ হেগেলের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা। হেগেল মনে করেন যে ট্র্যাজেডি আবেগের অভিভূতি থেকে আমাদের মুক্তি দেয় বটে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে তার নিষ্কাশন ক'রে নয়, একটি অপরিচিত দৃষ্টিকোণ থেকে তার পরিচয় সাধন ক'রে। বাস্তব জীবনে আবেগ আসে তার আটপৌরে রূঢ় মূর্ত্তিতে, ফলাফলের অসংখ্য জঞ্জালে আচ্ছন্ন হয়ে। ট্র্যাজেডির অবস্থিতি কল্পনার অন্তরীক্ষে ব'লে তার আনুষঙ্গিক আবেগও বস্তুজগতের রূঢ় স্পর্শের অতীত, আমরা তাতে অভিভূত হই না, অনাবিষ্ট ধ্যানসৌম্য চিত্তে তার নির্ব্বিকার রূপ অবলোকন করি। আরো ব্যাপক ভাবে সমগ্র আর্টের ক্ষেত্রে এই কথারই দ্বিরুক্তি করেছেন মোর্। কিন্তু এই যদি আর্টের সার্থকতা হয়, তা হলে রিচার্ড্স্-এর মতো মোর্কেও মর্য়ালিটির প্রাধান্য মানতে হবে। হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই মোহমুক্ত অন্তর্দর্শনজাত পরিচয় যে চরিত্রোৎকর্ষ-সাধনের একটি অপরিহার্য্য স্তর, এ-কথা নীতিকারেরা সর্ব্বত্রই স্বীকার করেছেন। প্রাচ্যের ধর্ম্মনীতির চরম বাণী হচ্ছে আত্মানং বিদ্ধি; পাশ্চাত্য নীতিবিশারদের আদি গুরু সক্রেটিস্ তাঁর সমস্ত তর্কবিতর্ককে সংহত করেছেন know thyself—এই ক্ষুদ্র বাক্যটিতে। মোর্ রসানুভূতিকে আত্মজ্ঞানে পরিণত করেছেন, অথচ সুন্দরকে শ্রেয়ের অঙ্গীভূত করতে অনিচ্ছুক। এ-অনিচ্ছার মূলে কোনো যুক্তি নেই।

সৌন্দর্য্যের শুচিতা বাঁচাতে গিয়ে কেউ কেউ তার মূল্যকে এমনই অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিয়েছেন যে জীবনের পরম সাধনার ক্ষেত্র থেকে তার বিচ্যুতি অনিবার্য্য। এঁদের কাছে শিল্প-সৃষ্টির চরম সার্থকতা হচ্ছে শিল্প-উপাদানের উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব ফুটিয়ে তোলাতে। বিভিন্ন চারু-শিল্পে যে-বিশেষ উপাদানের আবশ্যক, যার মধ্যস্থতায় তার রূপায়ণ সম্ভব হয়,—যেমন ভাস্কর্য্যে পাথর, চিত্রকলায় বর্ণ ও রেখা, কাব্যে ধ্বনি ও কল্পচ্ছবি—সেইটাকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে এনে তাকে যদৃচ্ছাক্রমে

ব্যবহার ক'রে শিল্পী দেখিয়ে দেয় যে তার জড়-ধর্ম্মের বাধা কত তুচ্ছ, তার উপর মনের একাধিপত্য কত অপরিসীম। এই মনোবৃত্তিটা না কি আমাদের দেশের কলাসৃষ্টিতেই সব চেয়ে প্রকাশমান; এবং, একজন কলাতত্ত্ববিদের মতে, এর উৎপত্তি যোগসাধনার ব্যভিচারে। প্রাণায়াম আসন প্রভৃতি শারীরিক অনুশীলনের আদি উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ছিল। কিন্তু কালক্রমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্তির সঙ্গে তার বিকৃতিও অনিবার্য্যরূপে এসে পড়ল; দেখা গেল যে ষান্মাসিক উপবাস থেকে বিষপান পর্য্যন্ত যত সব দুর্ঘট ব্যাপার ঘটিয়েই যোগীরা পরম তৃপ্তি পেতে লাগলেন। যোগের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল শরীরকে সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ক'রে তার দ্বারা সর্ব্ববিধ অসাধ্য সাধন। এরই অনু-প্রেরণায় শিল্পীরাও পাথরে রঙে রেখায় আপন অফুরন্ত শক্তির লীলা দেখানোকেই চরম জ্ঞান করলেন। উপাদানের মার্ফতে শক্তির অবাধ বিকাশের নামই টেক্‌নীক। আর্টকে টেক্‌নীক-সর্ব্বস্ব করলে সত্য বা শ্রেয়কে তার এলেকা থেকে দূরে রাখা হয় বটে, কিন্তু এ যে ঠক বাছতে গাঁ উজার ক'রে দেওয়া। টেক্‌নীকের দ্বারা যদি কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করা না হয়, টেকনীক্‌কারের চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শনই তার শেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তো পাভ্‌লোভার নৃত্যের চেয়ে সার্কাসে তারের উপর যে নৃত্য দেখানো হয় সেটারই মূল্য বেশী, কারণ তাতেই অধিকতর শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রকাশ। পাভ্‌লোভার নাচের কদর নিশ্চয়ই এ জন্যে নয় যে অঙ্গচালনায় তার কৃতিত্ব অন্য সকলের চেয়ে বেশী। উঁচু দরের আর্টিষ্ট্ হতে গেলে উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্ অপরিহার্য্য, কিন্তু টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করলেই বড় আর্টিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য নয়। অন্তত ইতিহাসে তার প্রমাণাভাব।

সৌন্দর্য্যের মূল্য স্বাশ্রয়ী হোক আর নাই হোক, সত্য ও শ্রেয়ের সঙ্গে সুন্দরকেও চরম মূল্যের মধ্যে গণ্য করাই সাধারণ রীতি। আমাদের জীবনের অনেকখানি শক্তি ও সুযোগ চ'লে যায় কেবলমাত্র জীবন ধারণের নিরন্তর সংগ্রামে, যেটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকে তার বিকাশের যে তিনটি সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র—বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি ও শিল্পসৃষ্টি—তাদের লক্ষ্য-

রূপেই সত্য শ্রেয় ও সুন্দরকে চরম আদর্শ ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে রিলীজন নামক বস্তুটা এতখানি জায়গা জুড়ে আছে যে তার বিশিষ্ট সাধনার বিষয়কে মূল্য নির্দ্ধারণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কেমন যেন আশ্চর্য্য ঠেকে। রিলীজন-পন্থীরা অবশ্য বলবেন যে ঈশ্বরের সত্তা সমস্ত মূল্যের বহু উর্দ্ধে; কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন ও প্রমাণ মূল্য-বোধের সংরক্ষকরূপে। প্রকৃতির অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতার রথচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে আমাদের সমস্ত আদর্শ যাতে ধূলায় বিকীর্ণ না হয়ে যায় সেজন্যে দরকার এমন এক শক্তির যে প্রকৃতির নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করবে আমাদের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে, আমাদের সাধনাকে নির্ব্বিঘ্ন করতে। হতে পারে যে এই জন্যেই ঈশ্বরকে চতুর্থ মূল্যরূপে গণ্য করা হয় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্য তিনটি মূল্য থেকে আদৌ পৃথক নয়। সংস্কৃতির আদিপর্ব্বে যখন আমাদের মূল্যজ্ঞান সবেমাত্র জেগেছে, যখন সমাজ-জীবন এত প্রাথমিক ছিল যে বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের এবং আর্টের সঙ্গে ধর্ম্মনীতির প্রভেদ পরিস্ফুট হয় নি, মানব মনের সেই শৈশবাবস্থায় তার সমস্ত ঊর্দ্ধপ্রয়াস অগত্যা আবদ্ধ ছিল একটিমাত্র অনির্দ্দিষ্ট অসংজ্ঞাত পথে ও লক্ষ্যে—রিলীজন ও ঈশ্বর। কিন্তু বিবর্ত্তনের গতি নির্বিভাগ থেকে বিভাগের দিকে। ক্রমশ মানুষের মন বিশ্লেষণক্ষম হয়ে এল, তার কর্ম্ম ও চিন্তার ধারা ভেঙ্গে পড়ল বহু শাখায় প্রশাখায়। "রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণ" থেকে ঈশ্বরের উপাসনা এল মুক্ত পৃথিবীতে, এল বিজ্ঞানে শিল্পরচনায় সর্ব্বমানবের কল্যাণ-কামনায়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সিল্‌ভ্যাঁ লেভি

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি গত ৬ই নবেম্বর কোন এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার সময় হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি ১৮৬৩ সালে পারিসে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল প্রথমে সোরবোনে ও পরে কলেজ্ দ' ফ্রান্সে সংস্কৃতভাষা ও ভারতীয় কৃষ্টির অধ্যাপক ছিলেন। এ দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় তিনবার ঘটেছিল—প্রথম ১৮৯৭-৯৮ সালে যখন তিনি নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য নেপালে কিছুকাল অতিবাহিত করেন, দ্বিতীয়বার ১৯২১-২২ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্ব-ভারতীতে এক বৎসর অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকটী বক্তৃতা দেন, শেষবার ১৯২৯ সালে তিনি জাপান হ'তে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে এদেশে আসেন।

এদেশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী না হ'লেও লেভির নাম এদেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট সুপরিচিত। তার কারণ তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে ভারতের পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আর যে সব ভারতীয়েরা হয় ফ্রান্সে না হয় এদেশে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিল তারা সকলেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বহু দেশের ছাত্র তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেছে—সেই শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ ছিল যার ফলে সকলেই তার গুণে আকৃষ্ট হয়েছিল। লেভি ছিলেন স্বভাবকোমল ও স্নেহশীল—তিনি বিদেশী ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন ও সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন—যাতে প্রবাসের কষ্ট লঘু ও বিদেশ স্বদেশে পরিণত হ'ত। লেভির এই সস্নেহ ব্যবহারের জন্য শুধু যে ভারতীয় ছাত্রেরাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত তা' নয়, সুদূর জাপান, চীন, ইন্দোচীন জাভা, শ্যাম, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশের শিষ্যমণ্ডলীই তাঁকে এত ভালবেসে ফেলেছিল যে তাঁর বিদেশযাত্রায় বা কঠিন অসুস্থতায় সকলকেই বিচলিত

হ'য়ে পড়ত। এই শিষ্যমণ্ডলীর জন্য লেভির দরজা সব সময় উন্মুক্ত থাকত আর তা' ছাড়া প্রতি শনিবারে তাঁর বাড়ীতে তারা সকলে সমবেত হ'ত। যাঁরা লেভির প্রাচীন ছাত্র এবং যাঁদের ভিতর দু'একজন লেভির মৃত্যুর পূর্ব্বেই মারা যান (—ইউবের, লুই ফিনো...) তাঁরা সকলে লেভির অধ্যাপনার পঞ্চবিংশতি বৎসরে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন তাতেই তাঁদের শ্রদ্ধার গভীরতার পরিমাপ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই—পল পেলিও, (Paul Pelliot), ফুশে (Foucher), ফিনো (Louis Finot), ইউবের (Ed. Huber), জুল ব্লক (Jules Bloch) মাস্‌পেরো (Henri Maspero) ইত্যাদি সকলেই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত।

ফ্রান্সে লেভি পাণ্ডিত্যের সেই ধারা অনুসরণ করেছিলেন যে ধারার প্রবর্ত্তক ছিলেন ইউজেন বুর্ণুফ (Eugene Burnouf) ও পরিপোষক ছিলেন আবেল বেরগেঞ্জ (Abel Bergaigne) ও এমিল সেনার (E. Senart)। বুর্ণুফের সময় থেকে শতাধিক বৎসর গত হয়েছে—কিন্তু তাঁর কাজের মূল্য এখনো কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। আঁক্‌তিল দু-পেরোঁ (Anquetil du Perron) প্রাচীন ইরাণের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তা উদ্ধার করে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সামনে দিলেন তখন যে সব পণ্ডিত সেই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা ও ভাব নিয়ে আলোচনা করলেন তাঁদের মধ্যে বুর্ণুফ হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয়। বুর্ণুফ তাঁর কঠোর সাধনার দ্বারা আবেস্তার আলোচনায় পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের পথপ্রদর্শক হ'লেন—তাই তাঁর গ্রন্থ ১৮৩৩-৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এখনো সমাদরণীয়। কিন্তু বুর্ণুফ ছিলেন কলেজ দ' ফ্রান্সে (College de France) সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাই ১৮৪৩ সালের পর তিনি আবেস্তার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনা সুরু করেন। তখন নেপাল থেকে হজসন (Hodgson) ইউরোপে বহু সংস্কৃত পুঁথিপত্র পাঠিয়েছেন। এই সব পুঁথির সাহায্যে বুর্ণুফ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন—Introduction a l'histoire du Bouddhisme Indien সে গ্রন্থেও রয়েছে নূতন পথের পরিচয়। এই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে যথাসম্ভব মাঞ্চু, মঙ্গোল,

তিব্বতী ও চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্যের তুলনা করে তিনি বৌদ্ধসাহিত্যের যে খসড়া দিলেন তা'কে আমরা এখনো উপেক্ষা করতে পারিনে।

বুর্ণুফের কথা তুলবার কারণ এই যে তিনিই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাপকতা সম্বন্ধে অবধানচিত্ত হয়েছিলেন, আর তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে সে কৃষ্টির প্রাচীন ইতিহাস কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধার হ'তে পারে না। বুর্ণুফের পর ফ্রান্সে যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় পথপ্রদর্শক হলেন তাঁর নাম হচ্ছে আবেল বেরগেঞ্জ (Abel Bergaigne)। আবেস্তার আলোচনায় বুর্ণুফের যে স্থান বৈদিক গবেষণায় বেরগেঞ্জেরও সেই স্থান। ইউরোপে তাঁর পূর্ব্বে যাঁরা বেদ বা বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা কেহই ঠিক পথ খুঁজে পান নি। বেদের অর্থ নির্ণয়ে তাঁরা অনেক স্থলেই হয় সায়ণভাষ্যের ন্যায় পরবর্ত্তী সাহিত্যের না হয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—সেই জন্য প্রায়ই তাঁরা একই শব্দের নানা অর্থ নির্দ্ধারণ করে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বেরগেঞ্জ প্রথম দেখাতে চেষ্টা করলেন যে বৈদিক ভাষার সাহায্যেই বেদের অর্থ নির্ণয় না করলে তার কদর্থ করা হবে কারণ পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রকারেরা বেদের সঠিক অর্থ ভুলে গেছেন। বেরগেঞ্জের নির্ণিত অর্থ সব সময়ে গ্রাহ্য না হলেও তিনি ঋগ্বেদের নানা মণ্ডলের তুলনামূলক বিচার করে—মণ্ডলগুলির যে পারম্পর্য্য নির্ণয় করলেন ও তাঁর বিরাট গ্রন্থ—La Religion vedique d' apres les hymnes du Rigveda এ বৈদিক দেবতাদের যে স্বরূপ নির্দ্ধারণ করলেন তা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তা ছাড়া বৈদিক interpretation এ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করলেন তা পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের অনুসরণীয় হ'ল। বেরগেঞ্জ ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখে আল্পসের হিমানী গহ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, কিন্তু বৈদিক গবেষণা ও বৃহত্তর ভারত, বিশেষ করে চম্পার প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্যে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বেরগেঙ্গের কথা উত্থাপন করতে হ'ল তার কারণ লেভি হচ্ছেন বেরগেঙ্গের শিষ্য আর লেভি নিজেই চেয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যদি কেউ চার লাইন লিখ্‌তে চায় তার ভিতর অন্ততঃ তিন লাইন যেন বেরগেঙ্গের সম্বন্ধে লেখা হয়। বেরগেঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণে লেভিকে পরামর্শ দেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রেনাঁ (Ernest Renan)। লেভি যে সে শিষ্যত্বের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। বুর্ণুফ ও বেরগেঙ্গের প্রভাবে লেভির প্রতিভা বহুমুখী হয়ে উঠেছিল—বুর্ণুফের প্রভাবে তার দৃষ্টি ব্যাপকতা ও বেরগেঙ্গের শিক্ষায় তীক্ষ্ণতা লাভ করেছিল।

যে সব পণ্ডিত ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করেছেন লেভি তা'দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার কারণ এ নয় যে তিনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা জান্‌তেন, কিন্তু সে ভাষায় তাঁর চাইতেও বড় পণ্ডিত জন্মেছেন। তিনি চীনা ও তিব্বতী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু তাই বলে তাঁকে Sinologist অথবা Tibetanist বলা চলে না। মধ্য এশিয়ার ছিন্ন পুঁথিপত্র থেকে তিনি লুপ্ত ভাষার উদ্ধার সাধন করেছিলেন—কিন্তু সে কাজে অন্যান্য পণ্ডিতও আত্মনিয়োগ করেছেন। লেভির পাণ্ডিত্যে বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর মধ্যে এই সমস্ত বিদ্যার একত্র সমাবেশ হয়েছিল—আর সেই সমস্ত বিদ্যাকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকল্পে।

লেভি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্য হ'তে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা নাই বল্‌লেই চলে, কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের রচনার কাল সঠিক নির্দ্দেশ করবার মত উপাদান সে সাহিত্যে নাই, শিলালিপি বা প্রাচীন মুদ্রা থেকে রাজাদের নাম পাওয়া যায়, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান তা থেকে কিছু সংগৃহীত হতে পারে, কিন্তু দেশের বা জাতির সত্যকার ইতিহাস সে উপাদানের সাহায্যে অঙ্কিত হ'তে পারে না। তা ছাড়া, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়েছে, বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শুধু চীনা ও

তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যেতে পারে। এ সব কারণে লেভির দৃষ্টি প্রথম থেকেই চীনা ও তিব্বতী সাহিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

লেভির প্রথম বই Le Theatre Indien ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে তিনি প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ও নাটকের ক্রমবিকাশের আলোচনা করেন। তাঁর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বিন্দিশ (Windisch) দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গ্রীক প্রভাবেই হচ্ছে ভারতীয় নাটকের জন্ম। লেভি এ মতবাদ খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে যে-মনোবৃত্তি থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম সে হচ্ছে ধর্ম্মভাব—আর সে হিসাবে ভারতীয় নাটক তার স্বকীয়তা বরাবর রক্ষা করেছে। Le Theatre Indien প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লেখা হলেও এখনো যে সে বই তার শ্রেষ্ঠত্ব হারায় নি তার সাক্ষ্য সম্প্রতি কিথ (Keith) তাঁর নূতন Indian Drama গ্রন্থে দিয়েছেন। লেভির এ বই পড়তে সকলেরই ভাল লাগে তার কারণ লেভির লেখা হচ্ছে সরস—যে গুণ সাধারণত এ জাতীয় লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। ষ্টাইল হিসাবে লেভি রেনাঁর শিষ্য; সুতরাং ইতিহাস বা আলোচনামূলক প্রবন্ধে রচনারীতিতে লেভি বরাবর রেনাঁর আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

Le Theatre Indien লিখবার পর নেপালের ইতিহাস Le Nepal ছাড়া লেভি আর কোন সত্যকার বই লেখেন নি। তাঁর সম্বন্ধে বেরগেঙ্গের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে—বেরগেঙ্গ তাঁকে বলেছিলেন যে "লেভি তুমি যদি বই লিখ্‌তে চাও তাহলে ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তা লিখে ফেল—পরে আর বই লিখতে পারবে না"। Le Theatre Indien লেখা শেষ হয় যখন লেভির বয়স ২৪ বৎসর।

নূতন বই না লিখতে পারবার কারণ এই যে ভারতীয় কৃষ্টির প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এত নূতন সমস্যা ও ঐতিহাসিক উপাদানের এত অভাব যে সে সব সমস্যার সমাধান না করলে ও নানা দিক থেকে উপাদান সংগ্রহ না করতে পারলে কোন বই লেখার চেষ্টা বিফল হ'তে বাধ্য। আর সেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা কি কষ্টসাধ্য তা' লেভির নিজের কথাতেই বলা ভাল—From the Mediterranean to the

Pacific ocean nations near and far gather round India and bring together converging rays to shine upon the voiceless night of her past. The picture that emerges is not, to be sure, as clear and complete as we could wish ; too often the documents say nothing or break off just at the moment when curiosity is on the track ; too often besides the portions upon which light is thrown give us minute details which by their seeming insignificance weary and discourage the student.

এই কষ্টসাধ্য কাজেই লেভি তাঁর সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রথম গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারত ও ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির আলোচনা করেন—এই আলোচনার ফল তিনি তাঁর লাতিন ভাষায় লিখিত বই—Quid de Graecis veterum indorum monumenta tradiderint (1890) ও অন্যান্য প্রবন্ধে—La Grece et l' Inde d'apres les monuments, 1891, Le Bouddhusime et les grecs 1891... লিপিবদ্ধ করেন। এই সব প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের ইতিবৃত্ত অঙ্কন ও পাণিনীয় সূত্রে উল্লিখিত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নানা জাতির সম্বন্ধে সমসাময়িক গ্রীক সাহিত্যে যে সব সংবাদ পাওয়া যায় তার তুলনামূলক বিচার করেন। তাঁর মতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ঢেউ গ্রীস পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল ও খৃষ্টধর্ম্ম খুব সম্ভব তার কিছু প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

লেভির মতে বৌদ্ধধর্ম্ম হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি জাতীয় কৃষ্টি, তা' বরাবর ভারতের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছে আর সেই উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা অটুট রাখবার জন্য বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি, সমাজ নিয়ন্ত্রণে, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে, ভাষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে ঐক্য আনবার চেষ্টা। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করে বিজাতীয়দের ভারতের অঙ্কে স্থান

দিয়েছে আর ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তা বিদেশে বিলিয়েছে। এশিয়াখণ্ডের নানাজাতি এক সময়ে এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সভ্যতার গণ্ডীতে উন্নীত হয়ে ভারতের অনেক অধুনালুপ্ত রত্ন সযত্নে রক্ষা করেছে। সুতরাং বিশ্বমানবিকতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের চাইতে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান উচ্চে।

লেভি এই মনোবৃত্তি পোষণ করতেন বলে বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই ইতিহাসের আলোচনায় তিনি প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাচীনতম বৌদ্ধ-সাহিত্য এখন লুপ্ত। সে সাহিত্য লেখা হয়েছিল মগধের ভাষায় যে ভাষায় বুদ্ধদেব নিজে ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী এই নূতন ধর্ম্ম-প্রচার করেছিলেন। ধর্ম্ম যখন প্রসার লাভ করল ও পশ্চিম ভারতে—অবন্তী, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই সেই দেশের ভাষায় নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল, পশ্চিম ভারতে পালিভাষায় ও কাশ্মীরে সংস্কৃতে। এই দুই নূতন সাহিত্য যে প্রাচীন মাগধী সাহিত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে তার প্রমাণ হচ্ছে—প্রথম, ঐ দুই নূতন সাহিত্যের ভাষা মাগধী না হ'লেও তাদের উপর মাগধীর সুস্পষ্ট ছাপ ধরা যায়, দ্বিতীয়, ঐ দুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রায়শই তারা এক মূল সাহিত্যের অনুবর্ত্তী। সুতরাং পালি এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য উভয়েই অর্ব্বাচীন, মূল প্রাচীন সাহিত্য তার রূপ হারিয়ে তাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য আমরা আংশিকভাবে পাই নেপাল ও মধ্যএশিয়ার পুঁথিপত্রে এবং চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে।

বৌদ্ধ দর্শনের দু'টী প্রধান সম্প্রদায় যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পূর্ব্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুই দর্শনের মূলগ্রন্থের উদ্ধারের জন্যও আমরা লেভির নিকট ঋণী। যোগাচারের মূল গ্রন্থ অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার ও বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠাতা বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির পুঁথি লেভি নেপাল থেকে উদ্ধার করেন ও তাদের তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ ও টীকাটিপ্পনীর সঙ্গে তুলনা করে ঐ দুই দার্শনিক মতবাদের আলোচনার প্রধান ভিত্তি স্থাপন করেন।

মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও লেভি Pelliot ও Stein-এর আবিষ্কৃত পুঁথিপত্র ও চীনা বৌদ্ধসাহিত্যের থেকে বহু উপাদান সঙ্কলন করেন। ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে Paul Pelliot প্রায় তিন বৎসর (১৯০৮-১৯১১) মধ্যএশিয়ার নানাস্থানে অনুসন্ধান চালান। তিনি যে সব পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন তার মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন লিপিতে লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধারের ভার পড়ে লেভির উপর। এই সব পুঁথির মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যের খণ্ডিত পুঁথির পাঠোদ্ধার করবার সময় লেভির দৃষ্টি এক নূতন ও লুপ্ত ভাষায় লিখিত পুঁথির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধার যত সহজে সম্ভব হয় তার অর্থবোধ ততটা সহজসাধ্য ছিল না। এই পুঁথির মধ্যে কতকগুলি ছিল দ্বৈভাষিক অর্থাৎ সংস্কৃত সূত্র ও তার এই অজ্ঞাত ভাষায় অনুবাদ। তা ছাড়া অন্যান্য পুঁথিগুলির চীনা অনুবাদও লেভি খুঁজে বের করলেন। এই সব উপাদানের সাহায্যে লেভি এই লুপ্ত ও অজ্ঞাত ভাষার পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করলেন। এ ভাষা ছিল মধ্যএশিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত কুচা প্রদেশের ভাষা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও এশিয়া খণ্ডের একমাত্র কেন্টুম ভাষা—অর্থাৎ সে ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সেই শাখা থেকে উদ্ভূত যা' থেকে গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু সে ভাষার উদ্ধার সাধন করেই লেভি নিশ্চেষ্ট রইলেন না—চীনা ও মধ্যএশিয়ার সাহিত্য থেকে তিনি প্রাচীন কুচা ও কুচীয় জাতির ইতিহাস উদ্ধার করলেন। এই জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় কৃষ্টি বহু পরিমাণে গ্রহণ করেছিল, ও তার প্রসারে সহায়তা করেছিল। সুতরাং প্রাচীন কুচার অধুনালুপ্ত ভাষা, কুচার প্রাচীন ইতিহাস ও সে দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধেও আমরা লেভির নিকট ঋণী।

সারাজীবন ধরে লেভি যে কাজ করেছেন তার ফলাফল অধস্তনেরা ভোগ করবে। তিনি শতাধিক প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাসের সব চাইতে অজ্ঞাত কোণগুলির উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন, ভারতের কৃষ্টির বিদেশে প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় ও

বৈদেশিক সাহিত্য থেকে বহু নূতন উপাদান সংগ্রহ করেছেন ও নূতন আলোচনার জন্য পথ নির্দ্দেশ করেছেন। সে সব পথ অনুসরণ করে আরও নূতন তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসের পূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব হ'বে হয়ত বর্ত্তমান যুগে—তা' লেভির যুগে সম্ভব না হলেও লেভির নাম সেখানে অমর হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে লেভির পরিকল্পনা ছিল বিরাট। ভারতের ইতিহাস তার বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সে ইতিহাসে স্থান থাকা চাই—ইন্দোচীন, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের। সে সব দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল বলেই যে ভারতের ইতিহাসে তা'দের স্থান থাকবে তা' নয়, ভারতীয় সভ্যতা তার বিচিত্ররূপে বৈদেশিক জাতিকে সভ্যতার কোঠায় তুলেছে—সুতরাং রূপের সে বিচিত্রতাকে অঙ্কিত না করলে ভারতের ইতিহাস হবে কঙ্কালসার। এ পর্য্যন্ত ভারতের যে সব তথাকথিত ইতিহাস লেখা হয়েছে সে ইতিহাস হচ্ছে রাজনৈতিক—কিন্তু সত্যকার ইতিহাস অঙ্কিত করতে হ'লে দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির ক্রমবিকাশ উপেক্ষা করা চলে না।

বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক আশা ভরসা সম্বন্ধে লেভির মতামত জানতে আমরা স্বতই কৌতূহলী—তার কারণ তিনি এক হিসাবে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যদি জাতিতে ইংরাজ হতেন তাহলে এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে হয় ত কোন কুণ্ঠা হ'ত না। কিন্তু তিনি ফরাসী বলেই হয় ত এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। তাঁর অন্যান্য লেখায় যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা' থেকে বুঝতে পারি, যে তাঁর মতে আমাদের বর্ত্তমান যুগের যে জাতীয়তা এসেছে তা'র মূলে রয়েছে ইউরোপীয় প্রভাব। প্রাচীন ভারতে কোন জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রাচীন সাম্রাজ্য হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী—ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হচ্ছে স্থায়ী। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে সমস্ত ভারতীয় কৃষ্টিতে একটা ঐক্য এসেছিল—কিন্তু সে ঐক্য থেকে জাতীয়তা আসে নি। আর সেই জাতীয়তার অভাবেই ভারতের রাজনৈতিক

দুর্গতি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতের রূপ বদলেছে এ কথা সত্য—কিন্তু লেভি স্বীকার করেছেন যে সেই প্রভাবে তার দৈন্যও বেড়েছে। পাশ্চত্যের ঢেউ যেখানেই লেগেছে সেখানেই প্রাচ্যজাতি দুর্দশার চরম সীমায় পৌছেছে, নিজের জাতীয় কৃষ্টির সঙ্গে যোগ হারিয়েছে। প্রাচ্য-জাতিসমূহ তাদের এই দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সাবধান হয়েছে ও সেইজন্য প্রতীচ্যের সঙ্গে তার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। প্রাচ্যের আশা ভরসা বুঝে যদি প্রতীচ্য তা'কে পথের অনুসন্ধানে সাহায্য না করে তা হ'লে সেই বিরোধই হ'বে ভবিষ্যতের পক্ষে সর্ব্বনেশে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের বিজাপুরের আমলা সমাজের কত গল্পই ত করলাম। কিন্তু একজনের নাম এতক্ষণ করি নেই এই জন্য যে তাঁকে কখনও আর পাঁচ জনের মত দুদিনের পথের সাথী মনে হয় নেই। প্রথম পরিচয়ের পর হপ্তা খানেক যেতে না যেতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অতি সহজেই আমাদের বড় ভাইবোনের স্থান অধিকার করে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল যতদিন বন্ধু এ জগতে ছিলেন। ১৯০৮ সালের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়ে দুবছরের জন্য আমি বাংলা দেশে চলে এলাম, আর তিনিও গেলেন চলে কোন দূর অজানা দেশে। সব সম্বন্ধ ঘুচে গেল। কিন্তু তার আগের সাতটী বছর তাঁদের দুজনের জন্য কখনও বিদেশকে বিদেশ বলে মনে হয় নেই। কত বার কত জায়গায় তাঁদের সঙ্গে থেকেছি। একবার ত বোম্বাইএ সপরিবারে তিন মাস তাঁদের বাড়ীতে ছিলাম। বিবি সাহেব মেয়েমানুষ, কতকটা সেকেলে, তিনি অতি সহজ ভাবে বড় বোনের মত আদর যত্ন করতেন, কিন্তু আহমদী কখন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে আমার অন্তরে গুরুর স্থান অধিকার করে-ছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারি নেই। একটা কথা নিশ্চিত যে বিজাপুরে দুটী বছর ওই ছোট্ট ইংরেজ সমাজের মাঝে কাটান সত্ত্বেও যে আমার মনুষ্যত্ব উবে যায় নেই সে অনেকটা এই বন্ধুর গুণে। তিনি নিজে ক্লাবের একজন খুব চাঁই ছিলেন। রসিক পুরুষ, কত রকমের গল্প করে লোককে হাসাতে পারতেন। তাঁর হাসি তামাসা গল্প গুজব শুনতে শুনতে ক্লাবে সকলেরই সন্ধ্যাটা আনন্দে কেটে যেত। কিন্তু মানুষটা ত কোনও ক্রমেই হালকা ছিলেন না, তাই এ সব করেও অনায়াসে নিজের ইজ্জৎ, নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবি সাহেব ইংরেজী বলতেন না। ক্লাবেও আসতেন না। সাহেব-মেম বাড়ীতে দেখা করতে গেলে একবার দেখা দিতেন মাত্র। কিন্তু আমার

আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁর কোন পর্দ্দাই ছিল না। কলকাতা হতে আমাদের কেউ বিজাপুর এলে তাঁর রাঁধাবাড়া খাওয়ান দাওয়ানের ধুম লেগে যেত। শেষে এক মজা হল। ছোট জায়গায় এ রকম কি আর চলে। সাহেবরা আস্তে আস্তে টের পেলেন যে বিবি সাহেবের সত্যি কোনও পর্দ্দা নেই। এক আধজন এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা-পড়াও করলেন। দুই বন্ধু পরামর্শ করতে বসে গেলাম, কি করা যায়। একটা খানাপার্টি না দিলে ত চলে না। কিন্তু গিন্নীকে রাজী করা ত সহজ নয়। ঘণ্টা দুই ধরে নানা তর্ক বিতর্ক করে তাঁকে আমরা বোঝালাম যে একটীবার এদের খাইয়ে না দিলে আর চলছে না। তিনি বললেন, "আপনারা খানা দিন না, আমি কি মানা করছি! মুসলমানের মেয়ে আমি টেবিলে বসব না।" বন্ধু হেসে উঠলেন "হ্যাঁ, তুমি মস্ত বড় পর্দ্দা বিবি! দত্তর ভায়েদের সঙ্গে কি করে খাও?" বিবি সাহেব এমন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "ছিঃ! ও কথা মুখে আনবেন না। তারা যে আমার আপন জন", যে বন্ধু তথা আমি লজ্জায় তখনকার মতন চুপ হয়ে গেলাম। পরে দুচার দিন ধরে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে একটীবারের মতন সাহেবদের সাথে খানা খেতে রাজী করা গেল। কিন্তু তিনি কড়া তাকীদ দিলেন যে সাহেব মেমেরা যেন বাড়ী থেকে মদটদ খেয়ে আসে, টেবিলে সরবৎ বই কিছু থাকবে না। তাই হল। আমাদের আমলা সমাজ খুব আনন্দ করে একদিন খেয়ে গেলেন। তাঁরা সত্যিই আহমদীকে ভাল বাসতেন, ও খাতির করতেন। কলেকটর D. বিবি সাহেবকে বলে গেলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন, এজন্য আমরা যথার্থই কৃতজ্ঞ।"

স্বামী স্ত্রী দুজনেই এঁরা কংগ্রেসভক্ত ছিলেন আর দেশকে ভাল বাসতেন অন্তরের থেকে। আমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিন পরে আহমদী একখানা ছবি তুললেন, বিবি সাহেব, আমার স্ত্রী ও একটী পার্শী মেয়ের এক সঙ্গে। বিবি সাহেবের হুকুমে ছবিখানার নীচে লেখা হল "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।" সেই ছবিখানা নিয়ে বিবি সাহেব অনেক দিন ধরে কত Sentimental কথাই যে বলতেন!

এঁদের বিজাপুরের বাড়ীতে এখনকার দুজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একজন পরম শ্রদ্ধেয় দেশনেতা আব্বাস তৈয়বজী সাহেব, আর একজন হায়দরাবাদের প্রবীণ মন্ত্রী আকবর হায়দরী সাহেব। আব্বাস সাহেবের তখন প্রৌঢ় বয়স, কিন্তু কি বিশাল বলিষ্ঠ শরীর! আমরা ত জোয়ান ছিলাম। তবু তাঁর একটা ঘুষো খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ ছিল না। ভদ্রলোক খুব আমুদে, বিজাপুরে যে কদিন ছিলেন, দিবারাত্র হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। বাহিরে থেকে দেখাত যেন একজন সাধারণ বড় ঘরের ছেলে, পয়সা কড়ির অভাব নেই, তাই ভাবনা চিন্তাও নেই। কিন্তু ভেতরে হালকাপনার লেশমাত্র ছিল না। আমার সঙ্গে বেশ ভাল করে আলাপ হয়েছিল। ঐ কদিনের মধ্যেই দুতিন বার আমাকে আলাদা বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেশ সম্বন্ধে, দেশী কর্ম্মচারীর দায়িত্ব সম্বন্ধে, কত উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশ দিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু মোটেই গুরুমহাশয়ের মতন নয়। তাঁর কথা-বার্ত্তা আমার এত ভাল লেগেছিল এইজন্য যে তার পেছনে একটা সরল অথচ জলন্ত দেশাভিমান ছিল। ভদ্রলোক বয়োবৃদ্ধ, উচ্চ কর্ম্মচারী, শিক্ষা দীক্ষা আদব কায়দায় বিলাত ফেরত, জাতে মুসলমান, তাঁর প্রাণে ঐ রকমের দেশপ্রেম দেখে আমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। বন্ধু আহমদীকে বলাতে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও মনে আছে—যত দিন যাবে ততই বুঝতে পারবে যে আব্বাসের মত খাঁটি লোক জগতে খুব কম। পরে আব্বাস সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম যে বন্ধু এক বর্ণও বাড়িয়ে বলেন নেই। একটা কথা মনে করে পরে অনেক হেসেছি যে তখনকার আব্বাস আজকের মতই দেশভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর তখনকার দিনের দেশ-প্রেমকে non-violent কোন ক্রমেই বলা যেত না।

আকবর হায়দরী ছিলেন আহমদীর ভাগ্নে। তিনি তখনকার দিনে কলকাতায় finance বিভাগে বড় চাকরী করতেন। খোশ মেজাজ লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কতকটা চাপা। বেশী কথা কইতেন না। তৈয়বজী পরিবারের অন্য সকলের মত তিনিও খুব কংগ্রেসভক্ত ছিলেন।

মুসলমানদের যে কোনও একটা আলাদা রাষ্ট্রনীতি থাকতে পারে, তা তিনি মোটেই স্বীকার করতেন না। শুধু তাই নয়। কোনও রকম সাম্প্রদায়িক ইস্কুল কলেজকে তিনি চুচক্ষে দেখতে পারতেন না। আলীগড় বেনারস-এর নামে জ্বলে উঠতেন। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ ছিল, তাই দুজনের মাঝে মাঝে বিষম তর্ক লেগে যেত। যখন খুব গরম হয়ে উঠতাম তখন আহমদী হেসে দুজনকেই থামিয়ে দিতেন। হায়দরী আমাকে ঠাট্টার সুরে বলতেন, "এই তুমি দেশকে ভালবাস! মোল্লা আর পুরোহিতগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিতে পার না!" সেদিনের হায়দরী আর এখনকার Sir Akbarএ কত তফাৎ! সময় সময় ভাবি। ভেবে মনে আনন্দ হয় না।

আগেই বলেছি যে বিজাপুর শহরে ভদ্র মুসলমানের বাস বড় একটা ছিল না, তবে, গরীব-গুরবো মুসলমান সহরে ও আশেপাশে অনেক ছিল। তাদের মধ্য থেকে অতি অল্প-সংখ্যক ছেলেই ইস্কুলে পড়তে যেত। যাতে আরও বেশী গরীবের ছেলে হাই ইস্কুলে ঢুকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে হেডমাষ্টার মহাশয় দরিদ্র মুসলমান ছাত্র ভাণ্ডার নামে এক ফণ্ড করলেন। আহমদীর ও আমার এই কাজে প্রথম থেকেই যোগ ছিল। আমরা সহজেই আমলা মহল থেকে মাসিক ষাঁট টাকা চাঁদা তুলে দিতে পারলাম। কিন্তু দরিদ্রের ত নানা বালাই! এক বছর না যেতে যেতেই মুসলমানেরা দুই দল হয়ে গেলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও মিটমাট করতে পারলাম না। এক দল খোট ধরলে যে নিরক্ষর মুসলমান সমাজের প্রধান দরকার মকতব, হাই ইস্কুল নয়। তারা কাউকে কিছু না বলে পুরানো সন্দল মসজিদে এক মকতবের পত্তন করে বসল। কাজেই আমাদের ফণ্ডের টাকা দু ভাগ করে দিতে হল। কালেকটর D. যে কত দূর উদারহৃদয় ছিলেন তা এই থেকে বোঝা যায় যে তিনি এক কথায় তাঁর মাসিক দশ টাকা চাঁদা ডবল করে দিলেন। আমরা সকলে তা করে উঠতে পারি নেই।

সারা জেলাতে মুসলমানের বাস কমই ছিল। তবে এক একটা বড় গ্রামে অনেক ঘর জোলা মুসলমান বাস করত। তাদের বেশীর ভাগ

তখনও জাত ব্যবসা ছাড়ে নেই। এই জোলারা সম্ভবতঃ আগেকার কালে উত্তর ভারত থেকে এসেছিল। খান্দেশ, নাসিক, ঠাণা জেলাতেও অনেক গ্রামে এই রকম হিন্দুস্থানী জোলাদের বসতি দেখেছি। বিজাপুর জেলায় এদের সব চেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল ইলকল। সেখানকার রেশমী সাড়ীর নাম ডাক তখনও খুব। তেমন চমৎকার নরম রেশম, তেমন সুন্দর নানা রঙ্গের চৌখুপী বুনন অন্যত্র বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। এখন সে শিল্পের অবস্থা কি, তা আমি জানি না। সব গ্রামে কিন্তু রেশমী কাপড় হত না। বেশীর ভাগ জোলা রঙ্গীন সুতীর লুগড়ী (দক্ষিণী সাড়ী) বুনে দিন গুজরান করত। সাধারণ লুগড়ীর দাম ছিল এক টাকা। কাজেই কারীগরের মুনাফা খুব বেশী থাকত না। এরা কাপড় বুনত সেই সেকেলে মান্ধাতার আমলের তাঁতে। কোন রকম ঠকঠকি তাঁতের সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল না। জেলায় বয়ন-শিল্পের উন্নতি করার উদ্দেশ্যে আমাদের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড স্থির করলেন যে ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন করতে হবে। নানা তর্ক-বিতর্ক জল্পনা-কল্পনা করে বাঙ্গালা দেশ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আমদানি করা হল। এই expert-এর নাম ছিল সতীশবাবু, পদবী এখন ভুলে গেছি। ইনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন একজন ফরাসডাঙ্গার বাঙ্গালী তাঁতি। শহরের মাঝখানে এক লম্বা চালাতে সতীশবাবু তাঁর ঠকঠকি তাঁত দুখানা বসালেন। হাকীমেরা আপন আপন তহসীলের জোলাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন সদরে এসে নূতন তাঁত দেখে যেতে। আমার মহকুমাতে চড়চন বলে এক বিখ্যাত জোলা গ্রাম ছিল। আমি উৎসাহের আতিশয্যে স্বয়ং সেখানে গিয়ে জনা দুই বুড়ো সরদারকে ধরে নিয়ে এলাম। কিন্তু এতেও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। জোলারা একজন দুজন করে এসে নূতন তাঁত দেখে চলে যেতে লাগল, কিন্তু fly-shuttle কেউ কিনতে চাইলে না, শিখতেও চাইলে না। আহমদী ও আমি জেলার নানা জায়গায় ঘুরে বক্তৃতাদি করে এলাম, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। বুড়োদের মুখে সেই পুরানো গজগজানি, ও তাঁতে কোন সুবিধা নেই, জোরে ত চালান যাবে না, জোরে চালালেই সুতো ছিঁড়ে যাবে, ইত্যাদি।

শেষে সতীশ বাবুর মাথায় এক ফিকির এল। তিনি এক প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে হিন্দীতে বললেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমার তাঁতী যতক্ষণে দুখানা সাড়ী বুনবে ততক্ষণে আপনাদের কোন জোলা যদি একখানা সাড়ী শেষ করতে পারে ত আমি দশটাকা বাজী হারব। এই রকম একটা অবজ্ঞা-ভরা চ্যালেঞ্জের কথা শুনে জোলারা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। চড়চনের এক জোলা সেইখানেই পালটা জবাব দিলে, সে দশ রূপৈয়া বাজী লাগাতে তৈয়ার আছে। যথোচিত ধুমধাম করে এক শনিবারে ম্যাচ-এর ব্যবস্থা করা গেল। আমলাবর্গ, মহাজন-মণ্ডলী, উকীল-মোক্তার, সকলের সামনে বাজী সুরু হল। তাঁতশালের এক কোণে বাঙ্গালী তাঁতী কোমরে রঙীন গামছা বেঁধে সতীশবাবুর ঠকঠকি তাঁতে বসল। অপর কোণে চড়চনের জোলাটী তার নিজের ঘরের তাঁতে কাপড় বুনতে আরম্ভ করলে। কত ঘণ্টা বাজী চলেছিল তা এখন মনে নেই, কিন্তু পুরানো তাঁতে যখন একখানা সাড়ী শেষ হল তখন দেখা গেল যে বাঙ্গালী তাঁতি প্রায় আড়াইখানা বুনে ফেলেছে। সতীশবাবু কিন্তু বাজীর টাকা কিছুতেই নিলেন না। কলেকটর সাহেব দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কিছু কিছু দিলেন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তরফ থেকে ইনাম স্বরূপ। এই বাজীর ফল কিন্তু খুব ভাল হল, কেন না চড়চনের সেই সরদার জোলাটী তৎক্ষণাৎ fly-shuttle শিখতে লেগে গেল। কিছুদিন না যেতে যেতে সতীশ বাবুর আরও অনেকগুলি ছাত্র জুটল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। এই তরুণ ভদ্রলোকটীর মত একনিষ্ঠ কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি কি পারিশ্রমিক রোজগার করেছিলেন তা এখন ভুলে গেছি। তবে এইটুকু মনে আছে যে সেটা তাঁর কাজের তুলনায় যৎসামান্য। এই তাঁতের কাজকে তিনি একটা ব্রতের মত মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারলেন না। বছর খানেকের মধ্যে শোলাপুরে হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন। বিজাপুরের জোলারা শেষ পর্য্যন্ত সবাই ঠকঠকির তাঁত গ্রহণ করলে কি না, তা আমি জানি না। না করে থাকে ত মিলের আড়াআড়িতে কি আর এতদিন টিঁকে আছে!

এইবার আপনাদিগকে বিজাপুর জেলার সাধারণ লোকের বিষয় দুচার কথা বলব। এই জেলাটী কানাড়া বা কর্ণাট প্রদেশের এক ভাগ। লোকের ভাষা কানাড়ী। ভাষাটী তেলেগুর মত আধা আর্য্য, আধা দ্রাবিড়ী। মহারাষ্ট্রের লাগা প্রদেশটায় আর্য্য শব্দগুলোর বেশী প্রয়োগ। তেমনি খাস মহীশূরের কথিত ভাষায় আর্য্য শব্দের ব্যবহার নেই বললেই হয়। বিজাপুর জেলার চাষী বেশীর ভাগ লিঙ্গায়ৎ জাতের। এই জাতকে একটা আলাদা সম্প্রদায় বললেও ভুল হয় না কেন না এরা ব্রাহ্মণকে মানে না। এদের নিজেদের পুরোহিত আছে। তাদিকে জঙ্গম বলে। প্রত্যেক লিঙ্গায়ৎ কোমরে একটী ছোট শিবলিঙ্গ ধারণ করে। সাধারণ গৃহস্থ এই প্রতীক এক সুন্দর সুঠাম রূপার বাক্সে রেখে রূপার জিঞ্জির দিয়ে সেই বাক্স কোমরে ঝোলায়। অসমর্থ গরীবের পক্ষে রজতাধারের বদলে লাল শালুর পুঁটুলির ব্যবস্থা। এই লিঙ্গায়ৎরা যে শুধু চাষী, তা নয়। অধিকাংশ ব্যাপারী মহাজনও ছিল এই জাতের। তবে তখনকার দিনে বিজাপুর জেলায় এঁদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার চল হয় নেই। তাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের তেমন বেশী রেশারেশিও ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন উকীল, ডাক্তার ও সরকারী আমলা, এঁরা ছিলেন চাষী, ব্যাপারী ও মহাজন, কাজকর্ম্ম একরকম নির্ব্বিবাদে চলে যাচ্ছিল। তবে পাশের ধারোয়াড় বেলগাঁও জেলায় এই দুই জাতের মধ্যে বিদ্বেষ অতি বিশ্রী রকম বেড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে লিঙ্গায়ৎ প্রচারক আসতেন আমাদের জেলায় এই বিদ্বেষের আগুন ছড়াতে। আমি প্রথম প্রথম জিনিসটা ঠিক বুঝতাম না। হিন্দু সমাজের মধ্যেই দুটো জাত যে এই রকম নির্লজ্জভাবে পরস্পরের সর্ব্বনাশ করতে কোমর বাঁধতে পারে, তা বুঝব কি করে! সাধারণতঃ শহরে ব্রাহ্মণদের জোর ছিল বেশী, কিন্তু দূর পল্লীগ্রামে লিঙ্গায়ৎরাই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার প্রথম বছরের সফরেই এই বর্ণ-বিদ্বেষের একটা বেশ স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। গল্পটা বলি, শুনুন।

এক নূতন ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যাবেলাতে। সারা পথটা হরিণ শিকার করতে করতে এসেছি, তাই বড় শ্রান্ত। তাড়াতাড়ি স্নান

করে খেয়ে দেয়ে, শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় চাপরাসী এসে খবর দিলে যে মামলতদার রাও সাহেব এসেছেন। এত রাত্রে, তখন নটা বেজে গেছে, রাও সাহেবের শুভাগমনে খুব খুশী হলাম তা বলতে পারি না। একবার ভাবলাম, সকাল বেলায় আসতে বলে দিই। ফের মনে হল, ভদ্রলোকের তালুকাতে প্রথম এসেছি, ওঁর সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নেই, ফিরে যেতে বললে হয় ত ক্ষুণ্ণ হবেন। বাহিরে চৌকী কেদারা রাখতে বলে বেরিয়ে এলাম। রাও সাহেব যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করে বললেন, "এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি, মাপ করবেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে, সেটা আপনাকে জানান আমার কর্ত্তব্য।" দূরে জনা দুই তিন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদিকে কাছে ডেকে বললেন, "এঁরা এই গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এঁদের কিছু নালিশ আছে।" আমার বিরক্ত বোধ হল। দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দিলাম, "এত রাত্রে আমি নালিশ শুনতে পারব না, মহাশয়। আপনি ত তালুকা ম্যাজিষ্ট্রেট, যা হয় ব্যবস্থা করবেন আজ রাত্রির মত।" একজন ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকায় সৌম্য-মূর্ত্তি, কাছে এগিয়ে এসে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, "শুভমস্তু, মহারাজ। আমরা দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সারা দিন উপবাসী, আমাদের পূজা পণ্ড হল, আজ আর জলগ্রহণ করতেও পাব না। এর কি কোন প্রতিবিধান নেই এ রাজ্যে?" ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুনে বড় লজ্জা হল। তাড়াতাড়ি বসে বললাম, "অবশ্য প্রতিবিধান আছে, শাস্ত্রী মহাশয়। বসুন। বলুন, কি হয়েছে।" ব্রাহ্মণ তখন তাঁদের দুঃখের কথা বললেন, "আজ কার্ত্তিকী একাদশী। আমরা প্রতিবৎসর এই দিনে গোধূলি-লগ্নে আমাদের দেবতাকে মিছিল করে এক মন্দির হতে আর এক মন্দিরে নিয়ে যাই। তার পর সেইখানে যথারীতি সন্ধ্যা আরতি পূজা-অর্চ্চনা করে উপবাসের পারণা করি। বাদশাহী আমল হতে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। তিন বছর আগে এখানকার লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় আমাদের মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমারা সময়মত জেলা হাকিমকে দরখাস্ত করায় কোন গোলযোগ হয় নেই। এ বছর আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। আগে হতে

কোন ব্যবস্থাই করি নেই। হঠাৎ বাজারের মাঝখানে প্রায় শতখানেক লিঙ্গায়ৎ লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমরা অনেক অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু তারা কিছুতেই পথ ছাড়লে না। অগত্যা দেবতাকে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাও সাহেবকে জানালাম। আপনি এসেছেন শুনে তিনি আমাদিকে আপনার হুজুরে নিয়ে এসেছেন।" সে রাত্রে আর কিছু করণীয় ছিল না। রাও সাহেবকে বলে দিলাম যেন সকাল বেলায় উভয় পক্ষ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকেন। পরদিন প্রায় দু ঘণ্টা ধরে উভয় দলের বক্তব্য শুনে, দলীল নকশা ইত্যাদি দেখে আমার কোন সন্দেহই রইল না যে ব্রাহ্মণেরা কার্ত্তিকী একাদশীর মিছিল গাঁয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। স্থানীয় লিঙ্গায়ৎদের প্রমুখও একথা স্বীকার করলেন। কিন্তু একজন ইংরেজী জানা তরুণ লিঙ্গায়ৎ ছিল, সে কিছুতেই চুপ করে না। বলতে লাগল, "আমরা কিছুতেই যেতে দেব না, সাহেব। আগে ওরা আদালতে ওদের অধিকার সাব্যস্ত করুক।" খবর নিয়ে জানলাম লোকটী ধারোয়াড়ের লোক, পেশা মোক্তারী, এই রকম করে সর্ব্বত্র গোলমাল বাধিয়ে দুপয়সা রোজগার করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ত বাহিরের লোক, এখানকার ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?" সে একটু গরম হয়ে জবাব দিলে, "এ আমাদের বীরশৈব সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা—" আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি বীরও হতে পারেন, শৈবও হতে পারেন, কিন্তু এখান থেকে মানে মানে আজই সরে পড়ুন। আমি ফৌজদার সাহেবকে বলে দিচ্ছি আপনার গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে।" লোকটা রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। কিন্তু লিঙ্গায়ৎদের প্রমুখ মহাশয় বললেন, "ফৌজদার সাহেবকে কিছু বলতে হবে না, হুজুর। আমিই ওঁর সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

সন্ধ্যাবেলা বাজারের চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আগের ব্যবস্থামত লিঙ্গায়ৎদের চার পাঁচজন মাতব্বর আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ। কিন্তু কারও হাতে লাঠি-সোটা না দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমার পেছনে

একটু দূরে ফৌজদার (Sub-inspector) বারোজন বন্দুকধারী পাহারা-ওয়ালা নিয়ে খাড়া ছিলেন। সকাল বেলায় মাতব্বররা লিখে দিয়েছিলেন যে কোন গোলমাল হলে তাঁরা দায়ী, তাঁরা গেরেপ্তার হতেও প্রস্তুত। ধারোয়াড়ের বক্তাটী ঠিক সরে পড়েছিলেন। একজন মাতব্বর হেসে বললেন, "লোকটা ভাল নয়, সাহেব। ছোকরাগুলোকে খেপিয়ে তুলেছিল।" যথাসময়ে ব্রাহ্মণদের মিছিল এসে পৌছল। সঙ্গে রাও সাহেব মামলতদার, মাত্র দুজন নিরস্ত্র কনষ্টেবল নিয়ে। আমাকে দেখে ব্রাহ্মণদের প্রাণে ভরসা এল। তাঁরা বার বার দেবতার জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। আমি লিঙ্গায়ৎ প্রমুখকে বললাম, "আমি ওঁদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনারাও আসুন না! প্রসাদ ভক্ষণ করে ফিরবেন।" "চলুন, সাহেব। আপনিই যখন যাচ্ছেন আমাদের কি আপত্তি!" বলে তিনি এগিয়ে এলেন। লিঙ্গায়ৎ যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ধীরে ধীরে তারাও অনেকে সঙ্গ নিলে। প্রধান ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছলছল চোখে বললেন, "এই রকমই হত, সাহেব, আগেকার দিনে। কেন যে আজ মানুষের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে, কে জানে!" মন্দিরে পৌছে মহা ধুমধাম লেগে গেল। রাত বারোটা অবধি নাচ গান প্রসাদ ভক্ষণ চলল। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ফৌজদার ও সেপাইরা শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গেই ছিলেন, তবে দূরে দূরে। এটা হয়েছিল আমার প্রবীণ রাও সাহেবের পরামর্শমত। তিনি আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, "তুমি অঘটন ঘটাচ্ছ, তা সত্যি, সাহেব। তবু বন্দুক সঙ্গে থাকা ভাল।"

লিঙ্গায়ৎদের অনেক গল্পই করা যায়। তবে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে। মোটের উপর এদিকে আমার খুব ভাল লাগে নাই। অন্ততঃ গুজরাতের পাটীদারদের মত লাগে নেই। এদের দেহে গুণের অভাব নেই। চাষী হিসেবে বুদ্ধি-সুদ্ধি যথেষ্ট। ইজ্জতের জ্ঞানও প্রবল, দরকার পড়লে সবাই একজোটও হতে পারে, তবে বড় নিষ্ঠুর জাত। শত্রু নিপাতের জন্য এমন কাজ নেই যা করতে পারে না। একবার কোন গ্রামের লোক একজোট হয়ে তাদের গ্রামস্থ মহাজনকে

খাতাপত্র দলীল দস্তাবেজ সমেত ঘরে বন্ধ করে জ্বালিয়ে মেরেছিল। আর একবার, এক চাষী তার দশ বছরের ছেলেকে স্বহস্তে খুন করে, লাশটা শত্রুর বাগানে ফেলে দিয়ে, পুলিসে এতেলা দিয়েছিল যে অমুক আমার ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার বাগান বাড়ীতে বন্ধ করে রেখেছে। এই রকম অনেক ছোট বড় ঘটনার কথা শুনেছিলাম দু-বছরের মধ্যে। তবে এইটুকু বলব যে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের মহাজন শ্রেণীকে আমার ওরই মধ্যে ভাল লেগেছিল। তারা খয়রাত করত, গান বাজনা কুস্তী কসরতের চর্চ্চাও করত, গুজরাতের বেনেদের মতন সারাক্ষণ কেবল পয়সার ধ্যানে মশগুল থাকত না।

বিজাপুর অঞ্চলে আমার Criminal tribesদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। Criminal tribe মানে এই যে সারা tribeটার জাতিগত পেশা চুরী-চামারী। বাহিরে হয়ত তারা অন্য কোন রকম ধান্দার ঢঙ করে, কিন্তু তাদের যথার্থ পেশা বলতে চুরীই বোঝায়। এদের কোন কোন জাত ঘরদোর বেঁধে গ্রামে বাস করে, আবার কোন কোন জাত বা আমাদের বেদেদের মতন ভবঘুরে, তিন দিনের বেশী এক জায়গায় থাকে না। ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়স থেকেই জাতব্যবসায় শেখে, আর সে ব্যবসায়কে কোন রকমে হীন বা অন্যায় মনে করে না। জাতের কেউ অকালে মরে গেলে, কি জেলখানায় বন্ধ হলে, সমস্ত জাতে মিলে তার ছেলেপিলেদের খেতে পরতে দেয়। ভবঘুরে tribeগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত কায়খাড়ী জাত। এদের জাত-ব্যবসা সিঁদকাটা। ছাদের এক কোণে এমন সুন্দর, artistic, সিঁদ কাটে যে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অথচ ছাদ ভাঙ্গবার সময় কোন আওয়াজ হয় না, গৃহস্থের ঘুমও ভাঙ্গে না। কায়খাড়ী মেয়েরা টুকরী সাজী ইত্যাদি ঘরে ঘরে বেচে বেড়ায়, আর কোন বাড়ীতে গহনাপত্র টাকাকড়ি কত আছে, বাড়ীর লোকে কোন ঘরে শোয়, এই সব দরকারী খবর সংগ্রহ করে ক্যাম্পে আনে। তারপর দলপতি চুরীর ব্যবস্থা করেন। বড় লোকের বাড়ীতে, কিংবা যেখানে ধরা পড়ার ভয় আছে সেখানে, দলপতি স্বয়ং সিঁদ কাটতে যান। ছোট খাটো চুরী করতে ছেলেছোকরাদিকে পাঠান।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে একটী চমৎকার ছোট্ট লোহার সিঁদ-কাঠি বা গাঁতি থাকে। তারা নিত্য ফুল সিন্দুর দিয়ে এই কাঠির পূজা করে। কায়থাড়ীরা বলে যে, তাদের এই দেবতা বজ্র দিয়ে গড়া। ভাল নীল ইস্পাত সন্দেহ নেই। আজ কয়েক বছর থেকে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই কায়থাড়ী ও অন্য Criminal জাতদের চরিত্র সংশোধন করার উদ্দেশ্যে Criminal Settlement (বস্তী) বসিয়েছেন। সেখানে তাদিকে চাষের জমী দেওয়া হয়েছে, তাঁতের কাজ শেখান হচ্ছে, ছোট ছেলেমেয়েদিকে ইস্কুলে পড়ান হচ্ছে। এর কত দূর স্থায়ী ফল হবে, তা আরও কয়েক বছর না গেলে বোঝা যাবে না।

বিজাপুরে আর এক Criminal জাত আছে, তাদের নাম ছপ্পর বন্দ অর্থাৎ ঘরামি। তারা কায়থাড়ীদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না, গ্রামে থাকে, নিয়মিত চাষ বাসও করে। ঘরামির কাজ ত বেশ ভাল রকমই জানে। কিন্তু তাদের আসল পেশা, মেকী টাকা তৈরী করা। বর্ষার চার মাস যখন সবাই গ্রামে থাকে তখন চাষের কাজও পুরোদমে চলে, আবার মাটির নীচে পাতাল ঘরে গোপনে অজস্র টাকাও তৈরী হয়। অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ জোয়ারীর ফসল ঘরে তুলে দিয়ে জোয়ান মরদরা সব বেরিয়ে যায় মেকী টাকার পুঁজী সঙ্গে নিয়ে। কত দূর দেশ-দেশান্তরে যে এরা চলে যায় এই টাকা চালাবার জন্য! পুবে হংকং, পশ্চিমে জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত এই ছপ্পরবন্দ coiners সব ধরা পড়েছে। এরা যে শুধু টাকা তৈরী করে, তা নয়। ছয়ানী, সিকি, আধুলি, টাকা গিনি, এমন কি সেকেলে আকবরী মোহর পর্য্যন্ত এমন হুবেহুব গড়ে যে সাধারণ লোকের ধরা অসম্ভব। আমি একবার খুব বোকা বনেছিলাম।

এক মোকদ্দমাতে চোরাই মালের ভেতর একখানা পুরানো মোহর এসে পড়ে। কেউ সে মোহর দাবী না করায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দেন যে সেটা বিক্রী করে দামটা সরকারে জমা হোক। সোজা-সুজি নিলাম না করে তিনি আমাকে এক পত্র লিখলেন, "আপনার প্রাচীন মুদ্রার উপর খুব ঝোঁক আছে জানি। তাই লিখছি যে আমার

কাছারীতে একখানা আকবরী মোহর বিক্রী আছে, দাম পঁচিশ টাকা। নেবেন কি?" আমি তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে মোহরখানা আনিয়ে নিলাম। মোহর যে পুরানো তা দেখেই বোঝা গেল। একখানা পর-বলা (lens) নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলাম। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও কোন বাদশাহের নাম বুঝতে পারলাম না। একটা শব্দ "আল্লাহ" মাত্র পড়তে পারলাম। বন্ধু আহমদী তখন ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি ফিরে এলে তাঁর হাতে lens ও ঐ মোহর দিয়ে বললাম, "দেখ ত, কোন বাদশাহের মোহর!" তিনি অনেকক্ষণ উলটে পালটে দেখে হেসে উঠলেন, "ছপ্পর-বন্দ বাদশাহদের মোহর! এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন আরবী শব্দই নেই এর উপর।" একটু নিরাশ হলাম। আমার স্ত্রী মোহরটা তুলে রাখলেন, পরে গহনা গড়াবার কাজে লাগবে। মাস ছয়েক বাদে কিছু সোনার দরকার হওয়াতে সেটা বার করে এনে সোনারের হাতে দিলেন। সোনার তাকে যথারীতি ঘোরালে ফেরালে, কষ্টি পাথরে ঘষে পরখ করলে, তার পর নিয়ে চলে গেল। আমরা মনে করলাম, যাক্, মোহরটা কাজে লাগল। কিন্তু কাজে ত লাগল না। সোনার সেটাকে ভেঙ্গে হুখানা করে এনে দিলে। ভেতরটা মোটেই সোনা নয় কিন্তু এমন কোন মিশ্র ধাতু যে ঝাঁ করে হাতে ওজন ধরা পড়ে না। বাহিরে সোনার পাত তারই উপর আরবী হরফের হিজি-বিজি। সুন্দর কাজ সন্দেহ নেই, তবে কোন বড়মানুষ মার্কিনীকে বেচলেই পারত। শীতকালে ছপ্পর-বন্দ গ্রামে অনেকবার গেছি। বাহিরে থেকে মনে হত সব সাদাসিধে মানুষ, চাষ মজুরী করে খায়। তবে একটা বিষয় নজরে পড়েছিল বটে, যে গ্রামে জোয়ান বয়সের পুরুষ দেখা যেত না, কেবল ছেলে আর বুড়ো। বুড়োগুলোর নমাজ পড়ার কি ঘটা!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ধর্ম্ম, যাদুবিদ্যা ও আর-আর ম্যারেট্

ইংলণ্ডের প্রধান নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে আর্ আর্ ম্যারেট্ যে অন্যতম সে-বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই। টাইলার ও ফ্রেজারের পরেই হয় ত তাঁহার স্থান। তিনি ফ্রেজারের ন্যায় অনেক গ্রন্থ লিখেন নাই, কিন্তু যাহাই লিখিয়াছেন তাহাই পণ্ডিত সমাজে অত্যুৎকৃষ্ট ও শীর্ষস্থানীয় বলিয়া সমাদৃত। তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে "Threshold of Religion" বহুজনবিদিত, কিন্তু তদ্ব্যতীত তিনি "Anthropology", "Man in the Making", এবং গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে আরও তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন যথা—"Faith, Hope and Charity in Primitive Religion", "Sacraments of Simple Folk" ও "Head, Heart and Hands in Human Evolution"। এই শেষ গ্রন্থখানি যদিও এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পারি নাই, তথাপি অপর গ্রন্থগুলি পড়া থাকায় তাঁহার মতামতের সঙ্গে আমি অল্পবিস্তর পরিচিত।

ম্যারেটের লেখার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি একাধারে দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিদ্, এবং দর্শন চর্চ্চা করিতে করিতে নৃতত্ত্বে মনোনিবেশ করায়, তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রেই প্রখর কল্পনাশক্তির নিদর্শন আছে। এই Imaginative Construction বা কল্পনানির্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রের পক্ষে সাধারণতঃ অনুপকারী বটে, কিন্তু ম্যারেট তাঁহার মেধাবলে সমস্ত বিঘ্নই অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে তাঁহার কল্পনার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইংরাজ নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের মত তাঁহার দৃষ্টিও অন্তরাভিমুখী ও মনস্তত্ত্বপ্রবণ; অধিকন্তু তিনি একজন অদ্ভুত কল্পনা-কৌশলী এবং নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে কল্পনা-কৌশলই তাঁহার বিশেষত্ব। তাহার গ্রন্থগুলি ফ্রেজারের রচনাবলীর ন্যায় দীর্ঘ আয়তন অথবা বিষয়বৃত্তান্তের (Factsএর) অপূর্ব্ব সমাবেশ নহে তাঁহার কৃতিত্ব এই যে অপরে যাহা বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে

আহরণ করিয়া পুঁথিজাত করিয়াছেন, তিনি তাহাই কল্পনাশক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া পুনরায় জগতকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

ম্যারেট্ Religion সম্বন্ধে যে সব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। Religion বলিতে ইংরাজিতে যাহা বুঝায় তাহা বাংলা কোন কথায় সঠিক বুঝান যায় না। তবে ধর্ম্ম কথাটি Religion অর্থে ব্যবহার করিলেও করা যাইতে পারে, কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম যে শুধু কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ইত্যাদি লোকাচারসম্পর্কেই (Ethico-social Practice) ব্যবহার হয় তাহা নহে, শব্দটিকে আমরা সাম্প্রদায়িক অথবা ব্যক্তিগত faith অথবা বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিয়া থাকি, যথা—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি।

ম্যারেট্ বলেন যাহাকে আমরা Religion অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস বলি—অর্থাৎ যাহা আমরা পূজা, উপাসনা ইত্যাদি কথার দ্বারা সচরাচর প্রকাশ করিয়া থাকি—তাহা সভ্যতার নিম্নাবস্থায় যাদুবিদ্যা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি হইতে অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ মানুষ যতদিন সভ্য হয় নাই, ততদিন তাহার ধর্ম্মোপাসনাদি ছিল এক-প্রকার Magic বা যাদুবিদ্যা। ধর্ম্ম, দেবার্চ্চনা ইত্যাদির সঙ্গে যাদুকরী বিদ্যার প্রভেদ করা ম্যারেটের মতে অন্যায়। ইহারা একই কাণ্ডের দুইটি শাখা মাত্র। মূলে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাকে আর এক হিসাবে যাদুও বলা চলে। আবার যাহা এক সময়ে সম্মোহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহার দ্বারা তৎকালীন ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যও সাধিত হইত। কারণ ধর্ম্ম ও যাদুবিদ্যার ভিত্তি এক, এবং বিজ্ঞান প্রথম হইতেই পৃথক। যাহা প্রাকৃত বা দৃষ্টজগৎ-সম্বন্ধীয় তাহারই স্বরূপ নির্ণয়ে বিজ্ঞান চিরকাল আবদ্ধ; কিন্তু যাদু ও ধর্ম্ম অদৃষ্ট জগতের বার্ত্তাবহ। যাহা অপ্রাকৃত অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক (supernatural), যাহা চর্ম্মচক্ষুর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না, তাহাই ছিল যাদু ও ধর্ম্মের বিষয়। যেখানে বিজ্ঞানের আলোক স্তিমিত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি ব্যহত, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে

ব্যর্থ, সেই অজানা, অদৃশ্য জগতেই ধর্ম্মের যথার্থ রাজ্য। এই অনৈসর্গিক রাজ্যে যাদু ও ধর্ম্ম, প্রথমতঃ নির্ব্বিশিষ্ট ভাবে বিরাজমান থাকিয়া সভ্যতার উন্নতির সহিত ক্রমশঃ স্বাতন্ত্র্যে অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং প্রারম্ভে ধর্ম্ম ও যাদুবিদ্যার মধ্যে ব্যবধান না থাকিলেও পরিস্ফুট বা পূর্ণবিকশিত অবস্থায় ধর্ম্ম ও যাদু পরস্পর-বিশ্লিষ্ট হইয়া উভয়তঃ পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সহজ কথায় আদিতে ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝাইত যাদু বলিতেও তাহাই বুঝাইত। ইহা ধর্ম্মের প্রাক্তন অবস্থার স্বরূপ। কিন্তু ধর্ম্মের উন্নতির সহিত উহা যাদু হইতে এতখানি সরিয়া গিয়াছে যে, আজ উভয়ের মূলগত সাদৃশ্যও কষ্টকল্পনা। শুধু ইহাই নহে। অসভ্যেরা যে-আচারকে যাদু ও ধর্ম্ম উভয় অর্থেই নিয়োগ করিত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সমষ্টির কল্যাণসাধন। যে-যাদু সমষ্টির অমঙ্গল ঘটাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিত, তাহা কখনও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত না। অর্থাৎ বস্তুদিগের দুই প্রকার যাদু-বিদ্যা—ব্যক্তিগত (Individualistic) ও সমষ্টিগত (Tribal, Social)। এই সমষ্টিগত যাদুই ছিল তাহাদের ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি। ব্যক্তিগত যাদু তাহাদের মতে একপ্রকার অনিষ্টকারী মায়াবিক বিদ্যা (Black Magic), যাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল ও ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ফ্রেজারের মতে ধর্ম্ম যাদুর বিপরীত মার্গ—যাদু আদি মানুষের বিজ্ঞান। যাহা এখন বিজ্ঞান নামে পরিচিত এবং যাহার দ্বারা মানুষ প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে অসভ্যদের নিকট তাহারই অপরিণত অবস্থা ছিল যাদু। সুতরাং যাদু বিজ্ঞানেরই রূপান্তর, এবং ইহাদের সহিত ধর্ম্মের কোনো সম্বন্ধ নাই ; কারণ যাদু বা বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে চাহে। যাদুকর ও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রহস্যভেদ করিয়া তাহাকে মানুষের আজ্ঞাধীনে আনার প্রয়াসী। কিন্তু ধর্ম্ম মানুষের অক্ষমতা ও হীনতার সাক্ষ্য, ধর্ম্ম অশক্ত মানুষের কাতর প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্তব, স্তুতি, উপাসনা ইত্যাদিই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, দেবতাকে স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করা,

তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতঃ বিনয় অনুনয় দ্বারা তাঁহার কৃপা-ভিক্ষাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম বলিতে বুঝায় দেবতার অনুগ্রহে আপনার নিঃসহায়তা হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা। নিজের শক্তি প্রয়োগে কিংবা কৌশল অবলম্বনে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক শক্তির পরিচালনা ও তাহার ফলে স্বকার্য্য-সিদ্ধি, এ-সমস্তই ধর্ম্মের পরিপন্থী। কাজেই বিজ্ঞান ও যাদু ধর্ম্মাচরণের প্রতিবন্ধক, উভয় পদ্ধতিই আত্মম্ভরিতার বিকাশ, উহাদিগের মধ্যে পরমুখাপেক্ষা বা ভজন-পূজনের স্থান নাই।

ম্যারেট্ বলেন ফ্রেজারের এই মত অসঙ্গত। যাদুকে ধর্ম্ম হইতে একেবারে পৃথক করিবার মূলে এই ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে যাদু আত্মশক্তির সাহায্যে স্বীয় অভিলাষ পূরণে বদ্ধপরিকর, এবং ধর্ম্ম দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দৈববলে বিধাতার অভিপ্রায় সম্পাদনে উৎসুক। যেখানে যাদু বলিতে চাহে, 'আমার কামনা সিদ্ধ হউক', সেখানে ধর্ম্মের উক্তি হইতেছে, "তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। আত্মনির্ভরতাই হইতেছে যাদুর মূল মন্ত্র। আর ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাদু ও ধর্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে এই যে মূল ধারণা রহিয়াছে ইহা ম্যারেটের মতে ভ্রান্ত কুসংস্কার মাত্র। কারণ যাদু যে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠাতেই ব্যস্ত, তাহা নহে ; যাহা বাহ্যতঃ শক্তিমানের আদেশ বলিয়া মনে হয় তাহাও অনেক সময় আন্তরিক মিনতিরই ছদ্মবেশ মাত্র ; এবং যেখানে যাদু মন্ত্রের আকার ধরে, সেখানে একের ইচ্ছাশক্তি অপরের ইচ্ছাশক্তির সাহায্য প্রত্যাশা করে। এই একের শক্তির দ্বারা অপরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা প্রথমতঃ আজ্ঞাকারে প্রকাশ পাইলেও ক্রমপরিণতিতে তাহাই মিনতি, অনুনয়, বিনয় রূপে প্রকট হয়। অতএব যাহা একদিক হইতে আদেশ বা ক্ষমতার অভিব্যক্তি তাহাই আর একদিক হইতে দেখিলে মিনতি, প্রার্থনা, স্তুতি ইত্যাদিরই রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আরও এক কথা আছে। অসভ্যেরা শুধু যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই নিরস্ত হয় তাহা নহে। তাহারা উচ্চারণের সহিত যে উদ্দেশ্যে

যাদুশক্তি নিয়োগ করিতেছে তাহারও অভিনয় করে। ফলতঃ দর্শকের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে তাহারা স্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দর্শকগণ অসভ্যদিগের এই আচরণের কেবল বাহিরটিই দেখিতে পান। যদি তাঁহারা উহাদের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে অসভ্যেরা ঐ যাদু-মন্ত্রে ঐশী শক্তিরই শরণাপন্ন হইতেছে। তাহাতে দম্ভ বা আত্মনিষ্ঠার কিছুই নাই। সুতরাং যাহা বাহিরে যাদুশক্তির সদর্প নিয়োগ বলিয়া বোধ হয় তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে—মিনতি ও অনুনয়। যাদুর বাহ্য দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা যাদুকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবেন, তাঁহারা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া আপনাদের অন্তর্দৃষ্টির অক্ষমতারই পরিচয় দেন।

ম্যারেটের মতামত আলোচনা করিতে হইলে ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ফ্রেজারের সহিত তাঁহার মতদ্বৈত আংশিক ভাবে সত্য হইলেও একেবারে নির্দ্দোষ নহে। তিনি ধর্ম্মের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহার প্রধান ত্রুটি এই যে সেই লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। লক্ষণ বা Definition সকল লক্ষ্যবৃত্তি না হইলে অলক্ষণ বা লক্ষণ-আভাস স্থানার্হ। গাভীর লক্ষণ দিতে গিয়া কেহ যদি বলেন, "গাভী একপ্রকার শুভ্রবর্ণ পশু", তাহা হইলে তাঁহার লক্ষণ অলক্ষণ বা লক্ষণ-আভাস স্থানীয় হইয়া যায়, কেননা কৃষ্ণবর্ণ গাভীও সুলভ। অর্থাৎ এমন গাভীও আছে যাহাতে উক্ত গাভীর লক্ষণ প্রয়োগ করা চলে না। সেইরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতে গিয়া যদি এরূপ লক্ষণ দেওয়া হয় যাহা সকল ধর্ম্ম সম্পর্কে খাটে না, তবে তাহাকে আর ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ম্যারেট্ বলেন যে ধর্ম্মের অধিকার হইতেছে এক অজানা অদৃশ্য রাজ্যে যাহা এই দৃষ্ট জগতের একবারে বাহিরে। কিন্তু এই লক্ষণ যে সকল ধর্ম্মে প্রয়োগ করা চলে না তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এমন ধর্ম্মও আছে যাহার সম্বন্ধ এই দৃষ্ট জগতেরই সহিত এবং যাহাতে অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত কিছুরই কোনরূপ স্থান নাই। কঁৎ (Comte) যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন

তাহা দৃষ্ট মানবেরই পূজা ও তাহাতে অদৃষ্ট বা অপ্রাকৃতির কোনরূপ স্থান ছিল না। তাঁহার এই ধর্ম্ম বহুলোকে গ্রহণও করিয়া ছিল এবং এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা নিজদিগকে 'পজেটিভ' ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং ধর্ম্ম যে কেবল অদৃশ্য ও অজানা জগত লইয়াই থাকে এ-কথা মনে করা কঠিন। আজকাল বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যেও অনেকে দৃষ্টজগতের ভিতর দিয়াই ধর্ম্মকে পাইবার প্রয়াসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মে অলৌকিক বা অপ্রাকৃতের কোনও স্থান নাই। যাহা লৌকিক বা প্রাকৃত তাহারাই মধ্যে ধর্ম্মের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley) এইরূপ মত সমর্থন করিয়া বিজ্ঞানকেই ধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতঃ শ্রুতি (Revelation) বর্জ্জিত এক নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত হইলেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ইহার সমর্থনে প্রস্তুত। অতএব ধর্ম্মকে কেবল পারলৌকিক বা অলৌকিক পর্য্যায়ে আবদ্ধ রাখিলে ধর্ম্মের স্বরূপের সঙ্কোচ ঘটে।

ম্যারেট্ আরও বিশ্বাস করেন যে অসভ্যেরা যাহাকে ধর্ম্মার্থে ব্যবহার করে তাহা এক অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত জগৎবিষয়ক। কিন্তু এ-মতও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃতের ধারণা তখনই সহজসাধ্য যখন প্রাকৃতের জ্ঞান বেশ পরিষ্কার। প্রাকৃতের সম্বন্ধে যে অসভ্যদের কোন সুস্পষ্ট বোধ আছে বা কখন ছিল, একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। অবশ্য ম্যারেট-এর বিশ্বাস যে অসভ্যদের "ইন্দ্রিয়শক্তি" (ঘ্রাণ, শ্রবণ, দৃষ্টি আদি) আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক প্রখর, এবং ভেষজ-বিদ্যাতেও তাহারা বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কারণ গাছ গাছড়া চিনিতে ও গুণাগুণ অনুযায়ী তাহাদিগকে ঔষধার্থে প্রয়োগ করিতে তাহারা যে জ্ঞানের পরিচয় দেয় তাহা কখনই অবোধ বা অজ্ঞের পক্ষে সম্ভব নহে। ম্যারেটের এই যুক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ ন্যায্য বলিয়া মনে হয় না। জন্তু জানোয়ারদিগের মধ্যেও গাছ গাছড়া সম্বন্ধে একপ্রকার অস্পষ্ট বা অন্ধ বোধ (Instinct) দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাদের ঘ্রাণাদির শক্তিও অনেক সময় আমাদিগের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। উড্ডীয়মান খেচরও ভূধরস্থ আহার লক্ষ্য করিয়া তদাহরণে সচেষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টি যে মানবদৃষ্টি হইতে অধিক শাণিত তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা সত্য নহে যে ঐ সকল পশুপক্ষীর মধ্যে প্রাকৃতের সুস্পষ্ট বোধ আছে। অসভ্যদের বিষয়েও এই যুক্তি কিয়ৎ পরিমাণে খাটে। তাহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে পারে, শ্রুতি অতি সজাগ হইতে পারে, ওষধির সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ পটুতার পরিচয় দিতে পারে—কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে তাহারা প্রাকৃত বিষয়ক কোনো বিশেষ জ্ঞানে অধিকারী।

ম্যারেট যাদুকে ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিতে গিয়া যে দুই প্রকার যাদুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন। ম্যারেটের মতে দুইপ্রকার যাদুর মধ্যে যাহা ব্যক্তিগত (Individualistic) তাহা হইতেছে অসভ্যদের একপ্রকার অনিষ্টকারী মায়াবী বিদ্যা যাহাতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। কেবল সেই যাদুই ধর্ম্ম স্থানীয় যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমষ্টির হিতার্থে (Tribal ends) সম্পাদিত। কিন্তু ধর্ম্ম সর্ব্বত্র কেবল সমষ্টির হিতার্থেই নিয়োজিত হয় না—তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও মাঝে মাঝে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম মাত্রকে একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার বলা যায় না—যাহাতে দশেরই হিত সাধিত হয়। যাহা ব্যষ্টিমূলক, যাহাতে একের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, দশের কার্য্য হয় না—তাহাও ক্বচিৎকদাচিৎ ধর্ম্ম হইতে পারে। ম্যারেটের মতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে ধর্ম্ম বা Religion একপ্রকার হিতকর লোকব্যবহার অথবা সামাজিক নীতি মাত্র (Morality)। কিন্তু এই মত স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয় যে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, সুতরাং যোগ সাধন ও অন্যান্য প্রকার ব্যক্তিগত অলৌকিক অনুভূতি (mystical experience) আর ধর্ম্ম পদবাচ্য নহে। কিন্তু আজকাল এই অলৌকিক অনুভূতিরূপ Mystical Religionই ধর্ম্ম হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেক বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করিতেছেন (Eddington, Arthur Thompson), আর এই যোগ বা Mysticism

যে একপ্রকার ব্যক্তিগত ব্যাপার তাহাও অবিসংবাদিত। দশের সহিত পূজা করিয়া দশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যোগ সাধন নহে। তাহাতে একের দ্বারা একের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় এবং যোগকে ধর্ম্ম বলিয়া অস্বীকার করা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ধর্ম্ম ব্যক্তিগতও হইতে পারে আবার সাম্প্রদায়িক হইতে পারে। ইহাতে দেবপূজার স্থান আছে, আবার ধ্যান, ধারণা, সমাধি আদিরও স্থান আছে। ইহার প্রকার ভিন্ন হইলেও ভিতরে সার বস্তু এক। যেমন মানুষকে শুধু সিতাসিতে বিভক্ত করিলে তাহার বর্ণ সম্বন্ধে অযথা সঙ্কোচ প্রকাশ পায় (কারণ বাদামি মানুষও বিরল নহে) সেইরূপ ধর্ম্মকে কেবল সাম্প্রদায়িক বলিলেও ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ অযথা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাতে মানুষ তাহার নিঃসহায়তা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, যাহা মানুষকে মিথ্যা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাই ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্ম-স্থানীয়। তাহা ব্যক্তিগতও হইতে পারে, সমষ্টিগতও হইতে পারে। যাহাতে ব্যক্তি তাহার নিঃসহায়তা হইতে মুক্তি পায় তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম; যাহাতে সমষ্টি তাহার অসহায়তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে তাহা হইতেছে সমষ্টিগত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানুষের অসহায়তা ও হীনতা হইতে মুক্তির উপায় এবং যে উপায়েই মানুষ এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে তাহাই ধর্ম্ম-স্থানীয়। যাহারা মনে করে দেবতার কৃপা লাভে মানুষ মুক্ত হইবে, তাহাদের পক্ষে দেব উপসনাই ধর্ম্ম। আবার যাহারা যাদু বা বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে আজ্ঞাধীন করিয়া মুক্তি লাভের প্রয়াসী তাহাদের পক্ষে যাদু বা বিজ্ঞানই ধর্ম্ম-নামীয়। আবার এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া যাহারা যোগ-বলে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক বা ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভে তৎপর তাহাদের পক্ষে যোগ সাধনাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বাহ্য রূপ নানা হইলেও ভিতরে সকল প্রকার ধর্ম্মই এই মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র। যাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্যিক কোন একরূপকে তাহার সার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করতঃ আস্ফালন করেন তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্রীসুশীল কুমার মৈত্র

সংস্কৃতি-সঙ্কট

.....“Please, will you
Give us a light ?
Light
Light.” (T. S. Eliot, ‘Triumphal March.”)

আধুনিক সাহিত্যের যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁদের জান্‌তে আর বাকী নেই যে সেখানে গানের ধুয়োর মত এই ধরণের কথা নানা ছদ্মবেশে দেখা দি’চ্ছে। যার পায়ের ধ্বনি শোনার জন্য কবিরা উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন, তার স্থলে আস্‌ছে, এলিয়টের ভাষায়—

“5,800,000 rifles and carbines,
102,000 machine guns
28,000 tench mortars,
53,000 field & heavy guns,
I cannot tell how many projectiles, mines & fuses,
13,000 aeroplanes,
24,000 aeroplane engines,
50,000 ammunition wagons,
now 55,000 army wagons,
11,000 field kitchens,
1,150 field bakeries.
What a time that took. Will it be now? No.”

কবিতার পথ আজ আর কুসুমাস্তীর্ণ নয়, লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র হ’য়ে পড়্‌ছে, বসন্তের বকুলগন্ধ তার মাদকতা হারিয়ে ফেল্‌ছে। অরসিকের প্রলাপ বলে’ যাঁরা একথা উড়িয়ে দেবেন্, তাঁদের বিদ্রূপ উপেক্ষা করেও আমাদের দেশে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন যে বর্ত্তমান সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হ’য়ে আস্‌ছে বলে ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সর্ব্বত্রই জরার চিহ্ন প্রকট হয়েছে। এলিয়টের মত যথার্থ চক্ষুষ্মান্ তাই

বর্ত্তমানকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করে প্রাচীনের মহিমা পুনঃ প্রচার করছেন, নিজেকে জ্ঞাতসারেই মায়ামুগ্ধ করছেন, যুগধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করে আশ্রয় নিচ্ছেন এক বাতাহত শৈলের ছায়ায়, ক্যাথলিক চার্চ্চকে বরণ করে। আমাদের মনে পড়ে বাইব্‌লের সেই আখ্যানের কথা—“rock”-এর ওপর বীজ পড়্‌লে সূর্য্যরশ্মিও তাকে প্রাণ দিতে পারে না।

গত পাঁচ শ বছর যে সংস্কৃতি পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা’র প্রতিফলিত ভাতি দেখে আমরা মুগ্ধ, যা অনুকরণ ও আমাদের সমাজে সংযোজন করতে আমরা ব্যস্ত, সেই সংস্কৃতি এখন যেন ব্যাধিগ্রস্ত। রোজ সকালে একবার কষ্ট করে’ খবরের কাগজখানা খুল্‌লেই মনে হবে যে নানা দেশের শাসনভার যাদের হাতে, তাদের মধ্যে বাতুলতা বুঝি সংক্রামক। যুদ্ধবিরতি সকলেরই কামনা, যুদ্ধোদ্যোগ সকলেরই কর্ত্তব্য! যাঁরা ভবিষ্যতের ছবি আঁকছেন, তাঁরা এখন রামরাজ্য কল্পনা ছেড়েছেন; Wellsএর ‘Things to Come’ দেখে মনে হবে যে ও ব্যাপারের ফিল্‌ম্‌ই ভাল, বাকি সবই ভয়াবহ। আগামী যুদ্ধ হবে সভ্যতার সমাধি। একথা কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে। অবিশ্বাসও করা যায় না। সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে যাঁরা তথাকথিত কৃষ্টির চর্চ্চা করে চলেছেন, তাঁরা নিজেদের মুক্তপুরুষ ভেবে’ আত্মতুষ্টি পান্ বটে, কিন্তু তাঁরা জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন, তাঁদের রূপসৃষ্টি হবে প্রাণহীন। তাঁদের কাছে অর্থহীন লাগ্‌বে Wilfrid Owenএর কথা—

All the poet can do today is to warn.
That is why the true Poets must be truthful.

সম্প্রতি অধ্যাপক জুলিয়ান্ হাক্সলি এক বক্তৃতায় ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য সমাজ-সেবায় বিজ্ঞানের প্রয়োগকে কি ভাবে ব্যর্থ করছে তা’র বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানকে সমাজের কাজে লাগানো হচ্ছে না, কৃষি-বিদ্যার উন্নতিকে চেপে রাখা হচ্ছে; অজুহাত অবশ্য অর্থাভাব, কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধোদ্যোগের বেলায় সে অজুহাত অন্তর্দ্ধান করে! অর্থবান্‌দের অর্থবৃদ্ধিই যেন জ্ঞান-চর্চ্চার একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য।

Baconএর সময় হতে জ্ঞানের যে অভিযান মানবজাতির গর্ব্ব ছিল, আজ তা প্রতিহত হচ্ছে। Spengler, Spann, Walter Eucken প্রভৃতি "idea of development"-কে অস্বীকার করছেন। বহু দার্শনিকের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের (theology) প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা প্রায়ই চলেছে; অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে উঠে' পড়ে লেগেছেন। বিচারগ্রাহ্য জ্ঞানের স্থলে আস্‌ছে গূঢ়ার্থবাদ (mysticism) অপরোক্ষানুভূতি (intuition), occultism। ফলিত জ্যোতিষের প্রতিপত্তি বাড়ছে। ফ্যাশিষ্ট্ দেশে যে রকম পণ্ডিতী প্রলাপ ও বুজরুকি প্রকাশ হচ্ছে, তার তুলনায় Jeansএর "mathematical god" অত্যুচ্চ কল্পনা মনে হবে। জার্ম্মানীর আজকালকার নতুন আমলে চিন্তাশীল বলে খুব নাম করেছেন H. Blank; তিনি বল্‌ছেন, What need has the German nation of the science of Darwin, Virchow, Du Bois, Raymonde, Haeckel, Planck and Einstein, which have torn the ties between the soul and God ?.....We rather want a world philosophy which is reproached with being barbarous, because, be it noted, we consider one of our best fighting calls the one "back to barbarism !" proclaimed in recent years। আজ ইয়োরোপের সব চেয়ে "শিক্ষিত" দেশে সংস্কৃতি উৎপাটনের চেষ্টা চলেছে, শ্রেষ্ঠ লেখকদের বই ঘটা করে পোড়ানো হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের বহিষ্কৃত করা হচ্ছে, "race theories" বলে এমন সব উপদেশ প্রচার হচ্ছে যা মধ্যযুগেও অগ্রাহ্য হত।

সমাজে অভিজাত অনভিজাতের পার্থক্য সনাতন ও শ্রেয়, যারা আজ নিঃস্ব, অধিকার-বঞ্চিত, তাদের আশাও যে অপরাধ, এ কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। আরাকি একবার জাপানীদের (অর্থাৎ জাপানী ধনিকদের) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ের

কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সে যাই হোক্, শ্রেণীভেদকে Pareto, Gentile, Spann, Rocco প্রভৃতি সমর্থন করেছেন ও করছেন, সকল মানুষের অধিকারসাম্য যে সভ্যতার উদ্দেশ্য, তা অস্বীকার করছেন। সুতরাং আশ্চর্য্য হলে চল্‌বে না যে Spenglerএর মত লেখক গরিলাপ্রকৃতির আদিম মানবের ক্রোধ, বীর্য্য, নিষ্ঠুরতার প্রশংসায় শতমুখ। তাই আমরা আজ পড়্‌ছি: "The soul of this Lonely One is militant throughout, suspicious, jealous with respect to its power and its acquisitions. It knows the stormy excitement when the knife cuts into the body of the enemy, the smell of blood and the cry of mortal agony evoke the feeling of triumph. Every real man, even in the cities of late civilisations feels within himself at times the latent fire of this primitive soul"। Spenglerএর সম্প্রতি লেখার এই যখন নমুনা, তখন এ তো স্বাভাবিক যে ফ্যাশিষ্ট্ নাট্যকার Johst বল্‌বেন, "When I hear the word 'culture', I cock my revolver"।

সংস্কৃতি-দ্রোহ আজ ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে; Julien Benda-র ভাষায় "la trahison des clercs" এযুগের লক্ষণ। কিন্তু সভ্যতার পুরোহিতেরাই কেন এ বিদ্রোহে যোগ দিচ্ছেন, তার কারণ বোঝার চেষ্টা তেমন নেই। সে চেষ্টার ফলে আমরা দেখব যে ধনতন্ত্রবাদের বিপদ যেখানে বেশী, যেখানেই বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে ফ্যাশিজ্‌ম্ উদ্ভত হয়েছে, যেখানেই ভবিষ্যৎকে নতুন ক'রে গড়ে তোলা হ'চ্ছে অপরাধ, সেখানেই সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন। একথা যাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজে ভাবছেন যে ঝড় কেটে যাবে তাঁদের স্পর্শ না করে। যখন ইতিহাস তাঁদের পরীক্ষা করবে, তখন কোন্ পক্ষে তাঁদের দেখা মিল্‌বে, সে সম্বন্ধে জোর করে বলা যায় না। ঝড় আস্‌ছে জেনেও তাঁরা তৈরী হ'চ্ছেন না, কারণ আসলে তাঁরা চান্ না যে ঝড় আসে, যে আমাদের সমাজের রূপ

বদ্‌লায়। তবে ইতিহাস তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা করবে না; যে বিপ্লব শুধু প্রলয় আন্‌বে না, করবে নতুন সৃষ্টি, সে বিপ্লবের আগমনী আজ আমরা শুন্‌ছি।

* * * * *

সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃতি-সঙ্কট বোঝাতে গেলে বলা হয় যে মোটের উপর আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে বুর্জোয়া (bourgeois) ও জরিষ্ণু (decadent)। এই দুটো কথার প্রতি অনেকেরই বিরাগ, আর স্বীকার করতে হবে এগুলো একটু বেশী 'যত্রতত্র' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন লেখককে বুর্জোয়া বা 'decadent' বলার মানে তাদের উড়িয়ে দেওয়া নয়। Proust বা Joyce সম্বন্ধে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ যখন করা হয়, তখন কেউই তাঁদের প্রতিভা অস্বীকার করে না। কোন লেখককে বুর্জোয়া বলার একটা অর্থ এই যে তিনি ঐ শ্রেণীর সম্বন্ধে ও ঐ শ্রেণীর জন্যে লিখে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখক স্বয়ং ঐ শ্রেণীরই একজন, কিম্বা D. H. Lawrenceএর মত শ্রমিক শ্রেণীতে জন্ম সত্ত্বেও সমাজের উচ্চস্তরে উঠেছেন। এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যাঁদের আমরা বুর্জোয়া লেখক বলি, তাঁদের লেখায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য যথার্থ সাহিত্যানুভূতির কাছে ধরা পড়তে বাধ্য। D. H. Lawrence-এর প্রতিভাকে যে মিস্‌টিসিজমের ঢেউ এসে অনেক সময় মুখোস পরিয়ে দিত, "blood consciousness" আর "thinking with one's thighs" সম্বন্ধে বক্তৃতা তাঁর মুখ দিয়ে বা'র করা'ত, তার কথা আমাদের বুর্জোয়া সাহিত্য সম্বন্ধে মনে পড়ে। আবার মনে পড়বে Proust-এর লেখার কথা, যেখানে আছে ফরাসী সমাজের এক আণুবীক্ষণিক বিভাগ সম্বন্ধে অনুপম, গভীর ও ব্যাপক ব্যবচ্ছেদ, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে ঐ বিভাগের বহির্ভূত যা কিছু তার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। এ ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি হ'য়ে থাকে সভ্যতার একটা যুগাবর্ত্তের সময়; 'byzantinism' কথাটা এই ভাব প্রকাশের জন্যেই ব্যবহার করা হয়। আবার জোর করে

বলা দরকার যে যখন Proust বা Joyce-কে "decadent" বলা হয়, তখন একেবারেই তাঁদের অসামান্য প্রতিভা অস্বীকার করার চেষ্টা বা ইচ্ছে থাকে না। এমন কি "decadence"-এর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকে যা সুস্থ লেখায় নেই। চরিত্র বা ঘটনা বিশ্লেষণে "decadent" লেখকদের শক্তি ও অনুভূতি দেখে মনে হয় যে তাঁরা বুঝি এক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অধিকারী; Virginia Woolf-এর লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কথাটার অর্থ সহজে পরিষ্কার হবে। তবে ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তাঁরা যে যুগকে সাহিত্যরূপ দিচ্ছেন সে যুগ সমাপ্ত-প্রায়, শুধু সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটার মত তাঁদের সৃষ্টি এখনও আমাদের মুগ্ধ করছে।

আরও বলা দরকার যে কাউকে বুর্জোয়া লেখক বলা মানে এই নয় যে তিনি জ্ঞাতসারে ধনতন্ত্রবাদকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে তিনি ধনতন্ত্রবাদ বা বুর্জোয়াজি সম্বন্ধে কোন বিশেষ ভাবই পোষণ করেন না, তাঁর কাছে কথাগুলো একরকম নিরর্থক, কানে পৌঁছে ফিরে যায়। এর কারণ তাঁর সঙ্গে ধনিক সভ্যতার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ; স্বতশ্চল হয়ে অজ্ঞাতসারে, নিষ্কপটভাবে তাঁর যুগের লক্ষণকে তিনি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ লাগিয়ে প্রকাশ করছেন। Walter de la Mare বা W. H. Davies-এর মধুর কবিতা পড়ার বেলায় এ কথা আমাদের মনে আসে। তাঁদের বুর্জোয়া বলে নিন্দা করার উদ্দেশ্য আমাদের কিছু মাত্র নেই; কথাটা ব্যবহারের কারণ এই যে তা হচ্ছে আমাদের অর্থনির্দ্দেশের একটা অপরিহার্য্য উপায়।

অধিকাংশ সাহিত্যতাত্ত্বিক এখনো ভাবেন যে শিল্প ও সাহিত্য অভেদ্য বেড়ার পেছনে রাখা আছে, জীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, দৈনন্দিন ব্যাপারের মালিন্য ও অশুদ্ধি থেকে তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তার অধিষ্ঠান কোন এক সুরম্য শূন্যদেশে যেখানে বাস্তবতা একেবারেই অস্পৃশ্য। তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যায় Trotsky'র কথা—

"Artistic creation is always a complicated turning inside out of old forms, under the influence of new stimuli which originate outside of art. In this large sense of the word, art is a handmai-

den. It is not a disembodied element feeding on itself but a function of social man indissolubly tied to his life and environment."

* * * *

সাহিত্যরস সেচন করে যারা মনকে একেবারে নিদ্রিত করে রাখে নি, তারা বর্ত্তমান "decadent", "bourgeois" সাহিত্য থেকে আনন্দ পায় না, এ কথা বলার বা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তারা বল্‌বে যে শুধু তাদের প্রায়ই মনে হয় Shaw'র কথা, "Yes this silly house, this strangely happy house, this agonising house, this house without foundations. I shall call it Heartbreak House."

Proustএর মত বিরাট শিল্পীর লেখায় সমসাময়িক সভ্যতার জীর্ণপ্রায় মূর্ত্তি প্রতিভাত হ'য়েছে। ফরাসী সমাজ সন্দর্শনে বেরিয়ে তিনি যাদের জীবন ব্যবচ্ছেদ করে দেখ্‌লেন, তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্থ, তাদের মধ্যেই সংস্কৃতির ছাপ আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু Proustএর অন্বেষণের ফল হল এক "Odyssey of Snobbery"; সমাজে যে কদর্য্যত্ব, যে শৈথিল্য ব্যাপক হয়েছিল, তা তিনি অপাবৃত করে দিলেন। পৃথিবীর যে জাতি সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ, সেই জাতির সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তিনি দেখলেন পূতি, দেখলেন জরা। Duchesse de Guermentes, Odette de Crecy, Madame de Villeparaise, Madame Verdurin—এরা সবাই মনে করিয়ে দেয় যে তাদের যুগ, তাদের সমাজ, তাদের সংস্কৃতি—সবই যেন মুমূর্ষু। প্যারিসের ওপর যখন গোলা পড়ছে, তখন যেন শহরের সঙ্গে সমাজও ধ্বংসোন্মুখ। Proustএর লেখা থেকে মনে হয় যে তার অপরূপ দীপ্তি হ'চ্ছে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণের মতই সুন্দর ও করুণ।

D. H. Lawrence ও Proustএর মধ্যে লেখক হিসেবে প্রভেদ খুবই বেশী, কিন্তু লরেন্‌সের বেলাতেও দেখা যায় যে দেশের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জীবন দেখে তিনি Proustএর মতই রিপোর্ট দিলেন; দুজনেই

দেখলেন যে ওপরে আছে ক্ষয় আর অবসাদ। লরেন্‌সের বিরাট শক্তি তাই যেন প্রতিহত হয়ে গেল; নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে একটা নতুন মিস্‌টিসিজমে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন। লরেন্‌সের লেখার যাঁরা অনুকরণে ব্যস্ত, তাঁদের সাহিত্য হল পুরোপুরি জীবন ছেড়ে পলায়নের সাহিত্য।

Aldous Huxley'-র লেখায় আমরা তাঁর মার্জ্জিত মনের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি; ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। কিন্তু সে লেখার সর্ব্বত্র এমন একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে রয়েছে যা' সাক্ষ্য দিচ্ছে সমাজের জীর্ণপ্রায় অবস্থা সম্বন্ধে। চিন্তার দৈন্য, অনুভূতির মূঢ়ত্ব, সর্ব্বব্যাপী ব্যর্থতা—এই যেন তাঁর উপজীব্য বিষয়। "Brave New World" পর্য্যন্ত হল ভীতিপ্রদ। Huxley'-র জিজ্ঞাসু মন প্রতিহত হয়ে ফিরছে এই উত্তর নিয়ে—"Thought is an infirmity, Tournebroche my son!"

* * * * *

সম্প্রতি W. B. Yeats "The Words upon the Window Pane"-এর ভূমিকায় লিখেছেন: We can no longer permit life to be shaped by a personified ideal, we must serve with all our faculties some actual thing"। এর অর্থ এই যে Yeatsএর মন পুরাণ-পরিচয় সত্ত্বেও সজাগ আছে, তিনি যথার্থ কবি বলেই। Yeats-এর পরেই নাম করা যেতে পারে Eliotএর; তাঁর সম্বন্ধে এর পূর্ব্বেই কিছু বলা হয়েছে। 'The Waste Land' হচ্ছে আধুনিক কবিতার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী অনুধাবনীয়। এর আবহাওয়ায় যেন রয়েছে শূন্যতার, অবসাদের ভাব; সবই অনিশ্চিত, সবই নিরর্থক, আশা আকাঙ্ক্ষার কোন ভিত্তি নেই, উদ্যম অহমিকারই রূপান্তর, তৃষ্ণার্ত্তের তৃপ্তি বুঝি অসম্ভব। এর ছন্দের বৈচিত্র্য অদ্ভুত; ভাঙা, ছিট্‌কে যাওয়া, লুকানো ছন্দের সঙ্গে সাজানো সুন্দর ছন্দ চলেছে। যে সমাজ এককালে ছিল খুবই শক্তিমান্, তারই ভাঙন্ ধরার ছবি এ কবিতায় পাওয়া যাবে। একটা দৃষ্টান্তও নেওয়া যাক্:

"My nerves are bad tonight. Yes bad. Stay with me.
Speak to me. Why do you never speak ? Speak.
What are you thinking of ? What thinking ? What ?
I never know what you are thinking. Think !
I think we are in rat's alley
Where the dead men lost their bones."

নিম্নশ্রেণীর জীবনের কি সর্ব্বগ্রাসী দৈন্য ফুটে উঠ্‌ছে সামান্য ক লাইনে, কবি যেন শিউরে উঠে সে জীবনের পূতিগন্ধ হ'তে সরে আস্‌ছেন :

"On Margate sands
I can connect
Nothing with nothing.
The broken fingernails of dirty hands
My people humble people who expect
Nothing !"

" 'Now Albert's coming back, make yourself a bit smart.
He'll want to know what you done with that money
he gave you
To get yourself some teeth. He did, I was there.'
'It's them pills I took, to bring it off,' she said.
(She's had five already, and nearly died of
young George.)
'The chemist said it would be all right, but
I've never been the same.'
'You are a *proper* fool,' I said.
'Well if Albert won't leave you alone, there it is,'
I said,
'What you get married for if you don't
want children.'

যে সমাজ, যে সংস্কৃতির সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ পরিচয়, তা ধ্বংসোন্মুখ :—

He who was living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience.
Falling towers

Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal.
London Bridge is falling down, falling down, falling down.

গত মহাযুদ্ধে Wilfrid Owenএর মৃত্যুতে ইংরিজী সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। Owenএর মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য যে বিশেষ সমৃদ্ধ হত, তার আর সন্দেহ নেই। তার একটা কবিতা নিয়ে দেখা যাক্ যে তার মনের উন্মেষ কি ভাবে হচ্ছিল।

"I thought of some who worked dark pits
Of war, and died
Digging the rock where Death reputes
Peace lies indeed.
Comforted years will sit soft-chaired
In room of amber ;
The years will stretch their hands, well cheered
By our lives' ember.
The centuries will burn rich loads
With which we groaned,
Whose warmth shall lull their dreaming lids
While songs are crooned.
But they will not dream of us poor lads
Lost in the ground."

কবিতাটী সুন্দর, কিন্তু মনে হয় যেন এর আবেগ নিষ্ক্রিয়, দুঃখ যেন সহিষ্ণু। Owen আজ থাক্‌লে হয়তো এই ধরণের লিখ্‌তেন।

Yet living here,
As one between two massing powers I live
Whom neutrality cannot save
Nor occupation cheer.

None such shall be left alive :
The innocent wing is soon shot down
And private stars fade in the blood-red dawn
Where two worlds strive.

The red advance of life
Contracts pride, calls out the common blood,
Beats song into a single blade,
Makes a depth-charge of grief.

Move then with new desires,
For where we used to build and love
Is no man's land, and only ghosts can live
Between two fires. (C. Day Lewis.)

* * * *

আধুনিক সাহিত্যে নৈরাশ্য, বিষাদ, অবসাদ, 'cynicism', 'escape', যাঁদের লক্ষ্য হয় না, তাঁরা হয়তো ইচ্ছা করেই অন্ধ সাজেন। অনেক সময় শোনা যায় যে সমাজ-বিপ্লব যে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে পরিবর্ত্তন আন্‌বে, তা নয়; সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান হলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হবে না, সে সমস্যা সনাতন, অচঞ্চল, অভেদ্য। কিন্তু আসলে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের চেয়ে তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান বদল করে দিচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক। অবশ্য ফ্রয়েড্ যাকে বলেছেন, 'সভ্যতার বোঝা' তা সর্ব্বযুগেই মানুষকে বহন করতে হয়েছে। কিন্তু যখনই কোন যুগের অগ্রগতির ও উৎকর্ষের সব পথ আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হয়, তখনই সে বোঝা অসহ্য হয়ে পড়ে। বর্ত্তমান যুগে তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসহনীয় বেদনার অবসাদ দেখা দিয়েছে।

অবশ্য একথা কেউই বল্‌ছে না যে সমাজতত্ত্বজ্ঞান সরেশ না হলে কবির কবিতাও নিরেশ হবে; বুদ্ধিমান্ মার্ক্‌স্‌পন্থী না হলে যে বড় কবি কেউ হতে পারে না, তা বলার মানে বুদ্ধিভ্রংশ। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান যুগে, ধনতন্ত্রবাদের মরণোন্মুখ অবস্থায়, পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই। সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ সব চেয়ে বেশী আস্‌ছে ফ্যাশিষ্ট দেশ থেকে। আর তার কারণ এই যে ফ্যাশিজম্ ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ বিভ্রান্ত চেষ্টা। যাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন, তাঁদের আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে বল্‌ব সহযাত্রী।

Paul Valery কিছুদিন আগে বলেছেন যে ইতিহাস ভুলে গিয়ে নিজেদের "ivory tower" হ'তে রূপসৃষ্টিই একমাত্র উপায়। কিন্তু ইতিহাস নিয়ে খেলা চলে না, কবিশেখরের নির্জ্জন দুর্গও পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়। ইতিহাস ভোলার উপদেশ হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের সংস্কৃতি-সঙ্কটের প্রধান সাক্ষ্য।

শিল্পী, সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা সমাজ-বিপ্লবকামীদের সহযাত্রী, তাঁরা বিপ্লবের যুগে তাঁদের আর্টকে ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন অস্ত্ররূপে; "above the battle" থাকার মত প্রবৃত্তি বা দুর্বুদ্ধি তাঁদের হবে না। তাই বিপ্লব যখন আসন্ন বা আগত, তখন আর্টেরও চেহারা বদ্‌লাবে, সে চেহারা মনোরম নয়। যখন বিপ্লব শেষ হয়ে গিয়ে সামাজিক সমস্যার নির্ব্বন্ধ লঘু হবে, তখনই তাঁদের সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিচার করার সময় আস্‌বে। অবশ্য তখন আর্টের "ivory tower"এ প্রত্যাবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন একেবারেই হবে না। যাঁরা "Proletarian literature" শুন্‌লে নাক শিঁট্‌কান বা কোমর বেঁধে তার বিচার করতে বসেন্, তাঁরা একথাটা মনে রাখ্‌বেন। ১৬৪০ সালে Oliver St. John যা বলেছিলেন, আমরা তাই বলি; "All is well; it must be worse, before it is better."

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

পাত্র ও পাত্রী

(১)

চন্দ্রমল্লিকা

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্টকার্ডখানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানিনে তো।
মনে হোলো সময় নেই একটুও।
গাড়ি হয়তো ষ্টেশনে এসে চলে গেছে।
চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
বাগান থেকে তুলে নিলুম
একটা চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তী রঙের।
ওই যা, চাবি ফেলে এসেছি,
ভাঁড়ারের দরজা বন্ধ করিনি।
যাক্ গে।
ষ্টেশনে এসে দেখি
গাড়ি আসেই না,
জানিনে কতক্ষণ গেল,
পাঁচ মিনিট,
হয়তো বা বিশ মিনিট।
গাড়িতে উঠে দেখি
চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে বলে।
আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন,
খানিকটা লাল রঙের কুয়াসা,
একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর,
বেজে উঠ্‌চে বাঁশি,
উড়ে আসচে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলি মুখ মুচছি রুমালে।
অজায়গায় থামল গাড়ি—
দুমিনিট, বা পনেরো মিনিট,
দরকার কী ছিল।
বাঁজল বাঁশি।
গাড়ি চল্‌ল ঘটর ঘটর।
গাছপালা ঘরবাড়ি পাম্পা পুকুর
ছুটেছে জানলার দুধারে
পিছনের দিকে,
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
ফিরে আর পায় কি না পায়।
গাড়িটার তাড়া নেই,
ঘটর ঘটর ঘটর ঘটর।
এক ঘণ্টা, কি দেড় ঘণ্টা,
কী জানি কতক্ষণ।
গাড়ি থামল হাওড়ায়—
বিয়ের কনে, টোপর হাতে আত্মীয় স্বজন,
সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে,
দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
কিছুই নেই।
কনেকে নিতে এসেছিল,
গেল চলে।
যারা এমুখে আসছিল
ফিরল সবাই গেটের দিকে।

গট গট করে আসতে আসতে
গার্ড আমার জানলার দিকে একটু তাকালে,
ভাবলে মেয়েটা নামেনা কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হোলো।
চেয়ে দেখলুম প্ল্যাটফরমের এদিকে ওদিকে,
শেষে বের করলুম থলিটা।
ভাগ্যে ভুলে ফেলে আসিনি।
রাস্তায় এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজ্‌টার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানিনে।
সামনে ছিল বাস্, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।
মনে পড়ল ননি,
যার সঙ্গে ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়েছি
সে থাকে শ্যামবাজারে,
তার নম্বরটা কী?

(২)

অপরপক্ষ

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায়;
বেরোলো খাটের নিচে থেকে।
গলায় বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্য্যন্ত,
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ সুরু করলেন ধীরে সুস্থে;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের,
মিনির জন্যে।
মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকচে একবার ওর দিকে।
ঘড়ির দিকে তাকাচ্চি আর উঠ্‌ছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরলেম; হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্ত মারচে ধাক্কা; মন্দগতি সময়কে
হৃদয়টা মারচে ঠেলা।
ট্যাক্সি ছুটল বেআইনি বেগে।
বড়োবাজারের মোড় এলো; ন'মিনিট বাকি;
দুর্ভাগ্য আর গরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে।
সমস্ত রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে
পাট বোঝাই গোরুর গাড়িতে।
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিষ্টেবল—
নিরেট আপদ, যথেষ্ট ফাঁক হচ্চেনা কোথাও।
নেমে পড়লুম ট্যাক্সি থেকে,
হনহনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া ষ্টেশনে।
ভাবচি এমন যদি হয় যে,
আমার কব্জি ঘড়িটা অন্তত পনেরো মিনিট ফাষ্ট।
কী জানি হয়তো বা—
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
গাড়ি নেই, মানুষ নেই;
আমার ভগ্ন আশা শূন্য প্ল্যাটফরম জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।
বেরিয়ে এলুম বাইরে—
বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার মাঝখানে,
জানিনে যাই কোনদিকে।
বাস্-এর নিচে চাপা পড়িনি নিতান্ত দৈবক্রমে।
এইটুকুর জন্যে দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে
ইচ্ছে করচেনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একমাত্র

বলেছিলাম,
আমার জীবনে একমাত্র নারী তুমি।
যখন মানুষ ও কথা কয়,
তখন কি সে চোখ রাখতে পারে
কেউ মুখ লুকিয়ে হাস্‌ছে কি না!
তুমি হেসেছিলে, না গো?

বোসেদের লীলার কথা তোমার মনে হলো,
এ সব গোপন ব্যাপার ত চাপা থাকে না;
শোনো তাহলে!
বন্ধুর পাহাড়ের দেশে,
পাইন বনের চোখে যখন নামে সন্ধ্যার শীতল আশ্বাস,
যখন ফার্ণের দলে শেষ হাতছানি হয় সমাধা,
শেষ চাওয়া চেয়ে পাহাড়ী ফুল ঘুমে পড়ে ঢুলে—
তখন পাহাড়ী পাখী ফেরে নীড়ে,
তপ্তবুকের সান্নিধ্যে,
তেম্‌নি এক সন্ধ্যার শীতল বিফলতা
তপ্তবুকে বহন করে চলে গেছে বোসেদের লীলা।
ভালো তাকে বাসি নি,—
সে কি হয় গো।

তোমারি মামাতো বোন্ বিভা,—
ডায়ারী পড়েচ বুঝি? তাহলে ত জানো!
মধুমাসে,
অশোকে কিংশুকে ফুল্ল বনতলে
দখিণা হাওয়ার দৌত্যে চলে দোললীলা;
উৎসবের সাড়া জাগে দিক্ থেকে দিগন্তরে।

সন্ধ্যা মদালসা,
উত্তপ্ত আলিঙ্গনের মতো দেহ ঘিরে নামে!
বিভা এনেছিল বহন করে এই উৎসবের বারতা তার সর্ব্বদেহে,
অপূর্ব্ব সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনা বিভা!
তার নিমীলিত নয়নের ঈষৎ স্ফুরণে,
রক্তিম অধরের মৃদু শিহরণে, স্তনতট-চুম্বী চাঁপার মালার
আলোড়নে ছিল যে আমন্ত্রণ,
তাকে অস্বীকার করব?
সে কি হয় গো!

শোনো নি শিলেটের শর্ব্বরীর কথা।
আগের চেনা নয়, পূজোর ছুটির পর কল্‌কাতা ফিরতি
জাহাজে দেখা, পদ্মার বুকে।
মাঝ গাঙে, দিনশেষে, অকস্মাৎ এলো ঝড়।
মনে হোলো,
আকাশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের লড়াই বাধ্‌লো—
গুরু গুরু নির্ঘোষ—ঘোর হুহুঙ্কার!
চল্‌লো বিদ্যুতের ছোরাখেলা আকাশের বুক চিরে চিরে!
ধর্ষিতা প্রকৃতি অসহায় ধারা বর্ষণে কোরলো আত্ম-নিমজ্জন!
জাহাজ ডোবে ডোবে!
যাত্রিরা করেছে ভীড় ডেকে, কে আগে উঠ্‌বে জলিবোটে,
কে আগে বাঁধ্‌বে গলায় বয়া
তারি তদ্বিরে।
খালি কেবিনে আমি একা,
ভাব্‌ছি এবারকার মতো পূর্ণ-চ্ছেদ পড়লো তাহলে!
সেই অপ্রকৃতিস্থা প্রকৃতির শঙ্কা, বেদনা, ভীতি
রূপ পরিগ্রহ করে এলো সেই কেবিনে,
শ্যামাঙ্গিনী শর্ব্বরী!

একমাথা কালো চুলের নীচে কালোমেয়ের জলভরা চোখে
জেগে উঠ্‌লো সন্ধ্যার অসহায় অযুচ্চারিত আর্ত্তনাদ—
বুকে সাড়া পড়বে না ?
সে কি হয় গো !

ঋতুতে ঋতুতে সমস্ত সত্তা
দিয়েচে সাড়া অনাহত ধ্বনির সাথে তাল মিলিয়ে,
আমার প্রাণবান, জীবন্ত সত্তা।
ভালোবাসি প্রত্যেকটি পরমক্ষণ, জীবন-পথের প্রতি সঙ্গিনীকে
ভালোবাসি—ভালোবাসি তাদের স্মৃতিকে !
জানো,—
একদিন অনন্ত সমুদ্রের বিশালতার বুকে জাগ্‌লো পৃথিবী,
সমুদ্রের মতো বিশাল নিঃসঙ্গতা বুকে বয়ে এলো সেখানে
মানুষ, সৃষ্টির প্রথম মানুষ ;
স্তব্ধ বনানী গুরুভার যূক সাহচর্য্যে ক্লিষ্ট !
সেদিন অকুণ্ঠিতা উষার মতো
যে নারী উদয় হয়েছিলো মানুষের গগনে, সৃষ্টির প্রথমা নারী,
বহন করে এনেছিল কী সে ?
মানুষের বলিষ্ঠ বুকে,
পুষ্ট মাংসপেশীতে,
স্বপ্নময় নয়নে জেগেছিল কী আলোড়ন ? শুধু প্রেম ?

আমার জগতের
তমোনাশিনী উষার মতো তোমার অভ্যুদয়,
প্রাণসঞ্চার তোমার নয়নোন্মীলনে,
জীবন্ত সত্তার তুমি পরম সত্য,
একমাত্র নারী !

আমি কি দেখতে যাচ্চি তুমি হাস্‌চো কি না ?
হাসো না গো !

শ্রীযুবনাশ্ব

দ্বিপ্রহরে

মেঘ্‌লা এ-দুপুরের বৃষ্টির নূপুরে
বাজে শোন্ বাদলের বাঁধভাঙ্গা ছন্দ,
এলো-মেলো বাতাসের আন্‌মনা বিলাসে
ভেসে আসে কাননের ভিজে ভিজে গন্ধ !
কোন কাজে মন নেই, শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি,
আকাশ ধরণী ছেপে এল বুঝি ঢল্ আজ,
পুরাণো যা কিছু কথা ভেসে যাক্, ডুবে যাক্,
আজকের কথা কিছু বল্ আজ।
কেশে তোর ঘনিয়েছে ঘন মেঘ-সমারোহ,
চোখের কানায় তোর কাঁপে জল,
থম্‌থমে ভাদরের আলোহীন আকাশের
আবছায়া ছবি তুই অবিকল !
সহসা তাকাতে গিয়ে চুলে পড়ে মন-প্রাণ,
ঠোঁটে তোর কি বিজলী চমকায়,
অতল বাদলে আজ ঘুম-ভরা দুপুরে,
আয় তুই আরও কাছে সরে আয় !
কি কথা বল্‌তে চাই, বলা কিছু হয় না—
সব কথা থেকে যায় গোপনে,
ভুল নিয়ে ভেসে যাব', পাইনে যে থৈ তারো,
হাবুডুবু আলুথালু স্বপনে ;
বেহালা থাকুক প'ড়ে গান আর হবে না,
কাঁদে জল ছল্ ছল্ জানালার গায়ে ঐ,
গহন রাতের গান ভরা দিন দুপুরে
শুন্‌বিতো কাছে আয়, আরও কাছে আয় সই।

সুধাংশুশেখর সেন গুপ্ত

জিজীবিষা

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?
অমরলোকের ইসারা তোমার চোখে।
ক্রান্তিবলয় শ্রান্ত সুমেরুলোকে।
আজ কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা ?

অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে
স্মৃতিবিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।
আজ কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা ?
তোমার শরীর অলকানন্দা-গান।
অচ্ছোদনীরে করেছিলে যবে স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরিল ক্রন্দসী।

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি।
প্রাণসূর্য্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরিল ক্রন্দসী।
উত্তরকরে মুদ্রিত বরাভয়।
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্তফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?
হে বীর মদন, জীবনের ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা।

শ্রীবিষ্ণু দে

মেঘদূত

(১)

শাপগ্রস্ত ঝড়,
কালির আঁচড়
বর্ণধূলি ॥

হে যক্ষ,
তুমিও সে-মেঘে
অঙ্গুলি-
কম্পিত রেখার সূক্ষ্ম তুলি-
লগ্ন হলে চিত্রীর উদ্বেগে।
তব সখ্য
ছাপার অক্ষর,
কালিদাস ॥

সে-ছবি,
সংস্কৃত কাব্য,
ছাত্রের, প্রিয়ার নয় ; হোলো ইতিহাস,
খোঁজে ভগ্নশেষ,
উজ্জয়িনীচূড়ার উদ্দেশ ॥

(২)

বৃষ্টি পড়ে,
ছাতাঅলা গলির ভিতরে।
গঙ্গা,
বেত্রবতী নদী নয়, শিপ্রা নয়, তবু তা'র সংজ্ঞা
সেই জলে, সেই মেঘে, হাওয়ার প্রবাহে।
(আজিকে কাহারে চাহে ?)

হাওড়ার পুলে,
লক্ষ লক্ষ,
হে যক্ষ,
মনোরথে নয়, বাস্-এ, মোটরে ইত্যাদি
অনাদি
তোমাদেরই বহি এই ধারা।
এ জীবন আজও মিল-হারা।
দেখো, অদ্ভুত,
চলে মর্ত্যে দুই মেঘদূত॥

(৩)

এরও পারে,
যক্ষ,
কোথা নিজে তুমি?
সে কোথায়?

রচিবারে
কোন্ কবি পারে মেঘকায়া,
জলের হাওয়ার ছায়া
পূর্ণতর সেদিনের? সেই ভূমি,
জম্বুবন; অণুবীজ হতে সত্তা উঠিছে কুসুমি'?
নব রামগিরি-
আশ্রমের সংস্করণ ঘিরি'
শাপমুক্ত কোন্ সৃষ্টিঝড়ে
তিন মেঘদূত এক হবে
আপনা-সম্পূর্ণ শিখা
রিক্ত-মরীচিকা
কবে

কালির আঁচড়ে,
বর্ণধূলি-
লগ্ন কোন্ চিত্রীর অঙ্গুলি-
ঘূর্ণাবেগে,
জেগে-
ওঠা বাদলের কণ্ঠস্বরে?

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকী

কবিদের অনুপকারিতা অনেক আগেই ধরা পড়েছে, এবং অন্তত হেগেল্-এর পর থেকে দর্শনও শূন্যকুম্ভ ব'লে পরিচিত। এটা বিজ্ঞানের যুগ; আধুনিক অতিপ্রাকৃত এঞ্জিনিয়ারদের হাতে, আজকালকার কথামৃত গণিতব্যবসায়ীদের মুখে, সত্যের যূপে স্বার্থবলিদান দেখতে সাম্প্রতিক মানুষ আর সাধকের আশ্রমে জোটে না, পদার্থবিদের প্রয়োগাগারেই ভিড় জমায়। তাহলেও বর্ত্তমান জগৎ পূর্ব্ববৎ কুসংস্কার-প্রবণ; এবং প্রাচীন মিসর যেমন পুরোহিতদের অপ্রমাদ ভেবে জাতীয় বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করেছিলো, আমরাও তেমনি বৈজ্ঞানিকদের অতি-মানুষ বিবেচনায় মহাপ্রলয়ের অভিমুখেই এগোচ্ছি। আসলে বিজ্ঞান মানুষী জ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র বিভাগমাত্র; এবং সেই সাবয়ব জ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতিই যেহেতু সত্য-পদবাচ্য, তাই গণ্ডিবদ্ধ বিশেষজ্ঞেরা অনেক সময়েই মরীচিকার মায়াজালে জড়িয়ে যান, নিরক্ষরদের ভূয়োদর্শী প্রবচনেই যাথার্থ্যের সন্ধান মিলে। অবশ্য এ-অভিযোগ ওয়েল্স্-প্রমুখ বিজ্ঞানস্তাবকদের বিরুদ্ধেই পোষণীয়; কিন্তু হাক্স্লী ও তাঁর সম-সাময়িক প্রবক্তারাই এই একদেশদর্শিতার উদ্ভোক্তা; এবং নিজেদের উপজীবিকা সম্বন্ধে প্লাঙ্ক্, জীন্স্, শ্র্যাডিঙ্গার ইত্যাদির অতিমাত্রিক বিনয় যদিও অনেক অন্ধেরই চোখ ফুটিয়েছে, তবু হিটলারী আর্য্যাবর্ত্তের জটিল চক্রান্তেও বৈজ্ঞানিক স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নেই। তবে এতে আশ্চর্য্য হওয়া বৃথা। কারণ ইদানীন্তন রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদবী চাইলেও অণু-পরমাণুর সাম্য এখনো মনুষ্যসমাজে অপ্রতিষ্ঠিত; এবং রাসেল্-এর মতো বিজ্ঞান-সচেতন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভৌতিক অনিশ্চয়বিধির মধ্যেই নৈরাজ্যের অনুমোদন খুঁজেছেন বটে, তত্রাচ সে-প্রযত্নে যুক্তির চেয়ে পক্ষপাতই হয়তো বেশি। কিন্তু সেজন্যে বিজ্ঞান দোষাবহ নয়, বৈজ্ঞানিক-দের মতান্ধতাই দায়ী; তাঁরাও যেকালে মানুষ, তখন সন্তর্পণে থাকলেও

মানুষী অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ তাঁদের অর্শায়। উপরন্তু সমাজে আত্মশ্লাঘা বংশমর্য্যাদার তুলনায় গৌণ; এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও অবৈজ্ঞানিকেরা ভুলতে পারে না যে বিজ্ঞান ভানুমতীর শেষ সন্তান। তাই অতিভাবী এডিংটন্-কে আমরা অলৌকিকের কর্ণধার বানাই, ভোরোনফ্-এর অস্ত্রচিকিৎসায় মৃতসঞ্জীবনীর আশ্বাস পাই, ফ্রয়েড্-এর নাম জ'পে ঘোচাই ইচ্ছাশক্তির শোচনীয় দৈন্য।

কিন্তু সাধারণের পক্ষে ভাবালুতা যদিও ভাবুকতার চেয়ে সহজ, তবু কারো প্রতিপত্তি কেবল ফাঁকির উপরে গ'ড়ে ওঠে না; এবং বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যেমন প্রবঞ্চনার অন্ত নেই, তেমনি তার স্বভাবগতিকেই সে আজ অন্যান্য বিদ্যার অগ্রগণ্য। বস্তুত বিজ্ঞান এত দিন তার ব্যাবহারিক আদর্শ ভোলেনি; হয়তো বয়সে সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ব'লে অগ্রজদের দুর্দ্দশা তাকে অত্যধিক কল্পনাবিলাস থেকে বাঁচিয়েছে, এবং সেইজন্যেই সে প্রারম্ভেই বুঝেছে যে জগতে টিঁকতে গেলে তত্ত্ব অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু সে-তত্ত্ব তথ্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-হলে লোকাপবাদ অনিবার্য্য। তাই সে আবহমান কাল শুধু খবর নিয়েছে আর ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজেছে; এবং অধ্যবসায়ের এমনি গুণ যে এই নিরুদ্দিষ্ট পরিশ্রমও অপুরস্কৃত থাকেনি, আজ অবধি কোনো নির্ব্বিকল্প কৈবল্যে পৌঁছুতে না-পারলেও সে ইতিমধ্যে বর্গনির্দ্দেশের তাগিদে যে-সমস্ত আপেক্ষিক নিয়মের সন্ধান পেয়েছে, তা থেকে অন্তত আনীহারিকা বস্তুপুঞ্জের অব্যাহতি নেই। সুতরাং বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আধুনিকদের কৌতূহল কেবলি বিদ্রূপযোগ্য নয়, সে-সম্বন্ধে আমাদের রোমান্টিক মনোভাবও হয়তো মার্জ্জনীয়, এবং বিজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানাতীত সমস্যার সমাধান না চাইলে তার অভয়ে বুক বাঁধাই সমীচীন। এ-কথা পরলোকগত রুষ জীববিদ্যাবিশারদ ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লোভ্ সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য; এবং তাঁর দেহাচারবিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাদিই যদিও মনস্তত্ত্বকে ঔপন্যাসিকের কবলমুক্ত ক'রে প্রামাণিক সাধারণ্যে আসন দিয়েছে, তবু পাভ্‌লোভ্ স্বয়ং কখনো কোনো ব্যাপক সিদ্ধান্তে আপনার লক্ষ্য হারাননি, আমরণ নিজেকে

স্নায়ুপ্রতিক্রিয়ার বিবেচক হিসাবেই দেখেছেন। সম্ভবত সেইজন্যেই চিরদিন আত্মবিজ্ঞাপন বাঁচিয়ে চ'লেও তিনি আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতীকস্বরূপ; সম্ভবত সেইজন্যেই এই অশীতিপর বৃদ্ধের অবশ্যম্ভাবী তিরোধানকেও অনাগতেরা অকাল মৃত্যু ব'লে মানবে।

কিন্তু অনধিকারচর্চ্চায় নিরুৎসাহ হলেও পাভ্‌লোভ্‌ অমানুষিক বা অতিমানুষিক নির্দ্ধর্ষণের প্রচারক ছিলেন না; এবং রুষ বিপ্লবের সাংঘাতিক বিক্ষোভেও তিনি তাঁর সহযোগীদের কাছে কালনিষ্ঠাই চাইতেন বটে, তবু ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে ও পরে জন্তু-জানোয়ারের কষ্ট-লাঘবের জন্যে যে-পরিমাণ সেবাব্রত তাঁকে পেয়ে বসতো, তা হয়তো জৈনদের মধ্যেও বিরল। কিন্তু এই সহৃদয়তার সঙ্গে ইংরেজদের অনাত্ম পশুপ্রীতির তুলনা চলে না; মানুষী অনুকম্পাও পাভ্‌লোভ্‌-এর বক্ষে এমনি আলোড়ন তুলতো যে সমানাধিকার রুষ বৈদ্যপীঠ থেকে পুরোহিত-সন্তানদের তাড়ালে পরে তিনিও তাঁর যাজক পিতার নামে উক্ত অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন। কারণ তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি যে বিজ্ঞান বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের অভিভাবক ব'লেই সাধারণের সহানুভূতি তার প্রাপ্য। ফলত জীবব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে বর্ণাড্‌শ-এর ভাববিলাস তাঁর নিকটে হাস্যকর ঠেকতো, এবং তিনি বুঝতেন যে অনাবশ্যক প্রাণিহত্যা যতই গর্হিত হোক না কেন, বিনামূল্যে জ্ঞানসঞ্চয়ও অসম্ভব। কিন্তু যে-জ্ঞান লোকহিতার্থে অব্যবহার্য্য, তার আকর্ষণ তাঁকে কোনোদিন টানেনি, এবং সম্ভবত সেইজন্যেই যন্ত্রশিল্পের অসম্পৃক্ত উন্নতিকল্পে বোল্‌শেভিক্‌দের নরবলি তাঁর মুখে ফোটাতো ভুরুক্তি, তাঁর কাজে আনতো বিদ্রোহ। তাহলেও এ-প্রতিবাদকে দেশদ্রোহিতা বলা অশোভন, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজের তথাকথিত আন্তর্জ্জাতিকতাও অনুপস্থিত, এবং মাতৃভূমি-সম্বন্ধে তাঁর ও আইন্‌ষ্টাইন্‌-এর মনোভাব মেলালেই পাভ্‌লোভ্‌-এর প্রগাঢ় দেশভক্তি চোখে পড়বে। কেননা নিরীহনিগ্রহে নাৎসীরাষ্ট্র যদিচ সোভিয়েট্‌তন্ত্রেরই পদাঙ্কচারী, তবু এই বৈজ্ঞানিক নীতির উত্তরে বিভীষণ-ভূমিকার পুনরভিনয় দূরে থাকুক, আইন্‌ষ্টাইন্‌-এর মতো স্বেচ্ছানির্ব্বাসনে যাওয়াও পাভ্‌লোভ্‌-এর সাধ্যে

কুলায়নি; এবং প্রায় আশী বছর বয়সে যখন তাঁর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, তখন কর্তৃপক্ষের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরিচর্য্যা নেননি, অনভিজ্ঞ স্বজাতির হাতেই আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং এ-কথা যেমন অবশ্যস্বীকার্য্য যে পাভ্‌লোভ্‌-এর মন জুগিয়ে চ'লে বোল্‌শেভিক্‌ দলপতিরা অসামান্য বিজ্ঞানভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তেমনি এটাও হয়তো নিঃসন্দেহ যে পাভ্‌লোভ্‌ কখনো য়িহুদী বুদ্ধিজীবীদের মতো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধের বীজ বুনে শাসক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্যপরীক্ষায় এগোননি।

বস্তুত পাভ্‌লোভ্‌-এর মতো নির্ব্বিরোধ মানুষ সকল যুগেই দুর্লভ; তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগকেই অন্যায় বিবেচনা করেননি, শ্রমবিভাগও তাঁর কাছে সমান অনুচিত ঠেকেছে। তাই তিনি কখনো নির্জ্জলা বিজ্ঞানে তুষ্ট থাকেননি, চিৎপ্রকর্ষের সকল শাখা-প্রশাখাকেই তুল্যমূল্য ভেবেছেন। এমন-কি বিজ্ঞানের বেলাতেও তিনি যে-আদর্শ থেকে আজীবন প্রেরণা কুড়িয়েছেন, তা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞের আত্মপ্রসাদ জুগিয়েই সার্থক নয়, এক সূত্রের সাহায্যে সর্ব্ববিধ তথ্যের ব্যাখ্যাই তার আশা ও অভীপ্সা। সেইজন্যেই রক্তচলাচল ও হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে অগণ্য আবিষ্কারেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটেনি, তিনি আবার নবীন উৎসাহে পাকস্থলীর পর্য্যালোচনায় নেমেছেন; এবং সেই সাফল্যের জন্যে ১৯০৪ সালে নোবেল্‌ পুরস্কার পেয়েও তিনি অবসর নিতে পারেননি, আরো পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে চৈতন্যকে নাড়িমণ্ডলের ভিতরে এনে দুর্ম্মুখদেরই উপহাস্য ক'রে তুলেছেন। ইতিমধ্যে বিদ্বজ্জনের শত্রুতা তাঁকে পদে পদে বাধা দিয়েছে, মহাসমর তাঁর পুত্রদ্বয়ের প্রাণ নিয়েছে, উপনিপাত তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনেও এমন টান ধরিয়েছে যে মাঝে মাঝে তিনি চলৎশক্তি সুদ্ধ হারিয়ে ফেলেছেন। তবু বিঘ্নের সামনে তিনি মাথা নোয়াননি, বার্দ্ধক্যের কাছে হার মানেন নি, এবং মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে পরলোক সম্বন্ধে নূতন গবেষণায় নেমে ইতিহাসের কীর্ত্তিস্তম্ভে পুনর্ব্বার এই কথা লিখে গেছেন যে মানুষ প্রকৃতিপরায়ণ হলেও পুরুষকারে বঞ্চিত নয়, তার আত্মসমাহিত সঙ্কল্প

প্রতিকূল প্রতিবেশকে তো পেরিয়ে যায়ই, উপরন্তু মহাকালের দিগ্বিজয়কেও প্রয়োজনমতো থামিয়ে রাখে।

অবশ্য আত্মসমাহিতি আত্মরতির নামান্তর নয়; এবং পাভ্‌লোভ্‌ যদিও সাধ্যপক্ষে নিন্দুকদের কথায় কান পাততেন না, তবু সাত্ত্বিক সমালোচনার দিকে তাঁর দৃষ্টি সদাসর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকতো। সত্যানুরক্তিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার; এবং প্রমাণের সম্মুখে স্বকৃত সিদ্ধান্ত পরিহারে তিনি বারম্বার যে-রকম ক্ষিপ্রতা দেখাতেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। উদাহরণত ১৯২৩ সালের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর ধ'রে ইঁদুর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে পাভলোভ্‌ ওই সময়ে এই সাধারণ বিশ্বাসে সায় দেন যে একজনের অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত দক্ষতা বিষয়-সম্পত্তির মতোই তার উত্তরাধিকারীদের বর্ত্তায়। এর ফলে দার্শনিক মহলেও সাড়া প'ড়ে যায়, এবং মনস্তাত্ত্বিকেরা যে সে-বাদ-বিতণ্ডাকে আরো পাকিয়ে তোলেনি, এমন কথা বলতে পারবোনা। কিন্তু পাভ্‌লোভ্‌-এর অপূর্ব্ব আবিষ্কার অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে, সে-তর্কনিষ্পত্তির আগেই স্বয়ং আবিষ্কর্ত্তা নিজের ভ্রান্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন এবং দিগ্বিদিকে নিঃসংকোচে রটান যে তথ্য-সংগ্রহে অসতর্কতাবশতই তিনি এত গোলোযোগ বাধিয়ে বসেছেন। এই জাতীয় নিরাসক্তির নমুনা তাঁর জীবনে অসংখ্য; এবং এই নিষ্কাম অনুসন্ধিৎসার চালনেই হৃৎপিণ্ড থেকে পাকস্থলী ও পাকস্থলী থেকে সমগ্র নাড়িমণ্ডলে তিনি প্রাণরহস্যের অনুধাবন করেছিলেন।

কারণ প্রমাণে আস্থা রাখলেও পাভ্‌লোভ্‌ বাল্যকালেই প্রামাণ্যে নির্ভর খুইয়েছিলেন। তাই পাকযন্ত্রের গণ্ডনিঃসারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি যখন বুঝলেন যে খাদ্যসম্পর্কিত সামগ্রী দর্শনে, এমন-কি খ্যাদ্যের নামেই, জীবের জিহ্বায় লালা ঝরে, তখন ব্যাপারটাকে মনোরাজ্যের অজ্ঞাতবাসে পাঠাতে তাঁর বিবেক আপত্তি জানালে; এবং প্রমাণাভাবে তিনি অগত্যা মনরূপ লোকপ্রসিদ্ধিরই মোহ কাটালেন। কিন্তু অতখানি সংস্কারমুক্তি সকলের সয়না। কাজেই সেজন্যে সহকর্ম্মী স্নার্স্কি-র সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটলো; বন্ধুরা তাঁর চিত্তস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে ভাবতে

লাগলেন; এবং প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় বিশবৎসরব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষাবলীর কল্যাণে মন-সংক্রান্ত পরোক্ষ মতামত ঝেড়ে ফেলে পাভ্‌লোভ্‌ দেখলেন যে মাইণ্ড্‌ আর ম্যাটার-এর চিরাচরিত দ্বৈত অন্তত মনুষ্যেতর জীবজগতে অবর্ত্তমান, সেখানকার সকল আচরণই শুধু স্নায়ু-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বোধগম্য, তথাকথিত মনোব্যাপারেও বিজ্ঞান-সম্মত বহিরাশ্রয়িতা সম্ভব ও সার্থক। কিন্তু জীবের জন্মগত অধিকারে সকল প্রকার আচরণের প্রাক্তন প্রতিমান নেই; উন্মুখীন ও বিমুখীন প্রবৃত্তির মতো গোটাকয়েক সহজ দেহাচার ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতিই সে ঠেকে শেখে; এবং এই শিক্ষা-দীক্ষা যেহেতু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিশেষ ঘটনাচক্রের ফল, তাই তার দেহবাচক নিত্য প্রতিক্রিয়াগুলো যত শীঘ্র বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসে, তার বুদ্ধি-বিচার, আসক্তি-বিরক্তি প্রভৃতি নৈমিত্তিক প্রতিক্রিয়াগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তত অনায়াসসাধ্য নয়। তাহলেও মন হেতুপ্রভব, এবং সাবধান দ্রষ্টা আর উপযুক্ত উপায় একত্রে জুটলেই মনস্তত্ত্বেও বিজ্ঞানের অনির্ব্বাণ আলোক জ্ব'লে উঠবে।

এই অমূল্য আবিষ্কারের সম্মান পাভ্‌লোভ্‌ নিজে নেননি, রুষ শরীর-বিদ্যার আদিগুরু সেচেনভ্‌-কেই দিয়েছেন। কেননা বাল্যবয়সে সেই মেধাবী সাহসিকের 'সেরিব্রল্‌ রিফ্লেক্‌স্‌'-নামক দেহাত্মবাদী পুস্তক তাঁর হাতে আসার ফলেই তিনি নাকি প্রৌঢ়বয়সে কায়িক ও মানসিককে দ্বন্দ্ব-সমাসে বাঁধতে পেরেছিলেন। কিন্তু পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারে এমেরিকান মনোবিজ্ঞানী থর্ন্‌ডাইক্‌-ও তাঁর অগ্রগামী; এবং ওয়াট্‌সন্‌, পার্কার, য়ের্কিস্‌ প্রভৃতি মার্কিনী বিহেভিয়ারিষ্ট্‌-রা তাঁর অনন্যাধীন সমসাময়িক। তবে এতে ক'রে পাভ্‌লোভ্‌-এর স্বকীয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, এবং এঁদের কাছে তাঁর ঋণ মানলে হিউম্‌, হার্ট্‌লি, কঁদিয়াক্‌ ইত্যাদিকেও এই বংশকারিকা থেকে বাদ দেওয়া দুষ্কর। আসলে মানবমনের অনুষঙ্গ-প্রবণতা এরিষ্টটল্‌-এর যুগেও অবিদিত ছিলোনা। কিন্তু জড় আর জীবের বিরোধ সম্পর্কে সেই মহাপুরুষের দুর্মর অভিমত গত আড়াই হাজার বছরে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে ব'লেই আমরা

এখনো উচ্চকণ্ঠে নিঃসম্পর্ক চিত্তবৃত্তির গুণ গাই। তত্রাচ এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্যে জনসাধারণ দায়ী নয়, অপরাধ শুধু মনোবিদদের। তাঁরাই অপবিজ্ঞানের বন্যা বইয়ে মনস্তত্ত্ববিষয়ে আমাদের সরল আস্থাকে ডুবিয়ে মেরেছেন। কারণ তাঁদের মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিতান্ত বিরল; তাঁদের অধিকাংশই ছদ্মবেশী নীতিকার; এবং ধর্ম্মনীতি যেহেতু ন্যায়ের ধার ধারে না, নিষ্ঠাকেই আঁকড়ে ধরে, তাই মনোবিদেরা সঙ্গতি-রক্ষায় ততটা সিদ্ধহস্ত নন, যতটা উপদেশে উন্মুখর।

অবশ্য সেজন্যে তাঁদের চেয়েও তাঁদের অধীত বিদ্যাই বেশি দোষী; সেখানে পরীক্ষার ক্ষেত্র যেমন বিরাট, পরীক্ষার পাত্র তেমনি দুর্লভ, এবং সে-সম্বন্ধে ব্যবচ্ছেদাদি প্রকরণ কেবল বিধিনিষিদ্ধ নয়, জিজ্ঞাসুর স্বভাব-বিরুদ্ধও বটে। কিন্তু এ-কথা যদিও মানুষের বেলাতেই বিশেষভাবে সত্য, তবু জীববিজ্ঞান মৃত্যুর নিদান নয়, জীবনেরই মর্ম্মানুসন্ধান; এবং ব্যবচ্ছেদের অবাধ সুযোগ থাকতেই আমরা সে-বিশ্লেষণে এত দূর এগোইনি, পরাবর্ত্তনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যেই তথ্যের পর তথ্য কুড়িয়েছি। প্রকৃতপক্ষে পর্য্যবেক্ষণের প্রকৃষ্টতর পদ্ধতিই মনোবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন; এবং ব্যবচ্ছিন্ন জীবকে বাঁচিয়ে রেখে, তার কষ্টের মাত্রা যথাসম্ভব গুটিয়ে, নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে তার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ ক'রে পাভ্‌লোভ্‌-ই সর্ব্বপ্রথম এই অভাব ঘুচিয়েছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর স্বতন্ত্র আবিষ্কার-সমূহ আপাতত ওয়াট্‌সনী সিদ্ধান্তের দিকেই ঝুঁকলেও চিন্তাশীলের কৃতজ্ঞতা পাভ্‌লোভ্‌-এরই প্রাপ্য, ওই শেষোক্ত পণ্ডিতের নয়; এবং তাঁর আর ওয়াট্‌সন্‌-এর মধ্যে যে-ব্যবধান বর্ত্তমান, তা হয়তো আর্য্যভট্ট ও গালিলিও-র পার্থক্যের চেয়েও সুদুস্তর। বলাই বাহুল্য যে এ-প্রসঙ্গে মার্ক্‌সবাদীদের অনুকরণে যুগধর্ম্মের অবতারণাও বৃথা; এবং রাষ্ট্রের ইতিবৃত্তে ডায়ালেক্‌টিক্‌ খাটুক বা না-খাটুক, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার সূচ্যগ্র স্থান নেই। কারণ কোনো বিশেষ ধারণা একটা নির্দ্দিষ্ট দেশ-কালে উড়ে বেড়ায়না, ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়োগনৈপুণ্যই পরিকল্পনা-বিশেষকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভোগে আনে; এবং রূপহীন ভাবনা যেকালে ভাবনাই নয়, ভাবনার ভানমাত্র, তখন অলস মনে

আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বেকার মানুষ ভাবুক আখ্যা পায়না, লোকোত্তর চিন্তাকে লোকায়তে নামিয়েই মনীষা তার ভাণ্ডার ভরে।

উপরন্তু সংঘটিত প্রতিক্রিয়াকে আচারবাদে পরিণত করা নিরাপদ নয়, তার সঙ্গে অনুষঙ্গমূলক মনস্তত্ত্বের যোগও আংশিক; এবং জীবনকে অবিভাজ্য ভেবে পাভ্‌লোভ্‌ যদিও দেহ-মনের যুক্ত রাজ্যে একই শাসনতন্ত্রের নিরন্তর প্রসার দেখেছেন, তবু তার ফলে চৈতন্যের মর্য্যাদা বেড়েছে বই কমেনি। কেননা তাঁর মতে একাধিক উত্তেজনার তাৎকাল্যই যথেষ্ট নয়, সেগুলোর তাৎপর্য্যও অবশ্যগণ্য; এবং যেকালে প্রত্যাশায় বারম্বার প্রবঞ্চিত হলে সকল নৈমিত্তিক প্রতিক্রিয়াই থেমে যায়, তখন জন্তুরাও কেবল ইন্দ্রিয়ের তাড়নে চলেনা, তারাও নিশ্চয় অতীন্দ্রিয় তুলামূল্যের সাহায্যেই বোঝে যে অবস্থা-বিশেষে তাদের চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বার সমন্বয় অবস্থান্তরে অব্যবহার্য্য। সুতরাং ওয়াট্‌সন্‌-এর বিপক্ষে রাসেল্‌-এর অখণ্ডনীয় আপত্তি পাভ্‌লোভ্‌-এর সম্বন্ধে খাটে না; এবং কোনো নিত্য প্রবৃত্তির প্রশ্রয় ব্যতীত পরাবর্ত্তকের অদল-বদল তো অসাধ্যই, এমন-কি শিক্ষা যেহেতু শিক্ষকের আজ্ঞাধীন নয়, শিক্ষার্থীরই বিচারসাপেক্ষ, তাই গোলমরিচের গুঁড়ো শুঁকেই আমাদের হাঁচি আসে, তার নাম শুনে কেউ হাঁচতে শেখেনা। আসলে জড়বাদের প্রতি পাভ্‌লোভ্‌-এর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই; বোধহয় হোল্‌ট্‌-এর মতো তিনিও জীব আর জড়ের উপাদানে এক উভয়-সামান্য মূল ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন; এবং তাঁর পারিভাষিক শুদ্ধি অন্তত জীববিজ্ঞান থেকে কথামালার মনুষ্যভাবাপন্ন পশু-পক্ষীদের তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর গবেষণাদি সম্ভবত লাইব্‌নিৎস্‌-এরই সহযাত্রী, তিনিও নিশ্চয় বিশ্বচরাচরে শুধু মনের সোপানমার্গই প্রত্যক্ষ করেছেন। সেইজন্যেই রুষের চার্ব্বাকপন্থীরা সাম্যবাদের সমর্থনে তাঁর প্রক্ষিপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিই আউড়ে বেড়িয়েছেন, কখনো ভুলেও তাঁকে প্রকাশ্য সাক্ষী ডাকেননি। সেইজন্যেই প্রজননবিচার বংশানুক্রমিক অধিকার-ভেদ বিহেভিয়রিজ্‌ম্‌-কেই বিপদে ফেলেছে, পাভ্‌লোভ্‌-এর অদ্বৈত-বাদকে ছুঁতে পারেনি। সেইজন্যেই মানুষ তো দূরের কথা, তিনি

কুকুরের মধ্যেই হিপোক্রেটিস্-আদিষ্ট চতুর্বর্ণ চারিত্র্যের প্রস্তাবনা খুঁজেছেন।

কিন্তু পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপরে প্রমিতির ভিত্তিস্থাপনা মূর্খের কাজ; এবং পাভ্‌লোভ্ পাঠ্যদশায় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখালেও, ওই নামে যে-প্রাপ্তবয়স্ক বৈজ্ঞানিক আজ জগদ্বরেণ্য, তিনি কখনো ব্যাপকতার খাতিরেও কোনো নিষ্প্রমাণ মতবাদের কুহকে মজেননি। বরং হঠকারী সামান্যীকরণ তাঁর এতটা অপ্রীতিকর লাগতো যে সমপর্য্যায়ের সকল জীবকে একই জাতিব্যবসায়ে জোড়া যায় কিনা, তিনি সে-সম্বন্ধেও প্রতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রেখেছেন। তাহলেও মনোবিকলনের দাবি-দাওয়া একেবারে অমূলক নয়; এবং মৃত লোকনায়কের মমির বদলে ক্রুসারূঢ় দেবতার মৃত্যুঞ্জয় মূর্ত্তিকে ভ'জেই তিনি তাঁর যাজ্ঞকোচিত কুলপ্রথার পরিচয় দেননি, হয়তো উল্লিখিত অধিকারভেদেও লাইব্‌নিৎস্ অপেক্ষা সেণ্ট্ অগাষ্টিন্-এর প্রভাবই অধিক। কারণ প্রাণিমাত্রেই অল্প-বিস্তর ব্যক্তিস্বরূপে অধিকারী হোক বা না-হোক, জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিত্য ও নৈমিত্তিকের অবস্থাবিনিময় নিশ্চয়ই প্রগতির পরিপন্থী এবং চিরনির্ব্বিকার প্রাণধর্ম্মের পক্ষপাতী। অবশ্য যথারীতি অভ্যাসের পরে সকল কুকুরই বর্ণ-বিশেষকে খাদ্যের বার্ত্তাবহ মনে করে। কিন্তু এই শিক্ষণীয়তা কখনোই সম্প্রসারিত চৈতন্যের নিদর্শন নয়, অপরিবর্ত্তনীয় চিত্তবৃত্তিরই চিহ্ন; এবং জীবনে বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে সহজাত প্রতিক্রিয়ার অসহযোগেও সংঘটিত প্রতিক্রিয়া জন্মাতো। উপরন্তু সে-রকম নির্ব্বাচনক্ষমতায় ফাঁকি প'ড়েও প্রাণপ্রবাহ যেকালে অদ্যাবধি থামেনি, কেবলি ঘুরে মরেছে, তখন জীব তো স্বয়ংসম্পূর্ণ বটেই, এমন-কি জড়প্রকৃতিও একই ধারায় অনাদ্যন্ত কাল বাঁধা। সম্ভবত সেইজন্যেই খাবার পেলেও কুকুরের লালা ঝরে, আবার লাল আলো জ্বললেও তার জিভে জল আসে; এবং এই বিপরীত উত্তেজনার উত্তরে একই প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে কুকুর নিশ্চয়ই তার আলোকপ্রাপ্তির সংবাদ রটায়না, সে এই কথাই বলে যে বস্তুজগতে বৈচিত্র্যের সুযোগ এমনি পরিমিত যে আলোকে

আহার্য্যের কোঠায় ফেলাই স্বাভাবিক। নচেৎ জন্ ষ্ট্যুয়ার্ট্ মিল্-এর মতো সংশয়বাদীও অন্বীক্ষার আরোহণপদ্ধতির দোষস্খালনে প্রকৃতির সমভাব খুঁজতেন না; নচেৎ সহস্র কোটি বৎসর আগেকার নক্ষত্ররশ্মিকে অত্যাধুনিক দৃক্‌শাস্ত্রের বিধান মানাতে গিয়ে ডি সিটার বিশ্ববিস্তারের অনর্থ বাধাতেন না; নচেৎ পাভ্‌লোভ্-এর মতো ব্যক্তিবাদীর জীবন কাটতো না সার্ব্বজনীন নাড়িমণ্ডলের চাপ ছ'কে।

সৌভাগ্যক্রমে সে-কথা পাভ্‌লোভ্ জানতেন; তাই বিজ্ঞানের মতো ব্রহ্মবিদ্যার চূড়ান্ত মীমাংসাও তাঁর সন্দেহ জাগাতো, এবং তিনি বুঝতেন যে অতীত ও বর্ত্তমান লোকাচারে স্বাধীনতার সুদূর সম্ভাবনাও যদিচ দুর্ঘট, তবু অন্তত অনধিগম্য আদর্শ হিসাবে সেই অভীপ্সাই মানবত্বের একমাত্র লক্ষণ। কিন্তু সাম্রাজ্য, গণতন্ত্র ও তথাকথিত সমানাধিকার, এই তিন শাসনপদ্ধতির সঙ্গেই ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষে এসে তিনি স্বভাবত ভেবেছিলেন যে স্বার্থচালিত মানুষও যন্ত্রপুত্তলীর মতোই অভ্যাসের দাস। তাহলেও তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে আত্ম-বেদের সম্মুখে অনিষ্টের শক্তিও দাঁড়াতে পারবে না; এবং বহিঃপ্রকৃতিকে না-বেঁধেও তার আংশিক পরিচয় পেয়েই মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য যখন এতখানি বেড়েছে, তখন তার অন্তঃপ্রকৃতি না-বদলালেও শুধু আত্ম-জ্ঞানের সাহায্যেই সে সকল হিংসা-দ্বেষকে ছাড়িয়ে যাবে। এই আত্ম-জ্ঞান একা বিজ্ঞানেরই দাতব্য কিনা, সে সম্বন্ধে পাভ্‌লোভ-এর কোনো স্পষ্টোক্তি নেই; তবে তাঁর নিত্যকর্ম্মতালিকায় শিল্প প্রভৃতির অনুশীলন এতখানি জায়গা জুড়েছিলো যে সে-সমস্তকে অনাবশ্যক ব্যসন বলা অসঙ্গত। হয়তো তাঁর বক্তৃতাবলীর আভাস-ইঙ্গিত এই ধারণারই অনুকূল যে বিজ্ঞানকে তিনি জ্ঞানার্জ্জনের উপায় মাত্র বিবেচনা করতেন; বিভিন্ন জীবনযাত্রার বিরোধী উপকরণের সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিজ্ঞান একটা নির্দ্বন্দ্ব বিশ্ববীক্ষার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানচিত্র আঁকবে, বোধহয় এই ছিলে তাঁর আন্তরিক আশা ও ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যেই আসন্ন বর্ব্বরতার অবশ্যম্ভাবী অবসানে পুনরুজ্জীবিত মানব-সভ্যতা ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লোভ্-কে মনুষ্যধর্ম্মের অন্যতম পুরোধা ব'লেই চিনবে।

পুস্তকপরিচয়

Rajmohan's Wife—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(প্রকাশক, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী অফিস)

মাইকেল মধুসূদনের মতনই বঙ্কিম প্রথম বই লেখেন ইংরেজীতে। সাধারণে খবরটুকু জানত না। বঙ্কিম বাবু শেষ জীবনে একটা নূতন নভেল লিখতে আরম্ভ করেন—তার মাত্র সাতটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল। বঙ্কিম বাবুর ভাইপো সচীশ বাবু তাকে সম্পূর্ণ করেন এবং তার নাম দেন 'বারি-বাহিনী'। শচীশ বাবুও জানতেন না যে বইটা Rajmohan's Wife নামে প্রকাশিত ইংরেজী নভেলেরই অনুবাদ। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ইংরেজী বইটা তারও দু'বৎসর পূর্ব্বের লেখা, যখন বঙ্কিমের বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। কিশোরী মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত Indian Field নামক সাপ্তাহিকে ১৮৬৪ সালে বইখানি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ সাপ্তাহিকের কোনো কপি সাধারণ লাইব্রেরীতে না থাকার দরুনই বঙ্কিমের প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে এমন অজ্ঞানতা। বঙ্কিমও নিজে বইখানি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। কারণ ঠিক জানা নেই, তবে সে সম্বন্ধে স্বকীয় গৌরব-বোধের এবং পাঠক-বর্গের মধ্যে উৎসাহের অভাবই অনুমান করা চলে।

বইখানির আবিষ্কার সত্যই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র লেখক ঐতিহাসিক ব্রজেন বাবুর অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি সর্ব্বজনবিদিত। কিছুকাল পূর্ব্বে অন্য বিষয়ে নিজের গবেষণাসম্পর্কে ১৮৬৪ সালের হিন্দু পেট্রিয়ট তিনি খোঁজ করেন। খোঁজ পেলেন ৺কৃষ্ণদাস পালের পৌত্র শ্রীসীতানাথ পালের লাইব্রেরীতে। যে ভলুমে ঐ বৎসরের হিন্দু পেট্রিয়ট বাঁধান ছিল তারই পাতা ওলটাতে ওলটাইতে ব্রজেন বাবু দেখলেন সেই সঙ্গে ঐ বৎসরের Indian Fieldও রয়েছে। যতগুলি সংখ্যা পেলেন তাতে তিনটি অধ্যায় ব্যতীত ইংরেজী নভেলটির বাকী সব অধ্যায়গুলিই ছিল। দপ্তরীর এই ভূলে বঙ্কিম-সাহিত্যের মহৎ উপকার হল।

নব-প্রকাশিত বইখানিতে ৪ থেকে ২১ অধ্যায় ও উপসংহার বঙ্কিমের লেখা—দু'একটি অক্ষর ছাড়া, যেগুলি পোকায় খেয়েছিল। প্রথম তিনটি অধ্যায় শচীশ বাবুর প্রকাশিত ও বঙ্কিম বাবুর লিখিত বারি-বাহিনী নামে বাংলা বইএর প্রথম তিনটি অধ্যায়ের অনুবাদ। এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ বঙ্কিমের ইংরেজী রচনাভঙ্গীরই অনুযায়ী। অতএব বইখানিকে পূর্ণাবয়বই বলা চলে।

স্বাধীন দেশে এই প্রকার কোনো সাহিত্যিক আবিষ্কার ঘটলে দেশময় একটা সাড়া পড়ে। কেবল তাই নয়, প্রথম সংস্করণের জন্য নীলামে হাজার হাজার টাকার ডাক ওঠে। এ পোড়া দেশে খবরের কাগজে সাড়া পড়ে যে কোনো

লোকের চরিত্রস্খলনে, এবং টাকা ছড়িয়ে পড়ে গোপন চিঠির প্রকাশ দমনে। সে যাই হোক—এই মহামূল্য আবিষ্কারের জন্য ব্রজেন বাবুকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়ে পরে বইখানির অন্য মূল্য যাচাই করিতে হবে, নচেৎ পরিচয়ের মতন পত্রিকার কোনো সার্থকতাই থাকে না।

এই ইংরেজী বইখানিকে বঙ্কিম-প্রতিভার অভিব্যক্তির সূচনা, সমসাময়িক সমাজের চিত্র, এবং মাত্র একখানি নভেল হিসেবে ধরা চলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছোট্ট বইখানি বঙ্কিম-প্রতিভার বীজ-ভূমি। অঙ্কুরগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির নির্দ্দেশ করছি। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা বিষয়ের আদর্শের আভাসও এখানে পাওয়া যায়।

বইখানির চতুর্থ পরিচ্ছদে মথুর-মাধব ঘোষের বংশপরিচয় নতুন সম্প্রদায়ের জমীদার-বর্গের সম্বন্ধে বঙ্কিমের গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে। ঘোষেদের সদর ও অন্দর মহলের বর্ণনা যেন নগেন্দ্র ও কৃষ্ণকান্তের বাড়িরই বর্ণনা। উইল সংক্রান্ত ঘরোয়া বিবাদ, সরিকী মনোভাব, সম্পত্তি ভাগ, দাস-দাসীর আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, এমন কি বৈঠকখানার সাজ সজ্জা পর্য্যন্ত আমাদের অত্যন্ত পরিচিত।

চরিত্র সৃষ্টিতেও বঙ্কিম বাবু যেন হাত পাকাচ্ছেন; অর্থাৎ পরবর্ত্তী উপন্যাসের অনেক টাইপ এখানে বর্ত্তমান, গোটাকয়েক স্পষ্ট ও গোটাকয়েক অস্পষ্টভাবে। মোটামুটি বলা চলে—রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও মথুরের স্ত্রী তারা এক টাইপের; মাতঙ্গিনীর বোন এবং মাধবের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী অন্য টাইপের —দুইই লক্ষ্মী মেয়ে। মথুরের দ্বিতীয়া স্ত্রী চম্পক যেমন হয় অর্থাৎ সুন্দরী ও হিংসুটে। একমাত্র খারাপ স্ত্রীলোক সুখীর মা। পুরুষদের মধ্যে রাজমোহন ডাকাতের গুপ্তচর, নিষ্ঠুর ও হিংসুক, মথুর অসচ্চরিত্র ও লোভী জমীদার—(অনেকটা দেবেন্দ্রের মতন), এই দুজন খারাপ। সর্দ্দার ও ভিখু লোক মন্দ নয়। লেখক হিসেবে ডাকাতের প্রতি বঙ্কিমের মোহ ছিল। এই বইতে ডাকাত, পরের বইএ ডাকু সন্ন্যাসী, তারও পরে বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী। মাধবই বইখানির নায়ক, ইংরেজী শিক্ষিত সহরে প্রকৃতির অর্থাৎ ভদ্রলোক। যে যে গুণ বঙ্কিমের সমগ্র নভেলের নায়কেই পাওয়া যায় মাধবও সেই সব গুণের আধার। মাধবকে প্রতাপও বলা যায়। বইখানিতে কোনো সন্ন্যাসী নেই। ভূতপেত্নী আনতে পারেননি বলে বঙ্কিম পাঠক-বর্গকে চাঙ্গা করেছেন—এটাও তাঁর পঞ্জিটিভিজমের পূর্ব্বাভাস। কিন্তু এলে গল্প আরও জমত।

গল্পের প্লট ও চরিত্র-সমাবেশ এই বইখানিতে দুটি বিভিন্নরূপ নেয়নি—পরেও তারা হরিহরাত্মা। বইখানির গল্প যেন ছুটছে—মাত্র ১৫৫ পৃষ্ঠার মধ্যে কি না হোলো—এক চরিত্রের অভিব্যক্তি ছাড়া! বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ বইগুলির প্লট যেন এই বই থেকেই ভাঙিয়ে নেওয়া। মাতঙ্গিনী ও মাধবের বাল্যপ্রেম, উইলচুরি, সুখীর মায়ের দৌত্য, মথুর-চম্পকের কথোপকথন, মথুর-রাজমোহনের সংভাষণ, মাতঙ্গিনী-তারার মাহাত্ম্য সবই পরবর্ত্তী উপন্যাসের উপাদান ও অঙ্গ।

বর্ণনাভঙ্গীও যুবক বঙ্কিমেরই উপযুক্ত। দ্রুত ঘটনার পর সেই রসিকতার অবসর, সেই গুরুগম্ভীর ভাষায় বিদ্রূপ, সেই গ্রাম্যভাষায় গ্রাম-বাসীদের কথোপকথন, স্বামী-স্ত্রীর সেই রসালাপ বর্ণনায় সেই সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয়, প্রকৃতির সেই রোমাঞ্চকর বর্ণনা সবই এই বইএ বিদ্যমান।

সমসাময়িক সমাজের চিত্র হিসেবে বইখানির মূল্য অত্যন্ত বেশী। মাত্র বছর পাঁচেক পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। ইংরেজ শাসন তখনও গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি—ডাকাতের দল তখনও ডাকাতী করে বেড়ায়, জমীদাররাও তাদের সাহায্য ভিক্ষা করে, গ্রামের সুন্দরী স্ত্রীলোক তখনও অত্যাচারী জমীদারের ভয়ে পথেঘাটে বেরোন না। অন্তঃধারে একদল ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় উঠছেন (বঙ্কিম মাধবকে গ্রামবাসী করেছেন!)—যাঁরা অত্যাচারী নন, গ্রামের বাড়িতে সোফায় শুয়ে ইংরেজী বই পড়েন (কি বই লেখা না থাকলেও অভ্যাসটা বাঙ্গালীর পক্ষে বহু পুরাতন দেখা যাচ্ছে)। এঁরা একটু নিরীহ প্রকৃতির, অত্যাচারের বিপক্ষে টুঁ-শব্দটি করেন না, এক বাড়িতে ডাকাত পড়ার খবর কোনো স্ত্রীলোকের মুখ থেকে শুনে উইল রক্ষার জন্য ডাকাতদের চেয়ে মাত্র বেশী চেঁচিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া। তখন থেকে ডাকাতপড়ার কিছু দিন পরে এসে দুষ্টের দমন করতে সুরু করেছেন জেলার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট। এই বইএর সাহেব জাতিতে আইরীশ এবং পুলিশ রিপোর্ট অগ্রাহ্য করবার সাহস ধরেন বলে interfering। এটাও পূর্ব্বলক্ষণ। এই সাহেবের আগমনবার্ত্তা শুনেই মধুর ঘোষ নামে জমীদার মহাশয় আত্মহত্যা করেন।

প্রেম ও বিবাহের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত বঙ্কিমী মতামত বইখানিতে ওতপ্রোত। বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাৎ, প্রেমনিবেদনের পর সংযম, স্ত্রীর আদর্শ সতীত্ব ও প্রেম—এমনকি রাজমোহন ও মধুর বাবুর মতন স্বামীর প্রতিও, কোনটাই এতে বাদ যায় নি। যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু পরেও আসেনি। শৈবলিনী ও সূর্য্যমুখীর স্বামীগৃহত্যাগ যদি সন্ন্যাসীর দ্বারা শোধিত না হত তবে সে-কর্ম্ম মাতঙ্গিনীর মাধব ও মধুর গৃহে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকৃত রাত্রি-বাসের মতনই সমাজবিগর্হিত হত না কি? বঙ্কিমের মতে চুই স্ত্রী থাকার পরিণাম খুব অশুভ নয়, কেবল মান অভিমানের দাবীদাওয়া মেটান ছাড়া। বঙ্কিমের কাছে বিবাহের চেয়ে বড় কিছুই ছিল না, এখানেও নেই।

স্ত্রীজাতির মধ্যে এক নিম্নশ্রেণীর দাসী বাঁদীদের ওপরই বঙ্কিম বিরক্ত ছিলেন। বাকী স্ত্রীলোক দুই জাতের—পরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—এ-বইএ ইঙ্গিত মাত্র আছে—এক তেজী, অন্য মিনমিনে, ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে। শেষের দলই হিংসুটে, সকলেই। তেজী মেয়েদের সম্বন্ধে বঙ্কিম এই বই-এর বিংশ-অধ্যায়ের শিরোনামায় লিখছেন, 'Some women are the equals of some men'। কিন্তু তেজী হয়েও পুরুষালী নয়। মাতঙ্গিনী ও তারা বঙ্কিমের আদর্শ রমণী, বিমলারই আত্মীয়া। কর্ত্তব্যের খাতিরে (?) মাতঙ্গিনী নিশুথ রাতে পাড়াগাঁয়ের জঙ্গুলে রাস্তা দিয়ে ভগীপতির বাড়ি যায়, স্বামীর হাতে যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে স্বামীর টানে (?) তারা দেবী লণ্ঠন হাতে করে বাগান অতিক্রম করে, রাস্তায় ডাকাত, আকাশে প্যাঁচার ডাক কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না, কম সাহসের কথা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে ভগীপতির সামনে মাতঙ্গিনীর এক হাত ঘোমটাও লক্ষ্য করবার জিনিষ। কিন্তু একবার খুললে মুখ আর থামে না, পরে বুক বাঁধতে হবে জেনেও। এই শ্রেণীর তেজী মেয়েদের শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না। কেবল ইচ্ছা হয় অষ্টম অধ্যায়ের

(যেখানে মাধব পৌঁছেই ডাকাত তাড়ালেন) নাম করণ এই প্রকার হল না কেন, Some men are the equals of some women? অবশ্য পুরুষের আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিম কোথাও খোলাখুলি কিছু লিখেছেন বলে মনে পড়ছে না। মাধবই যখন এই বই-এর নায়ক তখন তাকেই আদর্শ পুরুষ ভাবলে অন্যায় হবে না। যে ডাকাতরা আওয়াজের চোটেই ছুটে পালাল তারাও মাধবের গুণের অধিকারী। বইখানির শেষে রাজা-প্রজার সম্বন্ধে ইঙ্গিতটুকু নিতান্ত অল্প বয়সের লেখা বলে বাংলার স্বদেশ-প্রেমের জন্মদাতাকে ক্ষমা করা যায়।

মাত্র নভেল হিসেবে দেখলে বলা চলে, বাংলা সিনেমা ও টকীর উপযুক্ত এমন ভাল বই বঙ্কিম এর পরে আর কখনও লেখেন নি। জমীদার-বাড়ির সদর ও অন্দর-মহলের বর্ণনা সত্যই চমৎকার। কিন্তু কেবল ঐ জন্যই বইখানি যে ভাল লেগেছে তা নয়—বইখানির প্রধান গুণ এই যে তাতে কোনো সন্ন্যাসী নেই—"পতিতা"—রমণীকে শোধন করিয়ে নেবার জন্য।

বঙ্কিমের যথার্থ সমালোচনা এ-দেশে এখনও হয় নি—হলে দেশের উপকারই হবে। ব্রজেন বাবুর আবিষ্কার তাতে সাহায্যই করবে। ব্রজেন বাবুর কাছে আমরা কেবল সামাজিক ইতিহাস নয়, সাহিত্যিক ইতিহাসের জন্যও ঋণী। প্রকাশকও ধন্যবাদার্হ। আমার মতে বঙ্কিমের মতন লোকের ফেলা খুদ-কুঁড়োও উপভোগ্য—এটাত' কাঁচা ধান, কিংবা জাঁকাড়া চাল।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Experiments in Autobiography—by H. G. Wells (Victor Gollancz & The Cresset Press)—Vols I & II.

একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে ওয়েল্‌সের আত্মজীবনী তাঁর সাহিত্যিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে পরিগৃহীত হবার দাবী রাখে। এ হিসাব থেকে আমি তাঁর অক্ষয়কীর্ত্তি Outline of History ও Science of Lifeকে বাদ দিয়েছি, কেননা শেষোক্তটি হোল নিছক বিজ্ঞান আর প্রথমটি ইতিহাস বা ইতিহাসের সাজপরা বিজ্ঞান। Science of Life যে একটি মহামূল্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দ্বিমত নেই কিন্তু Outline-এর কৌলিন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মতামত না নেওয়াই হবে প্রীতিকর। বাস্তবিক ওয়েল্‌সের বিরাট খ্যাতির পংক্তিবিভাগ কেমনভাবে নির্দ্ধারিত হবে জানিনে, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে ওয়েল্‌সের লেখা যা কিছু সবই প্রায় বিজ্ঞান, কখন তা ইতিহাসের কখন তা নিবন্ধের কখন তা গল্পউপন্যাসের সাজপোষাকে সজ্জিত। এ সবের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক বার্ত্তাকেও বিজ্ঞান বলা চলে কিনা সন্দেহ, বলা যেতে পারে সে সব অর্দ্ধ বা উপ-বিজ্ঞান। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত আগ্নেয়াস্ত্রের ও বিমানের কল্পনাতে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব দেখতে পান তাঁদের কাছে ওয়েল্‌সের গল্পউপন্যাস বৈজ্ঞানিক সার্থকতা লাভ করতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান ও বিষৎ সমাজে এর সার্থকতা কখনই স্বীকৃত হবে না। অথচ স্বয়ং ওয়েল্‌সের এই সব বৈজ্ঞানিক আজগুবির প্রতি মমতার অন্ত নেই; আত্মজীবনীতে তিনি বলতে ছাড়েন নি যে বিগত

মহাযুদ্ধের বিমান সংগ্রাম তাঁরই কল্পনায় প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। Time-এর fourth dimension তিনিই প্রথম প্রচারিত করেন, রাষ্ট্রে বিপ্লব এনে ব্যক্তিগত অধিকার নির্মূল করে সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবার গৌরবও তিনিই অর্জন করতেন যদি না লেনিন তাড়াতাড়ি ঐ কাণ্ডটা বাধিয়ে বসতেন! বলা বাহুল্য এ সমস্তরই কল্পনা ওয়েল্‌সের মস্তিষ্কে ও রচনায় বাস্তবিক প্রসবিত হয়েছিল কিন্তু অপরিণত কল্পনা ও তার প্রকৃষ্ট পরিণতি—প্রভেদ ত এখানেই। তথাপি ওয়েল্‌স একজন বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক আর আমিও এখানে তাঁর গল্প উপন্যাসের scientific fantasiesএর দর যাচাই করতে বসিনি। এই সব গল্প উপন্যাসের বৈজ্ঞানিক মূল্য যাই হোক তারা এতদূর জনপ্রিয় হয়েছে যে তাদের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না এবং তাঁর Outline of History ঐতিহাসিকদের ইষ্টদেবতা না হলেও জগতে একটা বিরাট কীর্ত্তি বলে আদরণীয় হবে। উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধির একটা না একটা কারণ আছে যা তার স্বাধিকারের অতিরিক্ত। অপর পক্ষে তাঁর আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য এই যে তা এ শ্রেণীর লেখার অন্তর্গত নয়। তাতে কোন বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধি নেই এবং তার সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ স্বকীয়। এরূপ আত্মজীবনী বিরল এমনকি অদ্বিতীয় একথা বলতে বোধ হয় কুণ্ঠার প্রয়োজন করে না।

ওয়েল্‌স এ আত্মজীবনীর নাম দিয়েছেন Experiment in Autobiography। এ এক্সপেরিমেণ্টে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। প্রসঙ্গত আমার তিনটি আত্মজীবনীর কথা মনে জাগছে যাদের নাম করলে বোধ হয় পাঠকের কাছে দোষী হব না। প্রথম রুসোর Cofessions, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, তৃতীয় মহাত্মা গান্ধীর Experiments with Truth। রুসোর Confessions নিশ্চয়ই আত্মজীবনী লেখার অগ্রদূত,—তাতে সত্যের প্রাচুর্য্য থাকলেও প্রবঞ্চনারও কমতি ছিল না, কেননা সে জীবনীর প্রতিষ্ঠা ছিল আত্মগরিমায়। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী কবি-হৃদয়ের উন্মেষের কাব্যময় কাহিনী। মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর প্রতিষ্ঠা অন্য স্তরে—বোধ হয় বলা যেতে পারে তা মূলত আধ্যাত্মিকতায়। ওয়েল্‌সের আত্ম-জীবনী এ কোনটির সমতুল নয়, তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট হোল আত্মবিশ্লেষণের একটা এক্সপেরিমেণ্ট। অপরের জীবনী আলোচনা করতে যে নিস্পৃহা ও নিরপেক্ষতা কাম্য ওয়েল্‌স্ নিজের জীবনী আলোচনায় সেই নিস্পৃহা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োগ করতে পেরেছেন। এই detachment সত্যই বিরল। মানুষ একটা জৈব বস্তুবিশেষ ও সে জগতের একটা বিশেষ কাল ও ঘটনাচক্রের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত; এরই যোগ-সমন্বয়ের ফলাফলে তার শিক্ষা সাধনা কার্য্য ও কীর্ত্তিকলাপ, দোষ ত্রুটি গুণ। এতে গোপন করার কিছু নেই আবার দোষ ত্রুটিকে ক্ষুদ্র করে গুণকেও বড় করবার কিছু নেই। এই খাঁটি বৈজ্ঞানিক মনোভাব এ আত্মজীবনীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অথচ এ আত্মজীবনীতে বিজ্ঞানের বালাই নেই। ওয়েল্‌স্ বলেছেন যে নিজের আত্মজীবনীতে তিনি সারা মানবের জীবন্ত ছবি প্রতিফলিত দেখেছেন, তাই তাঁর কাছে ক্ষুদ্র মহৎ, দোষগুণের কোন প্রভেদ নেই।

A variety of biological and historical suggestions and generalizations ...the once amorphous mixture has fallen into a lucid arrangement and through this new crystalline clearness, a plainer vision of human possibilities and the conditions of their attainments appears. I have made the broad lines and conditions of the human outlook distinct and unmistakable for myself and for others.

উপরোক্ত মনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ হোল বিনয়,—এই বিনয় সমগ্র আত্ম-জীবনীতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। গোড়াতেই ওয়েল্‌স্ লিখেছেন—

"If there were brain shows as there are cat and dog shows I doubt if my brain would get even a third class prize···In a little private school in a small town on the outskirts of London it seemed good enough, and that gave me a helpful conceit about it, but compared with the run of the brains I meet now-a-days it seems a poorish instrument, I wont even compare it with such cerebra as the full and subtly simple brain of Einstein, the wary, quick and flexible one of Lloyd George, the abundant and rich grey matter of G. B. Shaw or Julian Huxley's store of knowledge"

একথা বলতেও তিনি ইতস্ততঃ করেননি যে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা যেমন বুদ্ধির নিষ্প্রভতার কারণ তেমনি তা নৈতিক নিষ্প্রেয়তারও উৎপাদক। মস্তিষ্ককে তিনি যেমন উচ্চস্থান দিয়েছেন তেমনি উচ্চস্থান দিয়েছেন শিক্ষাকে, বিশেষতঃ বাল্য-কালের শিক্ষাকে। এই বাল্যশিক্ষার ত্রুটি অনুভব করে তিনি লর্ড কার্জ্জন থেকে ষ্ট্যালিন কাউকে বাদ দেন নি,—বলেছেন Governessএর আঁচলধরা শিক্ষা ও বাল্যকালের অব্যবস্থিত শিক্ষাই এঁদের একগুঁয়েমি ও আত্মম্ভরিতার কারণ। স্কুল কলেজের শিক্ষার আলোচনা, তার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ওয়েল্‌সের আত্ম-জীবনীর অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক জগতের সব রকম শিক্ষা ও সব রকম বিলি-ব্যবস্থাতেই তাঁর মহা বৈরাগ্য; বাস্তবিক ওয়েল্‌সের সমস্ত কল্পনা সমস্ত রচনা একটি কেন্দ্রের চারিদিকে গ্রহমণ্ডলীর মত পরিভ্রমণ করেছে—সে হোল planned শিক্ষা, planned রচনা, planned সমাজ, planned জগৎ। মনে হয় তিনি সারা প্রকৃতির মধ্যে plan-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। সেই plan-কে চালনা করবার বিরাট পুরুষেরই যা কিছু অভাব।

এ সব যাই হোক নভেল ও গল্পলেখক, সমালোচক, journalist, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানশিক্ষক, সমাজসংস্কারক এদের একত্র সমাবেশময় ওয়েল্‌সের বিচিত্র রচনাবলীর উৎস ও পুষ্টি কোথায় তা তাঁর দু ভলুমের ৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী আত্মজীবনীতে সুবিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে। ওয়েল্‌সের বাল্যকাল কাটে দারুণ দারিদ্র্যে,—বাবা ছিলেন বাগানের পরিচারক ও ক্রিকেটার; মা ছিলেন বড় ঘরের পরিচারিকা। বাবা বাগানের কাজ করে ও ক্রিকেট খেলায় আকৃষ্ট থেকেও বাড়ীতে লাইব্রেরী থেকে নানা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনীর বর্ণনা নিয়ে এসে পড়তেন; মায়ের শিক্ষা ছিল নগণ্য। ওয়েল্‌সের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল পোষাকের দোকানের কর্ম্মনবীশি। কিন্তু দৈবাৎ আট-নয় বছর বয়সে পায়ে আঘাত পেয়ে ওয়েল্‌স্ কিছুকালের জন্য শয্যাশায়ী থাকেন। সেই সময় তিনি পাঠের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহার সন্ধান পান ও এই থেকেই তাঁর জীবনের বর্ত্ম অন্যদিকে ধাবিত হয়। Natural Historyর

প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁর এই সময় থেকেই। আর এক কথা, ঐ সময়ই তাঁর নানারূপ রঙীন ছবিদেখে স্ত্রীসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে চেতনা জাগে।

Across the political scenes also marched tall and lovely feminine figures, Britannia, Erin, Columbia, La France, bare armed, bare necked, showing beautiful bare bosoms, revealing shining thighs, wearing garments that were a revelation in an age of flounces and crinolines. I became woman-conscious from these days onwards.

পরে স্বীয় যৌনজীবন সম্বন্ধে নিজেকে অনাবৃত করে দেখাতে তিনি তিল মাত্র সংকোচ করেন নি; স্ত্রীবিলাসের আস্বাদ পান তিনি ১৪।১৫ বছর বয়সেই ও তার আহ্বান আসে তাঁর এক তরুণী আত্মীয়ার কাছ থেকে। পরে তিনি আর এক তরুণীর প্রেমময় বাহুবন্ধনের সুকৃতি লাভ করেন—ওয়েল্‌স্ বলেছেন "কামানন্দ নাহি তায়" এবং প্রকৃতি প্রেমের স্বরূপ তিনি এঁরই কাছে উপলব্ধি করেন। আর এক কথা তিনি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবার যথেষ্ট প্রয়াস করেছেন যে, তাঁর স্কুলজীবনে ১০। ১২ বছরের মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য ও গোপনীয় সংবাদ তার কোনটি থেকেই তিনি বঞ্চিত হননি। স্কুলেতে সহপাঠীর সঙ্গ যৌনতত্ত্বের শ্রীক্ষেত্র এ বিষয়ে এখনও অনেক পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের ভ্রান্তধারণার অন্ত নেই। যা হোক ওয়েল্‌সকে শিক্ষার পথ অবলম্বন করতে দুর্দ্দমনীয় চেষ্টার আশ্রয় নিতে হয়েছিল ও দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের সঙ্গে বিবাদ বিদ্রোহও করতে হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্যবয়স একরূপ শিক্ষকতা ও শিক্ষালাভের একত্র সমাবেশে অতিবাহিত হয়। এ রকম অব্যবস্থিত ভাবে শিক্ষালাভের অসুবিধা তাঁর সময়ে অনেককেই বহন করতে হয়েছে; ওয়েল্‌সের সময় শিক্ষার পদ্ধতিও এখনকার মত সহজ ও সুলভ্য ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় Natural History ভিন্ন সমস্ত রকমের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে ওয়েল্‌সের তীব্র নিন্দা সবাক হয়ে উঠেছে; Physics Chemistry শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধেও তিনি খড়্গহস্ত। Natural Historyর কথা আলাদা কেননা ও বিষয় তিনি ছেলেবেলা থেকেই বোঝেন ও ওবিষয়ে পরিণত বয়সে তিনি Huxleyর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি Midhurst Grammar School থেকে শিক্ষকভাবেই সসম্মানে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ও সে সময়কার নূতন ব্যবস্থানুযায়ী বৃত্তি পেয়ে Londonএর South Kensingtonএ নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পান। এইখানে সেই বিশ্ববিশ্রুত Huxleyর পদতলে তাঁর দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ওয়েল্‌স একমাত্র Huxleyকেই তাঁর বিজ্ঞান-শিক্ষার ইষ্টদেবতা ভেবে ভক্তি-অর্ঘ্য উপহার দিয়েছেন;—"Huxley the acutest observer, the ablest generalizer, the great teacher, the most lucid and valiant of controversialist."। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বীতরাগের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। Natural Historyর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের ফল তাঁর সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে বেশ বিকাশ পেয়েছে। World Historyকেও তিনি Natural Historyর মত সাজিয়ে ছড়িয়ে দেখতে চেয়েছেন আর পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে তিনি যা কিছু গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়েছেন তা হয়েছে আজগুবি। Huxleyর

শিক্ষকতা সম্বন্ধে ওয়েল্‌সের একটা বিবরণপাঠকে মুগ্ধ করবে নিশ্চয়—"I was told that while Huxley lectured Charles Darwin had been wont at times to come through those very curtains from the gallery behind and sit and listen"। কে না জানে Darwinএর evolution তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি Huxleyর কাছে কত না ঋণী।

নর্ম্মাল স্কুল থেকে পাশ করবার পর ওয়েল্‌স London Universityর B. Sc. পাশ করেন ও এই সময় থেকে তাঁর লেখকজীবন সুরু হয়। প্রথম প্রথম তিনি সুরু করেন সমালোচনা ও দু'একটা আজগুবি প্রবন্ধ লিখতে—এর মধ্যে Time Machine বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে তিনি ঐ সময় Educational Times, Science School Journal ও Pall Mall Gazette প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। সাময়িক পত্রিকাদিতে লেখার পূর্ব্ব থেকে তিনি B. Sc ছাত্রছাত্রীদের coaching কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ক্ষয়রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে ছেলে পড়ানো কাজ বন্ধ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখার কাজ বেড়ে চলে। বহু পত্রিকাদি থেকে তাঁর রচনার জন্য আহ্বান আসতে আরম্ভ হয় ও সেই থেকেই তাঁর সৌভাগ্যরবি উদিত হয়। ঠিক কোন সময়ে কি ভাবে তাঁর গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় তার সঠিক নির্দ্দেশ আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় না যদিও এ কথা তিনি স্থানে স্থানে বলে গিয়েছেন কোন ঘটনা থেকে তাঁর কোন গল্প উপন্যাসের আদর্শ সংগৃহীত হয়। তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে—বৈজ্ঞানিক আজগুবি বাদ দিয়ে—কোনটিই আমার কাছে যথেষ্ট উচুদরের মনে হয় নি। আমার কাছে তাঁর Outline ও Science of Life ই মূল্যবান গ্রন্থ বলে মনে হয়। Outline-এর উদ্ভব-কাহিনী ওয়েল্‌স সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন। বিগত মহাসমরের শেষাবস্থায় যখন সারা জগৎ League of Nations-এর কল্পনায় মসগুল সে সময়ে নানাভাবে ওয়েল্‌স এরই কল্পনা প্রচারে ব্যাপৃত হন ও সে অবস্থায় তিনি অনেক মহারথীর সংস্পর্শে এসে এই তথ্য আবিষ্কার করেন যে কূট রাজনীতিতে পাকা হলেও এঁরা অনেকেই জগতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতাসম্বন্ধে অজ্ঞ। এ থেকেই তাঁর Outline of Historyর পরিকল্পনার উদ্ভব হয় ও এতে তিনি অসামান্য সাফল্য ও অর্থলাভ করেন। Science of Life ও Wealth, Hapiness—রচনার পরিকল্পনাও এ থেকেই। সমগ্র প্রাচীন ও আধুনিক জাগতিক বিবরণকে একসূত্রে গাঁথার এই রিয়াট পরিকল্পনা শিক্ষিত জাতের কাছে চিরদিন গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে। আজ ঐভাবের পুস্তক রচনার কত যে অনুকরণ প্রকাশিত তা হতেই এর যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমি এই আলোচনা শেষ করতে চাই। অন্যান্য যে সব লেখক ও ভাবুকবৃন্দের সঙ্গে ওয়েলসের প্রীতিবন্ধন হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Bernard Shaw, George Gissing, Wallace, Joseph Conrad, ও Arnold Bennett। এক Shaw ছাড়া এঁদের বিবরণ আত্মজীবনীর এক রমণীয় অংশ জুড়ে আছে। শুধু আশ্চর্য্য লাগে যে একযার Shaw-এর তীক্ষ্ণ মেধার উল্লেখ ভিন্ন তাঁর প্রতি কোন প্রশংসা বা শ্রদ্ধার নিদর্শন ওয়েলস্ আত্মজীবনীতে

উপস্থিত করেন নি। রাশিয়ায় গিয়ে ওয়েলস্ সেদিন ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করেন ও তিনঘণ্টাব্যাপী রাষ্ট্র আলোচনায় অতিবাহিত করেন কিন্তু তাঁর প্রতি ওয়েলস্ প্রসন্ন নন। সোভিয়েটের আশ্রয়ে গর্কীর মনোগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেও তিনি বিদ্রূপ ও সংশয় ব্যক্ত করতে ছাড়েন নি। যে গর্কী একদিন সমাজের নগণ্যতমের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জয়গানে মুখর ছিলেন সে গর্কীর মুখে আজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রুর অনিষ্টাচার মাত্র। কে জানে ওয়েল্‌সের নির্দ্দেশই ঠিক কি গর্কীর ব্যাখ্যাই ঠিক। বাস্তবিক কি নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোথাও থাকা সম্ভব? সে যাক একজন রাশিয়ানকে ওয়েলস্ তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, সে হোল Pavlov; Pavlov-এর laboratoryকেও তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা এবং এই ৯০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও সমস্ত রাশিয়া যে কি শ্রদ্ধা ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তার বর্ণনা করেছেন। এমন কোন জিনিষ বা এমন কিছু টাকাকড়ি নেই যা Pavlov চাওয়া মাত্র পাননি।

আর একটি বিষয় বাকি আছে সে হোল ওয়েল্‌সের দাম্পত্যজীবন। দাম্পত্য জীবনে ওয়েল্‌স সুখী নন। প্রথমে তিনি যাঁকে বিবাহ করেন তিনি ওয়েল্‌সের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া; এ বিবাহ প্রেমঘটিত নয় এবং ওয়েল্‌স তাঁর নিষ্ঠাবান স্ত্রীর কাছে না প্রেম না তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সম্পদ বা সাড়া খুঁজে পেয়েছিলেন। যখন ওয়েল্‌স তাঁর এক ছাত্রীর কাছে প্রেমের আস্বাদ খুঁজে পান তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাঁর প্রেমাস্পদের বাহুবন্ধনে ঝাঁপ দিতে ওয়েলস ইতস্ততঃ করেন নি। পরে পূর্ব্ব স্ত্রীর সঙ্গে divorce ও নূতনের সঙ্গে বিবাহ হয় কিন্তু আত্মজীবনী পড়ে মনে হয় না যে দ্বিতীয়া স্ত্রীও তাঁর দাম্পত্যজীবনে এমন কিছু অবদান আনয়ন করেছিল। কামের দিক থেকে ওয়েল্‌স সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাই বিনাপরাধে প্রথম স্ত্রী ত্যাগের জন্য তিনি কোন ক্ষোভই স্বীকার করতে রাজী নন। ওয়েল্‌সের এমন বিচিত্র আত্মজীবনীর ষ্টাইল অতি সহজ ও সাধারণ, কোন অলঙ্কার বা রম্যতার প্রয়াস তাতে নেই।

"I am a journalist" I declared, "and I refuse to play the artist". I have stuck to that declaration ever since, I write as I walk because I want to get somewhere and I write as straight as I can, just as I walk as straight as I can, because that is the best way to get there"

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Ancient World—By T. R. Glover, (Cambridge).

(ক)

প্রতীচ্যে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার দ্বারা পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞানের সীমা যে পরিমাণে বাড়িয়ে চলেছেন, সে পরিমাণেই যাতে সাধারণ লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি সম্ভব হয়, এবিষয়েও তাঁরা সচেষ্ট। ফলে, লৌকিক বিজ্ঞান (popular science) জাতীয় বেশ একটা বড় গোছের সাহিত্য গড়ে উঠেছে; এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ পাঠককে সহজভাবে শিক্ষা দেওয়া। আমাদের দেশেও যখন বিদ্যার আদর ছিল, তখন পুরাণ জাতীয় সাহিত্য এই আদর্শেই লেখা হয়েছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণে

বর্ণিত বিষয় কতকটা একই বটে; কিন্তু এক একটী পুরাণের এক একটী বিশেষ সুর আছে,—কোনটীতে তীর্থমাহাত্ম্যের প্রাধান্য (যথা, স্কন্দপুরাণ), কোনটীতে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা অনেকটা স্থান অধিকার করেছে (যথা, গরুড়-পুরাণ) কোনটীতে ভৌগোলিক তত্ত্বেরই বিশেষ আলোচনা দেখা যায় (যথা, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ), ইত্যাদি। অবশ্য, আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে আমরা ইদানীং এ-সব পুরাণগুলোকে প্রায়ই নিতান্ত পুরোনো বলে' মনে করি, এবং একটু অবজ্ঞাও হয়তো করে থাকি। আমরা চাই, নতুন পুরাণ; আর ইংলণ্ডে সেইরকম চাহিদার ফলে শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র কেম্‌ব্রিজ সহরের ছাপাখানায় এই শ্রেণীর বই অনেকগুলি ছাপা হয়ে আস্‌ছে।

"লৌকিক বিজ্ঞান"—কথাটা ঠিক্ সোনার-পাথর বাটির মতন বলা যায় না; বরং বল্‌তে পারি, জিনিষটা যেন বাম্‌নের গরু,—খাবে কম, দুধ দেবে বেশী। মোডর সাহেবের কেতাবটীর দাম, মাত্র সাড়ে সাত শিলিং; অথচ তাতে আমরা দেখ্‌তে পাই একটী প্রকাণ্ড ব্যাপারের ছোট্ট একখানি ছবি,—সমগ্র প্রাচীন জগতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেখকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, বর্ণনায় সৌষ্ঠব আছে, তদ্ভীতে সরলতা প্রচুর। আলোচ্য গ্রন্থখানি কোনো "পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক" রূপে কল্পিত নয়; তাই "battles, dates and constitutions have been omitted, where they seemed of minor significance in the march of events." (লেখকের ভূমিকা)। এসব বিষয়ে ভাল করে' জান্‌তে হলে কৌতূহলী পাঠক Cambridge Ancient History পড়ে নেবেন,—গ্রন্থকারের এই নিবেদন।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে ইতিহাস তৈরী হয় প্রাধানত তিনটী ভৌগোলিক উপাদানে—পাহাড়, নদী, আর পথ। জগতে পর্ব্বতের মতন অচল আর কি আছে? পাহাড় থেকেই নদীর উদ্ভব। স্রোতস্বতীর বক্ষে বক্ষে কূলে কূলে, যাওয়া-আসা মানুষের পক্ষে চিরদিনই সহজ; তাই আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রধান পথগুলো নদীর প্রবাহের সহগামী। নদী আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই নিবারণ করে। জল কৃষকের শ্রেষ্ঠ সম্বল, তৃষিতের তৃপ্তিস্থান। সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নদী ও পর্ব্বত উভয়েরই পূজা করতেন। আমরাও যে করি না, তা নয়। শুধু পূজার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মনে মনে আমরা খুবই ভালবাসি, গঙ্গার ধারে বেড়াতে, ষ্ট্যাণ্ডের হাওয়া খেতে, দার্জ্জিলিং—শিমুলায় যেতে। পূজার উপচারই এখন বিভিন্ন; ফুল-চন্দনের পরিবর্ত্তে আমরা এখন ধারণ করি, রিষ্ট-ওয়াচ্, ওয়াকিং-ষ্টিক আর ওভার কোট্।

(খ)

আলোচ্য পুস্তকে যে জগৎ অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। লেখক গতানুগতিক ভাবে ধরে নিয়েছেন যে, ইতিহাসে প্রাচীন ভারত প্রায় নগণ্য। দোষ অনেকটা আমাদেরই। ইতিহাসে ইউরোপীয়দের যেরকম আস্থা আছে, আমাদের সেরকম নেই। আমার মনে হয়, এই আস্থা আর অনাস্থা যে মনোভাবের পরিচায়ক, সে মনোভাব জাতিগত। কেবল আধুনিক যুগেই যে আমরা ইতিহাসকে অবহেলা করেছি, তা নয়। প্রাচীনকালেও

ভারতীয়েরা এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনায় বিশেষ তৎপর ছিলেন না। কথাটা একটু বিশদভাবে বলি।

'ইতিহাস'—শব্দটীর প্রয়োগ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে, কিন্তু সেযুগে ঐ শব্দের অর্থ কি ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন্। যাস্ক বলেছেন, ইতিহাসের উদ্ভেদ হচ্ছে ঋগ্বেদের কতকগুলি mythsকে legends-ভাবে বোঝানো। বৈদিক সাহিত্যে 'ইতিহাস' আর 'পুরাণ' এই দুই শব্দেরই পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্ত্তী যুগের কাছে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।

আমরা প্রত্যেক রাজ্যের ইতিহাস বলতে বুঝি, স্থানীয় প্রধান প্রধান ঘটনার পূর্ব্বাপর-সংযোগ। এবং যেহেতু রাজা ও রাজ্য—ruler and ruled এই দুই মিলে তবে হয় প্রকৃতি বা State, রাজ-পরম্পরাকে ছেড়ে দিলে ইতিহাস রচনা করা কঠিন। কয়েকটী মহাপুরাণে 'রাজবংশ-কথন' পাওয়া যায়—আধুনিক historical research কার্য্যে এই বংশানুক্রম অত্যন্ত উপযোগী। স্বর্গীয় পার্জিটার সাহেব এই সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছিলেন। এই বিবরণে ভারত যুদ্ধ থেকে মহাপদ্ম নন্দ পর্য্যন্ত যে বংশানুক্রম দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনটী সমসাময়িক রাজবংশের মধ্যে কেবল মগধের রাজাদের-ই প্রত্যেকের রাজ্যকাল দেওয়া আছে,—অন্য রাজাদের কেবল পূর্ব্বাপর নামোল্লেখ মাত্র বর্ত্তমান। আমার মনে হয়, সেকালে মগধেই কালজ্ঞান ছিল; সেইখানেই ইতিহাসের মেরুদণ্ড।

সিংহলের 'মহাবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থকে ইতিহাস বলা যায়; সেখানেও রাজ-পরম্পরা ও রাজ্যকাল দেওয়া আছে। কিন্তু গোড়ার দিকের রাজাদের সঙ্গে সমসাময়িক মগধের রাজাদের পারম্পর্য্য ও রাজ্যকাল বিশেষভাবে উল্লিখিত। কারণ বোঝা সহজ; মগধ থেকেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার; সুতরাং মগধে প্রচলিত ঐতিহাসিক রীতি যে সিংহলে অনুসৃত হবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়।

কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিনী'ও ইতিহাস-পদবাচ্য। 'নীল-মত-পুরাণ' প্রভৃতি প্রাচীনতর গ্রন্থ অবলম্বন করে' এই ইতিহাসটী লেখা হয়। রাজতরঙ্গিনী রচিত হয়েছিল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন মগধের সিংহাসনে পাল-বংশীয় রাজা অধিষ্ঠিত। এই পাল-বংশের আদি রাজা ছিলেন বঙ্গদেশীয় 'গোপাল' যিনি খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীতে মগধ জয় করেন। গোপালের পর রাজা হন, ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপাল বহুদেশ জয় করেছিলেন; এমন কি সুদূর গন্ধার পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। হয়তো, মগধের ঐতিহাসিক রীতি এই সূত্রেই কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; অন্তত, এটা দেখি যে এই সময় থেকেই রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজাদের রাজ্যকাল ঠিক্ ঠিক্ দেওয়া আছে। অবশ্য চীনদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসেও এই পদ্ধতি দেখা যায়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত পদ্ধতিটীকে চীনে বল্‌লেও বলা চলে—বিশেষত যখন স্মরণ করি যে ঐ সময়ে চীনদেশের সঙ্গে ভারতের খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক। *

* আমার সন্দেহ হয়, পাল-বংশীয় দেবপালের সেনাপতি 'লাউসেন'—যিনি আসাম জয় করেন—চীনে ছিলেন। মাগধী প্রাকৃতে যে 'র'-এর বদলে 'ল' পাওয়া যায়, তাও হয়তো চীনের প্রভাবে।

(গ)

আমরা আশা করতে পারি না, যে মোভর সাহেব মাত্র চার-শ পৃষ্ঠার কেতাবে সমগ্র ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়ে যাবেন। তাঁর নিজের কথায় বলি—

"The writer has so far followed the example of ancient historians that he has ignored politicians, permitted himself to digress, and repeated that the cause is as important to learn as the event". (Preface).

কেন যে তিনি politicianদের ignore করেছেন, সে কথাও বলেছেন—

"When all is said, the politicians of any age are rarely remembered ten years after they die or lose their seats in Parliament. Only historians, pondering sadly over maps, marvel at the short outlook and the scanty insight of those who managed our colonies before they governed themselves. Ancient politicians were little wiser; and it is one of the touches of genius in the historian Thucydides that he ignores their very names, unless it may be that the murder of one of them shows the temper of the day. So little significant, so little formative, as a rule, are party leaders. Few indeed of the political figures did so much to make Greece as did the poets and philosophers." (Page 66-67).

মোভর সাহেবের digressionগুলি অনেক ক্ষেত্রে উপাদেয়। দু' একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আথেন্সে দাসত্ব কিরকম ছিল, এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

"The flight of 20,000 slaves is evidence enough that men were not content to be slaves in Athens. Escape was harder for women. But, at the worst, it must be admitted that slavery at Athens, bad as it was for master and slave, and bad economically, does not show the horrors of Roman slavery, or of American. No negro slave in New York or New Orleans is known to have inherited his master's widow along with a bank." (P. 134).

মিশরের সহর আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"The city was divided into five quarters called after the first five letters of the alphabet (the jews lived in Delta). It was full of impressive buildings, notably the Gymnasium, with porticoes more than a furlong in length. The streets were on the rectangular plan, and two of them very broad, 90ft. in width (Main Street, Winnipeg, is 132ft, wide); one the canopic street, they say, was four miles long, and lit at night—so well lit, that an ancient writer in his enthusiasm calls it "the sun in small change"; oil-lamps only, we remember with something of a start. Broadway in New York, is many miles long; but the ancient world was impressed with a street four miles long, the cities they knew were much smaller and far more cramped." (P 250).

সব দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে, মোভর সাহেবের Ancient World একটী সুখপাঠ্য পুস্তক। তবে, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণা চান্, তাঁদের জন্যে এ বই লেখা হয় নি।

শ্রীহরীতকৃষ্ণ দেব

সাগর ও অন্যান্য কবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (পূর্ব্বাশা প্রেস্)

পুরবাসিনী—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)

এই সুদৃশ্য ছোট কবিতার বইখানি আগাগোড়া অব্যাহত আনন্দে প'ড়ে যাওয়া যায় এবং প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে কোথাও বই বন্ধ ক'রে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না—ঝর্‌ ঝরে হাল্‌কা ভাষা, সুন্দর মোলায়েম্‌ শব্দ-যোজনা, স্থানে স্থানে চমৎকার চিত্রাঙ্কন—আবার সব শুদ্ধ জড়িয়ে কেমন একটা আব্‌ছা সুদূরতার অন্তরাল! মস্তিষ্ক-বৃত্তির মারপ্যাঁচে বিপর্য্যস্ত আধুনিক কাব্যের আব্‌হাওয়ায় এ কাব্যের বিশেষত্ব আছে—যে সমস্ত স্বপ্ন, যে সমস্ত অনুভূতি অত্যন্ত সন্তর্পণে আল্‌তো পায়ে আমাদের কল্পনার মাটি মাড়িয়ে চলে, লেখক তাদের ধ'রে রেখেছেন তাঁর সোনালী ভাষার ইন্দ্রজালে। তবে একথা আমি বিশ্বাস করি যে এই বই আরো বড় হ'লে এবং এই জাতের কবিতা এতে আরো থাক্‌লে বইটি শোচনীয় রকম একঘেয়ে হ'ত—আর শেষকালকার গদ্য-কবিতাগুলো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও আমি কোন উচ্চ প্রশংসা ক'রতে পারিনে। গদ্য চৈক্‌নিক্‌ বাংলা কবিতার ধাতের সঙ্গে ভালো রকম খাপ খায় কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে—বিশেষ ক'রে এই রকমের মেরুদণ্ডহীন গদ্য—যা গদ্য ও পদ্য দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং কোনটারই স্পষ্ট আভিজাত্য যাতে নেই। যদি কারুর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ক'রতে হয় ত আমি এই নবীন কবিকে অন্ততম নবীন কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে তুলনা কর্‌বো—উভয়ে যেন উভয়ের অবলম্বিত ধারার প্রতিক্রিয়ার দ্যোতক—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মূলতঃ স্বপ্নের কবি—তাঁর দৃষ্টি রঙীন, তাঁর ভাষা রঙীন, তাঁর ভঙ্গী পেলব—যেন পুষ্প ভরানতা ভূসঞ্চারিণী লতা—অবলম্বন ব্যতিরেকে যার উর্দ্ধমুখী হবার স্বকীয় শক্তি নেই। আর বিষ্ণু দে—আপন বেগে আপনি উর্দ্ধায়িত—কিন্তু তাঁর গতির বহুসহস্র গ্রান্থির আবর্ত্তন ও নিষ্ঠুরহীন কাঠিন্য উপভোগ্য ত নয়ই, সময় সময় ক্লান্তিকর। এ দুইই দুই প্রান্ত—সুতরাং গ্রন্থারম্ভে লেখকের পক্ষ থেকে যে লিরিক-বৈশিষ্ট্যের দাবী করা হ'য়েছে, তা আমরা অস্বীকার করি না।

দ্বিতীয় বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ ক'রেছেন। বলা বাহুল্য সহজেই সাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করা যায় যাতে, সেই প্রসাদগুণ তাঁর রচনায় প্রচুর—তাঁর হাতে ভাষা চলে ঠিক শাণিত তলোয়ারের মতো। কোথাও তাঁর বাধা-বিপত্তি নেই, অতি অনায়াস কৌশলে তিনি জবরদস্ত গল্পকে সরস সুরেলা ক'রে তুল্‌তে পারেন। তাঁর রচনা যে সাধারণের এত প্রিয়, তার আরও একটা কারণ তার ভেতর বৃহত্তর কোন ব্যঞ্জনার বালাই নেই; তার বদলে তাতে আছে খানিকটা নাটকীয়তা, খানিকটা গল্পের ভাব আর প্রচুর পরিমাণে আছে বাক্‌বিন্যাসের সরসতা। রুচি বা নীতির প্রশ্নকে সাহিত্য-বিচারে একান্ত ভাবে মারাত্মক ক'রে না তুল্‌লে এই জাতীয় রচনাকে বেশ উপভোগ্যই মনে করা যেতে পারে। অবশ্য এরা কবিতা কিনা সে প্রশ্ন ওঠা আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু কবিতার এলাকার যদি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ না থাকে ত একেও এক জাতের কবিতা বলতে বাধা কি? না হয় তার স্থান একটু নীচু স্তরেই নির্দ্দিষ্ট হ'ক্‌।

আলোচ্য বইয়ে বাংলার গার্হস্থ্য-জীবনে মা, ভগিনী, বৌদি ইত্যাদি নানা আকারে নারীর যে রূপ দেখা যায়, লেখিকা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁদেরই কয়েক-জনকে এঁকেছেন এবং অনেকগুলি কবিতাই বেশ সুখপাঠ্য ও সুষমান্বিত হ'য়েছে। রচনা কোথাও আড়ষ্ট হয় নি, স্থানে স্থানে বরং বিশেষত্বপূর্ণই হ'য়েছে—অবশ্য গভীরতা, নিবিড়তা কোথাও পাবেন না; তবে বিচিত্রতা ও মধুরতারও অভাব নেই। বাংলা ভাষায় কবি কিরণধন প্রথম এই ধরণের কবিতা লেখার সূত্রপাত ক'রে-ছিলেন—তাঁর 'গৃহিণী', 'দেনদার', 'আস্কারের আধঘণ্টা' প্রভৃতি এই জাতেরই কবিতা—অবশ্য তাঁর হাত ছিল অপরাজিতা দেবীর চেয়ে কম সচল, কিন্তু বেশী মিষ্টি। উভয়ের রচনা থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে পার্‌লে সুখী হ'তাম, কিন্তু স্থানাভাব। পিসিমা, ঠিকে ঝি, গৃহিণী চিত্র হিসাবে বাংলার ঘরে ঘরে আদর পাবে আশা করা যায়—বিশেষ ক'রে তাঁদের এরা খুবই প্রিয় হবে, যাঁদের নিয়েই এই কাব্যের উদ্ভব।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Everyman in Health and in Sickness—Edited by Dr. Harry Roberts (J. M. Dent & Sons)

মানুষের স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতা সম্বন্ধে লিখিত এই বইখানি ৭৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চিকিৎসাব্যবসায়ী না হ'য়েও সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীর ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে উৎসুক এবং নিজে অথবা কোনো আত্মীয়স্বজন ব্যাধি-বিশেষ পীড়িত হ'লে ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে যখন আগ্রহান্বিত তখন ঐ রোগ সম্বন্ধে মোটামুটি যতটুকু জানা থাকলে সে বুদ্ধি পূর্ব্বক ডাক্তারের কার্য্যের সহযোগিতা করতে পারে,—সেই সমস্ত তথ্যই এই বইখানিতে যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। শরীর ও মন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোনো কথাই এতে বাদ যায় নি। বইখানি চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে—Natural History of Everyman,—অর্থাৎ মানুষের শরীরের অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও সেগুলির ক্রিয়া, তার স্নায়ুসকলের ক্রিয়া, তার খাদ্যাখাদ্যের বিচার, তার মনের চেতন ও অবচেতন অংশ, তার সন্তানোৎপাদনের কলকৌশল ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগে—Everyman in Health,—অর্থাৎ স্বাস্থ্য কাকে বলে, স্বাস্থ্যরক্ষার কি কি উপায়, খাদ্যাদি সম্বন্ধে নানারকম বিচার, এবং ব্যায়াম সম্বন্ধে, বাসগৃহ সম্বন্ধে, পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এবং পরিশ্রমাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য। তৃতীয় ভাগে—Stages of Human Life,—অর্থাৎ শৈশবাবস্থা ও শিশু-প্রতিপালন সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় কথা, যৌনতত্ত্ব ও বিবাহতত্ত্ব, সন্তানোৎপাদন ও বার্থ-কণ্ট্রোল্‌, মধ্যবয়সের কথা ও মধ্যবয়সের উপযুক্ত আহার বিহারাদি, এবং বার্দ্ধক্যের কথা ও তখনকার জন্য নানারূপ সাবধানতার কথা। চতুর্থ ভাগে—Everyman in Sickness,—অর্থাৎ সকল প্রকার রোগ সম্বন্ধে

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তার প্রতিকারের উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, পথ্যাদি ও শুশ্রূষাদি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং রোগ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক ইতিপূর্বে ইংরেজীতে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি এই বইখানির মত সম্পূর্ণ পুস্তকও নয়, এবং এমন সাবধানে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণার সঙ্গেও লিখিত নয়। যথাসম্ভব সাধারণ ভাষায় লেখা হ'লেও এটিকে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পুস্তক বলা যায়। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিও এর মধ্যে সযত্নে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এমন কি ভেগাস্ নার্ভের উত্তেজনায় কিরূপে acetyl-choline উৎপন্ন হ'য়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্থর করে, আর Aschiem-Zondek test নামক ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার দ্বারা কিরূপে গর্ভসঞ্চারের অতি প্রথম অবস্থাও চিনতে পারা যায়, তাও এতে বাদ যায় নি। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক এই বইখানি লিখতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মত এই যে বিজ্ঞানের কথা পুরোপুরিভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে বলাই ভালো,—সাধারণের জন্য লেখা হচ্ছে বলে কতকগুলি সত্য বাদ দিয়ে কতকগুলি সত্য বেছে বেছে বলা বিপজ্জনক। "There is danger in presenting facts in too simple a way"—এতে সাধারণের ভুল বোঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তাঁরা বলেন শরীর সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান তা কেবল চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে, আর বুদ্ধিমান উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ সম্বন্ধে অজ্ঞ হ'য়ে এক একটা অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবে, বর্তমান যুগে এটা নিতান্তই অন্যায়।

"It is a curious reflection that about himself, about his own bodily and mental mechanism, the ordinary man knows far less than he knows about his motor car. The queerest notions obtain about human anatomy, human physiology, and human psychology, even among the highly cultivated. The practice of medicine is inevitably a matter for experts ; but it is obviously absurd that everyman, entrusted with the driving on the high roads of the universe of the most elaborate and the most dangerous vehicle conceivable, should be in complete ignorance of the structure of the machine."

এখনকার যুগের বৈজ্ঞানিকদের এই মত যে কোনোরূপ কার্পণ্য না ক'রে সমস্তটুকু সত্যই সাধারণকে জানতে দেওয়া উচিত, তবেই তাদের কাছ থেকে সমুচিত সহযোগিতা এবং সমর্থন পাওয়া যাবে। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যারা ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করবে, তাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়াও তারা ব্রতরূপেই গ্রহণ করবে। কোনো রোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হ'লে তারা বলবে না—"সে কথা জেনে তোমার কি লাভ ?"

বইখানিতে অনেক নতুন কথা দেখতে পাবেন। এর স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাটি বড় চমৎকার। লেখক বলেন স্বাস্থ্য বলতে কেবল অসুস্থতার অভাবই বুঝায় না,—তা ছাড়া আরো একটা স্বতন্ত্র জিনিষ স্বাস্থ্যের মধ্যে আছে, সেটা একটা প্রাণবন্ত আনন্দ এবং স্ফূর্তি।

""Health has come to mean an absence of disorders. This negative attitude to health is numbing to vitality. The conception is a passive one ; the reality is an active one."

নানারূপ রোগের মাইক্রোব বা বীজাণুর যখন প্রথম আবিষ্কার হয় তখন থেকেই মানুষের মনে বীজাণু-ভীতির সূত্রপাত হয়েছিল এবং লিটারের সময় থেকে অনেক কাল পর্য্যন্ত সে ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে। তখন লোকে ভাবতো যে বীজাণুর আক্রমণ থেকে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে গেলেই স্বাস্থ্য বজায় রইল, এ ছাড়া স্বাস্থ্য বলতে আর কিছু বোঝায় না। কাজেই তখন—

"Disease was studied, not health ; not prevention, but cure."

কিন্তু এখন সে ধারণা বদলে গেছে। এখন—

"We are coming to realize that, after all, man is stronger than the microbe, and that, if we cultivate the defences with which Nature has endowed us, the victory is nearly always with us."

এখন আমরা জানি যে বীজাণুরা কত লোকের দেহের মধ্যেই নিরুপদ্রবে বাস করে, এমনকি যক্ষ্মা-বীজাণুও কত লোকের দেহে লুকিয়ে আছে, অথচ স্বাস্থ্য ভাল ব'লে তাদের কোনো রোগই নেই। সুতরাং বীজাণু রোগের কারণ হ'লেও স্বাস্থ্যহানি না ঘটলে তারা একেবারে নিষ্ক্রিয়।

বইখানিতে মানুষের মন নিয়েও নানারকম আলোচনা আছে এবং মনের রোগ সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। আজকালকার দিনের এও একটা সমস্যা। মানুষের মনও শরীরের মত একরকম যন্ত্র-বিশেষ। "It is only just beginning to be suspected that the mind is just as much a machine as is the body"। এই কলও বিগ্‌ড়ে যায় এবং তার থেকেও নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়তে উৎসুক তাঁরা এই বইখানি পড়ে অনেক কথা জানতে পারবেন। এমন কি কোনো চিকিৎসকও যদি এ বই পড়েন তবে চিকিৎসারাজ্যের বাইরে আরো যে সব কথা তাঁর জানা দরকার তার অনেক কথাই এর থেকে জানতে পারবেন। তবে এই বইয়ের কতকগুলি ছবি সম্বন্ধে কিছু প্রতিবাদ করা আবশ্যক। অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ব্যায়ামকৌশল দেখাবার অছিলায় যে কতকগুলি নগ্ন স্ত্রী-পুরুষের ছবি এতে দেওয়া হয়েছে, এবং বইয়ের মলাটের ওপর সেই সব ছবির নমুনা ডিস্‌প্লে করা হয়েছে, এই বইয়ের মধ্যে তার কোনো আবশ্যকই ছিল না। বোঝা যাচ্ছে এটা জনসাধারণের কৌতূহল আকর্ষণ করবার একটা কৌশল,—অর্থাৎ পুস্তক-ক্রেতা প্রথম দর্শনে ছবি দেখেই উৎসুক হ'য়ে উঠবে, তার পর বইখানা উল্‌টে পাল্‌টে চাই কি কিনে ফেলতেও পারে। কিন্তু এমন একখানা বৈজ্ঞানিক পুস্তকের কাটতির জন্যে এরকম হীন কৌশল অবলম্বন না করলেই ছিল ভাল। এতে বইখানিকে খেলো করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

The Asiatics—By Frederic Prokosch. (Chatto & Windus).

'দি এসিয়াটিক্‌স্' বইখানি উপন্যাস, কিন্তু ইহা লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের আকারে এবং অনেকখানি পড়িয়াও এই বইখানি যে ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে এই ধারণা মন হইতে দূর করা শক্ত হয়। তাহার কারণ লেখকের অসাধারণ বর্ণনাশক্তি। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ব্যক্তি, এত স্পষ্ট, এত সহজ, এত জীবন্ত যে ইহারা কাল্পনিক তাহা কল্পনা করাই কঠিন। হয়তো সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত, কিন্তু একেবারে নিছক কাল্পনিক হইলে অবশ্য বইখানিকে নভেল বলা চলিত না।

এই ধারণা বইয়ের প্রথম অংশ পড়িয়া হয়। ইহা যে আসলে সত্যই উপন্যাস বইখানির উত্তর অংশ পড়িলে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বিশেষভাবে, ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অংশটুকু পড়িলে। এই অংশে ভারতবর্ষকে অতি অল্পই পাওয়া যায়—পাওয়া যায় শুধু লেখককে। কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক এইভাবে ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতেন না এবং যদি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক না বলিয়া বলা হইত রূপকথার রচয়িতা। ফ্রেডারিক্ প্রোকোশের ভারত-বর্ণনা প্রায় রূপকথারই সামিল, কিন্তু এই রূপকথার মধ্যে বাস্তবের একটু লঘু স্পর্শ থাকিয়া গিয়াছে, তাই ভারতবাসীর মনকে তাহা সামান্য নাড়া দেয়—সামান্য, কেন না, লেখক ভারতবর্ষের মর্মে পৌঁছিতে পারেন নাই, নিজের মর্ম দিয়া ভারতবর্ষকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, শুধু তাঁহার উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে ভারতবর্ষকে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র।

আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার দরদ আছে, তাই স্বভাবতই প্রোকোশের ভারত-বর্ণনা আমার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বইটির অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে ঠিক এতটা দৃঢ়ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিবার দুঃসাহস আমার নাই; আমি এশিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু একটি কথা 'দি এসিয়াটিক্‌স্'-এর যে-কোনো পাঠকেরই বোধহয় মনে হইবে—ইউরোপ হইতে তিনি যত দূরে সরিয়া আসিয়াছেন তাঁহার রচনার বাস্তবতা সেই পরিমাণে কমিয়াছে। তাই প্রথম অংশে এশিয়া মাইনরের অভিজ্ঞতা মনে হয় এত সত্য এবং উত্তর অংশে ভারতবর্ষ, বর্মা, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে যখন তিনি পৌঁছান তখন মনে হয় যেন নিতান্তই সঙ্কল্প রক্ষা করা ছাড়া এই অভিযানের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।

দি এসিয়াটিক্-এর চরিত্রচিত্র এই ধারণা আরো বদ্ধমূল করে। এসিয়া মাইনরে যাহাদের সাক্ষাৎ পাই তাহারা কেহ স্থানীয় অধিবাসী, কেহ বিদেশী, কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তাহারা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাস করে তাহার সহিত তাহাদের অন্তরঙ্গ যোগ আছে—তাহাদের মনের দিক হইতে নহে, চরিত্র অঙ্কনের দিক হইতে। উত্তরোত্তর এই যোগ লঘু হইতে লঘুতর হইয়া আসে, মনে হয় লেখকের চোখের সামনে যেন একটি রঙীন পরদা তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিলম্বিত হইয়াছে, ইহার রং কখনো প্রীতিকর, কখনো পীড়াদায়ক, ইহার একদিকে রহিয়াছে এশিয়া ও এশিয়া-বাসী, অপর দিকে লেখক ও তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবী এই উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা একাধিকবার অতর্কিতে অবতরণ করেন এবং আবার অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া যান। মাঝে মাঝে এই রঙীন পরদাটির স্বচ্ছতা কমিয়া আসে, তখন এশিয়া ও

এশিয়াবাসী পার লোপ, সমস্ত রঙ্গমঞ্চ জুড়িয়া থাকেন কয়েকটি য়ুরোপীয় নরনারী, ঠিক য়ুরোপীয় কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে নিতান্তই বিদেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এশিয়া একেবারে অন্তর্হিত হয় না পরদার ওপারে যাহার বিপুল প্রসার অন্তত কল্পনায় অত্যন্ত বাস্তব ছিল, তাহা দেখি ক্রমে পরদার উপর সঙ্কুচিত নক্‌সায় পরিণত হইয়াছে। নক্‌সার পরিকল্পনা অবশ্য য়ুরোপীয় চিত্রকরের। স্থূল তাঁহার তূলী, কিন্তু অত্যন্ত নিপুণ তাহার অবলেপ।

ফ্রেডারিক্ প্রোকোশ সার্থক ঔপন্যাসিক না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি মনোগ্রাহী লেখক এবং অত্যন্ত কৃতী শিল্পী।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

"Storm in Shanghai"—(La Condition Humaine)—By Andre Malraux (Methuen & Co).

জীবনের শিরায় তাণ্ডব নর্তনের ছন্দ যেখানে উদ্দাম হয়ে ওঠে, সেখানে শিল্পীর কর্তব্য হয়ে পড়ে জটিল ও দুঃসাধ্য। কারণ তাকে রূপ দিতে গিয়ে শিল্পী প্রায়ই নিজের সৃষ্টি-পরিধি খুঁজে পান না। একটা সংক্রামক আবর্তের ভেতর পড়ে হয় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, না হয় তাঁকে পলায়ন করতে হয় সৃষ্টি-ক্ষেত্র থেকে। অর্থাৎ যেখানে ঘটনার বেগ দ্রুত ও উগ্র সেখানে প্রায়ই পরিণতিটা হয়ে পড়ে নিছক উপ-নাটকীয়, melodramatic, অথবা উপ-রসাত্মক, Sentimental। এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে বলিষ্ঠ ও নিরাসক্ত রস-সৃষ্টি বিরল। কিন্তু মাল্‌রোর এ বইটা পড়ে মনে হল যে, তিনি অসামান্য শিল্প-প্রতিভার দ্বারা এ দুইয়ের প্রায় অসম্ভব সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের—করুণ, উগ্র, বীভৎস, বাৎসল্য, মধুর এতগুলি রস-বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে লেখকের বৈরাগ্যিক নিরাসক্তি ও নির্ভীক লেখনী চালনা দেখে অবাক হতে হয়। তবে এ বইটা উগ্র-রস-প্রধান। লেখকের পূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলিও উগ্র-রসাত্মক এবং অসম্ভব বেগবান। (অবশ্য Alastair Macdonald-এর অনুবাদের ওপর নির্ভর করেই মন্তব্যগুলি বলে যাচ্ছি)

আসলে, বইয়ের নাম—La Condition Humaine—। বাহ্যতঃ লেখককে নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদের অধিবক্তা বলে ধরে নেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আগাগোড়া ভাল ভাবে পড়লে পুরুষকারের স্থান এতে নেই বলা চলে না। অন্ততঃ, তা হলে কিও, কাটভ্ বা অন্যান্য অধিনায়কদের বৈপ্লবিক সংহতি, সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্যের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের শেষ পরিণতি পরাজয় হলেও বা তাদের মৃত্যু ঘটলেও তাদের আদর্শের মৃত্যু শেষ পর্যন্ত ঘটতে দেওয়া হয় নি। অদৃষ্ট বা পুরুষকার একটা বিশেষ অবস্থা বা পরিণতির ওপর নির্ভর করে। মৃত্যুর একটা অনিবার্য্য দৈব সত্যকে মেনে নেওয়া অদৃষ্টকে মানা নয়। অপঘাতই প্রশ্ন তোলে নিয়তির। কিন্তু কিও বা শেন্-এর মৃত্যুর পেছনে তাদের দৃঢ় ও জাগ্রত সংকল্প—will, পুরুষকারের অধিকারী করে তোলে—তাদের ঊর্দ্ধে দৈব থাকা সত্ত্বেও। তাই চূর্ণীকৃত ফলের বীজক্ষত থেকে নবতরূপে অঙ্কুরোদ্গমের

স্বপ্ন নিয়েই বইটাকে শেষ করতে হয়। ভবিতব্যতা ও পুরুষকারকে জড়িয়েই তাই La Condition Humaine। এই দুয়ের সমন্বয়ও হয়েছে অপূর্ব্ব!

রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপ সাহিত্যকে বহুদিকে ও বহুভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ফরাসী রাশিয়া আয়র্ল্যাণ্ড—এমন কি ভারতবর্ষেও, অনেক দেশেরই, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের চিত্র বহু সাহিত্যরথীদের হাত থেকে পেয়েছি। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এ বইটার বিস্তৃত তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভব নয় রিভিউতে। তবে মাল্‌রোর স্বাতন্ত্র্য মোটামুটি ভাবে দেখান সম্ভব। তার খানিকটা প্রথমেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য বইটা লেখা হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর চীনা রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামোল্লেখও পাওয়া যায় —যেমন—সুনইয়াৎসেন বা চাংকাইশেক। বইটার ঘটনাকেন্দ্র শাংহাই সহরে। প্রারম্ভেই দেখতে পাই বিপ্লবের বজ্রগর্ভ মেঘের ছায়াপাত সমস্ত সহরে। শেন্‌এর গুপ্ত-হত্যা এবং চাংকাই-শেক্ তথা কুওমিন্‌তাং-এর দৌরাত্ম্যে সে মেঘ হল আসন্নবর্ষী। সে বিপ্লব-মেদুর, সাইরেন-নাদী, থমথমে দৃশ্যপটে দেখতে পাই কিও'র বিপ্লবী বন্ধুদের ছুটোছুটি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের গুপ্ত ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এবং সাফল্য। তারপর বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ ও অগ্ন্যুৎপাৎ। ফলে সমস্ত সহর অস্থায়ীভাবে বিপ্লবীদের করতলগত হয়। ইতিমধ্যে চাং-কাই-শেক্‌এর হত্যার প্রশ্ন নিয়ে মতদ্বৈধ ঘটে কম্যুনিষ্ট কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে। ফলে শেন্ প্রমুখ বৈতাত্ত্বিক দল বিচ্ছিন্ন হয়ে চাং-কাই-শেক্‌এর হত্যার ভার নেয়। শেন্‌-এর ষড়যন্ত্র শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয় এবং শেন্ নিহত হয় বা আত্মঘাতী হয় বলাই ঠিক। এ দিকে কিও-র দল অস্ত্রবলের অভাবে পুলিশের হাতে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারপর বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যু। সংক্ষেপে গল্পের কাঠামোটি এই।

এরই অন্তরালে নায়কনায়িকাদের অন্তর্লোকে যে গভীর নাট্য-লীলা চল্‌ছিল তার আভাস আমরা পাই লেখকের প্রখর সন্ধানী আলোক-সম্পাতে। বইটার অসাধারণত্ব সেইখানেই। কর্ম্মকাণ্ডের তীব্র গতি সত্ত্বেও চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্লীন রূপ ব্যাহত হয় নি কোথাও। তাং-ইয়েন-তা-কে হত্যা করার পর শেন্-এর মনের অসহ্য দ্বন্দ্ব ও সংগ্রব প্রকট হয়ে উঠলো। সে হঠাৎ উপলব্ধি করলো নিয়তির অমোঘ স্পর্শ নিজের জীবনে। ফলে, দেখতে পাই হিংস্র ও রক্তাক্ত পারিপার্শ্বিক থেকে তার অহিংস ও অসহায় দূরত্ব। সে হয়ে উঠলো গভীর ভাবে নিঃসঙ্গ। নির্ব্বাসিত শেন্ তার পুরাতন গুরু বৃদ্ধ জিসোর-এর—কিওর পিতৃদেব—কাছেও কোনো আশ্রয় বা সান্ত্বনা পেলো না। নিয়তির অমোঘ ইঙ্গিত একটা উগ্র নেশার মত তাকে মৃত্যু-পথী করলো। কিও-র জীবনেও দেখতে পাই এই নির্লিপ্ততা। কিন্তু সে অন্য কারণে। তার শান্ত ও শুভবুদ্ধির অভাব ছিল না। যার মূলে ছিলেন তার পিতৃদেব জিসোর। ফলে সে বুঝেছিল যে জীবনের ভাবপুঞ্জ শুধু বৌদ্ধিক প্রত্যয় হিসেবে রইলে চলবে না—সমস্ত জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়ে নিবিড় ভাবে মূর্ত্ত হওয়া চাই। তাই কিও-র কর্ম্মযোগ আবশ্যিক নয় ঐচ্ছিক। কিন্তু শেন্ তার ভগবান হারিয়ে ফেলেছিল—তার জীবনে যেটা খুব বেশী দরকারী ছিল। তাই তার এই নির্ব্বেদ এবং অসহায় নিঃসঙ্গতা। এবং কিও-র জীবনে তাই

ধ্যানাশ্রিত ভগবানের বা পরম-পুরুষের অব্যবহিত প্রয়োজন ছিল না। কিও-র জীবনের সমস্যা তাই তত জটিল নয় যতটা শেন্-এর। মে-র আবির্ভাবে কিও-র জীবনের আর একটা স্তর দেখতে পা'ই। যেখানে সে অত্যন্ত মানবিক, আসঙ্গ-প্রার্থী অথচ সংযমী। মে কিওর সহধর্ম্মিণী পুরোপুরি ভাবেই। তাদের মিলন জৈব ভাবকে ছাড়িয়েও কর্ম্মের মধ্যে গভীর সহানুভূতির মধ্যে। অতীন আর এলা অথবা সব্যসাচী আর সুমিত্রা বা ভারতীকেও মনে পড়ে এই সূত্রে। তাদের জীবনের যোগসূত্র—প্রধানতঃ আবেগজ, একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগের নয়। তাই বলে মে আর কিও-র মধ্যে আবেগ ছিল না একেবারেই তা বল্‌ছিনে। কিন্তু লেখকের কৃপায় তাদের আবেগের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল একনিষ্ঠ কর্ম্মের দ্বারা। তারা বিলাসী হবার অবসর পায় নি। কিও-র লীলার পরিসমাপ্তির দিনে তার পাশে মে-কে দেখতে পাই মৃত্যু-সঙ্গিনী হিসাবে, যে মে অধুনাবৈজ্ঞানিকমন্ত্রভাবে দেহদান করে কিওকে করেছিল কঠিন। তারপর কিও, মে, সেন্-এর পাশা-পাশি দেখতে পাই জিসোর-কে তাদের জীবনের সূত্রধার রূপে। বৃদ্ধ জিসোর-এর চরিত্রাঙ্কন অদ্ভুত হয়েছে। চরিত্র হিসাবে তিনি পুরাদস্তুর চীনা। মহা-অহিফেন-সেবী, মহাজ্ঞানী ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রাচীন চীনা ঐতিহ্যের আধুনিক প্রকাশ তাঁর মধ্যে। দেখে মনে হয় তাও-পন্থী। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানের সে Opium tray'র সম্বন্ধ নিগূঢ়। তা হো'ক। তা'তে তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তাতে বরঞ্চ তাঁর চীনা লক্ষণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের জ্বালাময়ী লীলার উর্দ্ধে তাঁর প্রজ্ঞা সমাহিতি মুগ্ধ করে। তিনি নিজে একেবারে নিষ্ক্রিয় ও শান্ত এবং অহিফেন-মগ্ন। এ রকম উষ্মা-বিহীন শান্ত ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন মালরো-র সর্ব্বগ্রাহী তাপমানে জানা সম্ভব হয়েছে। তিনি মনে মনে বেশ জানতেন কিও-র কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের এই সব আন্দোলন একটা খণ্ড-নাট্য-লীলা, যার পেছনে পরম-সত্যের সমর্থন ঠিক নেই। তবু তিনি এই কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের পরিপন্থী হন নি, সর্ব্বতোভাবে তার সমর্থন করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। একবার শুধু জিসোর-এর এই পাষাণ সমাহিতি ভ্রূব হতে দেখলাম, কিও-র মৃত্যুর পর। তিনি শাংহাই ছেড়ে কোবে এসে অধ্যাপনা কার্য্যে মগ্ন হয়েছেন। এমন সময় মে এসেছে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। মে-কে বল্লেন—"I have not forgotten that May. It's something else...Kyo's death isn't only pain, it isn't only that things are changed···It's—a metamorphosis. I have never loved the world over-much : Kyo kept me in touch with mankind, it was through him that men existed for me···।" পিতা পুত্রের সম্বন্ধ এত গভীর ছিল! তারপর বল্‌ছেন—"Marxism no longer lives in me. Kyo looked upon it as a form of will—that's true—don't you think ?"—হাঁ ঠিক। কিন্তু, আসলে মনে হয় মার্ক্‌স্‌বাদের এ ভাষ্যটি জিসোর-এর নিজের। কিও উত্তরাধিকারীসূত্রে পেয়েছে মাত্র। কিন্তু এবার তাঁর পুনর্ভাষ্যটি বল্লেন—"But I see in it a fate, and I adhered to it so that my fear

might have a link with fate. There is almost no fear left in me now, May : since Kyo died, I haven't minded dying. I have been freed !—at one and the same time from death and from life. "—একে ঠিক শোকোচ্ছ্বাস বলব কি ?

এর পর চরিত্র হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাতড্, ক্লাপিক, ফেরাল এবং হেমেল্‌রিশ্। বিশেষতঃ ক্লাপিক-এর রণ-ক্ষেত্র থেকে পলায়ন-পর্বটি খুব উপভোগ্য ও সজীব। ইন্দ্রিয়বিলাসী ফেরাল্-এর (French Consortiumএর পরিচালক) কর্মকাণ্ড এবং কাম-কাণ্ড বেশ রসাল হয়েছে। তারপর হেমেলরিশ্ এবং কাতড্-এর করুণ পারিবারিক চিত্র মনে পড়ে। এই সূত্রে বলে রাখা ভাল যে বইটার আর এক দিক আছে। সেটা ক্যাথার্সিস-এর। মনের পুঞ্জীভূত রস-প্রাবল্য যেটা আবর্জনার মত ঠেলতে থাকে ভেতর থেকে—বহির্গমনের পথ পায় বইয়ের পাতায় পাতায়। লেখক সেজন্য ধন্যবাদার্হ।

শেষ করার আগে বলা দরকার লেখক স্বয়ং একজন গোঁড়া কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিজ্‌মের রস-বিমুখী বস্তু নিয়ে এত বড় রস-সৃষ্টি যিনি করতে পারেন তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। কিন্তু সম্প্রতি অ্যাঁদ্রে জিদ্ ও অট্টনাদী রোঁলার কম্যুনিষ্ট হওয়াটা সাহিত্যের তরফ থেকে অবান্তর। মানে, কম্যুনিজ্‌ম তাঁদের সাহিত্য-চর্চাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে বলে ভরসা হয় না। অথচ কম্যুনিজ্‌মও যে রসাত্মগ তার প্রমাণ মাল্‌রো-র সাহিত্য-সাধনা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র।

Poems—By William Empson (Chatto & Windus)

Poems—By George Barker (Faber & Faber)

Selected Poems—By Marianne Moore (Faber & Faber)

A Time to Dance—By Cecil Day Lewis (Hogarth Press)

জাক্ মারিত্যাঁ একদা এক গাছের কথা লেখেন। সে গাছ নাকি বলেছিল, "আমি শুধু গাছ, আর কিছু নয় ; আমি যে ফল ফলাব, সে হবে শুধু ফল। সুতরাং মাটীর যোগ আমি রাখব না, মাটী তো গাছ নয় আর এ আবহাওয়া আমি চাই না, এ তো শুধু গাছ-আবহাওয়া নয়, এ তো সারা প্রভাঁস্ বা ভাঁদের জলবায়ু। বাতাস থেকে আমাকে বাঁচাও।"

দীর্ঘকাল ধরে' কাব্যলক্ষ্মীও এই বুলি আওড়াতেন। টি, এস্ এলিয়ট্ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে অন্য সুর বলান্, এই তাঁর কৃতিত্ব। কবিত্ব করে' বলা যায় যে এবার কাব্যলক্ষ্মী জীবনের সমুদ্র থেকে উঠলেন। উঠলেন বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বধর্মে নিধন ভালো, ফলে দেখি দুর্বল ডে লুইস যে জীবন দেখেন, সে সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত কম্যুনিষ্ট জীবন। তাই এম্‌পসন্, ব্রিটিশ্ মিউসিয়মের বারাণ্ডায় আর মারিয়ান্ মুর জন্তুর বাগানে; অর্থাৎ গাছ একটা না একটা আশ্রয় চায়—হয় মাঝিষ্ট্ গ্রন্থশালায়, নয় যাদুঘরে।

মারিত্যাঁ এক জায়গায় বলেছেন যে শিল্পীকে নিজের শিল্পে মানতে হয় একটা তপস্যার কাঠিন্য, ঋজু ব্রহ্মচর্য্য এবং তা মান্‌তে গিয়ে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। এই শুচিতা প্রায়ই বার্কার পালন ও রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর মধ্যে নিজের সুখদুঃখ দেহমন নিয়ে, নিজের বিশ্বালোচন নিয়ে নাটুকে অতিশয্য তাঁর কাব্যকে পীড়িত করে। কিন্তু এ স্লাকামি স্পষ্ট বোঝা যায় প্রথমযৌবনের প্রায় স্বাভাবিক বিকার মাত্র। বিদ্যাপতি এই বিকারই রাধিকা-প্রসঙ্গে বর্ণনা করে' গেছেন। এ কথা মনে হয় যে অন্য তিন কবির মতো বার্কার মানবজীবন ও সভ্যতার অলিগলিতে যান নি। যে পথে তিনি তারস্বরে আত্মকীর্তন করছেন, সে পথ বড়ো ঐতিহ্যের চওড়া পথ, সে পথে চলা যায় ও চলার পূর্ণ পরিণতি আছে। বায়রণের নাটুকেপনা—ডন্ জুয়ানের নয়, চাইল্ড্ হ্যারল্ডের, বার্কারের ঘাড়ে চেপে থাক্‌লেও, তাই তাঁর মধ্যে মেজর কবির দুর সম্ভাবনা দেখি। অবশ্য বার্কারের প্রিয় মৃত্যু ও প্রেম এখনো কৈশোরের কল্পনাউদ্ভাসিত নাটুকে প্রেম ও মৃত্যু। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের সীমা বিষয়ে সজ্ঞান (Narcissus I)। আর বার্করের নাটুকেপনা ছাপিয়ে' ওঠে তাঁর উজ্জ্বল প্রাণশক্তি। এই উজ্জ্বল প্রাণশক্তি কিছুকাল আগে রয় ক্যাম্পবেলেও পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাম্পবলের মননমার্গ রোমান্টিক রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চার হওয়ায় তাঁর কবিপ্রকৃতি ম্যাজেপার ঘোড়দৌড়, ট্রিষ্টান্ ডা কুন্‌হা, গোখরো সাপ পোষা ইত্যাদিতেও চমৎকার আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যেই রুদ্ধ হল। বার্কারের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, যে ব্যাপক জীবনায়ন ও নিজের সীমাজ্ঞান পাওয়া যায়, তারই জন্যে ভরসা হয় তাঁর ভবিষ্যতে এবং ক্ষমা করা যায় এই রকম দুর্বল অনুকরণ—

> Wondering one, wandering on,
> One among stars, gone
> For ever from beneath the feet, bereft
> From your always wandering all is left.

কিন্তু চার পাঁচটি কবিতায় অন্তত বার্কারের সংযম এর চেয়ে ভালো কবিতাও সম্ভব করেছে। এবং বার্কারের এই কবিতাগুলিতে স্বকীয়তার দীপ্তি আছে। বিশ্বজগৎ বার্কারের মনে বাঁধা সড়কে যায় না। এই মননের স্বকীয়তায় তাঁর হাতে ভাষার নির্বিশেষ কথা হয়ে' উঠেছে বিশেষ। তাই হয়তো তাঁর শিল্পের ত্রুটি। তাঁর শিল্প তৈরি কিছু নিয়ে কারবার করতে পারে না, তাঁর শিল্প তাই—নিতান্ত ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে—একটু উচ্ছ্বসিত, primitive। প্রিমিটিভ্ সম্বন্ধে মারিত্যাঁর বক্তব্য মনে রেখেই বার্কারকে এ নিন্দা করছি।

দুঃখের বিষয়, ডে লুইস্‌কে এ নিন্দায় নন্দিত করা সম্ভব নয়। বার্কারের তপশ্চর্য্যায় ত্যাজ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে বয়সোচিত চাঞ্চল্য আর ডে লুইসের তপশ্চর্য্যাই নেই। তাঁর প্রবন্ধের বই পড়ে' ও তাঁর গুরু ও বন্ধু অডেনের বিশ্বরূপদর্শনে (The Arts Today নামক গ্রন্থে) জেনেছি যে কাব্য সম্বন্ধে ডে লুইসের বোধশক্তি কিঞ্চিৎ স্থূল ও তাঁর বিশ্বালোচন মাঝারী পথে হাঁটতে গিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরছে। এই নব রোমান্টিকরা যে শুধু সমাজরাষ্ট্রীয় পরিবর্তন

চান, তা নয়, তাঁদের জীবনায়নই সেখানে শেষ। এলিয়ট্‌পূর্ব্ব কাব্য সম্বন্ধে আপত্তি হত সে কাব্যের বহুমুখ জীবনকে এই সংক্ষিপ্ত সহজ করাতেই; সে আপত্তি আবার এই কম্যুনিষ্ট কবিকিশোরদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই ফাঁকি ডে লুইসেই সব চেয়ে সহজে ধরা পড়ে, কারণ তাঁর শিল্প নেহাৎ স্থূল। তাই তাঁর এ গুরুতর প্রশ্নের জবাব দেবারও প্রয়োজন হয় না—Is it your hope, hope's hearth, heart's home, here at the lane's end? বরঞ্চ হপ্‌কিন্‌সের জন্যে দুঃখই হয়। লুইসের যে মনন ক্ষীণ ও জীবনদৃষ্টি ধার করা তার একটা প্রমাণ তাঁর এই হপ্‌কিন্‌স ও অডেনের কবিতাশিল্পের কাছে ঋণ। তার চেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর নাম-কবিতার শিল্পরীতির অন্তসারশূন্যতা। Yes, why do we all, seeing a Red, feel small?—ইত্যাদি প্রশ্নে বাক্য ছাড়া সে কবিতাটি কিপ্‌লিং-নিউবোল্টের ভাষাতেই লেখা। এবারে লুইস্ pylon, cantilever, kestrel-দের হাত এড়িয়েছেন বটে, কিন্তু অর্কেষ্ট্রাকবিতা লেখার মানসিক সম্পদ্ ও শিল্পক্ষমতা তাঁর এখনো হয় নি। শুধু তাই নয়। এটি পড়ে লুইসের কম্যুনিজ্‌মের ফাঁকি আরো ধরা যায়। তার কারণ এর বহুচর্ব্বিত প্রেম (love) charity নয়, মৈত্রী নয়। তার কারণ এতে সেই বিশেষ নেই, যে বিশেষ কবির কোনো predominating passion থাকলে তাঁর কাব্যকে রঙিয়ে দেবেই দেবে। তা ছাড়া, এই কম্যুনিজ্‌মের জয়গান যখন মানবজীবনের বেড়ার বাইরে একঘেয়ে সুরে চলে, তখন সে কাব্যে কবির বিকাশের সম্ভাবনাই বা কোথায় আর বলিষ্ঠ জীবনানুগতাই বা কৈ? আর মাত্র জীবনানুগতাই যে কাব্যের উৎস নয়, সে কথা টমিষ্টরাও বলেছেন।

জানি এখানে সমাজিক প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর এলিয়ট্ তাঁর কবিতায় দিয়েছেন, স্বধর্ম্মানুসারে ইয়েট্‌স্‌ও দিয়েছেন। এ সমস্যায় ডে লুইস্ ও তাঁর সমপন্থীরা গোলকধাঁধায় ঘুরছেন ও ঘুরবেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ তাঁরা ভুলে' যান মানবধর্ম্ম এবং তাতে শিল্পের বিশেষ স্থান ও মর্য্যাদা কি ও কোথায়। মারিত্যাঁর ভাষায় তাঁদের দুর্দ্দশার বর্ণনা এই—

And for this reason human production is in its normal state an artisan's production and therefore necessitates a strict individual appropriation. For the artist as such can share nothing in common; in the line of moral aspirations, there must be a communal use of goods, whereas in the line of production the same goods must be objects of particular ownership. Between the two horns of this antinomy St. Thomas places the social problem.

When work become inhuman or subhuman, because its artistic character is effaced and matter gets the better of man, the material factors of civilisation, left to themselves, naturally tend to communism and the death of production, through the very excess of proprietarism and productivism which is brought about by the predominance of the *factible*.

কিন্তু ঐ পূর্ব্বোক্ত প্যাশন বা টমিষ্টদের কথায় habit—তার অভাবে লুইসের কাব্য যেমন দুর্ব্বল, সেই অভ্যাসের জোরেই তেমনি মিস্ মুর বা এম্‌প্‌সন্ স্বপ্রতিষ্ঠ। অভ্যাসের জোরেই—কারণ এঁরা কেউই মেজর কবি নন। তাঁদের কবিস্বভাব দুর্ব্বল

নয়, কিন্তু সুকুমার, যত্নপুষ্ট। কিন্তু শুভবুদ্ধি তাঁদের দিয়েছে সীমাজ্ঞান এবং তাঁদের স্বাভাবিক অভাব ও সার্থক অভ্যাস তাঁদের শিল্প ক্ষমতায় সংহত মূর্ত্তি লাভ করেছে।

অবশ্য যে পাঠক হেনরি জেম্‌স্ পড়েন নি, ডাল্লিআড ও হুডিব্রাস্ যাঁর ভালো লাগে নি এবং এমিলি ডিকিনসন্ আর আলিস মেনলের কবিতা যাঁদেরকে অভিভূত ক'রে না, তাঁদের মারিআন্ মুরকে ভালো লাগবে না। আর মার্ভলের বৈদগ্ধ্য ও রচচেষ্টারের চিন্তাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য যাঁরা বোঝেন নি তাঁরা এম্‌প্‌সনের সুকুমার বৈজ্ঞানিকমন্ত্র কবিত্বও বুঝবেন না। অবশ্য এঁরা দুজনে সবসময়ে সুর ঠিক রেখেছেন ভাবলে ভুল হবে। তাল কেটেছে মধ্যে মধ্যে, মধ্যে মধ্যে তানেও হয়েছে গোলযোগ। কিন্তু কয়েকটি ভাল কবিতা তো পাওয়া গেল আর তা ছাড়া The artist who has the habit of art and the quivering hand produces an imperfect work but retains a faltless virtue. (Art and Scholasticism)

মিস্ মুরের দৃষ্টি যেন সারসের মতো—মিস্ সিট্‌ওএলের কবিতা যেন কাকাতুয়ার আর্ত্তনাদ। স্থির শান্ত তাঁর ভঙ্গী—হঠাৎ দেখি শিকার হয়ে গেছে—কবিতার বিশেষ মুহূর্ত্তটি আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি ও ধারালো ঠোঁটে ধরা পড়ে গেছে। দৃষ্টি তাঁর হেনরি জেম্‌সের মতো, হড্‌সনের মতো প্রখর, প্রয়োগ ও গতি তাঁর পোপের মতো, বটলরের মতো তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র। অথচ আসন তাঁর সংযত শালীনতায় শ্রীমতী ডিকিন্‌সনের বা মেনলের মতো সুষ্ঠু ও সংহত-আবেগ। মিস্ মুরের ভাষাও অন্তরঙ্গ স্বকীয়তায় নিজের কাছে সার্থক ও পাঠকের কাছে মূল্যবান। মারিত্যাঁর পরীক্ষা তিনি পেরিয়ে গেছেন—it is bound fast to an object—any object to be made, certainly, not an object of contemplation.

তাঁর, তথা এম্‌প্‌সনের, তপশ্চর্য্যা সার্থক সন্দেহ নেই। Selected Poems-এর ভূমিকায় এলিয়ট বলেছেন যে জীবজন্তুর প্রতি বিষয়গত টান দেখে যদি কেউ ভাবে মিস্ মুর trivial, তাহলে বুঝতে হবে তারই মন trivial। নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, আর বাইব্‌লের কাল থেকে জীবজন্তুর বিষয়গত সার্থকতা তো আমরা দেখেই আসছি। কিন্তু একথা তো আধুনিক মনস্তত্ত্বে বলে ও সেণ্ট্ টমাস্ সেকালেই বলেছিলেন যে মানসিক ক্রিয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তু, কোনো কোনো প্রতীক অন্যাপেক্ষা মূল্যবান—যথা ঘ্রাণ গন্ধের সম্বন্ধে যা মানসিক ক্রিয়া হয়, তার চেয়ে দৃশ্যবর্ণের ক্রিয়া আরো গভীর। আধুনিক কবি হতে হলে হতে হবে মহাকবি—এ কথা মিস্ মুরকে বা এম্‌প্‌সনকে বলা যায়। তাঁরা কবি এবং ভালো কবি; কিন্তু তাঁদের ব্লাস যে জগতে সে জগৎ সীমাবদ্ধ। এখানে আরেকটা উদ্ধৃতি তাই দিয়ে ফেলছি—

For this reason art, as ordered to beauty, never stops—at all events when its object permits it—at shapes and colours, or at sounds or words, considered in themselves and *as things* (they must be so considered to begin with, that is the first condition), but considers them *also* as making known something other than themselves, that is to say *as symbols*. And the thing symbolised can be in turn a symbol, and the more charged with symbolism the work of art, the more immense, the richer and higher will be the possibility of joy and beauty. The

beauty of a picture or a statue is thus incomparably richer than the beauty of a carpet, a Venetian glass, or an amphora.

কিন্তু এ দুঃখ নিয়ে কাব্য পড়া পণ্ডশ্রম। ইংরেজির মতো সাহিত্যেও তিন জনের বেশি মহাকবি আশা করাই অন্যায়। তাই এম্‌প্‌সন্‌ পদার্থবিদ্যার জ্ঞানকে কাব্যমণ্ডিত করতে পারলেন না বলে' দুঃখ না করে' রাসায়নিক বিদ্যাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে'ই কৃতজ্ঞ রইলুম। Poems-এর আট নটি কবিতা ও Select Poems-এর ততোধিক যে কোনো পাঠককে তপ্ত করবে বলে' আমার বিশ্বাস। আর খুসি করবে মিস্‌ মুরের গদ্যের শব্দকে কাব্যমণ্ডনের ও এম্‌প্‌সনের বৈজ্ঞানিক শব্দকে কাব্যভাষা করার ক্ষমতা দেখে।

কিন্তু এলিয়ট্‌ যে মিস্‌ মুরের লাজুক ও শালীন স্বভাব আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করে বলেছেন, তার দ্বারা কোনো প্রশংসাই হয় না। এ কুণ্ঠা যদি কোন বাধজ (inhibition) হয়, তো কবি চিকিৎসা করালেই পারতেন। তাছাড়া মিস্‌ ডিকিন্‌সনেরও তো এই বাধ ছিল, কিন্তু তিনি চিড়িয়াখানার আনাচে কানাচে ঘোরেন নি। মিস্‌ মুর্‌ লিখেছেন,—

The deepest feeling always shows itself in silence ;
not in silence, but restraint.

তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ কঠিন শাসনের মধ্যেও বহমান দেখেছি। শুধু এই শাসনের গণ্ডী টেনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশেও রেখা টেনেছেন, এই আমার ভয়। এ ভয় এম্‌প্‌সনের বিষয়ে আরো বেশি, কারণ তাঁর গভীরতা আরো আপাতদৃষ্ট, তাঁর স্বভাব আরো সৌধীন ও খেয়ালী। কিন্তু এঁরা দুজনেই স্বধর্মশীল তাই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ কবি—যা ডে লুইস নন্‌। মিস্‌ মুর্‌ তাই বলেছেন—

I, too, dislike it ; there are things that are important
beyond all this fiddle.
Reading it, however, with a perfect contempt for it.
one discovers in
it after all, a place for the genuine.....
.....all these phenomena are important. One must
make a distinction
however : when dragged into prominence by half poets,
the result is not poetry.
nor till the poets among us can be
literalists of
the imagination—above
insolence and triviality and can present
for inspection, imaginary gardens with real toads in
them, shall we have
it. In the meantime, if you demand on the one hand
the raw material of poetry in
all its rawness and
that which is on the other hand
genuine, then you are interested in poetry.

বিষ্ণু দে

Hunger and Love—By Lionel Britton, (Putnam).

গত চার বৎসরের মধ্যে ব্রিটনের নাম প্রচারিত হয়েছে উদ্ভট সাহিত্যিক হিসাবে। 'বুভুক্ষা ও প্রেম' নামধারী এই উপন্যাসখানি লেখবার আগে Brain বলে একটি নাটক তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীটা ছিল তার পটভূমিকা। মানুষের সৃষ্টি-রহস্য থেকে আরম্ভ করে তার অভিব্যক্তি ও পরিণতি, যন্ত্রচালিত সমাজ থেকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক সভ্যতা,—এই ধরণের নানা দৃশ্য তাঁর সর্বগ্রাসী নাটকগর্ভে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব-শৃঙ্খলার বিপুল বিস্তার তাঁর পাঠক ও সমালোচকদের মন উদ্বুদ্ধ না করে উদ্ভ্রান্ত করেছিল। চরিত্র-সূচীর মধ্যে কেউ কেউ নায়িকার দর্শনাভাস না পেয়ে যে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল হিংস্র ও উগ্র রকমের সমালোচনা করে।

অবশ্য অসহায় পাঠকবর্গের তরফেও কিছু বলবার আছে। ব্রিটনের 'ব্রেনে' যে ব্রেনের চিহ্ন সুস্পষ্ট সে কথা অস্বীকার করতে সাহস হয় না। কিন্তু যখন তাঁর রচনাকে ন্যায্যাতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়, তখন গায়ে পড়ে তর্ক করবার প্রবৃত্তি হয়। তাঁর লেখায় কল্পনার প্রসার আছে, বলিষ্ঠ মননশক্তির পরিচয় আছে এবং পড়তে বসে তার নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্যে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের বিফলতা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য। একটা বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যা রচিত হল, তার অস্তিত্ব ও পরিচয় বাস্তব ধারণার বাইরে। গোটা কয়েক দার্ম্ভিক ভবিষ্যদ্বাণীকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেও, তা না হয়েছে বিজ্ঞান না শিল্প-সৃষ্টি। এর চেয়ে ওয়েলসের বিশ্বরাষ্ট্র অনেক সহজবোধ্য। তাঁর বুর্জোয়া মনোভাব নিয়ে হাঁসি যতই তুরন্ত রসিকতা করুন, এবং ব্রিটনের সমাজতত্ত্ব ওয়েল্‌স্‌-এর ধারণার চেয়ে যতই উন্নত ও যুক্তিসঙ্গত হোক্‌, ওয়েল্‌স্‌-এর লেখায় সাহিত্যগুণ আছে, পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকতা আছে,—যে কারণে তাঁর রচনা অত্যন্ত সুপাঠ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রসাদগুণ আর পঠন-যোগ্যতাই সাহিত্যিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়। মূল্য নির্দ্ধারণের একাধিক উপায় ও পরীক্ষা আছে। কিন্তু ধারণা আর কল্পনা ব্যাপক অথবা বিস্তৃত হলেও, কেবলমাত্র অভিনব পদ্ধতির জোরে সাহিত্য তৈরী হয় না। হাক্সির 'ডাইনাস্‌টস্‌' যে কারণে মহাকাব্যের যুগসৃষ্টি, ব্রিটনের 'ব্রেন' ঠিক সেই কারণেই আধুনিক কালের অহৃদ্দেশ বিসৃষ্টি।

এই উচ্চাঙ্গী এক্‌স্‌প্রেসনিষ্ট নাট্য কবিতা থেকে যখন তাঁর উপন্যাসক্ষেত্রে পৌঁছানো গেল দেখলুম ভদ্রলোকের মতি-গতির কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তন হয় নি। একনিষ্ঠ ধর্ম্মাচরণের মনোবৃত্তি নিয়ে এবং সূক্ষ্ম ও সজাগ মনোনিবেশ দিয়ে বইখানা শেষ করে ফেললাম—নাম করা বিলাতী সমালোচকবর্গের ওপর অশ্রদ্ধা ও সভয় আস্থা স্থাপন করে। আর কর্ত্তব্যচ্যুতির ভয় রইল না, তবে বুঝলুম যে ব্রিটন সাহেবের সামাজিক মতবাদগুলো আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গীর উৎকট অভিনবত্ব ঠিক সম্পূর্ণই বজায় আছে। বার্ণার্ড্‌ শ ব্রিটনের লেখার প্রশংসা করেছেন এবং এ-কথা সে-কথার পর মত প্রকাশ করেছেন, তিনি লিখতে জানেন। আমারও তাই মনে হয়, তবে গুছিয়ে নয়—এটা ঠিক।

অনেকেই ব্রিটনের বই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন নি, এবং অহেতুক সন্দেহ হয় যে অনেকস্থলে শ নিজেও একবর্ণ পড়েন নি। কিন্তু ব্রিটনের উপন্যাস যে প্রণিধান-যোগ্য এ কথা তাঁর অতি বড় কঠিন সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না। হয়ত আমাদের অনেকগুলো পুরাতন ধারণা ও আরামপ্রদ সংস্কারকে তাঁর বক্তব্য অতি রূঢ়ভাবেই আঘাত করে। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর বই যত্ন করে পড়া উচিত, অন্ততঃ যতটুকু সম্ভব।

উপন্যাসে অনেক চরিত্র আছে, কিন্তু তারা সব গৌণ, মনকে ভালো করে স্পর্শ করবার আগেই তারা মিলিয়ে যায়। গল্পের নায়ক হল আর্থার ফেল্‌প্‌স। ব্রিটন অত্যন্ত গম্ভীরভাবেই তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করে দিয়েছেন প্রাণিতত্ত্বের ভূমিকা দিয়ে। ফেল্‌প্‌স হল সমাজের নিম্নস্তরের একজন উৎপীড়িত মানুষ, যদিও তার ন্যায্য স্থান অভিব্যক্তির উচ্চস্তরে। কৈশোর থেকে আরম্ভ করে যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত নিজস্ব বুদ্ধি আর পর্য্যবেক্ষণ-বৃত্তির সাহায্যে তার মননশক্তির কতটা উন্নতি সাধিত হয়েছে, বইখানি তারি ইতিহাস। অবান্তর ঘটনার ভিড় কাটিয়ে যদি কেন্দ্রস্থলে পৌছানো যায়, দেখা যাবে উপন্যাসটি ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও সত্তার মধ্যস্থতায় সমগ্র সমাজ তথা বিশ্বনিয়মের সমালোচনা, নিগূঢ় উদ্দেশ্যের গভীরতর উপলব্ধি। জনসাধারণের একটি নগণ্য অঙ্গ হয়েও ফেল্‌প্‌স একজন উচ্চ শ্রেণীর প্রবুদ্ধ ও প্রগতিশীল ব্যক্তি। জীবনে তার অগণিত বাধা বিপত্তি এসেছে, জ্ঞানার্জ্জনের পথে একাধিক অন্তরায় তার মনকে বিচ্ছিন্ন করেছে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিকে খণ্ডিত করেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানানুরাগের প্রখরতা তার কোনও দিন কমে নি। তারি আতিশয্য হেতু সে যে বইএর দোকানে কাজ করত, সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ে সময় নষ্ট করার জন্য তার চাকরী গেল। সুরু হল জীবন সংগ্রাম, যেটা মাত্র রূপক নয়,—অতি মাত্রায় বাস্তব, কঠোর, অপ্রিয়। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক অসুবিধা সত্ত্বেও ফেল্‌প্‌স কখনো তার মনুষ্যত্বকে প্রবঞ্চিত করেনি, এই জড়ভরত সমাজ ও তার প্রচলিত নিষ্ঠুর বিধি-বিধানকে স্বীকার করে নিয়ে আপনার বিবেককে জলাঞ্জলি দেয়নি। মন ও বুদ্ধি হৃদয় ও দেহের বশ্যতা গ্রহণ করলে হয়ত তার জীবন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সুগম হত। কিন্তু প্রতিপদেই তার সুকঠোর আহ্বান-রূঢ় জিজ্ঞাসা, যা অনুভূতির তীব্রতায় ও স্বাতন্ত্র্যহীন জগতের নির্ব্বোধ প্রথার প্রতি ঘৃণায় উন্মুখর।

ব্রিটন কশাঘাত করেছেন প্রচুর, অনেক স্থলে নির্ম্মম উল্লাসেই। পড়তে পড়তে সুইফ্‌টের কথা মনে আসে। তবে সুইফ্‌টের মত ব্রিটনের আক্রমণ ধ্বংসমূলক নয়। ব্রিটন সমবায়-শক্তিতে আস্থা রাখেন, বিশ্বাস করেন সংঘবদ্ধ হলে মানব-সমাজের অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হবে। যেমন অনেকগুলো একক্রিয়, সমধর্ম্মী জীব-কোষের অঙ্গাঙ্গি সমষ্টিতে প্রাণিদেহ গঠিত হয়ে ওঠে এবং সকলেই যেমন মস্তিষ্কের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে আপনার কাজ করে যায়, তেমনি বিভিন্ন মানুষ যদি স্বার্থ-বিদ্রোহিতা ত্যাগ ক'রে সংহত শক্তির প্রাধান্য গ্রহণ করে, তা' হলে সমাজের প্রভূত উপকার অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটন একস্থলে লিখেছেন—

"The human—as we are coming to know it now—cannot exist except in civilisation. It is not a quality of individual men

at all, but arises only out of association and co-operation as a mass-effect and individuals are human individually by metaphor in so far as they contribute to the human in civilisation. It is a totality effect like the soul in body, and depends upon the organisation of the whole."

তাঁর এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হল ফেল্‌প্‌সের জীবনচরিত। অনেকেরই ধারণা যে বর্ত্তমান সমাজে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশাতেই মানুষ সমগ্র জাতির সর্ব্ব-সাধারণ উদ্দেশ্যকে কাজে পরিণত করতে প্ররোচিত হয়। কিন্তু এ বিশ্বাস অমূলক। জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ফেল্‌প্‌সের আছে। কিন্তু মনিবদের আর ধনী-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-প্রণোদিত মহাযুদ্ধ তার মহান্ প্রচেষ্টার বিষ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটন দেখিয়েছেন, কিরূপে শিক্ষা, সাহিত্য, নৈতিক জীবন, ধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তাদের মানব-গুণ হারিয়েছে। সকলেরই এক লক্ষ্য কেমন করে এই বিচ্যুত ও উৎপীড়িতদের আজীবন নির্ভরতার নাগপাশে বেঁধে ফেলা যায়। একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আত্মোন্নতি ও শিক্ষা উপলক্ষ্যে ফেল্‌প্‌স আবিষ্কার করলে, বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে একটা স্বভাবগত বিরোধ আছে। পরে তার বদ্ধমূল ধারণা হ'ল, রোম্যান্টিসিজ্‌ম আর কিছুই নয়—যে সব লোক অথবা শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আছে তাদেরই রচিত একটি সুমিষ্ট-প্রলেপ মতবাদ। অবশ্য যাঁরা অজ্ঞাতসারে শান্তিরক্ষক, বিচারক, প্রভুবর্গ প্রভৃতি রাষ্ট্র-প্রণালীর বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগগুলিকে পরিপোষণ করে আসছেন, তাঁদের কাছে এরকম ধারণা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যাদের আপনার অন্ন-সংস্থান আপনার পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব, তাদের কাছে এটা সত্য অভিজ্ঞতা। বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বুঝেও বোঝেন না,—যেহেতু তাদের সাহিত্য, তাদের মুখপত্র, তাদের ধর্ম্ম-সংঘ সব কিছুই এই শাসন প্রণালীর কঠোরতাকে মোলায়েম করে দেয়। কিন্তু শ্রমজীবী অথবা বেতনজীবীকে প্রতিনিয়তই ঐ শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধির সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে; অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে হচ্ছে—গলদ কোনখানে।

ব্রিটন বিশ্বাস করেন যে উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সমস্ত লোকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যোগ্যতম মানুষের সমকক্ষ হতে পারবে। অবশ্য এ সব ধারণা সমালোচনার বাইরে, কারণ তর্কে ক্ষ্যাপামি বেড়ে যায়। The Mass-Production of Genius নামক অধ্যায়ে এবং বইএর অন্যান্য অনেক স্থলেও ব্রিটন এই কথাটাই বার বার বলেছেন যে প্রতিভা-বিকাশের সহায়ক একটা সমিতি গঠন করা অত্যন্ত দরকারী হয়ে পড়েছে। Genius-Production Society-র মারফত অনুরূপ শিক্ষার সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের সহজাত দ্রব পদার্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন হবে সেটা আন্দাজ করা একটু কঠিন। অবশ্য সু-প্রজনন বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেললে আমরা যে কি না করতে পারি তা' বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে ব্রিটন সাহেবের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা এবং আধিবিক অনুস্বতার মধ্যবর্ত্তী রেখাটি নিতান্তই সূক্ষ্ম। তাঁর এই সম্পূর্ণ নতুন উপায় উদ্ভাবনের কথা পড়লে মনে হয়, যদি Chelsea-র বিকৃত-যকৃৎ দুর্ব্বাসা মুনি বেঁচে থাকতেন।

ব্রিটনের আর একটি অতি প্রিয় ধারণা আছে, তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। সেটি হল, সংঘ-শক্তি। সমগ্র মানব জাতিটাকে সুব্যবস্থিত শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেললে, ব্রিটনের মতে, জগতের যাবতীয় অন্যায়, অশান্তির পূর্ণচ্ছেদ হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাঁধবে কে? ব্রিটন উত্তর দিয়েছেন মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা। জীবকোষেরা এই ঐক্য-শক্তির মূল রহস্যের সন্ধান পেয়েছে বলেই জৈব পদার্থের এতটা সুনিয়মিত ব্যবস্থাপন। তিনি লিখেছেন,—

"The cells have found it out. Each mitosis leaves them a little quicker at selective osmosis and assimilation than before, greater hormone responsiveness, nimbler livers...."

কিন্তু জৈবগঠনেও এটা আংশিকভাবে সত্য বা সফল। এই উপন্যাসের গোড়াতে বার্টরেণ্ড্ রাসেল-কৃত ভূমিকায় এই মতবাদের অতি উপাদেয় সমালোচনা ও বিশ্লেষণ আছে, যেটা পড়লে বোঝা যায় দীর্ঘ ও জটিল প্রলাপের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রকাশ কত বেশী মনকে উদ্বুদ্ধ করে। রাসেল বলেছেন,—

"There may be cancer cells which may develop Napoleonic ambitions and bring the whole body to destruction. And when in health, the body is governed not democratically but autocratically from the brain. .....I think such an organism of the human race as Mr. Britton has in mind would necessarily be oligarchic and would therefore contain within itself the same distinction of master and slaves which makes him indignant with our existing society. Moreover, it is difficult to conceive of values as residing elsewhere than in individuals."

তা ছাড়া ব্যক্তিরও স্বাতন্ত্র্য আছে—সে সমষ্টির প্রতীক-মাত্র নয়। রাসেল সঙ্গীত-রচনার উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন—

"Can we imagine the collective brain of the human race, however highly organised, producing a symphony? Collective mankind can give individual training and opportunity, but he alone must do the creative work."

মুস্কিল হচ্ছে এই যে সংঘ-গঠন, জগতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের একমাত্র প্রতিকার হ'তে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজেও শক্তিধারী মানুষ থাকবে যে তার ক্ষমতাকে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রয়োগ না করে আপনার শ্রেণীর উন্নতি-বিধানে উৎসুক হতে পারে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে যতদিন ব্যক্তির হাতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে, ততদিন বিরোধ ও নৈরাজ্যের সম্ভাবনাও থাকবে। কিন্তু, আদর্শ, সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে মানুষ যে তার শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে সযত্নে রক্ষা করবে এই ধারণারই বা কি সুনিশ্চিত ভিত্তি আছে?

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে সাম্যবাদ কয়েক স্থলে সফল হয়েছে বলে প্রতিভায় সাম্যবাদ স্বীকার করতে অনেকেই কুণ্ঠিত হবেন। তবে ব্রিটনের স্বপক্ষে এটুকু

বলা উচিত যে একজন তীক্ষ্ণধী Proletarianএর তরফ থেকে তিনি আধুনিক জগৎ ও সমাজকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। কে জানে হয়ত তাঁর কল্পিত আদর্শটাই খাঁটি এবং একমাত্র মানব-সমাজের সুগঠিত ঐক্যরাজ্যে আমাদের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উন্নতি ও প্রসার হবে। সত্যের স্বরূপ হল নৈর্ব্যক্তিক, বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচারের সময়েই হয়ত তার যথার্থ মূর্ত্তি উদঘাটিত হবে।

সমস্ত বইখানা ভালো করে পড়লে মনে হয় যে ব্রিটন অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সেই প্রলাপের অবসর-মুহূর্ত্তে অনেক সারগর্ভ তথ্য বলে ফেলেছেন। উপন্যাসের মধ্যে Mind-mining, The Space-time Franchise, The Time-scape, Undimensional or Super-dimensional? Romance and Reality, The Origin of Will, The Mass-production of Genius, The Relativity of Ego, ও Toward Infinity নামক অনেক তথ্যবহ ও বুদ্ধিবিভ্রমকারী অধ্যায় আছে। কিন্তু সব চেয়ে আমার ভালো লেগেছে The Recipe for .Greatness শীর্ষক পরিচ্ছেদটি। এটি গম্ভীর সত্য আর উন্মাদ-কৌতুকের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। একটা কথা বলে রাখা ভালো। ব্রিটন Lewes-কৃত Biographical History of Philosophy-কে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একশত পুস্তকের অন্যতম বলে নির্দ্ধারণ করেছেন কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রসিকতা করেছেন—বাইবেলকে অনেকে এই রকম উচ্চাসন দিয়ে থাকে। দর্শন-শাস্ত্রটা অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক, কিন্তু ঐ আধুনিক সমাজের মূর্খতার জ্বালায় কিছু করবার উপায় নেই।

ব্রিটন হচ্ছেন চৈতন্যস্রোতে চালিত চিন্তার পরিপন্থী। এ জন্যে তাঁর লিখনভঙ্গী ও ভাষাও অনুরূপ—সংক্ষিপ্ত, ছেদবিহীন ও ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত। যথা:—

"Judges dishonest. Not a criminal in Christendom makes steady £ 5,000; send prison for stealing less than stealing self.

অথবা আরো ভালো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে "The Recipe for Greatness" থেকে—

" Pyrrho, doubt whether doubted; Spinoza, explain whole world from axioms not find out first whether anybody accept axioms or not; Leibnitz, monads, best of all possible worlds, so usefull to bishops mayors; Descartes, 'I am here thinking therefore here to think; Berkeley, with weighty doctrine can't be conscious without being conscious; Plato, prove by making imaginary characters agree :—all solemnly laying down the Law to which the universe must conform. Darkness, tomfoolery, obesities of One Who Knows."

এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে পড়ল। জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, বলতে গিয়ে ব্রিটন বলেছেন যে যদি আমরা শ্রেণীবদ্ধ ও শ্রেণীভুক্ত করতে শিখি, তা' হলে জগতের প্রতিটি তথ্য আমাদের করতলগত হবে, আর তখন জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করবে। এর ব্যবস্থাও তিনি দিয়েছেন—

"Never become too big to understand.
But how can we understand ?
The infinitude of fact.
The Tiny mind. "

ইন্দ্রিয়-বোধের সাহায্যে আমরা জ্ঞানার্জন করে থাকি। আর এই শক্তির কতকটা আমরা নিজে সঞ্চয় করেছি, কতকটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। তার পরেই ব্রিটন এই বোধশক্তির ইতিহাস দিতে গিয়ে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে টেনে নিয়ে গেছেন, যখন বোধশক্তির পূর্ব্বে ধারণাশক্তি ছিল,—যখন নিরিন্দ্রিয়দেরও গ্রহণ করবার ক্ষমতা ছিল। অতি সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক সত্য।

আবার "The Space-time Franchise" নামক অধ্যায়ে অনেক পাগলামীর শেষে বলেছেন—

"Meantime, the good old space-time continuum went on doing whatever it was it did. The time and space of Arthur's world —the world in which he lived, were already in the process of decay. Minkowski and Einstein were neatly filing it away in the museum of the world's memories. " ইচ্ছা হয় বলে উঠি,—নো-ম্যাটার, নেভার মাইণ্ড।

সে যাই হোক্ ব্রিটনের উপন্যাসে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার অজস্র নিদর্শন আছে। স্থানে স্থানে অদ্ভুত রস হাস্যোদ্রেক করে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, আবেগের প্রবলতা, বর্ণনা ও বিচারের সূক্ষ্মতা, আর সর্ব্বোপরি চিন্তাধারার বিশ্বজনীনতা মনকে বিস্মিত করে। উপন্যাসে অনেক ভালো ভালো অংশ আছে যেগুলো প্রকৃত কাব্যরস ও সৌন্দর্য্যবোধে ভরপুর। মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করলুম, একটি Second Order Differences থেকে, অপরটি Nose drip and knowledge থেকে—

"Beauty is certainly one of the deepest-seated and insuppressible needs of our nature, through the centuries, back past the dawn and into the night of time, since perhaps even before we were men. Beauty, the intangible ..

আর—

"The race drifts, the earth shoots on in a dark night, with no light but the stars, the race drifts on the sea of time, you drift on tho racial sea, bubble, spume blown by the the wind of chance, spray scattered into night's darkness by the storm of time. The dawn of all the tomorrows will rise on a quiet sea from the star movement, out of the flow of things. "

শেষোক্ত লাইন ক'টি পড়লে ওয়েল্‌সের Tono Bungay'র পরিসমাপ্তির কথা মনে পড়ে—যেখানে বলা হয়েছে, "We are all things that make and pass out to the open sea ." অনেক স্থলেই মনে হয়েছে যেন ওয়েল্‌সের প্রতিধ্বনি। আধুনিক সমাজের নির্ব্বোধ নিপীড়নের কথা ব্রিটন হাজারবার বলেছেন—আমার

স্মরণ হয়েছে Ann Veronica অথবা Kipps-এর কথা :—"In a blessed drain-pipe, and got to crawl along till we die।" ব্রিটন বলেছেন সব চেয়ে যে বড়ো কাজ, তাইতে নামতে হবে—তবেই আমরা আত্মপ্রসারে সমর্থ হ'ব। The New Machiavelli-তে আছে—"If I don't attempt the biggest things in life, I am a damned shirk. The very biggest।" লেখকের ওপর ওয়েল্‌সের অজ্ঞাত প্রভাব পড়েছে।

ব্রিটনের স্বপ্ন বিরাট্। সমাজ ও জগতের যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন, তা' অসম্ভব হলেও প্রণিধান-যোগ্য। সকল মনীষীরাই অল্প-বিস্তর আদর্শ-ব্যাধিগ্রস্ত। বার্ণাড শ-ও একদা লিখেছেন—"তোমরা সবাই দেখো আর প্রশ্ন কর—কেন? আমি স্বপ্ন দেখি সেই সব, যা অসম্ভব ছিল, আর জিজ্ঞাসা করি—কেন নয়?"

সমালোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ল, কিন্তু বইখানির আয়তন ও বিষয়বস্তু ত কম নয়! পদ্ধতির কথা বলে শেষ করা যাক্।

বলা বাহুল্য এ ধরণের বইএর সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি না থাকলেও আবয়বিক সংস্থানের জন্য একটা আঙ্গিক রূপ মেনে নেওয়া হয়েছে, তা' সে যতই কুয়াসায় আবৃত হোক্। এত বিশাল এই উপন্যাসের পটভূমি যে তার কোনো সাহায্যই কাজে লাগে না। ফলে একটা বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হয়েছে। ঘটনা ও চরিত্রের বেশী বাহুল্য না থাকলেও চিন্তাধারার জটিল আবর্ত্তে অনেকটা রসহানি হয়েছে। অবশ্য ব্রিটনের বক্তব্যের একটা পারম্পর্য্য আছে—কিন্তু প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক জায়গায় সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি। চৈতন্যস্রোতের ধারাকে নিরাবিল রাখতে হলে যে শিক্ষা-সংযমের অবশ্য-প্রয়োজন, তার অভাব এই উপন্যাসে লক্ষ্য করেছি। অনেক সময়ে তার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রলাপের উদ্বেল বন্যায়। এই কারণে মনে হয়, প্রসঙ্গের যেখানে সাফল্য, ব্রিটনের ও জয়েসের সেখানে পরীক্ষার অভিনবত্ব। নানা গুণ সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে ব্রিটনের উপন্যাসখানি উৎকট রকমের দুরূহ—এতই কষ্টসাপেক্ষ যে এর তুলনায় "দি ওয়েভস্" রীতিমত স্নিগ্ধ পুকুর-জল, আর "অন্তঃশীলা" ত প্রশ্রয়যোগ্যা নাবালিকা।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Progress of Archaeology —By Stanlay Casson, (G. Bell & Sons.)

(ক)

এ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটীতে আধুনিক আর্কিয়লজির একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার অক্সফোর্ডে আর্কিয়লজির অধ্যাপক (রীডার)। আলোচ্য পুস্তকে তাঁর পাণ্ডিত্যের ও রচনা-কৌশলের যুগপৎ পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা গত বিশ বৎসরের আর্কিয়লজি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেতে চান্, তাঁদের কাছে এই ছোট্ট বইটী বিশেষ মূল্যবান্। কেবল একটী দুঃখ আছে; লেখক কোনো Bibliography দেন্ নি, যদিও মাঝে মাঝে ফুটনোটে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

আর্কিয়লজি জিনিষটাকে ঠিক্ পুরা-তত্ত্ব বলা যায় না। "Archaeology

is the study of the human past, concerned principally with the activity of man as a maker of things (p. 2)। আর্কিয়লজির উদ্ভবও অদ্ভুত ; রেলের রাস্তা তৈরী করা, বন্দর বানানো, সুড়ঙ্গ কাটা, —এই সব কাজে মাটি খোঁড়া দরকার হয়, আর মাটির নীচে পাওয়া যায়, সেকালের মানুষের হাতে গড়া জিনিষ,—হয়তো-বা চক্-মকি পাথর, নয়তো-বা দেবতার মূর্ত্তি, আরও কত কী পুরাকালের কীর্ত্তি। কিন্তু একটা কুফল হ'ল। ভূগর্ভোত্থিত রত্নের সংগ্রহ করা একটা বাতিক হওয়ায় অনেক বড়লোকরা লুণ্ঠনের লোভে আনাড়ীর মতন মাটি খোঁড়াতে লাগলেন। এ প্রণালীতে যে সব দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলোর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা অবশ্যই কঠিন ; কেননা কোন্ স্তরে কোন্ জিনিষ পাওয়া গিয়েছে, সেটা না জানলে পারম্পর্য্য বা কার্য্য-কারণ সংযোগ বোঝা যায় না।

(খ)

ইংলণ্ডে ১৯২৫ সালে এয়ার-ফোটোগ্রাফির সাহায্যে 'উড্-হেঞ্জ্' নামে একটী কাষ্ঠময় 'ষ্টোন্-হেঞ্জ'-জাতীয় কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনুমান হয়, এটীর নির্ম্মাণ-কাল খৃষ্টের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। বিমান-সন্দর্শনের পরেই পরশুরামের মতন কুঠার হস্তে ভূমি-খনন-পটু আর্কিয়লজিষ্ট্ সেই স্থলে উপস্থিত হয়েছেন।

ব্রন্জ-যুগের আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স ও স্পেনের সংস্কৃতি-গত সংযোগ এখন প্রতিপন্ন হয়েছে। এঙ্গল্সীতে আবিষ্কৃত একটী গোরস্থানের পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে সেকালে ঐ অঞ্চলে নর-বলি দেওয়া হ'ত। আয়র্ল্যাণ্ডে সোনা ছিল প্রচুর ; সেই সোনার তৈরী জিনিষ হল্যাণ্ড-ডেন্মার্কেও পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ ৩০০০—৪০০০ বৎসরের সময়ে বৃটেনে, এমন-কি পশ্চিম ইউরোপের সব স্থানেই, মানুষগুলো ঠিক্ সভ্য হয় নি ; তখন কোন গতিকে জীবন ধারণ করাটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, শিকার করে আহারের ব্যবস্থা করা ছাড়া তারা চাষ-বাস দুই-ই সবে মাত্র আয়ত্তের ভিতরে আন্তে সুরু করেছে। কিন্তু মধ্য ইউরোপ আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে সভ্যতার একটা সাড়া পাওয়া গেল। প্রাচ্য দেশ থেকে ড্যানিয়ুব নদীর ধারে ধারে এই সভ্যতার প্রবাহ তখন বহমান। সুমেরিয়া বা মেসোপোটেমিয়াতে ছিল এই প্রবাহের উৎস।

মেসোপোটেমিয়ায় 'উর'-নামক স্থানে খনন-কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বে পণ্ডিতরা অনুমান করতেন যে ঈজিপ্টেই সভ্যতার আদিম উন্মেষ হয়েছিল। অবশ্য, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে মিশর থেকে সভ্যতা ভূমধ্যসাগরের আশে-পাশে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উরের আবিষ্কার না-কি প্রতিপন্ন করেছে এই যে, খৃঃ পূঃ ৩৫০০ এম্নি সময়েও সেখানকার শিল্প বেশ উঁচুদরের হয়েছিল। ক্যাসন সাহেবের বইয়ে ছবি দেওয়া আছে,—উরে প্রাপ্ত সোনার বাটী, সোনার গেলাস, 'হার্প'-বাজনা, Mosaic 'Standard' যা দেখ্লে আমরা সুমেরীয় শিল্পীর প্রশংসা করতে বাধ্য হই।

উরে আবিষ্কৃত একটী রাজার সমাধি জিজ্ঞাসুদের জানিয়ে দেয় যে সেখানে সহ-মরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজার সহচররাই মরণের ওপারে যেতেন, রাজ-সাহচর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে। আর, রাণী—এ রাণীটীর নাম 'সুবাদ'—যখন ইহলীলা

সংবরণ করতেন, তখন তাঁর নব-জীবনের সম্পদ পূর্ব্ব-জীবনের অনুরূপ করে রাখবার উদ্দেশ্যে অনেক লোক আত্মহত্যা করতেন। রাজা ও রাণীর পাশাপাশি গোর দেওয়া হতো। উপযুক্ত অলঙ্কার সাজ-সজ্জা তাঁদের দেহের সঙ্গে সমাধি লাভ করত।

মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পার আবিষ্কার সম্বন্ধে ক্যাসন সাহেব বলেন যে, এখনও অনেক খোঁড়া দরকার। এখন এই-মাত্র বলা যায় যে, খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে সুমেরীয় ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। হারাপ্পায় প্রাপ্ত একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বালকের মূর্ত্তি দেখে হঠাৎ মনে হয় যে সেটী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর কোনো গ্রীক্ ভাস্করের হাতে-গড়া। লেখক ভরসা করেন : "The Indians may prove to have been the earliest naturalistic sculptors in the world."

ইউরোপ এবং এসিয়ার মধ্যে যেটুকু জলের ব্যবধান আছে, সে ব্যবধানটুকুকে জয় করার প্রচেষ্টা প্রাচীনযুগে বারম্বার হয়েছিল। কন্ষ্টান্টিনোপ্ল্ আর (হোমরীয়) ট্রয়—এই দুটী ছিল ইউরোপের সঙ্গে এসিয়ার গতায়াতের সেতু। ঐ দুটী সহরে সেই জন্যে প্রাচী-প্রতীচ্যের সমন্বয় বিশেষ ভাবে দেখা যায়। বেল্গ্রেডের কাছে 'বিঞ্চা' নামক স্থানে কয়েক বৎসর খনন-কার্য্য চলেছে ; ফলে, আমরা জান্তে পেরেছি যে, প্রাচ্য সভ্যতা—যার আভাস আমরা উরে পাই—প্রতীচ্যে প্রবেশ লাভ করছিল খৃঃ পূঃ প্রায় ২৫০০।৩০০০ বৎসরের সময়ে।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা যাদের 'হিটাইট্'নামে অভিহিত করেন, তাদের অভ্যুদয় হয়েছিল প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০। ট্রয় নগর তখন রাহু-গ্রস্ত। তুর্কী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 'বোঘাজ্-কুই'-গ্রামে সহস্র সহস্র হিটাইট্ ফলক আবিষ্কৃত হয়েছিল ; অধিকাংশেরই পাঠোদ্ধার এখন হয়েছে। বহু ফলকে 'অহ্হিয়ব' নামক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় ; এই জাতি হোমরে 'অখাইয়' (Achaeans) -নামে পরিচিত। ট্রোজান সমরের সমসাময়িক মিশরের শিলালিপিতে এই জাতির নাম মেলে ; এরা অন্যান্য নানা জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল। সেই সময়েই বোধ হয় ঐ সব জাতির কিয়দংশ ভারতে আসে। ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠের সমকালীন রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারটী জাতের সঙ্গে এই মিশরীয় অভিযানের চারটী জাতের নাম-গত সাদৃশ্য আছ (অখৈব=যক্ষু, শিকুরু=শিভ্রু ; তুর্-বশ=তুর্বশ)। আর রামায়ণে বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠের সমকালীন রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে রাক্ষসরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের জাতিগত নাম 'পুলস্তি' (পুলস্ত্য) মিশরের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, এই 'পুলস্তি'-জাতি প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে বসবাস করতে লাগলেন—সেই জন্যেই দেশটার নাম প্যালেষ্টাইন ; আর, কিছুদিন পরে এই 'তুর্-জাতি' ইতালীতে 'এত্রুরিয়া' অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে,—সেই জন্যেই দেশটার নাম এত্রুরিয়া।

আধুনিক ইতালী দেশ-হিতৈষীরা বিশ্বাস করতে চান্ যে, এত্রুরিয়ার

* এ বিষয়ে বর্ত্তমান সমালোচকের একটী প্রবন্ধ ১৯৩০ সালে জার্ম্মাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল—Geiger Commemoration Volume (Studia Indo-Iranica, Leipsig) art. "Vedic India and Minoan Men" দ্রষ্টব্য।

লোকরা বহির্জাতি ছিল না, তারা ছিল প্রাক্-আর্য্য-জাতির বংশধর। কিন্তু, ক্যাসন সাহেব বলেন যে, আর্কিয়লজি এ মতকে দিনের পর দিন খণ্ডন করে যাচ্ছে। আর একটা ভুল ধারণা এই যে, ইতালীতে প্রাচীনযুগে বাস করছিল যত অসভ্য জাত; তাদের না-কি সভ্য করলেন রোম। সত্য কথা বলতে গেলে রোমের সমৃদ্ধির বহুপূর্ব্বে সেই সব প্রাচীন জাতি সভ্যতার উন্নত সোপানে আরোহণ করেছিলেন।

রাশ্যা, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, সাইবীরিয়া ও চীন এই সব দেশের শিল্প কি প্রকারের ছিল, তার কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। রাশ্যার যাদুঘরগুলির মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন সংরক্ষিত আছে, সে-গুলো দেখলেই বোঝা যায় সে-কালে সে-দেশের শিল্প কত ভাল ছিল। সাইবীরিয়ায় প্রস্তর-যুগের এমন কয়েকটী কীর্ত্তি আছে যে-গুলোকে masterpieces বলা যায়। যাযাবর জাতিদের সাধারণত একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়। কিন্তু তাদের হাতের তৈরী জিনিষ দেখলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে উত্তর এসিয়াখণ্ডের যাযাবর-জাতি শিল্প-কৌশলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির সমতুল্য। ক্যাসন সাহেবের ভাষায়—

"The style of art of those Siberian and Russian ornaments found throughout the length and breadth of upper Asia is particularly pure and fine. The art is instinctive and not elaborated. And the tendency throughout is to capture the beauty of the forms and shapes of animals and to adapt those shapes quite arbitrarily to the utility aspect of the objects made. And the artist is always making patterns, never copying nature. In a word, the northern Asiatic in ancient times was an instinctive artist, a wandering hunter with a hunter's eye for beauty." (pp. 69-70).

আমেরিকায় 'মায়া'-জাতির সভ্যতার নিদর্শন অনেকদিন আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছিল অতি সামান্য। গত বিশ বৎসরের খনন-কার্য্যের দ্বারা এই অভাব কতকটা পূর্ণ হয়েছে। এখন বোঝা যায়, প্রায় খ্রীষ্টজন্মের সময়েই আমেরিকায় এ সভ্যতার বিকাশ, এবং তারপরে প্রায় ৪৫০ বৎসর সভ্যতাটীর জীবন। তবে এই নাগরিক সভ্যতার আদি কবে ও কোথায় তার সন্ধান আজও মেলে নি। এদের শিল্প অনেকটা সাইবীরিয়ার মতন; কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের চাইতে মানুষের চেহারাই এরা আঁকতে ভালবাসত বেশী। লোহার ব্যবহার তারা জানত না—তাদের যন্ত্রগুলো, হয় পাথরের, নয় কাঠের। গণনায় এরা ছিল বিশেষ নিপুণ।

আফ্রিকায় যে সব নতুন জিনিষ খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে তুতানখামেনের সমাধি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। ক্যাসন সাহেবের মতে,—"Among the objects recovered some, undoubtedly, were of exquisite workmanship and great beauty. But there was a pronounced element of sheer vulgarity and ostentation in many of them." (p. 90). রাজার মুকুটটী সেকালের স্বর্ণকারের স্বকৌশলের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, ইত্যাদি সম্বন্ধে পুস্তকটীতে অল্প-বিস্তর আলোচনা

আছে। ইষ্টর আইল্যাণ্ডের বিস্ময়কর ভাস্কর্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও আমরা পাই। তবে আধুনিক আর্কিয়লজি এসব দেশের কোনো নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি।

ভরসা করি, বইটী বিদ্যানের কাছে আদর পাবে।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

Principles of Gestalt Psychology—By K. Koffka. (Routledge).

মনোবিজ্ঞানের অনতিপূর্ব্ব ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের দুন্দুভি-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনীয় দেহাচারবাদের সমসাময়িকতা স্বতঃই বিংশতাব্দীর বিজ্ঞানপন্থী মনোবৈজ্ঞানিকের মনে সন্দেহ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। ভুণ্ট ও টিচনারের বীক্ষণাগারের প্রপদী মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ধারার সঙ্গে এই নবীন মতবাদের বিরোধের সমাধান হবার পূর্ব্বেই হোরটাইমার, কেইলার ও কফ্‌কার গেষ্টাল্ট-বিধির প্রচার হওয়াতে জনসাধারণ মনোবিজ্ঞানের এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। অবশ্য গেষ্টাল্ট নামক পরার্থের সঙ্গে পূর্ব্বের বৈজ্ঞানিকদেরও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিচয় ছিল। মুলার,হুসার্ল, এরেনফেল্স, স্যুমান, কর্ণেলিয়াস ক্রিগার, ফোলকেণ্ট ও মাক্তিয়ুসের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজেই গেষ্টাল্ট-মতবাদও নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় অর্থাৎ কেইলার-কফ্‌কা-মাত্রাত্রয় নয়। অবশ্য পরীক্ষার বহুবিধ আঙ্কিক নবীনেরা আবিষ্কার করেছেন ও গেষ্টাল্টকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে বহু আয়াস করেছেন একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য।

মানসিক ক্রিয়ার যে প্রপদী আণবিক ও সংশ্লেষাত্মক ব্যাখ্যার অপ্রতিহত প্রভুত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিরাজমান ছিল প্রধানতঃ তার বিরুদ্ধেই গেষ্টাল্টীয়গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আণবিক বেদনা-পুঞ্জের আনুসঙ্গিক সংশ্লেষণের সাহায্যে মনের ব্যাখ্যা দুর্ব্যাখ্যা বলে এঁরা প্রপদী মনোবিজ্ঞানকে নির্ব্বাসনে পাঠালেন। অংশ থেকে সমগ্রে উপনীত হবার অসম্ভাব্যতা এঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তাই সিদ্ধান্ত করলেন যে অংশকে সমগ্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিচার না করলে অংশকে বোঝা যায় না। ন্যায়তঃ সমগ্রতা অংশতার পূর্ব্ববর্তী; অতএব এঁরা দেহাচারবাদীর পরাবর্ত্তকের বিশেষীকরণ বিধিকেও আণবিক সংশ্লেষণ-স্থানীয় বলেই মনে করেন। গেষ্টাল্টের এই তাত্ত্বিক প্রতিবেশে পরীক্ষাগারের অবিরত পরিশ্রমের ফল এই বিখ্যাত পুস্তক, Principles of Gestalt Psychology।

প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বহু দার্শনিক আলোচনার সন্নিবেশ করেছেন ও শেষ পরিচ্ছেদে পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগ রেখে তার পুনরুল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, জ্ঞানোন্মেষ, চিন্তা, ইচ্ছা, ভাবাবেগ, আশ্বিতা প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রে গেষ্টাল্টের প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যদের সঙ্গে নিজের মতের সামঞ্জস্য করে এই শাস্ত্রকে এক নূতন রূপ প্রদান করেছেন। ফলে বহু তথ্য ও তত্ত্বের ঘন-সন্নিবিষ্ট অরণ্যানীর মধ্যে অনভিজ্ঞ পাঠককে প্রায় দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। যুগান্তব্যাপী বাদ-বিসংবাদের সমাধানের চেষ্টার ফলে পুস্তকখানি

বিশেষজ্ঞদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু লিখনভঙ্গীর সাবলীলতা এত দুরূহ ব্যাপারকেও মনোজ্ঞ করে তুলেছে। তবে একটু অন্যমনস্ক হলেই চিন্তার ও বিচারের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। কাজেই পাঠককে অত্যন্ত অবহিত হয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করে পুস্তকখানির পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ অতিক্রম করে লেখকের সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত পৌছাতে হয়। তবে প্রথম পরিচ্ছেদে কিছু সাধারণ আলোচনা থাকাতে সে পক্ষে কিছু সৌকর্য্য হয়।

চর্য্যা বা জ্ঞানোন্মেষ সম্পর্কে গ্রন্থকারের মূল বিরোধ দেহাচারবাদীদের সঙ্গে। থর্ণডাইকের পরীক্ষা ও ভ্রান্তি নামক বিখ্যাত বিধির বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখান হয়েছে। চর্য্যার মূলে কেবলমাত্র প্রয়োগ বর্ত্তমান এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পরীক্ষা দ্বারা গ্রন্থকার দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে অন্তর্দৃষ্টিই চর্য্যার প্রাণ। সম্পর্ক স্থাপন ও অর্থগ্রহ অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন সম্ভব নয় এই যুক্তিতে দেহাচারবাদীদের বিখ্যাত প্রয়োগ-বিধি খণ্ডনের চেষ্টায় ইনি বহু পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ সম্পর্কেও প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ নিরসন দ্বারা গেষ্টাল্টবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযত্নের ত্রুটী করেন নি। কিন্তু যে থর্ণডাইকের বিরুদ্ধে গেষ্টাল্টের এই অভিযান সে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ মাত্র, অন্তর্দৃষ্টি না হোক, অন্ততঃ অর্থগ্রহকে আসল থর্ণডাইক অস্বীকার করেন নি। আর প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গ্রন্থকার যে ভৌতিক, শারীর ও মানসিক গেষ্টাল্টের পরিকল্পনা করেছেন, তা কতটা ভারসহ বলা কঠিন। স্বতঃই মনে হয় পদার্থবিদ্যা ও শরীর-বিজ্ঞানের এই কাল্পনিক মূর্ত্তি রচনা গেষ্টাল্টের ভঙ্গুরতার পূর্ব্ব সূচনামাত্র।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে অতিমাত্রায় দার্শনিকতার গন্ধ থাকলে স্বভাবতঃই অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হয়। কফ্‌কা কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ স্থির করতে রাজী নন। তিনি একটা পূর্ব্ব-কল্পিত পরিকল্পনার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কোন প্রকারে সেই কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। বিভিন্ন বিজ্ঞানের সীমানির্দ্দেশ ও বিষয়-বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ দার্শনিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাণ্টের Critique of Pure Reason-এর শেষাংশে Transcendental Doctrine of Methodএর Architetonic of Pure Reason নামক অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এ আলোচনাতে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা দার্শনিকের অধিকার বেশী। অধিকন্তু, কোন বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এ জাতীয় দার্শনিক আলোচনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অনুসন্ধিৎসার পরিপন্থী। গ্রন্থকার প্রাকৃতিক ও মানসিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তা প্রয়োজনীয় হলেও, তার ধারা বর্ত্তমান পুস্তকে দার্শনিকতাপ্রসূত, অতএব আপত্তিকর।

বিস্তৃত দার্শনিক বিচার করলে মনোবিজ্ঞানের স্থান ঠিক কোথায় তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির মূলগত পার্থক্যের বিষয় মনে রাখলে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে একে সমপর্য্যায়ে ফেলা চলে না। আর যদিও বা কিছু সম্ভব হয়, সে একমাত্র দেহাচারবাদী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেই কিছু খাটে।

গেষ্টাল্টবাদ শেষ পর্য্যন্ত McDougallএর Hormic Psychology বা বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর Spranger, Binswanger, Ewald প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Understanding Psychology'র সমপর্য্যায়ভুক্ত। Dilthey ও Munsterburgএর সঙ্গেও Gestalt-পন্থীগণের মূলগত সাদৃশ্য আছে; দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দেখলে Gestalt Psychology Empirical Psychologyর সমগোত্রে উন্নীত হয়েছে বললেও বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য একথা Gestalt Psychologyর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার পদ্ধতির দিক থেকেই কেবলমাত্র খাটে। আধুনিক কালোপযোগী বহু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বর্ত্তমান কালের মনোবিজ্ঞানের বহুবিদিত লেখকের এই পুস্তকখানি দার্শনিক, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন-বিজ্ঞানে অনুরাগী প্রত্যেক পাঠককেই পাঠ করতে আমরা অনুরোধ করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

A Handbook of Marxism—Edited by Emile Burns (Gollancz,)

প্রায় এগার শো পাতা, ছাপা ভাল, কাপড়ের বাঁধাই, দাম মাত্র পাঁচ শিলিং—একে বইয়ের বাজারে একটা মস্ত দাঁও বল্‌তেই হবে। পুণ্যার্জ্জনের ইচ্ছা থাকলে কেউ যেন এর অন্তত শখানেক কপি কিনে একটা ছোটখাট দানছত্র খোলেন!

মার্ক্‌সবাদের প্রামাণ্য আলোচনা একখানা সহজলভ্য বইয়ের মধ্যে যতদূর ঢোকানো যায়, বার্ণ্‌স সে চেষ্টা করেছেন। যাঁদের মুখ আর কলম দিয়ে মার্ক্‌সবাদ বিশ্লেষণ এ বইয়ে হয়েছে, তাঁরা কেউই পণ্ডিতী টীকাকার নন্। তাঁরা হচ্ছেন স্বয়ং মার্ক্‌স, এঙ্গেল্‌স্। আর তাঁদের দুই শ্রেষ্ঠ শিষ্য লেনিন আর ষ্টালিন। বইয়ের আর্দ্ধেকের কিছু বেশী দুই গুরুর লেখা থেকে বাছা, বাকিটা হচ্ছে দুই শিষ্যের লেখা, বক্তৃতা আর ১৯২৮ সালে থার্ড ইণ্টারন্যাশ্‌নলের অধিবেশনে যে কার্য্য-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তার বিবরণ। অন্য কারুর লেখা এতে নেই; প্রেখানভ, ট্রট্‌স্কি, কাউট্‌স্কি বা হিল্‌ফারডিঙের উল্লেখ নেই শুধু বইয়ের শেষে এক নামের তালিকায় ছাড়া; যাঁরা মার্ক্‌সবাদকে ঘষে মেজে "ভদ্রস্থ" করার চেষ্টায় ছিলেন সেই "Revisionists"-দের কথা তো ছাড়াই যাক্। ১৮৮৮ সালের কম্যুনিষ্ট্ ইস্তাহার দিয়ে বই আরম্ভ, আর শেষ হচ্ছে ১৯২৮ সালে ইণ্টারন্যাশ্‌নলের কার্য্যপদ্ধতিতে। আর ক মাস বাদে বইটা বেরুলে সপ্তদশ ইণ্টারন্যাশ্‌নলের যে অধিবেশন হয়ে গেছে, তার খবর থাকত আর সে খবর কম্যুনিজ্‌মের ইতিহাসে বিশেষ দামী।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে ১৮৫৪ সালে মার্ক্‌স্ যা' লিখেছিলেন তা আমাদের প্রায় সকলের পক্ষেই দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, একরকম অপ্রাপ্য; এ বইয়ে সেটা মিল্‌বে। মার্ক্‌সের 'Poverty of Philosophy' (যা' প্রূধঁর Philosophy

of Poverty'-কে বিরূপ করে লেখা হয়েছিল), এঙ্গেল্‌সের 'Origin of the Family, Private Property, and the State' লেনিনের 'Materialism and Empirio Criticism', 'Imperialism' ইত্যাদি অনেক বই যা' আমরা বড় একটা যোগাড় করতে পারি না, তা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি এ বইয়ে পাওয়া যাবে। আসল মার্ক্‌সবাদ বলতে যা বোঝায়, তার ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, দৈনন্দিন কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ক—এ সব রকম আলোচনা চুম্বকে জানতে হলে এ বইয়ের জুড়ি আর কোথাও মিলবে মনে হয় না।

কেউ কেউ হয় তো চাইবেন যে ট্রট্‌স্কির 'Russian Revolution' থেকে বা হিল্‌ফার্ডিঙের 'Finance Capital' থেকে বা কাউট্‌স্কির ১৯১৪ সালের আগের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা অনেকেই ট্রট্‌স্কির অসামান্য তীক্ষ্ণ প্রতিভা দেখে অল্পাধিক মুগ্ধ; কাউট্‌স্কি আর হিল্‌ফার্ডিঙ্ জার্ম্মাণভাষী দেশে যে মার্ক্‌সবাদীদের এককালে পুরোধা ছিলেন, তাও অনেকে জানেন। কিন্তু মার্ক্‌সবাদের ভিত্তির ওপর যারা নতুন সমাজ-সৌধ নির্ম্মাণে ব্যস্ত, তারা বিমার্গগামীদের ("deviationists") ক্ষমা করতে পারে না, তাদের মতে যারা কৃতঘ্ন তাদের পূর্ব্ব খ্যাতির জন্যে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ভণ্ডামির একটা প্রকার-ভেদ। ট্রট্‌স্কির অতিদুর্লভ চিন্তাশক্তি, কর্ম্মক্ষমতা ও লেখনীদক্ষতা তাদের অজ্ঞাত নয়, গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাউট্‌স্কি যে নির্ব্বিসম্বাদে মার্ক্‌সবেত্তাদের শিরোমণি ছিলেন, তাও অস্বীকার্য্য নয়; কিন্তু যুদ্ধ কাউট্‌স্কিকে সুবিধাবাদী ("opportunist") করে দিল আর মতান্তর ট্রট্‌স্কিকে প্রকাশ্যভাবে কম্যুনিষ্ট্ দলের অনুশাসনদ্রোহী করল—এ দুই অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

এই সুযোগে ষ্টালিন্-ট্রট্‌স্কির মতভেদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মতদ্বৈধের প্রধান কারণ হচ্ছে ট্রট্‌স্কির "Permanent Revolution"-বাদ। তাঁর মতে প্রলেটেরিয়েটের যে কেবল ধনিকদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে তা নয়, চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের বিরুদ্ধে যাবে। সুতরাং যে সমস্ত পশ্চাৎপদ দেশে চাষীদের সংখ্যাধিক্য প্রবল, সেখানকার সমস্যা সমাধান তখনই হতে পারবে যখন সমস্ত পৃথিবীতে প্রলেটেরিয়ট্ বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেছে। এর এক অর্থ এই যে বিপ্লবী রুষদেশ কখনই রক্ষণশীল ইয়োরোপ বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। ইয়োরোপের মজুর শ্রেণী রুষদেশকে সাক্ষাৎ সাহায্য না করলে সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। অন্তত ইয়োরোপের প্রধান সব দেশে শ্রমিকদের জয় না হলে রুষদেশে নতুন সমাজসৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

লেনিনের লেখা থেকে বোঝা যাবে যে প্রলেটেরিয়ন্ ডিক্টেটরশিপের ভিত্তি হচ্ছে নগর ও গ্রামের সকল শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ মিলন; মিলের কুলী আর মাঠের চাষীকে এক নিশানের তলায় দাঁড় করাতে হবে, ট্রট্‌স্কি এদের আলাদা তাঁবুতে ঠেলেছেন। বিপ্লবে চাষীদের যে অনেকখানি যায়গা নেবার আছে তা তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন বলে প্রকারান্তরে তাদেরই সাহায্য করছেন যারা চাষীদের বিপ্লবান্দোলনে ডাক দিতে নারাজ। আর দ্বিতীয়ত, লেনিনের মতে ধনিকবাদের একটা নিয়মই

হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে অসমান, তার রেখা অবক্র, মসৃণ, ঋজু নয়, কোথাও কম, কোথাও বেশী এই তার স্বভাব। সুতরাং এ অবস্থায় কয়েকটি বা এমন কি একটি মাত্র দেশেও সমাজতন্ত্রবাদের জয় অবশ্য-সম্ভাবী। গত মহাযুদ্ধের সময় লেনিন মনে করেছিলেন যে ঐ বিকট তাণ্ডবের অবিশ্রান্ত ক্রূরতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে সকলের চক্ষুরুন্মীলন হবে, বিপ্লব কেবল সর্ব্বব্যাপী হবে না সর্ব্বত্র সফলও হবে, "একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ" সম্ভব কি না সে বিচার নিষ্প্রয়োজন হবে। কিন্তু ইতিহাসের সিদ্ধান্ত হল ভিন্ন, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপন ও পরিচালন ব্যাপদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা পুরোনো মতে পরিবর্ত্তন এনে দিল।

মার্ক্‌স্ও একবার তাঁর এক চিঠিতে বলেছিলেন যে "একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ" সম্ভব কি না সন্দেহ। কিন্তু লেনিন আর ষ্টালিন দেখ্‌লেন যে অন্তত রুষদেশ সম্বন্ধে তাঁর ও মত ঠিক খাটছে না। মার্ক্‌স্ যে অর্থে "এক দেশ" কথা দুটো ব্যবহার করেছিলেন, সে অর্থে রাষ্ট্রা একদেশ মাত্র নয়, এক বিরাট মহাদেশ বা প্রায় সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে। ভৌগোলিক বহিরাকৃতি (configuration) যার সহায়, যেখানে খনোৎপাদনের সুযোগ প্রায় অফুরন্ত, যেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অনেক অগ্রগামী দেশের তুলনায় সহজে পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ,—সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক কথা, আর ধনিকজগতের বৈরিতা অগ্রাহ্য করে ইংলণ্ডের মত সুসংহত, বাণিজ্যনির্ভর দেশে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের চেষ্টা আর এক কথা। এই কারণে লেনিন একবার বলেছিলেন যে রুষদেশের তুলনায় ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন সময়সাপেক্ষ, কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে ভিত্ একবার ভাল করে খুঁড়তে পারলে রাস্তার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি ইমারৎ উঠে যাবে।

অবশ্য 'Socialism in one country'—একথা শুনে প্রেরণা বেশী আসে না। তবে যাদের প্রেরণা কতগুলো গরম কথা তাদের দাম সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে খুবই কম। আর সকলেই জানেন যে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে প্রচেষ্টা অদম্য উদ্যমে চলেছে, তার সাফল্যের চেয়ে বড় প্রেরণা শ্রমিক আন্দোলনের আর কিছু নেই। মার্ক্‌স্‌বাদ জড় বিশ্বাস নয়, জীবন্ত আন্দোলন, তার রীতি, তার বিধি স্থাণু, নিশ্চল নয়; তাই Brest-Litovsk সন্ধির সময় ট্রট্‌স্কি যখন ব্যাকুল হয়ে লেনিনকে তার করেছিলেন যে 'ইভ্‌নিং' পোষাক পরে সন্ধি-সভায় তিনি প্রলেটেরিয়ন্ হ'য়ে কেমন করে উপস্থিত হন, তখন উত্তর আসে যে যুদ্ধশান্তির জন্যে প্রয়োজন হয় তো 'পেটিকোট' পরে হাজির হও। তাই তাঁর New Economic Policy মার্ক্‌সবাদের আদর্শ থেকে সাময়িক বিচ্যুত হলেও তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি; ষ্টালিনও সেই পথ অনুসরণ করে ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন। ঐ দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বও যে বিরোধের মধ্যে ছিল না, তা' নয়; কিন্তু ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে সমূহের স্বার্থই শ্রেয়, তাই পার্টির নিয়ম যিনি লঙ্ঘন করেছিলেন, তাঁর শাস্তি হল। লেনিনের সময় যেমন Martov, Dan প্রভৃতি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি ষ্টালিনের সময় ট্রট্‌স্কিকেও দেশ ছাড়তে হল। এ নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নেই; কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে বিপথগামিতা বিষম অপরাধ, ভ্রমস্বীকার ভিন্ন তার মার্জ্জনা নেই।

আলোচ্য বই ছেড়ে খানিকটা বেরিয়ে আসা গেছে। আবার ফিরে বলা যাক যে এ থেকে যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে একটা সঙ্কলন আশা করছেন, তাঁদের ভুল হচ্ছে। তবে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ যে মতবাদ ও বিপ্লবান্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, সে সম্বন্ধে একটা বই থেকে যত না আশা করা যায়, তার বেশী এ বইয়ে পাওয়া যাবে।

বাছাই খুব ভালই হয়েছে—তবে দু' একটা জিনিষ, যেমন আয়ারল্যাণ্ড বা "housing question" সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ বা এঙ্গেল্‌স্ যা বলেছিলেন তার দাম এখন তাঁদের অন্য অনেক লেখার তুলনায় কম। তার বদলে "Wage-Labour and Capital" থেকে অন্তত কিছু, মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সের পত্রাদি থেকে কিছু, আর "Critique of Political Ecomony"র ভূমিকাটা নিশ্চয়ই এখানে থাকা উচিত ছিল। ষ্টালিনের লেখা খুব দরকারী হলেও তার সামান্য কমিয়ে একটু যায়গা মার্ক্‌সের জন্যে বাড়ানো হলে ভালই হত। মার্ক্‌সবাদের অর্থনীতির দিকটা আরও পরিষ্কার করবার চেষ্টা বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে হতে পারত।

অবশ্য এগুলি হচ্ছে গৌণ সমালোচনা; বইখানার দাম সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ইংরাজীতে যে কথা আছে—"beg, borrow or steal" সেটা একটু বদলে বলব এ বইটা—buy, borrow or steal।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুধাকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২০।৫।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।